সীরাহ
মুহাম্মাদ ﷺ

প্রথম খণ্ড

সীরাহ

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

রেইনড্রপস

প্রকাশিত

সীরাহ্

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক	▪	জিম তানভীর
প্রথম প্রকাশ	▪	জুমাদা আস সানী ১৪৩৭ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ	▪	রবিউস সানী ১৪৩৭ হিজরি, মার্চ ২০১৮ ঈসায়ী
গ্রন্থস্বত্ব	▪	রেইনড্রপস
প্রচ্ছদ	▪	আনিকা ওয়ারদা তুবা
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য	▪	২৫০ টাকা

www.raindropsmedia.org
www.facebook.com/raindropsmedia
rdmedia2014@gmail.com

শারঈ সম্পাদনা: শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবন জাকির

ISBN: 978-984-34-0250-9

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর নগণ্য কিছু বান্দাকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বান্দার জীবনকথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন এমন একজন, চৌদ্দশ বছর পরেও যাকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। যারা তাকে জেনেছে, তারা তাঁকে ভালোবেসেছে; যত বেশি জেনেছে, তত বেশি ভালোবেসেছে। যারা তাঁকে জানেনি, তাঁরা ভালোবাসার নদী দেখলেও মহাসমুদ্র দেখেনি। না-দেখেও যাকে পৃথিবীর মানুষ সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

গল্পের নায়কদের কথা মানুষ খানিক বাদেই ভুলে যায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব টিকে থাকে বড়জোর কয়েকটা বছর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একজন যাকে এত বছর পরেও লোকেরা ভালোবাসে, তাঁর অনুসরণ করে, তাঁর সম্মানে নিজের জীবন দিয়ে দেয়। জীবদ্দশায় আবু জাহেলরা তাঁকে ভয় করতো, মৃত্যুর পরে আবু জাহেলের উত্তরসূরিরা তাঁর অনুসারীদের ভয় করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যে জাতির কাছে 'মুহাম্মাদ' ﷺ আছে, সে জাতিকে আজ টং এর মামা থেকে শুরু করে বারাক ওবামা – প্রত্যেকেই দিকনির্দেশনা দিতে ব্যতিব্যস্ত। মুসলিমদের আজকে অমুসলিমরা ইসলাম শেখায়, উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির সবক দেয়। বিষয়টা লজ্জা আর গ্লানির।

আমরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ চিনলেও তাঁকে আমরা জানিনা। জানিনা বলেই তিনি কারো কাছে নিছক একজন 'ভালো মানুষ', আর দশজন মনীষির মতো, যারা কিনা কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আর নীতিকথা বলে খালাস! কিংবা কারো কাছে তিনি একজন 'ধর্মপ্রচারক', কিছু ভালো ভালো কাজ করেছেন, এই যা!

কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন রাসূল। তিনি একটা গ্লোবাল মিশন নিয়ে এসেছিলেন এবং আমরা সেই মিশনের অংশ। আল্লাহ এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য। তিনি মানুষকে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন যে পথ খুঁজে পেতে আমাদের বুদ্ধিজীবী-দার্শনিক-বিজ্ঞানী-আমলারা মাথা কুটে মরে, কিন্তু সমাধান খুঁজে পায় না।

এই সমস্যার একটিই সমাধান। তা হলো রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানা। আর জানার জন্যই তাঁর সীরাহ পড়া। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তি জীবন, তাঁর

নবুওয়াত, তাঁর নেতৃত্ব এবং তাঁর চারপাশের মানুষগুলো নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনীপ্রবাহ। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ পড়লে ইনশা আল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সংকীর্ণ ধারণার দেয়ালগুলো ভেঙে যাবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্পর্কে জানলে, ইসলামবিদ্বেষীদের প্রোপাগান্ডা শুনে আমাদের মনে যে 'খচখচ' হয় সেটা দূর হয়ে যাবে, বিইযনিল্লাহ। আমরা জানব রাসূলুল্লাহ ﷺ কত চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কারো মন জয় করতেন, কাউকে রুখে দিতেন, আর কাউকে মোকাবিলা করতেন। নিজের ঘর থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান – প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। যারা তাঁকে ভালোবেসেছে, তাদের জীবন আমূল বদলে গেছে, যে জাতি তাঁর অনুসরণ করেছে, তাদের ভাগ্য বদলে গেছে। এমন একজন মানুষ সম্বন্ধে যদি আমরা না জানি, না মানি, তাহলে তো আমরাই 'মিস' করলাম!

আদর্শিক দৈন্যতার কারণে ইতিহাস বলতে হয়তো আমরা ৫২ বা ৭১ এর আগে কিছু চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ইতিহাসের সামনে সকল ইতিহাসই ম্লান। পৃথিবীর যত বিপ্লব, তার সবক'টা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কিছু পরিবর্তন করে কয়েক দশক বা সর্বোচ্চ কয়েক শতক পরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু যে বিপ্লবের সূচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, সেটা চলবে ততদিন, যতদিন না মুসলিম জাতির সমগ্র পৃথিবীর উপর বিজয়ী হবে।

বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহর ﷺ একাধিক সীরাহ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই সীরাহতে হাত দিয়েছি মূলত দুটি কারণে। একটা হলো, মুসলিমরা সীরাহকে গল্প হিসেবে পড়ে, কিন্তু সেখান থেকে কিছু শেখে না। এই সমাজের আবু জাহেল কিংবা মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইদেররকে তারা চিনতে পারে না। এই সীরাহতে প্রায় প্রতিটি ঘটনা থেকে কী শেখার আছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি ভাষাগত। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামকে আমাদের দেশের মূলধারার শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ায় ইসলামী সাহিত্যের সাথে সাধারণ মানুষের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে যে ধরনের সাহিত্য আমরা পড়েছি, সেগুলোর সাথে ইসলামী সাহিত্যকর্মের ভাষাগত ব্যবধান তৈরি হওয়ায় বরেণ্য আলিমদের লেখা বইগুলো পড়েও মানুষ যথাযথভাবে উপকৃত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই সীরাহ সেই ব্যবধানকে কমিয়ে আনার প্রয়াস। চৌদ্দশো বছর আগের কথাগুলো যেন আমরা আমাদের পরিস্থিতির সাথে মেলাতে পারি, সেই সময়ের আলোয় নিজেদের দেখতে পারি সে জন্য প্রয়োজন ভাষাগত দেয়ালটি ভেঙে ফেলা। সে উদ্দেশ্যে এই সীরাহতে কাহিনিগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিছুটা আধুনিক যুগের ঢঙে, যেন পাঠক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নবীজির যুগে প্রবেশ করতে পারে।

এই সীরাহর বিষয়বস্তুগুলো মূলত নেওয়া হয়েছে শাইখ আলি আস-সাল্লাবির রচিত সীরাহ এবং আর-রাহীকুল মাখতুম থেকে। রেইনড্রপস এর ভাইবোনেরা চেয়েছে

কেবল একটি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় সীরাহ্ উপহার দিতে, যেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ আমরা ভালোবাসতে পারি, তাঁর জন্য জীবন দিতে পারি।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম।

জিম তানভীর
২০ রবিউস সানি, ১৪৩৭ হিজরী।

সীরাহ নিয়ে কিছু কথা

সীরাহর সংজ্ঞা

সীরাহ্ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। আরবিতে সাইর মানে হাঁটা, কেউ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যায় তখন আরবিতে বলা হয় সাইরত্ব ফুলান, অর্থাৎ অমুক হাঁটছে।

সীরাহ্ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেঁটে চলে। হান্স ডিকশনারিতে (Dictionary of Modern Written Arabic by Hans Wehr) সীরাহর যে সব অর্থ দেওয়া হয়েছে তা হলো: আচার-ব্যবহার, চালচলন, মনোভাব, জীবনযাত্রার ধরন, সামাজিক অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন ও জীবনী–এই সবগুলোই সীরাহ এর অন্তর্ভুক্ত। সীরাহ বলতে শুধুমাত্র মুহাম্মাদের ﷺ জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো হয়। কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ এর জীবনীর সাথে সীরাহ্ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় নবীজি মুহাম্মাদের ﷺ জীবনীকেই বোঝানো হয়। সীরাহ বলতে যেহেতু যেকোনো ব্যক্তির জীবনচরিতকে বোঝায় তাই আবু বকরের رضي الله عنه সীরাহ, উমারের رضي الله عنه সীরাহ – এভাবে বললেও ভুল হবে না।

সীরাহ্ অধ্যয়ন করার গুরুত্ব

১) ইসলামের ইতিহাস জানা

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। তাঁর জীবন অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইসলামের আসল ইতিহাস জানা যাবে, অর্থাৎ তাঁর পুরো জীবনকাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলো জানা বর্তমান সময়ের দাওয়াতি কাজের জন্য খুবই জরুরি। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন তাই নিছক একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা নয় বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো মুসলিম জাতির ইতিহাস, দ্বীন ইসলামের ইতিহাস।

দুনিয়াতেই জান্নাতের সুখবরপ্রাপ্ত ১০ জন আশরা-ই-মুবাশশারাহর একজন হলেন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه বলেন, 'আমাদের পিতা (সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস) রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ্ পড়ানোর সময় বলতেন, এগুলো হলো তোমাদের বাপ-দাদাদের ঐতিহ্য, কাজেই এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করো।' তাঁরা সীরাহকে মাঘাযি বলে অভিহিত করতেন, মাঘাযি মানে যুদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষভাগের প্রায় পুরোটা সময় বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাই তাঁরা মাঘাযি বলতে তাঁর পুরো জীবনকেই নির্দেশ করতেন।

আলী ইবন আবি তালিবের رضي الله عنه নাতি আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিব বলেছেন, 'আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শেখানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনীও পড়ানো হয়েছিল।' অর্থাৎ সীরাহ তাঁদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কুরআন অধ্যয়ন করার পেছনে তাঁরা যেভাবে সময় দিতেন সীরাহর পেছনেও ঠিক একইভাবে সময় দিতেন।

সীরাহ অধ্যয়ন করা কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। কুরআন থেকে মূসা عليه السلام বা ঈসার عليه السلام জীবন সম্বন্ধে যতটা বিস্তারিত জানা যায়, ততটা রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্বন্ধে জানা যায় না। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই তাঁর সীরাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

২) রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা

সীরাহ অধ্যয়ন করার একটি অন্যতম কারণ হলো অন্তরে মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি এক গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা। নবীজিকে ﷺ ভালোবাসা হলো ইবাদাত। দ্বীনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।'

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে ﷺ সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়া যাবে না। সুতরাং মুহাম্মাদকে ﷺ কে ভালোবাসা হলো ইসলামের একটি অংশ।

উমার ইবন খাত্তাব رضي الله عنه ছিলেন খুবই সৎ ও স্পষ্টভাষী একজন মানুষ, তিনি যা বলার তা সরাসরি বলে ফেলতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি নিজেকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি, আমি নিজেকে ছাড়া অন্য সবকিছুর চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যতক্ষণ না আমাকে ভালোবাসতে পারবে', এর মানে হলো যতক্ষণ না আমাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারবে না। এরপর উমার ইবন খাত্তাব رضي الله عنه বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাহলে আমি আপনাকে আমার নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল-আন আমানতা', অর্থাৎ 'এখন তুমি পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করেছ।'

এই উম্মাহও মুহাম্মাদকে ﷺ ভালোবাসে। যে কোনো মুসলিমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসে কিনা তাহলে সে নিশ্চয়ই উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ, বাসি।'

কিন্তু কারও সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে তাকে মনের গভীর থেকে, আন্তরিকভাবে ভালোবাসা যায় না। কাউকে ভালোবাসতে হলে তার সম্পর্কে জানা চাই। আর নবীজির ﷺ ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য, কেননা তিনি এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে যত জানা হয়, ততই তাঁর ব্যক্তিত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসাও তৈরি হয়। যদিও বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমরা তাঁর সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জেনেই তাঁকে ভালোবাসে, তারপরও তাঁর সম্পর্কে ভালোভাবে না জানা পর্যন্ত তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্ম নেবে না। তাই দেখা যায় যে, সাহাবারা ﷺ রাসূলকে ﷺ যত বেশি জানতেন, তাঁরা তত বেশি তাঁর সান্নিধ্য পেতে চাইতেন এবং তাঁকে তত বেশি ভালোবাসতেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমর ইবন আল আসের ﷺ কথা। তিনি ছিলেন এক সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘোরতর শত্রু। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও দুশমনদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীতে একসময় তিনি মুসলিম হন। মৃত্যুশয্যায় তিনি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেন। পিতাকে মৃত্যুশয্যায় কাঁদতে দেখে ছেলে আবদুল্লাহ ইবন আমর ﷺ বললেন, “বাবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে (ঈমানের) সুসংবাদ দেননি?”

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন আল আস ﷺ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আমানা আমর’, অর্থাৎ আমর ইবন আল আস ঈমান অর্জন করেছে। খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন আল আসের ﷺ মু'মিন হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র একজন মুসলিমই ছিলেন না, বরং উঁচু স্তরের একজন মু'মিনও ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল যে, “আপনি একজন মু'মিন। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন সেখানে আপনি মৃত্যুর পূর্বে এভাবে কান্নাকাটি করছেন কেন?”

আমর ইবন আল আস ﷺ তাঁর ছেলের দিকে ফিরে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষায়–

আমি আমার জীবনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছি। জীবনের প্রথম ভাগে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর প্রতি আমার বিদ্বেষ এতটাই তীব্র ছিল যে, তাঁকে যেকোনোভাবে পাকড়াও করে হত্যা করার ব্যাপারে আমি ছিলাম বদ্ধপরিকর। এটাই ছিল আমার অন্তরের আকাঙ্খা, তীব্র বাসনা। যদি সে সময় আমি মারা যেতাম তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমার স্থান হতো জাহান্নামে।

কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেন। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললাম, ‘হে মুহাম্মাদ ﷺ, আমি মুসলিম হতে চাই! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার কাছে বাই'আত দিব।’

কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ যখন হাত সামনের দিকে বাড়ালেন তখন আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'
-আমার একটি শর্ত আছে।
-কী শর্ত?
-আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক, এটাই আমার শর্ত।

আমর ইবন আল আস ؓ জানতেন যে, তিনি অতীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যা যা করেছিলেন তা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাঁর অতীতের কার্যকলাপের জন্য পাকড়াও না করেন।

তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'হে আমর, তুমি কি জানো না যে, ইসলাম তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়, হিজরত তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয় এবং হাজ্জ তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়?'

আমর ইবন আস ؓ বলতে থাকেন, 'তারপর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম। তখন থেকে মুহাম্মাদের ﷺ চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তিনিই কিনা একসময় আমার ঘোরতর শত্রু ছিলেন।

তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ এতটাই তীব্র ছিল যে, আমি কখনো তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। কেউ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক সৌষ্ঠব বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করত তাহলে আমার পক্ষে তাও সম্ভব হতো না। আমি যদি সে সময় মারা যেতাম তাহলে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করতে পারতাম...'

এই হাদীসটি এখানেই শেষ নয়, এর পরে আরও কিছু অংশ রয়েছে। কিন্তু এই হাদীস থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো, যে নবীজিকে ﷺ আমর ইবন আস একসময় চরম শত্রু বলে গণ্য করতেন, সেই মুহাম্মাদকে ﷺ তিনি যখন কাছ থেকে দেখলেন, তাঁকে জানতে শুরু করলেন, তখন থেকে তিনিই হয়ে গেলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

সুলাহ আল হুদাইবিয়্যাহ অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে কুরাইশরা সুহাইল ইবন আমরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠায়। উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মাদের ﷺ সাথে দফা-রফা করা। সুহাইল ইবন আমর ছিল একজন উঁচুমানের কূটনীতিক। তাকে পারস্য, রোমান ও আবিসিনিয়ান সাম্রাজ্যের দরবারে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হতো। তিনি বেশ সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাকেই কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠিয়েছিল আপস-মীমাংসা করার জন্য।

সুহাইল ইবন আমর মদীনায় গেল। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে আবিষ্কার করল সাহাবারা ؓ

নবীজিকে ﷺ কতটা ভালোবাসেন, তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেন। কাজ শেষে সুহাইল ইবন আমর মক্কায় ফিরে আসল। কুরাইশদেরকে বলল,

'আমি রোমান সাম্রাজ্য দেখেছি, পারস্যের বাদশাহর দরবারেও গিয়েছি। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীকে দেখেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত মুহাম্মাদের ﷺ মতো এমন কোনো নেতা দেখিনি যাকে তাঁর অনুসারীরা এত বেশি ভালবাসে, এত বেশি সম্মান করে। আমি দুনিয়াতে তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি। রোমান, পারস্য ও আবিসিনিয়ার বাদশাহদের যদিও অনেক ক্ষমতা, শক্তিসামর্থ্য ও বিশাল সাম্রাজ্য আছে, কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি তাঁর অনুসারীদের যে ভালোবাসা আমি দেখেছি তা অন্য কোথাও দেখিনি।

আমি দেখেছি অসাধারণ কিছু বিষয়। যখন মুহাম্মাদ ﷺ অযু করেন, তখন সাহাবারা ﷺ তাঁর কাছে কাছেই থাকেন যেন তাঁর দেহ থেকে অযুর পানি চুইয়ে পড়া মাত্রই তা সংগ্রহ করতে পারেন। তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো, কিন্তু মনে রেখ এই মানুষগুলো তাদের নেতাকে কোনোদিনও ছেড়ে যাবে না।'

আসলেই সাহাবাগণ ﷺ কখনোই রাসূলুল্লাহকে ﷺ পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা নিজের জীবন দিয়েছেন, তাঁর জন্য তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করেছেন, কিন্তু কখনো তাঁকে ছেড়ে যাননি।

তাই সত্যিকার অর্থে নবীজিকে ﷺ ভালোবাসতে হলে অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে হবে। যদিও মানুষজন তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি জানে না, তাঁর জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করেনি, তারপরেও দুনিয়ার বুকে মানুষ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছে। তাঁর নাম হলো দুনিয়ার সবচেয়ে পরিচিত নাম। তাই দুনিয়াতে শত-শত হাজার-হাজার মানুষ পাওয়া যাবে যাদের নাম ভালোবেসে মুহাম্মাদ রাখা হয়েছে। ইতিহাসে এমন আর কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার নামে এত মানুষের নাম রাখা হয়েছে।

যদি তাঁর ব্যাপারে খুব ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও মানুষ তাঁকে ভালবাসে, তাহলে যে তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করবে তার ভালোবাসা কেমন হবে সে তো চিন্তার বাইরে! রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদের ﷺ নাম পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক উচ্চারিত নাম। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় না। প্রতিটি সেকেন্ডে, প্রতিটি মিনিটে, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অন্তত একজন মুয়াযযিনের মুখে তাঁর নাম প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে, "*আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।*"

মুহাম্মাদ শব্দের মানে হলো প্রশংসিত আর এই দুনিয়াতে মুহাম্মাদের ﷺ মতো প্রশংসিত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। তাঁর নাম যথার্থতা লাভ করেছে কারণ, তিনি সদা

প্রশংসিত এক ব্যক্তি। তাঁর নাম শুনলে মুসলিমরা তাঁর প্রশংসা করে বলে, "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" তাই তাঁকে ভালোবাসতে হলে তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করা কর্তব্য। তাঁর সম্পর্কে যত বেশি জানা যাবে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> **"বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করো এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো – যদি এগুলো তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ২৪)**

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিমদের ভালোবাসার সর্বোচ্চ হকদার হলেন আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। পিতা, পুত্র, ভাই, নিজ গোত্র, ধন-সম্পদ সবকিছুর চেয়ে এই তিনটি বিষয় অধিক প্রিয় হতে হবে। প্রতিটি মুসলিমের কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও ইসলাম সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হওয়া উচিত।

৩) সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ

ইবন হাজার বলেছেন, 'কেউ যদি আখিরাতের জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে চায়, দুনিয়াবি জীবনে প্রজ্ঞা হাসিল করতে চায়, জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে চায় এবং নিজের মাঝে প্রকৃত নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়, তবে সে যেন রাসূলুল্লাহর ﷺ পথ অনুসরণ করে।' মুহাম্মাদ ﷺ এর ছিল সর্বোশ্রেষ্ঠ আখলাক। তাঁর মাঝে যাবতীয় অসাধারণ গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে তাঁকে আরও বেশি করে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

৪) কুরআনকে অনুধাবন

কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো ওয়াহী নাযিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়, যেমন, আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ। পরিবেশ-পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন এ আয়াতগুলো সবসময় স্বতন্ত্র থাকে। আবার কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা যায় যে কিছু আয়াত কোনো ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটার সময়ে নাযিল হয়েছে কিংবা ঘটনা ঘটার পরে নাযিল হয়েছে।

সীরাহ এসব আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ দেয়। এর মাধ্যমে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে–তা সীরাহ থেকে জানা যায়। যেমন, সূরা আল আহযাবের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আল-আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। আবার সূরা আলে ইমরানে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার কিছু কথোপকথন। মূলত নাযরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথোপকথনে রাসূলুল্লাহকে ﷺ সমর্থন যোগানোর জন্যই এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়। আর আলে ইমরানের পরবর্তী অংশে গাযওয়ায়ে উহুদ অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা এই সূরাতে দেওয়া হয়নি। একমাত্র সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমেই আয়াতগুলোকে যথাযথ পরিস্থিতির নিরিখে বোঝা সম্ভব।

৫) মুহাম্মাদের ﷺ জীবন ইসলামি আন্দোলনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াতের জীবন বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রথমে তিনি গোপনে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াহ দেওয়া শুরু করেন এবং পরবর্তীতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পরিচালনা করেছেন। ইসলামি আন্দোলনে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য এই পর্যায়গুলোর মাঝে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ওয়াহী দ্বারা নির্দেশিত। নিছক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুটহাট সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ﷺ প্রতিটি পদে সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা কোনো এলোমেলো বা আকস্মিক ঘটনাবলির সমষ্টি নয়, বরং এ সকল ঘটনা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনার অংশ, যাতে দ্বীন ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসব ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব ধাপ অতিক্রম করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব পর্যায় পার করেছেন সেগুলোও খেয়াল রাখতে হবে।

সীরাহ এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সীরাহ সাহাবাদেরকে رضي الله عنهم শিখিয়েছিল কুরআনের শিক্ষা কীভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। সীরাহ তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মৌখিক নির্দেশ, আর সীরাহ হলো সেই নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন। অন্য নবীদের সীরাহ সংরক্ষিত নেই, কিন্তু মুসলিমদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি সীরাহও সংরক্ষণ করা আছে।

কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, রামাদানে কালো সুতা থেকে সাদা সুতা আলাদা না হওয়া পর্যন্ত সেহরি খাওয়া যাবে। একজন সাহাবী رضي الله عنه এই আয়াতটির

আক্ষরিক অর্থের উপর আমল করা শুরু করে দিলেন। তিনি তাঁর বালিশের নিচে একটি সাদা সুতা ও একটি কালো সুতা রাখলেন। এরপর তিনি খেলেন। তারপর আবার বালিশ সরিয়ে দেখলেন যে সুতা দুটির মাঝে পার্থক্য করা যায় কি না। যখন তিনি দেখলেন যে, সুতার রঙে কোনো পরিবর্তন আসেনি তখন আবার খাওয়া শুরু করলেন। এরকম করে অনেকক্ষণ চলতে লাগল অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন এবং বললেন যে, 'এই আয়াতের মানে এই নয় যে তুমি সুতার দিকে তাকিয়ে থাকবে, বরং সাদা সুতা বলতে এখানে দিগন্তে উত্থিত সূর্যের প্রথম আলোকে বোঝানো হচ্ছে।' অর্থাৎ আয়াতটির বাস্তব প্রয়োগ কী রকম হবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সাহাবীকে رضي الله عنه শিখিয়ে দিলেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তা নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের رضي الله عنهم জীবন থেকে জানা সম্ভব।

৬) সীরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদাত

সীরাহ বিনোদনের জন্য নয়, এটি একটি ইবাদাত। তাই সীরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। যে জমায়েতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন করা হয়, সে জমায়েত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জমায়েত, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জমায়েত। আর যে জমায়েতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হয়, ফেরেশতারা সে জমায়েত ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১)

৭) মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় গড়ে তোলা

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী একটি অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা জোর করে সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শক্তি প্রয়োগ করে হলেও এই অপসংস্কৃতি গ্রহণে বিশ্ববাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে। থমাস ফ্রাইডম্যান আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক, নিউইয়র্ক টাইমসে লেখালেখি করেন। তিনি বলেছেন, 'পুঁজিবাদী অর্থনীতির পেছনে রয়েছে একটি অদৃশ্য কালো হাত। ম্যাকডোনাল্ড বার্গারকে আপনার ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই ম্যাকডোনাল্ড ডগলাসের জঙ্গিবিমান F-15!' অন্যভাবে বলা যায় যে, এই অপসংস্কৃতি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। কারো পছন্দ-অপছন্দকে এই অপসংস্কৃতি কোনো রকম তোয়াক্কা করে না। *হয় ম্যাকডোনাল্ড বার্গার কিনে খাও, নতুবা ম্যাকডোনালড ডগলাসের জঙ্গিবিমান F-15 তোমার আকাশসীমানায় হাজির হবে।* এটি এমন একটি সংস্কৃতি যা কিনা ভিন্নমত একদমই সহ্য করতে পারে না। এটি দুনিয়ার বুক থেকে অন্য সব মতাদর্শকে উপড়ে ফেলতে চায়। আলেকজান্ডার সলযেনিতসিন নামক একজন বিখ্যাত রাশিয়ান ইতিহাস-

রচয়িতা বলেছেন, 'একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে অবশ্যই তার শেকড় কেটে দিতে হবে।' কাজেই, বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে যে ভোগবাদী সংস্কৃতি ছড়িয়ে ও চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি অশনি সংকেত, কেননা এটি সকল সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে দুনিয়ার বুক থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চায়।

ইসলাম ব্যতীত অন্য সব মতাদর্শ আজ এই বৈশ্বিক সংস্কৃতির সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা যা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুনিয়ার সকল আদর্শকে মোকাবিলা করতে সক্ষম। দুনিয়ার সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য থাকলেও কিছু মুসলিম আজ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কিছুটা সন্দিহান। চারপাশে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলার চেষ্টা করেন এমন অনেক মুসলিম রয়েছেন, কিন্তু মুসলিম হিসেবে যে একটি স্বকীয়তা বা নিজস্ব পরিচয় রয়েছে তা অধিকাংশের মাঝে অনুপস্থিত। রকস্টার বা ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে একজন গড়পড়তা মুসলিমের যতটা সাদৃশ্য দেখা যায় ততটা একজন সাহাবীর ﷺ সাথে দেখা যায় না। এই যুগের যুবকেরা সাহাবীদের ﷺ সম্পর্কে যতটা না জানে তার চেয়েও অনেক বেশি জানে খেলোয়াড়দের সম্পর্কে। এমনকি তারা নবী-রাসূলদের সম্পর্কেও তেমন কিছু জানে না। আজকের দিনের অল্প ক'জন যুবকই আল্লাহ তাআলার সব নবী-রাসূলদের নাম বলতে পারবে, বা সাহাবীদের ﷺ নাম মনে রাখতে পারবে। কিন্তু সেই একই ব্যক্তিকে তার প্রিয় ফুটবল টিমের অথবা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নাম জিজ্ঞেস করা হলে দেখা যাবে সে হড়বড় করে অনেক কথা বলে ফেলছে। মুসলিমদের মাঝে আত্মপরিচয়ের যে সংকট দেখা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এই পরিচয়সংকট দূর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি তা হলো:

- ইসলামি ইতিহাসের উপর ভালো দখল থাকতে হবে। তাদের সিলেবাসে যেসব বিষয় থাকা খুব জরুরি সেগুলো হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ, নবীদের জীবনী, সাহাবীদের ﷺ জীবনকাহিনি এবং সবশেষে মুসলিমদের সামগ্রিক ইতিহাস। সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ হলো ইসলামের ইতিহাস জানার মাধ্যমে নিজেদের একটি পরিচয় গড়ে তোলা, কারণ এই ইতিহাস মুসলিমদের নাড়ির ইতিহাস, মুসলিমদের অস্তিত্ব।

- সমগ্র মুসলিম জাতি এক উম্মাহ। নিজেকে পুরো মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য মনে করতে হবে। জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলিমদের একেকজনের যে পরিচয় রয়েছে তা যেন মুসলিম পরিচয়ের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। মুসলিমদের মধ্যে কেউ আছে কুয়েতি, আমেরিকান, ব্রিটিশ বা পাকিস্তানী, তবে এই জাতীয়তাবাদী পরিচয় যেন মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে যায়। ইসলাম কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা দূর করার জন্যই এসেছে। মুসলিমদের আনুগত্য হলো আল্লাহ তাআলা ও দ্বীন ইসলামের প্রতি । তাই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম ভাইবোনদের খোঁজখবর রাখতে হবে। ফিলিস্তিনে কী-হচ্ছে, না-হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রতিটি ব্রিটিশ মুসলিমের উদ্বিগ্ন থাকা উচিৎ। প্রতিটি আমেরিকান মুসলিমের

উচিৎ কাশ্মীরের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখা। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণে কী ঘটছে সে ব্যাপারে মুসলিমদের এমনভাবে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ যেন তা নিজের বাড়িতেই ঘটছে। নিজেদের আত্মপরিচয় গড়ে তোলার ব্যাপারে এগুলো খুবই জরুরি উপাদান।

আলেকজান্ডার সলযেনিতসিন বলেছেন, 'একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রথমেই সেই জাতিকে তাদের শেকড় কেটে দিতে হবে, তাদেরকে তাদের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে।' ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে শেকড়কে চেনার প্রথম পদক্ষেপ তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্পর্কে জানা।

- মুহাম্মাদের ﷺ রিসালাতের প্রমাণ হলো তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা। রাসূলুল্লাহর ﷺ সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো কুরআন। এছাড়া রাসূলুল্লাহর ﷺ রিসালাতের প্রমাণ হিসেবে আরও অনেক মু'জিযা ছিল। তবে তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহই রিসালাতের অন্যতম প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অতি সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। এ সময়ে তাঁর ব্যবহার, কথাবার্তা, চলাফেরা ও চরিত্র ছিল সত্যিই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু তিনি কোনোদিন ক্ষমতা বা আধিপত্য লাভের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পরিবর্তনের সূচনা করেছেন তা এক অভূতপূর্ব বিষয়, অবিশ্বাস্য বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন নিরক্ষর। যে মানুষটি লিখতে-পড়তে জানতেন না তিনি কিনা এমন একটি কিতাবের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন যার মতো দ্বিতীয় আর কোনো কিতাব রচনা করা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। এমন নজির রয়েছে ভুরি ভুরি। রাসূলের ﷺ জীবনে এমন অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা আছে যেগুলোর একটি মাত্র ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য, আর তা হলো–তিনি আল্লাহর নবী, আল্লাহ তাআলাই এই মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাগুলো ঘটিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা অর্জন করেছিলেন তা আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কোনোমতেই অর্জন করা সম্ভব হতো না। সুতরাং সীরাহ এটাও প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার মনোনীত রাসূল।

যে মুহাম্মাদ ﷺ জীবনের প্রথম চল্লিশটা বছর একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করেছিলেন, সেই মুহাম্মাদ-ই ﷺ পরবর্তীতে একজন রাজনৈতিক নেতা, সামরিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, বিশাল সংসারের প্রধান, আইন-প্রণেতা[1], শিক্ষক, ইমাম এবং আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন আর এসব ঘটেছিল তাঁর জীবনের শেষ তেইশ বছরে, নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য!

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, দুনিয়ার সর্বকালের সেরা মানুষ হলেন

---

[1] আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ এর মাধ্যমে শরীয়ার যত বিধান এসেছে তা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।

মুহাম্মাদ ﷺ এবং সেই মানুষটির সীরাহ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সীরাহ। তাঁর মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য যা-ই বলা হোক না কেন তা আসলে কম বলা হবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়ার যাবতীয় মাইলফলককে ছাপিয়ে যায়। দুনিয়াতে এ যাবতকাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তিকে নিয়ে বিখ্যাত আমেরিকান লেখক মাইকেল এইচ হার্ট একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হলো *The 100 Most influential People*। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে প্রভাবশালী নেতাদের জীবনী অধ্যয়ন করেছিলেন। একজন অমুসলিম হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সন্দেহাতীতভাবে মুহাম্মাদ ﷺ হলেন এ যাবতকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। এই বইটি মূলত অমুসলিমদের জন্য লেখা হয়েছিল। অনেকে তার এই বাছাই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এই ভেবে তিনি সূচনাতে লিখেছিলেন,

'আমার তৈরি করা পৃথিবীর এ যাবতকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকার এক নম্বরে মুহাম্মাদকে দেখে অনেক পাঠক অবাক হতে পারে। আমার মনোনয়ন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে পুরো ইতিহাসে একমাত্র তিনিই হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আধ্যাত্মিক এবং দুনিয়াবী–উভয় জায়গাতেই সর্বোচ্চ সফলতার ছাপ রেখেছেন।' এরপর তিনি আরও বলেছেন, 'দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিক উভয় পর্যায়ে মুহাম্মাদের ﷺ অসাধারণ প্রভাব দেখে আমি তাঁকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে বাছাই করেছি।'

মাইকেল হার্ট সত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর তিনি তার পাঠকদের কাছে এই বলে ক্ষমা চেয়েছিলেন যে, 'আমার কিছুই করার ছিল না', অর্থাৎ তালিকায় মুহাম্মাদের ﷺ উপরে রাখার মতো আর কাউকে তিনি পাননি। যদি তাঁকে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের যেকোনো একটি দিক দিয়ে বিচার করা হয়, যেমন, সামরিক বাহিনীর নেতা হিসেবে, তবে দেখা যায় যে, তিনি সামরিক নেতা হিসেবে সবার চেয়ে সেরা ছিলেন। আবার ধর্মীয় নেতা হিসেবেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। কাজেই যে দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, যতভাবে তাঁর জীবন ব্যবচ্ছেদ করা হোক না কেন, তাঁর জীবনের যেকোনো একটি দিকই তাঁর সেরা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে মনে রাখা জরুরি যে, সীরাহ হচ্ছে আল-মুস্তাফার জীবনী। মুস্তাফা মানে হলো যাকে বাছাই করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সবার মধ্য থেকে বাছাই করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল মুস্তাফা আল খালকি। তিনি আল্লাহ তাআলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে নির্বাচিত।

সীরাহশাস্ত্র ও হাদীসশাস্ত্রের পার্থক্য

সীরাহ ও হাদীসশাস্ত্র জ্ঞানের দুটি ভিন্ন শাখা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দুটি শাখার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু এই দুইটি শাখার নিয়মরীতি একে অপর থেকে অনেকাংশে আলাদা।

হাদীসের আলিমগণ নিয়মনীতির ব্যাপারে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করেন। কিন্তু সীরাহর আলিমগণ এ ব্যাপারে বেশ ছাড় দেন। এর কারণ হলো, হাদীসের সত্যতা বা ইসনাদ যাচাই করার পর তা থেকে হুকুম-আহকাম প্রতিপাদন করতে হয়, তাই মুহাদ্দিসগণ সর্বদা হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন যেন হাদীসগুলোর ইসনাদ ঠিক থাকে। দুর্বল ইসনাদের হাদীসের উপর ভিত্তি করে যেন কাউকে ইবাদাত করতে না হয় তা চিন্তা করেই আলিমগণ হাদীসের নিয়মনীতির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি আরোপ করেন।

কিন্তু সীরাহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। সীরাহকে ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে দেখা হয়, তাই হুকুম-আহকামের উপর এর কোনো প্রভাব থাকে না। যেহেতু সীরাহর উপর ভিত্তি করে কোনো হুকুম-আহকাম নির্ধারণ করা হয় না তাই এর নিয়মকানুনের ব্যাপারে সীরাহর রচয়িতাগণ এতটা কড়াকড়ি করেন না। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, যিনি হাদীসশাস্ত্রের একজন আলিম ছিলেন, তিনি বলেছেন, 'যখন আমরা ইতিহাস নিয়ে কথা বলি তখন বেশ ছাড় দিই।' তাই দেখা যায় যে, সীরাহর রচয়িতাগণ এমন অনেক বর্ণনা সীরাহর অন্তর্ভুক্ত করেন, যেগুলো তাঁরা হাদীস হিসেবে হয়তো গ্রহণ নাও করতে পারেন। সুতরাং সীরাহ ও হাদীসের ক্ষেত্রে এটাই ছিল পূর্ববর্তী আলিমগণের গৃহীত পন্থা।

সীরাত ইবন ইসহাক, সীরাতে ইবন সাদ সহ পূর্ববর্তী আলিমদের সীরাহ গ্রন্থগুলো এসব নিয়মকানুনের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু আলিম সীরাহ রচনার ক্ষেত্রে নতুন একটি ধারা সংযোজন করেছেন। তারা সীরাহর ক্ষেত্রেও হাদীসের নিয়ম প্রয়োগ করতে চান। এর পেছনে তারা যুক্তি দেখিয়েছেন, 'আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো আমাদের জন্য আহকামের অন্যতম একটি উৎস। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের সময় খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই কোনো হুকুম-আহকাম ধার্য করার জন্য তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনী অধ্যয়ন করতেন না, বরং তারা সীরাহ থেকে সাধারণ শিক্ষা লাভ করতেন, বিশেষ কোনো হুকুম বা মাসআলা নয়, কারণ দ্বীন ইসলাম তখন প্রতিষ্ঠিত অবস্থাতেই ছিল।'

কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্যাপারটি ভিন্ন। কীভাবে দাওয়াহ করতে হবে, ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কী কী পর্যায় অতিক্রম করতে হবে প্রভৃতি বিষয়াদি জানার জন্য অবশ্যই সীরাহ অধ্যয়ন করতে হবে। তাই সীরাহ একটি ফিকহশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এ কারণে তারা বলেন যে হাদীসের নিয়মকানুনগুলো সীরাহর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, সহীহ সীরাহ আন নাব্যুওউয়াহ নামক বইটিতে হাদীসের নিয়মকানুন প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ, যেমন, বুখারি, মুসলিম, সুনান আবু দাউদ প্রভৃতিতে সীরাহ সম্পর্কিত যে হাদীসগুলো আছে সেগুলো একত্রিত

করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ রচনা করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলিমদের রচিত সীরাহ, যেমন, সীরাতে ইবন ইসহাক বা সীরাতে ইবন হিশাম ইত্যাদি থেকে সাহায্য নেওয়ার বদলে তারা বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থসমূহের সাহায্য নিয়েছেন। সাঈদ হাওয়া হাদীসের উপর ভিত্তি করে আল-আসাস ফীস সুন্নাহ নামক একটি বই লিখেছেন। এরকম আরও কিছু বই রয়েছে যেগুলো এই রীতি অনুসরণ করেছে।

এদিক দিয়ে ইবন কাসির অন্যান্য সীরাহ গ্রন্থ থেকে বেশ আলাদা, কারণ ইবন কাসির পূর্ববর্তী আলিমদের রচিত সীরাহর বই থেকে যেমন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ঠিক তেমনি হাদীসগ্রন্থগুলো থেকেও সাহায্য নিয়েছেন। তাই তাঁর বইয়ে যেমন বুখারি থেকে বর্ণিত হাদীস দেখা যায় তেমনি ইবন ইসহাক থেকে বর্ণিত বর্ণনাও দেখা যায়।

প্রাক কথন: নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব

সীরাহ লেখকগণ সাধারণত নবীজির ﷺ জন্মের সময়কাল থেকে সীরাহ শুরু করেন না, বরং এই মিল্লাতের পিতা ইবরাহীমের ﷺ ঘটনা দিয়ে শুরু করেন। আর শুরুতেই থাকে ইবরাহীম ﷺ কর্তৃক স্ত্রী হাজেরা ﷺ ও পুত্র ইসমা'ঈলকে ﷺ মক্কায় রেখে আসার কাহিনি। এই বইতেও সেই রীতি অনুসরণ করা হবে।

ইবরাহীমের ﷺ কাহিনি

যমযম কূপের উদ্ভব

ইবরাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী হাজেরা ﷺ ও সদ্যজাত পুত্র ইসমা'ঈলকে নিয়ে হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তাদেরকে যে জায়গাটিতে নিয়ে যান সে জায়গাটিই এখন মক্কা নামে পরিচিত। ওই সময় মক্কা ছিল জনমানবশূন্য। তবে যে স্থানে কাবা নির্মাণ করা হয়েছিল তা সৃষ্টির শুরু থেকেই পবিত্র ছিল। ইবরাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে অল্প কিছু পানি ও এক থলে খেজুরসহ সেই নিরিবিলি জায়গায় রেখে আসেন। তারপর কিছু না বলেই সেখান থেকে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেন।

হাজেরা ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বামী তাদেরকে রেখে যাবেন, কিন্তু তিনি এটা আশা করেননি যে এরকম জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে তিনি তাদেরকে এভাবে ফেলে চলে যাবেন। তিনি স্বামীর পিছে পিছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'ইবরাহীম, আপনি কি আমাদেরকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোনো জনবসতি, না কোনো ফল-ফসল!'

ইবরাহীম ﷺ চুপ করে রইলেন।

তাঁর স্ত্রী আবারও একই প্রশ্ন করলেন, ইবরাহীম ﷺ কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলো। তখনও তিনি নিশ্চুপ।

হাজেরা ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?'

এবার উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

হাজেরা ﷺ বললেন, 'তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তাআলাই আমাদের দেখাশোনা করবেন। তিনি আমাদের কখনোই অবহেলা করবেন না।'

হাজেরা ﷺ জানতেন, যদি আল্লাহ তাআলার আদেশে ইবরাহীম ﷺ তাদেরকে এমন জনমানবহীন অঞ্চলেও রেখে যান, তবুও দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কেননা আল্লাহ তাআলাই

এই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর এই বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ তাআলাই তাঁকে দেখে রাখবেন। যদি সে আদেশ হয় এরকম নিরিবিলি স্থানে একাকী বসবাস করা, তবে সেখানেও আল্লাহর হেফাজতের চাদর তাদের ঘিরে রাখবে।

ইবরাহীম ﷺ চলে গেলেন। তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে একটি দুআ করেন। এই চমৎকার দুআটি আছে কুরআনের সূরা ইবরাহীমে,

> **“হে আমাদের রব, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে অনুর্বর উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৭)**

Maslow's hierarchy of needs নামে একটি তত্ত্ব আছে যেখানে মানুষের বিভিন্ন চাহিদাকে একটি পিরামিড আকারে দেখানো হয়েছে। এই পিরামিডের সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মানুষের শারীরবৃত্তীয় চাহিদা। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুসারে শারীরিক চাহিদা (যেমন খাদ্যগ্রহণ) মানব জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। গুরুত্বের দিক থেকে এর পরে আছে যথাক্রমে সামাজিক চাহিদা (সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা), আধ্যাত্মিক চাহিদা (ধর্মচর্চা) এবং পিরামিডের চূড়ায় আছে আত্মোপলব্ধি; নিজের সম্ভাবনা ও প্রতিভাকে আবিষ্কার করে তা বিকশিত করতে ধাবিত হওয়া (*self-actualization*)। মাসলোর এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলতে হয়, একজন মানুষ প্রথমে তার শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণ করতে সচেষ্ট হবে, তারপর দলবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করবে, এরপর ধর্মের খোঁজ করবে এবং অবশেষে সে নিজস্ব স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতার সন্ধান করতে শুরু করবে।

কিন্তু ইবরাহিমের ﷺ দুআতে তত্ত্বের এই পিরামিডটিকে সম্পূর্ণ উল্টো রূপে দেখা যায়। তিনি তাঁর পরিবারের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রথমেই যা চেয়েছেন তা হলো–লি ইউকীমুস স্বলাহ–যেন তারা সালাত কায়েম করে। অর্থাৎ তিনি প্রথমে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের প্রতি। এরপর তিনি দুআ করেছেন, ফাজ'আল আফ-ইদাতাম মিনান নাস–আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। এখানে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য মানুষের অন্তরে ভালোবাসা গড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অনুরোধ করেছেন। এটি হলো তাঁর পরিবারের জন্য সামাজিক চাহিদা। সবশেষে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে যা চাইলেন তা হলো রিযক্ব অর্থাৎ তাদের শারীরবৃত্তীয় চাহিদাপূরণ–ওয়ারযুক্বহুম মিনাস সামারাত–তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুজি দান করুন। তবে এখানে এটাও লক্ষণীয়, ইবরাহীম ﷺ তাঁর দুআর শেষ অংশে শুধুমাত্র রুজির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেননি বরং এর সাথে ইবাদাতের ব্যাপারটিও যুক্ত করে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, লা আল্লাহুম ইয়াশকুরুন–যেন, তারা শুকরিয়া আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইবরাহীম ﷺ চলে গেলেন। মা হাজেরার ﷺ কাছে অল্প যে খাবার ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আর ইসমা'ঈল ﷺ তখনো ছিলেন দুধের শিশু। হাজেরা তাঁর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন কিন্তু সেই দুধও একসময় শুকিয়ে গেল। ইসমা'ঈল প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাঁদছে। সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে মা খাদ্যের খোঁজে বের হলেন। একটি পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, এ পাহাড়ই পরে আস-সাফা নামে পরিচিত হয়েছিল। সেই পাহাড়ের উপর উঠে একবার ডানে তাকান, আবার বাঁয়ে তাকান, কিন্তু তিনি কাছাকাছি কোনো মানববসতির সন্ধান পেলেন না। এরপর পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় ফিরে এলেন, কাপড় গুটিয়ে এবার উঠতে লাগলেন আরেকটি পাহাড়ে, পরবর্তীতে যা আল-মারওয়া নামে পরিচিত হয়। এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠেও ডানে-বায়ে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেলেন না।

একদিকে পুত্র ইসমা'ঈল প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, অন্যদিকে মা হাজেরা ﷺ কিছু পাওয়ার আশায় আস-সাফা ও আল-মারওয়া পাহাড় দুটির মাঝে ছোটাছুটি করছেন। এভাবে ইতিমধ্যে সাতবার দুই পাহাড়ে ওঠানামা করে ফেলেছেন। সপ্তম বার তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজটি কোথা থেকে এসেছে তা বোঝার জন্য আশেপাশে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, শিশু ইসমা'ঈলের ﷺ পায়ের কাছ থেকে আওয়াজটি আসছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিবরীল ﷺ সেখানে যমযম কূপ খনন করে দিয়েছেন আর হাজেরা এই কূপের আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড খুশিতে তিনি পানির উৎসের দিকে দৌড়ে গেলেন। মরুভূমিটি শুষ্ক ছিল, তাই পানি শুকিয়ে যেতে পারে চিন্তা করে হাজেরা পানি ধরে রাখার জন্য কুয়ার মতো একটি জায়গা তৈরি করলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'ইসমা'ঈলের ﷺ মায়ের উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন। তিনি যদি এভাবেই তা ফেলে রাখতেন তাহলে সেখানে নদী প্রবাহিত হয়ে যেত', অর্থাৎ তিনি কুয়া বানিয়ে পানি ধরে না রাখতেন তাহলে তা থেকে একটি নদী প্রবাহিত হতো।

চোখের সামনে ক্ষুধায় কাতর পুত্রের কষ্ট ও কান্না দেখে নিশ্চয়ই হাজেরা ﷺ অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁর বুক ভেঙে গিয়েছিল, হয়তোবা তিনি কাঁদছিলেনও। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন মু'মিনাহ ও মুত্তাকী বান্দী। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে পরীক্ষা করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এক মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু হাজেরা তা জানতেন না। তাই তিনি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কষ্টের মাঝে ছিলেন। হাজেরার এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'আর এ কারণেই আমরা (হাজ্জের সময়) সাফা-মারওয়ায় ওঠানামা করি।' অর্থাৎ আজ পর্যন্ত আমরা হাজেরার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি। হাজেরা যদি জানতে পারতেন যে এমন এক সময় আসবে যখন সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাহলে তিনি মুখে এক চিলতে হাসি নিয়েই সাফা-মারওয়ায় ওঠানামা করতেন।

এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষ

কিছু পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে পরীক্ষা নেন, কিন্তু আমরা জানি না আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কী ঠিক করে রেখেছেন। কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হাজেরাও এক সময় কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন আর সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসের কারণে তাঁকে দেওয়া হয়েছে এক অসাধারণ প্রতিদান।

মক্কায় জনবসতি স্থাপন

যমযম কূপ সৃষ্টি হলো, মরুভূমিতে পানির অভাব দূর হলো, আর স্বাভাবিকভাবেই শুরু হলো প্রাণের সমাগম। পাখিরা কূপের চারপাশে উড়তে লাগল। সেখানে তখন জুরহুম নামে একটি যাযাবর গোত্র ছিল। এদের আদি নিবাস ছিল ইয়েমেন, কিন্তু তারা ইয়েমেন ত্যাগ করে এখানে চলে আসে। ইয়েমেনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে ব্যাপকহারে লোকজন এ স্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এ রকম একটি ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন ইয়েমেনে সাবা জাতির বসবাস ছিল, তারাই প্রথমবারের মতো সেখানে একটি বাঁধ তৈরি করেছিল। যে মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে সে মরুভূমিতেই বাঁধ দেওয়ার কারণে সারাবছর পানি সরবরাহ তৈরি হলো। পানির এই সহজলভ্যতা আরবের মাঝে এক বিশাল জাতির জন্ম দিল। কুরআনে বর্ণিত আছে, তাদের ব্যাপক সম্পদ আর চাষাবাদের কারণে তাদের ভ্রমণ করতে কোনো কষ্টই হতো না। কেননা, তারা বিভিন্ন জায়গাজুড়ে অনেকগুলো উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তাই তাদের থাকা-খাওয়ার জায়গার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু এ জাতির লোকেরা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের বাঁধ ধ্বংস করে দেন, এর ফলে পুরো এলাকা পানিতে ভেসে যায় এবং লোকজন ইয়েমেন ত্যাগ করে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা যেমন আন-নাজদ, আল-হিজায, ইরাক, আশ-শাম, মদীনা ইত্যাদি এলাকাসমূহে ছড়িয়ে পড়ে।

জুরহুম গোত্র অবশেষে হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করে। তবে তারা সেই প্লাবনের আগে এসেছিল নাকি পরে এসেছিল–সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। মক্কা ও এর আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে জুরহুম গোত্রের ভালো ধারণা ছিল। তারা ভালো করেই জানতো যে, ওই এলাকায় পানির কোনো উৎস নেই। তাই ওই এলাকার আকাশে ব্যাপক হারে পাখিদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। সেখানে কী ঘটছে দেখার জন্য দুইজন লোক পাঠাল। তারা ফিরে এসে জানাল যে সেখানে একটি কূপ রয়েছে। এরপর জুরহুম গোত্রের লোকেরা যমযম কূপের কাছে চলে গেল। মা হাজেরার দিকে ছুঁড়ে দিল একটি অদ্ভুত প্রশ্ন। আর তিনিও তাদের অদ্ভুত প্রশ্নের জবাবে অদ্ভুত একটি উত্তরই দিয়েছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমরা কি এখানে বসতি স্থাপন করতে পারি?'

জুরহুম ছিল যোদ্ধাদের গোত্র আর তারা কিনা বসতি স্থাপনের জন্য এক মহিলার অনুমতির তোয়াক্কা করছে! বিবি হাজেরা ছিলেন এমন একজন মহিলা যার সাথে ওই

সময় একমাত্র শিশু সন্তান ইসমাঈল ছাড়া আর কোনো পুরুষ ব্যক্তি ছিল না। তারা চাইলেই হাজেরাকে সেখান থেকে এক ধাক্কায় বের করে দিতে পারত। কিন্তু তারা বেশ ভদ্রতা করে তাঁর কাছে অনুমতি চাইল। হাজেরা ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে তোমরা থাকতে পারো, তবে আমার একটি শর্ত আছে আর তা হলো এই কূপ আমার অধীনে থাকবে।' মজার ব্যাপার, তিনি ছিলেন একাকী এক মহিলা, যার তাদের সাথে পেরে ওঠার কোনো ক্ষমতাই নেই, তিনিই কিনা তাদের সাথে দর কষাকষি করছেন আর শর্তারোপ করছেন, যেখানে কিনা তারা চাইলেই তাঁকে সেখান থেকে হটিয়ে দিতে পারত! যাই হোক, জুরহুম গোত্রও তাঁর এ শর্তে রাজি হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'হাজেরা মনে মনে চাইছিলেন এই গোত্র এখানে বসতি স্থাপন করুক।' তিনি চাচ্ছিলেন এখানে একটা জনবসতি গড়ে উঠুক, কিন্তু এটাও চাচ্ছিলেন যেন বিষয়টা যথাযথভাবে হয়। অবশেষে জুরহুম গোত্র যমযম কূপের নিকটস্থ এলাকায় বসতি স্থাপন করে আর এ এলাকাটি পরবর্তীতে মক্কা নামে পরিচয় লাভ করে। ইসমাঈল ﷺ তাদের মাঝেই বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। জুরহুম গোত্রের ভাষা ছিল আরবি, ইসমাঈল ﷺ সেটাও রপ্ত করে ফেললেন। তাঁর পিতা ইবরাহীম ﷺ ছিলেন ইরাকের অধিবাসী আর সে সময় ইরাকে অন্য ভাষা চালু ছিল। ইসমাঈল ﷺ জুরহুম গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন, আর এখান থেকেই শুরু হয় রাসূলুল্লাহর ﷺ বংশধারা।[2] সে সময় মক্কার রাজনৈতিক নেতৃত্ব জুরহুম গোত্রের হাতে ছিল। পরবর্তীতে ইবরাহীম ﷺ মক্কায় এসে পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেন। মক্কার ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিল ইসমাঈলের ﷺ হাতে, আর তা যুগ যুগ ধরে তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝে বহাল ছিল। জুরহুম গোত্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলেও ধর্মীয় কর্তৃত্ব কখনোই তারা লাভ করেনি।

মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস

কুরাইশ বংশের উৎপত্তি

জুরহুম গোত্র দীর্ঘ দিন ধরে মক্কায় ছিল। ধীরে ধীরে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের স্থলে বনু খুযা'আ গোত্রকে পাঠান। বনু খুযাআ জুরহুম গোত্রকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। বনু খুযাআ ছিল একটি ইয়েমেনি গোত্র এবং অন্যান্য গোত্রসমূহের মতো এটিও ইয়েমেন ত্যাগ করেছিল। অবশেষে তারা হিজাযে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এদিকে জুরহুম মক্কা ছেড়ে যাওয়ার আগে দুটো কাজ করলো, প্রথমত, তারা যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে এর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিল। দ্বিতীয়ত, আল-কাবার ভেতরে যে মূল্যবান সম্পদগুলো ছিল সেগুলো তারা সাথে করে নিয়ে গেল।

---

[2] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩।

জুরহুম গোত্র চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মক্কার শাসন ক্ষমতা চলে গেল বনু খুযাআর হাতে। যদিও সে সময় ইসমাঈলের ﷺ বংশধররা সংখ্যায় অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং অনেক গোত্রে বিভক্ত হয়ে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় একটিমাত্র শাখা গোত্র রয়ে যায় আর এই শাখা গোত্রটির নাম হলো কুরাইশ। অর্থাৎ ইসমাঈল ﷺ থেকে উদ্ভূত গোত্রগুলোর একটি হলো কুরাইশ। তবে মক্কার কর্তৃত্ব তখনো কুরাইশদের হাতে নয়, বরং বনু খুযাআর হাতেই ছিল।

বনু খুযাআর অন্যতম নেতা ছিল আমর ইবন লুহাই আল খুযাই। আরবের ধর্মীয় পটভূমির আলোচনায় তাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে কুরাইশদের নেতা ছিল কুসাই ইবন কালব–সে সকল কুরাইশকে ঐক্যবদ্ধ করে বনু খুযাআর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে মক্কা থেকে বের করে দেয়। প্রথমবারের মতো মক্কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয়–উভয় নেতৃত্ব কুসাই তথা কুরাইশদের হস্তগত হয়। কুসাইর হাতে তখন কাবা ঘরের অভিভাবকত্ব চলে আসে। সে একই সাথে কাবা ঘরের সিকায়াহ ও নিফাদা এর ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল হয়। সিকায়াহ ও নিফাদা হলো কাবায় আগত হাজীদের খাবার ও পানি পান করানোর দায়িত্ব।

এই কাজগুলো সাধারণভাবে খুব আহামরি মনে না হলেও আরবে আল্লাহ তাআলার অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানজনক একটি ব্যাপার ছিল। এই দায়িত্ব লাভের মাধ্যমে হাজ্জ করতে আগত হাজীদের মেহমানদারির দায়িত্ব বর্তায় কুরাইশদের উপর। তৎকালীন কুরাইশদের রাজনৈতিক পরিষদ আন-নাদওয়ার কর্তৃত্বও কুসাই ইবন কালবের হাতে ছিল। আন-নাদওয়া ছিল অনেকটা বর্তমান যুগের সংসদের মতো। তার হাতে আরও ছিল আল-লিওয়ার নিয়ন্ত্রণ। আল-লিওয়া ছিল যুদ্ধের ব্যানার, অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা দেওয়ার সকল ক্ষমতাও ছিল কুসাইয়ের হাতে। এক কথায় বলা যায় যে কুসাই ইবন কালব ছিল তৎকালীন মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি।

কুসাই ইবন কালবের মৃত্যুর পর এসব ক্ষমতা তার সন্তানরা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়। কুসাইয়ের নাতি আমর পৈত্রিক সূত্রে হাজীদের খাবার ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করার দায়িত্ব লাভ করেন। সচরাচর শুধুমাত্র স্যুপ দিয়ে হাজীদের আপ্যায়ন করা হতো। কিন্তু আমর এ খাবারে কিছুটা নতুনত্ব আনেন। তিনি রুটি ছিঁড়ে স্যুপের মধ্যে ভেজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে খাবারটির স্বাদ আরও বেড়ে গিয়েছিল। কোনো কিছু ভেঙ্গে গুঁড়ো করার পদ্ধতিকে আরবিতে 'হাশম' বলা হয়। এই হাশম থেকেই তখন আমরকে হাশিম নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রপিতামহ। হাশিম বিয়ে করেছিলেন মদীনার এক মহিলাকে। এরপর তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। গাযাতে তাকে দাফন করা হয়। এর মধ্যে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল 'শায়বা'। শায়বা মানে হলো বৃদ্ধ লোক। ছোটো শিশুর এরূপ অদ্ভুত নামকরণের কারণ হলো জন্ম থেকেই তার মাথার কিছু চুল ধূসর ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর শায়বার মা ইয়াসরিবে পিতামাতার কাছেই থেকে গিয়েছিলেন। তাই

শায়বার ছোটবেলা কেটেছিল ইয়াসরিবে তার নানাবাড়িতে। আর এই ইয়াসরিবে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ হিজরত করলেন তখন সেই ইয়াসিরবের নাম বদলে হয়ে গেলো মদীনা।

আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্ব লাভ

একদিন আল-মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তি মদীনায় আসলেন। তিনি ছিলেন হাশিমের ভাই। ভাতিজা শায়বাকে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মদীনায় এসেছিলেন। তখন শায়বার বয়স ছিল প্রায় আট বছর। প্রথমে তার মা ছেলেকে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু আল-মুত্তালিব তাকে বোঝালেন যে, সে কুরাইশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্যতম উত্তরাধিকারী এবং তার উচিত তার নিজ বংশ ও পরিবারের নিকটে ফিরে যাওয়া এবং সেখানে দায়িত্বসমূহ বুঝে নেওয়া–একথা শুনে শায়বার মা রাজি হন।

এরপর আল-মুত্তালিব শায়বাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে যান। শায়বাকে এর আগে মক্কার কেউ দেখেনি। তখনকার দিনে দাস কেনাবেচা খুব সাধারণ একটি ব্যাপার ছিল। তাই লোকজন আল-মুত্তালিবের সাথে এই অচেনা ছোট ছেলেটিকে দেখে ভেবেছিল যে সে বোধহয় আল-মুত্তালিবের দাস। তাই তারা শায়বাকে আবদুল মুত্তালিব বলে ডাকতে থাকে আর এই আবদুল মুত্তালিবই হলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দাদা। তার আসল নাম ছিল শায়বা, কিন্তু লোকেরা মুত্তালিবের দাস ভেবে তাকে আবদুল মুত্তালিব নামে ডাকতে শুরু করেছিল।

আবদুল মুত্তালিবের বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। বনু জুরহুম গোত্র মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে এর সব চিহ্ন মুছে দিয়েছিল, এ ঘটনার পর প্রায় তিনশ বছর পর্যন্ত যমযম কূপের অবস্থান মক্কাবাসীদের কাছে অজানা ছিল। একদিন আবদুল মুত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নে কেউ তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল, 'খোঁড়। তায়্যিবা', তায়্যিবা মানে হলো পবিত্র। আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নের মধ্যেই সাড়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'তায়্যিবা কী?' কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। সেদিনের মতো স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। পরের দিন রাতেও তিনি একই রকম স্বপ্ন দেখেন, সেই একই আওয়াজ তাকে বলতে থাকে, 'গর্ত করো, সেই মহার্ঘ।' আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'কী সেই মহার্ঘ?' সে রাতেও তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। তৃতীয় রাতে সেই একই আওয়াজ তাকে বলল, 'যমযম খনন করো।' আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'যমযম কী?' এবার তিনি উত্তর পেলেন। সেই কণ্ঠস্বরটি এবার বলল, 'যমযম একটি কূপ যা কখনো বন্ধ হবে না বা শুকিয়ে যাবে না। এখান থেকে হাজীরা পানি পান করবে। এই কূপ রয়েছে গোবর আর রক্তের মাঝে, এর কাছেই রয়েছে সাদা পা-বিশিষ্ট কাক এবং পিঁপড়ার আবাস।'

এই দুর্বোধ্য সাংকেতিক কথাবার্তার কিছুই আবদুল মুত্তালিব বুঝতে পারলেন না। পরের দিন সকালে তিনি যখন কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন তখন কাছেই সেখানে তিনি গোবর ও রক্ত দেখতে পান। সেগুলো ছিল একটি জবাইকৃত উটের রক্ত আর

গোবর। এরপর তিনি সেই একই জায়গায় সাদা পা-বিশিষ্ট একটি কাক এবং একটি পিঁপড়ার বাসা দেখতে পেলেন। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই স্থানের কথাই তাকে স্বপ্নে জানানো হয়েছে, এখানেই তাঁর পূর্বপুরুষের যমযম কূপ রয়েছে। এরপর তিনি পুত্র হারিসকে সঙ্গে নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করে দিলেন।

যমযম কূপ আল-কাবা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পিতাপুত্রের এই খোঁড়াখুঁড়ি দেখে লোকজন জড়ো হয়ে যায় এবং তারা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কী করছ? আল-কাবার পাশে এভাবে খোঁড়াখুঁড়ি করছ কেন?' তারা তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর পুত্র হারিস খনন কাজ বন্ধ না করে চালিয়ে যেতে লাগলেন। একদিকে পিতা-পুত্র খনন কাজ চালিয়ে যেতে লাগল, আরেকদিকে লোকজনও তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আবদুল মুত্তালিবের এরকম করার কারণ তারা কোনোভাবেই বুঝতে পারছিল না। এক পর্যায়ে তারা তাকে ছেড়ে দিল। তারা ফিরে যাওয়ার সময় আবদুল মুত্তালিবের চিৎকার শুনতে পেল। লোকেরা দৌড়ে এসে দেখতে পেল যে আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপের ঢাকনা উন্মোচন করেছেন।

এরপর উপস্থিত কুরাইশের নেতারা এসে বলল যে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই হলো আমাদের পূর্বপুরুষ ইসমা'ঈলের ﷺ কূপ', এ কথার মাধ্যমে তারা ইঙ্গিত দিতে চাইল যে এই কূপের উপর তাদের সবার অধিকার আছে, তাই এই কূপের অংশীদার তারা সবাই। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'আমিই স্বপ্নে এই কূপের খোঁজ পেয়েছি। আমিই এটাকে আবার উন্মোচন করেছি। তাই এই কূপের মালিক আমি।' কিন্তু তারা এটা মানতে চাইল না। তারা বলতে লাগল যে তারা সবাই ইসমা'ঈলের উত্তরসূরি, তাই তারা সবাই এই কূপের মালিক। এদিকে আবদুল মুত্তালিব এই কূপের মালিকানা অন্য কারও হাতে দেবেন না বলে মনস্থির করেছেন। দুই পক্ষই তর্কাতর্কি চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মাঝে যখন এই কূপ নিয়ে প্রায় যুদ্ধ বেঁধে যাচ্ছিল তখন কেউ একজন প্রস্তাব দিল যে, 'নিজেদের মাঝে এরকম মারামারি না করে আমরা বরং বনু সাদের মহিলা জাদুকরের কাছে যাই। সে হয়তোবা আমাদের একটা সমাধান দিতে পারবে।'

বনু সাদের এই মহিলা জাদুকর দাবি করত যে তার সাথে আত্মার যোগাযোগ আছে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যমযম কূপ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান পাওয়ার আশায় এই মহিলার কাছে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারল যে সেই মহিলা সিরিয়া চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার আশ-শামের দিকে যাত্রা শুরু করল। যাত্রাপথে তাদের পানি শেষ হয়ে গেল। তখন তারা ছিল মরুভূমির মাঝে। সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় আবদুল মুত্তালিব বাকি সবাইকে বললেন, 'আমাদের মৃত্যু যদি এই নির্জন মরুভূমিতেই ঠিক করা থাকে তাহলে সবার উচিত যার যার কবর খুঁড়ে ফেলা যাতে কেউ একজন মারা গেলে বাকিরা তাকে কবর দিতে পারে। তাহলে অন্তত একজন ছাড়া বাকিদের কবর হবে।' তাঁর কথামতো সবাই যার যার কবর খুঁড়ে ফেলল এবং সেই কবরে শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আবদুল মুত্তালিবই আবার বলে উঠলেন, 'নাহ, আমাদের মতো পুরুষদের এভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা

করা মানায় না। তার চেয়ে বরং আমরা সবাই পানির খোঁজে বের হই।' তাঁর সাথে সবাই একমত হলো এবং একেকজন পানির খোঁজে একেকদিকে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে আবদুল মুত্তালিব পানির খোঁজ পেলেন। পানি নিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে এই মরুভূমিতে পানির সন্ধান দিয়ে রক্ষা করেছেন এবং তিনিই তোমাকে যমযম কূপ উন্মোচনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এসব কিছুই একটি জিনিস নির্দেশ করে; এই কূপ তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ আর এই কূপের মালিকানা তোমারই। আমরা আমাদের দাবি ছেড়ে দিলাম। এখন চলো, আমরা মক্কায় ফিরে যাই।'

যখন কুরাইশ নেতারা যমযম কূপের মালিকানার জন্য আবদুল মুত্তালিবকে চাপাচাপি করছিল, তখন আবদুল মুত্তালিবের পাশে একমাত্র পুত্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। এ ব্যাপারটি আবদুল মুত্তালিবকে বেশ ভাবিয়ে তোলে, কেননা গোত্রীয় সমাজে কোনো ব্যক্তির শক্তিমত্তা কেমন তা নির্ধারিত হয় তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাধিক্যের উপরে, যেমন যার যত ছেলে, ভাই, চাচা, কিংবা আত্মীয় – সে তত বেশি শক্তিশালী। আবদুল মুত্তালিব তখন আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে দশটি পুত্র সন্তান দেন, তাহলে আমি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আপনার পথে কুরবানি দেব।' এরপর আল্লাহ তাআলার দয়ায় আবদুল মুত্তালিব দশটি পুত্র ও ছয়টি কন্যাসন্তান লাভ করলেন। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে কৃত ওয়াদা পূরণ করার ব্যবস্থা নিলেন। আবদুল মুত্তালিবসহ কুরাইশের অন্যান্য লোকেরা তাদের সবচেয়ে বড় মূর্তি হুবালের কাছে যায়। এই মূর্তির পাশে কিছু তীর ছিল, তীরগুলোকে তারা খুব পবিত্র বলে বিশ্বাস করত, সেগুলোর সাথে ঐশ্বরিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে বলে তারা মনে করতো। ওই তীরগুলোর গায়ে আবদুল মুত্তালিবের সব পুত্রের নাম লেখা হয়েছিল। এরপর লটারি করা হলে প্রথমবার উঠল আবদুল্লাহর নাম, দ্বিতীয়বারেও উঠল আবদুল্লাহর নাম এবং তৃতীয়বারেও আবদুল্লাহর নাম উঠল।

তারপর আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহকে আল-কাবার পাশে নিয়ে গেলেন। তিনি যখন ছুরি বের করে আবদুল্লাহকে জবাই করতে যাচ্ছিলেন তখন দৌড়ে আসলো তারই আরেক পুত্র আবু তালিব। আবু তালিব তাঁর পিতাকে বলল, 'আমরা আপনাকে এ কাজ করতে দিতে পারি না।' এরপর আবদুল্লাহর মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনরা এসে বলল, 'আমরা আপনাকে আমাদের পুত্রকে জবাই করতে দিতে পারি না।' তখন আবার অন্যান্য লোকেরাও আবদুল মুত্তালিবকে বলতে লাগল, 'আপনি যদি এ কাজটা করেন তাহলে তা আপনার উত্তরসূরিদের জন্য করণীয় বলে গণ্য হবে', কেননা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তাদের নেতা, তিনি কোনো কাজ করলে তা প্রথা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তাদের আপত্তি মানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ তাআলার কাছে যে মানত করেছি তা কোনোভাবেই ভঙ্গ করতে পারব না।' এ নিয়ে তাদের মাঝে কথা কাটাকাটি হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা যখন কোনো

সমাধানে পৌঁছাতে পারল না, তখন তারা আবার সেই মহিলা জাদুকরের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিল।

তারা সেই মহিলার কাছে গেল এবং সবকিছু শুনে সেই মহিলা জাদুকর বলল, 'আচ্ছা তোমরা আজকে যাও, আগামীকাল আবার এসো। আমি এর মাঝে আমার আত্মাগুলোর সাথে এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করব।' কুরাইশরা পরদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। এর মাঝে মহিলা জাদুকর একটি সমাধান বের করে নিল। মহিলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোনো ব্যক্তির রক্তপণ কীভাবে আদায় করো?' তারা বলল, 'দশটি উট দিয়ে।' তখন মহিলা বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে এক পাশে দশটি উট ও অপর পাশে আবদুল্লাহকে রেখে তীর চালনা করো; তীরটি উটের দিকে নির্দেশ করলে উটগুলোকে জবাই করবে আর আবদুল্লাহর দিকে নির্দেশ করলে পূর্বের উটগুলোর সাথে আরও দশটি উট যোগ করবে।' কুরাইশরা এতে রাজি হলো এবং মক্কায় ফিরে গেল।

মহিলা জাদুকর যা যা করতে বলেছিল কুরাইশরা ঠিক তা-ই করল। তীর যতবার আবদুল্লাহর দিকে নির্দেশ করছিল ততবার তারা উটের সংখ্যা বাড়াতে লাগল। এভাবে উটের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে যখন একশতে পৌঁছল তখন এটি উটের দিকে নির্দেশ করল। কুরাইশের লোকেরা আবদুল মুত্তালিবকে বলল, 'অবশেষে আমরা তোমার ছেলেকে জবাই থেকে বাঁচাতে পারলাম।' কিন্তু আবদুল মুত্তালিব বলল, 'না, এখনো শেষ হয়নি। আমরা আরেকবার লটারি করব।' তারা আরো দুইবার একই কাজ করল এবং প্রতিবারই নিক্ষিপ্ত তীর উট বরাবর ছিল। অবশেষে সেই একশত উট জবাই করা হলো আর আবদুল মুত্তালিবকে এই উটগুলোর পুরো খরচ একা বহন করতে হয়েছিল। তিনি খুবই দয়ালু ছিলেন, নিজের জন্য গোশত না রেখে সমস্ত উটের গোশত মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। লোকজন গোশত খেয়ে আবার সাথে করে নিয়েও যাচ্ছিল কিন্তু তারপরও পশুপাখিদেরকে খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট গোশত উদ্বৃত্ত ছিল। এরপর থেকে আরবদের মাঝে এই কথাটি ব্যাপক বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল যে আবদুল মুত্তালিবই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষ ও পশুদেরকে খাইয়েছিলেন, এমনকি আকাশের পাখিদেরকেও খাইয়েছিলেন।

কুরাইশদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, তারা বলেছিল আবদুল মুত্তালিব যে কাজ করবে, পরবর্তী আরবদের জন্য তা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, যে আরবে রক্তপণ হিসেবে ১০টি উট দেওয়া হতো, আবদুল মুত্তালিবের ১০০টি উট জবাই করার পর সেখানে রক্তপণের মূল্য ১০০টি উট নির্ধারিত হয়। ইসলামেও এই নিয়মটি বহাল রাখা হয়েছে। অবশ্য এখন আর উট দিয়ে রক্তপণ আদায় করা হয় না, বরং ১০০ উটের মূল্য মুদ্রার সাপেক্ষে হিসাব করা হয় এবং টাকা দিয়ে তা পরিশোধ করা হয়।

আবদুল্লাহ ও আমিনা হলেন মুহাম্মাদের ﷺ পিতামাতা। তাকে বলা হতো, 'তুমি হলে দুই যবীহের সন্তান। তারা হলেন ইসমা'ঈল ও আবদুল্লাহ।'

আরবের তৎকালীন ধর্মীয় পটভূমি

ইসমা'ঈল ﷺ ছিলেন আরবের নবী, আর ইসমা'ঈলের ﷺ দাওয়াহ ছিল তাওহীদের দাওয়াহ, তাই আরবরা প্রথমত মুসলিমই ছিল, কিন্তু কালের পরিক্রমায় তারা একটা সময়ে এসে মুশরিক হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ আমলে আরবে মূলত তিনটি ধর্মের প্রচলন ছিল, পৌত্তলিকতা, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম।

আরবে শির্কের উদ্ভব

আমর ইবন লুহাই আল খুযাই ছিল খুযাআ গোত্রের নেতা। সে ছিল বেশ উদারমনা, ক্ষমতাবান এক ব্যক্তি। তাকে তার গোত্রের লোকেরা অনেক সম্মান করত। তারা তাকে এতটাই সম্মান করত যে তার কথাকে আইন হিসেবে মেনে নিত। একবার আমর আশ-শামে (বর্তমান সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, লেবানন এবং জর্ডান) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণে যায়। সেখানে সে কিছু মূর্তি দেখে। স্থানীয় লোকদেরকে এগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা তাকে বলে, 'মূর্তিগুলো আমাদের এবং আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। আমাদের একেক রকম সমস্যার জন্য আমরা এক এক মূর্তির কাছে সাহায্য চাই। তারা আমাদের হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।' মূর্তিপূজার এই প্রথা আমর ইবন লুহাই আল খুযাইকে অভিভূত করে। তার মনে হলো যে, এই মুহূর্তে আরবদের জন্য এমন কিছুই চাই! আরবদের এমন কাউকে দরকার যা তাদের হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।

আমর ইবন লুহাই আল খুযাই আশ-শামের লোকদের কাছে একটা মূর্তি চাইলো যেন সে মূর্তিটি তার গোত্রের লোকদের কাছে নিয়ে যেতে পারে। তারা তাকে হুবাল নামের এক বিশাল মূর্তি দিল। সে হুবালের মূর্তি নিয়ে মক্কায় ফেরত গেল। হারামে গিয়ে আল-কাবার ঠিক পাশে একে স্থাপন করল। তার গোত্রের লোকদেরকে বলল যে মূর্তিটি তাদের হয়ে আল্লাহর সাথে মধ্যস্থতা করবে। মক্কা ছিল আরবের কেন্দ্রবিন্দু, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যস্থল। আর এ কারণে মক্কার চারপাশে এই বিদআতটি যেন দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মাঝে এই ভ্রান্ত প্রথাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আরেকটি কারণ ছিল ব্যক্তি হিসেবে সমাজে আমর ইবন লুহাই আল খুযাইয়ের গ্রহণযোগ্যতা, তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চাওয়ার প্রবণতা। সে তার গোত্রের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। তাই সবাই তাকে অনুসরণ করতে চাইত। মূর্তি বানানো এবং তা বিভিন্ন গোত্রের কাছে বিক্রি করা মক্কার একটি ব্যবসায় রূপ নিল। বিভিন্ন গোত্র মক্কায় আসত এবং মানুষ তাদের পছন্দের মূর্তি কিনে চলে যেতো। তারা বহনযোগ্য মূর্তি বানানো শুরু করল যাতে মূর্তিগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করা যায়।

মূর্তিপূজার বিষয়ে উমারের ﷺ একটি ঘটনা আছে, একদিন উমারকে দেখা গেল একবার হাসছেন আবার কাঁদছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে কেন তিনি এমন করছেন। তিনি বললেন, 'আমি জাহেলি যুগের একটি দিনের কথা ভেবে হাসছি। সে

দিন আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মূর্তিপূজা করার শখ জাগল। কিন্তু আমার মনে পড়ল যে আমি আমার মূর্তিটি ফেলে এসেছি। তাই আমি উপাসনার অন্য একটি উপায় বের করার চেষ্টা করলাম। তখন আমার সাথে ছিল কিছু খেজুর। আমি সেই খেজুরগুলো দিয়ে একটি মূর্তি বানালাম এবং সেই মূর্তির পূজা করলাম। সেই রাতে আমার অনেক খিদে পায়। তখন আমি খেজুরের তৈরি মূর্তিটি খেয়ে ফেলি।' উমার ﷺ পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে করছিলেন এবং অনুধাবন করছিলেন যে মূর্তি পূজারিরা কত বোকা! এভাবেই ইসলাম মানুষকে বদলে ফেলে। এটাই ইসলামের কারামত। ইসলাম মানুষকে তুচ্ছ অবস্থান থেকে অনেক উঁচু স্থানে উন্নীত করে। উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ ব্যাপারে আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ তাঁর বইয়ে একটি প্রশ্ন তুলেছেন,

'ইসলাম ছাড়া উমার ইবন খাত্তাব কী হতে পারতেন?' এর উত্তরে তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'তিনি তাঁর গোত্রের প্রধান হতে পারতেন, অথবা তিনি কুরাইশ গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ নেতা হতে পারতেন অথবা সর্বোচ্চ তিনি কুরাইশ বংশের নেতা হতেন। তবে তিনি যদি কম বয়সে মারা যেতেন সেটাই হতো তাঁর জন্য প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক ঘটনা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, এই বদঅভ্যাসের জন্য তিনি হয়তো অল্প বয়সে অপরিচিত অবস্থায় মারা যেতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম তাঁকে ও তাঁর অবস্থানকে বদলে দিয়েছে। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি শুধু সমগ্র আরবের নেতা হননি বরং তিনি পুরো পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশের নেতা হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি।'

মক্কায় মূর্তিপূজা সাধারণ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যেত। আল-কাবা এইসব মূর্তি দ্বারা অপবিত্র হয়ে যায়। তখন কাবা শরীফে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। চারদিকে শির্কের ছড়াছড়ি। একটি আমদানি করা মূর্তি থেকে শির্ক সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। দিনে দিনে এটি একটি ব্যবসায় রূপ নেয়। এভাবেই ইসমাঈলের ﷺ আনীত দ্বীনের বিকৃতি ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি জাহান্নামে আমর ইবন লুহাই আল খুযাইকে নাড়িভুঁড়ি ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে চলতে দেখেছি।'[3] কারণ সে-ই আরবে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন করেছিল।

ইহুদি মতবাদের প্রচলন

ইয়েমেনের রাজা তুব্বান আসআদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে আশ-শামে গিয়েছিল। মদীনা অতিক্রম করার সময় সে তার ছেলেকে সেখানে রেখে যায় যেন সে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তার ছেলে মদীনায় ব্যবসা চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মদীনার কিছু লোক তার ছেলেকে মেরে ফেলে। মদীনায় ফিরে এসে সে তার ছেলের মৃত্যুসংবাদ পায়। এ সংবাদ শুনে সে মদীনাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাই সে মদীনায় আক্রমণ করে।

---

[3] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মানাকিব, হাদীস ৩১।

তার বিশাল সৈন্য বাহিনীকে মোকাবিলা করার মতো মদীনার তেমন শক্তিই ছিল না। তুব্বান চাইলে মদীনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে সময় হঠাৎ মদীনায় দুইজন ইহুদী পণ্ডিতের আগমন ঘটে।

রোমানরা জেরুসালেম দখল করার পর ইহুদিরা উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল। তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ শেষ নবীর খোঁজে আরবে চলে আসে। তাদের ধর্মগ্রন্থে শেষ নবীর আগমনের কিছু লক্ষণ ছিল, তারা মদীনায় সেই লক্ষণগুলো দেখতে পায়। তাই তারা মদীনায় বসতি স্থাপন করে। সেখানে বাস করত তাদের তিনটি গোত্র–বনু কায়নুকা, বনু নাযির এবং বনু কুরায়যা। ইহুদি পণ্ডিতরা তুব্বান আস'আদের কাছে গিয়ে বলে, 'দেখুন, এই স্থানটি আল্লাহ তাআলা সুরক্ষিত করে রেখেছেন, যদি আপনি মদীনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন তবে আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করে দেবেন।' তারা একথা সেকথা বলে শেষ পর্যন্ত তুব্বানকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, মদীনা আক্রমণ করলে তুব্বান ভুল করবে। তাদের কথায় তুব্বান এতটাই প্রভাবিত হয় যে, সে শুধুমাত্র মদীনা আক্রমণ থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তার ইহুদি ধর্ম ভালো লেগে যায় এবং সেই ইহুদিদের ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর সে সেই পণ্ডিতদেরকে ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তারা রাজি হয় এবং অবশেষে তুব্বান ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে।

সেই সময় হাওয়াযিন এবং কুরাইশ গোত্রের মধ্যে বিরোধ চলছিল। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা মক্কা ও তুব্বান আস'আদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়ে আসছিল এবং তারা এই উদ্দেশ্য পূরণে সফলও হয়। তুব্বান মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন ইহুদি পণ্ডিতরা আবার তাকে বলল যে আল্লাহ তাআলা মক্কাকেও সুরক্ষিত করে রেখেছেন। তাই মক্কায় আক্রমণ করার বদলে তুব্বানের মক্কায় যাওয়া উচিত এবং কাবা শরীফ তাওয়াফ করা উচিত। তুব্বান ইহুদি পণ্ডিতদের সাথে মক্কায় গিয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তারা সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ ইহুদি আলিমদের জন্য কাবা তাওয়াফ করা সমীচীন হবে না কেননা কাবা মাটির তৈরি মূর্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং তুব্বান একাই মক্কায় যায় এবং কাবা শরীফ তাওয়াফ করে। তুব্বান সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে চাদর দিয়ে আবৃত করে। সে প্রতি বছর একবার কাবার চাদর পরিবর্তন করত। পূর্বে তারা একটি চাদরের উপর অন্য চাদর বিছিয়ে দিতো। তারা মনে করতো যে, কাবার চাদর অনেক পবিত্র তাই এটি সরানো ঠিক হবে না। এই নিয়ম ততদিন বলবৎ থাকে যতদিন না অনেকগুলো চাদর কাবা শরীফের জন্য অতিরিক্ত ভারী হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তারা কাবার চাদর অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। তুব্বান আস'আদ ইহুদি পণ্ডিতদের নিয়ে ইয়েমেনে চলে যায় এবং সেখানে তাদেরকে ইহুদি মতবাদ প্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উৎসাহ দেয়। বেশিরভাগ গোত্র এই মতবাদ গ্রহণ করে। সুতরাং তখনকার সময়ে দুই ধরনের ইহুদি ছিল। একদল ছিল জাতিগত ভাবে ইহুদি, এরা মূলত খায়বার ও মদীনায় বসবাস করত, আরেকদল ছিল বিশ্বাসগত ভাবে ইহুদি, এরা জাতিগতভাবে আরব, কিন্তু বিশ্বাসের দিক থেকে ইহুদি, এরা বসবাস করত ইয়েমেনে। এ থেকে বোঝা যায়,

এক সময়ে ইহুদিরা তাদের ধর্ম প্রচার করত যা তারা এখন আর করে না। এভাবেই আরবে ইহুদি মতবাদের প্রসার ঘটেছিল।

খ্রিস্টধর্মের আগমন

ঈসার ﷺ পর পর্যায়ক্রমে খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে অনেক অনুসারী ধর্মচ্যুত হয়। খুব কম সংখ্যক লোকই অবশিষ্ট ছিল যারা ছিল সত্যিকার অর্থে এই ধর্মের প্রকৃত অনুসরণ করতো। পরবর্তীতে তারাই পুনরায় খ্রিস্টধর্ম পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। ঈসার ﷺ ধর্মের মূল বক্তব্য ছিল বিশুদ্ধ তাওহীদ।

সেই অনুসারীদের মধ্যেই একজন একবার ইয়েমেনে যান এবং সেখানে নাযরান নামের এক এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা শুরু করেন। সেখানে অনেক গোপনে এবং ধীরে ধীরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ চলছিল। ততদিনে তুব্বান আস'আদ মারা যায়। আর ইয়েমেনের রাজা ছিল তার ছেলে যু নাওয়াস। নতুন এই ধর্মের কথা তার কানে পৌঁছলে সে এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর অনুসারীদের ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে।

আসহাবুল উখদুদের গল্প

সহীহ মুসলিমে এই সংক্রান্ত একটি কাহিনি বর্ণিত আছে, গল্পটি এক রাজা ও এক কমবয়সী ছেলেকে ঘিরে। অনেক আলিম গল্পটিকে রাজা যু নাওয়াস এবং ইয়েমেনের তাওহীদবাদী খ্রিস্টানদের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। ঘটনাটি এমন:

এক রাজা ছিল, সে জাদুবিদ্যা চর্চা করত এবং তার উপদেষ্টাও ছিল জাদুকর। কালের পরিক্রমায় একসময় জাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হয়। সে রাজাকে বলে, 'আমার তো সময় শেষ হয়ে আসছে, আমি যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। তাই আমি একজনকে এই জাদুবিদ্যা শিখিয়ে যেতে চাই যেন আমি মারা যাওয়ার পর সে আমার অভাব পূরণ করতে পারে।' তারা জাদুকরের উত্তরসূরির সন্ধান করতে থাকে। অতঃপর তারা এক বালককে সেই জাদুকরের ছাত্র হিসেবে মনোনীত করে। ছেলেটি খুব সকালে তার বাড়ি থেকে জাদুকরের কাছে জাদুবিদ্যা শিখতে যেত এবং রাতে নিজ বাড়িতে ফিরে যেত।

একদিনের ঘটনা, জাদুকরের বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে সে দেখলো একটি ইবাদাতখানা, তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেখানে প্রার্থনার আওয়াজ শুনতে পেল। ছেলেটির কাছে এই ইবাদাত একটু অন্যরকম ঠেকলো, সে ঠিক এই ধরনের ইবাদাতের সাথে পরিচিত ছিল না। সে জায়গাটি ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিল। বস্তুত, এটি ছিল তাওহীদের গির্জা। সেখানে ঈসা ﷺ আনীত সত্য ধর্মের দাওয়াত দেওয়া হতো। সেখানে এক লোকের কাছে সে খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপারে জানতে পারলো এবং তা

তাকে অভিভূত করলো। কিন্তু ওই সময়ে তার জাদুকরের কাছ থেকে জাদু শিখার কথা ছিল। ছেলেটি বুঝতে পারছিল না সে কী করবে – এখানে থাকবে নাকি জাদুকরের কাছে চলে যাবে, সে গির্জার ধর্মযাজককে জিজ্ঞাসা করলো যে এই ব্যাপারে তার কী করণীয়। তিনি তাকে প্রতিদিন সকালে তার কাছে এসে শিক্ষাগ্রহণের পরামর্শ দিলেন এবং তারপর জাদুকরের কাছে যেতে বললেন। যদি জাদুকর দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে যেন বলে, 'আমার পিতামাতার জন্য দেরি হয়েছে।' তিনি তাকে আরো বললেন, বাড়ি ফেরার আগে সে যেন আবার গির্জা হয়ে যায়। যদি তার পিতামাতা বাড়িতে দেরি করে ফেরার কারণ জানতে চায় তাহলে সে যেন বলে যে জাদুকর তাকে দেরি করিয়ে দিয়েছে।

এভাবেই সেই অল্পবয়স্ক ছেলেটির দিন কাটতে লাগলো, সে জাদুকরের কাছে যাওয়ার আগে এবং বাড়ি ফেরার পথে গির্জা থেকে দীক্ষা নিয়ে যায়। একদিন একটি ঘটনা ঘটলো, এক ভয়ানক জন্তু বাজারে ঢুকে পড়লো এবং বাজারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। কেউ জন্তুটিকে থামাতে পারছিল না। তখন ছেলেটি বললো, 'হে আল্লাহ! আমি আজকে জানতে চাই যে ধর্মযাজক এবং জাদুকর, এই দুইজনের মধ্যে কে সঠিক পথের উপর আছে। হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দাও।' সবাই জন্তুটিকে হত্যা করার চেষ্টা করলো কিন্তু কেউ সফল হলো না। সে একটি পাথর হাতে নিয়ে বললো, 'হে আল্লাহ! যদি গির্জার ধর্মযাজক সত্য পথের উপর থাকে তাহলে এই পাথর দ্বারা জন্তুটিকে মেরে ফেলো।'

সে সেই জন্তুর দিকে পাথরটি ছুঁড়ে মারলো এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা গেল। ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে ছেলেটি সব কিছু খুলে বললো। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, 'তুমি আজকে অনেক উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছো। এখন তোমাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।'

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা ছাড়া কেউ উঁচু মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে পরীক্ষা করার জন্য মানুষদের পাঠিয়েছেন। আর সবাইকে তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষা করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ। এরপর পর্যায়ক্রমে যোগ্যতা অনুসারে সবার পরীক্ষা নেওয়া হয়।'

ধর্মযাজক বালকটিকে বলেছিলেন যে, সে শীঘ্রই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তিনি আরো বললেন যে, 'যখন পরীক্ষার সময় আসবে তখন তুমি আমার নাম কারো কাছে প্রকাশ করে দিও না।' তিনি ভয় পেয়ে নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি–বিষয়টা এমন ছিল না। যেহেতু তাঁর দাওয়াহর পুরো কার্যক্রমটাই গোপনে পরিচালিত হচ্ছিল তাই তিনি সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এমনটি করেছেন।

অন্যদিকে, রাজার একজন অন্ধ উপদেষ্টা ছিল। তিনি এই বালকের কাছে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে গেলেন। এই বালক ততদিনে সবার কাছে বেশ পরিচিতি লাভ

করেছিল এবং সবাই তার কাছে বিভিন্ন সাহায্যের জন্য আসতো। যখন রাজার উপদেষ্টা বালকের কাছে গেলো, সে বললো, 'আমি নই, বরং আল্লাহ তাআলাই আপনাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন।' অতঃপর সে আল্লাহর সাহায্যে লোকটির অন্ধত্ব দূর করে দিল। সুস্থ হওয়ার পর লোকটি রাজার কাছে গেলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কে তোমাকে সুস্থ করে তুললো?' লোকটি বললো, 'আল্লাহ।' তখন রাজা বললো, "কী! আমি ছাড়া তোমার আর কি কোনো রব আছে?' লোকটি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ আছে। আল্লাহ আমার রব এবং আপনারও।'

এরপর রাজা তার এই উপদেষ্টাকে অনেক অত্যাচার করলো যাতে সে ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করে যে তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। অনেক অত্যাচারের পর সে ছেলেটির নাম প্রকাশ করে দিল। ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করা হলো, তাকেও অনেক নির্যাতন করা হলো। সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার শিক্ষকের নাম বলে দিতে বাধ্য হলো। এরপর ধরে আনা হলো বালকের দীক্ষাগুরু সেই ধর্মযাজককে। তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। এরপর তারা একটি করাত এনে তার মাথার উপর রাখলো আর তাকে কেটে দু'ভাগ করে ফেললো। কিন্তু তবুও তিনি তার দ্বীন ত্যাগ করতে রাজি হননি। অদম্য সাহসিকতার এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!

বাকি থাকল সেই ছেলেটি। রাজা ছেলেটিকে পাহাড়ের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার আদেশ করলো। ছেলেটি আল্লাহর কাছে দুআ করলো, 'হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ভালো মনে করো সেভাবেই আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করো।' সে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করলো। তারা ছেলেটিকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে গেলো। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই পাহাড়টি কেঁপে উঠলো এবং ছেলেটি ছাড়া বাকি সব সৈন্য পাহাড় থেকে পড়ে গেল। এরপর ছেলেটি রাজার প্রাসাদে ফিরে গেল। রাজা তখন অন্য আরেকদল সৈন্যকে আদেশ দিল যে তাকে যেন গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। তারা নৌকা করে সমুদ্রে গেল এবং সে পুনরায় একই দুআ করলো, 'হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ভালো মনে করো সেভাবেই আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করো।' হঠাৎ মাঝপথে নৌকাটি উল্টে গেলো এবং সে ছাড়া সবাই ডুবে মারা গেলো। সে আবার রাজার কাছে ফিরে গেল।

পুনরায় রাজা ছেলেটিকে মারতে চাইলো এবং সে আরো এক দল সৈন্য নিয়োগ দিল। সে ছেলে তাকে বললো, 'আপনি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মারতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি আমার কথামত কাজ করেন।' রাজা প্রশ্ন করলো, 'কী সেই কাজ?' তখন বালকটি বললো, 'আপনি আমাকে রশি দিয়ে একটি গাছের সাথে বেঁধে সেখানে সবাইকে জড়ো করেন। তারপর আপনি আপনার তীর নিয়ে বলবেন – বিসমিল্লাহ! এই বালকের রবের নামে। এই কাজ করলে আপনি আমাকে মেরে ফেলতে পারবেন।' অর্থাৎ ছেলেটি রাজাকে বলে দিল কীভাবে তাকে মেরে ফেলতে হবে।

ফিদায়ী বা আত্মোৎসর্গমূলক হামলা বা অভিযানের বৈধতার পক্ষের বিভিন্ন দলীলের

মধ্যে এই ঘটনাটি প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করা হয়। আল্লাহ্‌ তাআলার খাতিরে নিজের জীবন উৎসর্গ করা নিঃসন্দেহে একটি বৈধ কাজ, তবে কখন এবং কোথায় এই কাজটি করা যাবে সেই ব্যাপারে অবশ্যই কিছু বিধিনিষেধ আছে। কারণ এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে ছেলেটি রাজাকে বলে দিয়েছিল যে কীভাবে তাকে মেরে ফেলা সম্ভব। ছেলেটি এই কাজ করেছে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে।

রাজা ছেলেটির বলে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করলো। 'বিসমিল্লাহ! এই ছেলের রবের নামে' – এই কথা বলে সর্বসমক্ষে রাজা তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। তীরটি সরাসরি ছেলেটির মাথায় বিঁধে যায়। ফলে সে সাথে সাথে মারা যায়। এটা দেখে ঘটনাস্থলের সবাই মুসলিম হয়ে যায়। ছেলেটি নিজের জীবন বিসর্জন দিল যেন অন্যের জীবন বাঁচতে পারে, আর বেঁচে থাকার অর্থ তো একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত। যে জীবনে ইসলাম নেই, সেই জীবনের কোনো মূল্য নেই। নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে সে একদল মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে গেল।

অতঃপর রাজার উপদেষ্টারা তাকে বললো, 'হায় হায়! আপনি যা আশঙ্কা করছিলেন তা-ই ঘটলো।' ছেলেটিকে রাজা মেরে ফেলতে চেয়েছিল যেন তার দ্বীন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, অথচ এখন সবাই ছেলেটিকে মারা যেতে দেখে মুসলিম হয়ে গেল, রাজার পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। রেগে গিয়ে রাজা যু নাওয়াস একটি বড় গর্ত খোঁড়ার জন্য তার সৈন্যদের আদেশ দেয়। তারপর সেই গর্তে কাঠ রেখে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। লোকদেরকে বলা হলো তাদের নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করতে। যারা অস্বীকৃতি জানালো তাদের সবাইকে ধরে ধরে এই আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো। অনেক মানুষকে সেই জ্বলন্ত আগুনে সেদিন জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এরা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিল। তারা পিছু হটেনি, ছাড়ও দেয়নি।

গল্পের শেষটা অসাধারণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একজন মহিলা আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তার কোলে ছিল তার বাচ্চা। বাচ্চাটির জন্য সে মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সেই কোলের শিশুটি বলে উঠে, 'মা! আপনি শান্ত হোন কারণ আপনি সত্য পথে আছেন', আর এই কথা শুনে মহিলা নির্ভীকচিত্তে আগুনে ঝাঁপ দেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, 'তিনজন শিশু আছে যারা (অলৌকিকভাবে) শিশু বয়সে কথা বলে উঠেছিল। এই শিশুটি তাদেরই একজন।'[4]

সূরা আল-বুরুজে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। তাদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা

---

[4] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮। তবে ইবন ইসহাক কাহিনীটি অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণনা অনুসারে রাজা ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায় এবং বাকি সকলেও মুসলিম হয়ে যায়। তিন শিশুর দোলনায় কথা বলার হাদীসটি বুখারিতে উল্লেখিত আছে -- অধ্যায় নবীদের কথা, হাদীস ১০৭।

হয়েছিল, কিন্তু বস্তুত তারা মৃত্যুর মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করেছে। মনে হতে পারে যে, এখানে রাজা বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন ভিন্ন কথা, তিনি বলেছেন,

"...এটিইতো বিরাট সাফল্য।" (সূরা বুরুজ: ১১)

আল্লাহ তাআলা কেন এমন একদল মানুষকে বিজয়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যারা আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে? প্রকৃত বিজয় দুনিয়াবী শক্তির বিজয় নয়, বরং প্রকৃত বিজয়ী তারাই, যারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য আদর্শের উপরে, নিজ বিশ্বাসের উপর অটল থাকে। জান্নাতে প্রবেশ করতে পারাই হচ্ছে বিজয়, আর তাই শহীদরা অবশ্যই বিজয়ী, যদিও তারা অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হন বা কষ্ট ভোগ করেন।

সেদিন সব মুসলিমকে হত্যা করা হলেও তাদের মধ্যে একজন বেঁচে যান, তিনি রোমান সম্রাটের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কারণ সেই সম্রাট ছিল খ্রিস্টান। খ্রিস্টানরা তৎকালীন সময় বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, কেননা ততদিনে রোমান খ্রিস্টানরা ত্রিতত্ত্ববাদ ও ঈসাকে ﷺ ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে তাদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলে। এই কারণে বিভিন্ন ফিরকার উদ্ভব হয়। সেই বেঁচে যাওয়া মানুষটি রোমান সম্রাটের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন এবং রোমান সম্রাটের কাছে সাহায্য চাইলেন। রোমান সম্রাট তখন বললো, 'আমরা ইয়েমেন থেকে অনেক দূরে আছি। তবে আমি যা করতে পারি, তোমাদের অবস্থার কথা জানিয়ে আবিসিনিয়ার নাজ্জাশির কাছে সংবাদ পাঠাতে পারি, আশা করি সে তোমাদের সাহায্য করতে পারবে।' তখন আবিসিনিয়ার নাজ্জাশিও খ্রিস্টান ছিলেন। তাই রোমান সম্রাট তাঁর কাছে খবর পাঠালো।

অতঃপর নাজ্জাশি তাঁর সেনাপতি আরইয়াতের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান। তারা ইয়েমেন আক্রমণ করে যু নাওয়াসের সাথে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে যু নাওয়াস পরাজিত হয় এবং লোহিত সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ইয়েমেনের কিছু অংশে তখন আবিসিনিয়ার শাসন শুরু হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা এই আক্রমণ পরিচালনা করে কারণ ইয়েমেনের ইহুদিরা খ্রিস্টানদের হত্যা করেছিল। আরইয়াত কিছুদিনের জন্য ইয়েমেন শাসন করে। এমন সময় আরইয়াতের এক সেনাপতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে এবং এই বিদ্রোহের ফলে ইয়েমেনে বসবাসরত আবসিনিয়ানরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল আরইয়াতের পক্ষে এবং অন্যদল ছিল বিদ্রোহী সেনাপতি আবরাহার পক্ষে। দল দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

আরইয়াত আবরাহাকে বলে, 'আমরা যদি দুই দল মিলে যুদ্ধ করি তাহলে ইয়েমেনের লোকেরা আমাদের হাত থেকে ইয়েমেন ছিনিয়ে নেবে। কেমন হয় যদি শুধু আমরা দুইজন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি?' আবরাহা রাজি হয়, কিন্তু সে একটি চক্রান্ত

করে। সে গোপনে তার কয়েকজন দেহরক্ষীর সাথে আরইয়াতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো যে, যদি তারা আবরাহাকে হারতে দেখে তবে তারা যেন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। বর্ণনামতে আরইয়াত ছিল লম্বা এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। অন্যদিকে আবরাহা ছিল খাটো এবং স্থুলকায়। তারা যখন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল তখন চারপাশে অনেক মানুষ যুদ্ধ দেখছিল। যুদ্ধের প্রথমেই আরইয়াত আবরাহাকে আক্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে তার নাক কেটে ফেলে। এমন অবস্থায় আবরাহার একজন রক্ষী এগিয়ে এসে আরইয়াতকে মেরে ফেলে। এভাবেই আবরাহা ইয়েমেনের শাসনক্ষমতা দখল করে।[১]

আবরাহার বাহিনী ও 'হাতির বছর'

আবরাহা ইয়েমেন দখল করে নিয়ে সেখানে শাসন করা শুরু করে। সে সবাইকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চাচ্ছিলো। কাবাঘরের প্রতি আরবদের বিশেষ দুর্বলতা ছিল, তাই সে এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কাবার অনুরূপ 'আল-কালিস' নামের একটি চমৎকার গির্জা নির্মাণ করে। কাবার সাথে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্যে এই গির্জা বানানো হয়েছিল। কিন্তু এই কাজটি আরব গোত্রগুলোর পছন্দ হয়নি। একদিন রাতের অন্ধকারে একজন গির্জায় গিয়ে মলত্যাগ করে এবং গির্জার দেওয়ালে মল ছুঁড়ে নোংরা করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আবরাহা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। সে কাবা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। আবরাহা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে অভিযান শুরু করে। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নুফাইল নামের একজন গোত্রনেতা তার বিরোধিতা করে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সে আবরাহার কাছে হেরে যায় এবং যুদ্ধবন্দী হয়।

আবরাহা আত-তাইফে পৌঁছানোর পর সেখানকার লোকেরা তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে, কেননা কুরাইশদের সাথে তাইফবাসীর শত্রুতা ছিল। তাইফের এক লোক আবরাহার বাহিনীকে পথ দেখানোর জন্য রাজি হয়, কিন্তু তাইফ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে সে মারা যায়।

আবরাহা আরবের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাল। সেখানে একটি চারণভূমিতে কিছু মেষ এবং উট চড়ছিল। আবরাহা সেগুলো দখল করে নেয়। এই মেষ এবং উটগুলো ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ দাদা আবদুল মুত্তালিবের।

আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সাথে দেখা করতে গেলেন। অন্যদিকে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন নুফাইলের বন্ধু। নুফাইল আবরাহার কাছে বন্দী ছিলেন। বন্দী অবস্থাতেই নুফাইলের সাথে উনাইস নামের এক ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয়। উনাইস ছিল আবরাহার বাহিনীর হস্তীচালক। আবদুল মুত্তালিব নুফাইলের সাথে দেখা করে তাকে বলেন যে, তিনি আবরাহার সাথে দেখা করতে এসেছেন। নুফাইল উনাইসের সাথে কথা বলে আবরাহার সাথে আবদুল মুত্তালিবের দেখা করার বন্দোবস্ত করে দেন। উনাইস আবরাহার সাথে আবদুল মুত্তালিবের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। আবরাহা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়।

বর্ণনানুসারে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সুপুরুষ এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাকে দেখে যেকোনো মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক ঘটবে। আবদুল মুত্তালিবকে দেখার সাথে সাথেই আবরাহা খুব সম্মানের সাথে তাকে স্বাগত জানায়, যদিও তখনও আবদুল মুত্তালিবের সাথে আবরাহার কথা হয়নি। আবরাহা ছিল রাজা, তার সাথে কেউ দেখা

করতে আসলে সে অনেক উঁচু একটি সিংহাসনে বসতো এবং বাকিরা নিচে, তার পায়ের কাছে বসতো। কিন্তু সে আবদুল মুত্তালিবকে দেখার পর তাকে পায়ের কাছে বসানো পছন্দ করলো না। সে চাইলে আবদুল মুত্তালিবকে তার সিংহাসনে বসার জন্য বলতে পারতো, কিন্তু তা না করে আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের সাথে মেঝেতে বসলো এবং তার দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলো যে তিনি কী চান।

কোনো রাখঢাক না রেখে আবদুল মুত্তালিব দোভাষীকে সরাসরি বললেন, 'আবরাহা আমার দু'শ উট লুট করেছে। আমি তা ফেরত নিতে এসেছি।'

- প্রথম দেখায় তোমার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এসেছি তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের লাঞ্ছিত করতে, তোমাদের দেশ ধ্বংস করতে। আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বানানো আল-কাবা ভেঙে দিতে চাই। আর তুমি কিনা এসেছ আমার কাছে উট চাইতে?

- এই উটের মালিক আমি, তাই আমি আমার উট নিয়ে যেতে এসেছি। কাবা ঘরের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাই আল্লাহই এর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

অতঃপর আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের উট ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিল। আবদুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে গেলেন আর তাঁর গোত্রের লোকদের বললেন, 'আবরাহার সাথে যুদ্ধ কোরো না, মক্কা থেকে পালিয়ে যাও।' আবদুল মুত্তালিব পরিষ্কারভাবে সবাইকে পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দিলেন। সবাই মক্কা ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবদুল মুত্তালিব সবার শেষে মক্কা ত্যাগ করেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি কাবার চাদর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর নিকট দুআ করেন যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর ঘরকে রক্ষা করেন। তারপর তিনি মক্কা থেকে চলে যান।

আবরাহা তার সৈন্যদলকে কাবার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয় কিন্তু হাতিগুলো কিছুতেই সামনে এগোচ্ছিলো না। হাতি চালকরা তাদের হাতিগুলো অন্য কোনো দিকে চালনা করলে হাতিগুলো সেদিকে দৌড়ে যেতো। কিন্তু তাদেরকে মক্কার দিকে ঠেলা হলে তারা সেখানেই বসে পড়তো। এটা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কারামত। বলা হয়ে থাকে উনাইস নামের সেই লোকটি হাতির কানের কাছে গিয়ে বলেছিল, 'এটা আল্লাহর ঘর, একে আক্রমণ কোরো না'–এই বলে সে পালিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, কোনো না কোনো কারণে হাতিগুলো কাবার দিকে এগুচ্ছিলো না।

তারা হাতিগুলোকে মারতে লাগলো, তাদের বল্লম দিয়ে খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত করে ফেললো কিন্তু তবুও হাতিগুলো কাবার দিকে একচুল পরিমাণ নড়লো না। অবশেষে তারা হাতিগুলোকে পিছনে ফেলে সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ তাআলা এবার তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। যেকোনো কিছুই আল্লাহর সৈন্য হতে পারে; পানি,

বাতাস, জীব-জন্তু। আল্লাহ তাআলা এবার সৈন্য হিসেবে প্রেরণ করলেন এক দল পাখি। সবগুলো পাখি পায়ে একটি করে পাথরের নুড়ি নিয়ে আবরাহার বাহিনীর দিকে উড়ে গেল এবং পাথর ছুঁড়ে তারা নিমেষেই আবরাহার বাহিনী ধ্বংস করে ফেললো।[6] সূরা আল-ফীলে এই ঘটনা বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্মের বছরে এই ঘটনা ঘটেছিল। তাই তাঁর জন্মের বছরকে 'হাতির বছর' বলা হয়।

---

[6] সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২। পুরো কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ আবির্ভাব: শৈশব, পেশা এবং বৈবাহিক জীবন

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্ম

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্মের সময় আরব এবং পুরো বিশ্বের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক, সে সময় তাদের পথ নির্দেশনা বা নেতৃত্বের খুব প্রয়োজন ছিল। তবে তখনও মানুষের মাঝে কিছু ভালো গুণ বিদ্যমান ছিল। যেমন আরবরা বেশ উদার ও অতিথিপরায়ণ ছিল, তারা কথা দিয়ে কথা রাখতো। তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল, তাদের মধ্যে আরো ছিল লজ্জাবোধ এবং অন্যায়কে রুখে দেওয়ার মানসিকতা। তাদের ছিল দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, উদ্যম এবং সারল্য। আরবদের এই চমৎকার গুণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাহাবারা ﷺ এই গুণগুলোর অধিকারী ছিলেন, আর তাই তাঁরা এই দ্বীন প্রচারে সফল হয়েছিলেন। সাহাবাদের ﷺ উদারতা আর আতিথেয়তার কারণে তারা যেখানে যেতেন সেখানেই তাদেরকে সকলে বরণ করে নিত, তাদের স্বাগত জানাতো। জনগণের চোখে তারা মোটেও ঘৃণিত দখলদার ছিলেন না, বরং তারা সাহাবীদেরকে ﷺ পেয়েছিল মুক্তিদাতা সৈনিক হিসেবে। মিসর ও সিরিয়াতে এমনটা হয়েছিল। মুসলিমরা যখন তাদেরকে রোমান শাসনের অধীন থেকে উদ্ধার করে লোকজন তখন অনেক খুশি হয় এবং তাদেরকে মুক্তিদাতা হিসেবে স্বাগত জানায়।

সাহাবাগণ ﷺ ক্ষমতা বা কর্তৃত্বলোভী ছিলেন না। অনেক সময়ই তারা নিজেদের হাত থেকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে যোগ্য লোকদের হাতে তুলে দিতেন। তারা তাদেরকে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের হাতেই নেতৃত্ব হস্তান্তর করে যেতেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির মতো জনগণের সম্পদ লুট করার জন্য সাহাবারা ﷺ যুদ্ধ করতেন না, বরং তাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে তারা যুদ্ধ করতেন। তাঁরা ছিলেন বিশ্বস্ত, অঙ্গীকার পূরণে সদা-সচেষ্ট এবং নির্ভরতার প্রতীক। স্থানীয় জনগণের কাছে তাদেরকে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহিতা করতে হত। এই গুণগুলো দাওয়াহর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মক্কা ও মক্কার মানুষগুলোকে শেষ নবীর রিসালাতের স্থান হিসেবে অন্য সবকিছুর উপর মনোনীত করেছেন। কেননা তাদের মাঝেই ইসলামের বার্তা বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বছর জন্মগ্রহণ করেন, যে বছর আল্লাহ তাআলা আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। নবী ﷺ জন্মের সময় সম্পর্কিত অনেক বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই সহীহ নয় তাই সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

যখন নবীজির ﷺ মা আমিনা গর্ভবতী ছিলেন, তাঁর বাবা আবদুল্লাহ আশ-শামে সফররত ছিলেন। কিন্তু তিনি মদীনার কাছাকাছি একটি স্থানে এসে মারা যান। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। অর্থাৎ আবদুল্লাহ তাঁর পুত্রের জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্মের সময় তাঁর মা আমিনা একটি আলো দেখতে পেলেন।[7] তাঁর শরীর থেকে এই আলো বেরিয়ে আসছিল এবং সেই আলো আশ-শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আলোর দ্বারাই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, মুহাম্মাদের ﷺ বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে।

ইমাম আহমেদ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, লোকেরা মুহাম্মাদকে ﷺ নিয়ে নানা রকম কথা বলতো। যেমন তারা বলতো যে, মুহাম্মাদ যেন শুষ্ক মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া একটি সবুজ সতেজ গাছ। তারা বোঝাতে চাইতো যে তিনিই তাদের বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'লোকেদের কিছু কথা রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট পৌঁছালো, তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বলো, আমি কে?' তারা বললো, 'আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন,

> *'আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির সেরা অংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি সব সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, এবং আমাকে সেই দুইয়ের মাঝে উত্তম দলটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি মানুষকে অনেক গোত্রতে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ গোত্রের মাঝে স্থান দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে অনেকগুলো বংশে ভাগ করেছেন এবং আমাকে সেরা বংশে জন্ম দিয়েছেন যারা তাদের গোত্রের মাঝে সেরা এবং চেতনায় অগ্রগামী।'*

রাসূল ﷺ খারাপ মানুষদের মধ্যে প্রেরিত ভালো মানুষ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সেরাদের মধ্যে সেরা। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে কিনানাকে পছন্দ করেছেন, এবং কিনানার মধ্য থেকে কুরাইশদেরকে মনোনীত করেছেন, এবং তিনি কুরাইশদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন বনু হাশিমকে এবং তিনি বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।'[8] অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, 'আমি বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তান, আদম عليه السلام থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার বংশধারায় কোনো অবৈধ সন্তান নেই। জাহিলিয়াতের ব্যভিচার আমার বংশকে দূষিত করতে পারেনি।'

---

[7] মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ৫/২৬২।

[8] তিরমিযী, অধ্যায় রাসূলুল্লাহর (সা) মর্যাদা, হাদীস ৩৯৬৪ (আরবি রেফারেন্স)।

জাহিলিয়াতের যুগে যদিও যিনা ব্যভিচার জাতীয় অনৈতিক কার্যকলাপ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউই এমন জঘন্য কাজে অংশ নেয়নি, আল্লাহ্ তাঁর বংশধারাকে সবসময় হেফাজত করেছেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ নামসমূহ

মুহাম্মাদের ﷺ সবচেয়ে সুপরিচিত নাম হলো, মুহাম্মাদ এবং আহমাদ। কিন্তু এগুলো ছাড়াও তাঁর আরও কিছু নাম আছে। তাঁর পরিবার থেকে তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছিল মুহাম্মাদ। তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে এই নাম দেন। "মুহাম্মাদ" নামের অর্থ হলো যিনি প্রশংসিত। লোকজন তাঁর প্রশংসা করতো তাঁর চরিত্র, তাঁর কাজ, ও তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য, তিনি ছিলেন প্রশংসার মূর্ত প্রকাশ। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সেই মানুষ যাকে দিনে-রাতে প্রতি মুহূর্তে প্রশংসা করা হয়। ইতিহাসে এমন আর কোনো মানবসত্তা নেই যাকে মানবজাতি এত প্রশংসা করেছে। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর নামের অর্থকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। আহমাদ ও মুহাম্মাদ নাম দুটি একই মূল শব্দ থেকে এসেছে, 'হামদ'। হামদ মানে প্রশংসা। 'মুহাম্মাদ' মানে প্রশংসার অধিকারী। 'আহমাদ' মানে হলো, যিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন। রাসূল ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করেন, এবং তাঁর প্রশংসা অন্য সবার চাইতে বেশি।

মুহাম্মাদের ﷺ আরো কিছু নাম আছে, যা হাদীস থেকে জানা যায়, তার মাঝে একটি হলো "আল হাশির", আল হাশির অর্থ হচ্ছে জড়োকারী, যার জাগরণের সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতির পুনরুত্থান ঘটবে এবং তার পেছনে জড়ো হবে। নবী মুহাম্মাদকে ﷺ হাশরের দিন সর্বপ্রথম পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং পুরো মানবজাতি তাঁর পুনরুজ্জীবনের পর জাগ্রত হবে। "আল-মুকতাফ" বা "উত্তরসূরি" - তাঁর আরেকটি নাম। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ। আর কেউ তাঁর পরে নবী বা রাসূল হিসেবে আসবেন না, এ কারণে তিনি হলেন সকল নবীর সর্বশেষ উত্তরসূরি। "আল মাহী" তাঁর আরেক নাম, যার অর্থ হলো "নিশ্চিহ্নকারী", যিনি কুফরিকে মুছে ফেলেন বা নিশ্চিহ্ন করেন। মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া আর কোনো নবীই পুরোপুরিভাবে কুফরিকে অপসারণ করতে পারেননি, যদিও নবীজির ﷺ এই মিশন তাঁর হাতে পূর্ণ হয়নি, তবে তা তাঁর উম্মাহর হাত দিয়ে অর্জিত হবে, তাঁর উম্মাহ এখনও পর্যন্ত এই মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সেই [illegible]র্ত আসবে যখন সারা বিশ্ব মুসলিম হয়ে যাবে, সেটা আসবে উম্মাতে মুহাম্মাদীর [illegible] ঈসার ﷺ নেতৃত্বে। তাই, মুহাম্মাদই ﷺ কুফরকে সমূলে দূরীভূত করতে সফল হ[illegible] আরেকটি নাম হচ্ছে "নাবিয়্যুল মালহামা" বা "যুদ্ধের নবী।" মালহামা মানে এ[illegible] নয়, বরং মালহামা দ্বারা বোঝানো হয় একের পর এক সংঘটিত ভয়ংকর যুদ্ধ। ন[illegible] ﷺ এই নামের একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি অর্থ হতে পারে যে, তাঁর উম্মাহ জিহাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে এই নামের অন্য অর্থও রয়েছে।

শৈশব

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রথম জীবনে লালিত হয়েছিলেন তাঁর মা এবং উম্মে আইমানের হাতে, যাঁর আসল নাম বারাকা। উম্মে আইমান ছিলেন একজন আবিসিনিয়ান মহিলা। তিনি মক্কায় বাস করতেন। তিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন। রাসূল ﷺ তাঁকে তাঁর মুক্ত করা দাস যায়িদ ইবনে হারিসের সাথে বিবাহ দেন। আরব নগরীর একটি ঐতিহ্য ছিল তাদের সন্তানদেরকে বড় করার জন্য মরুভূমিতে পাঠানো। তারা বিশ্বাস করতো যে মরুভূমির পরিবেশ হলো স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ। মরুভূমি ছিল গরম এবং শুষ্ক, ফলে তা জীবাণুদের টিকে থাকার জন্য খুবই অনুপযুক্ত পরিবেশ। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, মরুভূমির প্রখরতা তাদের ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় আর শক্তিশালী করে তোলে। তাই তারা তাদের সন্তানদের শহর থেকে দূরে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিত। রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন বনু সাদের ভূমিতে।

হালিমা সাদিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দুধ-মা। তিনি তাঁর বান্ধবীদের সাথে মক্কায় এসেছিলেন শিশুর খোঁজে, যাকে তারা লালন-পালন ও দুধ খাওয়াবার জন্য নিয়ে যাবেন। এটা ছিল তাদের ব্যবসা। এই বেদুইন মহিলাগণ মক্কায় আসতো, আর কিছু শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতো। এর বিনিময়ে তারা অর্থ লাভ করতো। যে বছর তিনি মক্কায় যান সেটি ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। আর তারাও ছিলো হতদরিদ্র। তারা মক্কার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের খোঁজ করতে লাগলো। বেদুইন মহিলাদের প্রত্যেকের কাছেই মুহাম্মাদকে ﷺ উপস্থিত করা হয়, কিন্তু তারা কেউই তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। এর কারণ ছিল, নবীজি ﷺ ছিলেন এতিম। তারা বলতে লাগলো, 'এই এতিম আমাদের কী উপকার করবে? কে আমাদেরকে টাকা দেবে, তাঁর তো বাবা মারা গেছে।' তারা ভাবলো যে তাঁর মা তাদেরকে বেশি কিছু দিতে পারবেন না। হালিমার ভাষায়,

"দিন শেষে আমার সব বান্ধবী নিজেদের সঙ্গে শিশুদেরকে নিয়ে তাদের তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল, একমাত্র আমি ছাড়া। আমি আমার সাথে নেবার মতো একটি শিশুকেও পেলাম না! রাতের বেলা আমার স্বামীকে ডেকে বললাম, শোনো, আমি আগামীকাল সকালে মুহাম্মাদ নামের ওই বাচ্চাটিকেই নিয়ে আসব, আমি খালি হাতে ফিরে যেতে চাই না।

আমার স্বামী রাজি হলেন। পরদিন সকালে আমি মুহাম্মাদের মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কাছে গেলাম। তাঁকে গিয়ে বললাম, আমি আপনার সন্তানকে নিতে রাজি আছি।

এর আগের রাতে আমরা একটুও ঘুমাতে পারিনি কারণ আমাদের উটগুলি কোনো দুধ দিচ্ছিল না, দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কারণে আমি আমার সন্তানকেও দুধ পান করাতে পারিনি। সে সারারাত কান্নাকাটি করে আমাদেরকেও ঘুমুতে দেয় নি। যখন আমি মুহাম্মাদকে

আমার তাঁবুতে নিয়ে এলাম, আমার স্তন যেন এই শিশুকে স্বাগত জানালো। তাঁকে সবটুকু দুধ দিলো, যতখানি তাঁর প্রয়োজন ছিল। সেই দুধ আমার সন্তানের জন্যেও যথেষ্ট ছিল। সেই রাতে আমরা অনেকদিন পর পুরো রাত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছিলাম। কারণ আমার ছেলে গত কয়েক রাত ধরে ঠিকমতো ঘুমুতে পারেনি। আমার স্বামী এরপর উটের দুধ দোহন করতে গেলে, উটটি এত দুধ দিল যে আমার স্বামী আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, 'হালিমা, তুমি তো এক বরকতময় আত্মাকে নিয়ে এসেছো।'

মক্কায় আসার সময় আমি একটি দুর্বল বৃদ্ধ গাধার পিঠে ছিলাম। এটি এত ধীরে চলছিল যে এটার সাথে তাল মিলাতে গিয়ে অন্যদেরও আস্তে চলতে হচ্ছিল আর এ কারণে বাকি সবাই বিরক্ত হচ্ছিল। অথচ ফিরে যাওয়ার দিন আমার গাধাটিই হয়ে যায় পুরো দলের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী গাধা।

আমার বান্ধবীরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো,

-তুমি তো এই গাধার পিঠে চড়েই মক্কায় এসেছিলে, তাই না?

- হ্যাঁ, এটা সেই গাধাটাই।

- আল্লাহ শপথ, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটছে।

সেদিনের পর থেকে আমি এবং আমার স্বামী আমাদের ছাগলগুলোকে যখনই মাঠে চরাতে পাঠাতাম, তারা ভরপেট হয়ে ফিরে আসতো। আমরা যখন খুশি দুধ দোহাতে পারতাম। অথচ আমাদের গোত্রের অন্য সকলের পশুগুলো ক্ষুধার্ত থেকে যেতো। সেগুলো কোনো দুধও দিত না। লোকজন তাদের মেষপালকদের নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, 'হালিমা তাঁর পশুগুলো যে মাঠে নিয়ে যায় তোমরা কেন সে মাঠে আমাদের পশুগুলোকে চরাতে নিয়ে যাও না?' তারাও তাদের পশুগুলোকে আমাদের পেছন পেছন একই জায়গায় নিয়ে যেতো, এরপরও আমাদের পশুগুলোই ভরপেট ফেরত আসত আর তাদেরগুলো ফিরতো খালি পেটে।

দিনে দিনে শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকে, আর আমরা আবিষ্কার করতে থাকি যে আল্লাহ তাআলা এই শিশুর উসিলায় আমাদের সকলের জ[illegible]হমতের ওপর রহমত বর্ষণ করছেন! দুই বছর বয়সেই তাঁকে দেখতে খুবই চমৎ[illegible] লাগত। তিনি সেই বয়সী অন্য বাচ্চাদের মতো ছিলেন না, আল্লাহর শপথ, দুই বছর[illegible]ই তিনি অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন।"

[illegible]

দুই বছর বয়সে শিশু মুহাম্মাদকে ﷺ মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবার সময় চলে আসে। তারা মক্কায় ফিরে গিয়ে আমিনার কাছে শিশু মুহাম্মাদকে ﷺ আরও কিছুদিন রাখার অনুমতি চান। তারা মুহাম্মাদকে ﷺ অসম্ভব ভালোবাসতেন এবং এটাও জানতেন যে তিনি ছিলেন বরকতময়। তারা আমিনাকে বিভিন্ন রকম অজুহাত দেখিয়ে বোঝাতে

চাচ্ছিলেন যে, মুহাম্মাদের জন্য মরুভূমিতে থাকাই শ্রেয়। আমিনা রাজি হওয়া পর্যন্ত তারা চেষ্টা চালিয়ে যান। একসময় আমিনা সম্মতি দেন। এরপর হালিমা মুহাম্মাদকে ﷺ আবার মরুভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হালিমা বলতে থাকেন, "একদিন শিশু মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দুধ-ভাইয়ের সাথে খেলা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর ভাই ছুটে এসে অন্যদের বললো,

- আমার কুরাইশের ভাই!

- কী হয়েছে তাঁর?

- আমি দেখলাম, দুইজন সাদা কাপড় পরা লোক মাটিতে নেমে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল। এরপর তাঁর বুক চিরে ফেললো।

এ কথা শোনার পর আমি আর তাঁর বাবা ছুটে গেলাম। মুহাম্মাদের মুখ ফ্যাকাসে। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

- কী হয়েছে বাবা?

- দুইজন লোক এসে আমার বুক চিরে আমার ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে গেল।

আমি মুহাম্মাদকে ﷺ খুব বেশি ভালোবাসতাম। কেউ তাঁর কোনো ক্ষতি করুক এটা আমি কিছুতেই চাই না, বিশেষ করে আমার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায়। তাই দ্রুত মক্কায় ফিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলাম।

মক্কায় গিয়ে আমিনার কাছে বললাম, 'এই যে মুহাম্মাদ, এখন থেকে আপনি তাঁকে নিজের কাছে রাখতে পারেন। আমরা আমাদের দায়িত্ব পূর্ণ করলাম।'

- মাত্র কদিন আগেই তো তোমরা তাঁকে নিজের কাছে রাখার জন্য খুব উৎসাহ দেখাচ্ছিলে। এখন হঠাৎ করে কেন তাঁকে ফিরিয়ে দিতে এলে?

আমরা কোনো উত্তর দিলাম না। কিন্তু মা আমিনাও নাছোড়বান্দা। তিনি আমাদেরকে বারবার প্রশ্ন করতেই লাগলেন, এক পর্যায়ে আমরা তাঁর কাছে আসল ঘটনা খুলে বললাম।

সব শুনে আমিনা বললেন, 'তোমরা কি তাঁকে নিয়ে এই ভয়ে শঙ্কিত যে, শয়তান তাঁর কোনো ক্ষতি করবে? আল্লাহর শপথ, এমনটা হতে পারে না। তাঁকে যখন আমি গর্ভধারণ করি তখন সে ছিল সবচেয়ে হালকা, আর যখন তাঁকে প্রসব করি, তাঁর জন্ম অন্যসব বাচ্চাদের মতো ছিল না। যখন সে বের হয়ে আসলো, আমি আলো দেখতে পেলাম, যা ছিল আশ-শাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই বলছি, আল্লাহর সুরক্ষা তাঁর সাথে আছে। আমি নিশ্চিত তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল হবে।' এটুকু একনাগাড়ে বলে মা

আমিনা থামলেন।[৭]

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর মায়ের সাথে মক্কায় থেকে যান। ছয় বছর বয়সে তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মুহাম্মাদ ﷺ পিতৃমাতৃহীন হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে লালিত পালিত হতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে বড় করেন, কিন্তু নবীজির ﷺ আট বছর বয়সে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। তখন মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে বড় হতে থাকেন। তিনি তাঁকে আশ্রয় ও সুরক্ষা দেন, সাহায্য করেন, এবং তাঁকে তাঁর জীবনের পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে সহায়তা করে যান।

এই ছিল নবীজির ﷺ জীবনের প্রথম দিকের বছরসমূহ। রাসূলুল্লাহকে ﷺ আল্লাহ সর্বদা হেফাজত করেছেন। তৎকালীন সমাজে লোকেদের মাঝে নানান গুনাহ আর পাপকাজের প্রচলন থাকলেও তিনি কখনো সেসবের সাথে জড়াননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সেসব কাজ থেকে দূরে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ এক ঘটনা বর্ণনা করেন।

'আমি ছিলাম একজন মেষপালক। একদিন আমি আমার এক মেষপালক বন্ধুকে বললাম, 'আজ রাতে আমি মক্কার আসরে যেতে চাই, যেখানে অন্য সকলে যায়।'

আমি সেখানে গিয়ে দেখতে চাচ্ছিলাম যে তারা কী করে। তাই আমার বন্ধুকে বললাম, আমি না আসা পর্যন্ত যেন আমার মেষগুলোকে দেখে রাখে। সে রাজি হলো। আমি মক্কায় তাদের আসরের কাছে গেলাম। যেই না আমি সুরেলা ধ্বনি শুনলাম, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সাথে সাথে আমার কান বন্ধ করে দিলেন এবং আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম। আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন আসর শেষ হয়ে গেছে।

পরের দিন, আমি অন্য একটি আসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলে সেই আগের দিনের মতো একই রকম ব্যবস্থা করে মক্কায় গেলাম। মক্কায় পৌঁছে আমি আসরে গেলাম। যখনই সুর শুনতে পেলাম, আল্লাহ তাআলা আবারও আমার কান বন্ধ করে দিলেন এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠলাম আসর শেষ হওয়ার পর। আর তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে আমার জন্য এক বিশেষ নিদর্শন।'

এমন আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যায়িদ ইবনে হারিসা, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন ক্রীতদাস। তিনি বর্ণনা করেন, ইসাফ ও নাইলা নামে পিতলের দুটো মূর্তি ছিল। মুশরিকরা কাবাঘর তাওয়াফ করার সময় মূর্তিগুলো স্পর্শ করতো। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'এগুলো স্পর্শ কোরো না।' তিনি তখনো নবুওয়াত প্রাপ্ত হননি, তারপরেও তিনি কেমন করে যেন জানতেন যে, এগুলো স্পর্শ করা উচিত হবে না।

---

[৭] সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১।

আসলে এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত। ঘটনা এখানেই শেষ নয়, যায়িদ আরো বর্ণনা করেন, 'আমরা যখন ঘুরে আসলাম, তখন আমি মনে মনে ভাবলাম– একটু ছুঁয়েই দেখি না কী হয়!' যেই না আমি ছুঁয়েছি আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাকে কি এটা করতে নিষেধ করা হয়নি?' [10]

যায়িদ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়াতের পূর্ববর্তী জীবনে কখনো কোনো মূর্তিকে নমস্কার করেননি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কোনো মূর্তির উপাসনা করেননি এবং কোন মূর্তিকে পূজা করার উদ্দেশ্যে স্পর্শও করেননি। তিনি স্বভাবগতভাবেই মূর্তিপূজা অপছন্দ করতেন। আর তিনি এই নিয়মগুলো নিজ পরিবারের জন্যেও খাটাতেন। তিনি যায়িদকে বলতেন, যায়িদ মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণ কোরো না। এই কারণেই আলী ইবনে আবি তালিবও কোনোদিন মূর্তিপূজা করেননি কেননা তিনি মুহাম্মাদের ﷺ বাড়িতেই বড় হয়েছেন। আবু তালিব দরিদ্র হয়ে পড়লে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছেলে আলী ইবনে আবু তালিবের দেখাশোনা করার দায়িত্ব নেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজিকে ﷺ কিছু ইবাদত করার প্রতি নির্দেশনা দিতেন, যা সম্পর্কে এর আগে কেউ জানতো না। কুরাইশদের মধ্যে হাজ্জের সময় তারাই ছিল একমাত্র লোক, যারা আরাফাতে অংশগ্রহণ করতো না। হাজ্জের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ছিল, যেমন - তাওয়াফ, সাঈ, আরাফাতে অবস্থান এবং মিনায় অবস্থান করা। কুরাইশের লোকজন সব নিয়ম-কানুন পালন করলেও আরাফাতে অবস্থান করতো না এর কারণ হলো তারা এটাকে হারামের সীমানার বাইরে মনে করতো। আরবের অন্য সকলে সেখানে যেতো, আর কুরাইশরা তাদের বলতো, 'আমরা আল হারামের বাসিন্দা, আমরা কীভাবে আল হারামের বাইরে যেতে পারি?' তারা আরাফাতের সীমানা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে থেকে যেতো। জুবাইর ইবনে মুত'ইম একবার তার উট হারিয়ে ফেলেন। তিনি তা খুঁজতে খুঁজতে আরাফাতে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে অর্থাৎ আরাফাতে মুহাম্মাদকে ﷺ দেখতে পেয়ে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। তিনি বলে উঠেন, 'সে কি কুরাইশের লোক নয়? সে আরাফাতে কী করছে?'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মাদকে ﷺ ফিতরাতের মাধ্যমে পথ দেখাতেন, তাঁর অজান্তেই তাঁকে দিয়ে হাজ্জের একটি আহকাম পালন করিয়ে নিয়েছেন, যেটা তাঁর গোত্রের লোকেরা করতো না।

মেষপালন: সকল নবীর পেশা

নবীর ﷺ প্রথম পেশা ছিল মেষপালন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি মেষপালক ছিলেন না।' তাঁর সাথীরা জিজ্ঞেস করেন, 'আর আপনি?'

---

[10] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৪।

তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমিও মাঠে ভেড়া চরাতাম আর মক্কার লোকদের কাছ থেকে এই কাজের জন্য বিনিময় নিতাম।'[11]

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো প্রত্যেক নবীই একজন মেষপালক ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা সব নবীকেই এই কাজটির মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

মেষচালনা থেকে নবীগণ অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

প্রথমত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি হলো দায়িত্ববোধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা সকলেই হলে মেষপালক এবং তোমরা তোমাদের পালের ব্যাপারে দায়িত্ববান।' উদাহরণস্বরূপ, মুসলিমদের জন্য দায়িত্বশীল হলেন তাদের ইমাম, পরিবারের জন্য দায়িত্বশীল পরিবারের কর্তা ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো কিছুর ব্যাপারে বা অন্যের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। একজন নেতার জন্য দায়িত্বশীলতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেতা তার দলের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আল্লাহ্ তাআলা নবীদেরকে উম্মাহর নেতা হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাই তাঁরা তাদের উম্মাহর জন্য হিসাব দিতে বাধ্য থাকবেন।

দ্বিতীয়ত, মেষপালন তাদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। ভেড়াদেরকে মাঠে চরানো একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়। তারা খুবই ধীরস্থির প্রাণী, সময় নিয়ে আস্তে আস্তে সবকিছু করে। পশুপালককেও তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কখনো ভেড়াগুলো নিজেদের মধ্যেই মারামারি লাগিয়ে দেয়, আবার কখনো বা একে অপরের সাথে খেলা করে। কিন্তু মেষপালককে ধৈর্য ধরে সবকিছু লক্ষ রাখতে হয়। সে তাদেরকে এ কথা বলতে পারবে না যে, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোমরা তাড়াতাড়ি করো।' ভেড়ারা তাদের মর্জি অনুযায়ী ঢিলেমি করবে। মেষপালকেরা সাধারণত সকালে বের হয়, আর ফেরে সন্ধ্যাবেলায়, সূর্য অস্ত যাবার সময়।

আল্লাহ তাআলা সকল নবীকে মেষপালকের দায়িত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছেন যেন তাদের মধ্যে ধৈর্যের অনুশীলন গড়ে ওঠে, যেন তাঁরা উম্মাহর ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারেন। নবী মূসার ﷺ সাথে তাঁর উম্মাহর লোকেরা যা করেছিল, তা ছিল রীতিমতো অসহনীয়। এই খুবই দুঃসহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মত চরিত্র গঠনের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েই সবচেয়ে বেশি সময় ধরে মেষপালন করান, দীর্ঘ দশ বছর।

নূহ ﷺ সুদীর্ঘ ৯৫০ বছর দাওয়াহর কাজে ব্যয় করেন, এরপরও তিনি ধৈর্য হারাননি। সকল উপায়ে চেষ্টা চালিয়েছেন,

---

[11] সহীহ বুখারি, অধ্যায় ইজারাহ, হাদীস ৩।

"আমি চেষ্টা করেছি প্রকাশ্যে এবং গোপনে। আমি চেষ্টা করেছি দিনে ও রাতে। আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেক উপায়ে। এবং তারা আমার বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।" (সূরা নূহ, ৭১: ৩)

তৃতীয়ত, সুরক্ষা প্রদান, মেষপালকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো তাদের ভেড়ার পালকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা। ভেড়ার পালে নেকড়ে বা অন্য পশু হামলা করতে পারে, তাদের রোগবালাই হতে পারে। মেষপালক সর্বদাই তাদেরকে এটা নিশ্চিত করে যে তারা সকল প্রকার আশঙ্কামুক্ত। আল্লাহর নবীরাও অনুরূপ। তাঁরা উম্মাহকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেন। একবার মদীনায় রাতে হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হয়। হৈ চৈ শুনে কিছু সাহাবা ﷺ অস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চালিয়ে সবেগে সেখানে শব্দের উৎসের দিকে ছুটে যান। তাঁরা সেখানে পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিমধ্যেই সেখান থেকে ফিরে আসছেন আর তাদেরকে জানালেন সবকিছু ঠিকঠাক আছে।[12] সাহাবীরা ﷺ খুব তাড়াহুড়ো করে সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল ﷺ তাদেরও আগে সেখানে পৌঁছে গিয়ে খোঁজখবর করে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম উম্মাহকে সম্ভাব্য সকল বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন, এমনকি ভবিষ্যতে যেসব বিপদ আসবে যেমন, দাজ্জাল, সে সম্পর্কেও সতর্ক করে গেছেন।

চতুর্থত, দূরদৃষ্টি অর্জন। এই পশুগুলো থাকে মাটির খুব কাছাকাছি এবং তাদের দৃষ্টিসীমা খুবই সীমিত। সামান্য দূরে কী আছে সেটা তারা দেখতে পায় না। চোখের সামনে ছোটোখাটো বস্তুও তাদের দৃষ্টি আটকে দিতে যথেষ্ট। ওপাশে কী আছে তারা বুঝতে পারে না। অন্যদিকে একজন মেষপালকের দৃষ্টিসীমা ভেড়ার তুলনায় বহুগুণে বিস্তৃত, বিপদ আসার অনেক আগেই সে ভেড়াগুলোকে সতর্ক করে দিতে পারে।

নবী এবং তাদের অনুসারীদের বিষয়টিও ঠিক এমন। বিপদ ঘটার আগেই নবীরা তাদের উম্মাহকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন, কেননা তাদেরই আছে অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমার এবং তোমাদের মধ্যে তুলনা হলো এই, আমি আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি এবং তোমরা আগুনের আলো দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছ আর এতে লাফ দিচ্ছ। আমি তোমাদের কাপড় টেনে, তোমাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে সেই আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি আর তোমরা তখন আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য আমার কাছ থেকে নিজেদেরকে ছুটিয়ে নিচ্ছ।'[13]

সাধারণ মানুষের সাথে নবীদের পার্থক্য হলো এই, নবীরা বিপদ আঁচ করতে পারেন কিন্তু আমরা তা পারি না। হতে পারে ভেড়াদেরকে রক্ষা করার জন্য মেষপালক

---

[12] ইবন মাজাহ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৭৭২।

[13] রিয়াদুস স্বলেহীন, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬৩ (মুসলিম)।

তাদেরই কাউকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। তবে এখানে আঘাত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের ভালোর জন্যই আঘাত করাটা দরকার। তাই যখনই আল্লাহর নবীগণ উঠে দাঁড়ান আর মানুষকে কঠিনভাবে সতর্ক করেন, তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা খুব রুঢ় কিংবা আবেগবর্জিত। বরং প্রকৃতপক্ষে তারা উম্মাহর ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান। রাসূল ﷺ একদিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করছি।' হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, নবীজির ﷺ কণ্ঠস্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, বাজারের লোকেরা পর্যন্ত মসজিদ থেকে রাসূলের ﷺ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল।

পঞ্চমত, সাধারণ জীবনযাপন। মেষপালকদের জীবন সহজ, সরল, সাদাসিধে। তার তেমন কোনো বিষয়পত্র নেই। মার্সিডিজ বেনজ, টেলিভিশন কিংবা ফ্রিজ নেই। যদি সে ধনী ব্যক্তিও হয়, মেষ চড়ানোর সময় বিলাসি জিনিসগুলো সঙ্গে নেওয়ার সুযোগ নেই। তাদেরকে হালকাভাবে চলাফেরা করতে হয় যাতে পশুদের দেখাশোনা করা যায়। তারা খুব সাধারণ খাবার খায় এবং তাদের বাসস্থানও বৈচিত্র্যহীন। সাদেকী জীবন যাপন তাদের বৈশিষ্ট্য, আর নবীদের ক্ষেত্রেও তা-ই।

ষষ্ঠত, মেষপালনের অভ্যাস মানুষকে বিভিন্ন পরিবেশে মানিয়ে নিতে শেখায়। রৌদ্রতপ্ত গরম, মুষলধারে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া বা জমে যাওয়া ঠাণ্ডাতেও মেষপালককে প্রথমে তার পশুপালকে রক্ষা করতে হয় এবং সবশেষে নিজেকে সামলাতে হয়। রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনেক ভ্রমণ করতে হতো, দাওয়াহ এবং জিহাদের জন্য বিভিন্ন রকম আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সপ্তমত, আল্লাহর সৃষ্টির কাছাকাছি থাকা। এটা মানুষকে পৃথিবীর কৃত্রিমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, প্রকৃতির নির্মলতার কাছাকাছি নিয়ে যায়। যখন কেউ মরুভূমিতে আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে পড়ে থাকে, তা তাকে মেকি দুনিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কৃত্রিমতাপূর্ণ জীবন যাপন করতে করতে মন ও মগজে, চিন্তায়-চেতনায় একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়। ইট-পাথরের এই পৃথিবীতে প্রায় সবকিছুই কৃত্রিম, সবকিছুই সৃষ্টির স্বাভাবিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে, প্রকৃতি মানুষের অস্তিত্বে মিশে আছে। এই কৃত্রিমতাভরা পৃথিবী মানুষকে আল্লাহর বিশাল সৃষ্টির ব্যাপারে উদাসীন করে রাখে। সে সাধারণভাবে চিন্তা করতে ভুলে যায়। দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার অনেক সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন। সূর্য, চাঁদ, তারা, জান্নাত, পাহাড়-পর্বত, নদী, গাছপালা, গরু, মশা, মেঘ, বৃষ্টি কত কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আল্লাহর সৃষ্টি হচ্ছে আয়নার মতো, যেখানে আল্লাহর গুণগুলো প্রতিফলিত হয়। আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকানোর মত করে তাকালেই আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা যায়। একজন নবী এভাবেই আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন।

নবীগণ মেষপালক হওয়ার মাধ্যমেই এমন দরকারি সব শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। উট, গরু বা ছাগল নয়, তাঁরা ছিলেন মেষ পালক। উট বা গরুর তুলনায় ভেড়া অনেক বেশি দুর্বল। সহজেই শিকারীর ফাঁদে পড়ে। তাদের জন্য প্রয়োজন অত্যধিক যত্ন ও সুরক্ষা। শয়তানের ব্যাপারে মানুষ এই ভেড়াগুলোর মতোই দুর্বল। শয়তান মানুষকে অতি সহজেই প্রলুব্ধ করতে পারে, আক্রমণ করতে পারে। রাসূল ﷺ যখন শয়তান হতে সাবধান করতে চাইতেন, তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেন, 'তোমরা দলবদ্ধভাবে থাকো, কারণ নেকড়ে দলছুট ভেড়াকেই কামড়ে খায়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ মেষপালনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন নেকড়ে কেবলমাত্র সেই ভেড়াকেই আক্রমণ করে যে দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে, পুরো দলকে সে কখনো আক্রমণ করে না।

এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ভেড়ার পালকরা সাধারণত উট বা অন্যান্য পশুপালকের চেয়ে বেশ আলাদা স্বভাবের হয়। ভেড়ারা নরম-প্রকৃতির প্রাণী, স্নেহের কাঙাল। তাদেরকে দয়া-মায়া দিয়ে পালতে হয়, কঠোর আচরণ করা যায় না। এমনি করে মেষপালকেরাও খুব সদয় ও দয়ালু হওয়ার শিক্ষা পায়। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে মেষপালনের অনুশীলন করান যেন তাঁরা তাদের অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেন।

মেষ বা ভেড়ার ক্ষেত্রে যেমন, উটের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটা সত্যি। উট খুবই উদ্ধত প্রাণী। উটের প্রতি নরম হলেই সে সরলতার সুযোগ নেবে। উটকে তাই খুব কঠোরভাবে শাসন করতে হয়, এ কারণে উট পালকরা রুঢ় আর কর্কশ স্বভাবের হয়।

মানুষ তার পেশা দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিক্ষকদের আচরণ পিতৃসুলভ হয়ে থাকে। ডাক্তাররা তাদের লেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আবার অন্যভাবে বলা যায়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব মানুষের পেশাকে প্রভাবিত করে, কারণ মানুষ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পেশা নির্বাচন করে আর সেই পেশা বেছে নেওয়ার ফলে তার ওই বৈশিষ্ট্যগুলো আরো প্রকটভাবে তার মাঝে বিকশিত হয়। মুসলিমদের তাদের কাজের ধরন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মাথায় রাখতে হবে যে, তাদের পেশা ও কাজ তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে।

ইবনে হাজার ছিলেন সালাফ আস-সলেহীনদের সময়কার একজন প্রসিদ্ধ আলিম। তিনি তাঁর হাদীসের শারহ (ব্যাখ্যা) নিয়ে লেখা বই, "ফাতহ আল-বারি"–তে উল্লেখ করেন,

"নবুওয়াতের পূর্বে নবীদের মেষপালক হিসেবে কর্মরত থাকার পেছনে হিকমাহ হলো, তারা পশুর পালকে চালাতে দক্ষতা অর্জন করতেন, কেননা পরবর্তীতে তাদেরকে নিজ নিজ জাতির পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। পশুপালন একজন মানুষকে সহনশীল ও দয়ালু হওয়ার শিক্ষা দেয়, ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যখন একজন মেষপালক তার পশুর পালকে এক স্থানে জড়ো করে, কিংবা পুরো পালকে এক জায়গা থেকে আরেক

জায়গায় নিয়ে যায়; তখন তাকে তাদের সকলের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। সেই সাথে নজর রাখতে হয় যেন কোনো শিকারী পশু তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। এমনি করে সে একটি জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে। ভেতর-বাহির সবরকম শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। মেষপালক হওয়ার মাধ্যমে এভাবেই নবীরা তাদের জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করা শিখেছেন, বিভিন্ন ঘরানার মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে শিখেছেন, আর শিখেছেন দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে আর ক্ষমতাসীনদের গুঁড়িয়ে দিতে। আল্লাহ কেন গরু বা উটের বদলে ভেড়ার পালক হিসেবে তাঁর নবীদেরকে নিয়োজিত করেছেন? এর কারণ হলো ভেড়ারা খুবই দুর্বল প্রাণী। তাদের অতিরিক্ত যত্ন ও দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য পশুর তুলনায় ভেড়ার পালকে সামলে রাখা অত্যন্ত কঠিন। কেননা তারা খুব সহজেই এদিক-ওদিক হেঁটে হারিয়ে যেতে পারে। আর সমাজে মানুষের অবস্থানও ঠিক একই রকম। আর তাই এটা মহান আল্লাহর আযযা ওয়াজালের পরম প্রজ্ঞা যে তিনি নবী-রাসূলদেরকে একইভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।"

সমসাময়িক আরেকজন লেখক এক্ষেত্রে মন্তব্য করেন,

"দ্বীন ইসলাম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে সেইসব চিন্তাবিদ, নির্ভীক, মেধাবী মানুষদের দ্বারা, যারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। দুশ্চরিত্র মানুষদের সাথে থেকে কেউ ইসলামকে নিজের মাঝে ধারণ করতে পারে না। মুসলিমদের জন্য এটা খুবই জরুরি যে তারা মানুষের স্বভাবজাত সৎগুণকে নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করবে। এর প্রমাণ রয়েছে খলিফা উমার ইবন খাত্তাবের জীবনে, তিনি লোকদেরকে কষ্টসহিষ্ণু এবং কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হতে শেখান । চলন্ত ঘোড়ায় উঠতে বলেন। এটা এজন্য যেন লোকজন দীর্ঘ (আরাম-আয়েশের) জীবনের আকাঙ্ক্ষা না করে এবং বদঅভ্যাস (যেমন আলস্য) যেন তাদের পেয়ে না বসে। এর মানে এই নয় যে শহুরে জীবন ছেড়েছুঁড়ে চলে আসতে হবে। বিষয়টা হলো, সেসব (দুনিয়াবী) বিষয় ত্যাগ করতে হবে যেগুলো নিজের মাঝে থাকলে ইসলামের জন্য কষ্ট স্বীকারের ইচ্ছেটুকু নষ্ট হয়ে যায়।"

এই মন্তব্যটি রাসূলুল্লাহর ﷺ পেশা হিসেবে মেষপালন বেছে নেওয়া এবং প্রাথমিক জীবনে তাঁর মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা নিয়ে। এই কাজগুলোর ফলে রাসূলুল্লাহর ﷺ মধ্যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের অভ্যাস গড়ে ওঠে। নবুওয়াতের মিশনের জন্য তাঁকে উপযুক্ত করে তোলে। রাসূলুল্লাহর ওফাতের কয়েক বছর পর তাঁর সাহাবি উমার যখন খলিফা, এই বিশ্বের সেরা জিনিসগুলোর কর্তৃত্ব হাতের মুঠোয় নিয়ে বসা, তখনও তিনি সেসব স্পর্শ করেন নি। খুব সহজ-সরল-সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, মুসলিমদেরও সতর্ক করেছেন তারা যেন আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত না হয়ে রুক্ষ ও কঠোর জীবনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়। ইসলাম এমনই এক দ্বীন, এমনই এক বার্তা, যা মেনে চলতে গেলে মু'মিনকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আর তাই প্রস্তুত থাকতে হবে। নাহয় সামান্য চাপেই সে বেসামাল হয়ে পড়বে।

দাওয়াহ ইসলামের এমন একটি ইবাদাহ যার জন্য কষ্ট স্বীকারের মানসিকতা থাকা চাই। একজন দাঈ যদি কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার ইচ্ছা ও ধৈর্যধারণ করতে না পারেন, তাহলে তিনি কখনোই আন্তরিকতার সাথে মন-প্রাণ দিয়ে দাওয়াতের কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে পারবেন না।

হিলফুল ফুদুল

রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রাথমিক জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো 'হিলফুল ফুদুল' চুক্তি।

এর পেছনের একটা গল্প আছে। ইয়েমেনের যাবিদ নামের এক এলাকা থেকে একজন লোক ব্যবসা করতে মক্কায় আসে। তার ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী সাহম গোত্রের এক স্বনামধন্য ব্যক্তি আল আস ইবন ওয়াইল কিনে নেয়, টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞাও করে। কিন্তু কিছু সময় পর গড়িমসি আরম্ভ করে। লোকটাকে পাওনা বুঝিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইয়েমেনি লোকটি মক্কায় ভিনদেশী, আল-আস আশা করেছিল যে লোকটি কিছুদিনের মধ্যে চলে যাবে, সেই সুযোগে আল-আস তার টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা করে।

কিন্তু ইয়েমেনি লোকটি এত সহজে চলে গেল না। সে হক আদায় না করে নড়বে না। মক্কায় মানুষের ভীড়ের মাঝে গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা শুরু করলো। 'হে মক্কাবাসী, আমি তোমাদের দেশে এসে যুলুমের শিকার হয়েছি, অন্যায়ের শিকার হয়েছি, হে লোকসকল, তোমরা কে আছ যে আমার পাশে দাঁড়াবে, তোমরা কি তোমাদের দেশে এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে?' তার আবেগী কথা শুনে কুরাইশের কিছু গোত্র জড়ো হয়ে একটা চুক্তি করলো। চুক্তির কথা ছিল, মক্কার দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষদের অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

চুক্তিতে অংশ নেওয়া গোত্রগুলোর একটি ছিল নবীজির ﷺ পরিবার। নবীজি ﷺ সেই সময় কিশোর, কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তাঁকেও সভায় নিয়ে যান। সভা অনুষ্ঠিত হয় আবদুল্লাহ ইবনে জাদানের বাড়িতে। সে ছিল খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার। তার সম্মানে সে বাড়িতেই তারা সভার আয়োজন করলো। সভায় চুক্তি হলো যে, তারা সকলে একত্রিত হয়ে মজলুমদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হবে। এ ঘটনা নবুওয়াতের আগেই ঘটেছিল আর চুক্তিটাও মুশরিকদের মধ্যকার একটি চুক্তি। রাসূল ﷺ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে জাদানের বাড়িতে যে চুক্তি সম্পাদিত হলো, আমি এক পাল ভালো পশুর বিনিময়ে হলেও সেই চুক্তিতে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। আর যদি ইসলামের পরে এমন ঘটনা ঘটতো তখনও আমি বিষয়টিকে স্বাগত জানাতাম।'

অর্থাৎ যদি ইসলাম আসার পরে এমন কোনো চুক্তি করার সুযোগ আসতো, রাসূল ﷺ সেই চুক্তিতে সানন্দে অংশ নিতেন, এমনকি যদি এই ধরনের চুক্তি কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তবুও। এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে, তা হলো, মুসলিমরা সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে, চাই সেই ন্যায় একজন মুসলিমের পক্ষে বা কোনো অমুসলিমের পক্ষে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মুসলিমরা হকের পক্ষ, নিপীড়িত মানুষের পক্ষ, মজলুমের পক্ষাবলম্বন করবে।

মুহাম্মাদ ﷺ মারা যাওয়ার অনেক বছর পরে একটি ঘটনার সূত্র ধরে আবারো হিলফুল ফুদুল এর নামটি চলে আসে। ঘটনাটা ঘটেছিল হুসাইন ইবন আলী ইবনে আবু তালিব ؓ এবং আল ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে। ওয়ালিদ ছিল মদীনার গভর্নর, সে তার ক্ষমতার জোরে অন্যায়ভাবে হুসাইনের কিছু সম্পত্তি নিয়ে দখল করে নেয়। হুসাইন ؓ ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বললেন, 'শোনো, হয় তুমি আমার প্রাপ্য আমাকে ফেরত দিবে নয়তো আমি মসজিদের দিকে গিয়ে হিলফুল ফুদুলের ঘোষণা দিব। লোকদেরকে আমি হিলফুল ফুদুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিব।'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ؓ সে সময় ওয়ালিদের সাথেই ছিলেন। হুসাইনের মুখে হিলফুল ফুদুলের কথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'তবে আমিও আল্লাহর নামে শপথ করছি, যদি হুসাইন হিলফুল ফুদুলের ডাক দেয়, আমি আমার তরবারি উন্মুক্ত করবো এবং তার পক্ষ নেব। যতক্ষণ সে ন্যায় বিচার না পাচ্ছে, আমরা যুদ্ধ করতে থাকবো। সে ন্যায়বিচার পেলে তবেই আমরা থামবো, নতুবা যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবো।'

এই কথা পরে আরও কিছু মানুষের কানে গেল। তারাও উত্তেজিত হয়ে একই রকম বিবৃতি দিলো। ওয়ালিদ বুঝলো পরিস্থিতি মোটেও সুবিধার নয়, তাই সে তড়িঘড়ি করে হুসাইনের প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেয়। এই ঘটনার শিক্ষণীয় দিক হলো– মুসলিমরা কখনো কারো প্রতি জুলুম সহ্য করে না। তৎকালীন সময়ে মুসলিমরা একজন মুসলিম নেতা ওয়ালিদ ইবনে উকবার অধীনে ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যেই বসবাস করতো, তবুও তারা হকের জন্য তাদের নেতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ।

শাইখ মুহাম্মাদ গাজ্জালী এই ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'এই চুক্তি (হিলফুল ফুদুল) আমাদের সামনে একটি বিষয় তুলে ধরে, রাত যত গভীর হোক না কেন, শাসক যতই অত্যাচারী হোক না কেন, উন্নত চরিত্র সবসময়ই কিছু না কিছু মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। তারা সুবিচার এবং ন্যায়ের জন্য উঠে দাঁড়াবে। আল্লাহ তাআলা ভালো কাজে সহযোগিতা করাকে একজন মুসলিমের উপর একান্ত কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।'

"...সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর।

নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা মায়িদা, ৫: ২)

যে কোনো মুসলিম দলের জন্য হিলফুল ফুদুল বা এ ধরনের কোনো চুক্তিতে অংশগ্রহণ বৈধ, কেননা, এ সকল চুক্তির আসল উদ্দেশ্যই হলো জুলুমের অপসারণ যা পালনের মাধ্যমে ইসলামি একটি দায়িত্বের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়। মুসলিমদের জন্য অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের সাথে যুলুমের অপসারণ কিংবা যালিমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার উদ্দেশ্যে চুক্তি করা বৈধ, যদি সেখানে ইসলামের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য কোনো কল্যাণ থেকে থাকে। যেহেতু রাসূল ﷺ ইসলামের আগমনের পরেও এই ধরনের চুক্তিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, সুতরাং তা মুসলিমদের জন্যেও বৈধ।

নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন

খাদিজার ﷺ সাথে বিয়ে

যুবক বয়সে নবীজির ﷺ জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো খাদিজার ﷺ সাথে বিয়ে। খাদিজা ﷺ মক্কার বিখ্যাত এক নারী, সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা। তাঁর আগেও বিয়ে হয়েছিল। খাদিজার ﷺ নিজস্ব ব্যবসা ছিল। সে সময় ব্যবসার কাজে প্রায়ই ইয়েমেন ও সিরিয়া যাতায়াত করা লাগতো। তিনি ব্যবসার কাজ সামলাবার জন্য বিভিন্ন লোক ভাড়া করতেন, নিজে ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা করতেন না। কুরাইশের লোকেরা শীত ও গ্রীষ্মে বছরের দুই সময়ে সফরে বের হতো একবার ইয়েমেনে, আরেকবার শামে। আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল মক্কার সে সময়ের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

> **"কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্য,
> শীত ও গ্রীষ্ম সফরে তাদের নিরাপত্তার জন্য।" (সূরা কুরাইশ, ১০৬: ১-২)**

নবীজির ﷺ সততা ও সত্যবাদিতার কথা তখন মক্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর কথা শুনে খাদিজা ﷺ তাঁকেই ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করলেন। মুহাম্মাদ ﷺ যখন শামে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন, খাদিজা ﷺ তাঁর দাস মায়সারাহকে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। তাঁরা দুজন শামে ব্যবসা শেষ করে ফিরে এলেন।

মায়সারাহ খাদিজার ﷺ কাছে তাদের সফরের বর্ণনা দিতে এসে মুহাম্মাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেন, 'এই মানুষটার সততা ও বিশ্বস্ততা মুগ্ধ হওয়ার মতো!' খাদিজা ﷺ নবীজির ﷺ কথা যত শুনছেন, ততই তাঁর প্রতি আগ্রহ বোধ করছেন। নবীজির ﷺ চারিত্রিক গুণাবলি এমনই ছিল যে সবাইকে টানতো। খাদিজা ﷺ, মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা, এক সাধারণ কর্মচারীর অসাধারণ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজার ﷺ প্রস্তাব মেনে নিয়ে বিয়ের জন্য সম্মতি জানালেন। বিয়ের সময় নবীজির ﷺ বয়স ছিল পঁচিশ, আর খাদিজার ﷺ বয়স ছিল চল্লিশ। দুজনের বয়সের পার্থক্য পনেরো বছর, কিন্তু বয়সের এই সুবিশাল ফারাক তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো আঁচ ফেলতে পারে নি।

খাদিজার ﷺ অনন্যতা

খাদিজা ﷺ বেঁচে থাকা অবস্থায় নবীজি ﷺ আর কোনো বিয়ে করেননি। নবীজির ﷺ বেঁচে থাকা সন্তানদের প্রত্যেকেই ছিলেন মা খাদিজার ﷺ সন্তান। তাদের ছয় সন্তান– যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা, আল কাসিম আর আবদুল্লাহ। কেবল ফাতিমা বাদে বাকি সবাই নবীজির ﷺ জীবদ্দশাতেই মারা যান। ফাতিমা ও আলী ﷺ

থেকেই নবীজির ﷺ বংশের ধারা প্রবাহিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজাকে ﷺ প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। খাদিজার ﷺ সাথে তাঁর বন্ধন, বিশ্বাস, প্রতিশ্রুতি মৃত্যুর পরেও ভাঙেনি। তিনি সবসময় তাঁকে মনে করতেন, তাঁর কথা বলতেন। আর এজন্য নবীজির ﷺ অন্য স্ত্রীরা মৃত খাদিজাকে ﷺ নিয়েও ঈর্ষা বোধ করতেন! তবুও নবীজিকে ﷺ খাদিজার ﷺ স্মরণ থেকে থামানো যেতো না। খাদিজার ﷺ জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ভালোবাসা, আকর্ষণ, মমতা ও সম্মান ছিল সবচাইতে বেশি। কারণ তিনি খাদিজাকে ﷺ সবসময় নিজের পাশে পেয়েছেন। যখন সবাই রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তখন সান্ত্বনা আর আশ্বার কথা শুনিয়েছেন খাদিজা ﷺ। তিনি নবীজিকে ﷺ পরম মমতায় আগলে রেখেছিলেন।

খাদিজার ﷺ পর নবীজির ﷺ সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন আ'ইশা ﷺ। কিন্তু এই আ'ইশাও ﷺ খাদিজার ﷺ প্রতি ঈর্ষা বোধ করতেন। বুখারি ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, আ'ইশা ﷺ বলেন, 'আমি খাদিজা ছাড়া নবীজির ﷺ আর কোনো স্ত্রীকে নিয়ে এতটা ঈর্ষা অনুভব করিনি! এটা এজন্য নয় যে আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি, বরং এটা এজন্য যে নবীজির ﷺ তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন।'[14]

নবীজি ﷺ মাঝে মাঝে একটা ভেড়া জবাই করে বলতেন, 'এই ভেড়ার মাংস খাদিজার ﷺ বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দাও।' নবীজি ﷺ যে কেবল খাদিজার ﷺ নাম বারবার উল্লেখ করতেন তাই নয়, তিনি খাদিজা ﷺ মারা যাবার পরেও তাঁর বান্ধবীদের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রেখেছেন। এটা তিনি করতেন খাদিজার ﷺ প্রতি ভালোবাসা থেকে। এমনটা করতে দেখে আইশা বেশ ঈর্ষা বোধ করতেন, একদিন বলেই ফেললেন, 'শুধু খাদিজা আর খাদিজা!' তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'মহান আল্লাহ তাআলাই আমার অন্তরে খাদিজার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন।'[15] এই ভালোবাসার নিয়ন্ত্রণ রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে ছিল না, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলাই তাঁর অন্তরে খাদিজার ﷺ জন্য বিশেষ স্থান তৈরি করে দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে, আ'ইশা ﷺ বলেন, 'এমন অনেক দিন হয়েছে যে, খাদিজার প্রশংসা না করে নবীজি ﷺ ঘর থেকে বের হোন নি! একদিন এভাবে তিনি খাদিজার প্রশংসা করছিলেন। আমি আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলাম, 'তিনি কী এমন ছিলেন? তিনি তো একজন বয়স্ক মহিলা মাত্র। তাঁর চেয়েও উত্তম নারী দিয়ে কি আল্লাহ তাআলা আপনার স্ত্রীর স্থান পূরণ করে দেননি?'

---

[14] তিরমিযী, অধ্যায় তাকওয়া এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা, হাদীস ১২৩।

[15] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ১০৮।

এ কথা শোনামাত্র নবীজি ﷺ রেগে যান। রাগত স্বরে বলেন, 'না, আল্লাহর শপথ, তিনি খাদিজার চাইতে উত্তম আর কাউকেই আমার জীবনে আনেননি। যখন সবাই আমাকে অস্বীকার করেছে, তখন সে আমার ওপর আস্থা রেখেছে। যখন সবাই আমাকে মিথ্যুক ডেকেছে, তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছে। যখন সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন সে, তাঁর সবকিছু দিয়ে আমাকে স্বস্তি দিয়েছে। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে আমার ওপর রহমত দিয়েছেন, আমাকে তাঁর থেকে সন্তান দান করেছেন।'

কেউ খাদিজার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করামাত্র নবীজি ﷺ রেগে যেতেন। নবীজির ﷺ চরিত্রের এই দিকটি থেকে একটি ব্যাপার বোঝা যায়, আর তা হলো–আপন মানুষদের জন্য নবীজির ﷺ কদর। তিনি সবসময় তাদেরকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। খাদিজা رضي الله عنها মারা যাবার বহুবছর পরেও তিনি তাঁকে স্মরণ করতেন। হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব, মুসআব ইবন উমাইর, খাদিজা رضي الله عنها –এদের সবাইকে তিনি স্মরণ করতেন। মৃত্যুর ঠিক আগে নবীজি ﷺ একটি কাজ করেছিলেন। তিনি উহুদের শহীদ সাহাবাদের رضي الله عنهم কবর যিয়ারত করতে যান। নবীজির ﷺ ৭০ জন সঙ্গী সেই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। তাই যখনই নবীজি ﷺ বুঝতে পারেন যে, তাঁর হাতে আর বেশিদিন বাকি নেই, তিনি সেখানে গিয়ে তাদের সবার জন্য দুআ করলেন, এবং দুআর মাঝে বললেন, 'শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে।'

নবীজি ﷺ তাদেরকে অসম্ভব ভালোবাসতেন, নিজের পাশে তাদের অভাব অনুভব করতেন। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করেন, যেন আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁকে তাদের সাথে মিলিত করে দেন। তিনি তাঁর কোনো সঙ্গীকে ভুলে যাননি। তাদেরকে আজীবন স্মরণ রেখেছেন। তেমনি করেই মনে রেখেছেন নিজের স্ত্রী খাদিজার رضي الله عنها কথা, যিনি তাঁর দুঃসময়ের সঙ্গী। তিনি নিয়মিত খাদিজার رضي الله عنها জন্য দুআ চাইতেন, ঘুরেফিরে তাঁর কথাই বলতেন।

খাদিজা رضي الله عنها আসলেই ছিলেন একজন বিশেষ ব্যক্তি। তিনি বেঁচে থাকতে একবার জিবরীল عليه السلام নবীজির ﷺ কাছে এসে বললেন, 'এখন খাদিজা আপনার কাছে আসবেন। তিনি আপনার খাবার নিয়ে আসছেন। যখন তিনি আসবেন, তাঁকে বলবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সালাম দিয়েছেন। সেই সাথে বলবেন যে, আমিও তাঁকে সালাম জানিয়েছি।'

খাদিজার رضي الله عنها মর্যাদা এতোটাই অসামান্য ছিল যে স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে সালাম দেওয়ার জন্য জিবরীলকে عليه السلام পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর জিবরীল عليه السلام নিজের পক্ষ থেকেও তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। এরপর জিবরীল عليه السلام বলেন, 'খাদিজাকে জান্নাতের বাড়ির সুসংবাদ দিন!'

খাদিজা رضي الله عنها হলেন জান্নাতী রমণী। পৃথিবীর বুকে সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন চারজন নারীর একজন হলেন মা খাদিজা رضي الله عنها। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুনিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ নারী

চারজন। মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ এবং আসিয়া ইবন মুযাহিম।' এই চারজনের মাঝে সেরা হলেন, মারইয়াম ﷺ। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সূরা আলে-ইমরানে বলেন,

> **"আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৪২)**

এরপর দ্বিতীয় স্থানে আছেন খাদিজা ﷺ। তারপর ফাতিমা ﷺ এবং চার নম্বরে আসিয়া বিনতে মুযাহিম ﷺ। এই চারজনের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের মাঝে দুইজন ছিলেন নবীদের মা বা নবীদের বড় করেছেন– মারইয়াম এবং আসিয়া। মারইয়াম ছিলেন নবী ঈসার ﷺ মা আর আসিয়া ﷺ নবী মূসাকে ﷺ লালনপালন করেন। খাদিজা ﷺ ছিলেন একজন নবীর স্ত্রী এবং ফাতিমা একজন নবীর কন্যা।

এই চার নারীর মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

এক, তাদের নিরেট ঈমান। তাদের ঈমান ছিল শক্তিশালী। অন্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে কোনোকিছুই হৃদয়ে সন্দেহের জন্ম দিতে পারতো না। তাদের প্রবল ঈমানকে টলাবার সাধ্য কারো ছিল না। তাদের ঈমান মূলত ইয়াকীনের পর্যায়ে ছিল। দেখা জগতের তুলনায় অদেখা জগৎটার প্রতিই তাদের বিশ্বাস ও আস্থা বেশি ছিল–যে গায়েবকে তারা কখনও দেখেননি বা শোনেননি, সেই "গায়েব" জগৎটাই ছিল তাদের বেশি প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত।

যেমন ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া ﷺ, তাঁর কী-ই না ছিল! একজন নারী দুনিয়ার যা কিছু চাইতে পারে সে সবই তাঁর ছিল। সম্পদ, ক্ষমতা, 'টাকাওয়ালা' স্বামী, ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য নিয়োজিত চাকর-চাকরানীর দল। অথচ তিনি এ সবকিছু আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে চমৎকার এক স্থানে, রানীর হালে থাকার সুযোগ দিয়েছেন আর আসিয়া ﷺ বলেছেন তিনি এসবের কিছুই চান না, তিনি চান কেবল জান্নাতের একটি ঘর।

> **"আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের জন্যে ফির'আউনের স্ত্রীর এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলেছিল, হে আমার রব, আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরআরউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ১১)**

আসিয়া ﷺ দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব চাননি। তিনি ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে মুক্তি

চেয়েছেন। এটাই দেখিয়ে দেয় তার ঈমান কত প্রবল, কত গভীর। অত্যন্ত নীতিহীন এবং কলুষিত সমাজের একজন বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ সব কিছু থেকে নিজেকে পবিত্র রেখেছিলেন এবং তাঁর হৃদয়কে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। বাকি তিন জন নারীর ক্ষেত্রেও তা বলা যায়।

দুই, তাদের সবার মধ্যে দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় তা হলো তারা প্রত্যেকে ছিলেন ভালো স্ত্রী বা ভালো মা। নারীবাদীরা এ বিষয়টি ভালো চোখে নাও দেখতে পারে। এই চার নারী কিন্তু তাদের ক্যারিয়ার, সংস্কার কার্যক্রম, আন্দোলন কিংবা জ্ঞানের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি। আসিয়া ﷺ এবং মারইয়াম ﷺ এই দুইজনের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিল দুই শ্রেষ্ঠ নবী, মূসা ﷺ এবং ঈসা ﷺ। খাদিজার ﷺ অনন্যতার পেছনে রয়েছে তাঁর স্বামী নবী মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থন। তিনি বড় ব্যবসায়ী ছিলেন সত্যি, তবে এজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ নন, তিনি শ্রেষ্ঠ কারণ–যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি তাঁর স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে স্বস্তি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে মা খাদিজা ﷺ ছিলেন একজন চমৎকার স্ত্রী।

ফাতিমাও ﷺ এমন একজন ব্যতিক্রমী স্ত্রী। একবার আলী ﷺ শুনলেন রাসূল ﷺ কিছু দাস পেয়েছেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী ভাবলেন নবীজির ﷺ কাছে একটা দাস চাইবেন। নবীজিকে ﷺ ঘরে পাওয়া গেল না, তারা মা আ'ইশার ﷺ কাছে বিষয়টি জানিয়ে ফিরে আসেন। রাসূল ﷺ ঘরে ফিরে সব কথা শুনলেন। আলী ও ফাতিমার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

এই হাদীসটি আলী ইবন আবি তালিব ﷺ নিজে বর্ণনা করেছেন, তাঁর ভাষায়–

"নবীজি ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। আমরা তখন শুয়ে ছিলাম। তাঁকে দেখামাত্র আমরা শোয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূল ﷺ বললেন, যেমন ছিলে থাকো। তিনি এসে আমার আর ফাতিমার মাঝে বসলেন, আমরা দুজনেই তাঁর গা ঘেষে বিছানায় শুয়ে আছি।"
রাসূল ﷺ তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে এত ভালবাসতেন যে তিনি একবার বলেছিলেন, 'ফাতিমা আমারই অংশ, কেউ যদি তাঁকে কষ্ট দেয়, সে আমাকেও কষ্ট দেয়। কেউ যদি তাঁকে আনন্দ দেয়, তাতে আমিও আনন্দিত হই।' রাসূলুল্লাহর ﷺ সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমাই বেঁচে ছিলেন আর তিনি তাঁকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর মেয়ের জন্য সবচেয়ে ভালোটাই চাইতেন। তিনি চাইলেই পারতেন একজন ভৃত্য তাদের ঘরে নিযুক্ত করতে, কিন্তু তিনি তা করেননি।

তিনি বললেন, "তোমাদের দেওয়ার জন্য দাস থেকেও ভালো কিছু আমার কাছে আছে। তোমরা রাতে ঘুমুবার আগে, সুবহানআল্লাহ তেত্রিশ বার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার এবং আল্লাহু আকবর তেত্রিশ বার করে পড়বে। এটা তোমাদের জন্য

একটা ভৃত্য রাখা অপেক্ষা উত্তম।" রাসূল ﷺ জানতেন তাঁর কন্যা হচ্ছেন সেরাদেরও সেরা। তিনি জানতেন কাজ করতে করতে ফাতিমার হাতগুলো রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল, তিনি জানতেন তাঁর হাতের চামড়াগুলো খসখসে হয়ে গিয়েছিল, তারপরেও তিনি তাঁকে তাসবীহ্ উপহার দিয়েছিলেন, ভৃত্য নয়।

আলী ইবন আবি তালিবের ﷺ থেকেই তাঁর স্ত্রীর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'ফাতিমা খুবই কঠোর পরিশ্রম করতেন, যাঁতাকলে কাজ করার কারণে ওঁর হাত রুক্ষ, খসখসে হয়ে যায়। কুয়া থেকে পানি তুলতে তুলতে ওঁর ঘাড়ে দাগ পড়ে যেতো, ঘর পরিষ্কার করতে করতে ওঁর পোশাক ময়লা হয়ে পড়ত।' এই ছিল পৃথিবীর সেরা মানুষটির কন্যার অবস্থা। আর এর কারণেই তিনি ছিলেন চার সেরা নারীর একজন। জ্ঞান বা মেধার বিবেচনায় আ'ইশা ﷺ ছিলেন খাদিজা ﷺ ও ফাতিমার ﷺ থেকে অনেক অনেক এগিয়ে, তথাপি তিনি ফাতিমা বা খাদিজার ﷺ সমান সম্মাননা অর্জন করেননি।

নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন নিয়ে সমালোচনার জবাব

নবীজি ﷺ প্রথম বিয়ে করেছিলেন পঁচিশ বছর বয়সে। ন্যায়নীতিহীন একটি সমাজে থেকেও এই পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি সৎ ও পবিত্র হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। নবুওয়াত পাওয়ার আগেও তাঁর জীবনে নারীঘটিত কিছু ছিল না। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষীরা নবীজির ﷺ নামে নানারকম কুৎসা রটনা করেছে, তারা নবীজির ﷺ বিয়েকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। আ'ইশাকে অল্পবয়সে বিয়ে করা, বারো জন স্ত্রী রাখা – এসব নিয়ে তারা নবীজিকে ﷺ নিয়ে নানারকম অপবাদ দেয়। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে মুসলিমদের সঠিক ধারণা রাখা অত্যন্ত জরুরি।

প্রথমত, নবীজির ﷺ জীবনকালে মক্কার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। নারী-পুরুষের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক, মেলামেশা, ব্যভিচার এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আ'ইশা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায় যে, সেই সময় নারী-পুরুষের মাঝে চার ধরনের সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। একটা ছিল এখনকার সাধারণ বিয়ের মতো। দ্বিতীয় প্রকার ছিল পতিতাবৃত্তি – মক্কায় কিছু বাড়ির ওপর বিশেষ ধরনের চিহ্ন থাকতো, এগুলো ছিল পতিতালয়। তৃতীয় সম্পর্ক ছিল এমন, একজন নারী দশজন পুরুষের সাথে এক এক করে শয্যাশায়ী হবে, এরপর গর্ভধারণ করলে, তার ইচ্ছা মতো তাদের যেকোনো একজনের দিকে নির্দেশ করবে এবং সেই লোককেই বাচ্চার সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে নিতে হবে। চতুর্থ ধরনের সম্পর্ক ছিল এমন, একজন লোক তার স্ত্রীকে অভিজাত ঘরের কোনো লোকের সাথে যিনা করার জন্য পাঠাবে, যাতে করে তাদের সন্তান উন্নত বংশের হয়। এরকম নীতিবিবর্জিত সমাজে থেকেও নবীজি ﷺ নারীদের সাথে কোনো সম্পর্কে জড়াননি। পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন কুমার।

দ্বিতীয়ত, পঁচিশ বছর বয়সে এসে তিনি বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় এমন একজন নারীকে বেছে নেন, যিনি ছিলেন তাঁর চাইতে পনেরো বছরের বড়। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত মহিলা। নবীজি ﷺ উচ্চবংশের যুবক ছিলেন, চাইলেই নিজের জন্য মক্কার যেকোনো নারীকে বাছাই করতে পারতেন। তিনি চাইলেই নিজের চেয়ে ছোট অল্প বয়সী কোনো তরুণীকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি এমন একজন নারীকে বিয়ে করলেন যিনি তার চেয়েও পনেরো বছরের বড়।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজার ؓ সাথে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত সংসার করেন। একজন পুরুষ যুবক বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্তই সাধারণত নারীদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই বয়সটাতে পুরুষের চাহিদা থাকে সর্বাধিক। কিন্তু নবীজি ﷺ তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত কেবলমাত্র এক স্ত্রী নিয়েই সংসার করেছেন। যতদিন পর্যন্ত খাদিজা ؓ বেঁচে ছিলেন, ততদিন অন্য কোনো বিয়ে করেননি এবং খাদিজাকে ؓ নিয়েই তিনি অত্যন্ত খুশি ছিলেন। সুতরাং নবীজি ﷺ নারীদের ব্যাপারে দুর্বল বা তিনি নারীলোভী ছিলেন– এই ধরনের কথা শুধু ভিত্তিহীনই নয়, বরং নির্ভেজাল মিথ্যাচার।

চতুর্থত, খাদিজা ؓ মারা যাবারও দুই-তিন বছর পর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ একাই জীবনযাপন করেন। এর পর আরেকজন বিধবা, সাওদাহকে ؓ বিয়ে করেন। সাওদার স্বামী মারা যাওয়ায় তিনি তাঁকে বিয়ে করেন। সাওদাহ বেশ বয়স্ক ছিলেন। একটা সময় তিনি নবীজিকে ﷺ তাঁর ভাগের রাতগুলো আ'ইশার সাথে কাটানোর অনুমতি দেন, এর কারণ ছিল তাঁর বার্ধক্য।

নবীজি ﷺ এর পরবর্তীতে আরও কিছু বিয়ে করেন। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরেই তিনি বেশিরভাগ বিয়ে সম্পন্ন করেন। তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর নয়জন বিধবা স্ত্রী ছিল। প্রশ্ন আসতে পারে কেন নবীজি ﷺ জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে এতগুলো বিয়ে করলেন, যখন নিজের যুবাবয়সে মাত্র একজন বিধবাকে বিয়ে করেই তিনি সুখী বিবাহিত জীবন লাভ করেছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর এতগুলো বিয়ে করার কারণ কী?

প্রথমত, বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের মিশন ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। তিনি যা কিছুই করেছেন, এমনকি নিজের বৈবাহিক জীবনেও যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলো কেবলমাত্র ইসলামের ভালোর কথা চিন্তা করেই নেওয়া। শুধুমাত্র নিজের খেয়ালখুশি বা চাহিদা মেটানোর জন্য কোনো কাজ করেননি। তিনি বেশ কিছু বিয়ে এই কারণেই করেছিলেন, যাতে করে অন্যান্য গোত্র ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়। যেমন, জুওয়াইরিয়্যাহকে বিয়ে করার ফলস্বরূপ বনু মুসতালিক গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, সাহাবীদের ﷺ দেখাশোনা করার জন্য-যেমন, সাওদাহকে ﷺ তিনি বিয়ে করেছিলেন, সাওদাহ ছিলেন বিধবা।

তৃতীয়ত, ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের ﷺ সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত করা। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সাহাবীদের ﷺ সম্পর্ক ছিল ভাইয়ের মতো। তিনি ইসলামের এই ভ্রাতৃত্বের সাথে পারিবারিক বন্ধন যুক্ত করে সম্পর্ক আরো মজবুত করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই সাহাবী আবু বকর ﷺ ও উমারের ﷺ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর উসমানের ﷺ সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। যখন সেই মেয়ে মারা গেলেন, তখন আরেক মেয়েকেও উসমানের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনিও মারা যান। তখন নবীজি ﷺ বলেন, 'আমার যদি আরো মেয়ে থাকতো, তাহলে আমি তাদেরকে একের পর এক করে উসমানের কাছেই বিয়ে দিতাম।' আলী ইবন আবি তালিবের ﷺ সাথে তিনি ফাতিমার ﷺ বিয়ে দেন। এমনি করে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ চার সাহাবীর ﷺ সাথেই নবীজির ﷺ পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

চতুর্থত, দ্বীনের শিক্ষা পরিপূর্ণ করার জন্য নবীজির ﷺ একাধিক বিয়ের প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ জানা ও মানা মুসলিমদের কর্তব্য। দেশ পরিচালনা, শিক্ষকতা, ইমামতি, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামীর দায়িত্ব প্রত্যেকটি বিষয়ে নবীজির ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। তিনি আমীর হিসেবে কেমন ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কেমন ছিলেন, কিংবা শিক্ষক ও ইমাম হিসেবে কেমন ছিলেন– এগুলো বলার জন্য শত শত সাহাবী ﷺ ছিলেন। কিন্তু নবীজির ﷺ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানাতে পারবে, এমন সাহাবির সংখ্যা নগণ্য। রাসূলুল্লাহর ﷺ সন্তানদের মাঝেও একজন বাদে সবাই মারা যান। রাসূলুল্লাহর ﷺ পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় তাঁর স্ত্রীদের বর্ণনা থেকে।

নবীজির ﷺ যদি কেবলমাত্র একজন স্ত্রী থাকতো, তাহলে অনেক সমস্যা হতো। একাধিক স্ত্রী থাকার কারণে অনেকগুলো সুবিধা হয়েছে। প্রথমত, একজনের পক্ষে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার মনে করে রাখা খুব দুরূহ ব্যাপার। আর যদি কয়েকজন স্ত্রী থাকে, তখন একজন ভুলে গেলেও অন্য কেউ সে বিষয়টা স্মরণ করতে পারবেন। এছাড়াও যদি শুধুমাত্র একজন বর্ণনা করে, তাহলে তার কথাকে সহজেই বাতিল করে দেওয়া যায়, কেননা মাত্র একজন কথাগুলো বলছে, যার আর অন্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। একটা মাত্র উৎস হলে, তার বক্তব্য দুর্বল বলে প্রমাণ করে দিতে পারলেই সবগুলো হাদীসকে বাতিল করে দেওয়া যেতো। সেক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

কাফেররা সবসময় চায় ইসলামের উপর আঘাত হানতে। তারা আবু হুরাইরাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য কতভাবে যে আক্রমণ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এর কারণ হলো, আবু হুরাইরাকে বাতিল প্রমাণ করতে পারলে তাঁর থেকে বর্ণিত পাঁচ হাজার হাদীসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব। নবীজির ﷺ একাধিক স্ত্রী থাকায়, তাদের থেকে বর্ণিত

হাদীসগুলোর সত্যতা আরো বেশি জোরালো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ পারিবারিক জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুন্নাহ সম্পর্কে অবহিত করে। আর এই সুন্নাহগুলো সবার জন্য প্রযোজ্য। সবাই শিক্ষক, ইমাম বা আমীর না হলেও প্রত্যেকেই একটি পরিবারের সদস্য। তাই পরিবারে রাসূল ﷺ কীরূপ আচরণ করেছেন সেটা জানার গুরুত্ব অপরিসীম, আর সেটা একমাত্র স্ত্রীদের পক্ষেই জানানো সম্ভব। এই বিশাল পরিমাণ জ্ঞানের উৎস তাঁর স্ত্রীদের থেকে পাওয়া গেছে। তাদের বক্তব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার জানা সম্ভব হয়েছে। তিনি কীভাবে খেতেন, ঘুমোতেন, বসতেন, কীভাবে স্ত্রীদের সাথে রাত কাটাতেন, কীভাবে তাদের সাথে আচরণ করতেন, দাসদের সাথে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল, এসব বিষয়ে বহু হাদীস উম্মুল মুমিনীনদের মাধ্যমে জানা যায়।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল নবী মুহাম্মাদকে ﷺ প্রেরণ করেছেন কুরআনের জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে, ইসলামের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ হিসেবে। তাই তাঁর সুন্নাহ সকলের কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি। এই কারণেই তাঁকে সাধারণ নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। চারজন বা কম সংখ্যক স্ত্রীর বদলে অধিক স্ত্রী দান করা হয়। এসবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনার অংশ। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে হেফাজত করেছেন এবং নবীজির ﷺ সব সুন্নাহ পরবর্তী সকল প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

নবীজির ﷺ যে দুটি বিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়, সে দুটি হলো আ'ইশা ﷺ এবং যাইনাব বিনতে জাহশের ﷺ সাথে বিয়ে। এই দুটো বিয়ের দিকেই লোকেরা সবচেয়ে বেশি আঙ্গুল তোলে। কারণ, আ'ইশার সাথে যখন নবীজির ﷺ বিয়ে হয়, তখন আ'ইশার ﷺ বয়স মাত্র ছয় বছর। এই বিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে আ'ইশার ﷺ বয়স নয় বছর হওয়ার পর। ওদিকে যাইনাবের সাথে নবীজির ﷺ বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণ যাইনাব ছিল নবীজির ﷺ পালক সন্তান যায়িদের স্ত্রী। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে বিয়েগুলো নিয়ে মানুষের মনে এত প্রশ্ন, ক্ষোভ, আপত্তি–সেই দুটো বিয়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি আদেশপ্রাপ্ত ছিল। নবীজির ﷺ অন্য কোনো বিয়ে ওয়াহীর মাধ্যমে নির্দেশিত ছিল না, শুধুমাত্র এই দুটি ছিল ব্যতিক্রম। সূরা আল আহযাবে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল যাইনাবকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহকে ﷺ নির্দেশ দেন,

> "অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাঁকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৭)

আ'ইশার ﷺ সাথে বিয়ের নির্দেশও ওয়াহীর মাধ্যমে এসেছিল। নবীজি ﷺ স্বপ্নে এই নির্দেশনা পান। সহীহ বুখারিতে এই স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আ'ইশাকে বলেছেন, 'জিবরীল আমার কাছে এলেন। আমি দেখতে পেলাম তুমি একটি সিল্কের কাপড়ে জড়ানো। যখন আমি কাপড়টি সরিয়ে তোমাকে দেখলাম, জিবরীল বললেন, এই হলো তোমার স্ত্রী–দুনিয়ায় এবং আখিরাতে।' নবীজি ﷺ দু'বার একই স্বপ্ন দেখেন। নবী-রাসূলদের স্বপ্নও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী। অর্থাৎ এভাবেই আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ﷺ আ'ইশার ﷺ সাথে বিয়ের নির্দেশ দেন।

আজকাল দুই ধরনের লোক নবীজির ﷺ বিয়ে নিয়ে আক্রমণ করে, দুর্বল ঈমানের মুসলিম আর অমুসলিম। দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা অবাক হয় এই ভেবে যে, *নবীজি ﷺ কীভাবে এমন কাজ করতে পারলেন?* তাদের জন্য উত্তর হলো–এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ তাআলা যা-ই আদেশ দেন না কেন, একজন মুসলিম হিসেবে তা মেনে নিতে হবে, এটা নিয়ে সন্দেহ বা সংশয় প্রকাশ করলে কিংবা প্রশ্ন তুললে মুসলিম থাকা যাবে না। নবীজির ﷺ সাথে আ'ইশার ﷺ বিয়ে সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম, এটি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু নবীজির ﷺ জন্য এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হুকুম ছিল। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো অধিকার একজন মুসলিমের নেই।

আর যেসব অমুসলিম নবীজির ﷺ চরিত্র নিয়ে বাজে কথা বলে, তাদের মূল সমস্যা আসলে নবীজি ﷺ ও আ'ইশার ﷺ বিয়ে নিয়ে নয়। তাদের সমস্যা হচ্ছে, তারা মুহাম্মাদকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করে না। আ'ইশার ﷺ সাথে নবীজির ﷺ বিয়ে একটি অজুহাত মাত্র। নবীজি ﷺ যদি আ'ইশাকে বিয়ে নাও করতেন, তবুও এই ইসলাম বিদ্বেষীরা কোনো না কোনো বিষয় খুঁজে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতো। কারণ তারা নবীজিকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবেই মানে না। তাই তাঁর সম্পর্কে ভুল ধরার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। অমুসলিমদের সাথে নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়াটাই তাই অর্থহীন। যখন মক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ নানাভাবে আক্রমণ করছিল, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু আয়াত নাযিল করেন,

> "তাদের কথাবার্তায় আপনার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। কিন্তু তারা তো নিশ্চয়ই আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এই জালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।" (সূরা আনআম, ৬:৩৩)

তারা ব্যক্তি মুহাম্মাদকে ﷺ অস্বীকার করেনি বরং তারা আল্লাহর বাণীকেই অস্বীকার করেছে। নবীজির ﷺ সাথে তাদের আক্রমণাত্মক আচরণের কারণ ছিল এটাই যে তিনি আল্লাহর রাসূল। নবীজির ﷺ চরিত্রের জন্য আসলে তারা তাঁকে আক্রমণ করে না, বরং নবীজি ﷺ ইসলামের বার্তা প্রচারের মিশনে নেমেছেন দেখেই তাঁকে নিয়ে তাদের এতো ক্ষোভ।

নবীজির ﷺ সাথে আ'ইশার ﷺ বিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। সত্যি বলতে, নবীজির ﷺ সাথে আ'ইশার বিয়ে হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর অনেক বিশাল নিআমত দান করেছেন। যারা আ'ইশার অল্প বয়সে বিয়ে নিয়ে সংশয় পোষণ করে, তারা মূলত বুঝতেই পারে না যে, এই বিয়ে না হলে মুসলিম উম্মাহর ওপর কী দুর্যোগ আপতিত হতো! আ'ইশা ﷺ ছিলেন একজন আলিমা, প্রচণ্ড মেধাশক্তির অধিকারী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও অনুসন্ধানী প্রকৃতির।

আ'ইশার ﷺ বয়স খুব কম ছিল এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুসুলভ, তাই তিনি নবীজিকে ﷺ প্রশ্ন করতে পারতেন। কিন্তু অন্য সাহাবীরা ﷺ নবীজির ﷺ প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান থেকে এভাবে প্রশ্ন করতে পারতেন না। এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, যে নবীজির ﷺ কাছে তাঁর বক্তব্যগুলো নিয়ে জানতে চাইতে পারে। তাই আ'ইশার স্ত্রী হওয়াটা জরুরি ছিল।

নবীজির ﷺ এক সাহাবী, আমর ইবন আস ﷺ বলেন, 'আমি নবীজির ﷺ সাথে বছরের পর বছর একসাথে থেকেছি। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে কেমন ছিলেন; আমি বলতে পারবো না। কারণ তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে আমি কখনো তাঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকাইনি।' যেখানে নবীজির ﷺ সাহাবীরা ﷺ তাঁর দিকে তাকানোর পর্যন্ত সাহস পেতেন না, সেখানে আ'ইশা খুব খোলাখুলিভাবে নবীজির ﷺ সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে আ'ইশা ﷺ অনেক বেশি শিখতে পেরেছিলেন। তিনি ইসলামের বড় মাপের আলিমদের একজন। সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর অবস্থান চতুর্থ। ইসলামের যেকোনো ফিকহের গ্রন্থে আ'ইশার উল্লেখ পাওয়া যাবে। সুতরাং নবীজির ﷺ আ'ইশাকে বিয়ে করা সত্যিকার অর্থেই মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বড় নিআমত।

আ'ইশা ﷺ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ আর কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। আর আ'ইশাই ছিলেন নবীজির ﷺ একমাত্র কমবয়সী স্ত্রী। তিনি ছাড়া নবীজির ﷺ বাকি সব স্ত্রী হয় বিধবা ছিলেন কিংবা তালাকপ্রাপ্তা, বয়সেও সবাই পূর্ণবয়স্ক ছিলেন। তাই আ'ইশার ﷺ সাথে নবীজির ﷺ বিবাহ ছিল একটি ব্যতিক্রমী বিয়ে।

নবীজি ﷺ অন্যান্য যে বিয়েগুলো করেছিলেন, সেগুলোর প্রেক্ষাপটও জানা প্রয়োজন। উম্মে হাবিবা ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ আরেকজন স্ত্রী। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবিসিনিয়াতে হিজরত করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী ইসলাম থেকে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, ফলে তাঁকে অনেক দুর্দশা আর কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের কন্যা। পরবর্তীতে তাঁর স্বামী মারা গেলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন উমাইয়া আদ দামরীর মাধ্যমে নাজ্জাশির কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠান। এই পত্রে লেখা ছিল যে, নাজ্জাশি যেন নবীজির ﷺ সাথে উম্মে হাবিবার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

উম্মে হাবিবাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করেছিলেন তাঁর প্রতি সহানুভূতি থেকে। এই কারণে তিনি হাজারো মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও নবীজি ﷺ তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর সকল দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। আরেকটা কারণ ছিল, এই বিয়ের মাধ্যমে ইসলামের সবচেয়ে একগুঁয়ে শত্রু আবু সুফিয়ানকে ইসলামের কাছাকাছি নিয়ে আসা, ইসলামের প্রতি তাদের অবস্থানকে নমনীয় করে তোলা।

অদ্ভুত বিষয় হলো, ইসলামের ঘোরতর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান নবীজির ﷺ সাথে নিজের মেয়ের বিয়ের কথা শুনে খুশি হয়ে ওঠে। সে বলে ওঠে, 'মুহাম্মাদের চেয়ে উত্তম আর কে আছে।' এর কারণ ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ বংশমর্যাদা। বনু হাশিম গোত্রের একজন সদস্যের সাথে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে জেনে সে আনন্দিত হয়ে উঠেছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তার বিরোধ ছিল আদর্শিক বিরোধ, দ্বীন নিয়ে দ্বন্দ্ব, কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন তাদের চাইতে অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বংশের অধিকারী, তাই তিনি তার মত কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করায় তার অন্তর নরম হয়ে পড়ে।

আরেকটি বিয়ে ছিল উম্মে সালামার সাথে। তিনিও আবিসিনিয়াতে হিজরত করেছিলেন। এরপর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী আবু সালামা মারা যাবার পরে নবীজি ﷺ উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন। এভাবে নবীজি ﷺ মৃত সাহাবাদের ﷺ স্ত্রীদেরকে বিয়ে করার মাধ্যমে তাদের দেখাশোনার ভার গ্রহণ করতেন। এইসব সাহাবিয়াত ছিলেন বয়স্কা, বৃদ্ধা নারী। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বিয়ে করেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন মুসলিম উম্মাহর পিতা, মুসলিম উম্মাহর তত্ত্বাবধায়ক। সাহাবীদের ﷺ সাথে রক্তের সম্পর্ক না থাকুক, তিনি ছিলেন তাদের সবচেয়ে আপনজন। সাহাবীদের ﷺ ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, কষ্টে, প্রয়োজনে, দুঃসময়ে সবসময় পাশে থেকেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কাবা পুনর্নির্মাণ

মুহাম্মাদের ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। একবার আল-কাবা বন্যাকবলিত হয়। আল-কাবার অবস্থান একটি নিচু উপত্যকায়, পর্বতরাজির মাঝে। বন্যার ফলে কাবার কাঠামোতে ফাটল ধরে। তাই কুরাইশগণ কাবাকে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করে। আল-কাবা মোট চার বা পাঁচবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। ইবরাহীম ﷺ এবং আদম ﷺ–এই দুইজনের মধ্যে কে সর্বপ্রথম আল-কাবা নির্মাণ করেছিলেন তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতানুসারে ইবরাহীম-ই ﷺ প্রথম তা নির্মাণ করেন।

যারা বলেন যে আদমই ﷺ প্রথম নির্মাণকারী তারা এর পক্ষে কুরআনের যুক্তি পেশ করেন। কেননা কুরআনে বলা আছে,

> **"এবং স্মরণ করো যখন ইবরাহীম ﷺ ও ইসমাইল ﷺ কাবার ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" (সূরা বাকারাহ, ২: ১২৭)**

তাঁরা বলেন যে, ইবরাহীম ﷺ কাবাঘর গোড়া থেকে নির্মাণ করেননি, তিনি যা করেছিলেন তা হলো ভিত্তি উত্তোলন, অর্থাৎ সেখানে ইতিমধ্যে উত্তোলন করার মতো কিছু ছিল। তাই তাঁরা বলেন যে, নবী আদমের ﷺ সময়েই আল-কাবার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস এটাই যে ইবরাহীম ﷺ আল-কাবা নির্মাণ করেছেন। তবে যে নবীই সর্বপ্রথম তা করুক না কেন আল-কাবার পবিত্রতা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

বেশ কয়েকজন নবী-রাসূল আল্লাহর ঘর পরিদর্শন করেছেন। হাদীস থেকে জানা যায়, হুদ ﷺ, সালেহ ﷺ এবং নূহ ﷺ আল-কাবা পরিদর্শন করেছিলেন। এছাড়াও জানা যায় ঈসা ﷺ যখন পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রত্যাবর্তন করবেন তখন তিনি হজ্ব করবেন। সুতরাং, এটি হয় আদম ﷺ অথবা ইবরাহীম ﷺ নির্মাণ করেছেন কিন্তু আল্লাহকে স্মরণের জন্য এটিই প্রথম নির্মিত ঘর।

> **"নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত – বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ৯৬)**

মক্কা বন্যাপ্লাবিত হওয়ায় কাবা ঘর দ্বিতীয়বার নির্মাণের প্রয়োজন হয়। কুরাইশগণ এটিকে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিল, তাই কাবা ঘরের পুরনো ইমারতটি ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন পড়লো, কিন্তু তারা কেউই এই পদক্ষেপটি নিতে সাহস পাচ্ছিল না। তারা তাদের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে আল-কাবার চারপাশে অপেক্ষা করছে, কিন্তু কেউই সামনে গিয়ে এটি ভাঙ্গার কাজটি শুরু করতে চাচ্ছিল না, সেই সময়ে মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা আল-কাবাকে এতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। তারা সত্যি সত্যিই আল্লাহকে ভয় পেত; তারা বিশ্বাস করতো যে এটি ভেঙ্গে ফেললে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। অতঃপর তাদের মধ্যে একজন বললো যে, সে এই কাজটি শুরু করবে, তাই পরদিন ভোরে সে তার পুত্রদের নিয়ে আল-কাবার পাথরসমূহ সরাতে শুরু করলো আর বলতে থাকলো, 'হে আল্লাহ! তুমি ভয় পেয়ো না। আমরা তোমার ভালো চাই।'

এখানে লক্ষণীয়, আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস–তারা ভাবত যে, এসব বলে তারা আল্লাহকে শান্ত করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছু জানেন, মানুষ কোন কাজটা কেন করছে তা তাকে মুখে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি অন্তরের খবর রাখেন। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো ঠিকই কিন্তু তাঁর গুণাবলিকে অনুধাবন করতে পারতো না।

এরপর আল-কাবার দেয়ালগুলোকে নামিয়ে ফেলা হয়। তখন মক্কার অদূরে অবস্থিত লোহিত সাগর বন্দরে রোমের একটি জাহাজ নোঙর করে। তারা সেই জাহাজের কিছু কাঠ নিয়ে আসে, ওই জাহাজে আগত এক রোমান নির্মাতার সাহায্যে আল-কাবার পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন করে। জাহাজ থেকে নিয়ে আসা ওই কাঠ দিয়েই প্রথমবারের মত আল-কাবার ছাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরাইশগণ খুব ভালভাবেই জানত যে সুদের অর্থে ভালো কিছু নেই। আর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে শুধুমাত্র হালাল অর্থ দিয়েই আল-কাবার নির্মাণকাজ সম্পাদিত হবে। সেই সময় পতিতাবৃত্তি বহুল প্রচলিত ব্যবসা হওয়া সত্ত্বেও তারা সুদ অথবা পতিতাবৃত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ এই কাজে কোনোভাবেই ব্যবহার করবে না বলে মনস্থ করে। মানুষ সেই সময় থেকেই জানত যে এভাবে অর্জিত অর্থে কোনো কল্যাণ নেই অথচ তারপরেও তারা অর্থ উপার্জনের খাতিরে তাদের ক্রীতদাস মেয়েদেরকে দিয়ে পতিতাবৃত্তিসহ আরও বিভিন্ন রকম কাজ করাতো। অর্থের সংকুলান না হওয়ার কারণে তারা আল-কাবার একটি দিক কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিল। কাবাকে আয়তাকার না বানিয়ে বর্গাকার বানিয়েছিল। কাবার যে অংশটি তারা আর বানাতে পারেনি সেই অংশটিই এখন আল-হিজর বলে পরিচিত। কাবার দুটো ফটক ছিল, তারা বানিয়েছিল একটি আর তারা এর দোরগোড়াকে উঁচু করে বানিয়েছিল, তাই এখন-কাবার দরজার কাছে যেতে হলে উপরে উঠতে হয়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এক হাদীসে স্ত্রী আ'ইশাকে রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছিলেন, 'তুমি কি জানো না যে তোমাদের সম্প্রদায়ের আল-কাবা নির্মাণের ব্যয় বহনের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ছিল না? তোমাদের সম্প্রদায় নওমুসলিম না হলে অমি আল-কাবাকে ভেঙে এর পূর্ব ও পশ্চিমদিকে একটি করে দরজা নির্মাণ করতাম। আমি আল-হিজরকে আল-কাবার অন্তর্ভুক্ত করতাম।'

রাসূল ﷺ মক্কাতে প্রবেশের পরপরই আল-কাবাকে তার প্রকৃত ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু এরপর তিনি আ'ইশাকে রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি এই কাজটি করবো না শুধু এই কারণে যে কুরাইশরা সবেমাত্র মুসলিম হয়েছে। তাদের ইসলাম এখন ভঙ্গুর, ঈমান দুর্বল, আর এখন যদি অমি কাবাকে পুনর্নির্মাণ করি, তা তাদের অনুভূতিকে আঘাত করবে।'

শিক্ষা

দাঈদেরকে সমসাময়িক মানুষদের মানসিকতাকে বিবেচনায় রাখতে হবে। রাসূল ﷺ কাবার পুনর্নির্মাণ করতে আগ্রহী ছিলেন, তবু তিনি তা করেননি কারণ তিনি সেখানকার মানুষদের ঈমানে কোনোরূপ আঘাত করতে চাননি। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেছেন, 'তুমি যদি মানুষকে এমন কোনো কথা বলো যা তাদের বোধগম্য নয়, তাদের স্বল্পবুদ্ধি বা ঈমানের কারণে তা তারা বুঝতে পারে না, তখন তা তাদের জন্য ফিতনা হতে পারে।' এমন হতে পারে যে, একটি বিষয় সম্পূর্ণ সত্য এবং বৈধ–কিন্তু

সেটা শোনার জন্য মানুষ এখনো প্রস্তুত নয়, তখন সে বিষয়ক তথ্য উল্টো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের সম্প্রদায় (কুরাইশ) আল-কাবার দরজা উঁচু করে নির্মাণ করেছে যাতে তারা কে এর ভিতরে গেল আর কে বের হলো তা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।' এটি ছিল ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের একটি বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি আমি একে আবার বানাতাম তাহলে এর দরজাটি নিচু করে দিতাম আর দুইটি দরজা বানাতাম যাতে মানুষ একটি দিয়ে প্রবেশ করে অপরটি দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার পুনর্নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কুরাইশরা কাবার পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করার পর কালো পাথর বসানোর বিষয়টি সামনে এলে সমস্যা বেঁধে যায়। সবাই কালো পাথর যথাস্থানে রাখার মর্যাদা পেতে চায়। বনু আব্দুদ দার গোত্র তার সমস্ত লোকজনকে এক করে রক্তে পূর্ণ একটি পাত্র নিয়ে কাবার সামনে উপস্থিত হয়। পাত্রটি সবার সামনে রেখে তারা তাতে হাত ডুবিয়ে আবার হাত বের করে নেয়। এর দ্বারা তারা সবাইকে বুঝিয়ে দেয় যে, যদি তাদেরকে পবিত্র কালো পাথর হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে স্থাপনের সম্মান না দেয়া হয় তবে তারা এর জন্য যুদ্ধ করে মরতে প্রস্তুত। অন্যেরাও দমবার পাত্র ছিল না! এই দৃশ্য দেখে উল্টো আরেক গোত্র তাদের রক্তের পাত্র এনে একইভাবে যুদ্ধের অঙ্গীকার করে। অন্যান্য গোত্রও একই রকম অঙ্গীকার করলো। চার পাঁচদিন যাবত এই নিয়ে ঝগড়া চলতে থাকে। অবশেষে তাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উমাইয়া বললেন, 'আসুন আমরা সকলে এই সিদ্ধান্তে সম্মত হই যে, আগামীকাল ভোরে মাসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে যিনি প্রথম প্রবেশ করবেন তাঁর ফয়সালা আমরা সবাই মেনে নেব।'

পরদিন ভোরে মুহাম্মাদ ﷺ সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে বলে, 'ইনি তো সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত! আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিলাম।' তারা মাসজিদুল হারামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিবে বলে সম্মত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ হওয়ায় তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ও খুশি হয়েছিল, কারণ তারা জানত যে, তিনি কখনোই পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আর তাই তারা তাঁর হাতে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে একটা চাদর আনতে বলেন। এরপর নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে তা সেই চাদরের মাঝখানে রাখেন। অতঃপর বিদ্যমান গোত্রসমূহের নেতাগণকে সেই চাদরের কিনারা ধরতে বলেন। তারা সবাই একই সময়ে চাদরটি উঁচিয়ে ধরলো; এভাবে প্রত্যেকটি গোত্রই পবিত্র কালো পাথর হাজরে আসওয়াদ উত্তোলনে অংশ নেয়। যখন তারা সবাই পাথরটি উঁচিয়ে ধরে তার নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে যায় তখন মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে

স্থাপন করেন। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহই ﷺ হাজরে আসওয়াদকে তার নির্ধারিত জায়গায় স্থাপন করেন। এভাবে দ্বিতীয়বারের মতো কাবা নির্মিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন যে, যদি কুরাইশরা সেই সময়ে নওমুসলিম না হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই আল-কাবাকে ইবরাহীমের ﷺ দেওয়া ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করতেন। এর বেশ কয়েক বছর পর আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়ের মক্কার আমীর পদে আসীন হন। আ'ইশা ﷺ তাঁর খালা হওয়ার সুবাদে তিনি এই হাদীস সম্পর্কে জানতেন। আবদুল্লাহ ইবন আয যুবাইরের মা আসমা বিনত আবি বকর ﷺ ছিলেন আ'ইশার ﷺ বোন। আবদুল্লাহ ইবন আয যুবাইর আল কাবাকে তার মূল ভিত্তির ওপর ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তৎকালীন মুসলিমগণ পূর্বের ন্যায় আর নও মুসলিম ছিলেন না, তারা ততদিনে পরিণত হয়েছেন। আয যুবাইর তখন কাবাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন কারণ বনু উমাইয়্যাহর সাথে যুদ্ধে কাবায় একবার আগুন ধরে যায়। আল হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস সাকাফি মক্কা অবরোধ করেছিল, ওই সময় আবদুল্লাহ ইবন আয যুবাইর এবং বনু উমাইয়্যাহর মধ্যে সিরিয়াতে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আবু উমায়েরের সেনাবাহিনী প্রধান মক্কা অবরোধ করেছিল, তাদের নিক্ষিপ্ত গোলাবারুদের দ্বারা কাবা অগ্নিদগ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ক্ষতিটুকু কাবার ইমারতকে না ভেঙেও মেরামত করা যেতো। কিন্তু আয যুবাইর এই পরিস্থিতির সুযোগ ব্যবহার করে কাবাকে তার মূল ভিত্তির উপর ফিরিয়ে আনেন। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস অনুযায়ী কাবাকে পুনর্নির্মাণ করেন। রাসূলের ﷺ ইচ্ছানুযায়ী কাবার দরজাকে নিচে নামিয়ে আনেন, পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে একটি করে দরজা নির্মাণ করেন এবং হিজরের দিকে কাবাকে প্রসারিত করেন।

আবদুল্লাহ ইবন আয যুবাইর সেই যুদ্ধে পরাজিত ও শহীদ হন। আল হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মক্কা দখল করে। তৎকালীন খলিফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান রাসূলুল্লাহর ﷺ সেই হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই তিনি কাবাকে আবার আবদুল্লাহ আয যুবাইরের আগে যেভাবে কুরাইশগণ নির্মাণ করেছিল, সেভাবে করার হুকুম জারি করেন। বনু উমাইয়্যাহর খিলাফাহর পর বনু আব্বাস খিলাফত লাভ করে, তারাই ছিল খলিফার রাজপরিবার। বনু আব্বাসের একজন খলিফা কাবাকে তার মূল ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণের কথা ভাবছিলেন। তিনি ইমাম মালিকের সাথে এই ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করেন। ইমাম মালিক খলিফাকে বলেন, 'আমরা কাবাকে রাজা-রাজড়াদের হাতের পুতুলের মতো ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি পরিবর্তনের পক্ষপাতী নই। যদিও এটিকে হযরত ইবরাহীমের দেওয়া ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণের কথা ও পরিকল্পনা রাসূলুল্লাহরও ﷺ ছিল, কিন্তু এটা এভাবেই থাকুক এবং আমরা আর এর পরিবর্তন সাধন করবো না।' এটি ইমাম মালিকের দেওয়া একটি অন্যতম বিচক্ষণ পরামর্শ ছিল। খলিফাও সেটি তখন মেনে নিয়েছিলেন। বর্তমানে যে কাবা রয়েছে তা কুরাইশগণের ভিত্তির ওপরই নির্মিত।

আলহামদুলিল্লাহ, এতে ভালোই হয়েছে। যদি কাবাকে ইবরাহীমের ﷺ দেওয়া তাঁর

আসল ভিত্তির উপর নির্মাণ করা হতো, তাহলে মুসলিমরা কাবার অভ্যন্তরে ইবাদত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু যেহেতু এটাকে কমিয়ে ফেলা হয়েছিল, তাই অর্ধবৃত্ত দিয়ে ঘেরা অংশটি প্রকৃতপক্ষে কাবারই অংশ। তাই ওই অংশে ইবাদাত করা যেন কাবার অভ্যন্তরেই ইবাদত করা। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার অভ্যন্তরে ইবাদত করেছেন। সময়ের সাথে সাথে কাবার উচ্চতাকে বাড়ানো হয়েছে বটে কিন্তু এর জায়গার পরিবর্তন হয়নি। যে পাথরগুলো দিয়ে কাবা নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো সেইসব পাথরের অবশিষ্টাংশ যা ইবরাহীম ﷺ ব্যবহার করেছিলেন, তবে সবগুলো নয়, কিছু পাথর পরবর্তীতে কুরাইশ এবং অন্যেরা সংযোজন করেছে।

এটিই সেই কালো পাথর যা ইবরাহীম ﷺ ব্যবহার করেছিলেন। এই পাথরটি ঘিরে অনেক গল্প কাহিনি প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে এটি জান্নাতে তৈরি হয়েছে। তিরমিযীর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কালো পাথরটি আসলে সাদা ছিল যা পরবর্তীতে পাপী আদম সন্তানদের স্পর্শের কারণে কালো রঙ ধারণ করেছে। অন্য হাদীসে এসেছে এই পাথরটি স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়। এটি কাবার একমাত্র অংশ যাকে চুম্বন করা হয় এবং দূর থেকে যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়। কেউ কেউ আবার ইয়েমেনি কোণের দিকেও ইঙ্গিত করে থাকে, কিন্তু তা সঠিক নয়। কাবা প্রদক্ষিণ করার সময় ইয়েমেনি কোণকে স্পর্শ করা যেতে পারে কিন্তু সেটির দিকে ইঙ্গিত করা কিংবা অভিবাদন করা ঠিক না। এটি শুধুমাত্র পবিত্র কালো পাথরকেই করা উচিত।

হেরা গুহায় নির্জনাবাস

নবী কারীম ﷺ মক্কা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় সময় কাটাতে চলে যেতেন। তিনি সাথে কিছু খাবার ও পানীয় নিতেন এবং হেরা পর্বতের নির্জনতায় আল্লাহর ইবাদাত করতেন। তখন হেরা পর্বতের গুহা থেকে কাবাকে দেখা যেতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে দিনরাত আল্লাহর ইবাদাত করতেন। তিনি আল্লাহকে চিনতেন। এই সময়টা ছিল আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ এক সুবর্ণ সুযোগ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, কেননা ধ্যান ও গভীর চিন্তা অন্তরকে শুদ্ধ করে। সাঈদ হাওয়া এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

'তৎকালীন সময়ে হিদায়াত অন্বেষণকারী কিছু মানুষ এই ধরনের একাকীত্বে সময় কাটানোকে বেছে নিত, সেখানে তারা আল্লাহকে স্মরণ করতো এবং আল্লাহর ইবাদাত করতো। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর স্মরণে নিমজ্জিত থেকে, অন্তরকে উদাসীনতা এবং নফসের খেয়াল-খুশির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যেন হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে অন্তর হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ পায়। অনেকেই মনে করে, ঈমানী যাত্রার সূচনালগ্নে একজন মানুষের উচিত নির্জনতায় কিছু নিবিড় সময় কাটানো, কারণ আল্লাহর রাসূল নবুওয়াতের আগে এবং প্রারম্ভে এভাবেই নির্জন সময় কাটিয়েছিলেন।'

মুসলিমদের আল্লাহর যিকিরে কিছু সময় একাকী কাটানোর অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। যেমন ভোরের প্রথমাংশে, আসরের পর অথবা জুমু'আর দিনে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে। আলেমরা এই ধরনের একান্ত যিকিরের অনেক ফাযায়েল বর্ণনা করেছেন। তবে এর মানে নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা নয়। লোকজনের সাথে মেলামেশা যেমন করতে হবে, তেমনি নিজের জন্য একান্ত কিছু সময়ও রাখতে হবে, দুটোর মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। নির্জনতার জন্য কিয়ামুল লাইল একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ। যখন সবাই গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত, তখন একাকী উঠে আল্লাহর ইবাদত করা। এই সময়টা বান্দার জন্য আল্লাহর সাথে একান্তে সময় কাটানোর অপূর্ব সুযোগ। আর এই সময়ে ইবাদাত করা বান্দার ইখলাস বা আন্তরিকতার পরিচয়ও বহন করে, কেননা এই সময়ে কেউ তাকে দেখছে না, শুধুই আল্লাহর জন্য সে সালাতে উঠে দাঁড়িয়েছে, লোক দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। অন্যান্য সালাত, যেগুলো জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে এই সুযোগ নাও থাকতে পারে।

প্রাক-ইসলামি যুগে তাওহীদের অনুসারীরা

নবীজির ﷺ নবুওয়াতের আগের সময়টি ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। কারো মাঝে সত্য-মিথ্যার তারতম্য করার ক্ষমতা বাকি ছিল না বললেই চলে। তবুও আনাচে-কানাচে তখনও দু একজন লোক ছিল যাদের মাঝে হক্ব ও বাতিলের বোধ বেঁচে ছিল। তাদের অন্তর তাদেরকে সত্যের দিকে, সরলপথের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

যায়িদ ইবন নাওফাল ﵁

যায়িদ ছিলেন কুরাইশ বংশের সন্তান। কিন্তু সত্যের সন্ধানে মক্কার বাইরে যাত্রা করেন। ইহুদিদের কাছে যান, তাদের কাছ থেকে ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে জানেন। সব জানার পরে, এই ধর্মের অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তিনি যান খ্রিস্টানদের কাছে। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানার পরেও তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে পারলেন নবী ইবরাহীমের ﷺ দ্বীনের কথা, যে দ্বীনকে বলা হয়েছে 'হানিফিয়া' বা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতের দ্বীন। তিনি ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে, একজন "হানিফি" হিসেবে তিনি শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন।

মক্কার শির্কের গভীর আঁধার-সাগরে যায়িদ ইবন নাওফাল একাই যেন স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছিলেন। তিনি ছাড়া এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলার আর কেউ ছিল না। আসমা বিনতে আবু বকর ﵂ বলেন, 'আমি দেখতাম যায়িদ ইবন নাওফাল কাবায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে ডাকতেন। তিনি বলতেন, 'হে কুরাইশ গোত্র, তাঁর শপথ যাঁর হাতে যায়িদের জীবন ও মরণ, আমি ছাড়া তোমাদের আর

কেউ-ই ইবরাহীমের দ্বীনকে অনুসরণ করছো না।' অথচ কুরাইশের লোকেরা খুব দাবি করতো যে, তারাই ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর আছে! যায়িদ আরও বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি যদি একটু জানতে পারতাম কোন পথ তোমার সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়, আমি সেই পথেই তোমার ইবাদত করতাম, কিন্তু আমি তো তা জানি না।'

যায়িদ ইবন নাওফাল সত্য বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু এই সত্যকে কীভাবে জীবনে প্রয়োগ করতে হয়, কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হয় – তা তাঁর জানা ছিল না। দ্বীন পালন করার জন্য তাঁর কাছে কোনো শরীয়াহ ছিল না। প্রত্যেক যুগেই যায়িদের মতো কিছু লোক থাকে যারা সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। তারা বোঝে যে, সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ কেবলমাত্র একজন। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর ইবাদত করতে চায়, কিন্তু ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকে না। এমনকি, অনেক ধর্মান্তরিত মুসলিম ভাইবোনের পূর্ব অভিজ্ঞতা শুনলে জানা যায়, তাদের অনেকেই আগে থেকেই বুঝতে পারতেন যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তারা নিজে নিজেই বুঝতে পারতেন, কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভুল। যায়িদ শুধুমাত্র তাঁর প্রকৃতিগত স্বভাবের মাধ্যমেই অনেক কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। ব্যাপারটি বিস্ময়কর! যেমন, তিনি কখনও কন্যাশিশু হত্যায় শরীক হতেন না। এই কাজটা থেকে সবসময় দূরে থাকতেন। এমনকি কোনো বাবা তার মেয়েকে হত্যা করবে শুনলেই তিনি সোজা সেই বাবার কাছে হাজির হতেন। বলতেন, 'একে আমার কাছে দিয়ে দাও, আমি ওর দেখাশোনা করবো। সে বড় হওয়ার পর তুমি চাইলে তাকে ফেরত নিতে পারো আর না হয় আমার কাছেই রেখে দিতে পারো।' এভাবে তিনি বহু মেয়েকে পালক নিয়েছিলেন।

মক্কায় জবাই হওয়া পশুর মাংস খেতেও যায়িদের আপত্তি ছিল। একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে মাংস রাখা হলে তিনি তা খেতে আপত্তি জানান এবং পাশের জনকে দিয়ে দেন। এরপর সেই মাংস যখন যায়িদকে দেওয়া হলো, তিনি বললেন, 'আমি এই গোশত খাবো না। তোমাদের দেবতাদের জন্য যে পশু জবাই দিয়েছ সেখান থেকে আমি গোশত খাবো না।' যায়িদ কুরাইশদের লোকদের কাছে গিয়ে তাদের দেবতাদের জন্য পশু বলি দেওয়ার নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন, 'এইসব ভেড়া আল্লাহর সৃষ্টি, তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তা থেকে জমিতে ফসল ফলান। তাহলে তোমরা কেন আল্লাহর এত নিআমতকে অস্বীকার করছো? কীভাবে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য দেবদেবীর নামে জবাই দিচ্ছো?'

নবীজির ﷺ নবুওয়াত লাভের আগেই যায়িদ ইবন আমর ইবন নাওফাল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র সায়িদ ছিলেন মুসলিম, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর ﷺ একজন। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে নিজের বাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন-

- বাবা তো নবুওয়াতের আগেই মারা গেছেন, তাহলে তাঁর দ্বীন কী ছিল?
- কিয়ামতের দিনে তোমার বাবা একাই একটা জাতি হিসেবে উপস্থিত হবে।

সূচিপত্র

অর্থাৎ নবীজি ﷺ যায়িদ ইবন নাওফালের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। বিচার দিবসে যায়িদ একাই যেন একটি জাতি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

হাশরের ময়দানে লোকেরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত থাকবে। প্রত্যেক জাতির সাথে থাকবে সেই জাতির জন্য প্রেরিত নবী ও রাসূল। মূসা ﷺ, ঈসা ﷺ, নূহ ﷺ, ইবরাহীম ﷺ, মুহাম্মাদ ﷺ, প্রত্যেকে তাদের উম্মাতসহ উপস্থিত হবেন। কিন্তু যেহেতু যায়িদ ইবন নাওফাল কোনো নবীর উম্মাতের অংশ ছিলেন না, তাই সেদিন তিনি একাই যেন একটি জাতি। বিচারের দিনে যায়িদ একাকী হয়েও একটি উম্মাহ হিসেবে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর মর্যাদা পাবেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে দাখিল করবেন, কেননা তিনি সত্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন, সত্যকে জানার পর এক আল্লাহর ইবাদত করেছেন, তাঁর পক্ষে যতটা করা সম্ভব ছিল ততটাই করেছেন।

ওয়ারাকাহ ইবন নাওফাল ﷺ

ওয়ারাকাহ ইবন নাওফাল মা খাদিজার ﷺ চাচাতো ভাই। ধর্মমতে খ্রিস্টান। শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, খ্রিস্টধর্ম নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন। তবে খ্রিস্টান হলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল আল্লাহ এক, অর্থাৎ তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় খ্রিস্টধর্মের এমন কিছু অনুসারী ছিল যারা এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করতো, তারা ঈসাকে ﷺ রব আখ্যায়িত করতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রথম ওয়াহী প্রাপ্ত হন, তখন খাদিজা ﷺ এই ওয়ারাকাহ ইবন নাওফালের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এর ঠিক পরপরই ওয়ারাকাহ মৃত্যুবরণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। লোকে বলাবলি করতে থাকে, ওয়ারাকাহর কী হবে? সে তো মুসলিম ছিল না, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবে। নবীজির ﷺ ওপর তখন ওয়াহী অবতীর্ণ হলেও, সেটা সবার কাছে প্রচার করার নির্দেশ আসেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ারাকাহ সম্পর্কে বলেন, 'আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি, তাঁর পরনে ছিল সাদা কাপড়। যদি তিনি জাহান্নামের অধিবাসী হতেন, তবে সাদা কাপড় পরে থাকতেন না।'

পরবর্তীতে তিনি ﷺ আরেকটি স্বপ্ন দেখেন। এবারে তিনি দেখেন, ওয়ারাকাহ জান্নাতে অবস্থান করছেন এবং তাঁর দুজন অভিভাবক রয়েছে। এই স্বপ্ন থেকে বোঝা যায়, ওয়ারাকাহ জান্নাতে যাবেন, কেননা তাঁর ঈমান সঠিক ছিল।

সালমান আল ফারিসী ﷺ

সালমান আল ফারিসীর কাহিনি খুবই চমকপ্রদ। তাঁর নিজের বর্ণনা থেকেই সেই কাহিনি সংরক্ষিত রয়েছে। সালমান আল ফারিসীর বৃদ্ধ বয়সের ঘটনা, একদিন ইবন আব্বাস ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর জীবনের গল্প শুনতে চাইলেন। তখন তিনি ইবন আব্বাসকে নিজের কাহিনি বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষায়–

"আমি ছিলাম ইস্পাহানের (বর্তমান ইরান) এক ফারসি যুবক। আমাদের গ্রামের নাম জাইয়্যান। আমার বাবা সেই অঞ্চলের প্রধান। আমরা ছিলাম 'মাজুস' (Magian) ধর্মের অনুসারী। আমি অনেক কষ্ট সহ্য করে অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই ধর্মের অনুসরণ করছিলাম। একজন ভালো মাজুস হওয়ার জন্য আমি কঠিন সাধনা করছি। এক সময় আমি 'আগুনের রক্ষক' হিসেবে উন্নীত হলাম।"

মাজুসি ধর্মাবলম্বীরা মঙ্গল ও অমঙ্গলের শক্তিতে বিশ্বাস করতো এবং আগুনের পূজা করতো। এটা ছিল শির্ক। আগুনের রক্ষক হওয়া সেই ধর্মের খুব উঁচু পদ ছিল। সালমানের ওপর সে দায়িত্ব এসে পড়ে। তাঁর কাজ ছিল আগুন জ্বালানো এবং কখনও যেন এটা নিভে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখা। প্রত্যেক গ্রামের মন্দিরেই এমন একটি করে আগুন জ্বালানো থাকতো। সেটা সর্বদা জ্বালিয়ে রাখার নিয়ম ছিল।

"আমার বাবার অনেক বড় ব্যবসা ছিল। একদিনের কথা। আব্বা একটা বাড়ি বানানোর কাজে সেদিন খুব ব্যস্ত। আমাকে বললেন ব্যবসার দিকটা দেখতে। আমার বাবা আমাকে এতো ভালোবাসতেন যে, তিনি আমাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতেন, ঘর থেকে বাইরে কোথাও যেতে দিতেন না। সেদিন ব্যবসার কাজে বাইরে পাঠানোর সময় আমাকে বাবা বললেন, শোনো বাবা, তুমি জানো তুমি আমার কতো প্রিয়। যদি তুমি ফিরতে দেরি করো, তাহলে চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে যাবো। এই বলে বাবা আমাকে কাজে পাঠালেন।

আমাকে এমনভাবে ঘরের মধ্যে রাখা হতো যেন আমি একটা বন্দী দাস। সেদিন খ্রিস্টানদের একটা গির্জার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের প্রার্থনার আওয়াজ শুনতে পেলাম। খুব কৌতূহলো হলো। কী ঘটছে জানার জন্য ভেতরে ঢুকতে চাইলাম। আমি কখনও বাড়ির বাইরে পা রাখি নি, পুরো বিষয়টাই আমার কাছে অভিনব, নতুন! বুঝতে পারলাম, মাজুসি ছাড়াও আরো ধর্ম রয়েছে।

গির্জার ভেতরে ঢুকবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সবাই প্রার্থনা করছে। আমি তাদের প্রার্থনার ভঙ্গিমা দেখে মুগ্ধ! সেখানেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত থেকে গেলাম, ওদিকে বাবার কাজ কিছুই করা হলো না। বাবা আমার এত চিন্তিত হয়ে পড়েন যে আমাকে খোঁজার জন্য চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। আমাকে দেখে বাবা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, তোমাকে কি আমি দেরি করতে নিষেধ করিনি? কী হয়েছিল?

- আমি খ্রিস্টানদের গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তাদের প্রার্থনা দেখার জন্য সেখানে ঢুকি। তাদের প্রার্থনার ব্যাপারে আরও জানতে গিয়ে আমি আপনার দেওয়া কাজের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

- দেখো বাবা, তাদের ধর্ম ভালো নয়। তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মই সবচেয়ে সেরা।

- না, তাদের ধর্ম আমাদের চেয়ে উত্তম।"

ছেলের মুখে এ কথা শোনার পর তাঁর বাবা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ছেলে নিজ ধর্ম বদলে ফেলবে এই আশঙ্কায় সে তাকে শেকল দিয়ে আটকে রাখলো।

গির্জায় ঢোকার পর সালমান একজনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'তোমাদের ধর্মের কেন্দ্র কোনটি?' লোকটি জবাব দিল, 'পবিত্র ভূমি, আশ-শাম (ফিলিস্তিন), লোকটা জবাব দিল।'

শেকলে বন্দী অবস্থায় সালমানের এই কথাটা মনে পড়ে গেল। অতি কষ্টে গির্জার লোকেদের কাছে একটা বার্তা পাঠাতে সক্ষম হলেন, 'যদি আপনারা আশ-শাম থেকে আগত কোনো কাফেলার সন্ধান পান, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন।'

এক সময় সালমানের কাছে কাছে বার্তা এল, 'শামগামী কাফেলা এসে গেছে।' সেই দিনই সালমান আল ফারিসী কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। অতঃপর এই কাফেলার সাথে পবিত্র ভূমি শামে গিয়ে পৌঁছান। এভাবেই সত্যের সন্ধানে তাঁর যাত্রার শুরু।

ধর্মের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকেই তিনি শিখতে চাইছিলেন। সিরিয়াতে গিয়েই খবর নিলেন এ ধর্মের সবচে জ্ঞানী ব্যক্তি কে। সবাই বললো বিশপের কাছে যাও, গির্জার পুরোহিত।

বিশপের কাছে গিয়ে নিজের সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন সালমান। তাকে বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে ধর্ম সম্পর্কে শিখতে চাই! বিশপ জবাব দিলেন, 'স্বাগতম! তুমি আমার সাথেই গির্জায় থেকে যাও।'

সালমান ফারিসী গির্জাতেই দিন কাটাতে লাগলেন। বিশপ কেমন ছিল বোঝার জন্য সালমান আল ফারিসীর একটা মন্তব্যই যথেষ্ট, তিনি বিশপ সম্পর্কে বলেন, "এই লোকটা অত্যন্ত অসৎ! মানুষদেরকে দান করতে উৎসাহ দিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দানের সব টাকা নিজের জন্য রেখে দিত। আমি তাকে খুবই ঘৃণা করতাম।"

অথচ এত ঘৃণা সত্ত্বেও তিনি সেই বিশপের সাথে রয়ে গেলেন। এর পেছনে কারণ ছিল তাঁর জ্ঞানার্জনের তীব্র স্পৃহা। দীর্ঘদিন এসব ব্যাপারে সালমান চুপ ছিলেন। বিশপ মারা যাওয়ার পর খ্রিস্টানরা যখন তার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করতে চাইলো, তখন তিনি মুখ খুললেন। বললেন, এই বিশপ ছিল একটা অসৎ আর খারাপ লোক।

- তারা রেগে হৈ হৈ করে উঠলো। তোমার কত বড় সাহস, বিশপকে নিয়ে এসব কথা বলো?

- আমি তোমাদেরকে প্রমাণ দিতে পারি। সালমান আল ফারিসী তাদেরকে সেই স্থানে নিয়ে গেলেন, যেখানে বিশপ তার সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ তার অনুসারীদের দেওয়া দানের মাল জমা করে রেখেছিল। সে সাত বাক্সভর্তি লুকোনো সোনা আর রূপা বের করলো।

সালমান ফারিসী বলেন, লোকেরা এতো রেগে গেলো যে, তারা শেষ পর্যন্ত ওই বিশপের মৃতদেহ ক্রুশবিদ্ধ করে তাতে পাথর ছুঁড়তে লাগলো।

এরপর তারা অন্য এক ব্যক্তিকে বিশপের স্থানে নিয়োগ করলো। তিনি এই ব্যক্তির সম্পর্কে বলেন, "আমি এমন চমৎকার মানুষ আর দেখিনি যে তার মতো এত যত্নের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। লোকটা ছিলেন দুনিয়ার প্রতি বিমুখ আর আখিরাত নিয়ে উদগ্রীব, দিন-রাত জুড়ে কঠোর সাধনা করতেন।"

এই আলেমের সাথেই সালমান ফারিসী সময় কাটাতে লাগলেন। তার কাছ থেকে দীক্ষা নিলেন, দ্বীনের ব্যাপারে শিখলেন, এবং ইবাদত করতে থাকলেন। একসময় এই বৃদ্ধ আলেমের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

"মৃত্যুশয্যায় আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আপনি তো আমার কাহিনি সবই জানেন যে, কীভাবে আমি সবকিছু পেরিয়ে এই ধর্মের শিক্ষা নিতে এসেছি। আপনার ওপর আল্লাহর হুকুম সমাগত, এখন আপনি কার কাছে আমাকে রেখে যেতে চান?

তিনি বললেন, বাবা, আমি যা করেছি সেরকম আর কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। তবে মসুল অঞ্চলে একজন আছেন। তিনি ঠিক আমার মতোই ইবাদতে মশগুল থাকেন, তুমি তার কাছে যাও।"

সালমান তখন আশ-শাম (ফিলিস্তিন/সিরিয়া) থেকে যাত্রা করে সুদূর মসুলে হাজির হলেন। মসুলের পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজের সমস্ত কাহিনি আগাগোড়া খুলে বললেন। এরপর বললেন, শামের পুরোহিত আমাকে মসুলে পাঠিয়েছেন। আপনি কি আমাকে আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিবেন?

পুরোহিত বললেন, 'অবশ্যই। তুমি আমার শিষ্য হতে পারো।'

এভাবে সালমান তার সাথে থাকতে লাগলেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন বেশ বৃদ্ধ। তার মৃত্যুও ঘনিয়ে আসছিল। সালমান তার কাছেও একই প্রশ্ন তুললেন।

- আমি আপনার কাছে খ্রিস্টধর্ম শিখতে এসেছিলাম। কিন্তু এখন আপনার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আপনার মৃত্যুর পর আমি কার কাছে যাবো?

- আমাদের পথের অনুসারী আর কারো কথাই আমার জানা নেই। শুধুমাত্র একজন বাদে। তুমি নিসিবিসের (নুসাইবিন) বিশপের কাছে যাও।

সালমান নিসিবিস পৌঁছে সেখানকার পুরোহিতের কাছে সব খুলে বলেন। নতুন করে তাঁর জীবন শুরু হলো নিসিবিসে। কিন্তু এই লোকটিও তখন জীবনসায়াহ্নে। সালমানের উস্তাদদের যেন মৃত্যুর মেলা বসেছিল, সবাই মারা যাচ্ছিল একে একে। তাদের পরে ধর্মের অনুসরণ করার মতো আর কেউ ছিল না। নিসিবিসের পুরোহিত মৃত্যুর সময় বলে গেলেন, আম্মুরিয়ার আলেম পুরোহিতের কাছে যেতে। সালমান ফারিসী তুরস্কের দিকে পা বাড়ালেন। আম্মুরিয়া হচ্ছে বর্তমান বাইজেন্টাইন।

আম্মুরিয়ায় জ্ঞানার্জন ও ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি সালমান নিজের একটা ব্যবসা আরম্ভ করলেন। লাভের টাকায় কিছু ভেড়া আর গরুও কিনলেন। এই শিক্ষকেরও শেষ সময় এগিয়ে আসলে তিনি পরবর্তী শিক্ষকের ব্যাপারে উপদেশ চাইলেন। আলেম উত্তর দিলেন, 'বাবা, আমার জানামতে এমন কেউ নেই যার কাছে আমি তোমাকে পাঠাতে পারবো। কিন্তু এখন নবী আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আসবেন আরবদের মধ্য থেকে। এরপর সেখান থেকে এমন এক স্থানে যাত্রা করবেন, যেখানে থাকবে খেজুর গাছের সমাহার আর তার দুইপাশে থাকবে পাথুরে ভূমি। তিনি কিছু সুস্পষ্ট চিহ্ন ধারণ করবেন। তিনি উপহারের খাবার খাবেন, কিন্তু দানের বস্তু ফিরিয়ে দিবেন। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুওয়াতের মোহর অঙ্কিত থাকবে। যদি পারো, সেখানে চলে যাও।'

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার আম্মুরিয়ার আলেমের বক্তব্য। তিনি সালমানকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের পথের আর কোনো অনুসারী জীবিত নেই। যারা ঈসার ﷺ দ্বীনকে সঠিকভাবে মেনে চলতেন, তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার নতুন বার্তা আসার সময় হয়ে গেছে। পৃথিবী এখন নতুন দিকনির্দেশনার জন্য অপেক্ষমান।

রাসূলুল্লাহর ﷺ তিনটি চিহ্নের কথাও সালমান ফারিসীকে বলা হয় -

এক, তিনি হবেন আরব। তিনি এমন এক স্থানে সফর করবেন, যেখানে অনেক খেজুর গাছ জন্মে আর সে ভূমির দুই পাশে হবে পাথুরে অঞ্চল।

দুই, তিনি লোকেদের সাদাকাহ গ্রহণ করেন না, কিন্তু উপহার নেন।

তিন, তাঁর পিঠে দুই কাঁধের মধ্যখানে অঙ্কিত মোহর। এটা হলো নবুওয়াত বা রিসালাতের চিহ্ন।

"আমি আরবে যাওয়ার পথ খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ কালব গোত্রের একদল বণিকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাদেরকে বললাম, 'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো, বিনিময়ে আমার সব সম্পদ তোমাদের। আমার গাভী-ভেড়া সব তোমাদের। তোমরা শুধু আমাকে আরবে নিয়ে চলো।"

অসাধারণ এই যুবক, অসাধারণ তাঁর কাহিনি! সত্যের খোঁজে পথে পথে ফেরা জীবনের গল্প!

লোকগুলো তাকে সাথে নিতে রাজি হলো। কিন্তু আরবে পৌঁছানোর পর বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পিছপা হলো না, মুহূর্তের মধ্যে চোখ উল্টে ফেললো–ওয়াদি আল কুরা নামক এলাকায় এসে সালমানকে দাস হিসেবে এক ইহুদি লোকের কাছে বিক্রি করে দিল। তখনকার দাসপ্রথাটা এমন ছিল যে একবার কেউ দাস হলে সেখান থেকে আর মুক্তির কোনো পথ নেই। দাস-দাসীর কথা না কেউ শোনে, না বিশ্বাস করে। তাই সে নিজেকে যতোই "স্বাধীন" বলে দাবি করুক, কেউ মানবে না। ইহুদি সেই লোক সালমানকে ওয়াদি আল-কুরায় নিয়ে গেলো।

"আমি জায়গাটি দেখে ভাবতে লাগলাম বোধহয় এই জায়গার কথাই পুরোহিত আমাকে বলেছিল। তখন আমার মালিকের এক জ্ঞাতিভাই এসে আমাকে তার কাছ থেকে কিনে নিল। সে ছিল বনু কুরাইযার অধিবাসী।" আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এই বনু কুরাইযা গোত্রের লোকেরা বাস করতো মদীনায়! সালমান তার নতুন মালিকের সাথে মদীনায় গিয়ে পৌঁছালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, এই জায়গাই তিনি খুঁজছিলেন। প্রচুর খেজুর গাছ আর দুইপাশে পাথুরে ভূমি। একদিকের অংশের নাম আল হাররা আর গারবিয়া, আরেক দিক হলো আল হাররা আশ-শাকিয়া। এভাবে প্রাকৃতিকভাবেই মদীনার দুইপাশের সীমান্ত সুরক্ষিত ছিল। দক্ষিণ দিকে ছিল গাছগাছালির দেয়াল।

"রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমন হলো। তিনি বছরের পর বছর মক্কায় কাটালেন, অথচ আমি এর কিছুই জানতে পারলাম না! দাসত্বের চাকায় পিষ্ট হয়ে আর কোনোদিকে খেয়াল করার অবস্থা ছিল না।" সালমান তখনও ইসলামের বার্তা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

একদিন আমি খেজুর গাছের ওপরে চড়ে আমার কাজ করছি। আমার মালিক গাছের নিচেই বসা। তার এক চাচাতো ভাই এসে রাগত স্বরে বলতে লাগলো, ইয়া মাবুদ, কায়লার বংশধরদের ওপর গযব পড়ুক! কোন এক মক্কার লোক নিজেকে নবী বলে দাবি করছে, আর তার জন্য ওরা কুবায় লোক জড়ো করছে।" আউস ও খাযরাজ গোত্র কায়লার বংশধর নামে পরিচিত ছিল।

সালমান বললেন, "কথাটা কানে আসামাত্র বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো। আমি কাঁপতে শুরু করলাম, এতো বেশি কাঁপুনি হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল গাছ থেকে সরাসরি আমার মালিকের ওপর গিয়ে পড়বো!"

এই একটি মুহূর্ত! যার জন্য বছরের পর বছর ধরে সালমান ফারিসী অপেক্ষা করেছেন। ঘর ছেড়েছেন, পরিবার ছেড়েছেন, অজানা-অচেনা কতো জায়গায় ঘুরে ফিরেছেন। শুধু সত্য জানার আশায়। পারস্য ছাড়লেন, শামে গেলেন, সেখান থেকে তুরস্ক, তারপর

ইরাক, শেষমেষ আরবে এসে পৌঁছালেন। আর আরব ভূমি ছিল পুরো দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটি এলাকা। এর পার্শ্ববর্তী পারস্য আর রোমের থেকেও বহু বহু দূরে। এই দূর পরবাসে সালমান একটা দাস হয়ে থেকে গেলেন শুধুই সত্য জানার জন্য। চিন্তা করা যায়, তিনি কী পরিমাণ একাকী বোধ করেছেন, ঘরের জন্য তাঁর মন কতোটা আনচান করেছে!

অবশেষে তিনি তাঁর আরাধ্য সংবাদটি শুনলেন।

"আমি দ্রুত গাছ থেকে নেমে এলাম, ওই লোকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। আমার মালিক আমার ঘাড়ে ধরে টেনে এনে মুখের ওপর ঘুষি বসালো। বললো, এত কিছু তোর জানার দরকার নেই। যা, কাজে যা। সেদিন সন্ধ্যার দিকে কিছু খাবার প্রস্তুত করে নিয়ে আমি কুবার দিকে রওনা হলাম। কুবা এলাকাটা মদীনার বাইরে। পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললাম, আমি শুনেছি আপনি খুব সজ্জন, অচেনা অসহায় লোকদেরকে আপনি নিজের সঙ্গী বানিয়ে নেন! আমি কিছু খাবার সাদাকাহ করতে চাই, আমার মনে হয় আপনিই এটার সবচেয়ে উপযুক্ত। এই বলে তাঁর হাতে খাবারগুলো দিয়ে দিলাম।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারগুলো নিলেন। এরপর তাঁর সঙ্গীদেরকে সেখান থেকে খেতে বললেন, কিন্তু নিজে তাদের সাথে খেতে বসলেন না।" এটা ছিল প্রথম চিহ্ন – নবীজি ﷺ নিজের জন্য দানের বস্তু গ্রহণ করেন না।

"পরদিন ফের সেখানে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিমধ্যে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে শুরু করেছেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, গতবার আপনাকে বলেছিলাম খাবারগুলো দান করতে চাই, কিন্তু আপনি সেখান থেকে খাননি। তাই এবার আমি আপনাকে এই খাবারগুলি উপহার হিসেবে দিয়ে সম্মানিত করতে চাই। এই বলে তাঁর দিকে খাবারগুলো বাড়িয়ে দিলাম। তিনি এবার তাঁর সাথীদের খেতে ডাকলেন, নিজেও তাদের সাথে যোগ দিলেন।

"এরপর আবারও তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি সে সময় মদীনার গোরস্থানে ছিলেন। একটু আগেই একজনের জানাযা হয়েছে। আমি নবীজীর ﷺ কাছে গিয়ে কুশল বিনিময় করলাম। তাঁর চারপাশে ঘুরে পিঠের চিহ্ন দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি কোনো একটা চিহ্নের কথা জানতে পেরে সেটা খোঁজার চেষ্টা করছি। তিনি নিজের পিঠ উন্মুক্ত করে দিলেন। তাঁর গায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে দেওয়ামাত্র আমার চোখের সামনে সেই চিহ্নটি স্পষ্ট হয়ে গেলো–রিসালাতের মোহর! নবীজির ﷺ সামনে মাটিতে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম! তাঁর পায়ে চুমু দিতে লাগলাম। আমি কান্নায় ভেসে যাচ্ছিলাম।"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন।" কেননা নবীজি ﷺ নিজের

জন্য কারো সিজদা নিতেন না। এরপর তিনি সালমানকে তাঁর কাহিনি শোনাতে বললেন। সালমান নবীজীকে ﷺ সব খুলে বললেন।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি নিজের এই কাহিনি আমার সাহাবীদেরকেও শোনাও।"

সালমান ফারিসী বলেন, "হে ইবনে আব্বাস, আমি আমার কাহিনি ঠিক সেভাবেই তাদেরকে শুনিয়েছি, যেভাবে আমি আজ তোমার কাছে বর্ণনা করছি।"

"দাস হওয়ার কারণে আমি বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ কোনোটাতেই অংশগ্রহণ করতে পারিনি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একদিন ডেকে বললেন, সালমান, নিজেকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করো।' দাসপ্রথা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দাস মনিবের সাথে চুক্তি করতে পারত। দাস একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করবে এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা কামাতে পারলে, সে নিজেকে দাসত্ব থেকে ছুটিয়ে নিতে পারে। সালমান ফারিসী তাঁর মালিকের কাছে মুক্তির আবেদন করলেন। তাঁর মালিক বললো, 'আমার জন্য তিনশ খেজুর গাছ লাগাবে, আর এই তিনশ গাছের একটাও যেন নষ্ট না হয়। আর সেই সাথে আমাকে চল্লিশ আউন্স স্বর্ণ দিতে হবে, তাহলে তুমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে।"

নবীজির ﷺ কাছে ছুটে গিয়ে সালমান তাঁর মালিকের এই অসম্ভব দাবির কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'চিন্তা করো না।' সাহাবাদের ﷺ ডেকে বললেন, 'তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো।'

সালমান ফারিসী বলেন, "এরপর সাহাবীদের কেউ তিরিশটা খেজুরের বীজ নিয়ে এলো, কেউ আনলো, কেউ বিশটা, কেউ দশটা, যে যেমন পারছিল আনছিল। এমনি করে আমার তিনশটা বীজ যোগাড় হয়ে গেল।"

নবীজি ﷺ বললেন, 'যখন তোমার কাছে ৩০০টা বীজ হয়ে যাবে, তখন সেগুলোর জন্য গর্ত খুঁড়বে, কিন্তু আগেই বীজ বপন কোরো না, আমার সাথে দেখা করে যেও।'

সালমান তিনশটা গর্ত খুঁড়লেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা অনুযায়ী সেগুলো সেভাবেই রেখে তাকে বলতে গেলেন। সালমান বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের বরকতময় হাত দিয়ে সেই তিনশটি বীজ একটি একটি করে বপন করলেন। সেই তিনশ গাছের একটা গাছও (ফল দেওয়ার আগে) মরেনি।'

এরপর বাকি থাকে চল্লিশ আউন্স স্বর্ণ। কীভাবে এই স্বর্ণের যোগাড় হবে সে ব্যাপারে সালমানের কোনো ধারণাই ছিল না। একদিন রাসূলুল্লাহকে ﷺ কিছু স্বর্ণ দেওয়া হলো। তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাদের পারস্যের সেই ভাই কোথায়?'

সাহাবীরা ﷺ সালমানের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। সালমান এলে নবীজি ﷺ তাঁকে বলেন, 'এই নাও স্বর্ণ, এটা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নাও।'

- ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এতটুকু স্বর্ণ দিয়ে কী হবে?

- এটা নাও, এটাই যথেষ্ট হবে।

সালমান বলেন, "মাপতে গিয়ে দেখি, ওই এক রত্তি স্বর্ণের ওজন ঠিক চল্লিশ আউন্স! আমি সেই স্বর্ণের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্ত, স্বাধীন হলাম! এরপর নবীজির ﷺ সাথে সব জিহাদে আমি অংশগ্রহণ করেছি, একটিও বাদ দেইনি।" [16]

সালমান আল ফারিসী প্রথমবারের মতো খন্দকের যুদ্ধে যোগ দেন। শত্রুদের জন্য মাটি খুঁড়ে পরিখা তৈরি করার চমকপ্রদ বুদ্ধিটা তিনিই দিয়েছিলেন।

শিক্ষা

সালমান ফারিসী তাঁর জীবনের শুরুতে দ্বীনের শিক্ষা নিয়েছিলেন সিরিয়ার পুরোহিতের কাছে। সালমান তার সম্পর্কে বলেন, 'আমি তার সাথে ছিলাম, কিন্তু সে ছিল অসৎ এক লোক। মানুষের থেকে দান-খয়রাত চাইতো, এরপর সেগুলো গরিবদের মধ্যে না বিলিয়ে নিজের জন্য জমা করে রাখতো। এভাবে সাত বাক্স ভরা সোনা আর রূপা তার কাছে জড়ো হলো! তার এইসব কাজ দেখার পর আমি তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম।' – একজন মানুষ সত্য জানার জন্য পথে পথে ঘুরছে। অথচ শেষমেষ সে এমন এক লোকের সন্ধান পায়, যে বাইরে "আলেম" সাজলেও ভেতরে ভেতরে অসৎ। সত্য জানার প্রতি বিতৃষ্ণা এনে দেওয়ার জন্য যা কিছু দরকার, তার সবকিছুই সেই পুরোহিতের স্বভাবে উপস্থিত ছিল। কিন্তু সালমান ফারিসী ছিলেন নিজের লক্ষ্যে অবিচল, দৃঢ়। তাঁর সত্যকে খুঁজে বের করার আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, এসব দেখেও তিনি সত্য খোঁজার ব্যাপারে বিরত হননি।

আজকাল দেখা যায় যে, মুসলিমদের কাজের কারণে লোকেরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। লোকে বলে, মুসলিমদের আচরণের জন্যই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে না। এই কথাটি কিছু অংশে সত্য হলেও পুরোপুরি সঠিক নয়। কেউ যদি সত্যপথ খুঁজে বের করার জন্য সত্যিই আন্তরিক হয়, তবে তার বোঝা প্রয়োজন যে, সমাজের সবাই সত্যের অনুসারী নাও হতে পারে। তাই কোনো ব্যক্তি বা দল ভুল মানেই এটা না যে, সেই ধর্মও ভুল। সালমান ফারিসী একটা অসৎ লোকের দেখা পাওয়ার পরেও সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্মকে বাতিল মনে করেননি। বরং তিনি সত্যকে জানার জন্য আরো উঠেপড়ে লেগেছেন। সেই লোকের সাথেই থেকে গিয়ে, আরও ভালো কিছুর সন্ধান করেছেন। আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল তাঁকে তাঁর এই ধৈর্যের পুরস্কার দিয়েছেন। সালমান পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠ আলেমদের থেকে ইলম অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন।

[16] সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৯।

লোকেরা সেই দুর্বৃত্ত পুরোহিতের বদলে এমন একজনকে সেখানে নিয়োগ দেয়, যাকে দেখে সালমান বলেছিলেন, মুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার দেখা সবচেয়ে উত্তম লোক ছিলেন তিনি।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুহাম্মদে বলেছেন,

> **"আর যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন আর তাদের প্রদান করেন তাকওয়া।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১৭)**

পুরো ঘটনাটি থেকে আরো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা যায়:
প্রথমত, যারা হিদায়াতের খোঁজে থাকে, তাদেরকে হিদায়াত দেওয়া হয়। কিন্তু অল্লাহর হিদায়াত পাওয়ার জন্য নিজেদেরকেও পরিশ্রম করতে হবে। যখন কেউ আল্লাহর জন্য কষ্ট করবে, ত্যাগস্বীকার করবে; তখন তার পুরস্কার হবে অসামান্য। যদি কেউ আল্লাহর দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, অল্লাহ তাঁর দিকে দৌড়ে আসবেন। কিন্তু মানুষকে প্রথম ধাপটি নিতে হবে। সালমান ফারিসী ধীরে ধীরে ঠিকই ইসলামকে খুঁজে পেয়েছিলেন, যদিও তিনি প্রথমে ছিলেন এমন একটি জায়গায় যা ইসলাম থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয়ত, কারো ভুল কাজ যেন আমাদেরকে দমিয়ে না দেয়। ধর্ম তাদের অসৎ কাজের উৎস নয়–সালমান ফারিসী এটা বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই একজন অসৎ লোকের কারণে সেই ধর্মকেই অবিশ্বাস করা শুরু করে দেননি। একটা পুরোহিত খারাপ বলেই তিনি আশা হারিয়ে ফেলেননি। সত্য জানার আগ্রহ যেন মানুষের ভুল কাজ নিয়ে আমাদের বিতৃষ্ণা বা ঘৃণাকেও ছাপিয়ে যায়, এটা খুব দরকার।

তৃতীয়ত, মুসলিমদেরকে নতুন মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব মুসলিম সমাজের। মুহাম্মাদ ﷺ স্বয়ং সালমানকে সাহায্য করেছেন, সাহাবীদেরকেও ﷺ সহযোগিতা করতে বলেছেন। নতুন ইসলাম গ্রহণ করার পরে বেশিরভাগ সময়েই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। নওমুসলিমদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করাও এক ধরনের দাওয়াহ। খালি মুখের কথায় দাওয়াহ হয় না। যারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের দায়িত্ব নেওয়াও এর অন্তর্গত।

সাহাবীদের ﷺ জীবনের দিকে লক্ষ করলে দেখব, নতুন মুসলিমদের অনেকেরই সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। বিলাল ﷺ ছিলেন একজন দাস, আবু বকর ﷺ তাঁকে মুক্ত করেন। প্রথম যুগের অনেক মুসলিমই দাস ছিল। এই রকম অবস্থায় বড় ধরনের সহযোগিতার দরকার পড়ে। এই সহযোগিতাটুকু না দিলে তাদের দ্বীন গ্রহণের প্রাথমিক সময়টা এত কঠিন হয়ে পড়ে, যে অনেকসময় তারা দ্বীন থেকেই সরে যায়। আমেরিকায় একটা পরিসংখ্যানে জানা যায়, বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণের নতুন মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত ইসলাম ছেড়ে দেয়। ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে ঘর থেকে

বের করে দেওয়া হয়। পরিবারের আপন মানুষগুলো পর হয়ে যায়। তাদের সামাজিক অবস্থান বদলে যায়। তাই এরকম পরিস্থিতিতে তাদের অনেক সহানুভূতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কয়েকটি ব্যাপার চলে আসার আগেই তোমরা ভালো কাজ করে নাও। দারিদ্র্য তোমাকে বিস্মরণ করিয়ে দেওয়ার আগেই সৎ কাজ করো।' যখন লোক খালি পেটে থাকে, তখন আধ্যাত্মিকতা, ইলম অর্জন– এসবের প্রতি সে আকর্ষণ বোধ নাও করতে পারে। তাই মানুষের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখাও দাওয়াহ দেওয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নবুওয়াহ, দাওয়াহ এবং প্রতিক্রিয়া

নবুওয়াতপ্রাপ্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। নিশ্চুপ, নিমগ্ন, নিবিষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদত করতেন। চারপাশের সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন। হঠাৎ একদিন জিবরীল ﷺ তাঁর কাছে হাজির হলেন। জিবরীল ﷺ সম্পর্কে উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'কুচকুচে কালো কেশ আর ধবধবে শুভ্র পোশাক পরা এক লোক, তাঁর মাঝে ভ্রমণের কোনো ছাপ নেই।' অর্থাৎ তিনি মাঝে মাঝেই মানুষের বেশ ধরে আসতেন। কিন্তু সেদিন, ওয়াহী আনার সেই প্রথম দিনে কোনো মানুষের রূপে নয়, নিজের রূপেই মুহাম্মাদের ﷺ সামনে নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রকাণ্ড সেই সত্তা, আচ্ছন্নকারী আবির্ভাব। কয়েকশ পাখা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছে, তাতে শোভা পাচ্ছে নাম-না-জানা অগণিত মণিমুক্তো আর প্রবাল।

মুহাম্মাদের ﷺ কাছে এসে বললেন, 'ইক্বরা' –তিলাওয়াত করো। ইক্বরা শব্দটার দুটি অর্থ আছে। তার মধ্যে একটি হলো, পড়া এবং আরেকটি তিলাওয়াত করা। এই প্রেক্ষিতে অর্থটা ছিল 'তিলাওয়াত করো।'

মুহাম্মাদ ﷺ উত্তরে বলে উঠলেন, 'আমি তো পড়তে জানিনা!'

জিবরীল তখন মুহাম্মাদকে ﷺ শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ইক্বরা।'

মুহাম্মাদ ﷺ আবারও বললেন, 'আমি তো পড়তে জানিনা!'

পুনরায় জিবরীল তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে বললেন, 'ইক্বরা।'

এভাবে একবার, দুবার, তিনবার করার পর অবশেষে তিনি কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, এগুলো ছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।

> **"পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞানের), যা সে জানতো না।" (সূরা আলাক, ৯৬: ১-৫)**

জিবরীলের ﷺ সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রথম সাক্ষাৎ এমনই ছিল। পুরো ঘটনার

আকস্মিকতায় নবীজি ﷺ বিহ্বল হয়ে পড়েন। ঘরে ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী খাদিজাকে ﷺ বলেন, 'জাম্মিলুনি, জাম্মিলুনি'—আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও! নবীজি ﷺ তখনও ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। তাঁর শীত করছিল। মা খাদিজা ﷺ তাঁকে চাদরে ঢেকে দিলেন, কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলে তিনি খাদিজার ﷺ কাছে সব কথা খুলে বললেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল। তিনি জ্বিন, আত্মা, জাদু ইত্যাদি বিষয় মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁর সাথে যা ঘটেছে, সেগুলোর সাথে জাদুকরদের জাদুর মিল আছে ভেবেই তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সব শুনে খাদিজা ﷺ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন,

'না, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনও ত্যাগ করবেন না! আপনি ন্যায়পরায়ণ, আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় করেন, অসহায়দের সাহায্য করেন, মেহমানদারি করেন। আপনার সাথে যা ঘটেছে তা কখনোই শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না।'[17]

রাসূলুল্লাহর ﷺ উত্তম আচার-আচরণ ও কাজের জন্য খাদিজা ﷺ নিশ্চিত জানতেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে অবশ্যই হেফাজত করবেন।

খাদিজা ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবন নাওফালের কাছে নবীজিকে ﷺ নিয়ে যান। ওয়ারাকাহ আইয়ামে জাহেলিয়াতে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁর কাছে বাইবেলের কিছু পাণ্ডুলিপিও ছিল, সেগুলো থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন। খাদিজা ﷺ তাঁর কাছে মুহাম্মাদের ﷺ পুরো ঘটনা খুলে বললেন। ওয়ারাকাহ বললেন, 'যিনি এসেছিলেন তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরীল ﷺ—মূসা নবীর কাছে তিনিই এসেছিলেন।'

ওয়ারাকাহ তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যে নবীজির ﷺ কাছে আসলে জিবরীল ﷺ এসেছে। যেমনি করে তিনি মূসার কাছে ওয়াহী নিয়ে আসেন, ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছেও ওয়াহীসহ আগমন করেছেন। ওয়ারাকাহ মূসা নবীর সাথে নবীজির ﷺ ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছিলেন। তিনি নবীজিকে ﷺ কিছু কথা বলেন। কথাগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেন, 'হায়! যদি আমি সে সময় তরুণ থাকতাম যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ অবাক হয়ে বললেন, 'আমার কওম আমাকে আমার দেশ থেকে বের করে দিবে? তা কী করে হয়!' প্রশ্নটা তখনকার পরিস্থিতিতে খুবই স্বাভাবিক—রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় একজন সম্মানিত ও প্রশংসিত ব্যক্তি, মক্কার সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু হাশিমের সন্তান। না তিনি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করেছেন, না কোনো বিবাদে লিপ্ত

---

[17] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪।

হয়েছেন। তাঁর মতো মানুষকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হবে–এটা চিন্তারও বাইরে। উপরন্তু, মক্কার সামাজিক ঐতিহ্যই ছিল এমন যে, কাউকে তার কওম থেকে বের করে দেওয়াটা চরম ঘৃণিত কাজ হিসেবে ধরা হতো। গোত্রতান্ত্রিক সেই সমাজে গোত্রভিত্তিক একতাই ছিল মরুভূমির চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার। আর তাই গোত্রের লোকেদের মাঝে বিরাজ করতো বিশ্বাসের এক অটুট বন্ধন।

ওয়ারাকাহ বলেন, 'যারাই তোমার মতো এই ওয়াহী লাভ করেছে, তাদের সবার সাথে লোকেরা শত্রুতা করেছে, তাদেরকে ঘরছাড়া করেছে।' এই একটি মন্তব্য দ্বারাই ওয়ারাকার অগাধ জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি ইতিহাস জানতেন। খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘর্ষের পরিণতি কী হতে পারে। তিনি জানতেন যে মুহাম্মাদ ﷺ যতোই প্রশংসার পাত্র হন না কেন, যখনই তিনি মানুষকের ইসলামের পথে ডাকতে আরম্ভ করবেন, তখন তাঁর সাথে এমনটাই ঘটবে। ওয়ারাকাহ ইবন নাওফালের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাঁর প্রতিটি অনুমান ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ পরবর্তী জীবনের জন্য সতর্কবার্তা। তিনি নবীজিকে ﷺ এটাই বুঝিয়ে দিলেন যে এই কাজ কোনো সহজ কাজ নয়।

ইক্বরা: জ্ঞানভিত্তিক এক উম্মাহ

মুহাম্মাদের ﷺ ওপর অবতীর্ণ কুরআনের প্রথম শব্দটি ছিল "ইক্বরা।"–এর তাৎপর্য হলো, আমরা মুসলিমরা সেই উম্মাহ যে উম্মাহ অধ্যয়ন করে, গবেষণা করে এবং সর্বোপরি দ্বীনের ইলম বা জ্ঞানার্জন করে। এই একটি শব্দ একটি নিরক্ষর জাতির মাঝে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে তৈরি করেছিল বিশ্ববরেণ্য আলেমসমাজ। সে সময় নবীজির ﷺ অনুসারীরা ছিল নিরক্ষর, কিন্তু এই শব্দগুলো তাদেরকে লিখতে ও পড়তে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহ বিশ্বের উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানী জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই উম্মাহর মাঝে যে পরিমাণ আলেম তৈরি হয়েছে, তা অতুলনীয়! মুসলিম উম্মাহর আলেমদের গুণাগুণ লক্ষ করলে দেখা যাবে, তারা অনন্য–তাদের সাথে অন্য কোনো জাতির বিদ্বানদের তুলনাই হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, ইমাম বুখারি–আড়াই লক্ষেরও বেশি হাদীস তাঁর ছিল মুখস্থ। কিংবা ইমাম শাফেঈ–যিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন কোনো বই খুলি তখন আমি তার একটা পাতা ঢেকে রাখি, কারণ আমি একটা পাতার সাথে আরেকটা পাতার তথ্য মিলিয়ে ফেলতে চাই না।' তাদের ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ফটোগ্রাফিক মেমোরি, ছবির মতো করে সব তথ্য মনে রাখতে পারার ক্ষমতা। অথবা শাইখ আল ওয়াফা ইবন আকীল, যিনি তিনশ গ্রন্থের একটি বিশ্বকোষ লেখেন। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা এখন আর নেই। ওটার মূল পাণ্ডুলিপি বাগদাদ লাইব্রেরি থেকে লুট করে নেওয়া হয়। এটাই

ছিল "ইক্বরা" শব্দের শক্তি, যা পুরো উম্মাহর এতটা পরিবর্তন এনে দেয়।

রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একটু ভিন্ন। তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না। তাঁর কাছে এই শব্দটির মানে ছিল 'তিলাওয়াত করুন', অর্থাৎ তিলাওয়াত করুন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণীর পুনরাবৃত্তি করুন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর রাসূলকে ﷺ নিরক্ষরই রাখতে চেয়েছেন, এটি ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীজির ﷺ জন্য হুকুম। সূরা আল আনকাবূতে আছে,

> "এবং আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই আপনার উপর সন্দেহ আরোপ করতো।" (সূরা আনকাবূত, ২৯: ৪৮)

আল্লাহ তাআলাই বলছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের আগে কোনো কিতাব পাঠ করেননি, তাঁর মাঝে লেখার বা পড়ার যোগ্যতা ছিল না। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। সাধারণ মুসলিমদের জন্য পড়তে জানাই হচ্ছে জ্ঞানার্জনের চাবিকাঠি। কিন্তু নবীজির ﷺ জন্য সত্যি বলতে, লিখতে-পড়তে পারাটা জরুরি ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং জিবরীল থেকে শিক্ষা নিচ্ছিলেন। সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে যে জন জ্ঞানার্জন করছেন, তাঁর জন্য বই থেকে শেখার মতো আসলেই কিছু নেই। আর তাই, তাঁর জন্য ইক্বরা শব্দটির অর্থ হলো "তিলাওয়াত করুন", কিন্তু উম্মাহর জন্য এর অর্থ হলো, 'পড়ুন।' মুসলিমদেরকে লিখতে ও পড়তে শিখতে হবে।

> "নূন। কসম কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার।"(সূরা কালাম, ৬৮: ১)

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কিছু নিয়ে শপথ করেন, তার অর্থ হলো সেই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ কলমের নামে শপথ করেছেন। বদরের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী মুশরিকদের এই মর্মে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা দশজন মুসলিমকে লিখতে ও পড়তে শেখাবে। এসব থেকে বোঝা যায় ইসলাম জ্ঞানার্জনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এই উম্মাহ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পারদর্শী এক উম্মাহ, যদিও দুর্ভাগ্যবশত আজ এই উম্মাহ তার দায়িত্ব পালনে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। ইলম অর্জনের ব্যাপারে উম্মাহর বর্তমান প্রজন্মের এই অনীহা যেন পরবর্তী প্রজন্মেও প্রসারিত না হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। একবার বাচ্চাদের মধ্যে একটা জরিপ চালানো হয়। বিষয়বস্তু ছিল–কারা পড়তে ভালোবাসে আর কারা পড়তে ভালোবাসে না। জরিপের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে তারতম্যের কারণে কিছু বাচ্চা পড়তে ভালোবাসছে, আর অন্যেরা পড়তে অপছন্দ করছে সেগুলো খুঁজে বের করা।

ফলাফলে দেখা গেল যেসব শিশুরা পড়তে পছন্দ করে, তাদের মাঝে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এক, তাদের বাবা-মা'রাও পড়তে ভালোবাসে। শিশুর বিকাশের প্রথম বছরগুলোই তার অনুকরণ করার সময়। একটা শিশু যখন তার বাবা-মাকে বই পড়তে দেখে, তখন তারা পড়তে না জানলেও আপনা-আপনি বই বা ম্যাগাজিন নিয়ে খেলতে শুরু করে। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাই বাড়িতে শিশুদের সামনে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা হলে তাদের জন্য বই পড়ার দৃষ্টান্ত তৈরি করা সম্ভব।

দুই, যদি তারা বই-পুস্তক সমৃদ্ধ কোনো জায়গায় বেড়ে ওঠে, অর্থাৎ যেখানে প্রচুর বই কিংবা লাইব্রেরি আছে। অর্থাৎ তাদের জন্য বই খুব সহজলভ্য, এসব ক্ষেত্রে বড় হলেও তারা পড়তে ভালোবাসে।

তিন, তাদের নিজস্ব লাইব্রেরি থাকলে।

চার, তাদের বাবা-মা যদি তাদেরকে প্রায়ই বইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে থাকেন।

পাঁচ, তারা এমন ধরনের শিশু যারা টেলিভিশন খুব কম দেখে কিংবা একেবারেই দেখে না।

বাবা-মায়েদের জন্য তথ্যগুলো অতীব জরুরি। লক্ষণীয় হচ্ছে, বাচ্চাদের বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর অর্থ এই নয় যে, আজেবাজে গল্পের বই পড়বে বা যা-খুশি তা-ই পড়বে। কিছু বই আছে যেগুলো মানসিক বিকাশের সময়ে পড়া হলে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন মদীনার প্রাথমিক যুগে এমন একটি ঘটনা আছে, রাসূল ﷺ দেখলেন উমার ইবন খাত্তাব ﵁ তাওরাতের পাতা উল্টাচ্ছেন। রাসূল ﷺ রেগে গেলেন, উমারকে এই কাজের জন্য কঠিনভাবে তিরস্কার করলেন। তবে তাওরাত পড়ার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সাময়িক। মুসলিমরা পরবর্তীতে নিজেদের আদর্শে বলীয়ান হলে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে বনী ইসরাইলের কিতাব পড়তে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছি। তোমরা এসব গল্পে বিশ্বাসও করবে না, অবিশ্বাসও করবে না।' অন্য কথায়, এইসব কিতাবে এমন কিছু কথা আছে, যেগুলোর সত্যতা কুরআন বা হাদীস দিয়ে যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই, সেগুলোকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করা ঠিক হবে না।

যেকোনো পাঠ্যসূচি এমনভাবে সাজানো উচিত যেন তা ছাত্রদের জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। রাসূল ﷺ জানতেন, প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের হাতে তাওরাত চলে গেলে তা তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করবে। ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, 'তুমি যদি মানুষের সাথে এমন কথা বলো যা তাদের বোধশক্তির বাইরে, তাহলে সেটা তাদের জন্য ফিতনা হতে পারে।' কিছু জ্ঞান হচ্ছে কাজের আর কিছু অনর্থক। রাসূল ﷺ প্রায়ই আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী

জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করছি, এবং আমি সেই জ্ঞান থেকে পানাহ চাই যে জ্ঞান কোনো কাজে আসে না।' সূরা আল বাকারাহতে আছে, দুজন ফেরেশতা, হারুত এবং মারুত দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মানুষকে জাদুর বিষয়ে শিক্ষা দিতে, যা ছিল ঈমানবিনাশী জ্ঞান।

সংক্ষেপে এই ছিল রাসূলের ﷺ কাছে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতের মর্মার্থ।

ওয়াহী: আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী বাণীর বিভিন্ন রূপ

ইবনুল কায়্যিম ওয়াহীর বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি অসাধারণ একজন আলিম, ইবনে তাইমিয়ার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি বলেন, প্রথম প্রকারের ওয়াহী হলো সত্য স্বপ্ন। এই উপায়েই রাসূল ﷺ প্রথম ওয়াহী লাভ করা শুরু করেন। জিবরীল কর্তৃক ওয়াহী নাযিলের পূর্বে টানা ছয় মাস ধরে রাসূল ﷺ নিয়মিত স্বপ্ন দেখতেন। রাতের বেলায় যে স্বপ্ন দেখতেন, পরদিন দিনের বেলায় সে স্বপ্ন সত্যি হতো, এইভাবে চলেছিল প্রায় ছয় মাস!

ওয়াহীর প্রথম প্রকার: স্বপ্ন

রাসূল ﷺ বলেছেন, যেসব স্বপ্ন সত্য, সেগুলো নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রাসূল ﷺ এর নবুওয়াতের জীবন ছিল তেইশ বছর দীর্ঘ, আর তিনি সত্য স্বপ্ন দেখেছেন ছয় মাস ধরে। তেইশ বছর সময়টাকে ছয় মাস দিয়ে ভাগ করলে অনুপাত দাঁড়ায় ১: ৪৬, ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন কেবল নবীরা নন, যে কেউই দেখে থাকে। পার্থক্য হলো এই–নবীদের স্বপ্ন এক ধরনের ওয়াহী হিসেবে বিবেচিত, অন্যদেরটা তা নয়। সাধারণ মানুষদের দেখা স্বপ্নের ব্যাপারে রাসূল ﷺ তিনটি প্রকারভেদ বলেছেন,

১) সত্য স্বপ্ন: এ ধরনের স্বপ্ন সত্যি হয় অথবা যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সে ব্যাখ্যা অনুসারে এই স্বপ্ন সত্যি হয়।

২) শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন: রাসূল ﷺ বলেন, 'এই স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে এবং সে তোমাদের ক্ষতি করতে চায়।' রাসূল ﷺ বলেন, 'যদি এমন স্বপ্ন দেখ, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না।' কারণ, শয়তান চায় আমরা খারাপ স্বপ্ন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ি আর মানুষকে বলে বেড়াই। রাসূল ﷺ বলেছেন এসব স্বপ্নের কথা কাউকে না বলতে, আর সেগুলো ভুলে যেতে।

৩) সাধারণ স্বপ্ন: এমন স্বপ্ন যা নিয়ে মানুষ দিনের বেলা ভাবে এবং রাতের বেলায় তা স্বপ্নে দেখতে পায়, এ স্বপ্নগুলো বস্তুত নিজের ভাবনার প্রতিফলন, যা নফস থেকে আসে।

ওয়াহীর দ্বিতীয় প্রকার

এই প্রকার হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসূলের ﷺ ওপর ওয়াহী নাযিল হয় কিন্তু জিবরীল ﷺ সরাসরি মুহাম্মাদের ﷺ সামনে হাজির হন না। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, সেই মহান আত্মা (জিবরীল) আমাকে জানিয়েছেন, 'নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ের আগে কারো মৃত্যু ঘটবে না। তাই আল্লাহকে ভয় করো এবং বিনীতভাবে তাঁর কাছে চাও। অধৈর্য হয়ে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে চলে যেও না। আল্লাহর আনুগত্য করা ছাড়া আল্লাহর নিআমত অর্জন করা সম্ভব নয়।'

ওয়াহীর তৃতীয় প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহী নাযিলের সময় ফেরেশতা মুহাম্মাদের ﷺ সামনে মানুষের আকৃতি নিয়ে হাজির হন। এর উদাহরণ হলো হাদীসে জিবরীল, জিবরীল ﷺ মানুষের বেশে এসেছিলেন আর তাঁকে মুহাম্মাদ ﷺ এবং অন্যরা দেখেছিলেন।

ওয়াহীর চতুর্থ প্রকার

ফেরেশতা ঘন্টার মতো শব্দ করে আসতেন। এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন আবির্ভাব। জিবরীল তখন রাসূলকে ﷺ শক্ত করে চেপে ধরতেন, শীতের দিনেও নবীজির ﷺ ঘাম ছুটে যেতো। জিবরীল ﷺ তাঁর ওপরে উঠে বসতেন, তাই রাসূল ﷺ অস্বাভাবিক ভার অনুভব করতেন। আর সেই সাথে শুনতেন ঘন্টা বাজার আওয়াজ পেতেন, সম্ভবত সেটি ছিল জিবরীলের পাখার কম্পনের শব্দ। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 'যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর আদেশ প্রেরণ করেন, তখন ফেরেশতারা এতটাই বিনয়াবত হয়ে পড়ে যে তাদের পাখাগুলো কাঁপতে থাকে এবং সেই পাখা কাঁপার শব্দ শুনতে পাথরের ওপর চেইন টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজের মতো শোনায়।'

জিবরীল ﷺ যখন এই রূপে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকটে আসতেন, তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ ওজন বেড়ে যেতো। দেখা যেতো, তিনি উটের উপর বসে আছেন, আর জিবরীল এসেছেন, তখন প্রবল চাপের ফলে বাধ্য হয়ে উট পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ত। যাইদ ইবন হারিসা ﷺ বলেন, "একদিন নবীজি ﷺ বসে ছিলেন। আমার পায়ের উপর তাঁর হাঁটু রাখা ছিল। এমতাবস্থায় ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। আমি তখন নবীজির ﷺ হাঁটুর তীব্র চাপ অনুভব করি। আমার উরু যেন প্রচণ্ড চাপে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল।"

ওয়াহীর পঞ্চম প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহী নাযিলের সময় ফেরেশতা তার স্বরূপে আগমন করেন। এরকম দু'বার হয়েছিল। সূরা নাজমে এর উল্লেখ আছে।

"নিশ্চয় সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিল, দূরদিগন্তের সিদরাহ-গাছের

কাছে...” (সূরা নাজম, ৫৩: ১৩-১৪)

জিবরীলের ﷺ পাখা এত বড় ছিল যে সেগুলো দিগন্ত ছেয়ে ফেলত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন জিবরীল তার স্বরূপে আসতেন, 'তিনি যেদিকেই তাকাতেন, সেদিকেই জিবরীলের পাখা দেখতে পেতেন।'

ওয়াহীর ষষ্ঠ প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে সরাসরি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে কথা বলেছেন, কোনো মাধ্যম ছাড়াই। এটা হয়েছিল আল-মিরাজের সময়। মূসার ﷺ সাথেও আল্লাহ এভাবে কথা বলেছিলেন। এই ছয় ভাবেই নবীজির ﷺ কাছে ওয়াহী নাযিল হয়েছে। এক এক সময় এক এক ভাবে। নবীজির ﷺ কাছে জিবরীল তাঁর নিজ রূপে কেবল দুবারই এসেছিলেন।

অগ্রগামী মুসলিমগণ

খাদিজা ﷺ ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নবীজিকে ﷺ সাহায্য-সহযোগিতা করে যান। ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দাস হলেন যাইদ ইবন হারিসা, ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম শিশু হলেন আলী ইবন আবি তালিব এবং ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ হলেন আবু বকর সিদ্দীক ﷺ। তবে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ কে তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন আবু বকর ﷺ, কেউ বলেন আলী ইবন আবি তালিব ﷺ। ইবন হাজার আল-আসকালানী এ মতবিরোধটি সমাধানের চেষ্টা করেন, তাঁর মতে, ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ আবু বকর ﷺ, কেননা, আলী ইবন আবি তালিব বড়ই হয়েছেন নবুওয়াতের ঘরে, তিনি মক্কার কুরাইশদের ধর্ম গ্রহণই করেননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি মুসলিম হিসেবে বড় হয়েছেন, তাই তাঁর অমুসলিম অবস্থা থেকে মুসলিম হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আবু বকর ﷺ দাসদেরকে মুক্ত করা ছাড়াও নানানভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি ছিলেন অনেক ধনী এবং কুরাইশদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ দান করার জন্য তিনি অনেক নন্দিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজের প্রভাবশালী লোকেদের একজন। সমস্ত সম্পদ ইসলামের উপকারে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। তাঁর সব সম্পদ, জ্ঞান ঢেলে দিয়েছিলেন নবী করীমের ﷺ সেবায়। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন মিশনারী। আর এ কারণেই তাঁকে বলা হয় *'সিদ্দীক'*, তিনি ছিলেন মু'মিন পুরুষদের মধ্যে প্রথম জন। সিদ্দীক মানে যে বিশ্বাস করেছে। লোকেরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অবিশ্বাস করেছিল, আর আবু বকর ﷺ তাঁকে বিশ্বাস করেছেন। বলা হয়ে থাকে, ইসলাম গ্রহণের সময়ে প্রত্যেকেই অন্তত মুহূর্তের জন্যে হলেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছে, কিন্তু আবু বকরের ﷺ ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। যখনই

তাঁর সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়, তিনি সেটা সাথে সাথে গ্রহণ করেন, তাঁকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয়নি। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেই স্বাধীন পুরুষ যিনি সর্বাগ্রে মুহাম্মাদকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেন, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মিরাজের ঘটনায় সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন, তিনি হলেন সেই মুসলিম যিনি রাসূলের ﷺ হিজরতের বিপদসংকুল সময়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীদের ﷺ মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি আপন ছিলেন তা নিয়ে একটি হাদীস আছে: আবু দারদা বর্ণনা করেন, একবার আবু বকর এবং উমারের মধ্যে ঝগড়া হয়। এই দুইজন ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ সবচে কাছের মানুষ, তাঁর উপদেষ্টা। আলী ইবন আবি তালিব ﷺ বলেন, 'আমি দেখেছি, রাসূল ﷺ যখনই কোথাও যেতেন, আবু বকর ও উমারকে সাথে করে যেতেন, কোথাও থেকে আসলে তাদের সাথে করে আসতেন, যখন তিনি বসতেন তাঁর এক পাশে থাকতো আবু বকর আর আরেক পাশে উমার।'

কিন্তু তারপরেও রাসূলুল্লাহর ﷺ বিশেষ টান ছিল তাদের প্রতি যারা ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে মুসলিম হয়েছিলেন। কাজেই যখন আবু বকরের সাথে উমারের ঝগড়া হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের নিকট আমাকে পাঠিয়েছেন আর তোমরা আমাকে বলেছিলে–আপনি মিথ্যা বলছেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল আবু বকর, সে আমাকে বলেছিল–আপনি সত্য বলছেন, সে নিজেকে ও তার ভাগ্যকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল, এরপরেও কি তোমরা আমার এই বন্ধুকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? দেবে না শান্তিতে থাকতে?'

প্রকাশ্য দাওয়াতের শুরু

ইসলামের প্রারম্ভিক দাওয়াহ ছিল গোপন পর্যায়ে, কুরআনে আল্লাহ এই আদেশ করেছেন।

> **"আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।" (সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ২১৪)**

এই আয়াতটি যখন নাযিল হলো তখন মুহাম্মাদ ﷺ বেরিয়ে পড়লেন এবং আস-সাফা পাহাড়ে উঠে বলে উঠলেন, "ওয়া সুবাহা!" – ওয়া সুবাহা বলাটা সে যুগে ঘন্টা বা সাইরেন বাজানোর মতো একটি বিষয় ছিল। খুব গুরুতর কোনো ঘটনা হলে এই কথাটি বলা হয়। কাজেই যারাই তাঁর ডাক শুনতে পেল, তারা তার দিকে চলে গেল এবং যারা যেতে পারছিল না তারা অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিল তিনি কী বলেন তা শুনে আসার জন্য।

যখন সবাই একত্রিত হলো, রাসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

– আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পেছনে এক সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদের অতর্কিতে হামলা করার জন্য, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?

– আমরা তো কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।

– আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে, যদি তোমরা বিশ্বাস না করো, তাহলে তা তোমাদের উপর আপতিত হবে।[18]

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাগুলোই ছিল কুরাইশদের প্রতি ইসলামের প্রথম দাওয়াহ। লক্ষণীয়, তাঁর কথাগুলো খুব সোজাসাপ্টা এবং পরিমিত। এভাবে কথা বলার কারণ হলো আল্লাহ নবীদেরকে আদেশ করেছেন স্পষ্ট বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তাদের দায়িত্ব হলো 'বালাঘুল মুবীন', এর অর্থ হলো, ইসলামকে মানুষের সামনে অস্পষ্টভাবে, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, এদিক-ওদিক করে, রাখ-ঢাক রেখে, কিছুটা গোপন করে, কিছুটা প্রকাশ করে, মধু-মাখাভাবে উপস্থাপন করা যাবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকে আমরা যখন মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি, আমাদের দাওয়াতে শ্রোতাদের মনে বিভ্রান্তির জন্ম হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাওয়াতে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেননি। তাঁর কথা শুনে শ্রোতারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, যদি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাহলে তারা জান্নাতে যাবে আর অবিশ্বাস করলে জাহান্নাম।

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে ডাকলেন এবং তারা ভাবলো নিশ্চয়ই খুব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ডাকা হচ্ছে। বিষয়টি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তা অনুধাবনের ক্ষমতা সকলের ছিল না। তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো, 'তোমার সারা দিন মাটি হোক, এই কথা বলতে তুমি আমাদের ডেকেছ?' আবু লাহাব খুবই বিরক্ত ও রাগান্বিত হলো। কারণ তাকে তার কাজ ছেড়ে এসে এসব কথা শুনতে হয়েছিল। ব্যবসার ব্যস্ত সময়ে কেনাবেচা ছেড়ে রাসূলের ﷺ কথা শোনা ছিল তার জন্য নিতান্তই অগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আবু লাহাবদের মতো লোকদের কাছে কাজ ফেলে জীবন, মৃত্যু, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কথা শোনা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। সে ছিল প্রচণ্ড দুনিয়াবী, ওই সময়টা তার কাছে নিছকই টাকা কামানোর সময়। এমন ভাবনা তার একার নয়, মুসলিমদের মধ্যেও তার মতো অনেকেই আছে। তারা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলাকে স্রেফ সময় নষ্ট জ্ঞান করে, তারা শুধু সেই কাজে ও কথায় মন দেয় যা তাদেরকে দুনিয়াতে উপকার করবে। কিন্তু দুনিয়ার পরের জীবনে কী তাদের উপকারে আসবে সেটা জানার সময় তাদের হয়ে ওঠে না।

সূরা লাহাবের প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

---

[18] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬।

> **"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের উভয় হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও যা সে অর্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসবে না।" (সূরা লাহাব, ১১১: ১-২)**

আল্লাহ তাআলা বলছেন তার এই সম্পদ, অর্থ কোনো কাজেই আসবে না। যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ায়, দুনিয়া তাদের কোনো কাজে আসবে না, যদি না তারা ইসলামের আলোকে জীবনযাপন করে। এই সূরাটি কুরআনের অলৌকিকত্বের একটি প্রমাণও বটে। কেননা, এই আয়াতে বলছে, আবু লাহাব ও তার স্ত্রী জাহান্নামে যাবে। এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন তারা বেঁচে ছিল, যদি তারা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাইতো, তারা মুসলিম হয়ে গেলেই তা করে ফেলতে পারতো, কেননা কুরআন বলেছে তারা জাহান্নামী হবে আর তারা মুসলিম হয়ে গেলে এই কথা মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু না, তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাফের ছিল আর সে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে।

ইক্বরা, ক্বুম, ক্বুম

মুহাম্মাদের ﷺ উপর নাযিলকৃত সর্বপ্রথম আয়াতগুলো হলো সূরা আল আলাক্বের এই ক'টি আয়াত (৯৬: ১-৬)

> "পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞানের), যা সে জানতো না।"

এগুলো হলো কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম আয়াতসমূহ। এই একটি ঘটনা রাসূলের ﷺ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এর পর কিছুদিন ওয়াহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ যেন তাঁর ওপর ওয়াহী নাযিলের এই বিষয়টিকে ভালবাসতে পারেন, যেন এর অভাব বোধ করতে থাকেন–সেজন্য এই কিছুদিনের বিরতির দরকার ছিল। বাস্তবিকও তার এই অভাববোধ এতটা তীব্র আকার ধারণ করে যে, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সূরা আল আলাক্বের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর নাযিল হয় সূরা মুযযাম্মিল এবং সূরা আল মুদ্দাসসিরের কিছু আয়াত। যদিও এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এ সূরা দুটির মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে, তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের ওয়াহীতে এ দুটো সূরা থেকেই আয়াত নাযিল হয়েছে।

দাঈ–যারা ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, তাদের জন্য এই আয়াতগুলো একটি নির্দেশিকা বা ম্যানুয়াল বুক হিসেবে কাজ করে। এই তিনটি ওয়াহীকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ইকরা, কুম, কুম। এই আয়াতগুলোই প্রথম যুগের মুসলিমদেরকে

দাওয়াহর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়।

প্রথম আদেশটি হলো "ইক্বরা"। এর মাধ্যমে তিলাওয়াত ও শেখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী আদেশটি এসেছে সূরা আল মুযযাম্মিলের দুই নম্বর আয়াতে, কুমিল লাইলা ইল্লা ক্বলীল–রাত্রে নামাজ পড়ো। আর সবশেষে সূরা আল মুদ্দাসসিরের দ্বিতীয় আয়াত, কুম ফা আনযির–যা রাসূলুল্লাহকে ﷺ আদেশ দিচ্ছে, উঠে দাঁড়ান এবং অন্যদেরকে সতর্ক করুন। কাজেই প্রথম শিক্ষা হলো, পড়াশুনা করা, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা। পরবর্তী ধাপ নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করা, এবং তার পরের ধাপ হলো অন্যদেরকে জানানো।

ইবনুল কায়্যিম বলেন, 'দ্বীন নিজে শেখা, অন্যকে শেখানো আর আল্লাহ্ আযযা ওয়াজালের বার্তা প্রচার–এই তিনটি ধাপ পার না করে কেউ পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারে না।' প্রথম ধাপ হলো "ইক্বরা", অর্থাৎ জানা, আর নিজে জানার পরেই কেবল অন্যকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এর পরের ধাপ "কুম ফা আনযির"– উঠুন, সতর্ক করুন। আর নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানোর সাথে সাথে যে বিষয়টি অত্যাবশ্যক, তা হলো ইবাদাহ–নফল ইবাদাহ, যেমন ক্বিয়ামুল লাইল। প্রথম যুগের মুসলিমদের জন্য বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ক্বিয়ামুল লাইল বাধ্যতামূলক ছিল। পরবর্তীতে এই আদেশ মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া অন্য সকলের জন্যে রদ বা রহিত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর আমরণ ক্বিয়ামুল লাইল বাধ্যতামূলক ছিল। নিজে শেখা, অপরকে শেখানো এবং ইবাদত করা, প্রতিটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক। একটি পরিপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় একত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে প্রচার করা, তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, এ ধরনের কাজ অন্তরকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে, আর তাই প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগীর, মধ্যরাতে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এই ইবাদত-বন্দেগীই একজন দাঈর অন্তরকে নরম করে, আর তাকে পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। যিকরের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। ইবনুল কায়্যিম তাঁর শিক্ষক শাইখ ইবন তাইমিয়্যা সম্পর্কে বলেন, 'প্রতিদিন ফজর সালাতের পর তিনি বের হয়ে পড়তেন, চলে যেতেন দামাস্কাসের সীমান্তবর্তী বিস্তৃত মাঠগুলোতে। সেখানে বসে তিনি আল্লাহর নাম নিতেন–সূর্যোদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত যিকর করতে থাকতেন। আমরা একদিন কৌতূহল মেটাতে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন প্রতিদিন এমন করেন? জবাবে ইবন তাইমিয়্যা বললেন, এটা হলো আমার সকালের নাস্তা, আমার আত্মার খাদ্য, এটা ছাড়া আমার শরীর অবসন্ন হয়ে যাবে। এটাই আমাকে সারাদিনে চলার শক্তি যোগায়–যদি সকালে আমি আমার রসদ না পাই, তাহলে সারাটা দিন আমি দুর্বল হয়ে থাকবো।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ক্বিয়ামুল লাইলের মাধ্যমেই দৃঢ়তা লাভ করেছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা প্রথম যুগের মুসলিমদের ওপরেও এটি ফরয করে দিয়েছিলেন, কেননা

তাদেরকে এমন কিছু পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছিল, যা আর কাউকে করতে হয়নি। তাদেরকে যে তীব্র বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা উম্মাহর পরবর্তী আর কাউকে ভোগ করতে হয়নি। এজন্যই তাদেরকে এই নিবিড় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তারা ছিলেন ইসলামের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় দল–দ্বীন ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর। তাদের ওপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং তাদের দৃঢ় হওয়া জরুরি ছিল। এই প্রশিক্ষণ যারা লাভ করেছেন তারা সংখ্যায় ছিলেন অল্প, একশো'রও কম। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ ও তারবিয়াহ তাদেরকে এমন প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত করে যে, তারা যেখানেই যেতেন, সেখানেই প্রভাব বিস্তার করে ফেলতেন। মানুষের মনে তৎক্ষণাৎ তাদের ছাপ পড়তো। আনসারগণ মুসলিম হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দাওয়াহর শেষার্ধে, কিন্তু যেহেতু মুহাজিররা প্রথম থেকেই তাদের সাথে ছিলেন, আনসাররা তাদের সাহচর্যে এসে অনেক কিছু দ্রুত শিখে ফেলেন। মুহাম্মাদ ﷺ আনসার ও মুহাজিরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন তৈরি করে দেন, তার মাধ্যমে দুইপক্ষই লাভবান হয়, আনসাররা মুহাজিরদের কাছ থেকে দ্বীনের আদর্শ ও জ্ঞান লাভ করেন এবং অপরদিকে মুহাজিররা আনসারদের কাছে থেকে তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং সামাজিক সহায়তা পান। মুহাজিরদের ভেতর এমন একটি আলো ছিল, যা দ্বারা চারপাশের সবাই আলোকিত ও প্রভাবিত হতো। সুতরাং দাওয়াতের পাথেয় হিসাবে অবশ্যই এ তিনটি শব্দ মনে রাখতে হবে: ইক্বরা, কুম, কুম।

প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মক্কার প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহর ﷺ দাওয়াহর জবাবে কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া ছিল বহুমাত্রিক। এক এক পর্যায়ে তারা এক এক রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারে:

১। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ
২। অপমান
৩। চরিত্রহননের চেষ্টা
৪। ইসলামের বার্তাকে বিকৃত করা এবং কুৎসা রটানো
৫। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আপোস করা বা সমঝোতার চেষ্টা করা
৬। প্রলোভন
৭। চ্যালেঞ্জ
৮। চাপ প্রয়োগ
৯। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা
১০। নির্যাতন-নিপীড়ন
১১। গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-ফুরকানে বলেন,

> **"তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ 'রাসূল' করে প্রেরণ করেছেন?" (সূরা ফুরকান, ২৫: ৪১)**

তারা বলতো–আল্লাহর কাছে কি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার জন্য এর চেয়ে যোগ্য কেউ ছিল না? তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, তাঁকে ব্যঙ্গ করা, ছোট করা কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারের সন্তান, সুঠাম দেহ, উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁকে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি সম্ভ্রম তৈরি হয়। তারপরও কুরাইশরা তাঁকে নিয়ে মজা উড়াতো, কারণ তিনি ধনী ছিলেন না, ক্ষমতাও ছিল না। মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে বেশি প্রভাবিত হয়–যার ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি আছে, তার ব্যাপারে সবার বেশি আগ্রহ থাকে। বনী ইসরাঈল তাদের নবীর ﷺ কাছে গিয়ে বলেছিল, 'আমরা চাই আপনি আমাদের উপর একজন রাজা নিয়োগ করেন, যেন আমরা জিহাদ করতে পারি।' তাদের ওপর রাজা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল তালুতকে। কিন্তু তাকে তাদের পছন্দ হলো না। তালুত বিত্তশালী বা 'পয়সাওয়ালা' ছিলেন না। তাই বনী ইসরাঈলও তাকে মেনে নিল না। তাদের মনে হয়েছিল রাজা হওয়ার উপযুক্ত আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের মাঝেই আছে, যারা তালুতের চাইতে বেশি বিত্তবান। মক্কায় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে এই আচরণেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বার তাইফে যান, এক লোক তাঁকে বলেছিল, 'তবে কি আল্লাহ নবী হিসেবে তোমার চাইতে ভালো আর কাউকে খুঁজে পায়নি?' এভাবেই তারা নবীজিকে ﷺ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো।

অপমান

কুরাইশের লোকেরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ অপমান করতো, তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করতো। একদিন কাবার পাশে কুরাইশদের কিছু নেতা বসে ছিল। আবু জাহেল তাদের কাছে এসে বললো, 'আজকাল তোমরা নাকি মুহাম্মাদকে মাটির সাথে মুখ ঘষাঘষি করার সুযোগ দিচ্ছ? আমি যদি তাঁকে এমন করতে দেখি (অর্থাৎ সালাত আদায় করতে দেখি), তাহলে তাঁর গলায় পাড়া দিয়ে মুখটা ধুলোর মধ্যে ঘষে দিব।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক তখনই সালাত আদায় করতে এলেন। নবীজি ﷺ সালাত পড়ছেন, আর আবু জাহেল এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। মুখে যত বড় হুমকি দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন হবে তো?

আবু জাহেল হেঁটে মুহাম্মাদের ﷺ কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মুহাম্মাদ ﷺ তখন

সিজদারত। উপস্থিত সবাই বিস্মিত চোখে দেখলো আবু জাহেল উল্টে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর দু-হাত মুখের ওপর এনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাড়াচ্ছে, যেন সে কোনো ভয়াবহ বিপদে পড়েছে আর হাত নাড়িয়ে কিছু একটা থামানোর চেষ্টা করছে। আবু জাহেল ফিরে আসার পর অন্যরা তাকে ঘিরে ধরলো। জিজ্ঞেস করতে লাগলো,

- তোমার হঠাৎ কী হলো?

- কী হলো মানে? তোমরা কী বলতে চাও? তোমরা কি দেখোনি কী হয়েছে?

- না আমরা কিছু দেখিনি। ওখানে তো কিছুই ছিল না! আমরা শুধু দেখলাম যে তুমি উল্টে পড়ে গেলে আর হাত নাড়তে লাগলে।

- আমার সামনে একটা গর্ত ছিল; আর ছিল আগুন, বাতাস এবং আতঙ্ক। আবু জাহেল জবাব দিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, ‘সেগুলো ছিল ফেরেশতা। সে যদি আমার দিকে আর একটুও এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।’[19]

অন্য আরেকদিনের ঘটনা, উকবা ইবন আবু মুআইত একদিন কাবার পাশে রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে পেল। নবীজির ﷺ কাপড়ে হেচকা টান মেরে সেটা তাঁর গলায় পেঁচানো শুরু করলো, যেন তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা যায়। আবু বকর رضي الله عنه ছুটে আসলেন। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন উকবাকে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ‘তোমরা কি একটা মানুষকে শুধু এই জন্য মেরে ফেলবে কারণ সে বলে–আমার রব হলেন আল্লাহ?’

পৃথিবীতে অনেকেই আছে যারা অপমানিত বা অপদস্থ হলেও কিছু মনে করে না, তাদের আত্মসম্মানবোধ নেই, বোধবুদ্ধিও কম। কিন্তু আল্লাহর নবীরা খুব স্পর্শকাতর ছিলেন। তারা সম্মানী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ। আবু জাহেল বা উকবা ইবন আবু মুআইতের আচরণগুলো নবীজিকে ﷺ খুব কষ্ট দিত, তবু তিনি উপেক্ষা করে যেতেন। তাদের বাজে কথার উত্তর দিতেন না, হাতাহাতিতেও যেতেন না। শুধু তাঁর দাওয়াতের মিশন অব্যাহত রাখার দিকে নিবদ্ধ হয়ে থাকতেন।

এরকম আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারিতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার পাশে সালাত আদায় করছিলেন, পাশেই কুরাইশদের কয়েকজন নেতা বসা। এমন সময় তাদের কাছে আসলো আবু জাহেল। বললো, ‘অমুক তো একটা উট জবাই করেছে, ওটার নাড়িভুঁড়িগুলো এনে মুহাম্মাদের গায়ে ঢালতে পারবে কে?’ তাদের মধ্যকার সবচেয়ে জঘন্য লোকটাই সাড়া দিল, এই জঘন্য লোকটি হলো উকবা ইবন আবি মুআইত। সে উঠে গিয়ে উটের নাড়িভুঁড়ি যোগাড় করে আনলো। এরপর ঘাপটি মেরে

---

[19] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৪।

বসে থাকলো কখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় যান সেই আশায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ সিজদায় যাওয়া মাত্র নাড়িভুঁড়ির দলা চাপিয়ে দিল তাঁর পিঠের ওপর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থির হয়ে সিজদাতেই পড়ে থাকলেন, যেন তাঁর সাথে কিছুই হয়নি। মেয়ে ফাতিমা رضي الله عنها দূর থেকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে বাবার কাছে ছুটে আসলেন। বাবার কাঁধে চেপে থাকা ময়লা-আবর্জনাগুলোকে দু হাতে সরিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাহ শেষ হলো। তিনি কুরাইশদের কিছুই বললেন না। শুধু জোরে জোরে একটি দুআ করলেন–

> *"হে আল্লাহ, শাস্তি দাও আবু জাহেল, উতবা ইবন রাবিআ, শায়বা ইবন রাবিআ, আল-ওয়ালিদ ইবন উতবা, উমাইয়া ইবন খালাফ, আর উকবা ইবন আবি মুআইত কে।"* [20]

এভাবে একে একে সাত জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাম ধরে দুআ করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, যদিও হাদিসের বর্ণনাকারী সপ্তম জনের নাম মনে করতে না পারায় এখানে শুধু ছয়টি নাম বলা হলো। আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ رضي الله عنه বলেন, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি, এই সাত জনের প্রত্যেককে বদরের যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে।'

আল্লাহ নবীজির ﷺ দুআ কবুল করেছিলেন।

চরিত্রহননের চেষ্টা

কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বিভিন্ন আজেবাজে নামে ডাকতো।

> "তারা বলে, ওহে, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, তুমি তো আলবৎ একজন উন্মাদ।" (সূরা হিজর, ১৫: ৬)

উন্মাদ বা পাগল ডাকার পাশাপাশি জাদুকর, মিথ্যুক এসব বলেও সম্বোধন করতো। কুৎসা রটানোর জন্য যা মুখে আসতো, বলতো। কিছুই বাকি রাখেনি। তারা চাচ্ছিলো রাসূলুল্লাহর ﷺ নামে কুৎসা রটিয়ে, তাঁর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দিতে। লোকে যেন তাঁর কথায় পাত্তা না দেয়। তাহলেই ইসলামের প্রচার-প্রসার থেমে যাবে। এভাবে চরিত্রহননের মাধ্যমে তাঁর নিয়ে আসা ইসলামের বার্তাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছিল কুরাইশরা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> "আমি অবশ্যই জানি, তারা যা বলে তা আপনাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা তো আপনাকে অস্বীকার করে না, বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার

---

[20] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬।

করে।" (সূরা আন'আম, ৬: ৩৩)

তারা বস্তুত ব্যক্তি মুহাম্মাদকে ﷺ প্রত্যাখ্যান করে নি– মনের গভীরে তারা বিশ্বাস করতো যে মুহাম্মাদ ﷺ সত্যি কথাই বলছেন কিন্তু তারপরও তারা তাঁর বিরোধিতা করেছে। কারণ তাদের সমস্যা ছিল ইসলাম। নিজেদের ধর্ম বাদ দিয়ে ইসলামকে তারা কোনো ক্রমেই মেনে নিতে চায়নি। ওয়ারাকা ইবন নওফালের সতর্কবাণীই যেন সত্যি হয়ে উঠছিল। নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে, তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেছিলেন, 'তোমাকে তোমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।' সেদিন এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ চমকে উঠেছিলেন, তিনি জানতেন মক্কার লোকেরা তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ওয়ারাকাহ্ অমোঘ বাণীর মত বলেন, 'যে ব্যক্তিই দ্বীনের এই বার্তা নিয়ে এসেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে।'

মক্কার বাজারগুলো তখন কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা কেনাকাটার জায়গা নয়, বরং এগুলো তাদের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে। সেখানে কাব্যচর্চা চলতো, চলতো বক্তৃতার চর্চা। সেরা কবিতাকে সসম্মানে ঝুলানো হতো আল-কাবার দেয়ালে। এগুলোকে বলা হতো আল-মুয়াল্লাকাত, বা ঝুলানো কবিতা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই বাজারগুলোতে এসেই দাওয়াহ দিতেন, সাধারণ জনতাকে বোঝাতেন ইসলামের কথা। ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেছেন যে রাবিআ ইবন হাদ্দাদ বলেন,

"আমি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ জুলমাজায বাজারে দেখেছি। তিনি লোকদের ডেকে বলছিলেন, তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে নতুন নতুন লোকের দেখা হতো আর তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন।

হঠাৎ এক লোক তাঁর পিছু নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যার সাথেই কথা বললেন, সেই লোক পেছন পেছন গিয়ে তাকে বলে আসতো, এই লোককে (অর্থাৎ মুহাম্মাদকে ﷺ) বিশ্বাস কোরো না, সে একটা মিথ্যুক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এই লোকটি কে, তারা আমাকে বললো, সে তাঁর চাচা আবু লাহাব।"[21]

রাবিআ ইবন হাদ্দাদ মক্কার অধিবাসী ছিলেন না। তাই তিনি আবু লাহাবকে চিনতেন না। এই ঘটনা বলে দেয় মুহাম্মাদের ﷺ জন্য দাওয়াতের কাজ চালিয়ে কী ভয়াবহ দুঃসাধ্য ছিল–তিনি যা কিছুই করতেন, আবু লাহাব সেটা ভেস্তে দিত। সাধারণত

[21] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১।

কাজের ফল মানুষের মনে লেগে থাকার উৎসাহ জাগায়। আর্থিক প্রতিদান, সমাজের কাছে স্বীকৃতি, নেতাকর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা ইত্যাদি–অন্তত কিছু একটা বিনিময়ের আশা নিয়েই মানুষ খাটতে থাকে। আশানুরূপ বিনিময় না পেলে মানুষের কাজের ইচ্ছা মরে যায়, প্রেরণা থাকে না, একসময় সে ক্ষান্ত দেয়। প্রতিদানের আশা না করেই কোনো কাজ করে যাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আর নবী-রাসূলরা ব্যতিক্রম। তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে লাগাতার কাজ করে গেছেন, যদিও তারা বিনিময়ে কিছুই পাননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নূহের ﷺ কথা। তিনি দিনরাত তাঁর জাতির কাছে দাওয়াহ দিয়েছেন–গোপনে এবং প্রকাশ্যে, কিন্তু বলার মতো কোনো সাড়া তাদের মাঝে পাননি। চোখের সামনে বিরোধিতাকারী এক জাতিকে নিয়েও তিনি দাওয়াহ করে গেছেন সুদীর্ঘ নয়শ পঞ্চাশ বছর।

এমন আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। হাজ্জের মৌসুম সবে শুরু, আল-ওয়ালিদ ইবন মুগীরা সে সময় কুরাইশদের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি। সে কুরাইশ নেতাদের নিয়ে মিটিং ডাকলো। বললো, হাজ্জের মৌসুম আসছে, আরবের প্রতিনিধিরা কিছুদিন পরেই এখানে জমায়েত হবে। আসো সবাই মিলে (মুহাম্মাদের বিষয়ে) একটি সিদ্ধান্তে আসি। এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে যেন কোনো মতভেদ না থাকে। তার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, মুহাম্মাদের ব্যাপারে একটা হেনস্থা করা। হাজ্জের সময় মক্কায় অনেক লোকের সমাগম হবে, আর মুহাম্মাদও এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না, তাদের কাছে ইসলামের বার্তা নিয়ে যাবে, তাই মুহাম্মাদের ﷺ ব্যাপারে তারা সবাইকে কী বলবে সে বিষয়ে সর্বসম্মত বক্তব্যে পৌঁছানো জরুরি ছিল। একেকজন একেক রকম কথা বললে কোন লাভ হবে না। কেউ বলবে সে মিথ্যুক, কেউ বলবে গণক, কেউ বলবে জাদুকর–এভাবে না করে বরং সবাই মিলে একই অপবাদ দিলে লোকে বেশি বিশ্বাস করবে।

কুরাইশরা ওয়ালিদ ইবন মুগীরাকে বললো, "আপনিই বলেন কী করা যায়। আপনি যেটা বলবেন, আমরা সেটাই সবাইকে বলবো।"

- আমি তোমাদের মুখে শুনতে চাই, ওয়ালিদ জবাব দিল।

- আমরা বলবো যে, সে একজন জ্যোতিষী।

- না, সে জ্যোতিষী নয়। আমি জ্যোতিষী দেখেছি, তাঁর মধ্যে জ্যোতিষীদের বৈশিষ্ট্য নেই, সে তাদের মতো অন্তঃসারশূন্য কথা বলে না।

- তাহলে আমরা বলবো যে, সে পাগল, বদ্ধ উন্মাদ।

- আমি পাগলও দেখেছি এবং তাদের প্রকৃতিও দেখেছি, সে তাদের মতো অপ্রকৃতস্থ আচরণ করে না, অসংলগ্ন কথাও বলে বেড়ায় না। সে উন্মাদ নয়, উন্মাদ কাকে বলে আমরা জানি।

- তাহলে আমরা বলবো যে, সে একজন কবি।

- না, না, সে কোনো কবি নয়। আমরা সব রকম ছন্দের কবিতাই চিনি, সে যা বলে তা

কোনো কবিতা না।

- তাহলে আমরা বলি যে, সে একজন জাদুকর।

এই প্রস্তাবেও ওয়ালিদ রাজি হলো না, বললো–সে কোনো জাদুকরও নয়, আমরা জাদুকর দেখেছি আর তাদের জাদু-কৌশল দেখেছি। সে ঝাঁড়ফুক করে না, জাদুটোনাও করে না।

কুরাইশের নেতারা একে একে সম্ভাব্য সকল অপবাদ পেশ করলো। কিন্তু ওয়ালিদ ইবন মুগীরা বললো, না, এগুলো বলে কোনো লাভ হবে না।

- তাহলে, আপনি বলে দিন আমরা তাঁর ব্যাপারে কী বলবো।

ওয়ালিদ অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললো,

'আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁর কথা বড়ো মিষ্টি, কী যেন গভীর তাৎপর্য আছে তাঁর কথায়। তোমরা তাঁকে নিয়ে যেটাই বলো না কেউ তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে না। তবে তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলতে পারো, তিনি একজন জাদুকর। তিনি যেসব কথা পেশ করেছেন তা স্রেফ জাদু। তাঁর কথা শুনলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী এবং গোত্র ও তার সদস্যের মাঝে বিরোধ লেগে যায়।'[22]

কুরআনে আল্লাহ এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন,

> "সে (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা) চিন্তাও করেছিল, তারপর আবার নিজের গোঁড়ামিতে ডুবে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। তার উপর অভিশাপ, কেমন করে সে (সত্য জানার পরেও) বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নিল! তার উপর আবারও অভিশাপ, সে কীভাবে এমন সিদ্ধান্ত নিল! সে একবার (উপস্থিত লোকদের দিকে) চেয়ে দেখলো, (অহংকার ও দম্ভভরে) সে ভ্রূ কুঁচকালো এবং মুখটা বিকৃত করে ফেললো। অতঃপর সে পেছনে ফেরলো এবং অহংকার করলো। এরপর বললো, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদুবিদ্যার খেল ছাড়া কিছু নয়। এটা তো মানুষের কথা।" (সূরা মুদদাসসির, ৭৪: ১৮-২৫)

ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা

আন নযর ইবন হারিস পারস্য গিয়ে গল্প শিখে আসতো। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে সে লোকদের ডেকে ডেকে বলতো, 'আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসলে আরও ভালো ভালো কাহিনি শুনতে পাবে।' সে লোকজনকে বলতো, মুহাম্মাদের ﷺ বার্তা আসলে কেচ্ছা-কাহিনি দিয়ে ভরা, ওসব হচ্ছে গল্পকথা–কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর নবীদের সাথে আসলেই কী হয়েছিল তা কি কেউ জানে? মুহাম্মদ যা বলছে

[22] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২২।

সেসব বানোয়াট রূপকথার গল্প। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> **"আর তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা – এসব সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর এগুলো তার কাছে পাঠ করা হয় সকালে ও সন্ধ্যায়।" (সূরা ফুরকান, ২৫: ৫)**

আপস এবং সমঝোতা

কুরাইশের লোকেরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে আপোসের চেষ্টাও করেছিল। নবীজির ﷺ কাছে এসে বললো–আসুন, আমরা একটি চুক্তি করি। আমরা এই শর্তে রাজি যে, আপনি এক দিন আমাদের দেব-দেবীর ইবাদত করবেন, আর আমরা পর দিন আল্লাহর ইবাদত করবো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন যে তিনি কখনোই এমন কিছুতে রাজি হবেন না। তারা কিছুক্ষণ পর আবার তাঁর কাছে ফিরে আসলো। এবার বললো–আপনার জন্য এবার আগের বারের চেয়েও ভালো প্রস্তাব আছে। আপনি এক দিনের জন্য আমাদের দেবদেবীর ইবাদত করেন, তাহলে আমরা এক সপ্তাহ যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করবো।

- না, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

এরপর আবার ফিরে এসে তারা আরেকটি প্রস্তাব দিলো। বললো, 'ঠিক আছে, আমরা নাহয় এক মাস ধরে আল্লাহর ইবাদত করবো, আপনি শুধু আমাদেরকে একটি দিন হলেও দিন।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ সেই এক জবাব, 'না', আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

> **"তারা চায় আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।" (সূরা কালাম ৬৮: ৯)**

কুরাইশদের ধর্ম ছিল মানবরচিত, তাদের নিজহাতে তৈরি, তারা চাইলেই আপোস করতে পারতো, যখন খুশি ধর্মকে নিজের মন মত বদলে নিতে পারতো। তাদের জন্য এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। এমনকি তারা যদি বলতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র এক দিন দেব দেবীকে পূজার বিনিময়ে, তারা সারা বছর আল্লাহর ইবাদত করবে, তারপরও নবীজির ﷺ সামনে দ্বীনকে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এই ধরনের আপোস বা সমঝোতা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"বলুন, হে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদাত করো, আমি তার ইবাদাত**

করিনা। এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হবো না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।" (সূরা কাফিরুন, ১০৬: ১-৬)

কুরাইশের লোকেরা আরও নানাভাবে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনোটাই কাজে দিলো না। দিনে দিনে তারা আরও ক্ষেপে গেল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ এক কথা–তিনি কেবল একজন রাসূল, আল্লাহর পাঠানো একজন দাস মাত্র–আল্লাহর দ্বীনের উপর হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তিনি রাখেন না।

প্রলোভন এবং চ্যালেঞ্জ

এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবন আব্বাস[23]। কুরাইশ নেতারা কাবার পাশে মিলিত হলো। বললো–আমরা সবরকম উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবো, মুহাম্মাদকে এবার কোনো অজুহাত দেওয়ার সুযোগ দেবো না। তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ ডেকে পাঠালো।

নবীজির ﷺ মনে বড়ো আশা কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের ডাক পেয়ে খুব খুশি হলেন, ভাবলেন হয়তো তাদের মন বদলেছে, হয়তো তারা ইসলামের প্রতি একটু নরম হয়েছে!

নবীজি ﷺ ছুটতে ছুটতে হাজির হলেন। তারা বললো–হে মুহাম্মাদ! তোমার সাথে মিটমাট করার উদ্দেশ্যে আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তাদের বক্তব্যের শুরুটা এমনই ছিল, সুন্দর, আশা জাগানিয়া। কিন্তু এরপরই তারা গা-জ্বালা করা কথাবার্তা বলতে শুরু করলো,

'আল্লাহর কসম, তুমি যা করলে, আর কোনো আরব লোক তার কওমের জন্য তোমার মত এত যন্ত্রণা আনে নি। বাপ-দাদার বিরোধিতা, আমাদের ধর্মের সমালোচনা, আমাদের রীতিনীতি নিয়ে উপহাস, দেব-দেবীকে অভিশাপ দেওয়া সবই তুমি করেছো। আমাদের সমাজটাকে বিভক্ত করে ফেলেছো তুমি। তোমার সাথে আমাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানোর জন্য আমাদের অপ্রিয় কোনো কাজ করতে বাদ রাখোনি।'

এরপর শুরু হলো নানা রকম প্রলোভন দেখানো। তারা বললো,

'মুহাম্মাদ! অর্থের আশাতেই যদি তুমি এই বাণী প্রচার করে থাকো, তাহলে আমরা তোমার জন্য যত লাগে সম্পদের ব্যবস্থা করবো, তোমাকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী বানিয়ে দেব। তুমি যদি ক্ষমতার আশায় এ ধর্ম নিয়ে এসে থাকো, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা হিসেবে বেছে নিতে পারি। আর তুমি যদি নারীর লোভে এসব কাজ করে থাকো, তাহলে আমরা তোমার জন্য কুরাইশের সবচেয়ে সেরা

---

[23] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬।

দশ নারীকে বাছাই করে আনবো, এরপর তাদের প্রত্যেককে তোমার সাথে বিয়ে দেব। যদি তোমার ওপর শয়তান ভর করে থাকে, তাহলে আমরা তোমার সুস্থতার জন্য যা কিছু লাগে ব্যয় করবো, এমনকি যদি তাতে আমাদের সমস্ত সম্পদও দিয়ে দিতে হয়, তাও দেব। আমাদেরকে শুধু বলো তুমি কী চাও।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে শান্তকণ্ঠে বললেন,

'তোমরা যা কিছুই বলেছো, তার কিছুই আমি চাই না। অর্থকড়ি, মানমর্যাদা কিংবা তোমাদের ওপর ক্ষমতা লাভের আশায় তোমাদের কাছে ইসলামের বার্তা নিয়ে আসিনি। আল্লাহ তোমাদের কাছে আমাকে একজন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার উপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে সুসংবাদ দিতে ও সতর্ক করতে। আমি তোমাদের কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি মাত্র। তোমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছি যে, যা আমি তোমাদের কাছে হাজির করলাম, তোমরা তা গ্রহণ করে নিলে তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক–এই দুনিয়া ও আখিরাতে দু জগতেই। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবো, যতক্ষণ না তিনি আমার এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'

তারা তাঁকে বললো,

"তুমি যদি আমাদের কোনো প্রস্তাবই মানতে না চাও, তাহলে শোনো, আমাদের দেশ অনেক সংকীর্ণ, আমরা খুবই দরিদ্র, আর আমাদের জীবনযাত্রাও দুর্বিষহ। এক কাজ করলে কেমন হয়, যে রব তোমাকে পাঠিয়েছে, তাঁকে গিয়ে তুমি একটু বলো যেন সে এই পর্বতগুলো সরিয়ে দেয়, এগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে সমতল করে একটু ফাঁকা স্থান তৈরি করে দিলেই চলবে। আর তুমি এটা কেন তাঁকে বলছো না মক্কার মধ্যে কয়েকটি নদী প্রবাহিত করে দিতে? যেমন করে সিরিয়া আর ইরাকে নদী আছে, সেরকম। আমরাও তো অন্যদের মতো নদী চাই! আর হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার, আমরা চাই যে, তুমি তোমার রবের কাছে গিয়ে বলো, সে যেন আমাদের কয়েকজন পূর্বপুরুষকে মৃত থেকে জীবিত করে দেয়। কুসাই ইবন কালবের প্রাণও ফিরিয়ে এনো কিন্তু, তিনি তো অনেক জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি যা বলছো তা কি সত্য নাকি মিথ্যা। মুহাম্মাদ, তুমি যদি এটুকু করতে পারো আর আমাদের বাপ-দাদারা যদি তোমার কথা মেনে নেয়, তাহলে আমরা তোমাকে অনুসরণ করবো।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবারও শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন,

'এ কারণে আমাকে পাঠানো হয়নি। আমি রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কেবল সেটাই এনেছি, যা সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমার তোমাদেরকে যা জানানোর ছিল তা জানিয়েছি, যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর, এই দুনিয়া এবং আখিরাতে। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে আমাকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় থাকতে

হবে যেন তিনি আমাদের মধ্যে বিচার করে দেন।'

তারা বিদ্রুপ করতেই থাকলো,

'আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করো, তুমি তোমার রবকে বলো একজন ফেরেশতা পাঠাতে, যে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে তুমি সত্য বলছো। আর তোমার রবকে বলো যেন আমাদের জন্য কিছু দুর্গ, বাগান, সোনা ও রুপার খনি দান করে, আর হ্যাঁ, আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়-তুমি তাঁকে বলো যেন সে তোমার প্রয়োজনটাও পূরণ করে দেয়, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাদের মতো করে জীবিকা মেটানোর চেষ্টা করছো।'

তারা এই বলে উপহাস করছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ যদি আল্লাহর এত প্রিয় বান্দা হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে কেন অন্য সবার মতো অর্থ উপার্জন করতে হচ্ছে! তাই তারা বলছিলো যে, আল্লাহর কাছ থেকে ধনসম্পদ নিয়ে আসতে। যেন তিনি যে আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা-সে কথা প্রমাণিত হয়। এসব কথাতেও রাসূলুল্লাহর ﷺ ধৈর্যচ্যুতি হলো না বা তিনি উত্তেজিত হলেন না, তিনি এতটুকুই বললেন,

'আমি এসব কিছুই করবো না। আমি আমার রবের কাছে এসব জিনিস চাইতে যাবো না। এসব কারণে আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়নি। আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য। যদি তোমরা আমার উপস্থাপিত বার্তা স্বীকার করে নাও, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তা তোমাদের জন্যই লাভজনক। আর যদি তোমরা তা অস্বীকার করো, তাহলে আমি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি এই বিষয়টি আমার রবের হাতে ছেড়ে দিলাম যতক্ষণ না তিনি আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'

তারা বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমার রবকে বলো তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিজ্ঞা করছো, সেই শাস্তি প্রেরণ করতে।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'এটা আল্লাহর হাতে, যদি তিনি চান তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন।'

তারা টিটকারি মেরে বললো, 'আরে মুহাম্মাদ, তোমরা রব কি জানে না যে আমরা তোমাকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি? সে কেন তোমাকে উত্তর দিতে সাহায্য করছে না? আমরা ভালোই জানি কে তোমাকে এইসব শিক্ষা দিচ্ছে, তোমাকে তোমার এই কুরআন শেখাচ্ছে ইয়ামামার এক লোক, তার নাম আর-রহমান। আর আমরা সেই আর-রহমানের কথায় কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করবো না।'

কুরাইশরা হঠাৎ করে 'আর-রহমান' নামক ব্যক্তির গল্প ফেঁদে বসে। তাদের মাঝে একজন বললো, 'যাও, যাও, গিয়ে আল্লাহর কন্যা ফেরেশতাদের ইবাদত করো।'

আরেকজন বললো, 'আমরা তোমাকে ততক্ষণ বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে হাজির করছো।' তারা সবাই মিলে রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তাঁকে অপমান করে সে স্থান থেকে চলে গেল।

সবাই চলে যাওয়ার পর তাদের মাঝে একজন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ফিরে আসলো, তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন উমাইয়া। তার ফিরে আসা দেখে মনে হয় যেন তার মুহাম্মাদের জন্য খারাপ লাগছে, হয়তো সে ক্ষমা চাইবে। সে নবীজির ﷺ কাছে এসে বললো,

'মুহাম্মাদ, তোমার লোকেরা তোমার কাছে সেরা সেরা প্রস্তাব পেশ করেছে, আর তুমি–তুমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছ। তোমাকে কোনো অলৌকিক ঘটনা (মু'যিজা) দেখাতে বললো, সেটাতেও তোমার আপত্তি। তারপর বলা হলো, তুমি যেন তাদের ওপর আযাব নিয়ে আসো, সেটাও তুমি পারলে না। এবার আমি তোমাকে একটা কথা বলি–আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না তুমি একটা মই নিয়ে আসো যেটা সরাসরি ওই আকাশ পর্যন্ত যায়। তুমি মই বেয়ে ওপরে উঠবে আর আমি তোমাকে দেখবো। তারপর তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছে তাঁকে বলবে সে যেন তোমার ব্যাপারে (প্রমাণস্বরূপ) একটি পত্র লিখে দেয়; সেখানে লেখা থাকবে যে, তুমি তার নবী, আর এর ওপর থাকবে তার স্বাক্ষর। এরপর চারজন ফেরেশতা সেই পত্র সঙ্গে করে নিচে নেমে আসবে, আর তারাও সাক্ষ্য দিবে যে তুমি আল্লাহর রাসূল। সত্যি কথা কী জানো, তুমি যদি এতকিছু করেও ফেলো, আমার মনে হয় এরপরও আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো না।'

এই ছিল রাসূলের ﷺ চারপাশের পরিবেশ এবং মানুষগুলোর অবস্থা ও তাদের মানসিকতা। এ ধরনের লোকদের তিনি দাওয়াহ করছিলেন।

চাপ প্রয়োগ

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। তাঁকে দমিয়ে রাখতে সম্ভাব্য সকল পথেই হেঁটেছে তারা। এক পর্যায়ে নবীজির ﷺ চাচা আবু তালিবকে কাজে লাগিয়ে তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস চালায়। আবু তালিবের ছেলে আকীলের মুখেই এর একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

'একদিন কুরাইশের লোকেরা বাবার কাছে এসে খুব হৈ চৈ লাগিয়ে দিলো। বললো, তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদ, আমাদের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে, দশ পদের ঝামেলা বাঁধাচ্ছে। তাঁকে বলে দিও–আমাদের থেকে সাবধান, তাঁকে যেন ধারেকাছেও আর না দেখি। বাবা আমাকে ডেকে বললেন, মুহাম্মাদকে ডেকে আনো। আমি ভাইকে খুঁজতে

বেরোলাম। একটা কেনাসের[24] মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেলাম।”

“রাসূলুল্লাহ ﷺ বাবার সাথে দেখা করতে এলেন। বাবা বললেন, লোকেরা তোমার নামে অভিযোগ এনেছে। তুমি নাকি তাদের সভায় বাধা দিচ্ছো, কী সব ঝামেলা পাকাচ্ছো, তুমি কেন এসব করছো?”

আবু তালিব মুহাম্মাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলছিলেন না। হুকুম দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ভাতিজাকে ডাকেননি, বরং ভাতিজার জন্য যা ভালো হবে বলে মনে হয়েছে, তেমনটাই পরামর্শ দেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন–চাচা, আপনি কি সূর্য দেখতে পাচ্ছেন?

- হ্যাঁ।

- এই সূর্যের তাপ থেকে আমাকে রক্ষা করতে আপনি যতোটা অপারগ, আমার এ দাওয়াতী কাজ থামিয়ে দিতেও আমি ততোটাই অপারগ।’[25]

ইসলাম ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন, জীবনের মিশন। এই মিশন থেকে সরে আসার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকবো না, যতক্ষণ না স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ের ফয়সালা করে দেন, অথবা আমার মৃত্যু হয়।’ তাঁর চাচা ভাতিজার কথার উত্তরে বলেন, আমার ভাতিজা, তুমি সত্য বলেছো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। এগিয়ে যাও এবং নিজের মিশন পূর্ণ করো। আবু তালিব বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ভাতিজাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে না। তাই তিনি নবীজিকে ﷺ সবরকম ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সম্মত হন।

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ আটকানোর জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা চালাতে থাকে। কুরাইশদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর কিছু সাহাবীকে ﷺ আবিসিনিয়াতে হিজরত করার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশরা আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশির সাথে যোগাযোগ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তারা তড়িঘড়ি করে তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে তাঁকে বলে তিনি যেন তার দেশে হিজরত করা মুসলিমদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠান।

সে সময় মুসলিমদের অবস্থা করুণ। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা– কোনো বিচারেই তৎকালীন মুসলিমরা কুরাইশদের সমকক্ষ বা হুমকিস্বরূপ ছিল না।

---

24 কেনাস অর্থ: একটি ছোট্ট ঘর বা তাঁবু।

25 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২।

তারপরও কুরাইশরা এই নিরীহ মুসলিমদের পেছনে লেগে ছিল। কারণ তারা চাইছিল ইসলামকে যেন গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা যায়। তারা বুঝতে পেরেছিল ইসলামকে যদি শুরুতেই দমন করা না হয় তাহলে একসময় তাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে।

হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসার কথা বলতে প্রথমেই আসে কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা ওয়ালিদ ইবন মুগীরার নাম। রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির বিষয়টি তার কোনোভাবেই সহ্য হচ্ছিল না। সে বলেছিল, 'আল্লাহ যদি কাউকে নবী বানাতেই চান, তাহলে আমাকে কেন নবী হিসেবে বাছাই করা হলো না? আমি জ্ঞানীগুণী লোক, বয়সেও মুহাম্মদের চাইতে বড়।' একই সুরে কথা বলেছিল তাইফের আরেক লোক। হিজায অঞ্চলে সবচেয়ে প্রখ্যাত এলাকা এ দুটোই ছিল–মক্কা আর তাইফ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আয যুখরুফে তাদের এ কথা উল্লেখ করেছেন,

> **"আর তারা বলে, এই কুরআন কেন দুই জনপদের (মক্কা ও তাইফ) মধ্যে কোনো এক প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলো না?" (সূরা যুখরুফ, ৪৩: ৩১)**

তাইফ থেকে আল মুগীরা ইবন শুআইবা একবার মক্কা বেড়াতে এলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তার প্রথমবার সাক্ষাতের ঘটনা সে নিজেই বর্ণনা করেছে–

'আমি আবু জাহেলের সাথে মক্কার পথ ধরে হাঁটছি, এমন সময় দেখি মুহাম্মাদ। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। আবু জাহেলকে বলে উঠলেন,

– কেন তুমি আমার অনুসরণ করছো না? কেন আল্লাহর ওপর বিশ্বাস আনছো না? কেন ইসলাম গ্রহণ করছো না?

– মুহাম্মাদ, তুমি কবে আমাদের দেবতাদের অপমান করা বন্ধ করবে? তুমি যদি চাও আমরা তোমার মিশন সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিই, তবে আমরা তোমার জন্য সে সাক্ষ্য দিয়ে দেবো। আর আমি যদি জানতাম যে তুমি সত্য বলছো, তাহলে তো কবেই তোমাকে অনুসরণ করতাম।

আবু জাহেলের এ উত্তর শোনার পর মুহাম্মাদ ﷺ সেখান থেকে চলে যান। এরপর সে আমার দিকে ফিরে বলে,

মুগীরা, আমি জানি মুহাম্মাদ সত্যি কথাই বলছে, কিন্তু কী যেন একটা আমাকে আটকে রেখেছে। কুসাইরের লোকেরা যখন বললো, আমরা আন-নাদওয়ার (কুরাইশদের সংসদ সভা) কর্তৃত্ব চাই, আমরা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলাম। তারা বললো, আমরা হিজাবার (কাবা ঘর) মালিকানা চাই, সেটাও দিয়ে দিলাম। তারা বললো, আল্লিলবার (যুদ্ধের

পতাকা) দায়িত্ব চাই, সেটাও দিলাম। এরপর তারা রিফাদা আর সিকায়ার দায়িত্ব নিতে চাইলো (হাজ্জযাত্রীদের জন্য খাবার ও পানির ব্যবস্থা করা), আমরা তাও তাদেরকে করতে দিলাম। এবার যখন আমরা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমানে-সমান চলে এসেছি, এখন তারা বলছে, আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন, আমরা এর সাথে কীভাবে প্রতিযোগিতা করবো? আল্লাহর কসম, আমরা কোনোদিনও তাঁকে মেনে নেব না।'[26]

নবুওয়াতের এই পুরো বিষয়টি আবু জাহেলের কাছে নিছক পারিবারিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। দুই পরিবারে প্রতিযোগিতা চলছে, কার হাতে ক্ষমতা যাবে সেটাই আবু জাহেলের মূল চিন্তা। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল আর সবকিছুতে টেক্কা দিতে পারলেও নবুওয়াতের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ টেক্কা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সে ঠিক করলো কিছুতেই নবীজির ﷺ পরিবারকে জিততে দেওয়া যাবে না। নবীজির ﷺ পরিবার এই একটি দিকে তার পরিবারের থেকে এগিয়ে আছে–এটা সে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না। তার মনে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ বিষিয়ে উঠছিলো, আর এটাই আবু জাহেলের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনিতেও ঘুরেফিরে একটা রূঢ় বাস্তবতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়–সমাজের ক্ষমতাধর লোকেরাই নবী-রাসূলদের ব্যাপারে সবচাইতে বেশি বিরোধিতা করে। কেননা এক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে তারা তাদের ক্ষমতার আসন হাতছাড়া করতে চায় না।

অত্যাচার-নিপীড়ন

নবুওয়্যাতের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, ক্ষয়-ক্ষতি এ সবকিছু সহ্য করতে হলেও, অত্যাচার-নির্যাতন কখনো সহ্য করতে হয়নি। এটি ছিল আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পক্ষ থেকে নবীজির ﷺ জন্য একটি বিশেষ সুরক্ষা। প্রথমে আল্লাহ তাআলা নবীজির ﷺ চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁকে নিরাপত্তা দান করেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পরেও আল্লাহ তাঁকে নিরাপদ রেখেছেন; তবে তাঁর অনুসারী মুসলিমরা নানা রকম অত্যাচার আর নিপীড়নের শিকার হয়। এসব ঘটনা নবীজির ﷺ মনে গভীর দাগ কাটতে থাকে। তিনি ছিলেন তাঁর সাহাবীদের ﷺ জন্য অন্তঃপ্রাণ। সাহাবীদের ﷺ ওপর অত্যাচার তাঁকে প্রচণ্ড পীড়া দিত, তিনি তাদের কষ্ট সইতে পারতেন না।

একটি বর্ণনায় ইবন ইসহাক্ব বলেন, 'কুরাইশরা মুসলিমদেরকে লোহার পাতে মুড়ে কড়া রোদের নিচে রেখে দিত, যেন তাদের শরীরগুলো সূর্যের উত্তাপে ঝলসে যায়।' সীমাহীন অত্যাচারের মুখেও যে সাহাবী সর্বাধিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন, তিনি হলেন বিলাল ﷺ। তাঁকে যতই অত্যাচার করা হতো, তিনি যেন ততোই দৃঢ় হতেন। তাঁকে

[26] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯।

প্রশ্ন করা হয়–এত নির্যাতন সত্ত্বেও আপনি কীভাবে 'আল্লাহ এক, আল্লাহ এক' (আহাদ, আহাদ) বলতে পারতেন?

বিলাল ﷺ বলেন, কারণ আমি খেয়াল করেছি যখনই আমি 'আল্লাহ এক' বলে চিৎকার দিয়ে উঠি, ওরা আরও ক্ষেপে যায়, আরও বেশি অত্যাচার করে, তাই এটাই বারবার বলতাম।

ইবন ইসহাক বলেন, 'বিলাল আল্লাহর কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।' বস্তুত আল্লাহ ছাড়া তাদের হৃদয়ে আর কিছুই স্থান পেতো না।

নানান মাত্রা আর ধরনের অত্যাচার বহাল থাকে। নির্যাতিতদের তালিকায় শুধু দাস সাহাবীরা ﷺ নয়; বরং সম্ভ্রান্ত বংশের অনেক সাহাবীও ﷺ যুক্ত হন। কুরাইশ বংশের অভিজাত পরিবার বনু উমাইয়ার সন্তান উসমান ইবন আফফান যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে মারাত্মক রোষের শিকার হতে হয়। কুরাইশরা তাঁকে কার্পেটে মুড়ে তাঁর গায়ের ওপর লাফাতো। পায়ের চাপায় পিষে দিতো যেন তাঁকে।

মুসলিম দাসদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা ছিল ভয়াবহ। আবু জাহেল তার অধীনস্থ দাস সুমাইয়া ﷺ, তাঁর স্বামী ইয়াসির, ছেলে আম্মারের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ইয়াসির আর সুমাইয়া দুজনেই আবু জাহেলের হাতে শহীদ হন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আবু জাহেল সুমাইয়ার ﷺ গোপনাঙ্গে বর্শা দিয়ে আঘাত করে।

বাবা-মায়ের ওপর এই পাশবিক নির্যাতনের দৃশ্য সহ্য করা কোনো সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আম্মারকে এই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছিল। সে চোখের সামনে দেখলো বাবা আর মা'কে অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলা হলো। নিজের ওপর শারীরিক নির্যাতন তো আগে থেকেই ছিল, তার ওপর বাবা-মায়ের মৃত্যু তাঁকে পাগল করে দিলো। শারীরিক অত্যাচার, মানসিক নির্যাতন সব মিলিয়ে ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত সাহাবী আম্মারের ﷺ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে নবীজির ﷺ বিরুদ্ধে কিছু কথা। একটা সময় যখন সব ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পান, তাঁকে অনুশোচনা ঘিরে ধরে। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছুটে যান নবীজির ﷺ কাছে। নবীজি ﷺ, যিনি সুখে-দুখে সর্বদা তাদের পরম আশ্রয়। পুরো ঘটনা খুলে বললেন তাঁর কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন।

> "যদি কোনো মুসলিম মাত্রাছাড়া অত্যাচারের কবলে পড়ে মুখে ঈমানের বিপরীতে কিছু কথা বলেও ফেলে, তবে সে কথার জন্য তাঁকে মাফ করে দেওয়া হবে, যদি তার অন্তরে ঈমান অটুট থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলা কারো ওপর সাধ্যের বেশি বোঝা চাপান না।" (সূরা নাহল, ১৬: ১০৬)

ইসলামের বিরুদ্ধে আবু জাহেলের বাড়াবাড়ি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে ছিল

দুর্বৃত্তদের নেতা, চরম ইসলামবিদ্বেষী। অপকর্ম আর দুষ্কৃতিতে তার কোনো জুড়ি নেই। সবাইকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে, মুসলিমদের অত্যাচার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। এত একনিষ্ঠভাবে শত্রুতার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। ইবন ইসহাকের বর্ণনায়,

'আবু জাহেল-ই হলো সেই পাপিষ্ঠ যে কুরাইশদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফুসলে দিতো। প্রভাবশালী বা উচ্চবংশীয় কোনো ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা তার কানে আসামাত্র সে তাকে অপমান করার জন্য বলতো, তুমি তোমার বাবার ধর্ম পরিত্যাগ করেছো, তোমার বাবা তোমার চেয়ে ঢের ভালো ছিল। বুড়ো আঙুল দেখাই আমরা তোমার এই ছাইপাশ আদর্শ আর মূল্যবোধকে। আমরা তোমাদেরকে বিভক্ত করে দেবো, মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো তোমাদের সব খ্যাতি, মান-ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকতে দেবো না। কোনো ব্যবসায়ী লোক মুসলিম হয়ে গেলে তাকে বলতো, আল্লাহর কসম, আমরা তোমার সাথে সব রকম ব্যবসা বয়কট করবো, তোমাকে শেষ করে দেবো। আর যদি ইসলাম গ্রহণকারী মানুষটি হতো সহায়-সম্পদহীন দুর্বল কোনো ব্যক্তি, তবে সে নিজে তো তাকে মারধোর করতোই, সেই সাথে অন্যদেরকেও মারধোর করার জন্য ডেকে আনতো। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আবু জাহেলকে শাস্তি দিক, তাকে ধ্বংস করুক!'[27]

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ ইসলাম গ্রহণের আগে কট্টর ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর একজন দাসী ছিল, তিনি তাঁকে অনেক মারধোর করতেন। পেটানোর মাঝখানে কখনও থেমে বলতেন, 'মনে কোরো না তোমার ওপর খুব দয়া এসেছে দেখে আমি তোমাকে পেটানো থামিয়ে দিলাম। তোমাকে মারা বন্ধ করেছি কারণ আমি এখন ক্লান্ত, তা না হলে আরো পেটাতাম।'

হত্যার পরিকল্পনা

পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য কুরাইশরা প্রথমে রাসূলুল্লাহর ﷺ ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চেয়েছিল। বলেছিল–এই লোকটা উন্মাদ, জাদুকর, এর কথার কোনো দাম নেই। কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত নবীজিকে ﷺ জানে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। আবু তালিব বেঁচে থাকতে তাদের সাহস এতোটা বাড়ে নি। তারা জানতো যে, নবীজিকে ﷺ হত্যা করলে আবু তালিবের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। কিন্তু আবু তালিব মারা যাওয়ার পর এসব ষড়যন্ত্র করতে আর কোনো বাধা থাকলো না। তারা নবীজিকে ﷺ হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটে। একের পর এক চাল চালে, কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে সুরক্ষিত রাখেন। হিজরতের বিবরণে এরকম একটি ঘটনা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

---

[27] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৭।

“কাফিররা যখন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা বের করে দেবে – তখন তারা যেমন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, আল্লাহও তেমনি পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।” (সূরা আনফাল, ৮: ৩০)

নবীজির ﷺ প্রতিক্রিয়া

বুখারিতে বর্ণিত আছে, খাব্বাব ইবন আরাত رضي الله عنه নামের এক সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যান। নবীজি ﷺ কাবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। খাব্বাব তাঁর কাছে গিয়ে বললেন–ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি কেন আমাদের জন্য দুআ করছেন না?

খাব্বাবের رضي الله عنه জীবনের নিদারুণ কষ্টের মুহূর্তগুলোর একটি ঘটনা এরকম: উমার ইবন খাত্তাব رضي الله عنه তখন খলীফা। একদিন তিনি মুসলিমদের মাক্কী জীবনের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য তাদের জড়ো করলেন। দেখতে দেখতে খাব্বাবের رضي الله عنه পালা এলো। তিনি মুখে কিছু বললেন না, শুধু পরনের জামাটা খুলে সবার সামনে পিঠ মেলে দাঁড়ালেন। উমার رضي الله عنه তাঁকে দেখে যেন আঁতকে উঠলেন, বললেন, ‘তোমার কী হয়েছিল, খাব্বাব? এমন কিছু আমি কখনও দেখিনি!

খাব্বাবের رضي الله عنه পিঠ জুড়ে ছিল গভীর গভীর গর্ত। তিনি বললেন, ‘মাক্কী জীবনের ঘটনা। কুরাইশরা পাথর নিয়ে এসে সেগুলোকে আগুনে পোড়াতো। পাথরগুলো যখন পুড়ে লাল হয়ে যেতো, তখন রৌদ্রতপ্ত বালিতে জ্বলন্ত পাথর রেখে আমাকে তার ওপর ছুঁড়ে ফেলতো। তপ্ত পাথরে আমার মাংস ঝলসে যেতো। আমি আমার নিজের মাংস পোড়ার শব্দ শুনতাম, চর্বি পোড়ার গন্ধ পেতাম।’

প্রকৃতপক্ষেই খাব্বারের رضي الله عنه কাছে নালিশ করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি ছিল। কিন্তু তিনি নালিশ করেননি। মুসলিমদের ওপর যে সীমাহীন কষ্ট এসে পড়েছে, সে কষ্ট কমানোর দুআ করতে বলেছেন শুধু–“ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি কেন আমাদের জন্য দুআ করছেন না?”

কিন্তু নবীজি ﷺ রেগে গেলেন, সোজা উঠে বসলেন, রাগে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি খাব্বাবকে বললেন,

‘তোমাদের আগে এমনও মু'মিন বান্দা ছিল, লোহার চিরুনি দিয়ে যাদের হাড় থেকে মাংস খুবলে আনা হতো, করাত দিয়ে যাদের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ করে ফেলা হতো, কিন্তু তবুও তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। আর তোমরা তাড়াহুড়া করছো। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করবেন। আর অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন

একজন মুসাফির সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত সফর করবে, কিন্তু তার মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় থাকবে না।’[28]

খাব্বাবের ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন। যত কষ্ট-দুর্ভোগ-অত্যাচার সহ্য করতে হোক না কেন, হার মানা যাবে না।

২. প্রকৃতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির যেমন কিছু ধরাবাঁধা সূত্র আছে, তেমনি দ্বীন কায়েমেরও কিছু নির্দিষ্ট সূত্র আছে যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঠিক করে রেখেছেন। দুনিয়ার বুকে দ্বীনকে কায়েম করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে একে একে সেই নির্ধারিত পথের প্রতিটি ধাপ পাড়ি দিতে হবে; এর কোনো ব্যতিক্রম বা শর্টকাট নেই। বহু আগের যুগের মু'মিনরা যে কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন, সাহাবীদেরকেও ﷺ সেই একই পথ পার করতে হয়েছে। আমাদেরও সে পথই পাড়ি দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন তাঁর উম্মাহ হবে সবার সেরা। তাই পূর্ববর্তী জাতিরা যদি দ্বীন কায়েমের পথে ধৈর্যশীল হয়ে থাকে, তবে তাঁর উম্মাহ যেন আরও বেশি ধৈর্যের পরিচয় দেয়। পূর্ববর্তী জাতিরা যদি শক্তিশালী হয়ে থাকে, তবে এই উম্মাহ যেন তারচেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়–এটাই ছিল নবীজির ﷺ চাওয়া। তিনি চাইতেন যে ক্বিয়ামতের দিনে তাঁর উম্মাহ-ই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করা।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন আর এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করতে পারবে আর তাদের মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় স্থান পাবে না। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, রাসূল ﷺ ছিলেন মক্কার অধিবাসী, তিনি মক্কার কথা না বলে ইয়েমেনের এই বিশেষ দুটি স্থানকে বেছে নিলেন কেন? মক্কার লোকেদের জীবনেই তো তেমন নিরাপত্তা ছিল না, তাহলে মক্কা উল্লেখ করে বোঝানো কি যেতো না যে, পরবর্তী সময়ে মক্কায় নিরাপত্তা আসবে। হাদীসে মক্কার কথা উল্লেখ না করে ইয়েমেনের কথা বলার বিশেষ কারণ আছে। সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত ইয়েমেনে গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। রাসূলের ﷺ সময় পুরো ইয়েমেনজুড়ে প্রচুর সশস্ত্র গোত্র ছিল। তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকতো। তারা প্রত্যেকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগে যখন ইসলামের আলো ইয়েমেনে প্রবেশ করলো, তা পুরো সমাজকে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন করে তুললো। ইসলামের সৌন্দর্যই এটা। যেকোনো কিছুই ইসলামের স্পর্শে নিরাপদ ও প্রশান্তিময় হয়ে ওঠে। এখন মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, শরীয়াহর শাসন উঠে গেছে আর সেজন্যই সেই একই সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত অঞ্চলটি আজ আবারও ইয়েমেনের সবচেয়ে অনিরাপদ স্থানে

---

[28] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০।

পরিণত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া এ দুটো স্থানের আশেপাশে সফরের কথা চিন্তায় আনাও নির্বুদ্ধিতার শামিল। এতেই বোঝা যায়, একমাত্র ইসলামের ছায়াতলেই রয়েছে সত্যিকার শান্তি।

কথার লড়াই

কুরাইশদের সাথে নবীজির ﷺ প্রজ্ঞাপূর্ণ বোঝাপড়ার একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনি আছে।[29] একবার কুরাইশের লোকেরা একত্র হয়ে ঠিক করলো, 'চলো, এমন একজনকে খুঁজে বের করি যে জাদু আর কবিতা রচনায় পারদর্শী। সে আমাদের হয়ে মুহাম্মাদের সাথে মোকাবেলা করবে।' তারা উতবা ইবন রাবিয়াকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। উতবা ইবন রাবিয়াহ মহা ধুরন্ধর লোক, কথার মারপ্যাঁচে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। উতবা নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা মুহাম্মাদ, বলো তো কে উত্তম– তুমি নাকি আবদুল মুত্তালিব?'

খুবই চতুরতাপূর্ণ প্রশ্ন। তৎকালীন আরব সমাজে মৃত পূর্বপুরুষদের অত্যধিক সম্মান করা হতো। আর রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবারকে সমগ্র মক্কার লোক সম্ভ্রমের নজরে দেখতো। আবদুল মুত্তালিব বা তাঁর মতো মানুষের বিপক্ষে কথা বলবে এমন সাহস কারো ছিল না। সেই সমাজে পূর্বপুরুষদের হেয় করে কথা বলাটাই ছিল এক ধরনের অপরাধ। তাই উতবা যখন নবীজিকে ﷺ তাঁর বাবা আবদুল্লাহ এবং দাদা আবদুল মুত্তালিবের কথা জিজ্ঞেস করলো, নবীজি ﷺ চুপ করে রইলেন। সুযোগ পেয়ে উতবা বলে উঠলো,

'দেখো, তুমি যদি বলো এই মানুষগুলো তোমার চেয়ে উত্তম, তাহলে শুনে রাখো, যে দেব দেবীদের নামে তুমি বাজে বকছো, ওরাও তো তাদেরই উপাসনা করতো। আর তুমি যদি নিজেকে তাদের চেয়ে ভালো মনে করো তাহলে তোমার কী বক্তব্য আছে পেশ করো। আমরাও শুনি তোমার কী বলার আছে। তবে আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমার চেয়ে বড়ো মূর্খ আমরা জন্মেও দেখিনি, যে কিনা তার আপন জাতির এত ক্ষতি করে। তুমি আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছো, দ্বন্দ্ব বাড়াচ্ছো, আমাদের ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করছো। তোমার জন্য আমরা আরবদের চোখে ছোট হয়ে গেছি, লোকের মুখে মুখে রটে বেড়াচ্ছে–কুরাইশদের মাঝে নাকি জাদুকর আছে।'

অদ্ভুত ব্যাপার হলো–কুরাইশদের মাঝে জাদুকর আছে এই গুজব সৃষ্টির জন্য উতবা রাসূলুল্লাহকে ﷺ দায়ী করছে, অথচ এই গুজব শুরুতে কুরাইশ নেতারাই রটায়। তারাই মুহাম্মাদকে ﷺ জাদুকর ডাকতে শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের নিজেদের কাজে নিজেরাই লজ্জায় পড়ে যায়। উতবা বলে, 'আল্লাহর কসম, দেখে মনে হচ্ছে যেন আমরা এক গর্ভবতী নারীর কান্নার জন্য বসে আছি, এরপরই আমরা একে

[29] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩।

অপরের বিরুদ্ধে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবো যতোক্ষণ না আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।' তার কথার অর্থ ছিল, ইসলামের কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ বেধে যাবে, আর সেজন্য মুহাম্মাদ ﷺ দায়ী।

এরপর উতবা প্রস্তাব দিল, মুহাম্মাদকে ﷺ উচ্চ মর্যাদা, ধনসম্পদ - তিনি যা চান তা-ই দেওয়া হবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবীজিকে ﷺ লোভ দেখিয়ে আপস-সমঝোতার মাধ্যমে ইসলামকে পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ উতবার এসব বকবকানি মন দিয়ে শুনেছেন, কথার মাঝখানে তাকে একবারও বাধা দেননি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট শ্রোতা। আর তাই উতবার কথাগুলো অর্থহীন হলেও তিনি শান্তভাবে তার সব কথা শুনে গেলেন। উতবা একসময় থামলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদুস্বরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- উতবা, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে?

- হ্যাঁ শেষ, উতবা জবাব দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ থেকে উতবার কথার কোনো জবাব দিলেন না, বরং কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করতে শুরু করলেন...

> "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত, আরবী কুরআন, সেই লোকদের জন্য যারা জানে।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ১-৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করতেই থাকলেন, করতেই থাকলেন। এরপর এই আয়াত এলো যেখানে বলা হয়েছে, (৪১: ১৩)

> "অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মতো।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ১৩)

এই আয়াতটি পাঠ করামাত্র উতবা হাত বাড়িয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে চাপা দিয়ে তাঁকে থামাতে গেলো। কেননা এই আয়াতে কাফেরদেরকে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তির হুমকি দেওয়া হচ্ছিলো আর উতবা মনে মনে ঠিকই জানতো যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যবাদী। তিনি যা উচ্চারণ করবেন, তার প্রতিটি বর্ণ অক্ষরে অক্ষরে ফলবে। সে মরিয়া হয়ে বললো, 'আমাদের সম্পর্কের কসম লাগে, থামো, তুমি থামো!'

উতবা কুরাইশের লোকেদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'মুহাম্মাদ যখন কুরআন পড়তে শুরু করলো, সে যে কী বলছিল আমি আগামাথা কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু একটা ব্যাপার বুঝেছি, আদ ও সামূদ জাতির ওপর যেমন আযাব এসেছিল, আমাদের ওপরও তেমন আযাব আসবে। এমনটাই সে হুমকি দিয়েছে।' কুরাইশের লোকেরা বললো, 'দূর হও! সে তোমার সাথে স্পষ্ট আরবি ভাষায় কথা বললো তবু তুমি তাঁর

কথা বুঝতে পারলে না?' উতবা উত্তর দিলো, 'আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তাঁর কথা বুঝতে পারছিলাম না।'

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ একেক পরিস্থিতি একেকভাবে মোকাবেলা করেছেন। অনেক সময়ই তিনি সরাসরি কুরআনের আয়াত দিয়ে মানুষের কথার জবাব দিয়েছেন। এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দাওয়াহ দেওয়ার সময়ে কুরআনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা একটি উত্তম পদ্ধতি, কেননা আল্লাহ্ আযযা ওয়াজালের কথাই উত্তম দাওয়াত।

মক্কার বাইরের লোকেদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

দামাদ আল আযদী: জ্বিন ছাড়াতে এসে ইসলাম গ্রহণ

দামাদ আল আযদী ছিল দক্ষিণ আরবের বাসিন্দা। সে মক্কায় এসে একটা গুঞ্জন শুনতে পেলো, 'এক লোককে জ্বিনে ধরেছে।' লোকেরা আসলে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথাই বলছিল। দামাদ আল আযদী ছিল ওঝা, সে জ্বিন তাড়াতে পারতো। খুব আন্তরিক ভাবে সাহায্যের নিয়তে সে নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে বললো, 'শুনেছি আপনাকে নাকি জ্বিনে ধরেছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, আপনি যদি চান তো আমি জ্বিন তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি।' সুস্থসবল লোকের জন্য কথাটা বেশ অপমানজনক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরক্ত বা রাগ কোনোটাই হলেন না। প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ এই মানুষটি বুঝতে পারলেন যে লোকটি নিশ্চয়ই তাঁর সম্পর্কে কিছু উল্টোপাল্টা শুনেছে। খুতবার দুআ পড়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন:

> *'সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ তাআলা যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আল্লাহ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইবাদতের যোগ্য ইলাহ নেই, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই।'*

আরবিতে এই দুআটি শুনতে যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই শ্রুতিমধুর। দামাদ আল আযদী এই দুআ শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলো। শেষ হওয়ামাত্র উঠলো–'মুহাম্মাদ! আপনি কি এই কথাগুলো আরেকবার বলবেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় দুআটি পড়ে শোনালেন।

দামাদ বললো, 'এমন কথা এর আগে আমি কোনো দিন শুনিনি! কী চমৎকার কথা– যেন সাগরের গভীরে যেয়ে আঘাত হানবে।' অর্থাৎ এ কথাগুলো এমন যা নিশ্চিত মানুষকে প্রভাবিত করবে।

- তবে এসো, আমার কাছে বায়াত (আনুগত্যের শপথ) করো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানালেন,

এক মুহূর্ত দেরী না করে দামাদ বললো,

- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

- তুমি কি তোমার (গ্রামের) লোকেদের জন্য বায়াহ্ দেবে?

- আমি আমার লোকেদের জন্যেও বায়াহ্ দেবো।

এর খানিকক্ষণ আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহকে ﷺ সুস্থ করতে এসেছিল, অথচ রাসূলুল্লাহই ﷺ তাঁকে জাহেলিয়াতের রোগ থেকে সুস্থ করে তোলেন! এর অনেক বছর পরের কথা। রাসূলুল্লাহর ﷺ পাঠানো সেনাবাহিনী সেই গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নেতা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি এই গ্রামবাসীর থেকে কিছু নিয়েছো?' একজন বলে উঠলো–হ্যাঁ, আমি তাদের থেকে একটা শক্তসমর্থ উট ছিনিয়ে নিয়েছি।' সেনাবাহিনীর নেতা এ কথা শুনে বললেন, 'ওদেরকে উটটা ফেরত দিয়ে দাও, কেননা তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হয়েছে।'[30]

আমর ইবন আবসা ﷺ: সত্যের খোঁজে মক্কায়

সহীহ মুসলিমে আমর ইবন আবসা ﷺ নামের এক সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনি ছিলেন আরবের অধিবাসী। আমর ইবন আবসার ﷺ নিজ মুখেই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনি বর্ণনা করেছেন:

'জাহেলিয়াতের সময় থেকেই আমার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমার সমাজের লোকেরা যে ধর্মের অনুসরণ করছে তা মিথ্যা, ভ্রান্ত। তাদের মূর্তিপূজায় আমি কোনোদিনও বিশ্বাস করিনি। আমি মন থেকে জানতাম–এই ধর্ম সঠিক নয়। হঠাৎ একদিন শুনলাম মক্কার এক ব্যক্তি নতুন ধর্ম প্রচার করছে। এ খবর শোনামাত্র আমি আমার উটের পিঠে চড়ে গোপনে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। (সে সময় মক্কার পরিস্থিতি এতো কঠোর ছিল যে মক্কার বাইরের কেউ মুহাম্মাদের ﷺ সাথে প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করতে পারতো না।) আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

- কে আপনি?

- আমি একজন নবী।

- এর অর্থ কী?

- এর অর্থ আমি আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছি।

- তিনি আপনাকে কী দিয়ে পাঠিয়েছেন?

- তিনি আমাকে এই বার্তা সহকারে পাঠিয়েছেন যে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না এবং সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করে দিতে হবে

---

[30] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২।

- আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ দূরদর্শী ছিলেন। তিনি মক্কার এই বিপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে আমরকে رضي الله عنه টেনে আনতে চাইলেন না। বললেন, 'তুমি এখন আমার অনুসরণ করতে পারবে না, তুমি কি আমার অবস্থা দেখছো না? তোমার লোকেদের কাছে ফিরে যাও, যখন শুনবে যে আমি বিজয়ী হয়েছি–তখন আমার সাথে এসে দেখা কোরো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে তিনি জয়ী হবেন। এখানে তিনি আমরকে ইসলাম গ্রহণে নিষেধ করেন নি, বরং গোপনে ইসলাম পালন করতে বলেছেন।

'আমি চলে এলাম। এরপর থেকে আমি মুহাম্মাদের ﷺ ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতাম। মুসাফিরদের কাছে জিজ্ঞেস করতাম – মুহাম্মাদের কী খবর? এরপর একদিন শুনলাম যে মুহাম্মাদ ﷺ মদীনায় হিজরত করেছেন এবং তিনি বিজয়ী হয়েছেন। এ কথা শুনেই আমি মদীনায় রওনা দিলাম। নবীজির ﷺ কাছে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

নবীজির ﷺ সাথে আমরের প্রথমবার সাক্ষাৎ হওয়ার পর বহু বছর কেটে যায়। প্রথম বার খুবই স্বল্প সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তো কাউকে ভুলে যান না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ চিনেছি, তুমি হলে সেই ব্যক্তি যে মক্কায় আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলে।'

নেতৃত্বদানের জন্য এই গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন নেতাকে অবশ্যই তাঁর অনুসারীদেরকে খুব ভালোভাবে চিনতে হবে। নবী সুলাইমানের عليه السلام মাঝেও এই গুণের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। যখন তাঁর পক্ষীবাহিনী থেকে মাত্র একটি পাখি অনুপস্থিত ছিল, তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে হুদহুদ পাখি সেখানে নেই।

এরপর আমর ইবন আবসা رضي الله عنه বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন। আমাকে সালাত নিয়ে কিছু বলুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে সালাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করলেন। এরপর আমর رضي الله عنه বললেন, 'আমাকে ওযু করা শেখান।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ওযু করা শিখিয়ে দিলেন। এভাবেই একটা সাধারণ মানুষের মনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অসাধারণ স্থান করে নিয়েছিলেন। অদ্ভুত মোহনীয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাসূলুল্লাহ–মুহাম্মাদ ﷺ।

আবু যার رضي الله عنه: গিফারের বাতিঘর

ইসলামের ইতিহাসের অনন্য এক নাম আবু যার গিফারী رضي الله عنه। কী ছিল তাঁর ইসলামে আসার কাহিনি? ইমাম আহমেদ থেকে বর্ণিত হয় আবু যারের ভাষ্য:

'আমরা ছেড়ে চলে এলাম আমাদের গিফার শহর। ছোট থেকে যেখানে বড়ো হয়েছি, শেষপর্যন্ত সেই গিফার ছাড়তে বাধ্য হলাম। মা আর ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম

নতুন কোনো গন্তব্যের আশায়। গিফারের লোকেরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল। পবিত্র মাসেও তাদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকে! আশহুরুল হারামের এই অপমান আর সহ্য করা যায় না।'

আশহুরুল হারাম হলো সেই চার মাস, যেগুলোকে আরবের লোকেরা পবিত্র মাস বলে গণ্য করতো। এ সময় তারা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকতো। আরবের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য, এই চার মাসে কোনোপ্রকার হত্যা বা খুনোখুনি করা যাবে না। এই চার মাসের মর্যাদা কেউ ক্ষুণ্ণ করবে না। তবে গিফারের লোকেরা ব্যতিক্রম। লুটপাট, হানাহানি করাই তাদের পেশা। এসব পবিত্র মাস বা প্রচলিত নিয়মনীতির ধার ধরতো না তারা। কাফেলা আক্রমণ, চুরি, হত্যা, এগুলোই ছিল তাদের কাজ। তাদের অপকর্মের ফলে সারা আরব জুড়ে তাদের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলাম গ্রহণের আগেও আবু যার ﷺ স্বগোত্রের এই অপরাধপ্রবণ জীবন পছন্দ করতেন না। সবার কাছে যা পানিভাত, আবু যার গিফারীর কাছে সেটাই গর্হিত অপরাধ। তিনি যেন নিজ ভূমে পরবাসী। তাই এক সময় পরিবারসহ গিফার ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে দেখা করলেন তাঁর চাচার সাথে। তাঁর চাচা অন্য গোত্রের সদস্য। আবু যারের ভাষায়, 'চাচা আমাদের প্রতি খুবই দয়ালু এবং যত্নবান ছিলেন।' কিন্তু তাদের প্রতি চাচার এই বিশেষ যত্নআত্তি ও মেহমানদারি বাকি আত্মীয়-স্বজনদের সহ্য হচ্ছিল না, তারা তাদেরকে হিংসা করতো। একদিন সুযোগ বুঝে আবু যারের চাচার কানে বিষ ঢেলে দিলো। বললো, আপনি যখন এখানে থাকেন না, সেই সুযোগে আবু যারের ভাই উনাইস আপনার স্ত্রীর সাথে দেখাসাক্ষাত করে, আপনার বউয়ের ব্যাপারে তার বেশ আগ্রহ।' চাচা আগে-পিছে কিছু বিবেচনা না করে সোজা আবু যার ও তার ভাই উনাইসের কাছে হাজির হলো। তাদেরকে এইসব বিষাক্ত কথা শুনিয়ে ছাড়লেন। আবু যার তার চাচার মুখে এসব কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন। বললেন, 'চাচা, আপনার দীর্ঘদিনের যত্নআত্তি আর উত্তম আচরণ–সবই আজ বরবাদ হয়ে গেল। আপনি কীভাবে পারলেন আমাদের বিরুদ্ধে এমন একটা অভিযোগ তুলতে! আপনার এত দয়ার আর কোনো মূল্য থাকলো না।' এই বলে তারা শীঘ্রই গোছগাছ করে চাচার বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন।

'চাচা আমার কথায় খুব দুঃখ পেলেন, উনার চিন্তাশক্তি ফিরে এলো। উনি এসব কথা তোলার জন্য আফসোস করতে লাগলেন। কাপড়ে মুখ ঢেকে খুব কাঁদছিলেন চাচা। কিন্তু আমাদের রাগ কমলো না, এমন অভিযোগের পর থাকা যায় না, তাই সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে সেখান থেকে চলে এলাম।'

এরপর আবু যারের পরিবার মক্কার কাছাকাছি একটি অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। আবু যার বর্ণনা করেন, 'আমার ভাই উনাইস ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যায়। সেখানে তার সাথে এক লোকের দেখা হয়। সে নিজেকে নবী দাবি করছিল। উনাইস ফিরে এসে বললো, আমার সাথে আজ এক লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি এক নতুন দ্বীন প্রচার

করছেন। তিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন। আমি বললাম, আরে, আমি তো ইতিমধ্যেই অন্য সকল প্রকার মূর্তি ও দেব দেবীর পূজা বাদ দিয়েছি। তিন বছর যাবৎ কেবল এক আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করছি।'

আবু যারের মতো মানুষগুলোর ফিতরাহ্ ছিল বিশুদ্ধ, তাদের জন্মগত স্বভাব ও প্রকৃতিই তাদেরকে বলে দিত যে, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। আবু যারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'তুমি কীভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে যে দিকে ফিরে দুআ করার নির্দেশ দিতেন, আমি সেদিকেই ফিরে দুআ করতাম। আল্লাহ্ আমাকে যে ভাবে দুআ করতে বলেন, আমি সেভাবে দুআ করতাম। আর আমি রাতভর দুআ করে যেতাম যতক্ষণ না ঘুম এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে নেয় আর এরপর সূর্যের আলোয় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি।'

আবু যার তাঁর ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলেন, 'সেই মানুষটি কী শেখান?' উত্তরে উনাইস আবু যারকে ইসলামের কিছু শিক্ষার কথা বলেন। তিনি নবীজির ﷺ কাছ থেকে সেগুলো শিখেছিলেন। এরপর আবু যার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা তাঁর সম্পর্কে কী বলে?'

- লোকেরা বলে সে একজন জাদুকর, গণক, মিথ্যাবাদী।

- নাহ, তুমি আমার কৌতূহল মেটাতে পারছো না! আমি নিজেই যাবো তাঁর সাথে দেখা করতে। লোকেরা তাঁর ব্যাপারে যা বলে, তা সত্য নাও হতে পারে।

আবু যার মক্কার 'সিএনএন' বা 'বিবিসি'-র ওপর ভরসা করে থাকেননি। তিনি নিজে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। 'আমি মক্কায় পৌঁছে যাকে প্রথমে সামনে পেলাম, তাকেই জিজ্ঞেস করে বসলাম, তুমি কি আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে? – কথা নেই, বার্তা নেই, সেই লোক সজোরে চিৎকার করে কুরাইশদের জড়ো করে ফেললো! কুরাইশরা এসে আমার ওপর অতর্কিত মারতে শুরু করলো। পাথর, নুড়ি, হাতের কাছে যে যা পাচ্ছিলো তাই নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়তে থাকে, একসময় আমি জ্ঞান হারাই। যখন জ্ঞান ফিরলো, আমার তখন নুসুব আহমারের মতো অবস্থা!'

নুসুব আহমার হলো সেই পাথর যার ওপর কুরাইশরা তাদের দেব দেবীর নামে পশু বলি দিতো, ফলে পাথরটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে থাকতো। মার খাওয়ার পর আবু যারের শরীরের অবস্থা হয়েছিল ওই পাথরের মত।

'আমি যমযম কূপের কাছে গিয়ে সেখান থেকে পানি খেলাম, আর যমযমের পানি দিয়ে গায়ের রক্ত ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলাম। এরপর আমি কাবার পাশে গেলাম।' ইমাম আহমেদের বর্ণনায় আছে যে আবু যার رضي الله عنه সেখানে তিরিশ দিন অবস্থান করেন। কেননা তিনি জানতেন না কোথায় রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখা পাওয়া যাবে। আবু যার

বলেন, 'পুরো সময়টাতে আমার কাছে যমযমের পানি ছাড়া আর কোনো খাবার ছিল না।' খাবার ছাড়া ত্রিশ দিন বেঁচে থাকা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্ভব নয়, তবে আবু যারের সাথে যা হয়েছিল তা হয়েছিল যমযমের পানির বরকতের কারণে। তবে মজার ব্যাপার হলো, আবু যার বলেন, 'সে সময় আমার ওজন বাড়তে থাকে, আমার স্বাস্থ্য এত ভালো হয়ে গেলো যে, আমার পেটে ভাঁজ পড়ে যায়!'

'একদিন দেখতে পেলাম দু'জন মহিলা, কাবার চারপাশে তাওয়াফ করছে। প্রত্যেক চক্করে চক্করে তারা ইসাফ আর নাইলা পাথরকে স্পর্শ করছিল।' ইসাফ আর নাইলা নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত। তারা ছিল প্রেমিক-প্রেমিকা, বিয়ে করেনি। একদিন দুজনে কাবার পাশে দেখা করে আর আল্লাহ্ তাআলার ঘরের পাশে তারা পরস্পরের সাথে যিনা করার ইচ্ছা করে। ওই অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাথরে পরিণত করেন। অথচ, কালের পরিক্রমায়, মক্কার মুশরিকরা তাদের এই মূর্তিগুলোর উপাসনা শুরু করে। এভাবেই শয়তান মানুষকে অন্ধকার থেকে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে ধাবিত করে, খারাপ কাজগুলোকে তাদের সামনে অতি মোহনীয় মোড়কে সুন্দর হিসেবে উপস্থাপন করে।

মূর্তি পূজার সূচনাও হয় এভাবে। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যে মানুষগুলোর মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল, তারা আদতে খারাপ লোক নয়, বরং সৎকর্মশীল মানুষ ছিলেন। নূহের ﷺ জাতি থেকে যখন নেককার লোকেদের মৃত্যু হলো, তখন শয়তান এসে মানুষদের বলতে থাকে, 'তোমরা তাদের মূর্তি তৈরি করলেই তো পারো, ওদের মূর্তি দেখে তোমাদের আল্লাহর কথা, ভালো কাজ করার কথা মনে পড়বে।' ফলে লোকেরা 'ভালো নিয়তে' তাদের মূর্তি গড়ে শয়তানের প্রথম পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এর কয়েক প্রজন্ম পরে সবাই যখন ভুলে গেল এই মূর্তি কেন তৈরি করা হয়েছিল, কী এদের উদ্দেশ্য। তখন শয়তান এসে বললো এই মূর্তিগুলোই পূজা করতে। এভাবে আস্তে আস্তে তারা মূর্তিপূজা আরম্ভ করে।

তবে আবু যার বরাবরই মূর্তিপূজার ঘোরবিরোধী। তিনি কাবার পাশে এমন মূর্তিপূজা দেখে আর চুপ থাকতে পারলেন না। মহিলা দুটোর দিকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, 'তোমরা পাথরদুটোর একটিকে আরেকটির সাথে সঙ্গম করিয়ে দিলেই তো পারো।' মহিলাদের মুখে কোনো কথা নেই। হতে পারে তারা তাঁর কথা বোঝেইনি, অথবা এমনও হতে পারে যে, তারা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে কেউ তাদের দেবতাদের নামে এরকম বাজে কথা বলতে পারে। তারা কোনো উত্তর না দিয়ে তাওয়াফ করতে থাকে। আবু যার যখন দেখলেন তাঁর কথায় মহিলাদের কোন ভাবাবেগ নেই, তিনি তারচেয়েও বাজে একটি মন্তব্য করলেন। এবারে মহিলাদের আর কোনো সন্দেহ রইলো না। তারা নিশ্চিত হয়ে গেল লোকটা আসলেই তাদের দেব দেবীদের সম্পর্কে এসব বাজে বকছে। ওমনি দু'জন চিৎকার করতে করতে দৌড়ে মক্কার রাস্তায় চলে গেল। ছুটতে ছুটতে একেবারে হাজির হলো মুহাম্মাদ ﷺ ও আবু বকরের ﷺ সামনে।

মুহাম্মাদ ﷺ তাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমাদের?'

- ওই যে, ওখানে ... ওখানে একটা মুরতাদ!

- কী করেছে সে?

- সে কথা মুখে আনার মতো নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির সাথে দেখা করতে চললেন। তিনি সেখানে আবু যারকে পেলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

- তুমি কোথা থেকে এসেছো?

- আমি এসেছি গিফার গোত্র থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মমতার সাথে তাঁর হাত আবু যারের কপালে রাখলেন। আবু যার বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত—সত্যের অনুসন্ধানে কেউ একজন গিফার থেকে মক্কায় চলে এসেছে!' কেননা গিফারে আইন-কানুন মানার কোনো বালাই নেই, পবিত্র মাসকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করে না। সেই গিফারের একজন মানুষ কিনা সত্যধর্মের খোঁজে মক্কায় চলে এলো! বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! অথচ যেখানে মক্কার কুরাইশরা ধর্মে-কর্মে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও সত্য দ্বীনের ব্যাপারে এগিয়ে এলো না।

'আমার কাছে মনে হলো যে, আমি গিফার থেকে এসেছি এটা শুনে হয়তো উনার পছন্দ হয়নি তাই তিনি আমার কপালে হাত দিয়েছেন। আমি হাত বাড়িয়ে কপাল থেকে উনার হাত সরাতে গেলাম। সাথে সাথেই আবু বকর ﷺ আমার হাতে বাড়ি মেরে নামিয়ে দিলেন, বললেন—হাত নামিয়ে নাও।' এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তাঁর কথোপকথন শুরু হয়।

আবু যার অনুসন্ধানী ব্যক্তি ছিলেন। যার-তার, যে কোনো কথা মেনে নেওয়ার লোক নন। আপন ভাই যখন নবীর সন্ধান এনেছিল, তিনি তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সত্যের ব্যাপারে আবু যারের সহজাত একটা বোধ বরাবরই কাজ করতো। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনও সহ্য করতে পারেন নি। ভিটেমাটি ছেড়েছেন, সত্যের সন্ধানে সুদূর মক্কায় এসেছেন, মার খেয়েছেন—তবু সত্যের প্রতি আগ্রহ দমেনি। কথোপকথনের এক পর্যায়ে আবু যারের অন্তরের সকল প্রশ্নের অবসান হলো। যে সত্যের সন্ধানে তিনি এতোদূর এসেছিলেন, আজ যেন সেই সত্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই চিরন্তন সত্যের সামনে তিনি মাথানত করে দিলেন। আবু যার ইসলাম গ্রহণ করলেন। আজ থেকে তিনি মুসলিম!

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু যারকে ﷺ উপদেশ দিলেন, 'তোমার ঈমানের কথা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না।' কিন্তু প্রবল উৎসাহে আবু যার পরদিনই মক্কার কুরাইশদের সামনে

চিৎকার করে উঠলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ﷺ।' এই কাজের ফল কী হতে পারে সেদিকে নজর দেওয়ার যেন সময়ই নেই।

'শাহাদাহ শোনামাত্র কুরাইশরা আমাকে ছেঁকে ধরলো, এমনভাবে এলোপাতাড়ি মারতে লাগলো যে আরেকটু হলে আমি সেদিনই মারা পড়তাম। কিন্তু ঠিক তক্ষুণি আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব এসে পড়লেন বলে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। তিনি বললেন, তোমরা জানো এই লোক কোথাকার? এই লোক গিফার গোত্রের। এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমাকে রেখে পালিয়ে গেল।

আবু যার অপ্রতিরোধ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও তিনি একই কাজ করলেন। প্রতিদিনই মক্কার লোকেরা তাঁকে মারধোর করতো, আর আব্বাস এসে বলতেন যে এই লোক গিফার থেকে এসেছে। আব্বাস বলতেন, 'তোমরা কি জানো যে এই লোক তোমাদের হাতে মারা পড়লে কী হবে? তোমাদের কোনো কাফেলা আর নিরাপদে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছাবে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর আবু যারকে ؓ বললেন, 'তুমি তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাও, তাদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দাও। যখন শুনবে আমি বিজয়ী হয়েছি তখন আমার সাথে দেখা করতে এসো।'

আবু যার ؓ রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে খুব অল্প সময় কাটিয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ থেকে খুব বেশি কিছু শেখার সুযোগ হয়তো সেভাবে হয়নি। হয়তো তিনি হাতেগোণা কিছু আয়াত ও হাদীস শিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেগুলোকে সম্বল করেই গিফারে ফিরে যান তিনি। সেখানকার লোকেদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ দিতে শুরু করেন। আর দেখতে দেখতে গিফারের লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করেন, তত দিনে আমার গোত্রের প্রায় অর্ধেক লোকই মুসলিম। আমরা ঠিক করলাম যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করতে যাবো, আর তখন গোত্রের বাকি অর্ধেকও বলে উঠলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসলে আমরাও তাঁর সাথে দেখা করতে যাবো। আমরাও তখন ইসলাম গ্রহণ করবো।' এভাবে এক এক করে পুরো গিফার গোত্রই মুসলিম হয়ে যায়।

অতঃপর একদিন মদীনায় নবীজি ﷺ দিগন্তে ধূলোর মেঘ দেখতে পান। দেখে মনে হচ্ছিল কোনো সৈন্যদল আক্রমণ করতে আসছে। কয়েকজন সাহাবী ؓ নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে উদ্যত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'নাহ, সম্ভবত আবু যার আসছে।' রাসূলুল্লাহর ﷺ ধারণা সত্য হলো। বস্তুত এই ধুলিমেঘ ছিল আবু যারের বাহিনীর। তিনি তাঁর পুরো গোত্রকে সাথে নিয়ে নবীজির ﷺ কাছে বায়াত দিতে মদীনায় আসছিলেন।

সে যুগে গিফার এবং আসলাম এই দুই গোত্রের মাঝে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আসলামের লোকেরা আবিষ্কার করলো গিফারের সব লোক মুসলিম হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়,

তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে বায়াতও দিয়ে ফেলেছে! তারা অবিলম্বে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললো, 'আমরাও মুসলিম হবো!' রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'গিফার! আল্লাহ যেন তাদের মাফ করে দেন। আসলাম! আল্লাহ যেন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত করেন।' পুরো দু-দুটো গোত্রের মুসলিম হয়ে যাওয়া–এই বিশাল ঘটনার পেছনে ছিলেন একজন মাত্র লোক, আবু যার গিফারী ؓ। তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন না, তাঁর অনেক বেশি বুজুর্গিও ছিল না। পরবর্তীতে অনেক ইলম অর্জন করলেও, ইসলাম গ্রহণের পর পর খুব অল্পসংখ্যক আয়াতই জানতেন। কিন্তু এই সীমিত জ্ঞান সম্বল করেই তিনি এগিয়ে যান। এর পেছনে ছিল তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা।

এভাবেই আবু যারের ؓ মাধ্যমে গিফার ও আসলামের সমস্ত লোক মুসলিম হয়ে যায়।[31] আরবের যে লোকগুলো কখনো মুসলিম হবে বলে আশাও করা যায়নি, তারাই ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু যারের ؓ কাহিনি থেকে শিক্ষা:

১. যে ব্যক্তি সরলপথের খোঁজ করে, আল্লাহ তাকে হেদায়েত দেন। আবু যার সত্য জানার প্রচেষ্টায় আন্তরিক ছিলেন, তাই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, অন্তত একটি আয়াত জানলেও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

৩. আবু যার ছিলেন খুবই সাহসী। সত্য কথা অকপটে তিনি সবার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। মক্কায় একজন 'বিদেশী' হওয়া সত্ত্বেও কথা বলতে ভয় পাননি, কারণ তিনি নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়ে গর্বিত ছিলেন।

৪. আবু যারের কাছ থেকে শিক্ষণীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কোনো কথার সত্যতা যাচাই করা । মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জাদুকর বা মিথ্যাবাদী বলে সবার কাছে প্রচার করেছিল। কিন্তু তাদের দেখাদেখি আবু যার সে কথায় বিশ্বাস করে ফেলেননি। বরং তিনি নিজচোখে সত্য যাচাই করতে মক্কায় এসেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। মুসলিমদের উচিত মিডিয়ার কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য বোঝার চেষ্টা করা।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীসে বলেছেন, 'কোনো ভালো কাজকেই ছোটো মনে

---

[31] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯।

করো না। এমনকি যদি তা হয় তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে এক চিলতে হাসি।' কোনো ভালো কাজকেই নগণ্য ভাবা যাবে না, কেননা বিচারের দিনে একটি ছোটো কাজও হয়তো অনেক ব্যবধান গড়ে দেবে। আবু যার ﷺ ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন–তা কিন্তু না, তিনি অল্পই জানতেন। আর তিনি নিজের গোত্রে ফিরে গিয়ে যা জানতেন, তা দ্বারাই ইসলামের দাওয়াহ দেন–এর বেশি কিছু করেন নি। হয়তো তখন তাঁর কল্পনাতেও আসেনি যে, তাঁর পুরো গোত্র তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়ে যাবে, এমনকি তাদের দেখাদেখি আসলাম গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করবে! কিন্তু দাঈদের কাজ এটাই। তারা বীজ বুনবে, চারাগাছ জন্ম দেবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। হাদীসে আছে, 'কোনো ব্যক্তি হয়তো তেমন চিন্তা-ভাবনা না করেই এমন একটি ভালো কথা বলে ফেলবে, যার কারণে আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং তাঁর জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে দেবেন। আর কোনো ব্যক্তি হয়তো এমন একটা কথা বলে বসবে যা আল্লাহর রাগের কারণ হবে, ফলে আল্লাহ তার সেই কথার জন্য তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।'

প্রথম হিজরত: আবিসিনিয়া

হাবাশা অর্থাৎ আবিসিনিয়াতে দু'বার হিজরত হয়েছিল। প্রথমবার বারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলার একটি ছোট দল সেখানে হিজরত করে। এটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের ঘটনা। আর দ্বিতীয়বার বেশ বড়সড় একটি দল হিজরত করে। সে দলে ছিল তিরাশি জন পুরুষ এবং আঠারো-উনিশ জন মহিলা।

প্রথম দলটি আল-হাবাশাতে পৌঁছে গুজব শুনতে পায় যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আন-নাজমের আয়াতগুলো কুরাইশদের লোকদের পড়ে শোনালে সেই আয়াতগুলো তাদেরকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। তিনি শেষ আয়াতে পৌঁছানো মাত্রই সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এই শেষের আয়াতটি ছিল সিজদাহ'র আয়াত। সে সময় নবীজি ﷺ আর মুসলিমদের সাথে সাথে কাফেররাও সিজদা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশের লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে। ফলে হাবাশা থেকে মুসলিমরা মক্কায় ফিরে আসেন। এসে বুঝতে পারেন যে, এ খবর মিথ্যা।

সাহাবীদের ﷺ কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা হাবাশাতে চলে গেলেই পারো, কেননা সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন। তিনি কারো সাথে জুলুম করেন না।' এই রাজা হলেন আন-নাজ্জাশী, খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। নবীজির ﷺ পরামর্শ অনুযায়ী সাহাবারা ﷺ দ্বিতীয়বারের মতো হাবাশায় হিজরত করেন। সবার আগে উসমান ইবন আফফান, তাঁর স্ত্রী নবীকন্যা উম্ম কুলসুমকে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁরা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটিও মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু মক্কার লোকেরা তাদেরকে এত সহজে ছেড়ে দেয়নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনোদিক দিয়েই মক্কার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল না। তারপরও কুরাইশরা মুসলিমদের পিছু নিলো। আন-নাজ্জাশীর কাছে দূত পাঠালো যেন সে আবিসিনিয়ার মুসলিমদেরকে তাদের হাতে হস্তান্তর করে দেয়। এই মিশনের জন্য মনোনীত করা হয় আমর ইবন আস এবং আবদুল্লাহ ইবন রাবিআ অথবা আমর ইবন রাবিয়াকে । ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র আমর ইবন আস একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ, কুরাইশদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দেশ-বিদেশের বহু লোকের সাথে তার পরিচয়, রাজাবাদশা এবং বড় বড় লোকদের সাথে তার ওঠাবসা। কূটকৌশল আর কথার লড়াইয়ে তুখোড়। তাই এ কাজের জন্য কুরাইশরা তাকেই বেছে নেয়।

আমর ইবন আস নাজ্জাশীর দরবারে গেলো। কথা ছিল, সে প্রথমে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করবে। তাদের প্রত্যেককে কিছু 'উপহার' দিয়ে–সোজা বাংলায় ঘুষ দিয়ে, তারপর নিজের প্রস্তাবনা তুলবে। তার কথার সারমর্ম হবে এরকম: মক্কার কিছু মূর্খ লোক পালিয়ে তোমাদের দেশে ঢুকেছে, আমরা চাই তোমরা তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পনা ছিল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আগেভাগেই সব ঠিক করে রাখবে। এরপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাতের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেবে। তাহলে নাজ্জাশীর সাথে যখনই সে মুসলিমদের বিষয়ে কথা তুলবে, তখন এই ঘুষখোর কর্মকর্তারা আমরের পক্ষে সায় দেবে। আমর ঠিক এই কাজটাই করলো। কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সাথে দেখা করে তাদেরকে উপহার দিয়ে কথাবার্তা বলে রাখলো, বললো, 'নাজ্জাশীর সাথে দেখা করার আগেই যদি তোমরা এই (মুসলিম) লোকগুলোকে আমাদের হাতে হস্তান্তর করতে পারো, তাহলে আমি আরও খুশি হবো।' কারণ মুসলিমদের কথা নাজ্জাশীর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে এই ঝুঁকি নিতে চায় নি। মূলত তারা কুরআনের আয়াতকে ভয় পেতো। তাই চাচ্ছিলো না যে মুসলিমদের সাথে রাজার দেখা হোক।

এরপর আমর গেলো নাজ্জাশীর সাথে দেখা করতে। বললো, 'আমাদের ভেতর কিছু গণ্ডমূর্খ আছে। ওরা আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের ধর্ম তো ত্যাগ করেছেই, আপনার ধর্মও তারা গ্রহণ করেনি...', এভাবে আরও নানা রঙ্গচঙ্গে উত্তেজক কথা বলে নাজ্জাশীকে বিভ্রান্ত করতে চায়, ক্ষেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তারপর বললো, 'আমি চাই আপনি ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন।' এসময় নাজ্জাশীর বাদ বাকি কর্মকর্তারাও আমর ইবন আসকে সমর্থন করছিল।

আন-নাজ্জাশী বললেন, 'না, যারা আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে আমি তাদের কথা না শুনে অন্য কারো হাতে তাদেরকে তুলে দেবো না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কারণেই মুসলিমদেরকে হাবাশায় হিজরত করতে বলেছিলেন। কেননা তিনি জানতেন আন-নাজ্জাশী একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা, তিনি তাঁর আদর্শকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেন।

নাজ্জাশী মুসলিমদের ডেকে পাঠান। তাদেরকে বলা হলো যে, মক্কার আমর ইবন আস

নাজ্জাশীর সাথে দেখা করেছে। এখন নাজ্জাশী তোমাদের সাথে দেখা করতে চান। এ কথা শুনে মুসলিমরা শুরা (পরামর্শ) করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, জাফর ইবন আবি তালিব মুসলিমদের মুখপাত্র হবেন। যা সত্যি তিনি সেটাই বলবেন। তারা নাজ্জাশীর দরবারে এলে নাজ্জাশী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোন ধর্মে বিশ্বাসী? তোমরা তোমাদের দেশের লোকেদের ধর্ম ত্যাগ করেছো, আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি। তোমরা পৃথিবীর কোনো ধর্মই মানছো না। তোমরা কারা?'

জাফর উত্তরে যা বলেন, তাঁর পুরো বক্তব্য উম্মে সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ চাচাতো ভাই জাফর ﷺ বলেন,

'হে রাজা! আমরা ছিলাম মুশরিক। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, আতিথেয়তার থোড়াই-কেয়ার করতাম, অবৈধ কাজকে বৈধ করে নিতাম, একে-অপরের রক্ত ঝরাতাম। আমরা ভালো-মন্দের তোয়াক্কা করতাম না। আর তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে আমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনোকালেই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর ইবাদতে আর কাউকে শরীক না করতে। তিনি আমাদেরকে আত্মীয়ের হক আদায় করতে আদেশ করেছেন, অতিথিদের সম্মান করতে বলেছেন আর শিখিয়েছেন মহান রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা ও রোজা রাখার কথা–তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করার কথা। তিনি আমাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। যেন আমরা আমাদের রবের একত্ববাদের ঘোষণা দিই, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি আর তিনি ছাড়া আর যত মূর্তি, পাথর আছে, যেগুলোকে আমাদের বাপদাদারা পূজা করেছে, সেগুলো ভেঙে ফেলি। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার আদেশ দেন, লোকের আমানত রক্ষা করতে বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ও আতিথেয়তার নিয়ম মেনে চলতে নির্দেশ দেন। হারাম কাজ, অবৈধ কাজ, একে-অপরের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেন। মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদে ভাগ বসানো, সতী-সাধ্বী নারীর নামে কুৎসা রটাতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে, ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করতে।'

এভাবে জাফর ﷺ আন-নাজ্জাশীর কাছে একেবারে অল্প কথায় ইসলামের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। জাফর ﷺ ইসলামের এমন সব সুন্দর শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সৎ গুণসম্পন্ন যেকোনো লোক ভালো বলে মানতে বাধ্য। তিনি নাজ্জাশীর কাছে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে, ইসলাম কোনো খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় না, কোনো অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং এর প্রতিটি হুকুম-আহকাম, প্রতিটি শিক্ষাই কল্যাণকর। এর মাঝেই তিনি ইসলামের চারটি স্তম্ভের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত, পরিমিত। সবশেষে জাফর বলেন,

সূচিপত্র

'আর তাই আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি, তাঁকে বিশ্বাস করেছি, তিনি আল্লাহর থেকে যা কিছু দিকনির্দেশনা এনেছেন, সেগুলোকে মেনে চলেছি। আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না। আল্লাহ তাআলা যেগুলো হারাম করেছেন, আমরাও সেগুলোকে হারাম হিসেবে মানি আর তিনি যেগুলোর অনুমতি দিয়েছেন, আমরাও সেগুলোকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে নিই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের সাথে সীমালঙ্ঘন করে। আমাদের ওপর অত্যাচার করে। তারা চায় আমাদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে, আমাদেরকে জাহেলি যুগের মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিতে। তারা চায় আমাদের দিয়ে সেই সব হীন কাজ করাতে যেগুলোকে আমরা আগে সঠিক মনে করতাম। যখন তারা আমাদের ওপর জোর-জুলুম করতে লাগলো, দ্বীন পালনে একের পর এক বাধার সৃষ্টি করতে শুরু করলো, তখন আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করলাম, অন্য সবার ওপর আপনাকে পছন্দ করলাম। আমাদের আশা ছিল যে আমরা আপনার আতিথেয়তা পাবো, আর আমরা আশা রাখি আপনার এ রাজ্যে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে আসবে না।'[32]

জুলুম-নির্যাতনের কথায় নাজ্জাশীর মন নরম হয়ে পড়ে। তাঁর মনে পড়ে যায় ঈসা ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের সাথেও কী পরিমাণ অন্যায়-অত্যাচার করা হয়েছিল। তিনি নিজেও খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জাফরের বক্তব্যের সমাপ্তিটা ছিল সবচেয়ে চমৎকার এবং উপযুক্ত। তাঁর সব কথা শেষে নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের কাছে যা এনেছেন, তাঁর কিছু কি তোমরা এনেছো?' তিনি কুরআনের আয়াত শুনতে চাচ্ছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব কুরআনের কয়েকটি আয়াত তাঁকে পড়ে শোনালেন। তিনি কুরআন থেকে যেকোনো অংশই তিলাওয়াত করতে পারতেন, কিন্তু বিচক্ষণ জাফর সূরা মারইয়ামের থেকে পড়তে শুরু করলেন, তিলাওয়াত করলেন প্রথম আটাশটি আয়াত।

> **"কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে তাঁর রবকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে, সে বলেছিল, হে আমার রব! আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যে মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব! আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হই নি। আমি আমার স্বগোত্রের দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, (অপরদিকে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এক জন উত্তরাধিকারি দান করুন।" (সূরা মারইয়াম, ১৯: ১-৬)**

নাজ্জাশী জাফরের তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি কান্নায় ভিজে গেল। আর তাঁর সব সভাসদরাও এতো করে কাঁদলো যে তাদের বাইবেলগুলো ভিজে গেলো। সেটি ছিল এক আবেগঘন, হৃদয়গ্রাহী কিরাত!

---

[32] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩।

আন-নাজ্জাশী কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, মুসলিমদের হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কুরাইশ প্রতিনিধিরা চলে গেলো। যাওয়ার সময় আমর ইবন আস হুমকি দিয়ে গেলো যে করেই হোক মুসলিমদের সে মক্কায় ফিরিয়ে আনবে, তাদেরকে শেষ করে ছাড়বে। আমর ইবন আসের সঙ্গী তাকে বললো, 'এমন করে বোলো না, এরা তো তোমাদেরই আত্মীয়। নাজ্জাশী যদি এদেরকে ফিরিয়ে দিতে রাজি না-ই হয়, তাহলে বাড়াবাড়ি না করে দেশে ফিরে যাও।' কিন্তু আমর ইবন আস বললো, 'না, আমি কালই আবার আসবো, রাজাকে শুনিয়ে যাবো যে, মুসলিমরা ঈসাকে দাস বলে।'

আমর ইবন আস পরদিন আবার এসে নাজ্জাশীকে বললো, মুসলিমরা ঈসাকে ﷺ আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না, তাঁকে নিছক দাস বলে বিশ্বাস করে। আমর ইবন আস ছিল সে সময় একজন মুশরিক, নবী ঈসাকে নিয়ে আদতে তার এত মাথাব্যথার কিছু নেই। তিনি খোদা হন বা নবী হন বা নিছক একজন দাসই হন–তাতে তার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সে এই বিষয়টাকে পুঁজি করে নিজের ফায়দা হাসিল করতে চাচ্ছিল। তাই সে ফিতনা তৈরি করছিল। আন-নাজ্জাশী এ কথা শুনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক। তাঁর রাজ্যে এসব নিয়ে কোনো ফিতনা হোক সেটা তাঁর কাম্য ছিল না। তাই তিনি মুসলিমদের আবার ডাকলেন।

মুসলিমরা আগের সিদ্ধান্তেই অটল। তারা পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন, যা-ই হোক না কেন, তারা সত্য কথাই বলবেন। এবারও আগের দিনের মত জাফর ইবন আবি তালিবই তাদের মুখপাত্র। দরবারে উপস্থিত হলে আন-নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ঈসা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী?'

- তিনি আল্লাহর দাস, আল্লাহর নবী, আল্লাহর কালাম, জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র ও কুমারী নারী মারইয়ামের গর্ভে।'

- তাঁর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য আর আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এই কথা শোনার সাথে সাথে বিশপেরা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। কীভাবে আন-নাজ্জাশী এই ধরনের কথা বলতে পারলেন! আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তারা ঈসাকে ﷺ ঈশ্বর মনে করতো, তাই তারা ঈসার ﷺ ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস শুনে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট, মুসলিমরা যে তাঁকে আল্লাহর দাস মনে করে এটা তারা মানতে পারলো না। আন-নাজ্জাশী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তোমরা যা খুশি বলতে পারো। আমি এই মানুষগুলোকে আমার রাজ্যে স্বাধীন ঘোষণা করলাম।'[33]

মক্কার প্রতিনিধিরা আবিসিনিয়ায় এলে আন-নাজ্জাশী প্রথমেই তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা আমার জন্য তোমাদের দেশ থেকে কী এনেছো?' আমর ইবন

---

[33] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫।

আস বলেছিলেন, 'আমি আপনার জন্য চামড়ার তৈরি কিছু জিনিস এনেছি।' চামড়ার জিনিস ছিল আন-নাজ্জাশীর খুব পছন্দের। কিন্তু সেদিন, উম্মে সালামার ভাষায়, 'সেদিন আমর ইবন আস ও তার সঙ্গীরা অপমানিত হলো, কেননা আন-নাজ্জাশী তাদের বের করে দেন, এমনকি তাদের দেওয়া উপহারগুলিও ফেরত দেন।' আমর ইবন আসের সাথে আন-নাজ্জাশীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে তিনি বন্ধুত্বকেও প্রশ্রয় দেননি, বরং সত্যের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন।

আবিসিনিয়ার হিজরত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

এক. যেহেতু মুসলিমদের ওপর দ্বীন মেনে চলার কারণে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছিল, তাই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা মক্কা থেকে পালিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের অনুমতি দেন। ইমাম হাজম বলেন, 'যখন মুসলিমদের সংখ্যা আর তাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তাদের হিজরতের অনুমতি দেন।'

দুই. অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা সবার থাকে না। চাপের মুখে কিছু মানুষ তাদের ঈমান ধরে রাখতে পারে না। বিলালের মতো মানসিক শক্তি সবার থাকে না, খাব্বাব ইবন আরাতের মতো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সবাই যেতে পারে না। তাই কেউ যদি কোথাও তার দ্বীন নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় করে, তাহলে তার উচিত অন্য কোথাও চলে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একজন ঈমানদারের পক্ষে এমন সাধ্যতীত কষ্ট নিজের ওপর চাপিয়ে নেওয়া উচিত নয়, যার কারণে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়।' যদি কারো জন্য কোনোকিছুর ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে থাকে, তখন তার নিজেকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না।

একবার এক লোক ডিমের আকারের এক খণ্ড খাঁটি সোনা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে হাজির হয়ে বললেন, 'এটা আমার পক্ষ থেকে সাদাকাহ, আমার সহায়-সম্পদ বলতে এটুকুই আছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ মন খারাপ করে বললেন, 'তোমাদের কেউ কেউ তাদের সমস্ত সম্পদ সাদাকাহ্ করে ফেলো, তারপর বিপদে পড়ে আবার আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ চাননি এই মানুষটা তার সমস্ত দান করে পুরো নিঃস্ব হয়ে পড়ুক, বিপদে পড়ে সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাত পাতুক। সামর্থ্য বুঝে দান করা উচিত। কিন্তু সীরাহ্ থেকে এটাও দেখা যায়, আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه একবার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে দান করে দিয়েছিলেন আর রাসূল ﷺ সেই কাজের প্রশংসা করেন। দুটো একই রকম কাজের প্রতি তাঁর আচরণ ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো, রাসূল ﷺ জানতেন যে, সবকিছু দান করে দিলেও আবু বকরের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আছে যা ওই লোকের ছিল না। আবু বকর رضي الله عنه তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করে দেওয়ার পরেও কখনই ভিক্ষা চাওয়ার মতো নীচে নামবেন না।

সবাই আবু বকরের মতো নন। তাই যে কারো উচিত নয় নিজেদের এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়া যা সামাল দেওয়ার সামর্থ্য তারা রাখে না।

তিন. হিজরত প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ কুতুবের একটা মন্তব্য আছে। তিনি বলেন, 'এটা বলা সমীচীন হবে না যে মুহাজিরদের সকলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে হিজরত করেন। কেননা এই মুহাজিরদের মধ্যে খুব প্রভাবশালী পরিবার থেকে আগত ও বিপুল সম্পদের মালিক অনেক সাহাবী ﷺ ছিলেন।' তাদের বেশিরভাগই ছিলেন কুরাইশ বংশের। জাফর ইবন আবি তালিব একজন কুরাইশ। আর তাদের কিছুসংখ্যক ছিলেন অল্পবয়স্ক যুবক, তারা নবী মুহাম্মাদকে ﷺ নিরাপত্তা দিতেন। তাদের কয়েকজন হলেন যুবাইর ইবন আওয়াম, আবদুর রহমান ইবন আউফ, উসমান ইবন আফফান প্রমুখ। মুহাজিরদের মধ্যে কুরাইশের অভিজাত পরিবারের কয়েকজন নারীও ছিলেন। যেমন উম্ম হাবিবা, তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। কুরাইশ নেতার কন্যা হিসেবে তিনি কখনও মক্কায় নির্যাতনের শিকার হননি, কেউ তার গায়ে স্পর্শ পর্যন্ত করার সাহস করেনি, তবু তিনি হিজরত করেছিলেন। কিন্তু কেন?

কারণ এই হিজরতের ঘটনা কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী পরিবারদের ধর্মীয় ও সামাজিক ভিত্তিতে ঝাঁকুনি দেয়। তাদের চোখের সামনে দিয়ে তাদের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও সম্ভ্রান্ত ছেলেমেয়েরা বিবেক ও ধর্মীয় কারণে আপন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর গোত্রীয় দেশকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছিল। কুরাইশ রাজবংশের জন্য এর চেয়ে বড় অপমান কিছু হতে পারে না। এই ঘটনার কারণে কুরাইশরা খুব বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়ে। আরবে কুরাইশদের উঁচু অবস্থানের কারণ ছিল তাদের উচ্চ মর্যাদা, মূল্যবোধ ও কাবার অভিভাবকত্ব, এ কারণে নয় যে তারা সামরিকভাবে শক্তিশালী। তাই মানুষ যখন দেখল সম্ভ্রান্ত লোকজন তাদের জান-মাল ও দ্বীনের নিরাপত্তার জন্য মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বিষয়টা কুরাইশদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো।

চার. আরেকজন গ্রন্থকার মুনির আল গাদওয়ানের মতে, রাসূল ﷺ মক্কার বাইরে দ্বিতীয় আরেকটি ঘাঁটি বানাতে চেয়েছিলেন। যদি মক্কায় কিছু ঘটে যায়, তাহলে অন্য কোথাও যেন মুসলিমরা তাদের দ্বীন নিয়ে টিকে থাকতে পারে। তাই যখন মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে গেলো, তখন থেকে মুসলিমরা দু'টো দলে আলাদা থাকতে শুরু করে। এক দল মক্কায় থেকে যায় আর আরেক দল হিজরত করে আবিসিনিয়ায়।

আল-হাবশার হিজরত ছিল এমন একটা হিজরত যেখানে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠের মাঝে মুসলিম সংখ্যালঘুরা বসবাস করে। এটি ছিল একটা খ্রিস্টান-প্রধান দেশ। কিন্তু পশ্চিমের ইতিহাসে দ্বিতীয় আর কোনো আন-নাজ্জাশীর দেখা মেলেনি। পশ্চিমে তাঁর মতো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব আর কখনো দেখা যায়নি। হয়ত এমন একটা সময় ছিল যখন পশ্চিমের আইন ও সংবিধান আন-নাজ্জাশীর ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি ছিল, কিন্তু বর্তমানকালে পরিস্থিতি প্রায় পুরোটাই বদলে গেছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আল-হাবাশা এবং মক্কীযুগ নিয়ে খুব বেশি বর্ণনা নেই। এর কারণ হলো:

১। মদীনায় হিজরতের আগে হাদীসের দলীল রাখা মুসলিমদের জন্য বৈধ ছিল না। কারণ, মুহাম্মাদ ﷺ চাইতেন না তাঁর কথাগুলো কুরআনের বাণীর সাথে মিশে যাক।

২। পূর্ববর্তী আলিমরা মদীনার ব্যাপারে যেরকম আগ্রহী ছিলেন সেই তুলনায় মক্কার ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন না। কেননা ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত আইন কানুন বিধি বিধানের বেশিরভাগই তারা মাদানী জীবন থেকে শিখেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কী জীবনের প্রথম তের বছরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বেশি দরকার। কারণ আজকের বিশ্বে মুসলিমদের বড় একটা সংখ্যা সংখ্যালঘুদের মতোই বাস করছে। সংখ্যালঘুদের নিয়ে অনেক ফিক্বহ আছে যেগুলো মক্কী জীবনের প্রথম তের বছর থেকে শেখা প্রয়োজন।

কেন আবিসিনিয়া? ইরাক বা সিরিয়া কেন নয়?

প্রথমত, কারণ, রাসূল ﷺ নিজেই বলেছেন, 'আবিসিনিয়ায় যাও, সেখানে এক রাজা আছেন যিনি কাউকে অত্যাচার করেন না।' সুতরাং মুসলিমদের আল-হাবাশা যাওয়ার পিছনে একটা প্রধান কারণ ছিল আন-নাজ্জাশীর ন্যায়পরায়ণতা।

দ্বিতীয়ত, আল-হাবশার সাথে আরবদের ভালো সম্পর্ক ছিল। কুরাইশরা আবিসিনিয়ায় ব্যবসা করতো, তাই আরবদের সাথে আবিসিনিয়ার ইতিমধ্যে একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আবিসিনিয়ার সংস্কৃতির সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক আগেই পরিচিত ছিলেন, কেননা তাঁর প্রথম ধাত্রী উম্মে আইমান ছিলেন আল-হাবাশার। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ যত্ন নিতেন আর তাঁকে বুকের দুধ খাওয়াতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, উম্মে আইমান রাসূলের ﷺ সামনে কিছু খাবার পরিবেশন করেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কী?' উম্মে আইমান জবাব দেন, 'এটা একটা আবিসিনিয়ান খাবার।'

উম্মে আইমানের সংস্কৃতি আর ভাষা ছিল আবিসিনিয়ান। তাঁর উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ আবিসিনিয়ান। ইবন সাদের মতে, তিনি "সালাম ইলাহি আলাইকুম" বলতে চাইলে সেটা "সালাম উল্লাহি আলাইকুম" হয়ে যেতো। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শুধু 'সালাম' বলতে বলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ পুরো জীবনে উম্মে আইমান তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর পালক পুত্র যায়িদ ইবন হারিসার সাথে বিয়ে দেন।

তৃতীয়ত, আবিসিনিয়ানরা ছিল খ্রিস্টান আর মুসলিমরা তাদেরকে কুরাইশ মূর্তিপূজক বা পারস্যের অগ্নিপূজারীদের তুলনায় খ্রিস্টানদেরকে আপন মনে করতো।

চতুর্থত, আন-নাজ্জাশী ও জাফরের যোগাযোগ করার ভাষা ছিল সম্ভবত আরবী। কিছু

বর্ণনায় এসেছে, আন-নাজ্জাশী হিজাজে কিছু বছর কাটিয়ে ছিলেন, তাই তিনি আরবীতে কথা বলতে পারতেন। যদিও তিনি আরবে থাকতেন না কিন্তু আরব ও আবিসিনিয়ানদের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে এটা অস্বাভাবিক নয় যে, আবিসিনিয়ানরা আরবী বলতে বা বুঝতে পারতো। যেহেতু নাজ্জাশী কুরআন তিলাওয়াতের সময় কুরআনের বাণী শুনে কাঁদছিলেন, তার মানে নিশ্চয়ই তিনি আরবী আয়াতের অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। একজন দোভাষী যদি আয়াতের অনুবাদ করে দিত তাহলে সেটা তার অন্তরে এতটা প্রভাব ফেলতে পারতো না।

আন-নাজ্জাশী মুসলিম হয়েছিলেন। তার ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা সবার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। তিনি জাফর ইবন আবি তালিব থেকে গোপনে ইসলাম শিখতেন। যখন আন-নাজ্জাশী মারা গেলেন, বুখারিতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আজকের দিনে আবিসিনিয়ার একজন পুণ্যবান মানুষ মারা গেছেন, আসো আমরা তাঁর জন্য দুআ করি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য জানাজার সালাত পড়েছিলেন। আন-নাজ্জাশীর মৃত্যুর সঠিক দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন, জিবরীল ﷺ তাঁকে এই মৃত্যুর ব্যাপারে জানিয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কাছে আন-নাজ্জাশীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।'

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমদের থেকে কী শেখার আছে

১। সাহাবাদের ﷺ মাঝে ছিল অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা। তারা তাদের নীতির উপর অটল ছিলেন। আদর্শের প্রশ্নে তারা কোনো আপস করেননি, যদিও তারা জানতেন এর ফলে তাদের বিপদ হতে পারে। আন-নাজ্জাশীর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন যে, তারা ঈসাকে ﷺ আল্লাহর বান্দা বলেই বিশ্বাস করেন, আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) হিসেবে নয়। আদর্শবান, ব্যক্তিত্বশীল মানুষের পক্ষে এটাই শোভা পায়। ব্যক্তিগত স্বার্থের আশায় তারা সত্যকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে না। সাবাহীরা দ্বীনের আদর্শ বুকে করে চলতেন, তারা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা কিছুই হোক–তারা সত্যটাই বলবেন। তাদের কাছে জীবনের চেয়েও দ্বীন ইসলামের মূল্য অনেক বেশি।

২। আবিসিনিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতির যে রীতিগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো সাহাবীরা ﷺ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলো গ্রহণ করেছেন। সে সময়ে আবিসিনিয়ানদের মধ্যে নাজ্জাশীকে সিজদা করা খুবই সাধারণ ও প্রচলিত ব্যাপার–যে লোকই তার সাথে দেখা করতে যাবে, সে-ই নাজ্জাশীকে সিজদা দিয়ে সম্মান জানাবে। আমর ইবন আস নাজ্জাশীকে বলে রেখেছিল, 'দেখবেন, এরা যখন আপনার সাথে দেখা করতে আসবে, তখন আপনাকে সিজদা করবে না।' আমর ইবন আস সঠিক বলেছিল, মুসলিমরা নাজ্জাশীর সাথে দেখা করতে এসে সিজদা করেন নি। আন-নাজ্জাশী খুব রেগে গেলেন, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন সবার মতো তারা কেন সিজদা করলো না। তারা জবাব দিলেন, 'আমরা

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করি না।'

এখন মুসলিমরা সামাজিকতা ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে বিভিন্ন হারাম ও বিদআতে অনায়াসে লিপ্ত হয়। অথচ আবিসিনিয়ার সাহাবীরা ﷺ ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে থেকেও ইসলাম নিয়ে সমঝোতা করেন নি, তারা অত্যাচারিত হয়েছেন, নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন, কিন্তু নবীজির ﷺ শিক্ষা ও সুন্নাহ থেকে তাদেরকে কেউ সরাতে পারে নি। সবাই করছে, আমরা না করলে কেমন দেখায় – এমনটা ভেবে সমাজের 'সামাজিকতা', 'প্রচলিত প্রথা' মেনে নেননি। একজন মুসলিমের এই শিক্ষাটাই বাস্তবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

৩। আবিসিনিয়ার মুসলিমরা সংঘবদ্ধ ছিলেন এবং একক নেতার অধীনে ছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব এই দলটির নেতা। এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়, মুসলিমরা যেখানেই থাকুক তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। ইসলাম কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় নয়, নিছক নামাজ-রোজা-হাজ্জ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ আধ্যাত্মিকতাসর্বস্ব ধর্ম নয় যে, যার যার খুশিমত ধর্ম পালন করবে। ইসলামের অনেক ইবাদতই সমবেতভাবে করতে হয় যা থেকে জামা'আতবদ্ধ থাকার গুরুত্ব বোঝা যায়।

৪। আবিসিনিয়ায় এই হিজরতের ঘটনা থেকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ ও সমাজের সাথে তাদের মেলামেশার ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দ্বীন ইসলামে মুসলিম নারীদের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দাবি রাখে। প্রথম মুসলিম ছিলেন একজন নারী এবং প্রথম শহীদও ছিলেন একজন নারী। জিহাদের ময়দান, জামা'আতে, শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণে তাদের ভূমিকা ছিল। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন, যখন বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি–এই দুই চরমপন্থা চলে আসে। এক পক্ষের মানুষ মনে করে, নারী-পুরুষের মেলামেশা এবং হাসি-তামাশা-গল্প-আড্ডা-গান-বাজনায় কোনো সমস্যা নেই। আবার অন্য পক্ষের মানুষ মনে করে, নারীদের গলার স্বরও কারো সামনে প্রকাশ করা যাবে না। একারণে, নবীজির ﷺ সময়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতির উপর আলোকপাত করা জরুরি।

এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে একটি ঘটনা বেশ উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি হাবাশায় হিজরতের সাথে সম্পর্কিত। সপ্তম হিজরীতে যখন মুসলিমরা আবিসিনিয়া থেকে মদীনাতে চলে আসেন, তখন জাফর ইবন আবি তালিবের স্ত্রী আসমা বিনত উমাইস ﷺ একদিন হাফসার ﷺ সাথে দেখা করতে তাঁর ঘরে যান। হাফসা ﷺ ছিলেন উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ মেয়ে, রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী। উমার ইবন খাত্তাবও ﷺ তখন তাঁর মেয়ের সাথে দেখা করতে এলেন। ঢুকে দেখলেন সেখানে একজন মহিলা বসে আছে, মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন,

- ইনি কে?

- উনি হচ্ছেন আসমা বিনত উমাইস, হাফসা ﷺ উত্তর দিলেন।

- আচ্ছা, উনি কি সেই আবিসিনীয় মহিলা যিনি সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছেন, উমার এটা জিজ্ঞেস করলেন কারণ আবিসিনিয়া থেকে মদীনা আসতে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়।

- হ্যাঁ, উনিই সেই মহিলা।

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ এরপর আসমাকে বললেন, 'আমরা আপনাদের আগে হিজরত করেছি তাই আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর আপনাদের থেকে বেশি হকদার।'

এই কথায় আসমা কিছুটা রেগে গেলেন। পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন, 'না, তা হতে পারে না, আপনারা আমাদের চাইতে রাসূলের ﷺ বেশি ঘনিষ্ঠ নন। আপনারা তো আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে থাকতেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাইয়ে দিতেন, মূর্খদের শিক্ষা দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে, অপ্রিয় এক রাজ্যে। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাচ্ছি, আপনি যে কথা বললেন, সেটা আমি তাঁকে বলবো। দেখি উনি কী বলেন, আমি কিছুই বাড়িয়ে-চড়িয়ে বলব না।'

উমারের ﷺ কথা আসমার ﷺ পছন্দ হলো না। কেননা তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে দূরে থেকেছেন, নবীজি ﷺ তাদের আত্মীয়ের চেয়েও বেশি আপন, তাদের আশ্রয়স্থল, তাদের অভিভাবক, তাঁর থেকে দূরে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর ছিল। অন্যদিকে উমার এবং অন্যরা অন্তত রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গটা হলেও পেয়েছেন যা থেকে তারা বঞ্চিত ছিলেন। এই বিষয়ের দফারফা করতে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলেন এবং বললেন, 'উমার আমাকে এই এই বলেছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি উত্তরে কী বলেছো?' আসমা ﷺ তাঁর দেওয়া উত্তরটি রাসূলুল্লাহকে ﷺ শোনালেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন ঠিক তাঁর মনের কথাটি বললেন। 'তুমি ঠিকই বলেছো আসমা, আমার প্রতি উমার আর তার সঙ্গীদের হক্ব তোমাদের চেয়ে বেশি নয়। তারা একটি হিজরতের পুরস্কার পাবে আর তোমরা পাবে দুটি হিজরতের পুরস্কার।'

আসমা ﷺ অত্যধিক খুশি হয়ে গেলেন, খুশি হলেন আবিসিনিয়ার সাহাবীরা ﷺ। রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাটি যেন তাদের মন ভরিয়ে দিল। কতোটা খুশি হয়েছিলেন ওরা? আসমা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই হাদীসটি বলার পর থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবারা ﷺ দলে দলে আমার কাছে আসতেন শুধুমাত্র এই একটি হাদীস শিখতে। দুনিয়াতে এই হাদীসের চেয়ে প্রিয় তাদের আর কিছুই ছিল না।'

এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ একজন মহিলার সাথে কথা বলছেন। তাদের মধ্যকার কথোপকথন ছিল সরলসোজা, সাদাসিধে, 'ফরমাল'। এছাড়াও, আসমা পরবর্তীতে অন্যান্য পুরুষ সাহাবাদেরকে ﷺ এই হাদীস শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন ছিল চটুলতাবিবর্জিত, শিষ্টাচার সম্বলিত, সোজাসাপ্টা ও মার্জিত। তারা তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সর্বদা একটি গাম্ভীর্য

বজায় রাখতেন। সস্তা কৌতুক বা হাসি-তামাশা করতেন না। পারস্পরিক সম্মান ও দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পর কথা বলতেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উম্মে হাবিবা ﷺ। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। মক্কার বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে হাবাশায় হিজরত করা ছিল তাঁর জন্য একটা বড় ত্যাগস্বীকার। আবিসিনিয়া তার কাছে অচেনা, অজানা এক রাজ্য, তবু তিনি দ্বীনের জন্য সব ছেড়েছুঁড়ে সেখানে হিজরত করেন। স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ হিজরতের পর মুরতাদ হয়ে গেলো। ইসলামের পরিবর্তে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলো। উবায়দুল্লাহর জীবনে কখনোই তেমন স্থিরতা আসে নি, একবার এই ধর্ম, আরেকবার ওই ধর্ম, এভাবে তার জীবনের অনেকটা সময় পার হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর কিছুটা স্থিরতা এলেও শেষপর্যন্ত সে হাবাশা গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। একজন মহিলার সবচেয়ে আপনজন তার স্বামী, স্বামীর দ্বারাই স্ত্রীরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। উম্মে হাবিবার ﷺ স্বামী মুরতাদ হয়ে যাওয়ায় তাকে কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজের দ্বীনকে বিসর্জন দেন নি। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়–সেটাই ছিল তাদের সংসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। উম্মে হাবিবা ﷺ ছিলেন দৃঢ়চেতা, মানসিকভাবে শক্ত-সমর্থ-মজবুত একজন ব্যক্তিত্ব। শত বাধা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পেরেছিলেন।

হিজরতের বিধান

১। যদি কোনো মুসলিম তার দেশে ইসলামের আবশ্যকীয় আহকাম যেমন সালাত, সাওম ইত্যাদি পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে সামর্থ্য থাকলে তার অন্য কোথাও চলে যাওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

২। যদি এমন হয় যে, কোনো দেশে বাস করতে গিয়ে একজন মুসলিমের এমন সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা তার জন্য কষ্টকর, তখন সে চাইলে তার যন্ত্রণা লাঘব করার উদ্দেশ্যে অন্য ইসলামি ভূমিতে হিজরত করতে পারে, তবে সেটি বাধ্যতামূলক নয়।

৩। কোনো মুসলিমের হিজরতের কারণে যদি সে অঞ্চলে ইসলামের কোনো আনুষ্ঠানিক হুকুম বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা ঘটে–যার দায়িত্ব সে ছাড়া অন্য কেউ পালনের ক্ষমতা রাখে না, তাহলে তার জন্য সে অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করা নিষিদ্ধ।

অমুসলিম দেশে বসবাস করার ব্যাপারে বিধান

মুসলিম আলিমগণ এই ব্যাপারে একমত যে, কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের মাঝে তাদের সমাজে বসবাস করা বৈধ নয়। একটি হাদীস এই ব্যাপারটি স্পষ্ট করে

বলছে, 'আমি সেই মুসলিমদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নিব না, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।'

এটি হচ্ছে সাধারণ বিধান, তবে এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। আলিমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন তারা বলেছেন, যদি কোনো মুসলিম অমুসলিম দেশে ইসলাম প্রচার করে এবং সেখানে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারে, সেক্ষেত্রে তার জন্য অমুসলিম দেশে থাকা বৈধ হতে পারে। এছাড়া ব্যবসা অথবা জ্ঞানার্জনের জন্য অমুসলিম দেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করা যায়। সাধারণভাবে দাওয়াতী কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকা ছাড়া অমুসলিম পরিবেশে বসবাস করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়, এর অন্যথা হলে গুনাহ্ হবে। তবে দাওয়াহ'র মানে এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই কাজ করতে হবে। দাওয়াহর অর্থ ব্যাপক—যেকোনো কাজ, যেটা ইসলামের বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, সেটাই দাওয়াহ। সেটা হতে পারে ত্রাণ, দান-সাদাকাহ, দাওয়াহ্-সংক্রান্ত কাজকর্ম ইত্যাদি, মুসলিমদের শিক্ষা দেওয়াও দাওয়াতী কাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

মক্কায় সাহাবীদের ﷺ সাহসিকতার দৃষ্টান্ত

উসমান ইবন মাযউন ﷺ

তিনি ছিলেন একজন মুহাজির। প্রথম হিজরতের পর তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসতে চান। যেহেতু তিনি মক্কা ছেড়ে হিজরত করেছিলেন, তাই কারো পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস ব্যতীত মক্কায় নিরাপদে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। ওয়ালীদ ইবন মুগীরা তাঁকে নিরাপত্তা দান করলো। সে ছিল মক্কার বয়স্ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন। ওয়ালিদ ইবন মুগিরার নিরাপত্তায় উসমান ইবন মাযউন মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কায় ফিরে এসে আবিষ্কার করেন যে, তিনি ছাড়া অন্য সব মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে! নিজের নিরাপদ জীবন তাঁকে এতটুকু খুশি করলো না, মজলুম মুসলিমরা তাঁকে ঈর্ষান্বিত করে তুললো! তাঁর কাছে মনে হলো তিনি বাদে অন্য সবার গুনাহ মাফ হয়ে যাচ্ছে আর তিনি কিছুই করতে পারছেন না। তাই তিনি ওয়ালিদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন যে তাঁর নিরাপত্তার কোনো দরকার নাই, তিনি সেটা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। ওয়ালিদ বললেন,

- তুমি কেন এটা করছো?'

- আমি শুধু আল্লাহর নিরাপত্তা চাই, তোমার নিরাপত্তা চাই না।

- ঠিক আছে, যেহেতু আমি প্রকাশ্যে তোমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছি, সেহেতু এই নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণাও প্রকাশ্যেই দিতে হবে।

তারা কাবাঘরে গেলেন। আল-ওয়ালিদ ইবন মুগীরা বললো, 'উসমান ইবন মাযউন আমার নিরাপত্তা আর চায় না, সে ফিরিয়ে দিয়েছে।' উসমান ইবন মাযউন বললেন,

'হ্যাঁ, আমি ওয়ালিদ ইবন মুগীরাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সৎ লোক হিসেবে পেয়েছি, কিন্তু আমি একমাত্র আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে আসতে চাই।'

কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো উসমান ইবন মাযউন একটা জনসমাবেশে এসেছেন। সেখানে তখন আরবের বিখ্যাত কবি লাবীদ তার একটা কবিতা আবৃত্তি করছিল, *'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই অসার।'* উসমান তাল মেলালেন, বললেন, *'ঠিক। ঠিক।'* ওই সমাবেশে অনেক লোক জমা হয়েছিল। কবি বলে চললো, *'আর সব সুখ তো ম্লান হয়ে যাবে।'* উসমান তার কবিতার মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন, *'না না, তুমি ভুল বলেছো, জান্নাতের সুখ কখনই ম্লান হবে না।'*

কবি লাবীদ একটা ধাক্কা খেল। সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, তার শ্রোতাদের মধ্যে কেউ এভাবে তার ভুল ধরিয়ে দেবে! কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বললো, 'কে এই লোক? তোমাদেরকে এভাবে হেয় করার সাহস সে কোথা থেকে পেল?' শ্রোতাদের মধ্যে কেউ একজন বললো, 'বাদ দিন, সে হচ্ছে এক মাথামোটা, মুহাম্মাদের ধর্ম অনুসরণ করে। এর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না।' উসমান ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন! তিনি এই কথার জবাব দিয়ে বসলেন। ব্যস, শুরু হয়ে গেলো তাদের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি। এক পর্যায়ে কুরাইশরা উসমানের চোখে ঘুষি মেরে বসে।

আল-ওয়ালিদ ইবন মুগীরা এই ঘটনা দেখলো। উসমানের কাছে এসে বললো,

– 'কী দরকার ছিল তোমার চোখের বারোটা বাজানোর? তুমি তো আমার নিরাপত্তার মধ্যেই ছিলে, কেন সেটা ফিরিয়ে দিতে গেলে?'

– ঈমানে বলীয়ান উসমান ইবন মাযউন তেজদীপ্ত গলায় বললেন,

– না, বিষয়টা তেমন না। আল্লাহর শপথ, আমি তো চাই আমার ভালো চোখটিও যদি আঘাত পাওয়া চোখের মতো হতো! সত্যি বলতে কী, আমি এমন একজনের নিরাপত্তায় আছি যিনি তোমার চেয়ে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান।

– তুমি কি আমার নিরাপত্তার মধ্যে ফিরে আসতে চাও?

– নাহ, আমার প্রয়োজন নেই।[34]

একজন কাফের বা মুশরিক কিছু হারালে সেটা ক্ষতির খাতায় ফেলে দেয়, কষ্ট-ব্যথা-বেদনাকে ক্ষতি বাদে অন্য কোনো নজরে দেখার ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু একই ঘটনা একজন মুসলিমের জন্য সুসংবাদ। মার খেয়ে, ফোলা চোখ নিয়েও উসমান ইবন মাযউন ভাবছেন, ব্যথার বিনিময়ে কিছু গুনাহ মাফ হলো। এটাই মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গী।

---

[34] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪।

আবু বকর ﷺ

আবু বকর সিদ্দিক ﷺ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেননি। মক্কায় তাঁকে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল। তাই তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। আবু বকর ﷺ মক্কা ছেড়ে ইয়েমেন গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি সায়্যিদ আল হাবিশ গোত্রের কাছে যান। আল-হাবিশ মক্কার নিকটবর্তী একটা গোত্র। আবু বকর ﷺ সেখানে ইবনে দুগায়নার সাথে দেখা করলেন। ইবন দুগায়না তাকে বললো,

- আবু বকর, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

- আমার স্বজাতির লোকেরা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, খুব খারাপভাবে আঘাত করেছে, একারণে আমি চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।

- তোমার মতো একজন মানুষ তো তাঁর স্বজাতির একটা সম্পদ। এভাবে তো তুমি চলে আসতে পার না। তুমি দুঃখীদের সাহায্য করো, গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। তুমি মক্কায় ফিরে যাও, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দেব।

তিনি আবু বকরকে ﷺ সাথে করে মক্কায় আসেন এবং মক্কার সমস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আবু বকর আমার নিরাপত্তার মধ্যে আছেন। আমি বুঝি না এরকম একজন মানুষকে তোমরা কীভাবে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও? সে তোমাদের সম্পদ, তোমরা কীভাবে তাঁর মতো একটা মানুষকে তাড়িয়ে দিতে পারলে? আজকে থেকে তিনি এখানে থাকবেন এবং আমার নিরাপত্তার অধীনে থাকবেন।'

কুরাইশের লোকেরা ইবন দুগায়নার কাছে এসে বললো, 'ঠিক আছে আমরা তোমার নিরাপত্তা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমরা চাই না আবু বকর প্রকাশ্যে ইবাদত করুক। সুতরাং দয়া করে এটা নিশ্চিত করো যে, সে এই কাজ করবে না।' ইবন দুগায়না আবু বকরের ﷺ কাছে এসে বললো, 'তোমার স্বজাতির লোকেরা চায় না যে, তুমি তাদের কষ্ট দাও। সুতরাং প্রকাশ্যে সালাত আদায় কোরো না।' আগে আবু বকর ﷺ ঘরের বাইরে সবার সামনে ইবাদত করতেন। আ'ইশা ﷺ বলেন, 'আমার বাবা খুবই নরম মনের একজন মানুষ। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তিনি খুব কাঁদতেন।' নারী-পুরুষ-বালক সবাইকে আবু বকরের খুশু আকৃষ্ট করতো। এটা দেখে কুরাইশরা ক্ষেপে যায়। তাদের আশঙ্কা–আবু বকরের ﷺ প্রকাশ্য সালাত আদায় দেখে লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে।

তাই ইবন দুগায়না আবু বকরকে ﷺ প্রকাশ্যে ইবাদত করতে মানা করেন। আবু বকর ﷺ রাজি হন। কিছুদিন আবু বকর ﷺ তাঁর বাড়িতে গোপনে ইবাদত করেন। কিন্তু এরপর তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। তিনি তাঁর বাড়ির উঠোনে একটা মুসল্লা বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই যদিও তিনি বাড়ির ভিতরেই ইবাদত করছিলেন, কিন্তু

লোকজন সেটা বাইরে থেকে দেখতে পেত। আগের সেই সমস্যা আবার ফিরে এল। লোকজন জড়ো হয়ে তাঁর ইবাদত দেখতে লাগল। কুরাইশরা রেগেমেগে আবার ইবন দুগায়নার কাছে গেলো। বললো, 'আমরা তোমাকে বলেছি, আমরা চাই না সে প্রকাশ্যে ইবাদত করুক, কিন্তু সে তো সেটাই করছে!' ইবন দুগায়না আবু বকরের কাছে গিয়ে এ কথা তুললে আবু বকর ﷺ বললেন, 'থাক, আমি আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার এর প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তায় থাকব।' শেষ পর্যন্ত তিনি ইবন দুগায়নার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলেন।[35]

আবু বকরের ﷺ কাহিনি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। যখন ইবন দুগায়না তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, কেন তিনি দেশান্তরিত হচ্ছেন, তখন আবু বকর ﷺ বলেছিলেন, 'আমি আমার রবের ইবাদত করার জন্য হিজরত করতে চাই।' আবু বকর ﷺ হিজরত করেছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, ব্যবসা বা অন্য কোনো দুনিয়াবী কারণে ভ্রমণ করেননি।

২। ইবন দুগায়না আবু বকর ﷺ সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা রাখতেন। পুণ্যবান মানুষ হিসেবে আবু বকরের বিশেষ খ্যাতি ছিল, তিনি অভাবীদের যত্ন নিতেন, দরিদ্রদের দান করতেন, সত্যের পক্ষ নিতেন। পৃথিবীর যেকোনো বিবেকবান মানুষ আবু বকরের গুণগুলোর কদর করতে বাধ্য। মুসলিমদের চরিত্র এমনই হওয়া উচিত। তারা যে দেশেরই হোক না কেন, তাদের মধ্যে এমন কিছু গুণ থাকা চাই যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে কদর করবে। এ সমস্ত গুণাবলির কারণেই ইবন দুগায়না আবু বকর সিদ্দিককে ﷺ নিরাপত্তার প্রস্তাব দিয়েছিল।

৩। আবু বকরের সালাত ছিল এক প্রকারের দাওয়াহ। প্রকাশ্যে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা এক ধরনের দাওয়াহ। যেমন হাজ্জ, সালাত, সাওম ইত্যাদি প্রকাশ্যে করা। মানুষকে দেখতে দেওয়া উচিত মুসলিমরা কীভাবে ইসলাম পালন করে। কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এ কারণেই। তারা জানত যে, প্রকাশ্যে ইবাদত করলে সেটা মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইসলামের যেসব ইবাদাত ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হুকুম দিয়েছেন সেগুলো অনন্য, হৃদয়গ্রাহী।

৪। ইসলামের বার্তাকে প্রকাশ করে দেওয়া। মুসলিমরা যদি গোপনে ইবাদত করে তাতে আল্লাহর দুশমনদের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু ঘটতে দেখলেই তারা প্রতিরোধ করবে। তাই ঠিক সেটাই মুসলিমদের করা উচিত। এমন কাজ করা উচিত যাতে মানুষকে ভালো জিনিস দ্বারা আকৃষ্ট করা যায় যেন তারা মুসলিম হয়। আর ভালো অন্তর ভালো জিনিস দ্বারাই আকৃষ্ট হয়।

---

[35] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭।

হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ

হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ ছিলেন একজন শিকারী। প্রায়ই মরুভূমিতে শিকারে বেরিয়ে পড়তেন আর ফিরে এসে অন্যদের কাছে শোনাতেন অভিযানের রোমহর্ষক সব কাহিনি। একদিন তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। সে সুযোগে আবু জাহেল রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে তাঁকে অভিশাপ দিতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরুত্তর। তিনি ﷺ সাধারণত মূর্খদের কথার জবাব দিতেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে মূর্খদের সাথে তর্ক না করার আদেশ করেছেন।

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা একজন মুসলিমের পক্ষে সাজে না। যে কথায় সাড়া দিতে গিয়ে দাওয়াহ আর দাওয়াহ থাকে না, ব্যক্তিগত রেষারেষিতে পরিণত হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ইসলামের শত্রুরা ইসলামের ভুল-ত্রুটি খুঁজতে ব্যর্থ হয়ে দাঈর চারিত্রিক দোষত্রুটি উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তাদের কথার জবাব দেওয়ার অর্থ হলো লক্ষ্য থেকে সরে যাওয়া, ইসলামের কথা বলার পরিবর্তে নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতেই অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়া। ফলে বক্তব্যের মূল বিষয় আর ইসলাম থাকে না। এ কারণে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে গিয়ে যদি কাউকে অপমানিত হতে হয়, তাহলে সেটা ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়। সেগুলো পাশ কাটিয়ে দাওয়াহ দিতে থাকতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> "তাদের কথাবার্তায় আপনার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। কিন্তু তারা তো নিশ্চয়ই আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এই জালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।" (সূরা আনআম, ৬: ৩৩)

আবু জাহেল এর আচরণ সেদিন সীমা ছাড়িয়ে যায়। হামযা ﷺ তখন মাত্র শিকার থেকে ফিরছিলেন। এক দাসীর মুখে শুনলেন, তাঁর ভাতিজাকে আবু জাহেল অপমানিত করেছে, ইসলাম নিয়েও আজেবাজে বকেছে। তাঁর খুবই মন খারাপ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাতিজা। হামযা ﷺ সে সময় কাফির ছিলেন সত্যি, তবু রাসূল ﷺ তাঁর আত্মীয়, তাঁর ভাতিজা। ভাতিজা মুহাম্মাদের উপর আক্রমণকে হামযা নিজের অপমান হিসেবে নিলেন। দ্রুত হেঁটে আবু জাহেলের কাছে গেলেন। আবু জাহেল, তার সাঙ্গপাঙ্গ কুরাইশের অন্য সব নেতার সাথে কাবার সামনে বসে ছিল।

হামযার ﷺ হাতে তখনও শিকারের সরঞ্জাম। আবু জাহেলকে দেখামাত্র হাতের ধনুকটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে বললেন, 'তোমার কত বড় সাহস তুমি আমার ভাতিজাকে আঘাত করো? শুনে রাখো, আমি মুহাম্মাদের ধর্ম অনুসরণ করছি। সাহস থাকলে আমাকে মারো!'

আবু জাহেলের মাথা থেকে রক্ত পড়তে থাকে, তা দেখে বনু মাখযুম হামযার গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হয়। বনু হাশিম উঠে দাঁড়ায় হামযার ﷺ পক্ষে। দুই গোত্রের

লোকেদের মধ্যে মারামারি বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলে আবু জাহেল মধ্যস্থতা করে। তাদেরকে থামিয়ে বলে, 'না, ছেড়ে দাও হামযাকে। আমিই তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদকে বিশ্রীভাষায় গালিগালাজ করেছি।'

হামযা ﷺ তখনো ইসলামের ওপর সত্যিকারের ঈমান আনেননি, দৃঢ় বিশ্বাস থেকে তিনি ইসলামের ঘোষণা দেননি, আবু জাহেলকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য জিদ করে কথার কথা বলেছিলেন। হামযা বাড়ি ফিরলেন। হঠাৎ তাঁর হুঁশ হলো, *'আরে! এটা আমি কী করলাম! ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম!'* কিছুক্ষণ পর যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসলো, তিনি পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেন এবং আবিষ্কার করলেন তিনি বেশ ভালো সমস্যার মধ্যেই পড়েছেন! তিনি মুসলিম হবেন নাকি কাফির থেকে যাবেন সেটা নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। যদি তিনি তাঁর মুখের কথা ফিরিয়ে নেন, সেটা তাঁর জন্য অসম্মানজনক ব্যাপার, কেননা তিনি ইতোমধ্যে আবু জাহেলকে মুখের উপর বলে ফেলেছেন তিনি মুসলিম হয়ে গেছেন। চট করে মুখের কথা বদলে ফেলা সে সমাজে ভালো চোখে দেখা হতো না। অন্যদিকে তাঁর কথার ওপর স্থির থাকাও কঠিন, কারণ তিনি আগে কখনো ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা মাথাতেও আনেন নি।

তিনি সারারাত আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে সত্য পথ দেখান! আমাকে বলে দেন আমি সত্যের উপর আছি কি না।' কুরাইশরা মুশরিক হলেও আল্লাহর ইবাদত করতো। যখন তারা দুআ করতো, তারা তা আল্লাহর কাছেই করতো, কিন্তু যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো কেন তারা অন্য প্রভুদের ইবাদত করতো, তারা বলতো এই মূর্তিগুলো হলো মাধ্যম। তারা আল্লাহর কাছে ইবাদাত পৌঁছিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তারা সংশয়ের মধ্যে ছিল।

পরদিন সকালের কথা, হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ বলেন, 'সকালে উঠেই অনুভব করলাম আমার অন্তর ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় ভরে গেছে। তাই আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আমি একজন মুসলিম।' প্রিয় চাচাকে পাশে পাওয়া ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে সবচেয়ে অসাধারণ মুহূর্তের একটি। হামযা ﷺ মুসলিম হলেন, মন থেকে মুসলিম হলেন। আবু জাহেল চেয়েছিল নবীজিকে ﷺ কষ্ট দিতে, অথচ তার এই অপকর্মের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত হামযা ﷺ মুসলিম হয়ে গেলেন!

এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনা। মানুষ কখনই জানতে পারবে না কোন কাজের পরিণতি ভালো আর কোন কাজের পরিণতি খারাপ। ইবনে ইসহাক বলেন, 'হামযা জিদের বশে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলামের ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক হয়ে যান।'

সূচিপত্র

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ ছিলেন ইসলামের গোঁড়া শত্রু। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি মুসলিমদের নির্যাতন করতেন। একদিন আমর ইবন রাবিয়ার স্ত্রী লাইলার সাথে উমারের ﷺ দেখা হয়, উমার ﷺ তাকে বললেন, 'কোথায় চললে, উম্মে আবদুল্লাহ?'

- তোমরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছো, তাই আমার রবের ইবাদত করার জন্য অন্য দেশে চলে যাচ্ছি।

- তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমার ভ্রমণ নিরাপদ হোক।

উম্ম আবদুল্লাহ খুব অবাক হলেন – উমার ﷺ তো এমন সহানুভূতি নিয়ে মুসলিমদের সাথে কথা বলার পাত্র নন! ঘরে ফিরলে তাঁর স্বামীকে তিনি ঘটনাটি বললেন, তাঁর স্বামী হাসতে হাসতে বললেন,

- তুমি আশা করছো উমার মুসলিম হবে?

- হতেও তো পারে, কেন নয়?

- উমারের বাবার একটা গাধা আছে না? সেই গাধাটা মুসলিম হলেও হতে পারে কিন্তু উমার মুসলিম হবে না।[36]

উমার ﷺ সম্পর্কে কারোই উঁচু ধারণা ছিল না। জাহেলিয়াতের সময়ে উমার ﷺ কেমন ছিলেন–সে বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন:

"আমি মদ খেতে ভালবাসতাম। আমার কিছু মদ্যপায়ী সঙ্গী ছিল, তাদের সাথে প্রতি রাতে দেখা করতাম, আড্ডা মারতাম। এক সন্ধ্যায় বের হলাম, মদশালায় গিয়ে দেখি কেউ নাই। তখন রাত হয়েছে, ভাবলাম মদের দোকানে যাই, কিন্তু গিয়ে দেখি দোকানও বন্ধ। অনেক খুঁজেও সময় কাটানোর মতো কিছুই পেলাম না। তখন ভাবলাম, যাই দেখি, কাবাঘরে গিয়ে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করি। তাওয়াফ করতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে আমি বাদে আরও একজন আছেন–মুহাম্মাদ! আমি আর তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তবে তিনি আমার উপস্থিতি টের পাননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জেরুসালেমের দিকে মুখ করে কাবায় সালাত আদায় করছিলেন। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে সামনের দিকে আসলাম। কাবার চাদরের আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে আছি। মুহাম্মাদ তখন আমার একদম সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু চাদরের কারণে আমাকে দেখতে পান নি। আমি এত কাছে যে তাঁর তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছি। তিনি সূরা আল হাক্কাহ থেকে তিলাওয়াত করছেন–কুরআন শুনে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিজেকে

[36] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০১।

বোঝালাম, এগুলো নিশ্চয়ই কোনো কবির কথা। এ কথা ভাবার পরেই সূরা আল হাক্কাহর পরের যে আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন তা হলো,

"এগুলো কোনো কবির কথা নয়, তোমাদের খুব অল্প লোকই সেটা বিশ্বাস করে থাকো।" (সূরা হাক্কাহ:৪১)

আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। নিজেকে বললাম, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো গণকের কথা। আর এরপরের আয়াতেই ছিল,

"এগুলো কোন গণকের কথা নয়, খুব কমই তোমরা স্মরণ কর।" (সূরা হাক্কাহ: ৪২)"

একটি বর্ণনা অনুসারে এই ঘটনার পর উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।[37] অন্য মত অনুসারে, এই ঘটনা উমারকে ﷺ খুব নাড়া দেয়, তার অন্তরে কুফরের ভিত দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের প্রতি তাঁর ঘৃণা কমলো না। একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন, তিনি কুরাইশদের এই ঝামেলা দূর করবেন, দীর্ঘদিনের অনৈক্যের অবসান একমাত্র এক ভাবেই ঘটবে–যে করেই হোক, মুহাম্মাদকে ﷺ হত্যা করতে হবে। মক্কাকে "সাবেইন" (মুসলিমদের) হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

উমার ﷺ বদ্ধপরিকর। নবীজির ﷺ খোঁজ করা শুরু করলেন, খুঁজে পেলেই হত্যা। জানতে পারলেন দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চল্লিশ অনুসারীসহ আছেন। উমার ﷺ একাই চললেন, হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। তিনি জানতেন মুহাম্মাদকে ﷺ হত্যা করতে গেলে তাকেও মেরে ফেলা হতে পারে, কিন্তু তিনি সেসব পরোয়া করেন না। রাস্তায় তাঁর এক আত্মীয় নাঈমের সাথে দেখা। নাঈম গোপনে মুসলিম হয়েছিলেন, উমার ইবন খাত্তাবের চোখ দেখেই নাঈম বুঝে গেলেন উমার খুব রেগে আছেন, নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটাবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

- কোথায় যাচ্ছো উমার?

- মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি, কোনো রাখঢাক না রেখে অকপটে নিজের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলেন উমার।

পরিস্থিতি গুরুতর দেখে নাঈম তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি করে বললেন,

- আগে তোমার নিজের বাড়িরই খোঁজ নাও, তারপরে মুহাম্মাদ!

- কেন? কী হয়েছে! আমার বাড়িতে আবার কী সমস্যা? উমার জানতে চাইলেন।

- যাও খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমার আপন বোন মুসলিম হয়ে গেছে।

---

[37] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫।

এই কথা বলে নাঈম রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচালেও উমারের বোন আর তাঁর স্বামীকে বিপদে ফেলে দিলেন। উমারের ؓ বোন ফাতিমা ؓ ছিলেন সাঈদ ইবন যায়িদ ইবন আমর ইবন নুফাইলের ؓ স্ত্রী। সাঈদ ؓ ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। উমার এবার তাঁর গন্তব্য পরিবর্তন করে বোনের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। সেখানে তাঁর বোন ফাতিমা আর তাঁর স্বামী সাঈদকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন খাব্বাব ইবন আরাত ؓ । খাব্বাব তাদেরকে ভাঁজ করা একটি কাগজ থেকে সূরা ত্ব-হা পড়ে শুনাচ্ছিলেন।

উমার ইবন খাত্তাবের ؓ পায়ের শব্দ শুনে খাব্বাব লুকিয়ে পড়লেন। ফাতিমাও চট করে কাগজটি নিয়ে লুকিয়ে ফেলেন। উমার ভিতরে এসে বললেন,

- কী সব আবোল-তাবোল বকছিলে তোমরা শুনি?

- কই! আমরা তো কিছু শুনিনি।

- আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু একটা তিলাওয়াত করতে শুনেছি। বলো সেটা কী ছিল। আমি শুনলাম তোমরা নাকি মুসলিম হয়ে গেছো?

এই কথা বলেই তিনি হঠাৎ সাঈদ ইবন যায়িদকে আঘাত করে বসলেন আর তাঁকে ঘুষি মারতে গেলেন। ফাতিমা স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন, তাঁর মুখেও উমার ইবন খাত্তাব আঘাত করে বসলেন।

ফাতিমার মুখ থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে উমার অপ্রস্তুত হয়ে যান, তাঁর খারাপ লাগতে থাকে, তিনি অনুতপ্ত হয়ে বোনের কাছে মাফ চাইলেন। ফাতিমা বললেন,

- হ্যাঁ, আমি ও আমার স্বামী দুজনই মুসলিম হয়েছি। তুমি যা খুশি করো।

- তোমরা যে কাগজটি পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাও, উমার বললেন।

- না, দেব না। তুমি মুশরিক, তুমি নাপাক।

- ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি, আমি সেটা নষ্ট করবো না।

উমার ইবন খাত্তাব ؓ নিজেকে পরিষ্কার করে ফিরে আসলে তাঁর বোন তাঁকে ভাঁজ করা কাগজটি দিলেন। উমার কাগজ থেকে সূরা ত্ব-হা'র প্রথম আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

> "ত্ব-হা। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমন্ডল ও সমুচ্চ নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমুন্নত হয়েছেন। নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও

কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তাঁরই।" (সূরা ত্ব-হা, ২০: ১-৮)

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ তিলাওয়াত শেষ করে বললেন, 'কথাগুলো তো অসাধারণ!' খাব্বাব ইবন আরাত ﷺ এতক্ষণ লুকিয়ে ছিলেন, উমারের এই কথা শুনে বের হয়ে এলেন, বললেন, 'উমার! আশা করি আল্লাহ আপনাকে বেছে নেবেন। গতকাল আমি শুনেছি আল্লাহর নবী ﷺ দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ! যেকোনো একজন উমারকে পথ দেখান–উমার ইবন খাত্তাব অথবা উমার ইবন হিশাম। আমি আশা করছি আপনাকেই আল্লাহ নির্বাচন করেছেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একদিন আগেই আল্লাহর কাছে এই দুআ করেছিলেন যে, আল্লাহ যেন দুইজন উমারের মধ্যে একজনকে পথ দেখান–উমার ইবন খাত্তাব অথবা উমার ইবন হিশাম (আবু জাহেল)। নবীজি ﷺ আল্লাহর কাছে এই দুইজনের একজনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য দুআ করেছিলেন। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ খাব্বাবকে বললেন, 'আমি মুসলিম হতে চাই। আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে চলো।' খাব্বাব তাঁকে বললেন, 'আপনি দারুল আরকামে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করুন।' উমার ইবন খাত্তাব ﷺ দারুল আরকামে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের ﷺ নিয়ে গোপন বৈঠক করছিলেন। সে সময় মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামের কোনো কার্যক্রম হতো না, তাই এই গোপন বৈঠকের আয়োজন।

সাহাবাদের ﷺ মধ্যে একজন উঠে দরজার ওপাশে উঁকি দিয়ে দেখে রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন উমার এসেছে। খানিকটা শঙ্কা, খানিকটা বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে সেই সাহাবা ﷺ বললেন, 'উমার ইবন খাত্তাব বাইরে দাঁড়িয়ে! তাঁর সাথে তলোয়ার!' আরেকজন সাহাবী ﷺ সাহস করে প্রস্তাব দিলেন দরজা খোলা হোক। কিন্তু উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহস সবার ছিল না। যার ছিল তিনি হলেন হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব। হামযা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, যদি উমার ভালো নিয়তে এসে থাকে তাহলে আমরা তাঁর সাথে সুন্দরভাবে বোঝাপড়া করে নেব। কিন্তু যদি সে খারাপ নিয়তে আসে, তাহলে তাঁর তলোয়ার দিয়েই তাকে মারবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযাকে বললেন, 'সমস্যা নেই, আমি নিজেই দরজা খুলে ব্যাপারটা দেখছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মাঝারী উচ্চতা ও মাঝারী গড়নের, অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব ছিলেন দীর্ঘাকায়, সুঠামদেহী। বিশালদেহী উমারের পোশাক ধরে তাকে টেনে ভিতরে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'উমার! তুমি কবে এসব বন্ধ করবে? তুমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের জন্য অপেক্ষা করছো?' উমার ইবন খাত্তাব বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি মুসলিম হতে এসেছি।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর!' ঘটনাটি ঘটছিল দরজার সামনে। সাহাবারা ﷺ অন্য ঘরে থাকায় কিছুই দেখতে বা শুনতে পাননি। কিন্তু আল্লাহু আকবার শুনেই বুঝতে পারলেন যে, উমার মুসলিম হয়ে গেছেন। তাঁরা এই খবরে এত খুশি হলেন যে, জোরে জোরে তাকবীর দিতে লাগলেন - আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর![38] মক্কার লোকেরা তাদের তাকবীর শুনে ফেললো, সেদিনের মত সভা ভেঙে সবাই তাড়াহুড়ো করে সরে পড়লেন।

'উমারের মুসলিম হওয়া ছিল বিজয়, তাঁর মদীনায় হিজরত ছিল ইসলামের সহায় আর তাঁর শাসন ছিল রাহমাহ।'

আবদুল্লহা ইবন মাসউদের একটি কথায় বোঝা যায় উমার ইসলামের ইতিহাসে কতো উঁচু স্থান দখল করে আছেন। উমারের ﷺ ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের ইতিহাসে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া একটি ঘটনা। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, 'উমার মুসলিম হওয়ার আগে আমরা কখনও কাবাঘরের সামনে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে পারতাম না।' তাঁর ইসলাম গ্রহণ পুরো মুসলিম সমাজের পরিস্থিতি বদলে দেয়। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ আরও বলেন, 'উমার মুসলিম হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতাম। তিনি মুসলিম হওয়ার পর আমরা গর্বের সাথে আমাদের ইসলামের কথা বলে বেড়াতাম।'

সীরাতের এক বর্ণনায় এসেছে, যখন উমার মুসলিম হন, রাসূল ﷺ মুসলিমদের দুই সারিতে দাঁড় করান। এক সারির নেতা হামযা ﷺ, আরেক সারির নেতা উমার ﷺ, তাঁরা ইসলামের ঘোষণা দিতে দিতে মক্কার রাস্তায় প্রকাশ্যে হাঁটতে থাকেন, আর রাসূল ﷺ এই দুই সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে যান।

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ মুসলিম হওয়ার পর জানতে চান, 'মক্কার সবচেয়ে বড় মুখ কার? কে পারবে আমার ইসলাম গ্রহণের খবর সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে?' উমার ইবন খাত্তাব ﷺ এই খবর চুপিসারে প্রকাশ করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সবাই জানুক যে তিনি মুসলিম হয়েছেন। তাকে বলা হলো জামিল আজ-জুমাহির কথা, সে ছিল মক্কার মিডিয়া। মজার এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন উমারের ছেলে আবদুল্লাহ ইবন উমার, তাঁর ভাষায়:

'ঐসময় আমি বেশ ছোট, কিন্তু সেদিন যা দেখেছি তার সবই মনে করতে পারি। আমি বাবার পিছুপিছু গেলাম। বাবা জামিল আজ-জুমাহিকে বললেন,

– তুমি কি জানো আমি কী করেছি?

– কী করেছেন আপনি?

---

[38] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩।

– আমি মুসলিম হয়েছি।

ব্যস, এতটুকুই। জামিল এই খবর শোনা মাত্র সাথে সাথে তার জোব্বা টেনে তুলে দৌড়ে কাবাঘরের দিকে গেল আর সবার সামনে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে কুরাইশের লোকসকল! উমার সাবিঈন হয়ে গেছে! উমার সাবিঈন হয়ে গেছে!' সাবিঈন শব্দটা শুনে উমার তাকে শুধরে দিয়ে বললেন, 'আরে, সাবিঈন না, বলো আমি মুসলিম হয়েছি।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! জামিল তখন এই 'তাজা খবর' প্রচার করতে চারিদিকে পাগলের মত ছুটছে।

এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ সবদিক দিয়ে বাবাকে ঘিরে ধরলো। তারা তাঁকে মারতে লাগলো আর তিনিও তাদের সাথে মারামারি করতে লাগলেন। ঘন্টাখানেক ধরে এভাবে চললো। সূর্য যখন একেবারে মাথার উপরে, তখন তারা ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিল।'

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বাড়ি ফিরলেন, সেখানেও লোকজন তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলো। তারা তাঁকে মেরেই ফেলবে। উমারের ﷺ ইসলাম গ্রহণ ছিল তাদের জন্য বিরাট ধাক্কা, তারা সহ্যই করতে পারছিল না বিষয়টা। তাঁর ঘরে এক লোক আসলো, তিনি উমারকে ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' উমার ﷺ বললেন, 'এরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়।' লোকটি বললো, 'বিষয়টা আমি দেখছি, তারা তোমাকে মারবে না।' এরপর তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই মানুষটিকে তোমরা একা ছেড়ে দাও। তাঁর কি নিজের পছন্দমতো ধর্ম গ্রহণ করার অধিকার নেই? আমি তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।' এ কথা শুনে সবাই চলে গেল।

অনেকদিন পরের কথা, আবদুল্লাহ ইবন উমার তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বাবা, সেদিন আপনাকে যে লোকটা সাহায্য করেছিল তিনি কে ছিলেন?' উমার ﷺ বললেন, 'তিনি হলেন আল আস ইবন ওয়াইল।' আল আস ইবন ওয়াইল ছিলেন আমর ইবন আসের পিতা, তিনি মুসলিম ছিলেন না। উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ গোত্র খুব একটা শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু আল আস ইবন ওয়াইলের গোত্রের সাথে তাদের মিত্রতা ছিল।[39]

উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ ইসলাম গ্রহণ থেকে শিক্ষা

১। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন থেকে একজন আদর্শ নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ চিনতেন, তাই তিনি উমার ইবন খাত্তাব অথবা আবু জাহেলের হিদায়াত চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন। উমার ইবন খাত্তাব এবং আবু জাহেলের এমন কিছু গুণ ছিল যে গুণগুলোর কারণে তারা বড় মাপের নেতা

---

[39] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন। আবু জাহেলকে তার গোত্রের লোকেরা আবুল হাকাম বলে ডাকত, এর মানে হলো জ্ঞানের পিতা। কিন্তু অনেক বড় বুদ্ধিজীবি হওয়া সত্ত্বেও সে ইসলামে প্রবেশ করেনি, আর এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম দিয়েছিলেন আবু জাহেল, যার মানে মূর্খের পিতা। এ দুজন মানুষ ছিলেন দৃঢ়চেতা, নিজেদের আদর্শ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। তারা যা বিশ্বাস করতেন, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। তারা ছিলেন তেজী ও সাহসী, কঠিন পরিস্থিতিতে সবাইকে ছাপিয়ে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাদের ছিল। আর তাদের মধ্যে এই গুণাবলির সমন্বয় দেখেই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের জন্য দুআ করেছিলেন।

২। রাসূলুল্লাহর ﷺ চরিত্র থেকে নেতৃত্বের আরেকটি গুণ শেখার আছে। সেটি হলো মানুষ চিনতে পারা এবং তাদের সমস্যা বুঝে তাদের অন্তরের রোগের সঠিক চিকিৎসা করা। উমার ইবন খাত্তাবের ؓ অন্তর ছিল মুসলিমদের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ। তাই যখন উমার মুসলিম হন, রাসূল ﷺ জানতেন তাঁর সমস্যাটি আসলে কোথায় এবং সেই সমস্যার প্রতিকার কী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত উমার ইবন খাত্তাবের ؓ বুকে রেখে একটি দুআ পড়েছিলেন, ‘হে আল্লাহ, তার অন্তরকে আপনি ঘৃণা থেকে মুক্ত করে দিন’–দুআটি তিনি তিনবার পড়েন।

৩। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতে শ্রেষ্ঠ, তারা ইসলামেও শ্রেষ্ঠ, যদি তাদের দ্বীনের বুঝ থাকে।’ এই কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকে যারা ভালো গুণের অধিকারী হয়, ইসলাম গ্রহণের পরে তারাই সবচেয়ে ভালো মুসলিম হতে পারে, যদি তাদের দ্বীনের বুঝ থাকে।

বয়কট

যখন কুরাইশরা আবিষ্কার করলো ঈমানদারদের মধ্যে কিছু লোক আবিসিনিয়া হিজরত করে সেখানে নিরাপদে আছে আর মক্কায় উমার ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা বুঝতে পারল যে ইসলাম দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, নবীকে ﷺ মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। মরিয়া হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। ইতিমধ্যেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বনু হাশিমকে অনুরোধ করেছিল যেন মুহাম্মাদকে তাদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিম কুরাইশদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর কুরাইশের বিভিন্ন গোত্র বনু হাশিম এবং বনু আল মুত্তালিব–এ দুটো গোত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার ব্যাপারে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। তবে আবু লাহাব রাসূলুল্লাহর ﷺ আপন চাচা ও একই গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাকে বয়কট করা হয় নি, কারণ সে নিজেও ইসলামের একজন প্রধান শত্রু।

মক্কী জীবনের সপ্তম বছরে মুহাররাম মাসে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের সাথে সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়। চুক্তিতে ঠিক হলো– তাদের সাথে কোনো বাণিজ্য করা হবে না, তাদের কাউকে কেউ বিয়ে করবে না অথবা তাদের কাছে কেউ বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা মুহাম্মাদকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হাতে হস্তান্তর করছে।

গোত্র দুটো চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখা। কুরাইশরা নিশ্চিত করতে চায় যেন বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের কাছে যেন কোনো খাবার না পৌঁছে। কুরাইশদের উদ্দেশ্য এই দুই গোত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা। কাবাঘরের ভিতরে বয়কট চুক্তির দলিল টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। তবে দুই গোত্রের মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কঠিন সময়েও তারা একে অপরের পাশে দাঁড়াতো। পরিস্থিতি বেশ মারাত্মক আকার ধারণ করে। বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিব গোত্রের নারী-পুরুষ-শিশু ক্ষুধায় কষ্ট পেতে থাকে। সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস সেই অবস্থা বর্ণনা করেন, 'আমরা এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকতে হতো।' বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের অধিকাংশ লোক মুসলিম ছিল না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো গোত্রের উপর ছিল।

বয়কটের অবসান

বয়কট চুক্তির বিরোধিতায় যে লোকটি উঠে দাঁড়ান তিনি হিশাম ইবন আমর। তিনি ছিলেন বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়। চুক্তি বাতিল করার পেছনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খাবারে বোঝাই একটি উট নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন, বনু হাশিম গোত্রের কাছাকাছি গেলে উটটি ছেড়ে দিতেন যেন সেটা চড়তে চড়তে পাহাড়ের নিচে বনু হাশিমের কাছে গিয়ে পৌঁছে, যেন খাবারগুলো তারা পায়।

একদিন যুহাইর ইবন আবি উমাইয়ার কাছে গিয়ে বললেন, 'যুহাইর! তোমার আপন মামারা নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছে, আর তুমি খেয়ে-পরে-আনন্দের মধ্যে বসে আছো কীভাবে? আমি শপথ করে বলছি, যদি এই মানুষগুলো আবুল হাকামের নিজের মামা হতো, সে তাদের সাথে কখনো এরকম করতো না।' যুহাইরও বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। হিশাম তাঁকে বোঝালেন যে, আবু জাহেলের অন্যায় ও দ্বিমুখী নীতি মেনে নেওয়া তাদের ঠিক হচ্ছে না। যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া জবাব দিলেন,

- তুমি আমাকে দোষারোপ করছো? আমি একা একজন মানুষ, আমি কী করতে পারি বলো? আল্লাহর শপথ, যদি আমার পাশে আর একটি লোকও থাকতো, আমি এই নিষেধাজ্ঞার দলিল বাতিল করে আসতাম।

- বেশ, তোমার সাথে একজন আছে, হিশাম জানালেন।

- কে সে?

- আমি আছি তোমার সাথে।

- তাহলে চলো তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করি।

হিশাম তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দেখা পেলেন মুতইম ইবন আদীর, তাকে বললেন,

- মুতইম! তুমি কি বনু আল মানাফের দুই গোত্রের কষ্ট দেখে আনন্দিত হচ্ছো? কুরাইশদের চুক্তিটি তুমি দেখনি? আল্লাহর কসম, তুমি যদি আজকে তাদেরকে এই কাজ করতে দাও, তাহলে কালকে তারা তোমার সাথেও একই কাজ করবে।
- তা বুঝলাম, কিন্তু আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি? আমি তো একা।

- তোমার সাথে আমিও আছি।

- তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করলে কেমন হয়?

- তৃতীয় জনকেও আমি পেয়েছি। সে হলো যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া।

- বাহ! তাহলে চতুর্থ কাউকে খুঁজে বের করা যাক।

চতুর্থজনকেও এভাবে খুঁজে পাওয়া গেল, তিনি হলেন আবুল বাখতারি। তিনিও এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন। তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং তাদের পক্ষে আরো লোক খুঁজে বের করার কথা বললেন। এরপর হিশাম খুঁজে পেলেন পঞ্চমজনকে। তিনি হলেন জামা ইবন আসওয়াদ। তাঁরা পরিকল্পনা করে পরদিন রাতের বেলা আল হুজুমে দেখা করলেন এবং সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন পরদিন সকালে গিয়ে তাঁরা সমস্ত দলিল নষ্ট করে ফেলবেন। কিন্তু সেটা এমনভাবে করা হবে যেন কেউ বুঝতে না পারে যে ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত।

পরদিন সকালে যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া এক বিশেষ পোশাক পরে (জোব্বা) কাবাঘরে তাওয়াফ করলেন। সময়টি ছিল কুরাইশ নেতাদের সাক্ষাতের সময়। তাদের এই সমাবেশ হতো আন নাদওয়াতে। যুহাইর সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন,

'হে কুরাইশের লোকসকল! তোমাদের কি খুব আনন্দ হচ্ছে যে তোমরা ভালো খেয়ে-পরে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছো, ওদিকে বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিব দুর্দশার জীবন পার করছে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, এই দলিল ছেঁড়ার আগ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না।'

পূর্ব পরিকল্পনা মতে, ওই পাঁচজনের দ্বিতীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! আমিও কখনই ওই দলিলের সাথে একমত ছিলাম না।' এরপর তৃতীয়জন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি আমি এই দলিলের সাথে নেই এবং আমি এই ধরনের চুক্তির অংশ হতে চাইনা।' এরপর চতুর্থজন উঠে দাঁড়িয়ে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা বললো এবং সবশেষে হিশাম ইবন আমর উঠে দাঁড়িয়ে কথা বললেন।

তখন আবু জাহেল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'এই ঘটনা সাজানো, তোমরা রাতেই এসব পরিকল্পনা এঁটেছিলো' কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়, বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, দলিলটি ছেঁড়ার জন্য আল মুতইম ইবন আদী কাবাঘরের দিকে ছুটে যান। তিনি আবিষ্কার করলেন সেই দলিলটি ইতিমধ্যেই উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র "আমাদের রবের নামে"—এই বাক্যটি ছাড়া!

দুই বা তিন বছর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকার পর এভাবেই নাটকীয়তার সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষা

১। এই ঘটনায় থেকে শিক্ষণীয় হলো, সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে অনেক বড় অর্জন সম্ভব। মাত্র পাঁচজন লোক মিলে একটি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছেন কেবল সাংগঠনিক গুণকে কাজে লাগিয়ে। অল্প কিছু মানুষের চেষ্টায় কুরাইশ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা রদ হয়ে যায়। এর সূচনা হয় হিশাম ইবন আমরের হাতে। তাঁর মাথাতেই প্রথম চিন্তাটি আসে। তিনি সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য সমমনা কিছু মানুষ যোগাড় করলেন। অতঃপর সকলে মিলে এই অন্যায্য চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে সমর্থ হন। এক হয়ে কাজ করা কতটা জরুরি তা এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। মুসলিম ভাই ও বোনদের উচিত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ানো এবং নিজ থেকে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহী হওয়া, যেমনটা করেছিলেন হিশাম ইবন আমর।

২। উইপোকার দলীল খেয়ে ফেলা একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করে তা হলো, আল্লাহর সৈনিকরা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এমনকি উইপোকাও আল্লাহর সৈনিক হতে পারে।

> **"কেউ জানেনা আল্লাহর সৈনিকের ব্যাপারে কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন।"**
> **(সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪: ৩১)**

মু'জিযা

রুকানার সাথে কুস্তি

রাসূলুল্লাহর ﷺ আরেকটি অলৌকিক ঘটনা হলো রুকানার সাথে কুস্তি। রুকানা ছিল মক্কার সবচেয়ে শক্তিশালী কুস্তিগীর, কখনও কোনো কুস্তিতে পরাজিত হয়নি। সে নবীজিকে ﷺ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, 'আপনি আমার সাথে কুস্তি লড়বেন?' সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। একজন কাফির হিসেবে রুকানার ইচ্ছা ছিল, রাসূলুল্লাহকে ﷺ লাঞ্ছিত করা—কুস্তি করতে গিয়ে মুহাম্মাদকে এক

হাত দেখে নেওয়া যাবে। পুরস্কার হিসেবে ঠিক হলো একশ ভেড়া। বাজি ধরা তখনও হারাম করা হয় নি। তারা লড়াই করা শুরু করলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকানাকে ওপর থেকে নিচে ধরে মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। রুকানা বিশ্বাসই করতে পারছিল না এসব কী ঘটছে! সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার লড়াই করতে চাইলো, রাসূল ﷺ পুনরায় তাকে হারিয়ে দিলেন। রুকানা তৃতীয়বার চেষ্টা করলো, সেবারও পরাজিত হলো।

নবীজি ﷺ শর্তে জিতে গেলেন। কিন্তু শর্তে জেতার চেয়েও অসামান্য ব্যাপার ছিল রুকানার ইসলাম গ্রহণ।

রুকানা বললো, 'হে মুহাম্মাদ, আপনার আগে কেউ আমার পিঠ মাটির সাথে লাগাতে পারেনি। আর এটাও সত্যি, এর আগে আপনার চেয়ে বেশি আর কেউ আমার চোখে এতটা ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং আপনি আল্লাহর নবী।' রাসূল ﷺ শর্ত মোতাবেক একশ ভেড়া পেলেন কিন্তু তিনি সেগুলো রুকানাকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'ভেড়াগুলো রেখে দাও।' [40]

চন্দ্র বিদীর্ণ হলো

কুরাইশের লোকেরা নিদর্শন দেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহকে ﷺ বারবার চাপাচাপি করছিল। কুরআন তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, যদিও কুরআনের চেয়ে বড় অলৌকিক বিষয় আর কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা জিবরীলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ওয়াহী পাঠালেন, 'যদি তারা নিদর্শন দেখতে চায়, আমরা তাদের জন্য চাঁদকে দুইভাগ করে দেব।' রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের ডেকে বললেন, 'চাঁদ দুই ভাগ হয়ে যাবে।' রাতের বেলা কাফিররা সবাই একত্রে জড়ো হলো । তারা সবাই তাদের চোখের সামনে দেখলো চাঁদ দুইভাগ হয়ে আবার জোড়া লেগে গেল। এটা ছিল একটা অদ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা। এই ঘটনা বুখারি, মুসলিম এবং কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> "কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" (সূরা ক্বমার, ৫৪: ১-২)

তারা অপবাদ দিলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জাদু করেছে, কিন্তু আদতে এটি কোনো দৃষ্টিবিভ্রম ছিল না। সংশয়বাদীরা এই ঘটনা নিয়ে নানান রকম সন্দেহ তুলে এই ঘটনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। যেমন তারা বলে, "চাঁদ দুই ভাগ হলে, পৃথিবীর অন্য

---

[40] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯।

প্রান্তের মানুষরা কীভাবে এই ঘটনা দেখলো না?" – বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়:

১। পৃথিবীটা বিভিন্ন সময়ের বলয়ের মধ্যে আছে; অর্ধেক পৃথিবীতে সে সময় দিন ছিল, আর বাকি অর্ধেকের ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত অনেক রাতে ঘটেছিল তাই অনেকেই এটা দেখেনি।

২। অথবা হতে পারে বিশেষ বিশেষ এলাকাতে চাঁদটা তাদের কাছে দৃশ্যমান ছিল না কারণ সেটা ততক্ষণে অস্ত চলে গেছে। তাই যেখানে রাত ছিল সেখানের সবাই এটা দেখতে নাও পেতে পারে।

৩। সাধারণত মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। তাদের উপরে আকাশে কী ঘটছে তারা সাধারণত খেয়াল করে দেখে না, যদি না তাদের উপরে তাকিয়ে দেখতে বলা হয়। তাই অনেকে হয়তো চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার এই ঘটনা দেখেনি কারণ তারা উপরে কী হচ্ছে সে খেয়ালই রাখেনি।

৪। তখনকার দিনে দলিল লিখে রাখার চল ছিল না। ইতিহাসের অনেক ঘটে যাওয়া ঘটনা কেউ লিখে রাখেনি। তাই এই সম্ভাবনাও থেকে যায় যে, কিছু মানুষ এটা দেখেছে ঠিকই কিন্তু তারা সেটা লিখে রাখেনি। কিছু আলিম বলেছেন, ভারত এবং চীনে এই ঘটনা লিখে রাখা হয়েছিল। তারা বলেন, চীনের কিছু পুরনো দলিলে চাঁদ দু'ভাগ হওয়ার ঘটনা লিখে রাখা হয়েছিল। তারা এই ঘটনাকে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কাজে প্রাসঙ্গিক ঘটনা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

৫। কিছু জ্যোতির্বিদ উল্লেখ করেছেন, চাঁদের মাঝ বরাবর একটা লম্বা দাগ কেটে গেছে, এ তথ্য যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এটা চাঁদ বিভক্ত হওয়ার স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে দেখানো যায়, যদিও এই তথ্যটি যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে।

প্রথম যুগের একজন আলিম আল খাত্তাবি বলেন, 'চাঁদ বিভক্ত হওয়ার ঘটনাটি ছিল পূর্ববর্তী নবীদের নিদর্শনের তুলনায় একটা বড় মাপের নিদর্শন। এর কারণ ছিল, এটা বিশাল এলাকা জুড়ে দৃশ্যমান হয়েছিল এবং এটি ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম একটি ঘটনা। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।'

সূরা আর রুম

রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজমান ছিল। তারা ছিল সে সময়ের পরাশক্তি। ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, সম্ভবত পাকিস্তানের কিছু অংশ এবং এর উত্তর দিক ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর তুরস্ক, পূর্ব-দেশীয় ইউরোপ, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া ছিল বাইজেন্টাইন বা রোমান সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত। রোমানদের অবস্থা তখন বেশ শোচনীয়, পারস্য একের পর এক যুদ্ধে তাদের পরাজিত করতে থাকে। এরই মধ্যে সিরিয়ায় পারস্য ও রোমানদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে সংগঠিত হয় এবং তাতে রোমানরা পরাজিত হয়। মক্কার মানুষ এই খবর শুনে খুব খুশি হয়, আর মুসলিমরা দুঃখ পায়। কারণ, ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে পারস্যরা ছিল মক্কার পৌত্তলিকদের আপন, যেহেতু তারা অগ্নিপূজা করতো। অপরদিকে রোমানরা ছিল খ্রিস্টান বা আহলে কিতাব, তাদের বিশ্বাস মুসলিমদের কাছাকাছি ছিল। এই ঘটনার পর মুশরিকরা মক্কার চারদিকে ঘুরে ঘুরে মুসলিমদের বলতে লাগল, 'যেভাবে পারস্যরা রোমানদের হারিয়েছে, আমরাও সেভাবে তোমাদের হারাবো।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন একটি আয়াত নাযিল করেন,

> **"আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরা আর-রুম, ৩০: ১-৫)**

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াদা করেছেন যে রোমানরা দশ বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। আবু বকর ﷺ এই আয়াত শুনে আবু জাহেলের কাছে গেলেন। তাকে বললেন, 'তোমার সাথে বাজি ধরতে চাই যে, রোমানরা বিজয়ী হবে।' আবু জাহেল বললো, 'কত সময়ের মধ্যে বিজয়ী হবে?' আবু বকর ﷺ বললেন, 'দশ বছরের কম সময়ে।' বাজির পুরস্কার ঠিক হলো একশ উট। আবু বকর ﷺ যেকোনো কিছুর ওপর বাজি ধরতে রাজি, কেননা তিনি কুরআনের উপর ভরসা করে বাজি ধরেছেন।

সূরা আর রুমের এই আয়াতটি বলছে রোমানরা বিজয়ী হবে এবং মুসলিমরা সেদিন খুশি হবে কারণ আল্লাহ তাদের বিজয় দেবেন। আট বছর পর রোমানরা সত্যিই বিজয়ী হলো, অথচ মুসলিমদের কাছে রোমানদের বিজয় সেদিন খুবই গৌণ বিষয়। মুসলিমদের জন্য সেটি খুশির দিন ছিল সত্যি, কিন্তু সেটা রোমানদের কারণে নয়, অন্য কোনো কারণে। আসল ঘটনা হচ্ছে, যেদিন তারা রোমানদের বিজয়ের খবর পেলো, সেই দিনটি ছিল বদরের যুদ্ধে বিজয়ের দিন, কাফেরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বিজয়ের প্রথম ইতিহাস। বলা বাহুল্য বদরের বিজয়ের সামনে অন্য সবকিছু ম্লান হয়ে যায়।

পৌত্তলিকরা বলতো তারা মুসলিমদের সেভাবেই পরাজিত করবে যেভাবে পারস্যরা রোমানদের পরাজিত করেছে, কিন্তু ঠিক উল্টোটাই ঘটল। রোমানরা বিজয়ী হলো এবং একই দিনে মুসলিমরাও বিজয়ী হয়। তবে অলৌকিকতার শেষ এখানেই নয়, এই আয়াতে বলা হয়েছে, বাইজেন্টাইন অর্থাৎ রোমানরা "*আদনাল আরদ*' এ পরাজিত হয়েছে। *আদনা* শব্দটির আরবিতে দুইটি অর্থ আছে, একটা অর্থ হলো সবচেয়ে কাছে

আর আরেকটা অর্থ হলো সর্বনিম্ন। পূর্ববর্তী আলিমরা মূলত এই শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছিলেন 'সবচেয়ে কাছে', কারণ আরবের সবচেয়ে কাছের দেশ ছিল আশ-শাম আর সেখানেই রোমানরা পরাজিত হয়েছিল। আবার অনেকে মনে করেন এই আয়াতের অর্থ সর্বনিম্ন, কেননা যে স্থানে এই যুদ্ধ হয়েছিল তা পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বনিম্ন স্থান। আল্লাহই ভালো জানেন।

দুঃখের বছর

মাক্কী জীবনের দশম বছরকে বলা হয় *আমুল হুযন* বা *দুঃখের বছর*। কুরাইশ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার প্রায় ছয় মাস পরের ঘটনা, যে মানুষটি এতদিন ধরে রাসূলুল্লাহর ﷺ সুখে-দুঃখে তাঁর পাশে ছিলেন, সেই আবু তালিব মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালিবের পাশে বসে তাকে বললেন,

> *'চাচা, আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। আপনি স্বীকার করে নিন আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে এ কথাগুলো বলে যান যেন আমি শেষ বিচারের দিন আপনার পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি, আপনার শাস্তি মওকুফের জন্য আমার রবের কাছে আবেদন করতে পারি। আপনি শুধু বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এ ছাড়া আমি আপনার কাছে আর কিছুই চাই না।'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন আবু তালিবের অপর পাশে বসা ছিল আবু জাহেল। পিছে লেগে থাকা বলতে যা বোঝায়, আবু জাহেল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ঠিক তাই করতো, ইসলামের বিরোধিতায় সে ছিল আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। সমস্ত ইসলামবিরোধী কাজ ও ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ছিল এই আবু জাহেল। রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরোধিতায় আবু জাহেল ছিল অদ্বিতীয়। সে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরোধিতা করে কাটিয়েছে।

আবু তালিবের এক পাশে রাসূল ﷺ এবং আরেকপাশে আবু জাহেল ও আবদুল্লাহ ইবন আবি উমাইর বসে আছে। আবু জাহেল বলে উঠল, 'আবু তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের দ্বীন ছেড়ে অন্য দ্বীনের ওপর মারা যেতে চাও? শেষ পর্যন্ত তুমি বাপের দ্বীন ত্যাগ করবে?' সে আবু তালিবকে *'ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল'* করার চেষ্টা করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যতই আবু তালিবকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন, আবু জাহেল ততই বাধা দিতে লাগল। আবু তালিব তাঁর জীবনের শেষ কথা বলার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে লাগল। অবশেষে আবু তালিব বললেন, 'আমি আমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের দ্বীনের ওপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো।' এটিই ছিল মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথা।

আবু তালিব মারা গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাবো।' কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। বিষয়টি ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য খুবই কষ্টকর। রাসূলুল্লাহর ﷺ আট বছর বয়স থেকে আবু তালিব তাঁর দেখাশোনা করেছেন, নিজের কাছে রেখে বড় করেছেন, তাঁর ভরণপোষণ করেছেন। আবু তালিবের কাছেই রাসূলুল্লাহর ﷺ শৈশবকাল কেটেছে, বড় হওয়ার পরেও আবু তালিব রাসূলুল্লাহর ﷺ পাশে ছিলেন। বিয়াল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ সাহায্য করে গেছেন, কুরাইশদের ষড়যন্ত্র থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ আট বছর বয়সে আবু তালিব সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। নবীজির ﷺ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সে হাত সেভাবেই তাঁকে আগলে রাখে। আবু তালিব তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহকে ﷺ রক্ষা করার জন্য ব্যয় করেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখলেন তাঁর প্রিয় চাচা কাফের হিসেবে মারা যাচ্ছে তখন তা মেনে নেওয়া তাঁর জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। তিনি যখন আবু তালিবের জন্য দুআ করতে মনঃস্থির করলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন,

> **"নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্নীয় হোক–একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা, ৯: ১১৩)**

রাসূলুল্লাহকে ﷺ আবু তালিবের জন্য দুআ করতে নিষেধ করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চাচার কথা ছিল, 'কুরাইশরা যদি আমাকে এ ব্যাপারে অপমান না করতো, তারা যদি না বলতো যে আমি মৃত্যুর ভয়ে কালিমা পাঠ করেছি, তবে তোমাকে খুশি করার জন্য আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতাম।' আবু তালিব জানতেন কালিমা পাঠ করলে মুহাম্মাদ ﷺ খুবই খুশি হবেন। কাফের হিসেবে নিজের প্রিয় চাচাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখা নবীজির ﷺ জন্য কতটা কষ্টকর ছিল তা আবু তালিব বেশ ভালোভাবেই জানতেন। আবু তালিব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁর কালিমা পাঠ না করার কারণ ছিল কুরাইশদের কাছে মানসম্মান হারানোর ভয়। তখন আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন,

> **"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।" (সূরা ক্বসাস, ২৮: ৫৬)**

হিদায়াত শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে। কে হেদায়েত পাবে তা শুধু তিনিই নির্ধারণ করেন। এমনকি রাসূলুল্লাহরও ﷺ এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না। তাঁর কাজ ছিল কেবল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কোনো ব্যক্তির অন্তরকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে, কোনো মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এ

কারণে ঈমান আনার ব্যাপারে কারো ওপর কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা ইসলাম সমর্থন করে না।

> "দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়েত গোমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়, আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।" (সূরা বাক্বারাহ, ২: ২৫৬)

কারোর অন্তরে কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কে কোন ধর্ম গ্রহণ করবে সে ব্যাপারে প্রত্যেককে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে আর এই ইচ্ছাশক্তিকে কে কীভাবে ব্যবহার করলো তার জন্য সবাইকে আল্লাহ তাআলার সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আবু তালিবের মৃত্যুতে যখন নবীজি ﷺ শোকাহত, তার মাত্র দুই মাস পরে মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা ؓ। এক মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর মতো আরও একটি দুঃখময় ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় প্রিয় নবী মুহাম্মাদকে ﷺ। তাই এই বছরকে বলা হয় শোকের বছর। এই বছরটি ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর বছর, কারণ ওই সময় তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় দুইজন মানুষকে হারিয়েছেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে আসছিলেন। খাদিজা ؓ রাসূলুল্লাহকে যেমন মানসিকভাবে সমর্থন যুগিয়েছেন ঠিক তেমনি নিজের ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন। অন্যদিকে, আবু তালিব রাসূলুল্লাহকে ﷺ কুরাইশদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। যে দু'জন মানুষ সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন, তাঁরা হঠাৎ করেই চলে গেলেন এই দুনিয়া থেকে। শুধু তাই নয়, সে বছরে কুরাইশদের ইসলামবিরোধিতার মাত্রাও বেড়ে গেলো।

আবু তালিব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তেমন গুরুতর কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ইসলাম প্রচার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আবু তালিবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষে আগের মতো দাওয়াতের কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। কুরাইশদের বিভিন্ন কটূক্তি ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তিনি যখন ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ি যেতেন, তখন তাঁর পাশে থাকতেন খাদিজা ؓ। তিনি তাঁকে সাহস ও স্বস্তি দিয়েছেন, জীবনের কঠিনতম মুহূর্তগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় স্ত্রীকে পাশে পেয়েছিলেন। কিন্তু খাদিজার ؓ মৃত্যুর পর তিনি একেবারেই একা হয়ে পড়েন। খাদিজার ؓ মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় দুই-তিন বছর পর্যন্ত বিয়ে করেননি। তখন তিনি বেশ কঠিন সময়ের মধ্যে ছিলেন।

কেন এই পরিস্থিতিতে রাসূলকে ﷺ পড়তে হলো – এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন, একসাথে এতগুলো ঘটনা ঘটার পেছনে আল্লাহ্ তাআলার হিকমাহ রয়েছে। তা হলো মুসলিমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা করতে শেখে। আল্লাহ্ চেয়েছেন ইসলামের আহ্বানকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিমরা যেন আবু তালিব বা খাদিজার ﷺ দিকে চেয়ে না থাকে, বরং তারা যেন তাদের এই সংগ্রামে কেবল আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ও আল্লাহ্‌র সাহায্যের দিকে চেয়ে থাকতে শেখে। সে কারণেই আল্লাহ্ তাআলা নবীজিকে ﷺ এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করেন যে পরিস্থিতিতে তাঁকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।

আল ইসরা ওয়াল মিরাজ: কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কষ্টের সময়ের পরে আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে অনন্য সাধারণ উপহার লাভ করেছেন। কষ্টের পরিমাণ যত বেশি হবে তার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অনুগ্রহের পরিমাণও অনেক বেশি হবে। এই অনুগ্রহ হলো আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা। আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনাটি বিভিন্ন হাদীসে এসেছে এবং প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য এবং নতুনত্ব আছে। এই বইয়ে সংক্ষিপ্ত এই যাত্রার সার অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ বর্ণনায় মিরাজের রাত

'আমি তখন আল হিজরে (কাবার নিকটে অর্ধগোলাকার একটি জায়গা), আমার কাছে আসলেন একজন ফেরেশতা। তিনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করলেন, তারপর হৃৎপিণ্ডকে বের করে এনে ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্রে রাখলেন। সেটিকে এই পাত্রে ধুয়ে আমার বক্ষে বসিয়ে দেওয়া হলো হলো। এরপর আমার সামনে এমন একটি জন্তু (বুরাক) উপস্থিত করা হলো যা আকৃতিতে ঘোড়ার চেয়ে ছোটো কিন্তু গাধার চেয়ে বড়। এই জন্তুটি যতদূর সম্ভব দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত এক লাফে চলতো।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই জন্তুটির অস্বাভাবিক দ্রুততা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই জন্তুর দু'চোখ যতদূর যায়, সেই পরিমাণ দুরত্ব সে এক ধাপে অতিক্রম করে। অর্থাৎ এটি প্রচণ্ড দ্রুতগতিসম্পন্ন জন্তু ছিল। তার ওপর চড়লে মনে হবে পুরো পৃথিবীটা যেন গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে।

'জিবরীল আমাকে সেই জন্তুর ওপর উঠতে বললেন। এরপর তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে জেরুসালেম নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে আমি আমার বাহনটিকে মসজিদের গেটে বেঁধে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তারপর সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম।'

সেখানে ওইসময় অন্যান্য নবী-রাসূলগণও সালাত আদায় করেছিলেন এবং এই জামাতের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, তিনি ইমামের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এরপর জিবরীল আমাকে আসমানের দিকে নিয়ে গেলেন। আমরা সবচেয়ে নিচের আসমানের দরজায় পৌঁছলাম, জিবরীল দরজায় টোকা দিলেন। দরজার প্রহরীরা জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলো,

- আপনি কে?

- আমি জিবরীল।

- আপনার সাথে কে আছেন?

- মুহাম্মাদ ﷺ।
- তাঁকে কি আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে?
- হ্যাঁ।
- তাঁকে স্বাগতম, তাঁর আগমনে আমরা আনন্দিত।

প্রহরীরা আনন্দের সাথে গেট খুলে দিল। এখানে লক্ষণীয়, অনুমতি ছাড়া কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না, এমনকি রাসূলুল্লাহও ﷺ পারেননি। গেট খুলে দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করলেন।

'আমি ভেতরে প্রবেশ করে পিতা আদমকে ﷺ দেখতে পেলাম। জিবরীল তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিবরীল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম ﷺ, তাঁকে সালাম দিন। আমি আসসালামু আলাইকুম বললাম। তিনি আমাকে ওয়া আলাইকুসসালাম বললেন। এরপর আদম বললেন, আমার পবিত্র পুত্রকে স্বাগতম। পবিত্র রাসূলকে ﷺ স্বাগতম।'

আদম ﷺ দেখা পেলেন তাঁর কোটি কোটি সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদের ﷺ। হাজার বছর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রের সাথে দেখা করার সুযোগ পাওয়া ছিল পিতা আদমের জন্য এক মহা আনন্দের ঘটনা। রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্যও সেই মুহূর্তটি অবশ্যই একটি অভূতপূর্ব আনন্দময় মুহূর্ত ছিল। কিন্তু তাদের আলাপচারিতার সময় ছিল বেশ অল্প, কেননা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে সময় ছিল কম, তাঁর জন্য আরো অনেক কিছু অপেক্ষা করছিল। এরপর জিবরীল রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে রওনা দেন। তাঁরা সেখানকার দরজায় পৌঁছলে আগের মতো প্রহরীরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলো। পরিচয়পর্ব শেষে তারা দরজা খুলে দিল। নবীজি ﷺ বলেন, 'আমি ভিতরে প্রবেশ করে ঈসা ﷺ ও ইয়াহইয়ার ﷺ দেখা পেলাম। তাঁরা দুইজন ছিলেন আত্মীয়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন, 'আমি তাদের সাথে সালাম বিনিময় করলাম।' অর্থাৎ নবীরা একে অপরকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন জানাতেন।

'এরপর তৃতীয় আসমানের দিকে রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখা হলো ইউসুফের ﷺ সাথে।' ইউসুফ ﷺ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তাঁকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল।' চতুর্থ আসমানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখা করলেন নবী ইদ্রিসের ﷺ সাথে। নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেন, 'আমরা এরপর পঞ্চম আসমানে গেলাম। সেখানে হারুনের ﷺ সাথে দেখা হলো। মূসা ﷺ ছিলেন ষষ্ঠ আসমানে। তাঁর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়।'

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখে সালাম বিনিময় ও স্বাগত জানানোর পর মূসা ﷺ কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এক যুবককে রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার পরে, কিন্তু জান্নাতে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা আমার চেয়ে

বেশি হবে।' মুহাম্মাদের ﷺ আবির্ভাবের আগে অন্য যে কোনো নবীর চেয়ে মূসার অনুসারীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। বনী ইসরাইল ছিল সংখ্যার দিক থেকে অন্য সকল মুসলিম জাতি অপেক্ষা সর্ববৃহৎ। কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ উম্মাতের সংখ্যা বনী ইসরাইল থেকেও বেশি। একারণেই মূসা কাঁদছিলেন। মূসা ﷺ ও মুহাম্মাদের ﷺ মধ্যে উম্মাতের সংখ্যা নিয়ে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল কিন্তু এ প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনোরকম ঈর্ষাবোধ বা হিংসা ছিল না। তাদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ প্রতিযোগিতা ছিল, মূসা ﷺ ও মুহাম্মাদের ﷺ পরবর্তী কথোপকথন থেকে তা স্পষ্ট হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এরপর আমাকে নেওয়া হলো সপ্তম আসমানে। সেখানে আমি আমার পিতা ইবরাহীমের ﷺ সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করলাম। তারপর আমাকে দেখানো হলো *বাইতুল-মা'মুর*।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে ইবরাহীম ﷺ *বাইতুল-মা'মুরে* হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। '*বাইতুল-মা'মুর*' এর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা *বাইতুল-মা'মুরের* শপথ নিয়েছেন। কাবাঘর যেমন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ঘর, *বাইতুল-মা'মুর*ও তেমন। তবে সেখানে ইবাদাত করে ফেরেশতারা। মুসলিমরা যেমন কাবার চারপাশে তাওয়াফ করে তেমনি ফেরেশতারা *বাইতুল-মা'মুরে* আল্লাহর ইবাদত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, প্রতিদিন *বাইতুল-মা'মুরে* সত্তর হাজার ফেরেশতা যায়। তারা আর কোনোদিনই সেখানে ফিরে আসে না।

বাইতুল-মা'মুরের ফেরেশতাদের সংখ্যার কাছে দুনিয়ার মানুষের সংখ্যা কিছুই না। মহাবিশ্বের সর্বত্র, চার আঙুল পরপর ফেরেশতারা ছড়িয়ে আছে। তারা রুকু অথবা সিজদায় আল্লাহর ইবাদাত করছে। এই সুবিশাল সৃষ্টির কাছে মানবজাতির সংখ্যা অতি নগণ্য।

ইবরাহীমের ﷺ *বাইতুল-মা'মুরে* হেলান দিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ঘটনাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তিনিই দুনিয়াতে কাবা নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলেন তখন তাঁকে ফেরেশতাদের ঘর *বাইতুল-মা'মুরে* বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি সেখানে *সিদরাতুল মুনতাহা* দেখেছি। আরো কিছু দূর গিয়ে আমি *সিদরাতুল মুনতাহায়* পৌঁছলাম।' *সিদরাতুল মুনতাহা* একটি গাছ। এটি আসমানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এরপরেই শুরু রয়েছে আখিরাতের জীবন, জান্নাত, আল্লাহ তাআলার 'আরশ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এই বিশ্বের শেষ প্রান্ত হলো *সিদরাতুল মুনতাহা*। একটার পর একটা করে মোট সাত আসমান, সবশেষে রয়েছে *সিদরাতুল মুনতাহা*। এরপরেই শুরু হয়েছে অন্য একটি জগৎ, আখিরাতের আবাস।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনতাহায় পৌঁছে দেখলেন এর নিচ থেকে চারটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি জিবরীলকে এ নদীগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জিবরীল বললেন, 'দুইটি নদী দৃশ্যমান আর বাকি দুইটি নদী লুকোনো। যে দুইটি নদী দেখা যায় সেগুলো হলো নীলনদ ও ইউফ্রেটিস। আর লুকোনো নদীগুলো জান্নাতের নদী।' দুনিয়ার নীলনদ ও ইউফ্রেটিস এতটাই পবিত্র যে এই দুইটার সমতুল্য নদী আসমানে রয়েছে। আর এই গাছটি জান্নাতের এত কাছে যে জান্নাতের দুইটি নদী এর নিচ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে।

এই সাত আসমানের আকার সম্পর্কে বলা আছে–প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি ছোট্ট আংটির মতো, দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমানের তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা আংটির মতো এবং এভাবে পরেরগুলোও। আর সপ্তম আসমান কুরসির তুলনায় মরুভূমিতে একটি ছোট্ট আংটির মতো।

সর্বনিম্ন আসমানের তুলনায় কুরসি কতটা বিশাল তার কোনো ধারণাই মানুষের নেই। আমরা যে দুনিয়ায় আছি তা সর্বনিম্ন আসমানের মধ্যে অবস্থিত, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমরা সর্বনিম্ন আসমানকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে সজ্জিত করেছি", অর্থাৎ সমস্ত নক্ষত্ররাজি সর্বনিম্ন আসমানে অবস্থিত, আর সমস্ত নক্ষত্ররাজির সর্বশেষ সীমানায় মানুষ এখনো পৌঁছতে পারেনি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সুবিশাল সৃষ্টি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এটি ছিল অসাধারণ এক সফর। *সিদরাতুল মুনতাহা* অতিক্রম করে সামনে যাওয়ার পর তিনি আরো ওপরে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটাই ছিল তাঁর ভ্রমণের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি ফিরে আসছিলাম, পথিমধ্যে মূসার ﷺ সাথে দেখা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনাকে কী বলেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। মূসা বললেন, আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না। আমি আপনার আগে অনেক লোককে দেখেছি এবং আমার কওম বনী ইসরাইলের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। মানুষের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যান, সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দিতে বলুন যাতে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ রাসূলের কথা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'সালাতের সংখ্যা কিছু কমিয়ে দিন।' আল্লাহ তাআলা সালাতের সংখ্যা দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ নতুন নির্দেশ নিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। তাঁর সাথে আবার মূসার দেখা হলো। মূসা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?', রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খুলে বললেন । তখন মূসা বললেন, 'আবার ফিরে যান। সালাতের সংখ্যা আরও কিছু কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে বলুন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার আল্লাহ তাআলার কাছে গেলেন, আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হলো। ফিরতি পথে মূসা তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে

জানালেন যে, আল্লাহ তাআলা সালাতের সংখ্যা কমিয়ে তিরিশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মূসা ﷺ সালাতের সংখ্যা আরও কমিয়ে আনার জন্য ফিরে যেতে বললেন। মুহাম্মাদ ﷺ আবারও ফিরে গেলেন এবং আরও দশ কমিয়ে দেওয়া হলো। মূসা একথা শুনে আবারও ফিরে যেতে বললেন। এবার কমিয়ে দশ করা হলো। মূসার উপদেশ অনুযায়ী মুহাম্মাদ ﷺ আবার গেলেন। এবার কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হলো। তিনি ফিরে এসে মূসাকে ﷺ তা জানালেন। মূসা ﷺ বললেন, 'মুহাম্মাদ, মানুষ সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, আমি বনী ইসরাইলের সাথে ছিলাম। আপনার উম্মাতের জন্য এটাও কষ্টকর হবে। আপনি আবার ফিরে যান এবং আরও কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে অনুরোধ করুন।' মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, 'আবার অনুরোধ করতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি আর পারব না।'[41]

মুহাম্মাদ ﷺ ও মূসার ﷺ ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যগুলো আছে। মূসা সালাতের সংখ্যা কমানোর জন্য আল্লাহ তাআলাকে বারবার অনুরোধ করেছেন। মূসা-ই ﷺ হচ্ছেন সেই নবী যিনি আল্লাহ তাআলাকে বলেছিলেন যে তিনি আল্লাহকে দেখতে চান। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন যার সুযোগ অন্য নবীরা পাননি। তারপরও মূসা শুধু কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, আল্লাহর সাথে দেখাও করতে চাইলেন! এর ফলে কী ঘটেছিল তা কুরআনে আছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আবার তিনিই মৃত্যুর ফেরেশতাকে ঘুষি মেরেছিলেন। এতে সেই ফেরেশতার চোখ ভালোভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূলগণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই ছিল। কিন্তু তাদের একেকজনের ব্যক্তিত্ব একেকরকম ছিল। এদিকে, মুহাম্মাদ ﷺ সালাতের সংখ্যা কমানোর জন্য যেতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। এসময় তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'এটাই আপনার উম্মাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে, তবে এর জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্তের পুরস্কার দেওয়া হবে।'

সেই একই রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি উম্ম আয়মানের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বলেন, 'আমি রাতে জেরুসালেম গিয়ে ফিরে এসেছি।' উম্ম আয়মান বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এ কথা আপনি কাউকে বলবেন না। কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে যে এটা অবাস্তব ঘটনা।' উম্ম আয়মান রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঠিকই বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তিনি আশঙ্কা করছিলেন অন্য লোকেরা এই কথায় বিশ্বাস নাও করতে পারে। আর কুরাইশ মুশরিকরা তো এ কথা নির্ঘাৎ উড়িয়ে দিবে। যেখানে জেরুসালেমে যেতে প্রায় এক মাস সময় লাগে সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতের মধ্যেই সে জায়গায় গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং ওই এক রাতেই সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসেছেন এবং এরই মধ্যে সাত আসমান ঘুরে দেখেছেন। তাই উম্ম আয়মান তাঁকে এ ঘটনা সবাইকে বলতে মানা করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, আমি এ ঘটনা সবাইকে

---

[41] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৪।

জানাবো। লোকেরা যা-ই বলুক না কেন আমি সত্য ঘটনা প্রচার করতে পিছপা হবো না। এটা আমার ওপর অর্পিত দায়িত্বের একটি অংশ। আমার দায়িত্ব হচ্ছে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া।'

এ বিশাল ঘটনার তাৎপর্য ও এই ঘটনা নিয়ে লোকেদের প্রতিক্রিয়া সামলে নেওয়া কতটা কঠিন হবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর ﷺ ধারণা ছিল, তিনি জানতেন বিষয়টা সহজ হবে না। তিনি বেশ চুপচাপ ও চিন্তিত ছিলেন। কয়েকজনকে এ ঘটনাটি জানালেন। এক পর্যায়ে তা আবু জাহেলের কাছে পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদে, লোকজন কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে তা নিয়ে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন। আবু জাহেল তাঁর কাছে এসে বললো,

- মুহাম্মাদ, কোনো নতুন সংবাদ আছে নাকি?

- হ্যাঁ, আছে।

- কী সেই খবর?

- আমি গত রাতে জেরুসালেম গিয়ে আবার সেই রাতেই ফিরে এসেছি।

- জেরুসালেম?

- হ্যাঁ, জেরুসালেম।

- মুহাম্মাদ, আমি যদি এখনই তোমার লোকদের এখানে ডেকে আনি তাহলে কি তুমি তাদের সামনে ঠিক এ কথাটাই বলতে পারবে যা আমাকে এইমাত্র বলেছো?

- হ্যাঁ, অবশ্যই পারবো।'

আবু জাহেল বেশ খুশি মনে কুরাইশদের ডাকতে লাগলো, এটা ছিল তার জন্য মুহাম্মাদকে ﷺ পাগল প্রমাণ করার 'সুবর্ণ সুযোগ', সে সবাইকে ডাকলো, 'হে কুরাইশের লোকেরা, এদিকে এসো, শুনে যাও।' সবাই উপস্থিত হলে সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'হে মুহাম্মাদ, তুমি কিছুক্ষণ আগে আমাকে যা বলেছো তা তোমার লোকদেরকে শুনাও দেখি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা অস্বস্তি ছাড়াই তাদেরকে বললেন, 'আমি গতরাতে জেরুসালেম গিয়ে ফিরে এসেছি।' উপস্থিত লোকেরা এ কথা শুনে হাসাহাসি করতে লাগলো, শিস বাজিয়ে, হাততালি দিয়ে অবজ্ঞা করতে লাগলো। এ ঘটনা তাদের জন্য নতুন এক 'বিনোদন' এর জন্ম দিল।

পরিস্থিতি খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো, চারপাশের মানুষেরা এ ঘটনা নিয়ে মজা করছে, হাসিঠাট্টা করছে, হাততালি দিচ্ছে। সেখানে তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা নিয়মিত জেরুসালেমে যেতো। তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ মসজিদের বর্ণনা দিতে বললো, জেরুসালেমের বর্ণনা দিতে বললো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি জেরুসালেমের বর্ণনা দেওয়া শুরু করলাম এবং একসময় আমি আটকে গেলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে জেরুসালেম দেখালেন এবং আমি এর বিস্তারিত বর্ণনা তাদেরকে শোনাতে লাগলাম, প্রতিটা পাথরের, প্রতিটা ইটের।' তখন লোকেরা অবাক হয়ে গেল, তারা স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, তিনি একেবারে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। তবে ইবন ইসহাকের আরেকটি বর্ণনায় অন্য একটি জিনিসও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ফিরে আসছিলেন তখন তিনি কুরাইশদের একটি কাফেলা দেখতে পান। সেই কাফেলাটি তাদের একটি উট হারিয়ে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভ্রমণকালে উপরে ছিলেন, তাই তিনি তাদের হারানো উটটি দেখতে পেয়ে তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের হারানো উটটি এই জায়গাতে আছে।' কাফেলার লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে এই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। এরপর তিনি নীচে নেমে তাদের পানির পাত্র থেকে পানি খেয়েছিলেন। এই কাফেলার বর্ণনা তাঁর মনে ছিল।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রমাণস্বরূপ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের অমুক কাফেলাটি তমুক স্থানে আছে, তারা তাদের উট হারিয়ে ফেলেছিল। আমি তাদের পাত্র থেকে পানি পান করেছিলাম। কাফেলাটির সামনে একটি উট ছিল।' এরপর তিনি সেই উটের বর্ণনা দিলেন এবং উটের ওপর কী কী ছিল তাও বলে দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ দেওয়া তথ্য যাচাই করার জন্য তারা তখনই কাফেলার কাছে কিছু লোক পাঠালো। এটি তখনো মক্কার বাইরে ছিল। পরে তারা মিলিয়ে দেখলো যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যা বলেছেন তার সবই সত্য। কাফেলার লোকেরা উট হারিয়ে ফেলেছিল এবং আকাশ হতে আগত একটি আওয়াজ শুনে তারা তা খুঁজে পেয়েছিল। এমনকি তাদের কাছে যে খাওয়ার পানি ছিল তার পরিমাণও কিছু কমে গিয়েছিল। এতসব নিদর্শন আর প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থিত করা সত্ত্বেও তারা এ ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। মিরাজের ঘটনাটি হজম করা সবার জন্য এতটাই কষ্টকর ছিল যে, বেশ কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলিম মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই ধরনের মু'জিযা তাঁর নবীদেরকেই দেখিয়ে থাকেন।

আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১. রাসূলুল্লাহর ﷺ বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনা দুইবার ঘটেছে। যখন তিনি হালিমা সাদিয়ার কাছে ছিলেন তখন প্রথমবার এ ঘটনা ঘটে। সে সময় তাঁর বয়স একদম কম ছিল। আর দ্বিতীয়বার ঘটে *আল ইসরা ওয়াল মিরাজের* সময়। এখানে *ইসরা* মানে হলো রাতের ভ্রমণ আর *মিরাজ* অর্থ আরোহণ করা।

২. মূসার ﷺ সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথোপকথন বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাআলা যখন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন তখন মুহাম্মাদ ﷺ তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মূসার ﷺ সাথে তাঁর দেখা হলে তিনি তাঁকে বলেছেন, 'আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না।' মূসা ﷺ তাঁর দীর্ঘদিনের নবুওয়াতের অভিজ্ঞতা থেকে এ উপদেশটি দিয়েছিলেন। এটাই

অভিজ্ঞতার মূল্য, তাত্ত্বিক জ্ঞানই সবকিছু নয়। অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে। মূসা ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেছিলেন, 'মানুষের ব্যাপারে আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, আপনি নতুন। কিন্তু আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছি বনী ইসরাইলের মতো এক কওমের সাথে। তাই বলছি আপনার উম্মাত এত সালাত আদায় করতে পারবে না। আপনি গিয়ে তা কমিয়ে আনুন।' মূসা ﷺ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই রাসূলুল্লাহকে ﷺ এরকম উপদেশ দিয়েছিলেন। মূসার নিজ জীবন থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

যখন মূসা তাঁর চল্লিশ দিনের সাওম শেষে আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলতে গেলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানালেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলীরা বাছুরের উপাসনা করছে। এই কথা শুনে তিনি খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। কিন্তু যখন তিনি নিজ চোখে এই দৃশ্য দেখলেন, তখন তিনি রাগে ফেটে পড়েন আর আল্লাহর কাছ থেকে সদ্য পাওয়া ফলকগুলো হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলেন। এর কারণ হলো, কোনো কিছু শোনা আর দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে।

আল্লাহ তাআলা যখন নবীজিকে ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করে দিলেন তখনও মূসা ﷺ বলেছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করাও এই উম্মাতের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়বে। মূসা আসলে ঠিকই বলেছিলেন। বর্তমানে মুসলিমদের অধিকাংশই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও ঠিক মতো আদায় করে না। অনেকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী সালাত আদায় করে, অর্থাৎ কিছু আদায় করে আবার কিছু বাদ দেয়। আল্লাহ মূসার ওপর রহম করুন যিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য সালাতকে সহজ করে দিয়েছেন। যদি প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা লাগত তবে তা কতই না কষ্টকর হতো! মূসা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল তাতে কোনোরকম হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না, বরং তাঁরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখে মূসার কেঁদে ফেলার কারণ ছিল তিনি জানতেন রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসারীর সংখ্যা তাঁর অনুসারী থেকে অনেক বেশি হবে, কিন্তু তারপরও তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর উম্মাতের সুবিধার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিও তাঁর সহানুভূতিমূলক মনোভাব ছিল। আল্লাহ তাআলার সকল নবী একে অপরকে ভালোবাসেন। তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা ছিল একে অপরকে ভালোবাসার প্রতিযোগিতা।

শেষ বিচারের দিনে বিভিন্ন নবী-রাসূলদের অনুসারীর সংখ্যা হবে বিভিন্ন রকম। কারো সাথে দশ জন অনুসারী থাকবে, আবার কারো সাথে পাঁচ জন, কারো সাথে মাত্র একজন, আবার কোনো নবী উপস্থিত হবেন একা। এমন নবী থাকবেন যিনি সারা জীবন ধরে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করেছেন কিন্তু কেউই তাদের এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামতের দিন এক বিশাল জনসমুদ্র দেখে ভাববেন এটা তাঁর উম্মত, কিন্তু সেটি হবে মূসার উম্মাত, রাসূলুল্লাহর ﷺ উম্মতের সংখ্যা হবে আরো বেশি।

৩. আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা থেকে আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো সালাতের গুরুত্ব। ইসলামের সকল ইবাদাতের আদেশ নাযিল হয়েছে দুনিয়ার বুকে, জিবরীলের মাধ্যমে। কিন্তু একমাত্র সালাতের হুকুম আল্লাহ তাআলা সরাসরি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে একান্ত সাক্ষাতে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। মূসা ﷺ যখন তূর পর্বতের ওপর আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলের জন্য সালাতের বিধান নির্ধারণ করে দেন, অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা সালাতের নির্দেশ তাঁর রাসূলকে ﷺ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

"আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (সূরা ত্ব-হা, ২০: ১৪)

আর ওই সময়েই মূসা ﷺ রিসালাতের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে রাসূল হওয়ার পরপরই মূসাকে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও পরে সালাতের নির্দেশ। এতেই বুঝা যায় যে, সালাত মুসলিমদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত আদায় না করা।' এমনকি ঠিক সময়ে সালাত আদায় না করাও একটি গুনাহ।

"তাদের পর তাদের অপদার্থ বংশধরেরা এল। তারা সালাত নষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।" (সূরা মারইয়াম, ১৯: ৫৮)

যারা সালাতকে অবহেলা করেছে অর্থাৎ সালাত আদায় করেনি আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করেছেন। ইবন আব্বাস এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, এখানে ওইসব লোকদের কথা বলা হয়নি যারা কিনা সালাত একদমই আদায় করে না, বরং সেসব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা অর্ধেক সালাত আদায় করে। ইবন খাত্তাব বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি ফরয সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তবে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল, যদিও এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে সবাই একমত যে সালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এ বিধান থেকে কেউই পার পাবে না। আর্থিক সামর্থ্য বা সাথে যাওয়ার মতো (নারীদের ক্ষেত্রে) কেউ না থাকলে হজ্ব মাফ করে দেওয়া হয়, অসুস্থতা বা বয়সজনিত সমস্যার কারণে সাওম মাফ করে দেওয়া হয়েছে আর নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকলে কাউকে যাকাত আদায় করতে হয় না, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সালাত ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

কেউ যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারে তবে বসে আদায় করবে, বসে আদায় করতে না পারলে শুয়ে আদায় করবে, শুয়ে আদায় করতে না পারলে আঙুল দিয়ে ইশারায় সালাত পড়বে। আর যদি তাও করতে না পারে তাহলে চোখের ইশারায় সালাত আদায় করবে। অবস্থা যাই হোক না কেন সালাত আদায় করতেই হবে। যতক্ষণ জ্ঞান আছে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই, এমনকি যুদ্ধ

চলাকালীন সময়ও সালাত আদায় করতে হবে। সালাত হলো এমন একটি ইবাদত যা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোনো অজুহাতই কার্যকর হবে না। মুসলিম আলিমগণ বলেছেন যে শত্রুপক্ষের ওপর নজরদারি করার সময় আঙুল দিয়ে ইশারায় সালাত আদায় করা যাবে।

৪. এ সফর আমাদেরকে পবিত্র ভূমি জেরুসালেমের গুরুত্ব জানিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ইসরা-তে বলেছেন,

> **"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত – যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।" (সূরা ইসরা, ১৭: ১)**

জেরুসালেমের কর্তৃত্বের ব্যাপারে মু'মিনদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমের ﷺ কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, জেরুসালেমের অভিভাবকত্ব ইবরাহীমের ﷺ উত্তরসূরিদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই ওয়াদা বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। মূসাকেও ﷺ জেরুসালেমের কর্তৃত্ব দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছিল, তবে তিনি সেটা তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি, তাঁর উত্তরসূরি ইউশা ইবন নুনের জীবদ্দশায় জেরুসালেমের কর্তৃত্ব মু'মিনদের হাতে দেওয়া হয়। বনী ইসরাঈল যতদিন পর্যন্ত সত্য পথের অনুসারী ছিল ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল, নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিল, তাদেরকে খুন করতে লাগল, এমনকি ঈসাকে ﷺ হত্যা করার চেষ্টা চালালো তখনই আল্লাহ তাআলা তাদের কাছ থেকে জেরুসালেম কেড়ে নিলেন এবং এই পবিত্র ভূমির দায়িত্ব ইসমাইলের ﷺ উত্তরসূরিদের ওপর অর্পণ করলেন। আর এ কারণেই জেরুসালেম এখন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতের ভূমি। যুগ যুগ ধরে নবী-রাসূলগণ যে বাণী প্রচার করেছেন, সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ সেই একই বাণীর বাহক। এখন তিনিই আদমের ﷺ সমস্ত সন্তানের নেতা। যে কারণে বনী ইসরাইলকে জেরুসালেমের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই একই কারণে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে জেরুসালেমের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণটি হলো তাওহীদ।

মূসা ﷺ যেমন তাঁর জীবদ্দশায় জেরুসালেম জয় করতে পারেননি কিন্তু তাঁরই অনুসারী ইউশার ﷺ সময় তা মুসলিমদের কর্তৃত্বে আসে, ঠিক তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় জেরুসালেম জয় করতে না পারলেও উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ শাসনামলে তা মুসলিমদের অধীনে চলে আসে। জেরুসালেমের তৎকালীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস করেনি, তবে মুসলিমরা যখন জেরুসালেমের গেটে পৌঁছল তখন তারা বললো, 'আমরা মুসলিমদের খলিফা ছাড়া অন্য কারো কাছে আত্মসমর্পণ করব না। চাবি নেওয়ার জন্য তাঁকেই এখানে আসতে

হবে।' এজন্য উমার ইবন খাত্তাব ﷺ জেরুসালেমের চাবি নেওয়ার জন্য মদীনা থেকে জেরুসালেমে এসেছিলেন।

৫. নবুওয়াতের দশম বছর ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য কষ্টের সময়, তাই এই সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই ভ্রমণের সুযোগ দিয়েছেন। এ ভ্রমণে জিবরীল ﷺ ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। এ ভ্রমণে তিনি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সাথে দেখা করার সুযোগ পান। এ ভ্রমণ ছিল যেন সত্যিকারের এক বিস্ময়-রাজ্যে ভ্রমণ। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে শেষ পর্যন্ত তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-কাউসার নামে একটি নদী দেখেছিলেন। এটি তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এই নদী ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি এক বিশেষ উপহার। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি"–এর মানে হলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কষ্টের জন্য উত্তম পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন। একজন মুসলিম যত কষ্টের মধ্য দিয়েই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে তার জন্য কিছু না কিছু বরাদ্দ করে রেখেছেন যা সে এই দুনিয়া অথবা পরকালে পাবে। সুতরাং একজন মুসলিমের কখনই ভেঙে পড়া উচিত না।

৬. আবু বকরের ﷺ মর্যাদা: কুরাইশের লোকেরা যখন আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল তখন আবু বকর ﷺ সেখানে ছিলেন না। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কেউ একজন তাঁর কাছে গিয়ে বললো, 'আপনি জানেন কী হয়েছে? মুহাম্মাদ ﷺ দাবি করেছেন যে, তিনি এক রাতের মধ্যেই জেরুসালেম গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।' এরপর আবু বকর ﷺ বলেছিলেন, 'যদি তিনি একথা দাবি করে থাকেন–তাহলে তা অবশ্যই সত্য।' এরপর আবু বকর ﷺ যখন জানতে পারলেন যে মুহাম্মাদ ﷺ আসলেই এ দাবি করেছেন, তখনই তিনি এ ঘটনাকে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

লক্ষণীয় হলো আবু বকরের ﷺ উক্তির প্রথম অংশ, 'যদি তিনি একথা বলে থাকেন...' –এই কথার মাধ্যমে হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। যে কেউ হাদীস বর্ণনা করলেই তা গ্রহণ করা যাবে না। বরং আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আসলেই তা বলেছেন কি না। মুসলিম ও আহলে কিতাবদের মধ্যে মূল পার্থক্য আসলে এখানেই। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের যা বলা হতো তাই তারা কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ করতো, যদিও তাদের প্রকৃত কিতাব আগেই পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মুসলিমদের রয়েছে আলাদা এক শাস্ত্র, যেখানে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য তা বের করার জন্য হাজার হাজার ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করা হয়।

৭. আবু বকরের উক্তির দ্বিতীয় অংশ, '...তাহলে তা সত্য', রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি আবু বকরের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাসূল ﷺ যা-ই বলতেন তিনি তা-ই বিশ্বাস করতেন এবং এ কারণেই তাঁকে বলা হত 'আস সিদ্দীক'।

সূচিপত্র

নবীজির ﷺ জীবনে সবচেয়ে বিষাদময় দিন - আত তাইফ

আবু তালিবের মৃত্যুর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিরাপত্তার ঢালটি হারিয়ে ফেলেন। মক্কায় ইসলামি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তিনি মক্কার বাইরে দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে তাইফে যান। তাঁর সাথে ছিলেন যাইদ ইবন হারিসা ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাইফের নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী সাকীফের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারা ছিল তিন ভাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন, তাদের সমর্থন ও সাহায্য কামনা করলেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ আহ্বানে এই তিনজন লোকের প্রতিক্রিয়া ছিল রীতিমতো জঘন্য। প্রথমজন বললো, 'তুমি যদি আল্লাহর প্রেরিত নবী হয়ে থাকো তাহলে আমি কাবাঘরের গিলাফ ছিঁড়ে ফেলব।' কাবার গিলাফ তাদের কাছে খুবই পবিত্র ছিল। দ্বিতীয়জন বলেছিল, 'আল্লাহ কি তোমার চেয়ে ভালো আর কাউকে পেলেন না?' আর তৃতীয় ভাই বলেছিল, 'তোমার সাথে আমি কোনো কথাই বলবো না। যদি তুমি সত্যই নবী হয়ে থাকো, তাহলে আমি মনে করি না তোমার সাথে কথা বলার যোগ্যতা আমার আছে। আর যদি তুমি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূল না হয়ে থাকো তাহলে তুমি মিথ্যাবাদী এবং আমার পক্ষে কোনো মিথ্যুকের সাথে কথা বলা সম্ভব না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দশদিন অবস্থান করলেন, দশদিন ধরে তিনি তাইফের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে যান এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাদের এক কথা, 'বের হয়ে যাও।' তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে, আপনারা যদি আমার আহ্বানে সাড়া না দেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে আমি চাই আমাদের মধ্যে যে আলাপ হয়েছে তা আপনারা মক্কার লোকেদের কাছে গোপন রাখবেন।'[41]

কিন্তু এই সাকীফের লোকেরা ছিল এতটাই খারাপ যে তারা কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলেপেলেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা গালাগাল করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যাইদ ইবন হারিসাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল, তাদেরকে ধাওয়া করতে লাগল। তাঁরা দুইজন দৌড়াতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য যাইদ ইবন হারিসা ﷺ নিজের শরীরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁরা একটি আবাদি জমিতে গিয়ে আশ্রয় নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুতর আহত। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। সাকীফের অধিবাসীদের পাথরের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল, তাঁর পায়ের রক্তে জুতো ভিজে গিয়েছিল।

---

[41] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় নেন মক্কার একটি বাগানে, তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে আঙুর গাছের ছায়ায় বসলেন। তাঁর মন প্রচণ্ড খারাপ, তাইফে তিনি এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবেন আশা করেননি। প্রচণ্ড কষ্ট আর মনোবেদনা থেকে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করলেন, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আর আবেগময় একটি দুআ, যা মুস্তাদআফিনের দুআ নামে পরিচিত।

> *'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করছি। দয়ালু দাতা, তুমি দুর্বলদের রব, তুমি আমারও রব, তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছ? আমাকে কি এমন কারও কাছে ন্যস্ত করছ, যে আমার সাথে রুক্ষ ব্যবহার করবে? নাকি কোনো শত্রুর হাতে ন্যস্ত করছ যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছ? যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোনও দুঃখ নেই, আফসোসও নেই। তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ত ও প্রসারিত কর। আমি তোমার ক্রোধ ও অভিশাপ থেকে তোমার সে আলোয় আশ্রয় চাই যা দ্বারা সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়। দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত। সকল ক্ষমতা এবং শক্তি শুধু তোমারই। তোমার শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।'* [42]

আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য সাহায্য পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় বেশ ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সেই আবাদি জমির মালিকেরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তারা তাদের খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাসকে আদেশ দিল যেন সে মুহাম্মাদকে ﷺ কিছু আঙুর খেতে দেয়। এই জমির মালিকরা ছিল মক্কা থেকে আগত। তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরোধী মতাদর্শের ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক এলাকার মানুষ হওয়ায় তারা সে সময় রাসূলুল্লাহকে ﷺ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাস রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য আঙুর নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার পূর্বে বললেন, 'বিসমিল্লাহ', এতে আদ্দাস বেশ অবাক হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'আপনি যা বললেন তা এই দেশের লোকেরা বলে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে আদ্দাস একজন ভিনদেশী এবং অন্য ধর্মের অনুসারী। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ? তোমার দ্বীন কী?' আদ্দাস উত্তর দিল, 'আমি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। আমার বাড়ি ইরাকের নিনেভাতে।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তো ইউনুস ইবন মাত্তার গ্রাম থেকে এসেছ। তিনি আল্লাহ তাআলার নবী ছিলেন।' আদ্দাস বললো, 'আপনি কীভাবে মাত্তার পুত্র ইউনুস সম্পর্কে জানলেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি একজন নবী ছিলেন আর আমিও একজন নবী।' এ কথা শোনামাত্র আদ্দাস সম্মানবশত নিচু হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ পায়ে চুম্বন করে। এরপর তাঁর হাত ও মাথায়

---

[42] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫।

চুম্বন করে।

জমির মালিকেরা এই দৃশ্য দেখে বললো, 'দেখেছো! সে আমাদের দাসকেও বশ করে ফেলেছে।' রাসূলুল্লাহর ﷺ অভ্যাস ছিল তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই দাওয়াহ দিতেন। আর এদিকে যে দুটি লোক কিছুক্ষণ আগে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল, তারাই এখন আদ্দাসের চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখে আফসোস করতে লাগলো। আদ্দাস ফিরে এলে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী হয়েছিল? তুমি কেন তাঁর হাত ও মাথায় চুমু দিচ্ছিলে?' আদ্দাস বললেন, 'এই দুনিয়াতে তাঁর মতো ভালো মানুষ আর নেই। তিনি আমাকে এমন কিছু বলেছেন যা একজন নবী ছাড়া কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।' তখন ওই দুইজন লোক তাঁকে বললো, 'তুমি তাঁর কথায় নিজের দ্বীন ত্যাগ করো না। তোমার দ্বীন তাঁর দ্বীনের চেয়ে উত্তম।' এই লোকগুলো খ্রিস্টান ছিল না, খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু তাদের মনে ইসলামবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে তারা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য যা খুশি তা বলতো, এমনকি না-জেনে ও মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করতো না, ইসলামেই ছিল তাদের যাবতীয় এলার্জি।

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে তাইফের দিন ছিল সবচেয়ে বিষাদমাখা দিন। বহুদিন পরের কথা, আ'ইশা জানতে চাইলেন, 'ইয়া আল্লাহর রাসূল! উহুদের দিনের চাইতে মারাত্মক কোনো দিন কি আপনার জীবনে আপনি দেখেছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'হ্যাঁ, দেখেছি। সেটি ছিল তাইফের দিন। আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা গ্রহণ করেনি। আমি সেদিন মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত। মাঝপথে এসে দেখি মাথার ওপর এক টুকরো মেঘ। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি জিবরীল। তিনি আমাকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা যা বলেছে সবই আল্লাহ তাআলা শুনেছেন। আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাদের পাঠানো হয়েছে। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতারা আমাকে সালাম জানালেন, বললেন, ইয়া আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনি যদি চান, ওদেরকে দুই পাহাড়ের মধ্যে পিষে দেবো।*
>
> *আমি বললাম, না, আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।'* [43]

আসমান থেকে সাহায্য পেয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ মন শান্ত হলো। আবার তিনি চলতে শুরু করলেন, থামলেন ওয়াদীয়া নাখলায়। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, সে এলাকায় ছিল কিছু জ্বীন, তাঁর

---

[43] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬।

তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে কুরআনের আরও কিছু আয়াত শিখে এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম হয়ে যায়।

জ্বীন মানব জাতির মতোই আল্লাহ তাআলার এক সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন। তারা মানুষের সাথে এই দুনিয়াতে বাস করে, মানুষের মতো তাদেরও সমাজব্যবস্থা আছে। তারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং তাদের পরিবার আছে। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করে। তাদের আর মানুষের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, তারা আগুনের তৈরি আর মানুষ মাটির তৈরি, তারা মানুষদেরকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না।

শেষ পর্যন্ত সেই জ্বীনরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে মুসলিম হয়ে গেল। এরকম আরো একটি ঘটনা রয়েছে যেখানে জ্বীনরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ ঘটনাটি কুরআনে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা জ্বীনে একবার উল্লেখ করা হয়েছে ও আরেকবার উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আহকাফে।

> "স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বীনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো; তারা একে অপরকে বলতে লাগলঃ চুপ করে শোনো। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারা বলেছিলঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।" (সূরা আহকাফ, ৪৬: ২৯-৩০)

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, 'জ্বীনরা বলেছে তারা এমন এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছে যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে। কিন্তু কুরআন আসার আগে তো ঈসার ﷺ ওপর কিতাব নাযিল হয়েছে, তাহলে কেন তারা ঈসার কথা বলেনি?'–কুরআনের একজন তাফসীরকার এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'ওই জ্বীনরা ছিল ইহুদি। তারা ছিল মূসার ﷺ অনুসারী। যখন তারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেল তখন তারা বললো যে কুরআন মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে।' সেই মুফাসসির বলেছেন যে এই জ্বীনরা ইয়েমেনের অধিবাসী ছিল আর ইয়েমেনে তখন কিছু সংখ্যক ইহুদি বাস করতো। তবে এই আয়াতের ব্যাপারে এটাই একমাত্র মত, তা নয়। জ্বীনরা আরো বললো,

> "হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন। যদি কেউ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে এ যমীনে আল্লাহকে ব্যর্থ করে দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতাই সে রাখে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (সূরা আহকাফ, ৪৬: ৩১-৩২)

জ্বীনদের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সাহায্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বস্তি লাভ করলেন এবং উদ্দীপনার সাথে তাঁর মিশনে মনোযোগ দিলেন।

তাইফের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. রাসূলুল্লাহকে ﷺ লক্ষ করে যখন তাইফের লোকেরা পাথর ছুঁড়ছিল তখন তাঁকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করছিলেন যাইদ ইবন হারিসা ﷺ। নিজের শরীরকে তিনি বর্ম হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। উহুদের যুদ্ধেও একই রকম ঘটনা দেখা যায়। সেই যুদ্ধে সাহাবীরা ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ পাথরের আঘাত নয়, বরং তীরের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের পিঠ পেতে দিয়েছিলেন। এই হলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ জন্য সাহাবীদের ﷺ ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত। আজকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নেই, নিজেদের শরীর আর রক্ত দিয়ে তাঁকে বাচানোর সুযোগ হয়তো নেই, কিন্তু তাঁর অবমাননার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো, তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারগুলোর জবাব দেওয়ার সুযোগ এখনো আছে। যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন, সেই দ্বীনকে রক্ষা করা, সেই দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাঁর সম্মানে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেওয়ার সুযোগ এখনো খোলা আছে। বিখ্যাত তাবেঈ আবু মুসলিম আল খাওলানি বলেছেন, 'সাহাবীরা ﷺ কি মনে করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তাদেরই, আর কারো নয়? রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর অধিকার কেবল তাদেরই, আর কারো নয়? না, বরং আমরা তাদের সাথে পাল্লা দেব। রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর আমাদেরও অধিকার রয়েছে আর আমরা তা আদায় করে নিতে চাই।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য যাইদ বা তালহা যা করেছিলেন আজ মুসলিমরা হয়তো সেইরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে হবে না, অন্তত চেষ্টা করতে হবে। মুহাম্মাদের ﷺ জীবন সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা অন্যান্যদেরকেও জানাতে হবে, যাতে সবাই তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর অনুসরণে আগ্রহী হয়।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাইফবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, উল্টো তাঁকে বের করে দেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কথা বলে গেছেন, 'ভালো কাজ করে যাও, কেননা তুমি কখনোই জানো না তোমার কাজের ফলাফল কী' – অর্থাৎ, একটি ভালো কাজ কারো চোখে হয়তো তুচ্ছ লাগতে পারে কিন্তু সেই কাজের ফলাফল হতে পারে অনেক বড় কিছু, আর সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না, তাই কোনো সৎকাজকেই তুচ্ছ করা উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাইফবাসী প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা দেখে তিনি হয়তোবা ভেবে থাকতে পারেন যে তাঁর এই দাওয়াত লোকেদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখানে দাওয়াহ দিচ্ছিলেন সেখানে খালিদ আল উদওয়ান নামে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, সে ছিল খাতীফ বংশের সন্তান। সেই খালিদ বহুদিন পর নিজের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, 'তাইফের মেলা চত্বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে

ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আমি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁর কথা শুনছিলাম। আমি তাঁকে সূরা আত-তারিক তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি তখনই এই সূরাটি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম যদিও আমি তখন কাফির ছিলাম। পরবর্তীতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।' যেখানে উপস্থিত বয়স্ক লোকেরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় কান দিচ্ছিল না সেখানে এক ছোট বাচ্চা তাঁর তিলাওয়াত শুনে শুনেই একটি সূরা মুখস্থ করে ফেলো আর কয়েক বছর পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফল দেখতে পেয়েছিলেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাসের মধ্যকার ঘটনাটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একজন মুসলিমের সাদাসিধে একটি আমলও যে দাওয়াতের আমলে রূপান্তরিত হতে পারে – এই ঘটনা তার একটি চমৎকার উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়া শুরু করেছিলেন 'বিসমিল্লাহ' বলে, আর এই "বিসমিল্লাহ" শব্দটিই আদ্দাসের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আদ্দাস আগে এরকম কিছু শুনেনি, তাই সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো আর এই কথার সূত্র ধরেই রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তার আলাপচারিতা শুরু হয়। তাঁর কাছ থেকে আদ্দাস এমন কিছু জানতে পেরেছিলে যা তাঁকে রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং ছোট ছোট কাজও মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে সে ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত অনেকেই এভাবে ইসলামের দরজা খুলে দ্বীনে প্রবেশ করে। সাহাবীদের ﷺ কথাবার্তা, ব্যবহার ও চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতো।

নতুন ভূমির সন্ধানে: হিজরত

বিভিন্ন গোত্রের প্রতি আহ্বান

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় প্রবেশ করা তাঁর জন্য সহজ ছিল না কারণ তাইফের কাহিনি মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ওই সময় একাকী মক্কায় প্রবেশ করা তাঁর জন্য নিরাপদ ছিল না। তাই তিনি নিজ শহরে প্রবেশ করার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে উরাইকাতের মাধ্যমে আল আখনাস ইবন শুরাইকের কাছে সংবাদ পাঠালেন।

আখনাস ইবন শুরাইক ছিল মক্কার লোক, তার সাথে কুরাইশদের মিত্রতা ছিল যদিও সে তাদের গোত্রের ছিল না। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আল আখনাস বললো, 'আমি যেহেতু কুরাইশদের মিত্র, কুরাইশদের কথার বাহিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কাউকে আমি আশ্রয় দিতে পারি না যে আমার বন্ধুর শত্রু।' সে রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুরোধ ফিরিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহাইল ইবন আমরের কাছেও একই সংবাদ পাঠালেন। সুহাইল ইবন আমরও তাঁকে ফিরিয়ে দিল, 'আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারবো না, কারণ আমর ইবন লুহাই বংশের হয়ে আমি এমন কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারি না যে কা'ব ইবন লুহায়ের বংশভুক্ত।' এ দুই বংশের মধ্যে রেষারেষি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবার মুতইম ইবন আদীর কাছে নিরাপত্তা চেয়ে সংবাদ পাঠালেন। মুতইম ইবন আদী এ অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিরাপত্তা দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং সেখানেই রাতে অবস্থান করলেন।

আল মুতইমের ছিল ছয় বা সাত সন্তান। সে তাদেরকে আদেশ দিল যেন তারা পরের দিন সকালে বিশেষ পোশাক পরিধান করে প্রস্তুত থাকে। এরপর তারা বাবার নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বেষ্টনী দিয়ে কাবার দিকে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফ করা শুরু করলেন। আল মুতইম ও তার ছেলেরা নির্দিষ্ট দূরত্বে বসে তাঁকে পাহারা দিতে থাকল। এসময় আবু সুফিয়ান মুতইমের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি তাঁকে শুধু নিরাপত্তা দিচ্ছ নাকি তাঁকে অনুসরণও করছ?' মুতইম বললো, 'আমি তাঁকে অনুসরণ করছি না, শুধু তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।' এরপর আবু সুফিয়ান বললো, 'তাহলে ঠিক আছে, যদি শুধু নিরাপত্তা দিয়ে থাকো তাহলে আমাদের আপত্তি নেই।' [44]

---

[44] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতইমের আশ্রয়ে থেকে মক্কায় দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেলেন। আবু তালিব ও খাদিজার ﷺ মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ্য করলেন যে, মক্কায় ইসলামের দাওয়াত স্তিমিত হয়ে পড়েছে। যদিও মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামে প্রবেশ করছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা মক্কায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি ঘাঁটি বা কেন্দ্রীয় ভূমির প্রয়োজন অনুভব করলেন যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জের মৌসুমে মক্কায় আগত আরবের বিভিন্ন নেতার সাথে সাক্ষাৎ করা শুরু করলেন। তিনি তাদের ছাউনিতে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, নিজের নবী-পরিচয় তুলে ধরতেন এবং তাঁকে আশ্রয় ও সমর্থন দেওয়ার জন্য আহ্বান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলতেন,

> *'আপনাদের উপর জোর খাটানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আপনারা চাইলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন, তবে আপনাদের উপর কোনো জোরাজুরি করবো না। আমি শুধু আমার শত্রুদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাই, আমি চাই আমার রব আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পূরণ করতে পারি এবং তিনি আমার ও আমার অনুসারীদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করেন তা মেনে নিতে পারি।'*

কিন্তু সবাই তাঁকে ফিরিয়ে দিল, কেউই তাঁকে নিরাপত্তা ও সমর্থন দিতে রাজি হলো না। সবগুলো গোত্রের নেতা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো, 'তার গোত্রের লোকেরাই তাঁকে সবচেয়ে ভালো চেনে। এমন লোককে আমরা কীভাবে আশ্রয় দিতে পারি যে তার নিজের গোত্রের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং গোত্রের লোকেরাই তাঁকে বের করে দিয়েছে। যেহেতু তার স্বগোত্রীয়রাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কাজেই আমরাও এই লোককে আশ্রয় দেব না।' মোটামুটিভাবে সবগুলো গোত্রই তাঁকে এভাবে ফিরিয়ে দিল।[45]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিন্দা বংশের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলেন কিন্তু তারা তা গ্রহণ করলো না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ গেলেন বনু আবদুল্লাহর কাছে, তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন এবং বললেন, 'দেখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য কত সুন্দর একটি নাম ঠিক করেছেন, তোমরা হলে আবদুল্লাহর (আল্লাহর বান্দার) পুত্র।' কিন্তু অন্যান্যদের মতো তারাও তাঁকে ফিরিয়ে দিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ গেলেন বনু হানিফা গোত্রের কাছে। তারা তাঁর সাথে প্রচণ্ড বাজে ব্যবহার করলো, আয-যুহরি এ ব্যাপারে বলেছেন, 'বনু হানিফার মতো এত রূঢ় আচরণ আর কোনো গোত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে করেনি।' এই বনু হানিফা গোত্রই কয়েক বছর পরে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর কিছুদিন আগেই এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এর পরিসমাপ্তি ঘটে আবু বকর সিদ্দীকের ﷺ

---

[45] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬১।

খিলাফতকালে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল মুসাইলামাহ আল কাযযাব। সে নিজেকে নবী দাবি করেছিল।

এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আমর ইবন সাসা গোত্রের সেনাছাউনিতে গেলেন। এই গোত্রের নেতা ছিল বুহায়রা ইবন ফারাস। সে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করলো এবং তাঁর কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেল। সে বললো, 'আমি কসম খেয়ে বলছি, যদি কুরাইশের এই সাহসী যুবক আমার সাথে থাকত তাহলে আমি তাকে পুঁজি করে আরবদের শেষ করে দিতাম।' পুরো বিষয়টির মাঝে বুহায়রা ক্ষমতার গন্ধ পাচ্ছিল। সে দেখল যে মুহাম্মাদের ﷺ মধ্যে এমন কিছু অসাধারণ গুণাবলি রয়েছে যার কারণে তিনি আর সবার থেকে আলাদা, তাঁর মতো লোককে নিজের পক্ষে পাওয়া গেলে পুরো আরব জয় করা সহজ হয়ে যাবে। বুহায়রা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, যদি আমরা আপনাকে মেনে চলি আর আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রুদের বিপক্ষে আপনি জয়লাভ করেন, তাহলে কি আপনি মারা যাওয়ার পর আমরা ক্ষমতায় যাবো?'

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই ক্ষমতা দেবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছেন, ক্ষমতায় কে আছে তা আসল কথা নয়, আসল কথা হলো দ্বীনের বিজয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ কথা শুনে বুহায়রা বললো, 'তাহলে আমাদের কী দায় পড়েছে যে আমরা আরবদের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনাকে নিরাপত্তা দেব? আমরা আপনার জন্য যুদ্ধ করবো আর আপনি বিজয়ী হলে অন্য কারো হাতে ক্ষমতা চলে যাবে আর আমরা বসে বসে দেখবো?' বুহায়রাও রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল।

বনু আমর ইবন সাসা হাজ্জ থেকে নিজ দেশে ফিরে গেল। তাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যিনি বার্ধক্যের কারণে হাজ্জে যেতে পারতেন না, কিন্তু কেউ হাজ্জ থেকে ফিরে আসলে তিনি তাদেরকে হাজ্জে কী কী ঘটেছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। তারা তাঁকে জানালো, 'এক যুবকের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল। তিনি হলেন কুরাইশের আবদুল মুত্তালিবের নাতি। তিনি নিজেকে আল্লাহর নবী হিসেবে দাবি করেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁকে পাত্তা দিই নি।' এ কথা শুনে সেই বৃদ্ধ লোক মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'হায়! হায়! এ তোমরা কী করলে! যে ভুল করেছো তা শোধরাবার কোনো উপায় আছে কি? আছে কোনো উপায় বিষয়টি সমাধা করার? আমি কসম করে বলছি, ইসমাঈলের কোনো উত্তরসূরি আজ পর্যন্ত এরকম কোনো মিথ্যা দাবি করেনি। কুরাইশের সেই যুবক যা দাবি করেছে তা অবশ্যই সত্য। কোথায় গেল তোমাদের বিচারবুদ্ধি?'[46]

এই বৃদ্ধ লোকটি বলেছিলেন, ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্যে কেউই এ পর্যন্ত নবী হওয়ার দাবি করেনি – এর মানে হলো তৎকালীন আরবদের মধ্যে নবুওয়াতের প্রচলন

[46] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬১।

ছিল না। রিসালাত সম্পর্কে তৎকালীন আরবদের কোনো ধারণাই ছিল না। তারা ছিল অশিক্ষিত জাতি। তাই তিনি বলেছিলেন যে মুহাম্মাদ ﷺ যা দাবি করেছেন তা অবশ্যই সত্য।

আবু নাঈম, আবু হাকিম ও বাইহাকি থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে। আবু বকর সিদ্দীকের ؓ সাথে এক বেদুইনের একটি মজার কথোপকথন আছে, সেটি বর্ণনা করেছেন আলী ؓ।

'যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ﷺ আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে নির্দেশ দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও আবু বকরকে সাথে নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন।' হাজ্জে আগত ব্যক্তিদের থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা মিনাতেই করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে দেখা করার জন্য এখানে এসেছিলেন। তিনি সবসময় আবু বকরকে ؓ সাথে নিয়ে বের হতেন। কারণ আবু বকর ؓ আরবদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত খুব ভালো করে জানতেন। বিভিন্ন গোত্রের ইতিহাস, তাদের নাম, অতীত কাহিনি – এসব তথ্য ছিল তাঁর নখদর্পণে। এই কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে এই কাজে সাথে রাখতেন, আবার আবু বকর ؓ বেশ সুপরিচিত ব্যক্তিও ছিলেন।

আবু বকর ؓ ছিলেন সবার সামনে। তিনি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন সকল ভালো কাজে অগ্রগামী, আর আরবদের বংশবৃত্তান্তের ব্যাপারেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।' তাঁরা একটি গোত্রের কাছে গেলেন। আবু বকর ؓ তাদের স্বাগত জানালেন, তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

- আমরা এসেছি রাবিআ থেকে।

রাবিআ ছিল আরবের উত্তর-পূর্ব দিকের একটি গোত্র। এটি বেশ বড় গোত্র ছিল। তাই আবু বকর ؓ এ বংশ সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে আগ্রহী হলেন। তিনি বললেন,

- তোমরা কি কপাল (উচ্চবংশ) থেকে এসেছ নাকি নীচ থেকে (নিম্নবংশ)?

- আমরা এই গোত্রের মূলধারার মধ্যে সেরা।

অর্থাৎ তারা ছিল পুরো গোত্রের মাঝে সেরা। আবু বকর ؓ তাদের এই দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য নিজেই তাদের সাথে আলাপ শুরু করলেন।

- আচ্ছা, আওফ কি তোমাদের সেই লোক যার সম্পর্কে বলা হয় যে তার উপত্যকায় কেউই স্বাধীন নয়?

- না।

এই আওফ লোকটি ছিল রাবিআ বংশের। সে ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব, উপত্যকার লোকেরাও তার বশ্যতা স্বীকার করে চলত। এ কারণে লোকেরা বলতো যে 'তার উপত্যকায় কেউই স্বাধীন নয়'। এরপর আবু বকর ﷺ তাদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন।

- আচ্ছা, তাহলে বুস্তান ইবন কাইস, আবুল লুওয়া এবং মুস্তাহিল আহইয়া – এরা কি তোমাদের লোক?

- না।

- তবে কি রাজাদের খুনি ও তাদের আত্মা হরণকারী – আল হাওফাযান ইবন শুরাইক তোমাদের জ্ঞাতি ভাই?

- না।

- ইজ্জতের রক্ষক ও প্রতিবেশীর বন্ধু - জাসসাস ইবন মুররা, সে কি তোমাদের গোত্রীয়?

- না।

- অনন্য পাগড়ীধারী সেই আল মুযদালাফ – সে কি তোমাদের কেউ?

- না।

- আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্দার রাজাদের সাথে কি তোমাদের কোনো সম্পর্ক আছে?

- না।

- লাখামের রাজাদের সাথে?

- না।

- তার মানে বোঝা গেল তোমরা গোত্রের মূলধারার কেউ নও, তোমরা শাখাগোত্র থেকে এসেছ।

আবু বকরের প্রশ্নবাণে তারা রীতিমত কাবু হয়ে গেল। বাইরে থেকে কেউ একজন এসে তাদেরকে এভাবে অপদস্ত করবে তা রাবিআ গোত্রের মোটেও সহ্য হলো না। উঠে দাঁড়ালো তাদের এক যুবক। সবে মাত্র দাড়ি গজানো এই যুবকের নাম ছিল দারফাল। সে আবু বকরের ﷺ উটের লাগাম ধরে বলে উঠল, 'যারা আমাদেরকে প্রশ্ন করে, আমরাও তাদের প্রশ্ন করবো। আর আমাদের কথার প্রমাণ দিতে আমরা বাধ্য নই। আপনি তো আমাদেরকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করেছেন আর আমরা কোনো কিছুই গোপন করিনি, সবকিছুর উত্তর দিয়েছি। এখন আমরাও আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। বলুন, আপনি কে?'

- আমি কুরাইশের লোক।

- হুম, তাহলে আপনারা হলেন নেতৃত্বদানকারী ও অভিজাত সম্প্রদায়, আরবদের পথপ্রদর্শনকারী। তা আপনি কুরাইশের কোন অংশ থেকে এসেছেন?

- আমি এসেছি বনু তাইম ইবন মুররা থেকে।

বনু তাইম ছিল কুরাইশের ছোটোখাটো একটি গোত্র, তেমন নামডাক ছিল না। যুবকটি আবু বকরকে ﷺ ঘায়েল করার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে গেল, সে বললো,

- আপনি তো শিকারীকে তার লক্ষ্যস্থল দেখিয়ে ফেলেছেন! আচ্ছা বলুন তো, কুসাই ইবন কালাব কি আপনার গোত্রীয় লোক যে মক্কা বিজয় করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে? সেই কুসাই যে সবাইকে বের করে দিয়ে নিজের লোকদের মক্কায় ঢুকিয়েছিল? মন্দির দখল করে সেখানে কুরাইশদের বসতি স্থাপন করেছিল এবং যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'ঐক্যবদ্ধকারী'! যার ব্যাপারে কবি কবিতা লিখেছিল – তুমি কি সেই পিতার পুত্র নও যিনি এক করেছিলেন ফিহরের গোত্রগুলো?

- না, আমরা আব্দে মানাফের লোক নই, তারা উপদেশ দানে সেরা।

- তবে কি আবুল ঘাদারে, মহানেতা, আবি আস সাক – সে তোমাদের নেতা নয়?

- না।

- তবে কি আমর ইবন আবদুল মুনাফ হাশিম – যিনি নিজের লোক ও মক্কাবাসীর জন্য রুটি ও গোশত তৈরি করেছিলেন, তিনি আপনার বংশীয় লোক নন? যার ব্যাপারে কবি বলেছেন – আমর আল উলা তার লোকেদের জন্য তৈরি করেছিলেন সারীদ, যখন মক্কার লোকেরা ছিল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ও অভাবী? যে ছিল শীত ও গ্রীষ্মের মুসাফির? কুরাইশরা যদি ডিম হয়, তবে সেই ডিমের কুসুম হলো আবদুল মানাফ। তাদের মতো সম্পদশালীও আর কেউ ছিল না আর তারা অতিথিদের কখনো ফিরিয়ে দিত না। তারা অপরাধীদের শায়েস্তা করতো আর নিরীহদের রক্ষা করতো নিজেদের তরবারির দ্বারা। আপনি যদি তাদের বাড়িতে থাকেন তবে তারা আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, আপনাকে নিরাপত্তা দিবে। সেই আমর কি আপনার গোত্রীয় ব্যক্তি নয়?

- না। আমর আমার গোত্রের নয়।

- তবে আপনি কি সেই আবদুল মুত্তালিবের আত্মীয়, যিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, মক্কার কাফেলার রক্ষক, আকাশের পাখি, বন্য পশু ও মরুভূমির সিংহের খাদ্যের যোগানদাতা? যার চেহারা জ্বলজ্বল করতো অন্ধকারে চাঁদের মতন?

- না।

- তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ওই লোকদের মধ্য থেকে এসেছেন যারা ইফাদার সুযোগ পায়।

- না।

- তাহলে বোধ করি আপনি তাদের মধ্য থেকে এসেছেন যারা হিজাবার সুবিধা পায়।

- না।

- তা না হলে নিশ্চয়ই আপনি নাদওয়ার সুবিধা পাওয়া লোকদের একজন।

- না।

- তাহলে নিশ্চয়ই আপনি সিকায়ার সুযোগ পাওয়া ব্যক্তিদের একজন।

- না।

- আচ্ছা, তবে কি আপনি রিফাদা প্রদানকারীদের একজন?

- না।

তিনি সব প্রশ্নের উত্তরে না বলে যাচ্ছিলেন। যুবকটি তাঁকে এত প্রশ্ন করছিল যে তিনি বিরক্ত হয়ে আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি যুবকটির হাত থেকে উটের লাগাম টেনে নিলেন। তখন সেই যুবক একটি কবিতার লাইন আবৃত্তি করছিল, 'তোমার (প্রশ্নের) ঢেউ আরো বড় ঢেউয়ের মুখোমুখি। আমার এই ঢেউ তোমাকে প্রথমবার থামিয়ে দেবে, আর দ্বিতীয়বার ভাসিয়েই নিয়ে যাবে। আমি কসম খেয়ে বলছি আমার কুরাইশ ভ্রাতা, তুমি যদি আরেকটু দাঁড়িয়ে থাকতে, আমি প্রমাণ করে ছাড়তাম তুমি হলে কুরাইশদের সবচেয়ে নিম্নগোত্র থেকে উঠে আসা লোক।'

এই কথোপকথন শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে হাসতে সেখান থেকে আসলেন। আলী ؓ আবু বকরকে ؓ বললেন, 'হায়! এই বেদুইন দেখি আপনার অবস্থা খারাপ করে ফেলেছে!' আবু বকর ؓ বললেন, 'হুম, দুর্যোগের পর আরেক দুর্যোগ, আর মানুষের মুখের কথা থেকে কতই না দুর্যোগের সৃষ্টি।'[47]

আলী ؓ বর্ণনা করেন, 'এরপর আমরা একটি বৈঠকে গেলাম। সেখানের মানুষগুলো ছিল শান্ত প্রকৃতির ও গম্ভীর। আমরা তাদেরকে স্বাগত জানালাম। আবু বকর ؓ তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? তারা বললো, আমরা বনু শাইবান থেকে এসেছি। আবু বকর ؓ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে জানালেন, এই লোকগুলো শক্তিশালী এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এরপর আবু বকর ؓ গোত্রের নেতাদের কাছে গেলেন। ওই দলের নেতৃত্বে ছিল মাফরুক ইবন আমর, হানি ইবন কুবাইসা, মুসান্না ইবন হারিস এবং নউমান ইবন শুরাইক । তাদের মধ্যে মুফরুক ইবন আমরের সাথে আবু বকরের আগে থেকেই ভালো পরিচয় ছিল। মুফরুকের চুলে ছিল দুটি বেণী, সেগুলো বুক পর্যন্ত নেমে এসেছিল।

আবু বকর ؓ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনাদের লোকবল কেমন?

- আমাদের আছে এক হাজারেরও বেশি শক্তিশালী লোক, অল্পসংখ্যক লোক তাদেরকে হারাতে পারবে না, মাফরুক জবাব দিল।

- আপনাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা?

---

[47] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫।

- আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, যেমনটা অন্য সকলের থাকে।

- শত্রুদের সাথে যুদ্ধে তোমরা কেমন নৈপুণ্য দেখাও?'

- যুদ্ধের সময় আমরা থাকি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, যুদ্ধের ঘোড়া নিয়ে আমাদের যত গর্ব, আমাদের সন্তানদের নিয়ে ততটা নই। আমরা আমাদের তলোয়ারের যতটা যত্ন নিই, আমাদের উটের তত যত্ন নিই না। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধে সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, কখনো আমরা জয়ী হই, কখনো আমাদের শত্রুরা। আচ্ছা ভালো কথা, আপনাকে তো কুরাইশের লোক মনে হচ্ছে?

- হ্যাঁ, আমি কুরাইশের লোক। আপনারা কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা শুনেছেন?

- হ্যাঁ, আমরা শুনেছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ ।

এরপর মাফরুক রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সরাসরি কথা বলতে চাইল। আবু বকর ﷺ তাদের কথা বলার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, মাফরুক বললো, 'হে কুরাইশের ভাই, আপনি আমাদের সামনে কী উপস্থাপন করতে চান?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুরু করলেন,

'আমি আপনাদেরকে এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি হচ্ছি আল্লাহর রাসূল। আমি আপনাদের কাছে আমাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যতক্ষণ না আমি আল্লাহর দেওয়া আদেশ পালন করে যেতে পারি। কুরাইশরা আল্লাহ তাআলার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করেছে। তারা সত্যের পথ ছেড়ে দিয়ে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই প্রশংসার যোগ্য।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ কথাগুলো মাফরুকের মনে ধরলো। সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ আরও কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আল আনআম থেকে কিছু আয়াত পাঠ করে শুনালেন। এরপর মাফরুক বললো, 'হে কুরাইশের ভাই, আপনি আমাদেরকে আর কী বলতে চান? আমি কসম করে বলছি, আপনি যা বললেন তা এই দুনিয়ার কোনো মানুষের বানানো কথা নয়, যদি তাই হতো তাহলে আমরা অবশ্যই জানতাম।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেকে সূরা নাহলের কিছু আয়াত শোনালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে ইসলামের কথা বললেন। এসময় হানি ইবন কুবাইসা বললো, 'আমরা তো একাকী এসেছি, আমাদের সাথে অনেকেই আসেনি, সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের ছাড়া আমরা একাকী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।' সে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা পছন্দ করেছিল, কিন্তু গোত্রের অন্যান্যদের সাথে আলোচনা না করে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায়নি। মাফরুক আরো বলেছিল, 'আমি মনে করি, শুধুমাত্র একটা বৈঠকের উপর নির্ভর করে, কোনো ধরনের পূর্ব পরিচিতি বা পরবর্তী

বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ না করে, পুরো বিষয়টি আগপাশ এবং ভবিষ্যত চিন্তা না করে যদি আমরা আমাদের দ্বীন ত্যাগ করে আপনার দ্বীন গ্রহণ করি, তাহলে সেটা হবে তাড়াহুড়া ও অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত।'

এখানে লক্ষণীয়, একেক গোত্রের আচরণ একেক রকম। আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তারা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বনু শায়বার হানি বলেছিল, 'কোনো ধরনের পরিচিতি বা পরবর্তী সাক্ষাতের নিশ্চয়তা ছাড়া আমরা এখনই ইসলাম গ্রহণ করতে পারি না।' তাদের ধর্মীয় নেতা হারিসা বলেছিল, 'আমি আপনার কথা শুনেছি। আপনি যা বলেছেন তা আমার ভালো লেগেছে।' তারা সকলেই রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় অভিভূত হয়েছিল। হারিসা বললো, 'আমি আপনার কথা শুনে বিমোহিত। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে হানি ইবন কুবাইসা যা বলেছে আমিও তার সাথে একমত। মাত্র একবার সাক্ষাতের উপর ভিত্তি করে নিজেদের দ্বীন ত্যাগ করে আপনাকে অনুসরণ করা ... বিষয়টাকে তুলনা করা যায় দুটো জলাবদ্ধ এলাকা – আল-ইয়ামামা ও আস-সামাওয়ার মাঝে নিজেদের ঠেলে দেওয়ার মতো।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এই কথাটি বুঝতে পারেননি। তাই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দুটো জলাবদ্ধ এলাকা বলতে?' মুসান্না উত্তর দিল, 'একটি হলো আরব বিশ্ব, অপরটি হলো পারস্য ও কিসরার নদী। কিসরার সাথে আমাদের এই মর্মে চুক্তি আছে যে, আমরা তাদের সাথে কোনো ঝামেলা করবো না এবং ঝামেলা করতে পারে এমন কাউকে আশ্রয় দেব না। আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা পারস্যের রাজা পছন্দ করবে না। আরবের সীমান্তবর্তী ভূমিগুলোর ক্ষেত্রে এটা সমস্যা নয়। আপনাকে আশ্রয় দিলে তারা হয়তো ক্ষমা করে দেবে আর অজুহাতও গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু এই কাজ যদি পারস্যের সাথে করা হয় তাহলে তারা মেনে নেবে না। আর যদি আপনি বলেন আমাদের এলাকার মধ্যে আপনাকে প্রতিরক্ষা দিতে হবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই, আমরা তাতে রাজি আছি।'

বনু শাইবার এলাকা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্তে, তাদের মধ্যে কিছু চুক্তি হয়েছিল। মুসান্না এ ব্যাপারে বলেছিল, 'পারস্যের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে যে সমস্যা-করতে-পারে এমন কাউকে আমরা আশ্রয় দিব না। আর আপনি যে দ্বীনের কথা বলেছেন তা রাজার কাছে পছন্দনীয় হবে না।' সে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিল যে ইসলাম এমন দ্বীন যা রাজাদের অপছন্দের কারণ, কারণ বেশিরভাগ রাজা জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে চায় না, তারা চায় নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে। কিন্তু ইসলাম এসেছে মানুষকে এই দুনিয়াবি দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহ তাআলার দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। মুসান্না পারস্যের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দিতে অপারগ ছিল তবে তারা আরবের দিক থেকে নিরাপত্তা দিতে রাজি ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সব শুনে বললেন, 'তোমরা খারাপ কিছুই বলোনি, কোনোকিছু গোপন করোনি, যা বলার তা সরাসরি ও সুন্দরভাবে বলেছো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এই দ্বীন তাদের হাতেই ন্যস্ত করা হবে, যারা সবদিক থেকে প্রতিরক্ষা করতে সমর্থ আছে।'[48] রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্ধেক চুক্তি করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সামগ্রিক নিরাপত্তা, পরিপূর্ণ অঙ্গীকার।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় হলো, যেকোনো আলোচনা বা মীমাংসায় আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সব কিছুর উপরে স্থান দিতে হবে। ইসলামের ব্যাপারে কোনো ধরনের দরকষাকষি কিংবা আপোস করা যাবে না। যদি কোনো চুক্তি ইসলামি বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে সেই চুক্তি করা যাবে না। এই ঘটনাটি এমন এক সময়ের যখন মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, সেখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তাঁর জন্য মক্কা ত্যাগ করা খুবই জরুরি ছিল, কিন্তু তারপরও তিনি বনু শায়বার আংশিক অঙ্গীকারের এই চুক্তিতে রাজি হননি। পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন তিনি আপসের চুক্তিতে রাজি হননি। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের স্বরূপ।

ইসলামের দূর্গ: আল-আনসার

আওস ও খাযরাজের ইসলামে প্রবেশ

ইবন ইসহাক আল-আনসারদের ইসলামে আসার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। আল-আনসার ছিল দুটি গোত্র – আল আওস এবং আল খাযরাজ। এ দুটো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে তাদেরকে একসাথে বলা হতো আল-আনসার, 'আনসার' মানে রক্ষক। এ দুটি আরব গোত্র মদীনায় থাকত, কাহতান শাখার বংশধর। আরবরা আদনান ও কাহতান নামক দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। ইয়েমেনের আরবদেরকে কাহতান বলা হতো, আর আদনান হলো ইসমাঈলের ﷺ বংশধর। আওস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে মদীনাতে তখন তিনটি ইহুদি গোত্র বাস করতো – বনু নাযির, বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযা। মদীনা শহরটির ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ছিল অন্যান্য শহর থেকে আলাদা, এর তিনদিক ঘেরাও ও নিরাপদ ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ছিল পাথুরে রাস্তা। সেখান দিয়ে মদীনা আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না, আর দক্ষিণ দিক কৃষিজমির গাছগাছালিতে ভরা ছিল। সুতরাং শুধুমাত্র উত্তর দিক থেকে শত্রুপক্ষ মদীনাকে আক্রমণ করতে পারত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জে আগত খাযরাজ গোত্রের ছাউনিতে গেলেন। ভেতরে ঢুকে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনারা কারা?

---

48 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭।

- আমরা আল খাযরাজ গোত্র থেকে এসেছি।

- আপনাদের সাথে কি ইহুদিদের মিত্রতা আছে?

- হ্যাঁ, আছে।

- আচ্ছা, আমি কি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে পারি?

তারা রাজি হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শোনার প্রতি তাদের খুবই আগ্রহ ছিল। তারা ইসলামের দাওয়াত পেয়েই তা গ্রহণ করলো এবং বললো,

'আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে এসেছি কারণ তাদের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা আর রেষারেষি লেগেই আছে, এমনটি আর কোথাও পাবেন না। হয়তোবা আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে আবার একত্রিত করতে পারেন। আমরা তাদের কাছে গিয়ে এই দ্বীন ইসলামের কথা তাদের কাছে তুলে ধরব। যদি আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাদেরকে একত্রিত করে দেন, তাহলে আপনার চেয়ে প্রিয় মানুষ আমাদের চোখে আর কেউ হবে না।'[49]

ছয়জনের এই ছোট্ট দলটি কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ইসলামের দাওয়াত পাওয়ামাত্রই তা গ্রহণ করে নিয়েছিল যা অন্য আরব গোত্ররা করেনি। এর পেছনে কিছু কারণ আছে। সেগুলো হলো,

১. মদীনাবাসীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যন্তরীণ সংঘাত চলছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ আর রক্তপাত হয়ে আসছিল, কিন্তু তারা চাচ্ছিল এর অবসান হোক। তাই যখন তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শুনল তখন এই ভেবে তারা আশান্বিত হলো যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের ﷺ মাধ্যমে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিতে পারেন।

২. ইহুদিরা তাদের প্রতিবেশী হওয়ায় তাওহীদ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ধারণার সাথে তারা পরিচিত ছিল এবং তাদের কাছে তাওহীদের ধারণার বিশেষ আবেদন ছিল। আরবরা সব সময় ইহুদিদের দ্বীনকে নিজেদের দ্বীনের চেয়ে শ্রেয় মনে করতো। এর কারণ, ইহুদিরা ছিল শিক্ষিত; তাদের কাছে কিতাব ছিল, দ্বীনের জ্ঞান ছিল। অন্যদিকে আরবদের দ্বীন বিভিন্ন উপকাহিনি আর পূর্বপুরুষদের রীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে জঘন্য কিছু রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, যেমন: কন্যা সন্তান জীবন্ত হত্যা করা। ইহুদিরা যদি অহংকার ও পক্ষপাতী না হতো, তাহলে আরবরা হয়তোবা তাদের দ্বীন গ্রহণ করতো।

---

[49] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৬।

৩. আরব ও ইহুদিদের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল হলেই ইহুদিরা তাদের হুমকি দিত, 'শীঘ্রই একজন রাসূলের আগমন ঘটবে। আর যখন তিনি আবির্ভূত হবেন তখন আমরা তাঁকে অনুসরণ করব এবং আদ জাতিকে যেভাবে শেষ করা হয়েছে আমরাও তোমাদেরকে সেভাবে শেষ করে দেব।' অর্থাৎ আরবদের জানা ছিল যে ওই সময়ে একজন রাসূলের আগমন ঘটবে। এভাবে নবুওয়াতের ব্যাপারে আওস ও খাযরাজ আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল।

৪. রাসূলুল্লাহর ﷺ হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে আল আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বুয়াস নামে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে দুই গোত্রেরই অনেক নেতা মারা যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বশূন্যতা সৃষ্টি হয়, যে কারণে তারা নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে ছিল। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা জানামাত্র তেমন কোনো আপত্তি ছাড়াই তারা তাঁকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়।

মূলত এসব কারণেই মদীনা ইসলামের প্রসারের জন্য উপযুক্ত ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। আ'ইশা ؓ বলেছেন, *'বুয়াসের যুদ্ধ ছিল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহর হিজরতের জন্য নির্ধারিত একটি প্রস্তুতি। এ যুদ্ধে তাদের প্রায় সব নেতা মারা পড়ে।'* সাধারণত সমাজের নেতা ও ক্ষমতাসীন লোকেরা সত্যের বিপরীতে কট্টর অবস্থান নেয়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আওস ও খাযরাজের নেতারা মারা যাওয়ায় ইসলামের পথে তাদের যাত্রা সুগম হয়। ইবন ইসহাক বলেছেন, 'ইহুদিদের সাথে একই ভূমিতে থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ইসলাম গ্রহণ আরও সহজ করে দিয়েছেন। ইহুদিরা ছিল কিতাবের অনুসারী, তাদের অনেক জ্ঞান ছিল। অন্যদিকে আল আওস ও খাযরাজের লোকেরা ছিল মুশরিক এবং মূর্তিপূজারী। তারা এর আগে ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ভূমি কেড়ে নিয়েছিল। যখনই মুশরিকদের সাথে ইহুদিদের কোনো ঝামেলা বাঁধত তখন ইহুদিরা বলতো, একজন রাসূলকে পাঠানো হবে। তিনি আসছেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করবো এবং আদ জাতির ভাগ্যে যা ঘটেছিল তোমাদেরকেও সেই একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।'

আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারার ২১৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, "তুমি হয়ত কোনো জিনিস অপছন্দ কর, কিন্তু তাতেই তোমার জন্য ব্যাপক কল্যাণ রয়েছে।" আওস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত বুয়াসের যুদ্ধটি ছিল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যদিও এ যুদ্ধে দুই গোত্রেরই অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু তা তাদের ইসলামে প্রবেশের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

বাইয়াতের প্রথম শপথ

সেই ছয়জন পুণ্যবান লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'আমরা দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের লোকদের ইসলামের পথে আসার জন্য আহ্বান করবো।' মদীনায় ফিরে যাওয়ার আগে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে পরের বছর হাজ্জের মৌসুমে দেখা করার কথা দিল। বছর ঘুরে আবার ফিরে এল হাজ্জের মৌসুম। এবার

ছয়জনের পরিবর্তে এল বারোজন, ছয়জন ছিল আগের বছরের আর বাকি ছয়জন নতুন। প্রথম বছরে ইসলাম গ্রহণকারী ছয়জন ছিলেন আল খাযরাজ গোত্রের; অন্য আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে পাঁচজন ছিলেন আল খাযরাজ গোত্রের আর বাকি একজন এসেছিলেন আল আওস থেকে। দ্বিতীয় বছরে আল খাযরাজ থেকে ছিলেন দশজন এবং আল আওস থেকে দুইজন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বাইয়াত দিলেন। বাইয়াতের ভাষ্য ছিল এমন:

'আকাবার প্রথম বৈঠকের রাতে রাসূলুল্লাহর কাছে এই মর্মে বাইয়াত দেওয়া হয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমরা ব্যভিচারের ধারে কাছে যাবো না, সন্তান হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেব না এবং ভালো কাজে তাঁর বিরোধিতা করবো না। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যদি তোমরা এগুলো মেনে চলতে পার তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে। আর যদি কোনো পাপ করে ফেল এবং সেই পাপের শাস্তি যদি এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি দুনিয়াতে পাপের শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ওই পাপের জন্য শেষ বিচারের দিন শাস্তি দিতেও পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।'

সাধারণত, মহিলারা এই মর্মে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাইয়াত করতেন। এই বাইয়াতে জিহাদের ব্যাপারে অঙ্গীকার ছিল না বলেই একে *বাইয়াতুন নিসা* বা মহিলাদের বাইয়াত বলা হয়।

এখানে একটি ফিক্বহী বিষয় লক্ষণীয়: এই বাইয়াতে যেসব গুনাহ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই হলো কবীরা গুনাহ – ব্যভিচার, সন্তানদের মেরে ফেলা, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, ভালো কাজে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে এই দুনিয়াতে থাকতেই যদি গুনাহের শাস্তি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে গুনাহকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর যদি বেঁচে থাকতে শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে গুনাহকারীকে শেষ বিচারের দিন ক্ষমা করে দেওয়া হবে নাকি শাস্তি দেওয়া হবে তা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার মুসলিমদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসআব ইবন উমাইরকে ؓ মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধি, শিক্ষক ও আলিম। মুসআব ছিলেন কুরাইশের এক ধনী পরিবারের সন্তান। মুসলিম হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন মক্কার সবচেয়ে উচ্ছন্নে যাওয়া যুবক, তাঁর পরনে থাকতো সবচেয়ে দামি সব জামাকাপড়, শরীরে থাকতো নিত্যনতুন সুগন্ধির ঘ্রাণ। তাঁর মা ছিলেন অনেক ধনী। মুসআব ছাড়া তার আর কোনো সন্তান ছিল না, তাই একমাত্র ছেলেকে অনেক আদর করতেন। কিন্তু যখন মুসআব ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মা তাঁকে ত্যাগ করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেলেন। যে মুসআব শৈশব-কৈশোর-যৌবন কাটিয়েছিলেন প্রাচুর্যের মধ্যে, তিনিই হঠাৎ সহায়সম্বলহীন এক যুবকে পরিণত হলেন, জীবন হয়ে যায় রুক্ষ, কঠিন। মুসআব যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, তাঁকে দাফন করার জন্য

পর্যাপ্ত টাকাপয়সাও তখন ছিল না। তাঁর গায়ে যে জামাটি ছিল তা দিয়ে তাঁকে ঠিকমত ঢেকে রাখা যাচ্ছিল না। উপস্থিত সাহাবীরা ﷺ সেই দিনের কথা বর্ণনা দিয়েছেন, 'আমরা যখন তাঁর মুখ ঢাকার চেষ্টা করছিলাম তখন তাঁর পা বের হয়ে যাচ্ছিল, আবার পা ঢাকতে গেলে মুখ দেখা যেতো। আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললাম, এখন আমরা কী করবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদেরকে কাপড় দিয়ে মুসআবের মুখ আর কিছু ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দিতে বললেন।

মুসআব ইবন উমাইর ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনার প্রতিনিধি, তাঁর উপর অর্পিত এই দায়িত্ব ছিল বেশ কঠিন। তিনি মদীনায় থাকার জন্য মক্কা ত্যাগ করলেন। আল আওস ও খাযরাজের মধ্যে শত্রুতা থাকায় তিনি সালাতের ইমামতি করতেন, কারণ দুই গোত্রের কেউই অন্য গোত্রের ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতে চাইত না। মুসআব মদীনায় আসআদ ইবন যুরারার সাথে থাকতেন। তাঁরা সেখানকার এক বাগানে অন্যান্য মুসলিমদের সাথে দেখা করতেন। তাঁরা সেখানে মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। মুসআব তাদের সাথে নিয়মিত হালাকা করতেন। তাঁরা বসতেন মদীনার আওস-অধীনস্থ একটি এলাকায়। তখন পর্যন্ত মুসলিমদের অধিকাংশই ছিল খাযরাজ গোত্রের, আওসের অল্পসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসআব আওস গোত্রকে ইসলামের দিকে আগ্রহী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ কারণে তিনি আল আওসের এলাকায় গেলেন।

আওসের নেতাদের বিষয়টি পছন্দ হলো না। আওসের নেতা ছিলেন সাদ ইবন মুয়ায ও উসাইদ ইবন খুযাইর। মুসআব ও আসআদ ইবন যুরারাকে আওসের এলাকায় একসাথে দেখতে পেয়ে সাদ ইবন মুয়ায খুব বিরক্ত হয়ে তার বন্ধু উসাইদকে বললেন, 'তুমি ওই দুই লোকের কাছে গিয়ে বলো যে, আমরা চাইনা তাঁরা এখানে থেকে দুর্বল ও বোকা লোকদের বিভ্রান্ত করুক। আসআদ যদি আমার আত্মীয় না হতো তবে আমি নিজে গিয়েই এই কথা বলতাম।' আসআদের সম্মানে, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে সাদ চুপ করে ছিলেন, নিজে না গিয়ে উসাইদকে পাঠালেন।

অন্যদিকে, আসআদ খাযরাজ গোত্রের হলেও তিনি ছিলেন আওসের নেতার মামাতো ভাই, সে সুবাদে তিনিই ছিলেন মুসআবকে মেহমানদারি করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। সাদের বিরক্তি দেখে উসাইদ ইবন খুযাইর বর্শা হাতে নিয়ে মুসআব ও আসআদের সাথে কথা বলার জন্য তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। আসআদ মুসআবকে জানিয়ে দিলেন, 'যে লোকটা আসছে সে হলো উসাইদ, সে তার লোকদের নেতা। তাঁকে যতসম্ভব ইসলামের দিকে টানার চেষ্টা করো, সে যদি মুসলিম হয় তাহলে অনেকেই তার দেখাদেখি মুসলিম হবে।' মুসআব ইবন উমাইর বললেন, 'সে শুনতে চাইলে আমি অবশ্যই তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করবো।'

ইবন খুযাইর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে খুব রুক্ষভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, 'দেখ, আমরা তোমাদের এই এলাকার আশেপাশে দেখতে চাই না। আমরা চাই না তোমরা এখানকার দুর্বল ও অজ্ঞ লোকদের বিভ্রান্ত কর। নিজেদের জীবনের মায়া থাকে তো

এখান থেকে চলে যাও, না হলে এই হলো আমার বর্শা।' যখন তিনি তাদেরকে এভাবে হুমকি দিচ্ছিলেন, তখন হালাকায় অংশগ্রহণকারী নও মুসলিমদের একজন বলে উঠল, 'ওরা নয়, বরং তুমিই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছ...' এই বলে সে উসাইদের সাথে তর্ক শুরু করে দিল।

পরিস্থিতি সামাল দিতে মুসআব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা যা নিয়ে কথা বলছিলাম তা কি আপনি একটু শুনে দেখবেন? যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন আর ভালো না লাগলে অগ্রাহ্য করবেন।' উসাইদ বললেন, 'ঠিক আছে শুনবো।' তিনি সেখানে বসলেন। মুসআব তাঁকে কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন, ইসলামের ব্যাপারে কথা বললেন। মুসআবের কথায় উসাইদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করেছেন আসআদ, 'উসাইদ মুখে কিছুই বললো না, তাঁর চেহারাই বলে দিচ্ছিল ইসলাম তাঁর হৃদয় দখল করে নিয়েছে, তাঁর মুখে ছিল প্রচ্ছন্ন এক আভা – শান্ত, প্রসন্ন একটা ছাপ।'

মুসআবের বক্তব্য হলে উসাইদ তাঁকে বললেন, 'এ দ্বীনে প্রবেশ করতে হলে কী করতে হবে?' মুসআব তাঁকে বললেন, 'আপনি পবিত্র হয়ে আসুন, তারপর সালাত আদায় করুন।' পবিত্র হয়ে উসাইদ সালাত আদায় করলেন, এরপর মুসআবকে বললেন, 'আমি আপনার কাছে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছি যিনি মুসলিম হলে তাঁর দলের সব লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে।' এই বলে উসাইদ গেলেন সাদ ইবন মুয়াযের কাছে। উসাইদকে ফিরে আসতে দেখে সাদ বললেন, 'আল্লাহর কসম! যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, ভিন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে।' এটিকে বলে ফিরাসা, ফিরাসা হলো কারো চেহারা দেখে তাঁর সম্পর্কে বলে দেওয়া, আরবদের মধ্যে এই রীতি ছিল।

সাদ ইবন মুয়ায জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' উসাইদ বললেন, 'সব ঠিকঠাক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না। আসলে একটু সমস্যা হয়েছিল, বনু হারিস (আল খাযরাজের একটি শাখা) যখন জানতে পারল যে আসআদ তোমার ভাই, তখন তারা শত্রুতাবশত তাকে খুন করতে চেয়েছিল।' পুরো ঘটনাটি উসাইদ বানিয়ে বললেন সাদ ইবন মুয়াযকে মুসআব ইবন উমাইরের কাছে পাঠানোর জন্য। উসাইদের মুখে এই কাহিনি কথা শুনে সাদ খুব রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'কী! তারা আমার ভাইকে খুন করতে চায়!' তিনি বর্শা নিয়ে ভাই আসআদকে রক্ষা করার জন্য চলে গেলেন এবং যাওয়ার সময় উসাইদকে বলে গেলেন, 'ধুর! তুমি আমার কোনো কাজেই আসলে না।' সাদকে আসতে দেখে আসআদ বললেন, 'মুসআব, যাকে আসতে দেখছ সে আওসের নেতা। তাকেও যতোটা পারো ইসলামের দিকে টানার চেষ্টা করো।' এদিকে সাদ ইবন মুয়ায তাদের দেখেই বুঝতে পারলেন যে উসাইদ ইচ্ছে করে গল্প ফেঁদেছেন, কারণ আসআদ বা মুসআব কাউকেই ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল না।

আসআদকে উদ্দেশ্য করে সাদ ইবন মুয়ায বললেন, 'আসআদ! তুমি কেন আমার সাথে এরকম করছ? এই লোককে কেন আমার এলাকায় নিয়ে এসেছ? তুমি আমার

সাথে তোমার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে এসব করছো, তুমি কি এই অশিক্ষিত, সহজসরল, অসহায় লোকগুলোকে বিপথে নিয়ে যেতে চাও?'

মুসআব তখন বললেন, 'কিছু মনে না করলে আমি কিছু কথা বলতে চাই, আপনি কি তা শুনবেন? যদি আপনার ভাল লাগে তাঁহলে তা গ্রহণ করবেন আর ভাল না লাগলে মানবেন না।' সাদ ইবন মুয়ায এ কথায় রাজি হলেন এবং তাঁর কথা শোনার জন্য বসলেন। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, মদীনাবাসীরা বেশ খোলা মনের ছিল, মক্কার লোকরা যেমন শত্রুভাবাপন্ন ছিল, মদীনাবাসীরা তেমন ছিল না। তারা অন্যের কথা শোনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। তাই মুসআবের কথা শোনার ব্যাপারে সাদ ইবন মুয়ায রাজি হলেন। মুসআব তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সাদ ইবন মুয়ায ইসলাম গ্রহণ করলেন, ইসলাম লাভ করলো দূর্গের চাবি।

মুসলিম হওয়ার পর সাদ ইবন মুয়ায ﷺ প্রথমে তাঁর লোকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী?' তারা বললো, 'আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং আমাদের নেতা।' তারপর সাদ ইবন মুয়ায বললেন, 'তাহলে তোমরা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত কেউ আমার সাথে কথা বলবে না আর আমিও তোমাদের সাথে কথা বলবো না।'

এই কথার পর সন্ধ্যার মধ্যেই বনু আসআদ গোত্রের প্রতিটি ঘরের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, আল আওসের এক বড় অংশের মাঝে ইসলামের আলো প্রবেশ করে।

আক্কাবার দ্বিতীয় শপথ

ইসলামের প্রথম বায়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আল-আকাবায়, এই ঘটনা বায়াত আল উলা নামে পরিচিত। মদীনায় ইসলাম প্রচারে মুসআব ইবন উমায়ের অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মানুষ সেখানে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী হাজ্জ মৌসুম চলে আসার আগে এমন অবস্থা হয় যে মদীনার প্রতিটি বাড়িতে একজন হলেও ইসলাম গ্রহণ করে। হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মদীনার নও-মুসলিমদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসলো। সত্তরের অধিক মুসলিম নিজ গোত্রের লোকেদের সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। মদীনা থেকে আসা প্রতিনিধি দলটির সাথে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই ছিল। যদিও গোপন বৈঠকটি ছিল শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ ও মুসলিমদের মধ্যে, কিন্তু তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় তাঁরা তাদের গোত্রের অমুসলিম সদস্যদের সাথে একসাথে এসেছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সাক্ষাত করতে আসে সত্তরের অধিক মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী।

কা’ব ইবন মালিক ও বারা ইবন মা’রুরের ঘটনা

সত্তর জন মুসলিমদের মধ্যে একজন ছিলেন কা’ব ইবন মালিক ﷺ, তিনি তাদের হাজ্জ যাত্রার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।[50]

‘আমরা সেবার হাজ্জ করতে মক্কায় যাই, আমাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মুসলিম আর কিছু লোক অমুসলিম। আমাদের মুসলিম দলের নেতা ছিলেন বারা ইবন মা’রুর, তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয়, প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের কাছে, অর্থাৎ মুসলিমদের কাছে এসে বললেন, আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত জানতে চাই, তোমরা আমার সাথে একমত হবে কিনা আমি জানি না। আমার মতামত হলো, সালাতের সময় কাবাঘরকে পেছনে রাখতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না।

বারা ইবন মা’রুর ﷺ কাবাকে পেছনে রেখে সালাত আদায় করতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। সে সময় কা’বা মুসলিমদের ক্বিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি। মদীনায় বসে জেরুসালেমের আল-আকসা মসজিদের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে গেলে কাবাঘর মুসলিমদের পেছনে পড়ে যেতো। এ কারণে বারা ইবন মা’রুরের মধ্যে অস্বস্তি কাজ করছিল।

কা’ব তাঁকে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ জেরুসালেমের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেন, সুতরাং আমরা তাঁর বিপরীত কাজ করবো না।’ বারা বললেন, “আমি কাবাঘরের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করবো।’ এরপর থেকে তিনি কাবাঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। এরপর তাঁরা মক্কায় এসে পৌঁছালেন। বারা তাঁর ভাতিজা কা’ব ইবন মালিককে বললেন, ‘ভাতিজা, আমাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিয়ে চলো। সফরে ক্বিবলা পরিবর্তন করা ঠিক হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করবো। তোমরা তো আমার কাজকে অনুমোদন দিলে না, তাই আমার খটকা হচ্ছে। চলো, রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করে দেখি আমার কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা।’ কা’ব মক্কার এক লোকের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় আছেন জানতে চাইলেন, সে বললো,

- আপনারা কি রাসূলুল্লাহকে ﷺ চেনেন? কখনো তাঁকে দেখেছেন?

- না, তাঁকে আমরা চিনি না।

- আচ্ছা, তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবকে চেনেন?

- হ্যাঁ তাঁকে আমরা চিনি।

- তাহলে আপনারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন যে, আব্বাসের সাথে একজন লোক বসে আছেন। তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ।

---

[50] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৩।

'আমরা মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম আব্বাস বসে আছেন, তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহও ﷺ বসে আছেন। আমরা সালাম দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে দেখে আব্বাসকে তাঁর কুনিয়া নামে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আবুল ফাদল, আপনি কি এ দু'জন মানুষকে চেনেন?

- হ্যাঁ চিনি, ইনি হলেন বারা ইবন মা'রুর, তাঁর গোত্রের নেতা আর ইনি হচ্ছেন কা'ব ইবন মালিক।

- কবি কা'ব নাকি?'

কা'ব ইবন মালিক ছিলেন একজন কবি। এজন্য আব্বাস যখন কা'বকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ইনিই কি কবি কা'ব কিনা।

এই ঘটনায় কা'ব তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এই বলে, 'রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাটি আমি কখনো ভুলবো না।'

কা'ব ইবন মালিকের কাছে এটা বিশাল ব্যাপার ছিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আগে থেকে চিনতেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে এটি ছিল তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, যে সাক্ষাতের এই মুহূর্তের জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আসছিলেন, আর সেই সাক্ষাতেই আবিষ্কার করলেন তাঁর নেতা, তাঁর এত প্রিয় এই মানুষটি তাঁকে আগে থেকেই চেনেন! এ কথা ভেবেই কা'ব ইবন মালিক গর্ববোধ করছিলেন এবং খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি আরো আনন্দিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়তো তাঁর কিছু কীর্তির কথাও শুনে থাকবেন।

এরপর বারা ইবন মা'রুর ﵁ তাঁর প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, 'হে আল্লাহর নবী ﷺ! আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামের পথে হিদায়াত করেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি যখন এই সফরে বের হই, তখন আমার মনে হলো, কাবাঘরকে পেছনে রাখা সমীচীন হবে না। তাই আমি কাবার দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেছি। কিন্তু আমার সাথীরা আমার বিরোধিতা করায় আমার মনে খটকা সৃষ্টি হয়েছে, যা করছি ঠিক করছি তো? এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?' মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, "তোমার আগে যে কিবলা ছিল তা বরারবই আদায় করা উচিত।" এরপর থেকে বারা ﵁ তাঁর কিবলা পরিবর্তন করেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মক্কায় ছিলেন তাঁকে সালাত আদায়ের সময় কাবাকে পেছনে রাখতে হতো না। কাবাঘরকে সামনে রেখে তিনি জেরুসালেমের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো হিজরতের পর রাসূলুল্লাহরও ﷺ ঠিক একই অনুভূতি হয়েছিল, যা হয়েছিল বারা ইবন মা'রুরের, তিনিও কাবাকে পেছনে রেখে সালাত আদায় করতে তখন অস্বস্তিবোধ করেছিলেন, এটা ঘটেছিল মদীনায়।

কা'ব বর্ণনা করেন, 'এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে, আমরা আকাবায় আইয়্যামে তাশরিফের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবো। এরপর

আমরা হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বিষয়টি আমরা গোপন রাখলাম, রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আমাদের গোপন বৈঠক সম্পর্কে আমাদের গোত্রের মুশরিক সাথীরা কিছুই জানতো না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম আবু জাবির, তিনি ছিলেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও গোত্রনেতাদের একজন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আবু জাবির! আপনি আমাদের অন্যতম নেতা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আপনি যে ধর্ম অনুসরণ করছেন তার কারণে আপনি আখিরাতে জাহান্নামের জ্বালানি হবেন – এটা আমরা চাই না।' আবু জাবির তখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে আসন্ন গোপন বৈঠক সম্পর্কে জানানো হয়। তিনি সেই শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রতিনিধি হিসেবেও মনোনীত করেছিলেন। ইসলামে তাঁর বয়স ছিল অল্প, কিন্তু তাঁর বয়স নেতৃত্বের যোগ্যতার কারণে তিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পেয়ে যান।

বাইয়াতের রাত

অবশেষে সেই নির্ধারিত রাত এল। মুসলিমরা একজন-দুইজনের ছোট ছোট দলে আকাবায় যেতে শুরু করেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন না কেউ তাদের দেখে ফেলুক। একসাথে সত্তর জন লোকের একটি দল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এভাবে তাঁরা সবাই আকাবায় মিলিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মক্কা থেকে আসা একমাত্র মুসলিম, তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব। আব্বাস তখনো মুশরিক ছিলেন, এই বৈঠকে তিনিই ছিলেন একমাত্র অমুসলিম। তিনিই প্রথমে কথা শুরু করেন। তিনি বললেন,

'মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মাঝে কেমন সম্মানের অধিকারী তা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। আমাদের গোত্রের লোকদের হাত থেকে তাঁকে আমরা নিরাপত্তা দিয়েছি। তিনি তাঁর গোত্রের কাছে সম্মানিত এবং নিজ শহরে নিরাপদে অবস্থান করছেন। কিন্তু তিনি এখন আপনাদের সাথে এক হতে চান। আপনারা যদি মনে করেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনারা মুহাম্মাদকে ﷺ আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, সে প্রতিশ্রুতি আপনারা পূরণ করতে পারবেন, তাঁর শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন, তাহলে সিদ্ধান্ত নিন আপনারা তাঁর দায়িত্ব নেবেন কি না। আর যদি মনে করেন, শেষ পর্যন্ত আপনারা তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন না এবং তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাতে তুলে দেবেন তবে এখনই তাঁকে রেখে যান। কারণ তিনি নিজ গোত্রের মধ্যে নিজের শহরে সম্মান ও নিরাপত্তার মাঝে আছেন।'[51]

আব্বাস ইবন মুত্তালিব আনসারদের দৃঢ়তা যাচাই করছিলেন। আনসাররা তাদের এই প্রতিশ্রুতির প্রতিটা কতো অনড় সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। কারণ তাঁরা এমন এক ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাদেরকে চড়া মূল্য

---

[51] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৭।

দিতে হতে পারে। চারদিক থেকে তাদের উপর চাপ আসতে পারে, তাদের উপর দুর্যোগ নেমে আসতে পারে এবং এ চাপ সামলানোর ক্ষমতা পরবর্তীতে নাও থাকতে পারে। এই ধরনের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যে সহজ হবে না সে ব্যাপারটি তিনি আনসারদের জানিয়ে রাখছিলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ আশ্রয় দেওয়া নিঃসন্দেহে একটা বিরাট ঝুঁকি, আর সেই ঝুঁকি নিতে রাজি কিনা, তাঁরা তাঁকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার সামর্থ্য রাখে কিনা – সে বিষয়টি যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই আব্বাস তাদের বলছিলেন, যদি তাদের এ সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাঁরা যেন এই অঙ্গীকারে অংশ না নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ মক্কাতেই রেখে যায়।

প্রশ্ন আসতে পারে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কেন আব্বাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন? কারণ আব্বাস ইবন মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা এবং বনু হাশিম গোত্রের একজন মুরুব্বি। মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থাকতে পছন্দ করতেন এবং তার সকল কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কায় রাসূলুল্লাহকে ﷺ যারা নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আব্বাস ছিলেন তাদের একজন। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর ভাতিজা যখন মক্কা ত্যাগ করে যাবে তখন যেন সে নিরাপদে থাকে। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বৈঠকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। বনু হাশিম গোত্রের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আব্বাস বৈঠকে উপস্থিত থেকে গোত্রের সন্তানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।

আরো প্রশ্ন আসতে পারে চাচা আব্বাসের নিরাপত্তা কি যথেষ্ট ছিল না, যেখানে আবু তালিবও তাঁর চাচা হিসেবে তাঁকে এতদিন নিরাপত্তা দিয়ে আসছিলেন? অনেকের মতে, নিজ গোত্রের লোকেদের কাছে আবু তালিব যেরূপ সম্মানিত ছিলেন, তাদের ওপর তাঁর যেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাঁর অন্য ভাইদের তেমনটা ছিল না। তাই বয়োজ্যেষ্ঠতার জন্য আবু তালিব যেভাবে মুহাম্মাদকে ﷺ রক্ষা করতে পেরেছেন, নিশ্চিতভাবেই আব্বাস সেভাবে পারতেন না। তিনি ছিলেন যুবক। তবুও তিনি তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করে হিজরতের আগ পর্যন্ত নবীজিকে ﷺ নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

আব্বাসের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আনসাররা বললেন, 'আপনার কথা আমরা শুনেছি। হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এবার আপনি কথা বলুন। বলুন আমাদের থেকে আপনি কী চান। আপনি নিজের এবং আপনার রবের জন্য আমাদের কাছ থেকে যা যা অঙ্গীকার নিতে চান, তা আমাদেরকে বলুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন,

> *'তোমরা অঙ্গীকার করো, ভালো-মন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং মানবে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আল্লাহর পথে হক্ব কথা বলে যাবে এবং এ ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। আমি*

যদি তোমাদের কাছে আসি তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আমাকে হেফাযত করবে সেভাবে, যেভাবে তোমরা নিজেদেরকে, নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হেফাযত করো।'

এই অঙ্গীকার ছিল আকাবার প্রথম বাইয়াতের অঙ্গীকারের চেয়ে একধাপ বেশি। তখন তারা কেবল মুসলিম হওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এবার আরো একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এটি ছিল আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। তিনি যা চান তিনি তা পরিষ্কার ভাষায় আনসারদেরকে জানিয়ে দিলেন, কোনো অস্পষ্টতা তিনি রাখলেন না। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন তিনি শুধু নিরাপত্তার খাতিরে মদীনায় আসছেন না, বরং সবাই তাঁকে মেনে চলবে এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা চলবে না। তাঁরা যদি আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুকে ভয় করেন তাহলে তিনি তাঁর মিশন নিয়ে এগোতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি মিশনে নেমেছেন যে মিশন সফল করতে হলে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থাকা চাই – আনসারদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথাটিই বুঝাতে চাচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শুনে বারা ইবন মা'রুর ؓ সবার প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাইয়াত দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আল্লাহর শপথ, আমরা তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যোদ্ধা জাতি।' বারার ؓ কথা শেষ হতে না হতেই আবুল হাইসাম ইবন তাইহান ؓ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের সাথে অন্যদের (অর্থাৎ ইহুদিদের) সন্ধি রয়েছে। আমরা যদি এই চুক্তি ভঙ্গ করি আর আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন, তাহলে কি আপনি আমাদের ত্যাগ করে নিজ গোত্রে ফিরে যাবেন?'

আবু হাইসাম বলতে চাচ্ছিলেন, আপনার হাতে বাইয়াত করার অর্থ হচ্ছে, আমরা এমন লোকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে পারি যাদের সাথে আমাদের সন্ধিচুক্তি রয়েছে। এ অবস্থায়, আপনি যদি বিজয় লাভ করেন, তখন কি আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন নাকি আমাদের সাথেই থাকবেন? দেখুন, আমরা কিন্তু সারাজীবনের জন্য স্বেচ্ছায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি কিন্তু আপনি কি আমাদের সাথে থাকবেন? নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে উত্তর দিলেন,

'তোমাদের রক্তই আমার রক্ত। আর তোমাদের ধ্বংসই আমার ধ্বংস। আমি তোমাদের আর তোমরা আমার। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও তাদের

সাথে সন্ধি করবো।'[52]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই ওয়াদা রেখেছিলেন। তাঁর আপন মাতৃভূমি মক্কা বিজয়ের পর তিনি সেখানে থেকে যাননি, বরং তিনি আনসারদের সাথে মদীনায় চলে যান এবং আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আনসারদের সাথে অবস্থান করেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে বাইয়াত করার জন্য আনসাররা যখন তাদের হাত এগিয়ে দিতে শুরু করেন, তখন আব্বাস ইবন উবাদা দাঁড়িয়ে তাদের বাধা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন মদীনার প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি বলেন, 'একটু থামো।' তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে এবং ধীরেসুস্থে করার জন্য বললেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

'আমরা আজ তাঁর কাছে এ কারণেই সমবেত হয়েছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল । তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ হলো সমগ্র আরবের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া। এর ফলে তোমাদের নেতাদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজবে। যদি তোমরা মনে করো, তোমরা এই ঝুঁকির ভার সইতে পারবে, তবেই তাঁকে নিজেদের কাছে নাও। তোমাদের এ কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর যদি নিজেদের জান তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তবে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও, এটা হবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য অজুহাত।'

তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন এই অঙ্গীকার কোনো সহজ অঙ্গীকার নয় – তোমরা কি বুঝতে পারছো, আমরা কীসের ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি? যদি আমরা তাঁকে আশ্রয় দিই, তাহলে পুরো বিশ্বের সাথে আমাদের শত্রুতা তৈরি হবে। আমাদের দিকে তরবারি তাক করা হবে সবদিক থেকে। আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মারা পড়তে পারে। আমাদের জান-মাল হুমকির মুখে পড়তে পারে, বিনষ্ট হতে পারে। কাজেই যদি তোমরা অঙ্গীকার করো, তবে বুঝেশুনে অঙ্গীকার করো। আর যদি তোমাদের অন্তরে কোনোরূপ ভয়-ভীতি থেকে থাকে তাহলে দেরি হওয়ার আগেই এ প্রতিশ্রুতি থেকে সরে পড়ো। তাঁরা আব্বাস ইবন উবাদাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা বাইয়াত করবো, এবং আমরা কখনও বাইয়াত ভঙ্গ করবো না।'

আনসাররা ছিলেন অসম্ভব দৃঢ়প্রত্যয়ী, তাঁরা প্রচণ্ড দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, 'আপনাকে রক্ষার বিনিময়ে আমরা কী পাবো?' – তাঁরা বলতে চাচ্ছিলেন, নিজেদের জীবন ধনসম্পদ কুরবানি করে হলেও আমরা আপনাকে রক্ষা করে যাবো কিন্তু এর বিনিময়ে আপনি আমাদের কী দেবেন? এর বিনিময় কী? কোনো

[52] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮।

চুক্তিই একতরফা নয়। যেহেতু আমরা আপনাকে সাহায্য করতে যাচ্ছি সেহেতু নিশ্চয়ই এর বিনিময়ে আমরা কিছু পাবো, সেটা কী?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটি শব্দই বললেন, ব্যস, *'আল জান্নাহ'*,[53] এতটুকুই ছিল তাঁর ওয়াদা, আর কিচ্ছু না। তিনি তাদেরকে না মন্ত্রীত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, না দিয়েছেন বাড়িগাড়ি কিংবা টাকাপয়সার প্রতিশ্রুতি, তিনি শুধু তাদেরকে একটি জিনিসের ওয়াদা করেছেন, তা হলো জান্নাত।

আনসাররা খুশিমনে বলে উঠলেন, 'এ তো এক লাভজনক ব্যবসা! আমরা কখনই এই সুযোগ হাতছাড়া করবো না।' তাঁরা দুনিয়ার সম্পদ কিংবা ক্ষমতা চাননি, তাঁরা শুধু জান্নাতের অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট ছিলেন।

বাইয়াতের এই সংবাদটি কোনোভাবে কুরাইশদের কাছে পৌঁছে যায়। হাজ্জের মৌসুমে সত্তরের অধিক লোকের একটি বৈঠক গোপন রাখা খুব সহজ ব্যাপার না। এক বর্ণনায় এসেছে যে, শয়তান কুরাইশদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেয়। তারা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালায় এবং আনসারদেরকে খুঁজে বের করে।

পরদিন ভোরে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের একটি দল আওস ও খাযরাজ গোত্রের তাঁবুতে প্রবেশ করে। তারা জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা খবর পেয়েছি যে তোমরা নাকি মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করেছো আর তাঁকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার ও নিরাপত্তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছো? ইয়াসরিববাসী, তোমরা জেনে রাখো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা অন্য সব আরব গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে আমাদের কাছে বেশি অপছন্দনীয়।' কুরাইশরা জানতো যে, আওস ও খাযরাজ গোত্র সহজ কোনো প্রতিপক্ষ নয়, তাঁরা ছিলেন লড়াকু যোদ্ধা।

আওস ও খাযরাজ গোত্রের মুসলিমরা চুপ করে থাকলেন, তাঁরা কোনো উত্তর দিলেন না। উত্তর দিল মুশরিকরা, তারা বললো, 'কই? এরকম কিছু তো হয়নি। আমরা তো কখনো মুহাম্মাদের সাথে দেখা করিনি।' গোত্রের মুশরিক সদস্যরা জানতোই না যে গোত্রের মুসলিম সদস্যরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ দেখা করেছে। গোপন বৈঠকের ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই তারা বারবার বলছিল যে, তারা মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করেনি। কা'ব ইবন মালিক বলেন, 'আমরা মুসলিমরা চুপচাপ একে অন্যের মুখের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম। আমরা কোনো কথাই বলিনি।'

কিন্তু কুরাইশদের মন থেকে কোনোভাবেই সন্দেহ দূর হচ্ছিল না। কা'ব বলেন, 'আমি চাইলাম কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে, যেন কুরাইশরা আসল বিষয়টি ভুলে যায়।'

---

[53] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০১।

সূচিপত্র

সেখানে ছিলেন হারিস ইবন হিশাম, কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি, তার পায়ে একজোড়া নতুন জুতো। কা'ব সেটা দেখে আবু জাবিরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'আবু জাবির! আপনি একজন বড় মাপের নেতা। আপনি কি পারেন না কুরাইশদের ওই যুবকের মতো একজোড়া নতুন জুতা ব্যবহার করতে? নেতা হয়ে আপনি পুরনো জুতা পরে আছেন, আর ওই যুবক কত সুন্দর জুতা পরে আছে।'

এ কথা শুনে হারিস মন খারাপ করে বলে,'তুমি আমার জুতা নিয়ে কথা বলছো? এতোই মূল্যবান আমার জুতা? লাগবে না এই জুতা!' এই বলে সে পা থেকে জুতাজোড়া খুলে কা'ব ইবন মালিকের দিকে ছুঁড়ে মারে। আবু জাবির বলেন, 'আহ থামো তো কা'ব! তুমি তো এই যুবককে ক্ষেপিয়ে তুলেছো। তার জুতা তাকে ফিরিয়ে দাও।' কা'ব বললেন, 'না, আমি এগুলো ফেরত দেবো না। এটি আমার জন্য ভালো লক্ষণ। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এই জুতা নিয়ে যাবো।'[54]

এতটুকুই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আনসারদের মধ্যকার বৈঠক। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এটি ছিল এযাবৎকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এটি ছিল ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো একটি ঘটনা। ইসলাম যেন এই ঘটনার মাধ্যমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি ভূমির সন্ধান পেলেন যেখান থেকে সুরক্ষিত ও স্বাধীনভাবে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। এটি সম্ভব হয়েছিল আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াত, বাইয়াতুল আক্বাবা আস-সানিয়ার মাধ্যমে।

বাইয়াত থেকে শিক্ষা

১. কা'ব ইবন মালিক ؓ বলেন, 'মদীনা ত্যাগ করার পূর্বেই আমরা সালাত আদায় করতে শিখেছিলাম, আমাদের দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেছিলাম।' এটি রাসূলুল্লাহর ﷺ হিজরতের আগের ঘটনা। সুতরাং যেসব ভাইবোনেরা ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিলম্ব করছেন এ অজুহাতে যে তারা বিদেশে গিয়ে কোনো শাইখের কাছে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছেন না বা কোনো ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছেন না, তাঁরা আসলে খোঁড়া যুক্তি দেখাচ্ছেন। দ্বীনের ব্যাপারে পড়াশোনা না করার ব্যাপারে এগুলো কোনো অজুহাত নয়। 'অনুকূল পরিস্থিতি'র আশায় বসে না থেকে প্রত্যেকের উচিত একটুও বিলম্ব না করে সাধ্যমতো দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়া। কা'ব ইবন মালিক এবং তাঁর সহযোগীরা যখন দ্বীনের বুঝ লাভ করেছেন, সালাত আদায় করা শিখে গেছেন, তখনো আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় প্রবেশ করেননি। তাদের সাথে কেবল একজন শিক্ষক ছিলেন – মুসআব ইবন উমাইর ؓ। কিন্তু কা'ব ইবন মালিকের বক্তব্যের একটি অন্তর্নিহিত বার্তা রয়েছে, তা হলো – আমরা প্রস্তুত, আমরা শিখছি। দ্বীনের জ্ঞানার্জন থেকে নিজেকে বিরত রাখা একেবারেই উচিত নয়, মুসলিম মাত্রই দ্বীন জানার ব্যাপারে সচেতন থাকবে।

---

[54] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪।

যদি কোনো মুসলিম কোনো আলিম বা শাইখের দারস্থ হতে না পারে, তাহলে তার উচিত বসে না থেকে অন্তত এমন কারো সাথে সময় কাটানো যে তার থেকে বেশি জানে। তেমন কাউকেও যদি না পাওয়া যায়, নিদেনপক্ষে কোনো আলিমের বই পড়তে শুরু করে দেওয়া উচিত। দ্বীনি পড়াশোনার মধ্যে সবসময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি। কালক্ষেপণ করা কোনো অজুহাত হতে পারে না। ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, কুরআনের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাহান্নামীদের বেশিরভাগ আর্তনাদের কারণ হবে তাদের গড়িমসি। তারা বলবে,

"হে আল্লাহ, আমাদের একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিন, যাতে আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। হে আল্লাহ, আমাদের একবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যান, যেন আমরা দান করতে পারি। হে আল্লাহ, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান।"

কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে, সুতরাং কখনই ভালো কাজের সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়।

২. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের কাছে তাঁর চুক্তির শর্তগুলো সম্পর্কে বলেছিলেন, তখন তাদের প্রশ্ন ছিল, 'বিনিময়ে আমরা কী পাবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ এক শব্দে উত্তর দিয়েছিলেন, জান্নাহ। এখানে থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সকল ইসলামি কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জান্নাত, আল্লাহ আযযা ওয়াজালকে সন্তুষ্ট করাই প্রতিটি কাজের মূল উদ্দেশ্য – খ্যাতির জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়, সামাজিকতার জন্যেও নয়। প্রতিনিয়ত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিজেদের জিজ্ঞেস করা উচিত – ইসলামের জন্য যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করছি, তা কেন করছি? তা কি আসলেই আল্লাহর জন্য করছি?

এই দ্বীনের জন্য প্রয়োজন আত্মত্যাগ। এই আত্মত্যাগের বিনিময় হলো জান্নাত। একজন মুসলিম দ্বীনের জন্য ত্যাগ আর কষ্ট স্বীকার করলে তার বিনিময় এই দুনিয়াতে নাও পেতে পারে, কেননা দুনিয়া ত্যাগ করাই দ্বীনের দাবি। এটি এমন একটি দ্বীন যার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে হতে পারে, কারণ এর বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। জান্নাতে যে প্রতিদান দেওয়া হবে তা যেকোনো আত্মত্যাগের তুলনায় বহুগুণে দামি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিবেন তা অনেক দামি। আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। কাজেই জান্নাত পেতে চাইলে এই দুনিয়াতে তার জন্য চড়া মূল্যও দিতে হবে।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে কী আশা করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো লুকোছাপা রাখেননি, তিনি আনসারদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের এই কাজের জন্য তাদের ও তাদের পরিবারের জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে, আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আশ্রয় দেওয়ার অর্থ নিজেদের জীবনে যুদ্ধ ডেকে আনা। আর এই কাজের বিনিময় হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দুনিয়ার প্রাচুর্য বা অর্থ-সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেননি, ক্ষমতার প্রতিশ্রুতিও

দেননি, তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা কোনো সহজ কাজ নয়, এর জন্য অনেক সংগ্রাম করতে হবে আর এর জন্য প্রয়োজন অনেক আত্মত্যাগ। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বলেছিলেন যে, আয়েশের জীবন ছেড়ে দাও, আরামের জীবন চিরস্থায়ী হবে না। কাজেই যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে চায়, তাদের মনে রাখতে হবে, এই কাজের জন্যে দুনিয়াকে বিসর্জন দিতে হতে পারে। আর সে হিসেবেই নিজেদের প্রস্তুত করে নেওয়া জরুরি।

৪. আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সত্তরের অধিক লোক সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকে মুসলিম ছিলেন যারা হয়তো সেখানে আসেনি। কিন্তু বাইয়াত গ্রহণ করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন ১২ জন নেতা (নুকাবা) মনোনীত করতে। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে তাদের জন্য একজন করে নেতা নিযুক্ত করেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, দ্বীন ইসলাম সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ থাকার উপর জোর দেয়। আর এখানে যেহেতু মুসলিমদের একটি দল রাসূলের ﷺ সরাসরি তত্ত্বাবধানে নেই, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন, তারা যেন নিজস্ব কাঠামোর অধীনে দলবদ্ধ থাকে। তাই তিনি দেরি না করে ৭০ জনকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেন এবং তাদের উপর বারোজন নেতা নিযুক্ত করেন। তাঁরা ছিলেন নকীব বা এক ধরনের প্রতিনিধি যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে রিপোর্ট করবেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাধ্যমে নির্দেশাবলি পাঠাবেন।

ইয়াসরিব হলো মদীনা

'আমাকে স্বপ্নে হিজরতের ভূমি দেখানো হয়েছে। সেটি ছিল খেজুরগাছ পরিবেষ্টিত, দু'টি পাথুরে অঞ্চলের মাঝে অবস্থিত।'

এই হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। বুখারিতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মক্কা থেকে এমন এক দেশে হিজরত করছি যা খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমি ধারণা করলাম যে, এলাকাটি হবে ইয়ামামা বা হিজর, কিন্তু পরে দেখা গেল যে তা ইয়াসরিব।'

মদীনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নাম পরিবর্তন করে ইয়াসরিব নামটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যদি কেউ মদীনাকে 'ইয়াসরিব' বলে ডাকে তাহলে তাঁকে ইস্তিগফার করতে হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এই শহরটির পরিচয়কে সম্পূর্ণ বদলে দিতে চেয়েছিলেন। ইয়াসরিবের ইতিহাস ছিল শত্রুতা আর যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরপুর, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ একে একটি নতুন পরিচয়ে পরিচিত করতে চাইলেন। ফলে এটির নতুন নাম হলো মদীনা, মদীনাতুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বা রাসূলুল্লাহর ﷺ শহর। মদীনা শব্দের আক্ষরিক অর্থ শহর, তবে মদীনা বলতে এখন রাসূলুল্লাহর ﷺ শহরকেই বোঝানো হয়।

সাহাবীদের রা. হিজরত

আবু সালামা রা. ও উম্মু সালামা রা.

হিজরতের সমসাময়িক একটি ঘটনা উম্মু সালামা রা. বর্ণনা করেন।[55] তিনি বলেন, 'আমরা হাবশা থেকে ফিরে আসলাম। আমার স্বামী আবার হাবশায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন মদীনা হিজরতের নতুন ভূমি এবং সেখানে কিছু মুসলিম রয়েছে, তখন তিনি মদীনায় সপরিবারে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন।' এটি ছিল আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের এক বছর আগের ঘটনা। তিনি ছিলেন প্রথম দিকের মুহাজিরদের একজন।

'আমার স্বামী আমাকে একটি উটের পিঠে আরোহণ করালেন এবং আমার ছেলেকে আমার কোলে তুলে দিলেন। আমরা মক্কা ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে যাবো – এমন সময় আমার পরিবারের লোকজন আমার দিকে তেড়ে এসে বললো, আমরা

---

[55] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১২।

তোমাকে তোমার স্বামীর সাথে যেতে দেব না। এ কথা বলে তারা আমাকে আমার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।'

ইতোমধ্যে বনু আসআদ অর্থাৎ আবু সালামার পরিবার এসে পড়লো। তারা বললো, 'আমরা তোমার সন্তানকে তোমার সাথে যেতে দেব না' – এ কথা বলে তারা শিশুটিকে ছিনিয়ে নেয়। এর ফলে আবু সালামা ও উম্ম সালামা আলাদা হয়ে গেলেন আর তাদের সন্তানকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো। উম্ম সালামার পরিবার উম্ম সালামাকে নিয়ে গেল, আর তাদের শিশু সালামাকে নিয়ে গেল আবু সালামার পরিবার। এভাবে তিনজনের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত স্ত্রী ও সন্তানকে মক্কায় রেখে আবু সালামা একাই হিজরত করে মদীনায় চলে যান। উম্ম সালামা বলেন, 'প্রতিদিন ভোরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে চলে যেতাম আর একটি টিলার উপর বসে সারাদিন কাঁদতাম, প্রায় এক বছর পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।' এই নারী তিনি ছিলেন একজন মা, একজন স্ত্রী – অথচ স্বামী-সন্তান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

অবশেষে বনু মুগীরার এক লোক, উম্ম সালামার চাচা, তাঁর ভাতিজির অসহায় অবস্থা দেখে তার পরিবারকে বললেন, 'এই অসহায় নারীর প্রতি কি তোমাদের কোনো দয়া হয় না? তাঁকে ছেড়ে দাও এবং স্বামী-সন্তানের সাথে মিলিত হতে দাও।' অবশেষে তারা রাজি হলো। তারা উম্ম সালামাকে বললো, 'তুমি ইচ্ছা করলে মদীনা যেতে পারো।' তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এ সংবাদ শুনে তাঁর সন্তানকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'এখন তুমি তোমার স্বামীর সাথে মিলিত হতে পারো।' উম্ম সালামা তাঁর সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

হিজরতের এই যাত্রায় তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা। তিনি তাঁর সন্তানসহ একটি উটের পিঠে আরোহণ করে একাকী মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। মক্কা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'তানাঈম' নামক স্থানে উসমান ইবন তালহার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। উসমান তাঁকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

- আবু উমাইয়্যার মেয়ে, যাচ্ছো কোথায়?

- মদীনা যাচ্ছি।

- তোমার সাথে আর কেউ আছে কি?

- না, আমি একাই যাচ্ছি।

- তাহলে আমি তোমার সাথে যাব। তোমাকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।

উসমান ইবন তালহা ছিলেন একজন মুশরিক, অমুসলিম। কিন্তু এই নারীটিকে এমন

একা দেখে তিনি তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। মক্কা থেকে মদীনার পুরো যাত্রাপথে তিনি তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখেন। উম্ম সালামা বলেন,

'আল্লাহর কসম, পুরো আরবে তাঁর মতো ভদ্র আর সম্মানিত মানুষ আর কাউকে দেখিনি। যখন আমরা কোথাও থামতাম, তখন তিনি আমার জন্য উটকে বসাতেন এবং দূরে সরে যেতেন। আমি নিচে নেমে আসলে তিনি ফিরে আসতেন এবং উটটিকে বেঁধে রাখতেন। তারপর তিনি দূরে কোনো গাছের নিচে বিশ্রাম নিতেন। পরদিন সকালে তিনি আমার উট নিয়ে আসতেন, উটকে প্রস্তুত করে আমাকে উঠতে বলতেন আর তিনি দূরে সরে যেতেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হলে তিনি আবার ফিরে আসতেন এবং উটের লাগাম ধরে আগে আগে চলতে থাকতেন।'

উম্ম সালামা ﵂ বলেন, 'আমাকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই আমার সঙ্গে আচরণ করেন। কুবায় পৌঁছানোর পর তিনি কুবাকে ইঙ্গিত করে বলেন, তোমার স্বামী এই গ্রামেই রয়েছে। এখন তুমি নিজে নিজে যেতে পারো।'

উম্ম সালামা বলেন, 'ইসলামের জন্য আবু সালামার পরিবারকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, তা আর কোনো পরিবারকে করতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর উসমান ইবন তালহার চেয়ে ভদ্র মানুষ আমি কখনও সঙ্গী হিসেবে পাইনি।' তিনি উসমান ইবন তালহার আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কেননা তখন মক্কার কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের শত্রুতা ছিল আর সেরকম একটি পরিস্থিতিতে তিনি নিজ থেকে এসে উম্ম সালামাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সাথে পুরোটা পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন এবং অনেক সম্মান করেছিলেন। তাই উম্ম সালামা ﵂ তাঁর এই আচরণের অনেক প্রশংসা করেন।

উসমান ইবন তালহা পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও তিনি মুসলিম হয়েছিলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﵁ এবং আমর ইবনুল আস ﵁ – এই দুইজনের সমসাময়িক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাবা শরীফের চাবি উসমান ইবন তালহার পরিবার বনু আব্দুদ দারের কাছেই থাকতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পরেও তাদের এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন, মক্কার চাবি তাদের কাছেই রাখেন। এখন পর্যন্ত সে নিয়ম বহাল আছে।

উমার ﵁

উমার ইবন খাত্তাব ﵁ কুরাইশদের বিন্দুমাত্র ভয় করতেন না। সবাই মদীনায় হিজরত করেছিলেন গোপনে, আর উমার রীতিমত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হিজরত করেন। তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন, সাথে নিলেন তলোয়ার, কাঁধে ঝোলালেন তীর-ধনুক, লাঠি নিতেও ভুললেন না। তিনি কাবাঘরের দিকে গেলেন, সেখানে

কুরাইশরা বসা ছিল, তাদের সামনে ধীরেসুস্থে সাতবার কাবাঘর তাওয়াফ করলেন। তারপর মাক্কামে গিয়ে আস্তেধীরে সালাত আদায় করলেন। তারপর জনসমাগমের দিকে গেলেন, এক এক করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'তোদের মুখে চুনকালি পড়ুক! আল্লাহ তোদের ওই নাক ধুলোয় গড়াগড়ি খাওয়াবেন। কে আছে বাপের ব্যাটা, বুকের পাটা থাকলে আয়! যদি স্ত্রীর বিধবা হওয়ার ভয় না করিস, সন্তানের এতিম হওয়ার ভয় না করিস, নিজের মাকে সন্তানহারা বানাতে ভয় না পাস, তাহলে এই পাহাড়ে আয়! আমার সাথে লড়ে দেখা!'

কেউ তাঁর সাথে লড়ার সাহস দেখালো না। বরং তিনি দলবল নিয়ে হিজরত করতে রওনা হলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন[56], 'আমি, আইয়্যাশ ইবন আবু রাবিআ এবং হিশাম ইবন আস – আমরা পরিকল্পনা করলাম একসাথে মদীনায় হিজরত করবো। আমরা সারিফের উপর মিলিত হওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করলাম। আমরা ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যদি কেউ ভোরে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে সে আটকা পড়েছে, সুতরাং বাকিরা তার জন্য অপেক্ষায় না থেকে মদীনায় যাত্রা শুরু করে দিবে।'

সারিফ মক্কার বাইরে একটি জায়গা, উমার ও আইয়্যাশ ভোরে সেখানে পৌঁছে গেলেন, কিন্তু হিশাম ইবন আসকে দেখা গেল না। তাই উমার আর আইয়্যাশ দুজন মিলেই যাত্রা শুরু করে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করেছিলেন সবার শেষে। আবু জাহেল ছিল আইয়্যাশ ইবন রাবিআর সৎ ভাই। সে তার ভাই হারিসকে নিয়ে মদীনায় চলে গেল আইয়্যাশকে ফিরিয়ে আনতে। তারা আইয়্যাশকে প্ররোচিত করলো, 'তোমার মা প্রতিজ্ঞা করেছে তোমাকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মাথার চুল আঁচড়াবেন না, রোদ ছেড়ে ছায়ায় বসবেন না। তুমি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মক্কার প্রখর রোদের নিচেই তিনি বসে থাকবেন।'

উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ দূর থেকে তাদের কথা শুনছিলেন। তিনি আইয়্যাশকে গিয়ে বললেন, 'এই লোকগুলো তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে, তোমাকে পটানোর জন্য এসব বলছে, তারা তোমাকে মক্কায় ফিরিয়ে নিতে চায়। তোমার মায়ের শপথের কথা বলছো? উকুনের জ্বালায় ঠিকই তিনি চিরুনী ব্যবহার করবেন, আর মক্কার কড়া রোদ অসহ্য ঠেকলে তিনি নিশ্চয়ই ছায়াতে না বসে পারবেন না। তুমি এদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না আর তাদের সাথে যেও না।'

উমার ইবন খাত্তাবকে ﷺ শয়তানও ধোঁকা দিতে পারতো না। তিনি খুব ভালোই বুঝতে পারছিলেন এসব আবু জাহেলের ষড়যন্ত্র। এদিকে মায়ের কথা শুনে আইয়্যাশ

---

[56] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬।

অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি উমারের উপদেশ না শুনে আবু জাহেলদের সাথে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। উমার বললেন, 'ঠিক আছে, যেতেই যদি চাও, আমার উটনীটি সাথে নাও। এটা খুব শক্তিশালী আর দ্রুত দৌড়াতে পারে। পথিমধ্যে যদি সন্দেহজনক কিছু দেখ, চোখ বন্ধ করে সোজা উট নিয়ে পালিয়ে যাবে।'

এরপর আইয়্যাশ ইবন আবি রাবিআ, আবু জাহেল এবং হারিস ইবন হিশাম মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। প্রত্যেকেই নিজেদের উটের উপর বসে চলছে। পথিমধ্যে আবু জাহেল তার উটের ব্যাপারে অভিযোগ করা শুরু করে – 'কী অদ্ভুত উট রে বাবা! এত ধীরে চলে! এ তো মহা ঝামেলা।' তারপর সে আইয়্যাশকে বলে, আমার উটটি খুবই ঝামেলা করছে। তুমি কিছুক্ষণের জন্য তোমার উটকে আমারটার সাথে অদল-বদল করবে?' আইয়্যাশ ছিলেন সহজ-সরল মানুষ, তিনি রাজি হলেন, তারা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, আইয়্যাশের উট মাটিতে বসামাত্র তারা ছুটে তাঁকে আক্রমণ করে এবং বেঁধে ফেলে। তারপর টেনে-হিঁচড়ে মক্কায় নিয়ে যায়।

তারা আইয়্যাশের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালালো। একই ঘটনা ঘটেছিল তার সাথী হিশাম ইবন আসের সাথে, তিনিও মক্কায় বন্দী হয়েছিলেন। উমার ﷺ বলেন, 'আমরা মুসলিমরা নিজেদের মাঝে বলাবলি করতাম যে, যে ব্যক্তি পেছনে পড়ে রয়েছে, অর্থাৎ হিজরত করেনি এবং শত্রুদের ধোঁকায় পড়েছে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন না।' যারা হিজরত করতে পারেনি তারাও ভাবতেন তাদের ক্ষমা পাওয়ার বুঝি আর কোনো আশা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার আগ পর্যন্ত তাঁরা এমন ধারণাই রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করলে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

> "বলোঃ হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। তার পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় আযাব আসার পূর্বে, অথচ তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না।" (সূরা আয্ যুমার, ৩৯: ৫৩-৫৫)

উমার ﷺ আয়াতগুলো পড়ে সেগুলো লিখে হিশামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হিশাম বলেন, 'চিঠিটি আমার নিকট পৌঁছলে আমি তুয়া উপত্যকায় উঠে সেটি পড়লাম, আবার পড়লাম এবং বারবার তা পড়তে লাগলাম। টানা কয়েকদিন বারবার পাঠ করেও আমি এর মর্ম উদ্ধার করতে পারছিলাম না। আমি যতদিন বুঝতে পারিনি কেন উমার এটি আমার কাছে পাঠালেন, ততদিন আমি সেখানে গিয়ে চিঠিটি বারবার

পড়তে থাকি। সবশেষে আমি বুঝতে পারলাম যে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।'

কেউ যত গুনাহের কাজই করুক না কেন, আল্লাহ্ তাআলা তারপরও তাকে ক্ষমা করতে পারেন, যদি সে তাওবা করে। কেউ যদি পেছনে পড়ে যায়, হিজরত করতে না পারে, কাফিরদের হাতে প্রতারিত হয়, তবু তার জন্য সুযোগ রয়েছে। হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হিশাম ইবন আস বলেন, আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করলাম, এরপর উটের পিঠে চড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

সুহাইব আর রুমী ﷺ

সুহাইব আর রুমী রাসূলুল্লাহর ﷺ পরে মদীনায় আসেন। রোমান ও আরবদের মধ্যকার একটি যুদ্ধে তিনি রোমান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হন। পরবর্তীতে তিনি রোমানদের মাঝেই বেড়ে ওঠেন এবং তাদের ভাষা রপ্ত করে ফেলেন। তাই তিনি আরবিতে কথা বলার সময় তাতে রোমান টান থাকত। বিভিন্ন মনিবের হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত দাস সুহাইব আর-রুমী আবদুল্লাহ্ ইবন জুদানের হাতে গিয়ে পড়েন।

আবদুল্লাহ্ ইবন জুদান ছিলেন মক্কার এক ধনী ব্যক্তি। তিনি সুহাইবকে ﷺ মুক্ত করে দেন। সুহাইব ﷺ ছিলেন মেধাবী, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ যুবক, তিনি নিজেই ব্যবসা শুরু করলেন এবং বেশ দ্রুত অনেক সম্পদের মালিক হয়ে যান। হিজরতের পূর্বে তিনি একটি গর্ত করে সেখানে তাঁর সম্পদ লুকিয়ে রাখেন এবং মক্কা ত্যাগের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কুরাইশের কিছু লোক তাঁর পিছু নিয়ে তাঁর পথরোধ করলো এবং তাঁকে বললো, 'তুমি আমাদের মাঝে এসেছিলে ফকির হয়ে। এখানে এসে তুমি সম্পদ গড়েছ, প্রতিপত্তি লাভ করেছো, আর এখন তুমি সেসব নিয়ে চলে যেতে চাও? আল্লাহর শপথ, আমরা কখনোই তোমাকে যেতে দেব না।' সুহাইব ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি আমি তোমাদেরকে টাকা দেই, তোমরা আমাকে যেতে দেবে?' তারা বললো, 'হ্যাঁ, তাহলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব।'

অবশ্য সুহাইবের হিজরতের ঘটনা অন্য একটি বর্ণনায় খানিকটা ভিন্নভাবে এসেছে: সুহাইব যখন দেখলেন কুরাইশরা তাঁর পিছে পিছে আসছে, তখন তিনি ৪০টি তীর বের করলেন এবং তাদেরকে হুমকি দিলেন যদি তারা তাঁর পথ না ছাড়ে তাহলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে এই ৪০টি তীর ছুঁড়ে মারবেন, আর এই তীরগুলো শেষ হয়ে গেলে তিনি তরবারি দিয়ে হলেও তাদের সাথে লড়বেন এবং কুরাইশদের পৌরুষত্বের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। এরপর তিনি তাদেরকে বললেন তাঁকে যেন যেতে দেওয়া হবে, বিনিময়ে তিনি তাদের টাকা দেবেন। এরপর কুরাইশরা বাড়াবাড়ি না করে তাঁর এই প্রস্তাবে রাজি হয়।[57]

---

[57] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৯।

শিক্ষা

১. আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল। গুনাহ যা-ই হোক না কেন, কখনও হতাশ হওয়া উচিত নয়, হাল ছাড়া উচিত নয়, বরং আল্লাহর কাছে তাওবা করা উচিত। সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো শির্ক। সেই শির্ক করার পরেও যদি কেউ তওবা করে, আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, আল্লাহ্‌ তাকেও ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু তা করতে হবে আল্লাহর আযাব বা মৃত্যু আসার পূর্বেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> **"তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো।" (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ৫৪)**

২. কাফেরদের ব্যাপারে সাবধান থাকা জরুরি, তাদের ব্যাপারে এতটুকু অসতর্ক হওয়া যাবে না। আইয়্যাশ ইবন আবি রাবিআ আবু জাহেলকে বিশ্বাস করে ভুল করেছিলেন। একজন মু'মিন শত্রুদের মিষ্টি কথায় প্রলুব্ধ হবে না। অনেকেই আছে সাদাসিধে ও সরলমনা। তারা এখানে-সেখানে 'ভালো ভালো' কথা শুনে বিশ্বাস করে ফেলে, রাজনীতিবিদদের সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে ফাঁদে পড়ে যায়। যারা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের সাথে যুদ্ধ করে আসছে তাদের কথায় চট করে বিশ্বাস করা যাবে না।

নিজেদেরকে প্রতারিত হতে দেওয়া উচিত না। উমার ﷺ আবু জাহেলের এই পরিকল্পনার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্যই তিনি আইয়্যাশকে বলেছিলেন, 'তাদেরকে বিশ্বাস কোরো না। তারা মিথ্যা বলছে। তোমার মায়ের মাথা উকুনে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তিনি অবশ্যই চুল আঁচড়াবেন। আর মক্কার প্রখর রোদে কেউ-ই বাঁচতে পারবে না, তাকে সরে ছায়াতে আসতেই হবে। মানত পূরণ করার জন্য তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।' আল্লাহ্‌ জানেন কারা মুসলিমদের শত্রু। তিনি এই উম্মাহকে তাদের শত্রু সম্পর্কে অবগতও করেছেন। তাই মুসলিমদের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। বরং শত্রুদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

৩. সুহাইব ﷺ ছিলেন একজন অভিবাসী। তিনি মক্কায় গিয়ে সেখানে স্থায়ী হন, ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং সেখানকার সমাজে সম্মানিত একটি অবস্থান অর্জন করেন। কিন্তু সেই একই ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌ তাআলার রাস্তায় হিজরত করতে চাইলেন, তখন যে লোকগুলো তাঁকে সম্মান করতো, তারাই তাঁর হিজরতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য সুহাইব ﷺ একজন আদর্শ, যিনি দ্বীনের জন্য নিজের উন্নত ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে ঈমানের ভূমিতে হিজরত করতে উদগ্রীব ছিলেন।

হিজরতের আহ্বান

> **"বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী**

> **প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।” (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ১০)**

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হিজরতের দিকে ইঙ্গিত করছেন। ‘ওয়া আরদুল্লাহী ওয়াসি’আহ’ – আল্লাহ তাআলার জমিন প্রশস্ত। আল্লাহ মুসলিমদের বলছেন, যদি মক্কায় তোমাদের উপর জুলুম করা হয় তাহলে তোমরা অন্যত্র চলে যেতে পারো যেখানে আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে। মুফাসসির মুজাহিদ (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য হিজরত করো ও জিহাদ করো এবং মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাক।’ উম্মাহর প্রাথমিক যুগের প্রখ্যাত আলিম আতা বলেন, ‘যদি তোমাকে কোনো পাপের দিকে আহ্বান করা হয় তাহলে তুমি পালিয়ে যেও।’

> **“আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর রাস্তায় অত্যাচারিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করব। আর আখিরাতের প্রতিদান তো বিশাল, যদি তারা জানতো।” (সূরা নাহল, ১৬: ৪১)**

যারা আল্লাহ তাআলার জন্যে হিজরত করে এবং নিপীড়িত হয় তাদেরকে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এই দুনিয়ার বুকে উত্তম আবাস দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। এই আয়াতের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন মুহাজিরগণ। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় তাঁরা ছিলেন নিঃস্ব। কিন্তু এই মানুষগুলোই পরবর্তী সময়ে কেউ হন আমীর, কেউ বা সেনাপতি। দুনিয়ার বুকেই আল্লাহ তাদেরকে নিঃস্ব অবস্থা থেকে উন্নীত করে সম্মান ও ইজ্জতের আসনে আসীন করেছেন। এটাই হলো এই আয়াতে বর্ণিত ‘উত্তম আবাস’। যদিও তাঁরা দুনিয়ার বুকে পুরস্কার পেয়েছেন, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল বলছেন, ‘কিন্তু পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক।’ আর তাই উমার ইবন খাত্তাব ﵁ খলীফা হওয়ার পর যখন মুহাজিরদের টাকাপয়সা অথবা উপহার দিতেন তখন তিনি বলতেন, ‘এটি হচ্ছে এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তোমাদের জন্যে উপহার কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য আখিরাতে এর চেয়েও অনেক বেশী বরাদ্দ করে রেখেছেন।’ যখন কেউ আল্লাহ তাআলার জন্য কিছু ত্যাগ করে, আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়েও ভালো প্রতিদান দিয়ে পুষিয়ে দেন।

> **“যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জিহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা নাহল, ১৬: ১১০)**

হিজরত একটি ইবাদাত। ইসলামে এই ইবাদাতের মর্যাদা অনেক বেশি। যেখানেই হিজরাত আছে, সেখানেই আছে নুসরাত। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা মুহাজিরগণ মদীনায় কোনো হোটেল বা উদ্বাস্তুশিবিরে জড়ো হননি। তাঁরা মদীনায় যাদের বাসায় উঠেছেন তাদেরকে বলা হয় আনসার। তাদেরকে আনসার বলার কারণ,

তাঁরা আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা (নুসরাহ) দিয়েছেন এবং জয়ী করতে সাহায্য করেছেন। তাদের ছোট্ট গৃহ তারা মুহাজিরদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

মদীনার ঘরগুলো কেমন ছিল? আল-হাসান আল বসরীর একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ্য, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরগুলো দেখেছি। সেগুলো এত ছোট ছিল যে, আমি আমার হাত দিয়ে ঘরের ছাদ ধরতে পারতাম। রাসূলুল্লাহ যখন আ'ইশার ﷺ ঘরে সালাত আদায় করতেন, ঘর ছোট হওয়ার কারণে আ'ইশাকে তাঁর পা সরিয়ে রাখতে হতো যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিকমত সিজদাহ দিতে পারেন।' রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি করে ঘর ছিল। কিন্তু সেগুলোর সাথে আলাদা করে কোনো রান্নাঘর, বসার ঘর অথবা বারান্দা বলে কিছু ছিল না। শুধুমাত্র একটি করে ঘর আর প্রতিটা ঘরই ছিল অনেক ছোট।

তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মা এবং সুহাইব ﷺ ছিলেন হাবিব ইবন উসার ﷺ বাড়িতে। হামযা ﷺ উঠেছিলেন সাদ ইবন যুরায়রার ﷺ বাড়িতে। সাদ ইবন খাইতানের ﷺ বাড়িকে বলা হতো "ব্যাচেলর হাউজ", কারণ সেখানে অবিবাহিত মুহাজিররা থাকতেন। উবাইদা ইবনু হারিস ﷺ ও তাঁর মা, তুফাইল ইবন হারিস ﷺ, তুফাইল ইবন আমর ﷺ, আল হুসসাইন ইবন হারিস ﷺ – তাঁরা সবাই থাকতেন আবদুল্লাহ ইবন সালামার ﷺ বাসায়। এক মুসলিমের আরেক মুসলিমের প্রতি উদার হওয়া এবং তাকে সাহায্য করা মুসলিমের ঈমানের চিহ্ন। এটা ছিল আনসারদের একটি বৈশিষ্ট্য।

সেই সময়ে মুসলিমদের কেউ মদীনায়, আবার কেউ হাবশায় হিজরত করেছিলেন। এই দুই হিজরতের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। হাবশায় হিজরতের ঘটনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা সেখানে হিজরত করলেও সেখানকার সমাজের উপর তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। সেখানে তাঁরা সমাজ থেকে অনেকটাই আলাদা থাকতেন। তাঁরা সেখানে উদ্বাস্তুর মতো অবস্থান করেছিলেন। আর এ কারণেই আবিসিনিয়া ত্যাগ করার সময় তাঁরা সেখানে ইসলামের তেমন কোনো প্রভাব রেখে আসতে পারেননি। কিন্তু মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আর সে উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল।

ইসলামে মদীনার তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছিলেন আল্লাহ তাআলা যেন তাদের অন্তরে মদীনার জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি করে দেন। তিনি দুআ করেছেন, 'হে আল্লাহ, মদীনাকে আমাদের চোখে মক্কার মতো বা তার চেয়েও প্রিয় বানিয়ে দাও।' নবীজি ﷺ মদীনার বরকত বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ আযযা ওয়াজাল-এর কাছে দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! মক্কায় তুমি যে পরিমাণ বরকত দান করেছো, মদীনাতে তার দ্বিগুণ বরকত

দাও।'

দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। নবীজি ﷺ বলেন, দাজ্জালের কাছ থেকে মদীনাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এর প্রতিটি প্রবেশমুখে ফেরেশতারা পাহারারত রয়েছে।

মদীনায় কষ্টকর জীবনে ধৈর্যধারণের জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। মদীনায় তখন প্রচণ্ড গরম ছিল এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল, তাই নবীজি ﷺ বলেছেন, 'মদীনার কষ্টকর অবস্থায় যে ধৈর্য ধারণ করবে, আমি শেষ বিচারের দিন তার শাফাআতকারী হব। শেষ বিচারের দিন আমি তার হয়ে মধ্যস্থতা করব।'

মদীনায় মৃত্যুবরণকারীর জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। নবীজি ﷺ বলেছেন, 'যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য শেষ বিচারের দিন মধ্যস্থতাকারী হবো।' উমার ইবন খাত্তাব ﷺ খলীফা হওয়ার পর থেকে চাইতেন তিনি মদীনায় শহীদ হবেন। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার রাসূলের শহরে শহীদ হিসেবে মরতে চাই।' এই দুআ শুনে তাঁর কন্যা হাফসা ﷺ বললেন, "আব্বা, আপনি কিভাবে মদীনায় শহীদ হবেন? মদীনা তো নিরাপদ শহর, মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। আপনি যদি শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চান তাহলে আপনাকে ইরাক বা সিরিয়া যেতে হবে, মদীনায় নয়।" এরপর উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বললেন, 'যদি আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু ঘটাতে চান, তাহলে তিনি তা অবশ্যই ঘটাবেন।' পরবর্তীতে দেখা যায়, উমার ﷺ মদীনাতেই শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সে সময় তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ মসজিদে ইবাদতরত অবস্থায় ছিলেন।

মদীনা হলো ঈমানের আশ্রয়স্থল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে সেভাবে, যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।' মদীনা শহরে কোনো অপবিত্রতা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, মদীনাকে পছন্দ হয় না বলে কেউ মদীনা ত্যাগ করে না, বরং আল্লাহ তাআলাই তাদের চেয়েও উত্তম কাউকে দ্বারা তাদেরকে প্রতিস্থাপন করে দেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, 'মদীনা অপবিত্র ও খারাপ লোকদের বহিষ্কার করে দেয়।' তিনি আরো বলেন, 'শেষ বিচারের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মদীনা সমস্ত খারাপ লোকদের ঠিক সেভাবেই বের করে দেয়, যেভাবে আগুন লোহার মরিচাকে দূর করে দেয়।'

স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়াজাল মদীনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে কেউ মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, সে সেভাবে বিলীন হয়ে যাবে যেভাবে লবণ পানিতে বিলীন হয়ে যায়।'

মদীনা হলো পবিত্র নগরী। নবীজি ﷺ এর পবিত্রতা সম্পর্কে বলেছেন, 'মদীনা পবিত্র, এখানে তোমরা গাছ কাটবে না, শিকার করবে না, অস্ত্র বহন করতে পারবে না।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ হিজরতের পটভূমি: গুপ্তহত্যার চেষ্টা

মুশরিকরা যখন দেখলো মুসলিমরা একে একে পরিবার-পরিজন নিয়ে ধন-সম্পদ ফেলে মদীনায় জমা হচ্ছে তারা অস্থির হয়ে গেল। মুসলিমদের মদীনায় হিজরতের ফলাফল কী হতে পারে তা তাদের অজানা ছিল না। তারা টের পেয়েছিল আওস এবং খাযরাজ গোত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ নেতৃত্বে এক হচ্ছে এবং তাদের মিলিত শক্তির সাথে পেরে ওঠা সহজ কথা নয়। মদীনায় মুসলিমদের ঘাঁটি গড়ার অর্থ হলো, তাদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়া, কেননা কুরাইশদের ব্যবসা ছিল ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে দীর্ঘ উপকূলীয় পথ রয়েছে সে পথেই কুরাইশদের কাফেলা চলাচলা করতো আর মদীনা থেকে সে পথ খুব দূরে নয়। কুরাইশরা দীর্ঘদিন ধরে আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার যে স্বপ্ন দেখে আসছিল, মদীনায় মুসলিমদের উত্থান হলে সে স্বপ্নে মুসলিমরা ব্যাঘাত ঘটাবে। অত্যাচার-নির্যাতন, প্রলোভন, সমঝোতা, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, হত্যার হুমকি, বয়কট–কিছুই যখন কাজ হলো না তখন কুরাইশরা ক্ষুব্ধ ষাঁড়ের মত ফুঁসলে উঠলো। ব্যর্থ, পরাজিত মানুষের মত বেপরোয়া, মরিয়া, অস্থির-উন্মাদপ্রায় কুরাইশরা গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করলো: মুহাম্মাদকে ﷺ তারা মারবেই–যে করেই হোক।

দারুন নাদওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসলো, শিরোনাম: মুহাম্মাদকে ﷺ কীভাবে থামানো যায়। কুরাইশদের বড় বড় নেতারা এ অধিবেশনে অংশ নিল। বেশ কিছু প্রস্তাব এলো। কেউ প্রস্তাব করলো তাঁকে কারাগারে আটকে রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাব খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কারণ তারা খুব ভালো করে জানতো যে, রাসূলুল্লাহকে ﷺ কারাগারে প্রেরণ করলে সাহাবীগণ ﷺ তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন, এমনকি তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে বসতে পারেন। প্রস্তাব হলো, রাসূলুল্লাহকে ﷺ মক্কা থেকে বের করে দেওয়া। কিন্তু এ প্রস্তাবও খুব একটা হালে পানি পেল না, কারণ রাসূলুল্লাহর ﷺ কথাবার্তা ছিল খুবই চমৎকার, তাঁর সুন্দর কথা শুনে মক্কার বাইরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর দলে যোগ দিয়ে মক্কায় আক্রমণ চালাতে পারে।

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে জঘন্য প্রস্তাব ছিল নবীজিকে ﷺ হত্যা করা। এই প্রস্তাব আর কারো নয়, এই প্রস্তাব কুখ্যাত আবু জাহেলের।[58] সে প্রস্তাব করলো, প্রত্যেক শক্তিশালী অভিজাত বংশের একজন করে শক্তসমর্থ কাউকে পাঠানো হবে। তাদের সবার হাতে থাকবে একটি করে ধারালো তলোয়ার। তারা সবাই একযোগে

[58] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩।

রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যা করবে। ফলে হত্যার দায় নির্দিষ্ট কাউকে বহন করতে হবে না, মক্কার সমস্ত গোত্র এই হত্যার দায়ভার নেবে। সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবার মক্কার সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারবে না, তারা রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। মুশরিকরাও খুশি মনে রক্তপণ দিয়ে দিবে। প্রস্তাবটি জঘন্য হলেও বেশ কার্যকরী ছিল, মক্কার সংসদে হত্যার বিল পাস হলো।

> **"আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য – তখন তারা যেমন পরিকল্পনা করতো তেমনি, আল্লাহও পরিকল্পনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর পরিকল্পনাই সবচেয়ে উত্তম।" (সূরা আনফাল, ৮: ৩০)**

মুশরিকদের পরিকল্পনা ছিল রাসূলুল্লাহকে ﷺ গোপনে হত্যা করা, কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল তাঁকে তিনি রক্ষা করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর নবী মুহাম্মাদকে ﷺ শিখিয়ে দিলেন একটি দুআ।

> **"বলুনঃ হে আমার রব, যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭: ৮০)**

"আমাকে সেখানে নিয়ে যান, যেখানে আমার গমন শুভ" – এখানে মদীনার কথা বোঝানো হচ্ছে; "যেখান হতে নির্গমন শুভ সেখান হতে আমাকে বের করে নিন" – এখানে বলা হচ্ছে মক্কার কথা এবং "আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি" – এখানে বলা হচ্ছে শাসনকর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক ক্ষমতার কথা। আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিচ্ছেন এই দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে চাই শাসনকর্তৃত্ব বা শক্তি।

হিজরতের সিদ্ধান্ত

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে رضي الله عنه বিষয়টি জানানোর জন্য তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলেন। আ'ইশা رضي الله عنها সেদিনের কথা বর্ণনা করেন, 'আমরা দেখলাম একজন মানুষ মুখ কাপড়ে ঢেকে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন।' আবু বকর رضي الله عنه তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। আবু বকর رضي الله عنه বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার, তা না হলে তিনি এ অসময়ে এভাবে আসতেন না।' দুপুর বেলা বিশ্রামের সময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ এভাবে আসার কথা না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ঢুকেই আবু বকরকে رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পরিবারের

সবাই কি চলে গেছে?' আবু বকর ﷺ বললেন, 'এখানে যারা আছেন তাঁরা তো সবাই আপনার পরিবারের সদস্য।' আবু বকর ﷺ বুঝাতে চাইলেন, আমার পরিবার তো আপনার নিজের পরিবারের মতোই, তাই আপনি তাদের বিশ্বাস করতে পারেন এবং তাদের সামনেই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে ﷺ জানালেন, 'আবু বকর, আল্লাহ তাআলা আমাকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন!' আবু বকর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর রসূল, আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!' রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে আবু বকর ﷺ কাঁদতে লাগলেন। আ'ইশা বলেছেন, 'সেদিন আমার পিতা খুশিতে যেভাবে কেঁদেছিলেন আমি কোনোদিন কাউকে আনন্দে এভাবে কাঁদতে দেখিনি।' [59]

মদীনায় হিজরত করা যে খুব আনন্দদায়ক ভ্রমণ ছিল তা কিন্তু নয়। আবু বকর ﷺ ভালোমতোই জানতেন যে, হিজরতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সফরসঙ্গী হওয়ার অর্থ নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া। তিনি বিপদাপন্ন একটি সফরে যাচ্ছেন জেনেও তিনি খুশিতে কেঁদে উঠেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ ভালোবাসতেন। নিজের জীবনের ভয়ে আবু বকর ﷺ ভীত ছিলেন না, বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য এই আত্মত্যাগের সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

বাসভবন ঘেরাও

গুপ্তহত্যার অপারেশনের জন্য নির্বাচিত করা হলো এগারো জনকে, এদের মধ্যে আবু জাহেল এবং আবু লাহাবও ছিল। তারা সবাই রাসূলুল্লাহর ﷺ বাসার চারদিকে ওঁৎ পেতে রইল। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে পড়লেই তাঁর বাসায় একযোগে হামলা চালাবে। তারা নিশ্চিত মনে হাসাহাসি করছিল, এবারের মিশন সফল হবেই, কেউ তাদেরকে থামাতে পারবে না। নির্ঘুম চোখে তারা অপেক্ষা করছিল সেই 'বিজয়' মুহূর্তের।

রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন কুরাইশরা। সেই রাতে আলী ইবন আবু তালিবকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে রাখা কুরাইশদের আমানত বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার এই সবুজ হাদরামাউতি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। ওদের হাতে তোমার কিছুই হবে না।' আলী নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথামতো বিছানায় শুয়ে থাকলেন। সাহাবারা ﷺ আগ্রহের সাথে তাদের এই দায়িত্বগুলো পালন করতেন। এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছেন খুশিমনে।

---

[59] সীরাত ইবন হিশাম, পৃষ্ঠা ১৫৬।

এদিকে কুরাইশরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশায়। আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বললো, 'আরে তোমরা জানো মুহাম্মাদ কী বলে! সে বলে তার দ্বীন মানলে তোমরা নাকি আরব অনারবের বাদশাহ হবে! মরার পর তোমাদের নাকি বাগান থাকবে, জর্ডানের বাগানের মতো বাগান! আর তোমরা যদি তাকে না মানো, তাহলে তোমাদের মেরে ফেলা বৈধ হয়ে যাবে আর মরার পর তোমরা আগুনে পুড়বে!'

'হ্যাঁ, আমি এ কথাই বলেছি আর আগুনেই পুড়বে তুমি' – রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, কেউ তাঁকে আর দেখতে পেল না। সকলের অগোচরে তিনি ঘর ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবৃত্তি করছিলেন সূরা ইয়াসীনের আয়াত[60],

> "আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি এবং আবৃত করে দিয়েছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬: ৯)

এদিকে কুরাইশদের সেই এগারো জন মাথায় মাটি নিয়ে বসে থাকলো নির্ধারিত সময়ের আশায়। কিন্তু তারা তার আগেই জানতে পারলো আল্লাহর রাসূল ﷺ আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তবু দুরাশা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো কেউ একজন বিছানায় শুয়ে আছে। তারা ভাবলো বুঝি রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে আছে। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা দেখলো শুয়ে আছে আলী। প্রচণ্ড হতাশ হয়ে আলীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় মুহাম্মাদ?' আলী বললেন, 'জানি নাহ।'

মদীনার পথে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর رضي الله عنه ইতিমধ্যেই মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে বেশ অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তিনি মক্কা ত্যাগ করার সময় বারবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর নামে বলছি, মক্কা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নগরী। আমাকে যদি এখান হতে বের করে দেওয়া না হতো তাহলে আমি কখনো এ নগরী ছেড়ে যেতাম না। এখানে থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকলে আমি মক্কা ত্যাগ করতাম না।'

মদীনা অভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ খেয়াল করলেন আবু বকর رضي الله عنه কিছু সময় তাঁর আগে-আগে হাঁটছেন আবার কিছু সময় তাঁর পিছন-পিছন হাঁটছেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

- কী ব্যাপার? কখনো তুমি আমার সামনে চলছো, আবার কখনো পিছনে চলছো,

---

[60] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৪।

কেন?

- আমার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার সামনে চলে যাই। আবার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার পিছন-পিছন হাঁটি।

- আবু বকর, তুমি কোনটা চাও, আমার ক্ষতি নাকি তোমার ক্ষতি?

- আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমার ক্ষতি হলে হোক, কিন্তু আপনার ক্ষতি হোক এটা আমি হতে দিতে চাই না।[61]

> **"এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ?"**

এরপর তাঁরা একটি গুহার কাছে পৌঁছালেন। প্রথমে আবু বকর ﷺ গুহার ভেতরে ঢুকে সবকিছু ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সেখানে কোনো সাপ, বিছা অথবা কোনো শত্রুদল ঘাপটি মেরে আছে কিনা। সবকিছু নিরাপদ দেখে তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভিতরে আসতে বললেন। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা তাদের গতিবিধি নজরদারি করতে সক্ষম হয় এবং গুহার খুব কাছে চলে আসে। আবু বকর ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, যদি মুশরিকদের কেউ মাথা নিচু করে পা বরাবর তাকায় তাহলে তারা আমাদের দেখে ফেলবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, 'আবু বকর, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ? তুমি কি তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হবে?' গুহার খুব কাছে এসেও মুশরিকদের ফিরে যাওয়ার কারণটি ছিল খুবই অদ্ভুত। একটি অতি ঠুনকো মাকড়শার জাল।[62]

> **"... আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল..." (সূরা আনকাবূত, ২৯: ৪১)**

যে মাকড়শার জালকে একটি আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা যায়, সেই দুর্বল মাকড়সার জালই হয়ে গেল এখানে আল্লাহ তাআলার সৈনিক। এটিই গুহায় মুশরিকদের সৈনিকদের ঢুকতে বিরত রেখেছিল। আল্লাহ যদি চান, তিনি তাঁর সুবিশাল সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে দুর্বলতম সৃষ্টিকেও সৈনিক হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। হিজরতের দিনে রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গী হিসেবে ছিলেন শুধু আবু বকর ﷺ, সাহাবাদের ﷺ কেউই সেখানে ছিলেন না। তার উপর মুশরিকরা তাদের ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহকে ﷺ সেই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই যথেষ্ট

---

[61] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩০। তবে সনদের বিবেচনায় বর্ণনাটি তেমন শক্তিশালী নয়।

[62] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১।

ছিলেন। এই ঘটনার পর আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

> "যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাঁকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাঁকে দেশান্তর করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর আপন সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ৪০)

আবু বকরের জন্য এই আয়াত একটি বিরাট সম্মান। কারণ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আবু বকরকে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী বা সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের সাথে সেই গুহাতে তিনদিন অবস্থান করেন। আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহ তাদের সাথে রাতের বেলা গুহায় অবস্থান করতো কিন্তু দিনের বেলা মক্কায় গিয়ে খোঁজ নিত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে কী পরিকল্পনা করছে। মুশরিকরা যাতে আবদুল্লাহর গুহায় যাওয়া-আসার বিষয়ে টের না পায় এজন্য সে আবু বকরের আযাদকৃত দাস আমির ইবন ফুহাইরাহকে ﵁ বলে দিত সে যেন তার ভেড়ার পাল নিয়ে আবদুল্লাহর অনুসরণ করে। এতে দুটো সুবিধা, প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﵁ ভেড়ার দুধ পান করতে পারতেন। এতে তাদের খাবারের প্রয়োজন পূরণ হতো। দ্বিতীয়ত, ভেড়ার পাল আবদুল্লাহ ও আমিরের ﵄ যাত্রাপথে তাদের পায়ের ছাপ নষ্ট করে দিত, ফলে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কেউ আঁচ করতে পারতো না।

এভাবেই তিনদিন চলে গেল। তিনদিন পর সেখানে আবদুল্লাহ ইবন উরাইক্বাত নামের এক ব্যক্তি এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরকে ﵁ মক্কা থেকে মদীনায় নেওয়ার জন্য নবীজি ﷺ তাকে ভাড়া করেছিলেন। সে ছিল মুশরিক। সাধারণত যে পথে সবাই মক্কা থেকে মদীনায় যায় আবদুল্লাহ ইবন উরাইক্বাত তাদেরকে সেই পথ দিয়ে না নিয়ে অন্য আরেকটি পথ দিয়ে নিয়ে যায়। মদীনা পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাঁরা উপকূল ঘেঁষে চলতে থাকেন।

হুলিয়া জারি ও মাথার দাম ঘোষণা

কুরাইশের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরকে ﵁ ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একশো উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে। জীবিত অথবা মৃত। তারা মরুভূমির বেদুইন গোত্রসমূহের কাছে এই পুরস্কারের ঘোষণা জানিয়ে দেয়। তারা মরুভূমির পথঘাট

সম্পর্কে দক্ষ ছিল। এমনই এক লোক ছিল সুরাকা ইবন মালিক। সে ছিল এক বেদুইন গোত্রের নেতা। হিজরতের একটি ঘটনা তার মুখে জানা যায়।[63]

"আমি বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এমন সময় একজন এসে বললো, 'আমি দিগন্তের দিকে দুইজন লোককে দেখেছি। কুরাইশরা দুজনকে খুঁজছে। মনে হয় তারাই সেই লোক।' আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আরে না, তারা সেই লোক হতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেও এই দুই লোক এখানে ছিল, এইমাত্র চলে গেছে।' আসলে আমি ঠিকই জানতাম যে ওই দুইজন লোক আসলে মুহাম্মাদ আর আবু বকর। কিন্তু আমি নিজেই একশ উট পাওয়ার লোভে তাদেরকে মিথ্যে বলি।'

এরপর সুরাকা সেখানে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলো। কারণ চট করে উঠে গেলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে। তারপর সে বাসায় গিয়ে তার চাকরকে বললো তার ঘোড়াটি প্রস্তুত করে লুকিয়ে রাখতে। কিছুক্ষণ পর সে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে নেয় একটি লম্বা বর্শা। কেউ যেন সেই বর্শা দেখতে না পায় এজন্য সে বর্শাটি মাটির সাথে ঘেঁষে ঘেঁষে নিয়ে গেল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরকে ﷺ ধরার জন্য রওনা দিল। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলো সে ওই লোকের দাবিই ঠিক। ওই দুই লোক আসলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর ﷺ।

কোটিপতি হওয়ার সুযোগ থেকে সুরাকা মাত্র অল্প কিছু হাত দূরে। অন্যদিকে, আবু বকর ﷺ বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিন্তমনে কুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি একবারও পিছন ফিরে তাকাননি। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন। আবু বকর ﷺ নিজেকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না, তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবু বকর ﷺ বুঝতে পারলেন কেউ একজন তাদের অনুসরণ করছে। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ ব্যাপারটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তৎক্ষণাৎ সুরাকা ঘোড়া থেকে পড়ে গেল আর ঘোড়াটি মাটিতে বসে গেল। লোভী সুরাকা আবার ঘোড়াটিকে সামলানোর চেষ্টা করলো কিন্তু সে আবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। এমন ঘটনা তার জীবনে আর কখনো ঘটেনি। তৃতীয়বার যখন একই ঘটনা ঘটলো তখন সুরাকার চোখেমুখে একরাশ ধূলি এসে পড়ল। সুরাকা বুঝতে পারল যে এই লোকের সাথে আল্লাহর সাহায্য আছে। এরপর সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুরোধ করলো যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ আগেও যে ব্যক্তি পুরস্কারের লোভে রাসূলুল্লাহকে ﷺ কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য খুঁজছিল এখন সে নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই চিন্তিত! সুরাকা বললো, 'আমার নিরাপত্তার জন্য একটি চিঠি লিখে দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আমির ইবন ফুহাইরাহকে একটি নিরাপত্তাপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। পত্রটি লেখা হয়েছিল চামড়া অথবা হাড়ের উপর। সুরাকা এই পত্রটিকে স্মারকচিহ্ন হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেয়। ৮-৯ বছর পরে নবীজির ﷺ পারস্য

---

[63] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১।

অবরোধের সময় সুরাকা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। সুরাকা তখন সেই নিরাপত্তাপত্রটি বের করে দেখালে মুসলিমরা তাকে ছেড়ে দেয়।

নিরাপত্তাপত্র যোগাড় করে সুরাকা মক্কায় ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ খোঁজাখুঁজি করার ব্যাপারে কুরাইশদের নিরুৎসাহিত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহই ﷺ তাকে এই কাজটি করতে অনুরোধ করেছিলেন। এভাবে সুরাকা হয়ে গেল রাসূলুল্লাহর ﷺ পাহারাদার, অথচ কিছুক্ষণ আগেও সে পুরস্কারের লোভে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ধরার জন্য তৎপর ছিল।

যাত্রাবিরতি: উম্ম মা'বাদের তাঁবু

যাত্রাপথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ؓ খুযাআ গোত্রের উম্ম মা'বাদ নামক এক মহিলার তাঁবুর কাছে থামেন। উম্ম মা'বাদ ছিলেন একজন দানশীল মহিলা। তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়া পথিকদের তিনি আপ্যায়ন করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরকে ؓ উম্ম মা'বাদ কিছুই দিতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্ম মা'বাদের কাছে খাবারের খোঁজ করেন। উম্ম মা'বাদ বললেন যে যদি দেওয়ার মতো কিছু থাকতো তাহলে তাঁর কাছে চাওয়া লাগতো না, বরং তিনি নিজে থেকেই দিতেন। আসলে উম্ম মা'বাদের শুধু একটি দুর্বল বকরী ছিল। খরার কারণে সেটির দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর দুধ দোহানোর জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চান। উম্ম মা'বাদ তাঁকে অনুমতি দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছ থেকে একটি বড় পাত্র চেয়ে নেন। তিনি বকরীটিকে স্পর্শ করামাত্রই বকরীটি দুধ দেওয়া শুরু করে। পাত্র না ভরা পর্যন্ত বকরীটি দুধ দিতে লাগল। পাত্রটি ভরে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে তা উম্ম মা'বাদকে দেন। এরপর একে একে সবাই তৃষ্ণা মিটিয়ে দুধ পান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার শেষে দুধ পান করেন। দুধ পান শেষে তিনি বলেন, 'ঘরের সেবকরা সবার শেষেই পান করে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্ম মা'বাদের জন্য পাত্রে কিছু দুধ রেখে দেন। উম্ম মা'বাদের স্বামী বকরীর পাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে দুধ দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দুধ কোথা থেকে এল?' উম্ম মা'বাদ বললেন, 'এক বরকতময় লোক এসেছিলেন আজ। তিনি-ই বকরীর দুধ দোহন করেছেন।' আবু মা'বাদ স্ত্রীর কাছে সেই লোকের বর্ণনা শুনতে চাইলেন। উম্ম মা'বাদ রাসূলুল্লাহকে ﷺ একবার মাত্র দেখেছিলেন। কিন্তু যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা এখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ সম্পর্কে দেওয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণনা।

> 'আমি তাঁকে দেখেছি, উজ্জ্বলদীপ্ত চেহারা, সুন্দর তাঁর গড়ন, সুদর্শন তাঁর মুখশ্রী, ছিপছিপে তাঁর শরীর। মাথাটা খুব ছোট নয়, বরং দেখতে তিনি অভিজাত এবং সুপুরুষ। চোখদুটো তাঁর ঘনকালো, পাঁপড়িগুলো টানাটানা। বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চেহারা, ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর। ভ্রু-যুগল উঁচু আর ধনুকের মতো বাঁকানো, চুলগুলো পরিপাটি। তাঁর গ্রীবা বিস্তৃত এবং দাড়ি বেশ ঘন। তাঁর গাম্ভীর্য তাঁর আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে, তাঁর কথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন

করে। তাঁর কথাগুলো মনোমুগ্ধকর আর দৃঢ়, চটুল কিংবা ফেলনা নয়। তাঁর প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় বাঁধা মুক্তোর মতো মসৃণ। দূর থেকে তাঁকে দেখতে যেমন উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয়, কাছ থেকে দেখলেও তাঁকেই সবচেয়ে সুদর্শন লাগে। উচ্চতায় তিনি মাঝারি। খুব লম্বাও নন আবার খাটোও নন। বাকি দুইজনের মাঝে তিনি উঁচু বৃক্ষের শাখার মতো, তবে তিনজনের মাঝে তিনিই সবচে সুন্দর। তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যখন কথা বলতেন, তারা মন দিয়ে শুনতো, তিনি যখন কিছু আদেশ দিতেন তা পালন করতে তারা ছুটে যেতো। তিনি কখনও মুখ গোমড়া করেননি। আর কেউ একবারও তাঁর কথার বিরোধিতা করেনি।’[64]

বর্ণনা শুনে আবু মা’বাদ বললেন, ‘এই লোকটি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁকে তো কুরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি যদি তাঁর সাথে দেখা করতে পারতাম তাহলে তাঁর কাছে মুসলিম হওয়ার স্বীকারোক্তি দিতাম।’ তাঁর স্ত্রী উম্মু মা’বাদ আগেই রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি দিয়ে মুসলিম হয়েছিলেন।

হিজরত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

হিজরত কী?

হিজরত দুই প্রকার। একটি আক্ষরিক অর্থে আরেকটি রূপক অর্থে। আন-নাসাঈর একটি হাদীসে রূপক অর্থের হিজরত সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করা হলো হিজরত।’ এই অর্থে হিজরত বলতে বোঝায় গুনাহগার অবস্থা ছেড়ে আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে ফিরে আসা। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনে বলেন, ‘অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো’। অপবিত্রতা, মূর্তিপূজা ও হারাম কাজ ছেড়ে চলে আসাও একধরনের হিজরত আর এই ধরনের হিজরত করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক।

আরেক ধরনের হিজরত হলো দেশান্তরী হওয়া, খারাপ জায়গা ছেড়ে ভালো জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া, কুফফার শাসিত রাষ্ট্র থেকে ইসলামিক শরীয়াহ্ শাসিত রাষ্ট্রে চলে যাওয়া। এই ধরনের হিজরতের উদাহরণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা অথবা বনী ইসরাইলের সেই ব্যক্তির হিজরত, যে একশো লোক খুন করার পর এক আলিমের কাছে যায় এবং সেই আলিম তাকে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করবেন, কিন্তু তোমাকে এই খারাপ জায়গা ত্যাগ করতে হবে এবং এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে জনগণ তোমাকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে সাহায্য করবে।

---

[64] যাদুল মা’আদ, ২য় খণ্ড।

অর্থনৈতিক উন্নতি

হিজরতের ফলে অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আন্দালুসিয়ার শেষ ইসলামি রাষ্ট্র গ্রানাডা। যখন স্পেনের খ্রিস্টান সৈন্যরা উত্তর দিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্র দখল করা শুরু করে তখন মুসলিমরা দক্ষিণ স্পেনে চলে যায়। এতে দক্ষিণ স্পেনের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে ২০ লক্ষে দাঁড়ায়, কিন্তু আগত অভিবাসীরা ছিল কাজেকর্মে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, তাই তাদের দ্বারা গ্রানাডার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। শেষ পর্যন্ত এটি সমগ্র ইউরোপের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যদিও বর্তমানের অবস্থা ভিন্ন, মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ স্থায়ীভাবে থাকার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোতে চলে যাচ্ছে, মুসলিম দেশগুলো তাদের দক্ষতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সতর্কতার মধ্যমপন্থা

হিজরতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সামান্যতম ছাড়ও দেননি। খুঁটিনাটি সব বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখ ঢেকে দুপুর বেলা আবু বকরের রাঃ বাসায় যান।

দ্বিতীয়ত, গোপনীয়তার স্বার্থে তিনি আবু বকরকে রাঃ আলোচনার সময়ে বাড়িতে কে কে আছে সেটা জেনে নেন।

তৃতীয়ত, তিনি আলী ইবন আবু তালিবকে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দেন যাতে শত্রুরা তাঁর চলে যাওয়ার ব্যাপারটি আঁচ করতে না পারে।

চতুর্থত, হিজরতের যাত্রার জন্য আগে থেকেই উট প্রস্তুত রাখা ছিল।

পঞ্চমত, চারপাশ অন্ধকার হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে রাঃ সাথে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়েছিলেন।

ষষ্ঠত, তাঁরা একজন গাইড বা পথপ্রদর্শক ভাড়া করেছিলেন।

সপ্তমত, মদীনা ছিল মক্কার উত্তরে, কিন্তু শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য তাঁরা প্রথমে দক্ষিণের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

অষ্টমত, তাঁরা একটি গুহায় তিনদিন লুকিয়ে ছিলেন।

নবমত, আবদুল্লাহ দিনের বেলা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মক্কায় থেকে যেতেন আর রাতের বেলা গুহায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রাঃ কে সব জানাতেন।

দশমত, আমির ইবন ফুহায়রা তাদেরকে খাবার এনে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য। কিন্তু তারপরও তিনি মদীনাতে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তিনি এর মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন যে, মুসলিম

হিসেবে জাগতিক প্রচেষ্টার সবটুকুই ঢেলে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখানো পথ অনুসারেই সকল প্রকার ইসলামি কাজকর্মের পরিকল্পনা করতে হবে ও সর্বোচ্চ শ্রম দিতে হবে। বিপদের ভয়ে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা যাবে না বরং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ করে যেতে হবে।

মুসলিম নারীদের সাহসী ভূমিকা

হিজরতের ঘটনার সিংহভাগ বর্ণিত হয়েছে আ'ইশার ﷺ সূত্রে, পুরো ঘটনা তিনিই সংরক্ষণ করেছেন। আসমা বিনতে আবি বকরকে ﷺ বলা হয়, 'যাতুন নিতাকাইন' বা দুই ফিতাওয়ালী। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বাবার জন্য থলেতে পাথেয় ও মশক গুছিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু মুখ বাঁধার জন্য কাছেধারে কোনো রশি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন নিজের কোমরের নিতাক বা বন্ধনী খুলে দু'টুকরো করে একটি দিয়ে থলে এবং অন্যটি দিয়ে মশকের মুখ বেঁধে দেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দুআ করেন আল্লাহ যেন এর বিনিময়ে জান্নাতে তাঁকে দুটি 'নিতাক' দান করেন, এজন্য তাঁর নাম হয় যাতুন নিতাকাইন।[65]

হিজরতের পরে তাঁর উপর বেশ ঝড় যায়। আবু বকর ﷺ চলে যাওয়ার পর আবু জাহেলসহ কুরাইশের কিছু লোক তাঁর বাড়িতে আসে। আসমা দরজা খুলে দেন, আবু জাহেল আবু বকরের ব্যাপারে জানতে চায়। আসমা জবাব দিলেন তিনি জানেন না। এ কথা শুনে আবু জাহেল তাঁর গালে জোরে আঘাত করেন। কিন্তু তারপরও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পিতা আবু বকরের নিরাপত্তার কথা ভেবে তা ধৈর্য ধরে সয়ে নেন। এখানে আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, তিনি সত্য গোপন করেছিলেন এবং মুসলিমের নিরাপত্তার স্বার্থে মিথ্যা বলা যায়।

আবু বকরের ﷺ পিতা, অর্থাৎ আসমা বিনত আবি বকরের ﷺ দাদা ছিলেন অন্ধ, তিনি এসে বললেন, 'আমার ছেলে দেখছি তোমাকে ভালো ঝামেলার মধ্যে ফেলে চলে গেছে। তোমার জন্য কোনো টাকা-পয়সাও রেখে যায় নি।' আসমা ﷺ ছিলেন বুদ্ধিমতী। তিনি একটি বস্তার মধ্যে কিছু পাথর ভরে নিয়ে এসে সেটা তাঁর দাদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বুঝাতে চাইলেন যে তাঁর পিতা আবু বকর ﷺ অনেক টাকাপয়সা রেখে গিয়েছেন। দাদা শুনে খুব খুশি হলেন। দাদাকে শান্ত রাখার জন্যই তিনি এই কাজটি করেছিলেন।

বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বন্ধু হিসেবে আবু বকর সিদ্দীককে ﷺ বেছে নিয়েছিলেন। আবু বকর ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তিনি যখন জানতে পারলেন

---

[65] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে হিজরত করার মতো সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন, তখন তিনি আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিলেন। আবু বকর ﷺ ছিলেন বুদ্ধিমান, আল্লাহভাজন একজন মানুষ। গুহায় আশ্রয় নেওয়ার সময় তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ প্রথমে গুহায় ঢুকতে না দিয়ে নিজে আগে ঢুকে পরীক্ষা করে নেন বিপজ্জনক কিছু আছে কি না। অতঃপর নিশ্চিত হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভেতরে ঢুকতে দেন।

উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ খিলাফতের সময়ের একটি ঘটনা, তিনি শুনতে পেলেন কিছু লোক আবু বকর ﷺ আর উমারের ﷺ মধ্যে কে উত্তম – তা নিয়ে আলোচনা করছে। এটা শুনে তিনি তাদের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, 'তোমরা শুনে রাখো, আবু বকরের এক দিন উমার আর উমারের পুরো পরিবারের সারাজীবন অপেক্ষা দামি।' তারপর তিনি হিজরতের ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন যে, হিজরতের সেই দিনটি শুধু উমার নয়, বরং তাঁর পরিবারের পুরো জীবন থেকেও উত্তম। সাহাবারা ﷺ আবু বকর ﷺ সম্পর্কে কেমন উঁচু ধারণা পোষণ করতেন তা উমারের ﷺ এই কথার মাধ্যমে বুঝা যায়।

গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা

হিজরতের সময়ে এবং মাক্কী জীবনের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় সব কাজেই অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলছিলেন। ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করার জন্যই তিনি গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু গোপনীয়তা ও দাওয়াহর মধ্যে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। হিজরতের একটি ছোট্ট ঘটনা দেখিয়ে দেয় কীভাবে এই দুটো কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়।

রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কা ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি খুব কম লোকই জানতো। আলী ইবন আবু তালিব, আবু বকর ﷺ ও তাঁর পরিবার ছাড়া আর কেউই বিষয়টি জানতেন না। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﷺ যখন বের হলেন, তখন তাদের কোনো কিছুর দরকার পড়লে আবু বকরের ﷺ ব্যবসায়িক পরিচিতি বেশ কাজে লাগত। কারণ আবু বকর ﷺ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতেন, তাই তিনি মক্কার বাইরের অনেক গোত্রের কাছে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, মক্কার বাইরের লোকজন রাসূলুল্লাহর ﷺ নাম শুনলেও তাঁকে সরাসরি খুব একটা চিনতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত মক্কা আর মক্কার বাইরে শুধু তাইফে তাঁর দাওয়াহর কাজ করেছেন। অনেকেই তাঁর নাম শুনেছিল কিন্তু তিনি দেখতে কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। আবু বকর ﷺ বেশ পরিচিত থাকায় কেউ তাদেরকে দেখলে আবু বকরের সাথে কথা বলতে এগিয়ে আসতো। তারা আবু বকরকে ﷺ জিজ্ঞেস করতো যে, তাঁর সাথে থাকা লোকটি কে অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। তখন আবু বকর ﷺ জবাব দিতেন এভাবে, 'ইনি হলেন আমার পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' এ কথা শুনে তারা মনে করতো, আবু বকরের সাথে থাকা এই লোক অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে ﷺ মরুভূমির

মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও আবু বকর ﷺ বুঝিয়েছেন ভিন্ন কথা, তিনি বুঝিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথের অভিমুখে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি এটা এমনভাবে বলতেন যাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ আসল পরিচয় গোপন থাকে কেননা রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন ছিল হুমকির মুখে। আবু বকর ﷺ মিথ্যাও বলেননি, ঘুরিয়ে কথা বলেছেন। এটাকে বলা হয় তাউরী, গোপনীয়তা রক্ষা করা।

কিন্তু একই সাথে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দেওয়াটাই হিকমাহ। তাই হিজরতকালে যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আবু বুরাইদাহ আল আসলামির দেখা হয়, তখন তিনি নিজেকে সর্বশেষ রাসূল হিসেবেই নিজের পরিচয় দেন এবং তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এরপরে আবু বুরাইদাহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে বুরাইদাহ রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ১৯টি যুদ্ধের মধ্যে ১৬টি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময়েই দুইজন চোরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তারাও মুসলিম হয়ে যায়। তিনি তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, 'আমাদের নাম হলো আল মুহানান', আল মুহানান মানে হলো 'অসম্মানিত ব্যক্তি'। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ নাম বদলে দিয়ে তাদেরকে 'মুকরামান' বা 'সম্মানিত ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করেন।

মাক্কী জীবনেও এরকম আরেকটি ঘটনা রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মেষপালককে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি সেই মেষপালকের কাছে দুধ খেতে চাইলেন। মেষপালক বললো, এই মুহূর্তে কোনো ছাগলের কাছেই দুধ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে ছাগলের দুধ দোহন করার অনুমতি চাইলেন। মেষপালকের অনুমতি পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ দোহন করা শুরু করলেন, আর প্রচুর পরিমাণে দুধ বের হয়ে আসল। প্রথমে মেষপালককে দুধ পান করতে দেওয়া হলো, এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তারপরে আবু বকর ﷺ দুধ পান করলেন। তখন মেষপালক রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলো,

- আকাশের শপথ! সত্যি করে বলুন তো কে আপনি? আমি আপনার মতো কাউকে এখনো দেখিনি।

- আমি যদি আমার আসল পরিচয় তোমাকে দেই তাহলে তুমি কি তা গোপন রাখবে?

- হ্যাঁ, রাখবো।

- আমি মুহাম্মাদ, আল্লাহর রাসূল।

- তবে কি আপনিই সে ব্যক্তি যাকে কুরাইশরা সাবিঈ বলে সম্বোধন করে?

সাবিঈ একটি অবজ্ঞাসূচক শব্দ, কুরাইশরা ইচ্ছা করে মুসলিমদেরকে হেয় করার জন্য এই নামে ডাকতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তারা এই নামে ডেকে থাকে।' তারপর মেষপালক বললো,

- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি যা বলেছেন তা সত্য এবং আপনি মাত্র যা করলেন তা একজন রাসূলই করতে পারে। আমি এখন থেকে আপনার উপর অবতীর্ণ দ্বীনের অনুসারী।

- তুমি এখনই তা কোরো না। যখন তুমি দেখবে আমি প্রকাশ্যে নিজেকে ঘোষণা করছি, তখন তুমি এসে আমাদের সাথে যোগ দিও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মুসলিম হতে মানা করেননি, তিনি তাঁকে মুসলিম জামা'আতে যোগ দিতে বারণ করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও গোপনে দাওয়াহর কাজ করে যাচ্ছিলেন। এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ একইসাথে দাওয়াহ করেছেন ও নিজের পরিচয়ও গোপন রেখেছেন। এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় কীভাবে দাওয়াহ ও গোপনীয়তা রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র সেসব ব্যক্তির কাছেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন যাদেরকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে যে তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিবেন।

স্বাবলম্বী হওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আবু বকরকে ﷺ হিজরতের ব্যাপারে জানান তখন আবু বকর ﷺ যাত্রার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন, হিজরতের জন্য দুইটি উট প্রস্তুত করা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছ থেকে উটটি কিনে নেন। এখানে লক্ষণীয়, একজন দাঈর অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যখন একজন আলিম সরকারী খরচে জীবনযাপন করেন, তখন সরকারি বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন হলে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সরকার তার পক্ষে ফতোয়া দেওয়ার জন্য সেই আলিমের উপরে চাপ দেয়। সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে সরকারের কোনো অন্যায়ের বিপক্ষে কথা বলতে বা তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে অনেকেই দ্বিধাবোধ করে। এ কারণে আলিম, দাঈ ও ইসলামি ব্যক্তিত্বদের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হওয়া জরুরী।

সূচিপত্র

মদীনার উপকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ : নতুন যুগের সূচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর ﵁ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাইড তাদেরকে পথ দেখিয়ে উপত্যকার কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কুবায় বনু আমর ইবন আউফের কাছে নিয়ে যায়। সেদিন ছিল সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল। গনগনে রৌদ্রতপ্ত দুপুরে সূর্য তখন প্রায় মাথার উপর। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করার আশায়, তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আনসারগণ প্রতিদিন সকালে মদীনার বাইরে যেতেন। কিন্তু রোদের তাপ বেড়ে গেলে তাঁরা ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হতেন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তাঁরা সকাল সকাল বাইরে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখা না পেয়ে তাঁরা সেদিনের মতো ফিরে যান। এর মধ্যে এক ইহুদি মদীনার উঁচু দালানের উপর থেকে দেখতে পেল যে, সাদা জামা পরিহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﵁ মদীনার দিকে হেঁটে আসছেন। ওই ইহুদি তাদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'হে আরবের লোকেরা! তোমরা যার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলে তিনি চলে এসেছেন!' এ কথা শুনে আনসারগণ তাদের অস্ত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছুটে যায়। অস্ত্র নিয়ে বরণ করাই ছিল তাদের রীতি। এটা দিয়ে আরো বোঝায় যে, আগত অতিথিকে তারা নিরাপত্তা দিতে ইচ্ছুক। আরবের কিছু গোত্রে এই ঐতিহ্য এখনো বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﵁ মদীনার বাইরে কুবা নামক জায়গায় আসামাত্র আনসারগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে চৌদ্দ দিন ছিলেন, এর মধ্যে তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বাড়িতে ছিলেন সেটিকে বলা হত 'ব্যাচেলর হাউস' বা 'কুমারবাড়ি', কারণ ওই বাসার সবাই অবিবাহিত ছিলেন।[66] সেটা ছিল সাদ ইবন খাইসামার বাড়ি। তাঁর সাথে অনেকেই দেখা করতে আসতো আর তিনি চাননি মানুষজনের আসা-যাওয়ার কারণে সেই পরিবারে কোনো অসুবিধা হোক। তাই তিনি এই বাড়িতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে থাকাকালীন সময়ে মদীনায় প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে সংবাদবাহক পাঠান। এর প্রতিউত্তরে তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য একটি বিরাট প্রতিনিধি দল পাঠান। এই প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করে বলেন, 'আসুন, আপনি এখানে নিরাপদ এবং আপনাকে মান্য করা হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে নিছক অতিথি হিসেবে যাননি বরং তিনি একজন নেতা হিসেবে সেখানে গিয়েছেন।

---

[66] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬।

মদীনার আকাশে নতুন চাঁদ: তালা'আল বাদরু 'আলাইনা

রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনাতে আগমনের দিনটি ছিল একটি চমৎকার দিন। চারদিকে সাজ সাজ রব, রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রবেশ উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি। মানুষজন তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছিল, পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে, আবিসিনিয়ানরা তাদের বর্শা নাচাচ্ছিল। মহিলারা ছাদে দাঁড়িয়েছিল আর রাসূলুল্লাহকে ﷺ একনজর দেখার জন্য বাচ্চারা রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তারা বরণ করে নেয় চমৎকার একটি নাশীদ গেয়ে, চৌদ্দশ বছর পরেও মুসলিমদের কাছে অতি প্রিয় একটি সুর।

তালা' আলা বাদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল ওয়াদা
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা
মাদা 'আ লিল্লাহি দা[67]

আনাস ইবন মালিক رضي الله عنه বলেন, 'আমি দুটি দিন দেখেছি। একটি হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উত্তম দিন। এই দিনটি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরের رضي الله عنه মদীনায় আগমনের দিন। অন্যদিনটি হলো আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার ও দুঃখের দিন। সেটি রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর দিন। আমি শুধু এই দুটি দিনই দেখেছি।' রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের আনন্দে বৃদ্ধ লোকরাও সেদিন ঘর থেকে বের হয়ে এসে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'কোন সে জন? কোন সে জন?' আনাস ইবনে মালিকের ভাষায়, 'এমন দৃশ্য আমি এর আগে কোনোদিন দেখিনি!'

মদীনার প্রথম দিনগুলো

মদীনার প্রত্যেকেই চাইছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন তাদের বাড়িতে থাকেন। তারা প্রত্যেকে তাদের বাসায় থাকার জন্য নবীজিকে ﷺ আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের সাথে থাকতে চান। কারণ বনু নাজ্জারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। হাশিম বনু নাজ্জারের একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। বনু নাজ্জার এসেছিল খাযরাজ থেকে, সে হিসেবে মদীনার বনু নাজ্জার ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ মায়ের গোষ্ঠী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের সাথে থাকার ইচ্ছার কথা সবাইকে জানিয়ে দেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তাঁর কাছাকাছি বনু নাজ্জারের কার ঘর আছে। আবু আইয়ুব আল আনসারী رضي الله عنه জানান তাঁর ঘর কাছাকাছি আছে। এরপর আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপরের ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ

---

[67] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৫। তবে এই নাশীদটি ঠিক কখন মুসলিমরা গেয়েছিল এটা নিয়ে দ্বিমত আছে।

ﷺ নিচের ঘরেই থাকতে চাইলেন। অনেকেই রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করতে আসতেন, এক্ষেত্রে তাঁর নিচ তলায় থাকার সিদ্ধান্ত সবার জন্যই সুবিধাজনক ছিল। অবশেষে আবু আইয়ুব রাজি হন। আবু আইয়ুব বলেন, 'একদিন আমাদের একটা পানির পাত্র মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম, এই পানি মেঝে চুইয়ে যদি রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভিজিয়ে দেয়, তখন কী হবে? আমাদের একটিমাত্র কম্বল ছিল, আমরা সেই কম্বল মেঝের পানি শুকানোর জন্য ব্যবহার করলাম। সে রাতে আমি আর আমার স্ত্রী কম্বল ছাড়াই ঘুমালাম।'[68] এই ঘটনাটি দেখিয়ে দেয়, রাসূলুল্লাহর ﷺ সামান্যতম কষ্টও সাহাবারা ﷺ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা নিজেরা কম্বল ছাড়া ঘুমিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ গায়ে এক ফোঁটা পানি তাঁরা পড়তে দেননি।

যাইদ ইবন সাবিত ﷺ বলেন, 'আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপহার দিয়েছিলাম। সেটি ছিল দুধ, মাখন ও রুটি দিয়ে পরিপূর্ণ বড় একটি কাঠের বাটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবু আইয়ুবের বাসায়, আমি নিজে সে উপহার তাঁর কাছে নিয়ে যাই। আমি নবীজিকে ﷺ জানাই যে, আমার মা তাঁর জন্য এ খাবার পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার মায়ের মঙ্গল করুন।' এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে সবাই একসাথে খেলেন। এরপর খাবার নিয়ে আসেন সাদ ইবন উবাদা। তিনি আনেন মাংসের ঝোল আর রুটি। আবু আইয়ুবের বাড়িতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত মাস থেকেছিলেন। এই সাত মাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেউ না কেউ, অন্তত তিন-চার জন রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে খাবার নিয়ে দেখা করতে আসতো।' এই সাহাবীদের ﷺ অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু তারপরও তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য নিজেদের খাবারটুকু পর্যন্ত দিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁরা এতটাই ভালবাসতেন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এই অসাধারণ মানুষগুলোকে রাসূলুল্লাহর ﷺ আনসার হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষভাগে বলেছেন, 'যদি না হিজরত করতাম, তাহলে আমি নিজেকে আল-আনসারের একজন সদস্য হিসেবেই ভাবতাম।'

মদীনার আর্থসামাজিক কাঠামো

সে সময় মদীনাতে পাঁচটি গোত্র ছিল। সেগুলোর মধ্যে তিনটি ছিল ইহুদিদের গোত্র এবং দুইটি ছিল আরবদের গোত্র। বনু নাযির, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকা – এগুলো ছিল ইহুদি গোত্র। বনু কায়নুকার বসবাস ছিল মদীনার কেন্দ্রে, তারা অলংকারের ব্যবসা করতো। আগে তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো। কিন্তু অন্যান্য ইহুদিদের সাথে তাদের যুদ্ধ হওয়ার পর তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। বনু নাযির ও বনু কুরায়যা উভয়ই মদীনার প্রান্তে বসবাস করতো। তাদের ছিল

[68] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১।

৫৯টি দুর্গ। তাদের ছিল ২০০০ সৈন্যবিশিষ্ট সামরিক বাহিনী। অন্যদিকে আল-আওস ও আল-খাযরাজ ছিল আরব গোত্র। তাদের সামরিক বাহিনী ছিল ৪০০০ সৈন্যবিশিষ্ট। এদের মধ্যে একটি গোত্র মদীনার উত্তরে বসবাস করতো আর অন্য গোত্রটি দক্ষিণে। মদীনা ছিল অনেকগুলি এলাকার সমন্বয়ে গঠিত। একেক এলাকায় ছিল একেক গোত্রের বসবাস। মদীনাবাসীর জীবিকা ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। মদীনায় ছিল খেজুরের বাগান। সেগুলো চাষ করার জন্য কৃষকদের টাকা প্রয়োজন হতো, ফলনের সময় হলে তারা সে টাকা পরিশোধ করতো। ইহুদি গোত্রগুলো তাদেরকে সুদের বিনিময়ে এই টাকা ধার দিত। এ কারণে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে কিছু তিক্ততা বিদ্যমান ছিল।

এই ছিল মোটামুটিভাবে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার অবস্থা। ইসলাম আসার পর মদীনার বহুমাত্রিক সমাজে মুশরিক, ইহুদিদের সাথে নতুন যোগ হয় মুসলিমরা। তাই রাসূলুল্লাহকে ﷺ খুব সাবধানতার সাথে সবাইকে সামাল দিতে হয়েছে।

কিন্তু মদীনার কিছু লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনে খুশি হতে পারেনি। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী একসাথে থাকার কারণে মদীনার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গাধার পিঠে চড়ছিলেন। সে সময় একটি সমাবেশ দেখতে পেয়ে সেখানে গেলেন। সেই সমাবেশে আরব, মুসলিম, অমুসলিম ও ইহুদি – সবাই ছিল। তাঁর গাধাটি যেতে যেতে ধূলো উড়োচ্ছিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই বললো, ‘যান তো, আপনার ধূলো আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিন।’

আবদুল্লাহ ইবন উবাই পরবর্তীতে মুনাফিকদের নেতা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথায় কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে উপস্থিত সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত দেওয়া শেষ হলে আবদুল্লাহ ইবন উবাই বললো, ‘দেখুন, আমাদের সমাবেশে এসে এভাবে বিরক্ত করবেন না। যেখানে উঠেছেন সেখানেই থাকুন আর আপনার এসব গল্প তাদের সাথে করুন যারা আপনার কাছে আসে। আগ বাড়িয়ে আমাদের সাথে এসব গল্প করবেন না।’ সাথে সাথে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বলে উঠলেন, ‘না! আমরা চাই তিনি আমাদের সমাবেশে আসবেন এবং কথা বলবেন।’ উপস্থিত লোকেরা চিৎকার-চেঁচামেচি এবং কথা কাটাকাটি শুরু করে দিল। ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে চলে গেল যেন যুদ্ধ বেঁধে যাবে। অবস্থা বেগতিক দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে শান্ত করতে লাগলেন, পরে সবকিছু শান্ত হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সাদ তুমি কি দেখনি আবদুল্লাহ ইবন উবাই কী করেছিল?’ সাদ জানতে চাইলেন কী ঘটেছে। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে থেকে বিস্তারিত শোনার পর তিনি বললেন, ‘আপনি আসার আগে আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে তার গোত্রের লোকেরা রাজা হিসেবে প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। এজন্য সে আপনাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।’ খাযরাজ গোত্র আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে তাদের নেতা বানানোর সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমনের কারণে সবাই রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাদের শাসক হিসেবে মেনে নেয়। এ কারণে উবাই আর রাজা

হতে পারেনি। এরকমই একটি কঠিন জটিল পরিস্থিতিতে মদীনায় আল্লাহর রাসূলের ﷺ আগমন ঘটে।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

চারটি প্রজেক্ট

মদীনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ চারটি প্রজেক্ট হাতে নেন এগুলো হলো:
১) মসজিদ নির্মাণ।
২) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।
৩) মদীনার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট দলিল বা সনদ প্রণয়ন।
৪) মুসলিম সেনাবাহিনী গড়ে তোলা।

প্রথম প্রজেক্ট: মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় পৌঁছেই প্রথমে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে অবস্থানকালেও একই কাজ করেছিলেন। মসজিদ হলো মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছুর আগে মসজিদ নির্মাণের দিকে দৃষ্টি দেন। মক্কায় তিনি দার-উল-আরকামে মুসলিমদের প্রশিক্ষণের কাজ চালাতেন। পরবর্তীতে মদীনায় মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে দার-উল-আরকামের কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করে। তবে মক্কার দার-উল-আরকাম ছিল একটি গোপন জায়গা। সেখানে মুসলিমরা সালাত আদায় করতে আসত এবং কুরআন শিক্ষা করতো। কিন্তু মদীনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় আর গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল না। তাই নির্মিত হয় 'মসজিদ-ই-নববী।'

মসজিদের জন্য জায়গা নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে চড়ছিলেন আর লোকজন যার যার দিকে উটটিকে টানছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটিকে ছেড়ে দাও, কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশে চলছে।' উটটি মদীনার রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। এটি থামলো একটি শুকনো খেজুরের মাঠে। সেই মাঠের মালিক ছিল দুই এতিম ছেলে। উটটি থামলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটিই হলো আমাদের মসজিদের জায়গা।' অতঃপর সেই জায়গাটি মসজিদের জন্য এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ থাকার জায়গা হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়গাটি এতিম বালকদের কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলেন। কিন্তু তারা বিক্রি করতে রাজি হলো না বরং তারা সেই জায়গাটি কোনো টাকা ছাড়াই

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দিতে চাইল। অবশেষে মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণ কাজ শুরু হলো। মসজিদের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল কাদামাটির ইট দিয়ে আর ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল তালপাতা দিয়ে। বৃষ্টি হলে পাতা চুইয়ে বৃষ্টির পানি তাদের মাথায় পড়তো, আর মেঝেতে ছিল শুধু বালি। মসজিদটি ছিল খুবই সাদামাটা কিন্তু এটি হলো ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বরকতময় মসজিদ। এখানেই মুসলিমদের প্রথম ও সেরা প্রজন্মটি দ্বীনের শিক্ষা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও সাহাবাদের ﷺ সাথে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ কাঁধে ইট বহন করেছিলেন।

মসজিদ নির্মাণের ঘটনা থেকে শিক্ষা

> # "তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ, দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে..." (সূরা হাজ্জ, ২২: ৪১)

আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল মুসলিমদেরকে জমিনে কর্তৃত্ব দান করার পর তাঁরা প্রথমে যে কাজটি করেছেন তা হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করা। সালাত প্রতিষ্ঠার এই কাজ শুরু হয়েছিল মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

মসজিদের নির্মাণকাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বশরীরে শ্রম দিয়েছেন। আরামে বসে থেকে অন্যদের আদেশ দিয়ে কাজ করিয়ে নেননি। ইসলামে নেতৃত্ব মানে অন্যকে আদেশ দেওয়া নয়, ইসলাম নেতৃত্ব হলো অন্যের সেবা। আর এ কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে করে দেখিয়েছেন।

ইসলাম মানুষের দক্ষতাকে মূল্যায়ন করে। মানুষ যে কাজে দক্ষ সেই কাজটাই তার করা উচিত। যেমন, মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণকাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের ﷺ সাথে বনু নজদের এক লোক ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন মিস্ত্রী। এই ব্যক্তি সকলের সাথে ইট আনা-নেওয়ার কাজে যোগ দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এই কাজে নিয়োজিত না করে বরং ইটের মিশ্রণ তৈরি করার কাজে নিয়োগ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নির্মাতা ব্যক্তিকে সেই কাজটিই করতে বলেছেন যে কাজে তিনি দক্ষ। দ্বীনের কাজে সবাই একই কাজ করবে – বিষয়টি তেমন নয়। সবাইকে যে একজন ভালো দাঈ, ইমাম বা আলিম হওয়া লাগবে ব্যাপারটি আসলে তা না। আল্লাহ্ তাআলা একেকজনকে একেক রকম দক্ষতা বা গুণ দিয়েছেন। আর এই দক্ষতাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানোর জন্য সবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। ভালো নেতার গুণ হলো তিনি তার কর্মীদের দক্ষতা কিসে তা খুঁজে নিতে পারেন এবং সেই দক্ষতাকে বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করেন। তবে এসব দক্ষতা অবশ্যই ইসলামের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে।

মসজিদের ভূমিকা

"আল্লাহ যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করা এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন"। (সূরা নূর, ২৪: ৩৬-৩৮)

বর্তমান সময়ে মসজিদকে শুধু মাত্র ইবাদাতের স্থান মনে করা হলেও, রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগে মসজিদকে শুধুই ইবাদাতের স্থান মনে করা হতো না। এটি ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক স্থান। মসজিদ ছিল সমাজের ব্যস্ততম প্রাণকেন্দ্র।

মসজিদ ইট-কাঠের নিছক একটি দালান নয়। মসজিদের প্রাণ হলো মসজিদের ভিতরে থাকা মানুষগুলো। কুরআনে সেই সব মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে অবস্থান করে এবং সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর কথা স্মরণ করে। তারা হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু মসজিদে গেলে তারা সেসবের কথা স্মরণ করে না। আল্লাহ তাআলার ঘরে থাকা অবস্থায় তারা শুধুমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করে। মসজিদ হচ্ছে সালাত ও যিকরের স্থান। এটিই মসজিদের প্রথম ও প্রাথমিক ভূমিকা।

মসজিদ মুসলিমদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র। মক্কায় মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল দার-উল-আরকাম, আর মদীনায় ছিল মসজিদ-ই-নববী। এখানেই রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিতেন, কথা বলতেন, আলোচনা করতেন। সাহাবাগণ ﷺ মসজিদে একসাথে বসে আল্লাহ তাআলার কিতাব নিয়ে পড়াশোনা করতেন।

#-রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি মানুষ আল্লাহ তাআলার ঘরে (মসজিদে) একত্রে বসে আল্লাহ তাআলার কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে চারটি জিনিস দেবেন: 'সাকিনা (প্রশান্তি), রাহমা (দয়া), ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখবে এবং আল্লাহ তাআলা আরও উন্নত জমায়েতে তাদের নাম উল্লেখ করবেন।'

মসজিদ হলো মুসলিমদের একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার জায়গা। এটি তাদের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব মুসলিমরা মসজিদে জামা'আতে সালাত এবং জুমু'আর সালাত আদায় করেন তারা দিনে পাঁচবার একে অপরের সাথে দেখা করার সুযোগ পান। এটি তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধকে মজবুত

করে দেয়।

মসজিদ-ই-নববী ছিল পথিক ও গরিবদের জন্য থাকার জায়গা। এই মসজিদে আশ্রয় নেওয়া সাহাবীদের ﷺ বলা হতো আহলুস-সুফফা।

মসজিদ থেকেই তৎকালীন সময়ে সেনাদল জিহাদের জন্য যাত্রা আরম্ভ করতো। আমীরের হাতে জিহাদের পতাকা তুলে দেওয়া হতো মসজিদেই।

মসজিদ হলো দাওয়াতের স্থান। ইয়েমেন থেকে আগত খ্রিস্টানরা মসজিদে অবস্থান করেছিল। তারা সেখানে অবস্থানকালে মুসলিমদের ইবাদতরত অবস্থায় দেখতে পেত এবং মুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ আলোচনাও শুনতে পেয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায়, দাওয়াহর স্বার্থে অমুসলিমরা মসজিদে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারে।

মসজিদ-ই-নববী খুবই সাদামাটা ছিল কিন্তু এখান থেকেই জ্ঞানার্জন করেছেন মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, সাহাবাগণ ﷺ । অথচ বর্তমান সময়ে অনেক বড় বড় মসজিদ থাকলেও এই মসজিদগুলো 'ইলমের প্রতীক নয়, বরং অর্থের শ্রাদ্ধের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আযানের সূচনা

মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় কীভাবে সবাইকে সালাতের দিকে আহ্বান করা যায়। কেউ পরামর্শ দিল, খ্রিস্টানদের মতো ঘণ্টা ব্যবহার করা অথবা মদীনায় ইহুদিরা যেভাবে হর্ন ব্যবহার করতো সেরূপ কিছু করা। কোনো প্রস্তাবই রাসূলুল্লাহর ﷺ মন:পুত হলো না। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবন যাইদ ﷺ একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, একটি লোক একটি ঘণ্টা বহন করছে। তা দেখে তিনি ওই লোকের কাছে ঘণ্টাটির দাম জানতে চান। লোকটি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কেন ঘন্টাটি চাও?' আবদুল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে উত্তর দিলেন যে, তিনি এটা দিয়ে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করবেন। লোকটি উত্তরে বললো যে, তার কাছে দেওয়ার মতো এর চেয়েও ভালো কিছু আছে। আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন সেটি কী। লোকটি তাঁকে বলতে বললো,

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার।
আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার।
আশ-হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশ-হাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ

সূচিপত্র

হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ
হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ
হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ
আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আবদুল্লাহ ইবন যাইদ রাসূলুল্লাহকে ﷺ এই স্বপ্নের কথা জানান। স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন যে এই স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। এরপর তিনি আবদুল্লাহকে বললেন বিলালকে এই আযান দেওয়া শিখিয়ে দিতে। বিলালের রা. কণ্ঠস্বর ছিল খুব জোরালো আর সুন্দর। আযানের শব্দ শুনতে পেয়ে উমার রা. দ্রুত মসজিদে আসেন। তিনি বললেন যে, তিনিও স্বপ্নে এই কথাগুলো শুনেছেন। একাধিক ব্যক্তি একই স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো স্বপ্নটি সত্য।[69]

সেই থেকে আযান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকসমূহের একটি। যে সব জায়গায় প্রকাশ্যে আযান দেওয়া হয়, সেসব জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি আছে এমনটা ধরে নেওয়া হয়।

মসজিদে নববীর একটি খুতবা

মসজিদে নববী স্থাপিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সবার উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। খুতবায় তিনি বলেন,

'ভাইয়েরা, ভালো কাজে এগিয়ে যাও। নিজেদের জন্য ভালো আমল আল্লাহর কাছে জমা করো। জেনে রাখো, আল্লাহর শপথ! তোমাদের প্রত্যেকের জীবনেই মৃত্যু এসে হাজির হবে। সেদিন তোমরা তোমাদের যাবতীয় সম্পদ পিছনে ফেলে যাবে। তোমাদের পালিত পশুগুলো প্রতিপালকহীন অবস্থায় পড়ে থাকবে। সেদিন তোমাদের আর আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না, কোনো পর্দা থাকবে না। সেদিন তোমাদের রব তোমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাদের কাছে কি আমার রাসূল যায়নি? সে কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দেয়নি? আমি তোমাকে অর্থবিত্ত দিয়েছি, আমার নি'আমতে তোমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছি। কিন্তু তুমি নিজের জন্য, এই দিনের জন্য কী আমল পাঠিয়েছো?' সেদিন প্রত্যেকে তার ডানে বামে অসহায়ের মতো তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকিয়ে সে দেখতে পাবে জাহান্নামের আগুন!

তাই তোমাদের সাধ্যানুযায়ী নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা

---

[69] সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫।

করার চেষ্টা করো। যদি একটি খেজুরের অংশবিশেষ দান করা তোমার সাধ্যে কুলায় তবে তাই করো। যদি এটুকু করারও সামর্থ্য না থাকে তবে দুটি ভালো কথা বলো, ভালো আচরণ করো। জেনে রেখো, প্রত্যেকটি ভালো কাজকেই আল্লাহ তাআলা দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করেন। আল্লাহর নিরাপত্তা, মমতা আর বারাকাহ তোমাদের ঘিরে থাকুক।'[70]

আহলুস-সুফফা

যখন ক্বিবলা উত্তর দিক, অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর ছিল তখন মসজিদে নববীর পাশে ছায়ার জন্য একটি ছাউনি তৈরি করা হয়। সেই ছাউনিটি আস-সুফফা নামে পরিচিত ছিল। ইবন হাজর আস-সুফফা সম্পর্কে বলেছেন যে, মসজিদ-ই-নববীর পিছনের জায়গাটি আস-সুফফা নামে পরিচিত ছিল। এখানে ছিল একটি ছাউনি। এটি মূলত সেসব মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল যাদের কোনো পরিবার বা থাকার জায়গা ছিল না। সেখানে যারা থাকতেন তাদের বলা হতো আহলুস-সুফফা। আবু হুরাইরা ﷺ একজন আহলুস-সুফফা ছিলেন। তিনি বলেছেন, আস-সুফফার অধিবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি। তাদের দেখাশোনার জন্য কোনো পরিবার অথবা সম্পদ ছিল না। তাই তাঁরা সেখানে থাকতেন। যারা সেখানে থাকতেন তাদের সবাই যে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে নিতান্তই বাধ্য হয়ে থাকতেন – বিষয়টি তেমন নয়। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আহলুস-সুফফায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এমন একজন সাহাবী ছিলেন আবু হুরাইরা ﷺ। তাঁর সম্পদ ছিল কিন্তু তিনি পড়াশোনা করে দিন কাটাতে ভালোবাসতেন। তাই তিনি আস-সুফফায় অন্যান্যদের সাথে থাকতেন। আবু হুরাইরা প্রথমদিকের সাহাবী ছিলেন না। তিনি অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারপরেও তিনি মুহাজির ও আনসারদের থেকে অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কীভাবে তা সম্ভব হলো? এই ব্যাপারে আবু হুরাইরা ﷺ বলেছেন, মুহাজিররা যখন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি ক্ষুধা পেটে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুসরণ করতেন। তাঁর তেমন কিছুই ছিল না কিন্তু তারপরও তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সাথে থাকতেন। মুহাজিররা কিছু ভুলে গেলে তিনি সেগুলো মনে রাখতেন। অন্যদিকে আনসাররা তাদের ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আনসাররা কিছু ভুলে গেলে তিনি সেগুলো মনে করিয়ে দিতেন।

আবু হুরাইরা ﷺ তাঁর দ্বীনি পড়াশুনার জন্য 'ফুল টাইম' বরাদ্দ রেখেছিলেন বলেই রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করার মতো সময় পেতেন। তিনি রাতের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন: এক অংশ ছিল ঘুমানোর জন্য, আরেক অংশ ইবাদতের জন্য বরাদ্দ এবং অন্য অংশে সারাদিন তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ যত হাদীস শুনেছেন তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেন। যখন অন্যান্য মুহাজির ও আনসারগণ ব্যবসা

---

[70] সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩।

ও ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তখন আবু হুরাইরা আহলুস-সুফফাতে সময় দিতেন এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থেকে সারাদিন পড়াশোনা করতেন।

আস-সুফফায় যারা থাকতেন তাদের ভরণপোষণের একটি উৎস ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ পাঠানো সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সাদাকাহ পেলে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি কোনো উপহার পেলে নিজের জন্য কিছু রেখে বাকিটুকু সুফফাবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি ধনী সাহাবীদের ﷺ উৎসাহ দিতেন যেন তাঁরা আস-সুফফার অধিবাসীদের নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি কারো কাছে দুইজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে সে যেন সেই খাবারে তৃতীয়জনকে আহ্বান করে। যদি কারো কাছে চারজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে সে যেন আরো এক বা দুইজনকে সেই খাবারে শরীক করে।'[71] যেসব সাহাবা ﷺ আহলুস-সুফফাদের নিমন্ত্রণ করতেন তাঁরা কোটিপতি ছিলেন এমন নয়। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের বলেছেন যদি তাদের কাছে দুইজনের যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে যেন তৃতীয় আরেকজনকে নিয়ে খায়।

উদারতা ও অন্যের জন্য নিজের জিনিস ছেড়ে দেওয়া - এই গুণগুলো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকে অনুশীলিত হয়ে আসছে। ইসলামের প্রথম প্রজন্মের মানুষগুলোর মধ্যে যে বন্ধন দেখা যায় তা আর কোনো যুগে দেখা যায় না। এতিম, গরিব, অভাবীদের প্রতি দয়া দেখানো, অতিথির সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা – এ সকল ব্যাপারে আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল কুরআনের অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এ কাজগুলো কিন্তু ইবাদাতেরই অন্তর্ভুক্ত। কুরআন নাযিলের শুরু থেকে এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম হওয়ার সাথে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার জড়িত এবং এই ইবাদাত আল্লাহ তাআলার অনেক পছন্দের একটি ইবাদাত।

ফাতিমা ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ মেয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই মেয়েকে খুবই ভালোবাসতেন। ফাতিমা ঘরের সমস্ত কাজ নিজ হাতে করতেন, তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। স্বামী আলী ইবন আবি তালিব ﷺ তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে কিছু দাস এসেছে, ফাতিমা যেন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে একজন দাসের জন্য সুপারিশ করেন। ফলে, ফাতিমা ﷺ তাঁর পিতার কাছে গিয়ে একজন দাসের জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি তোমাকে কোনো দাস দিতে পারছি না, কারণ আমি সুফফাবাসীদের খালি পেটে থাকতে দিতে পারি না। তাদের জন্য খরচ করার মতো টাকা আমার কাছে এখন নেই। আমি এই দাসদের বিক্রি করে দিব আর সেই টাকা তাদের জন্য ব্যয় করা হবে।' এ থেকে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলুস-সুফফার জন্য কত চিন্তিত ছিলেন।

---

[71] সহীহ বুখারি, অধ্যায় সালাতের ওয়াক্ত, হাদীস ৭৮।

এমনটা ভাবা সমীচীন হবে না যে, আহলুস-সুফফারা বসে বসে বিনামূল্যে খাবার খেতেন আর কোনো কাজ করতেন না। বরং তাঁরা ছিলেন ইবাদাতগুজার লোক, তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের আবেদ। তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে অনেক জ্ঞান রাখতেন। তাঁরা ছিলেন আলিম, মুজাহিদ। তাদের মধ্যে অনেকে শহীদও হয়েছেন। যেমন আবু হুরাইরা, তিনি আহলুস-সুফফার একজন সদস্য ছিলেন। তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহলুস-সুফফার আরেকজন সদস্য হলেন হুযাইফা ইবন ইয়ামান ﷺ। তিনি শেষ যমানার অধিকাংশ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহলুস-সুফফার সদস্যদের মধ্যে হারিসা ইবন নু'মান, সালিম ইবন উমাই, খুনাইস ইবন হুদাইফাহ, সুহাইব ইবন সিনান বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হানযালা শহীদ হয়েছিলেন উহুদের যুদ্ধে, ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। আস-সুফফার অনেকেই হুদাইবিয়াহসহ অন্যান্য যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাদের অনেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্য খেজুরের বীজ সংগ্রহ করে পশুপাখির খাবার হিসেবে বিক্রি করতেন। তাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ কর্ম করার চেষ্টা করতেন কিন্তু মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, তাঁরা অন্যের দারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অবস্থাভেদে আস-সুফফার অধিবাসীদের সংখ্যা উঠানামা করতো। গড়ে মোটামুটিভাবে ৭০জন সেখানে ছিলেন। তাঁরা মসজিদ-ই-নববীর পিছনেই দিনরাত ২৪ ঘণ্টা থাকতেন। তাঁরা পড়াশোনার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন, কেননা তাঁরা সবসময় মুসলিমদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র মসজিদ-ই-নববীর কাছাকাছি থাকতেন। আর এটি ছিল ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এ কারণেই তাঁরা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের প্রথম প্রজন্মের সমাজটি ছিল খুব শক্তিশালী একটি সমাজ। কারণ তাঁরা একে অপরকে দেখে রাখতেন এবং কষ্ট লাঘব করতেন। স্বার্থপরতা সে সমাজে ছিল না বিধায়, কঠিন সময়েও তাঁরা একে অপরের পাশে থেকেছেন। আর তাই তাদের মাধ্যমে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। মুনাফিকরা তাদের ভ্রাতৃত্বে কোনো চিড় ধরাতে পারেনি।

সে সময়টাতে মুসলিমদের সম্পদ খুব একটা ছিল না কিন্তু তারপরেও তাঁরা সমাজে কল্যাণমূলক সেবাগুলো চালু রেখেছেন। আস-সুফফায় যারা থাকতেন তাঁরা আল-আনসারদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করতেন। সমাজের মানুষদের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মেটানোও এক ধরনের দাওয়াত। উবাদাহ ইবনুস-সামিত ﷺ বর্ণনা করেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তখন তিনি নওমুসলিমদের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে ন্যাস্ত করতেন। যখন কোনো নওমুসলিম রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আসত তখন তিনি ব্যস্ত থাকলে আমাদের কাছে তাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমার বাড়িতে ছিলেন। আমরা তাকে পরিবারের সদস্যদের মতোই দেখাশোনা করেছিলাম আর তাকে কুরআন শিখিয়েছিলাম।'

আনসাররা এই ব্যাপারটি মনে রাখতেন যে, এই মুহাজিররা সবকিছু ছেড়েছুড়ে মদীনায় এসেছেন। তাই তাদের এখন সাহায্য দরকার। রাসূল ﷺ মুসলিম সমাজকে একটি সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রতিটি দলের একজন করে নেতা নির্বাচন করে দেন। যেমন আবু হুরাইরা رضي الله عنه ছিলেন আহলুস-সুফফার আরীফ। আরীফ হলেন কোনো দলের প্রতিনিধি অথবা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মূল নেতাকে জানানোর ব্যবস্থাকারী। আবু হুরাইরা رضي الله عنه আহলুস-সুফফার প্রতিনিধি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলুস-সুফফাকে কোনো সংবাদ দিতে বা কিছু বলতে চাইলে আবু হুরাইরার কাছেই সংবাদ পাঠাতেন।

দ্বিতীয় প্রজেক্ট: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা

> "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা অবস্থান করছিলে এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে, অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।" (সূরা আল ইমরান, ৩: ১০৩)

> "আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি আপনি যমীনের সব কিছু ব্যয় করে ফেলতেন, তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" (সূরা আল-আনফাল, ৮: ৬৩)

এখানে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলছেন, মুসলিমদের অন্তরে একে অপরের জন্য যে ভালোবাসা, তা আল্লাহ তাআলা নিজগুণে তৈরি করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি চাইতেন, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়েও এই কাজটি করতে পারতেন না। এটা একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছা। তাঁরা কেউ কাউকে চিনতেন না, কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একই দ্বীনের অনুসারী হওয়ার কারণে যে ভালোবাসা তাদের মধ্যে ছিল তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তিনিই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরস্পরের ভাই করে দিয়েছেন।

> "যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে। মুহাজরিদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। নিজেদের

অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর, ৫৯: ৯)

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আনসারদের অন্তর থেকে যাবতীয় কার্পণ্য দূর করে দিয়েছিলেন। এই আয়াতে যদিও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ অন্য পর্যায়ের, অতুলনীয়। আস-সুহাইলি থেকে জানা যায়, কিছু ব্যক্তি বলেছেন যে, এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয় হিজরতের পাঁচ মাস পরে। আবার কেউ বলেছেন হিজরতের ৯ মাস পরে। অন্যান্যরা বলেছে মসজিদ-ই-নববী নির্মাণের পর পরই এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয়।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার সম্পর্কটি এমন ছিল যেন তাঁরা রক্তের ভাই। এমনকি প্রথমদিকে উত্তরাধিকারের বিধানগুলোও তাদের ক্ষেত্রে রক্তের ভাইয়ের সম্পর্ক ধরে প্রয়োগ করা হতো। এরূপ সম্পর্কের একটি উদাহরণ হলো সাদ ইবন রাবিআ ও আবদুর রহমান ইবন আউফের ﷺ মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ। আবদুর রহমান ﷺ একজন মুহাজির ছিলেন। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুখবর পাওয়া দশজন সাহাবা ﷺ, অর্থাৎ আশারে মুবাশশারার একজন। তিনি হিজরত করার পরে সাদ ইবন রাবিআ নামক আনসারীর বাড়িতে থেকেছিলেন। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ তিনি নিজ মুখে বর্ণনা করেছেন।

"হিজরত করে মদীনায় আসার পর আল্লাহর রসূল ﷺ আমার ও সাদ ইবন রাবিআর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দেন। সাদ ইবন আর-রাবি' আমাকে বললো, 'আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে – আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত পূর্ণ হলে আপনি তাকে বিয়ে করে নিতে পারেন।' আবদুর রহমান বললেন, 'আসলে আমার তো এসব কিছুর প্রয়োজন নেই। এখানে কি কোনো বাজার আছে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়?' সাদ ইবন রাবিআ আমাকে বললো, 'হ্যাঁ আছে, তুমি কায়নুকার বাজারে যেতে পারো।'"

পরের দিন আব্দুর রাহমান ইবন আওফ বাজারে গিয়ে কিছু শুকনো ঘি ও মাখন কিনে আনেন। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত সেই বাজারে যাওয়া আসা করতেন। কয়েকদিন পরে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমানের শরীরে হলুদের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

- বিয়ে করেছো নাকি আব্দুর রাহমান?

- আবদুর রহমান মাথা নাড়লেন।

- কাকে বিয়ে করেছো?

- এক আনসারী মহিলাকে।

সূচিপত্র

- তাকে কী পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ?

- খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।

- ঠিক আছে, এখন একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও।[72]

সাহাবাগণ ﷺ নিজেদেরকে নিজেদের আপন ভাই মনে করে নাসীহা করতেন। এরকম একটি উদাহরণ হলো সালমান ও আবু দারদা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান ও আবু দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দেন। একবার সালমান আবু দারদা'র সাথে সাক্ষাত করতে এসে তাঁর স্ত্রী উম্ম দারদাকে মলিন পোশাকে দেখতে পান। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উম্ম দারদা বললেন, 'আপনার ভাই আবু দারদা'র পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি মোহ নেই।' কিছুক্ষণ পরে আবু দারদা এলেন। তারপর তিনি সালমানের জন্য খাবার তৈরি করে বললেন, 'তুমি খেয়ে নাও, আমি সাওম পালন করছি।' সালমান ﷺ বললেন, 'তুমি না খেলে আমিও খাবো না।' এরপর আবু দারদা বাধ্য হয়ে সিয়াম ভঙ্গ করে সালমানের সাথে খেলেন। রাত হলে আবু দারদা সালাত আদায়ে দাঁড়াতে গেলেন। কিন্তু সালমান বললেন, 'না, তুমি এখন সালাতে দাঁড়াবে না, তুমি এখন ঘুমাবে।' অগত্যা আবু দারদা ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবু দারদা আবার সালাতে দাঁড়াতে উদ্যত হলেন, সালমান আবার তাঁকে ঘুমাতে বললেন। রাতের শেষভাগে সালমান আবু দারদাকে নিজ থেকে জাগালেন এবং দু'জনেই সালাত আদায় করলেন। পরে সালমান তাঁকে বললেন, 'তোমার উপর তোমার রবের হক্ব আছে, তোমার নিজেরও তোমার উপর হক্ব আছে। আবার তোমার পরিবারেরও হক্ব রয়েছে। প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান করো।' এরপর আবু দারদা নবীজির ﷺ নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। সব শুনে নবীজি ﷺ বললেন, 'সালমান যা বলেছে ঠিকই বলেছে।'[73]

সালমান ইবন ফারিস ﷺ মুহাজির ছিলেন কিন্তু তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেন নি, তিনি পারস্য থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ খোঁজে মদীনাতে এসেছেন। তারপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে আবু দারদা'র ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিয়েছেন। এভাবে আনসারগণ মুহাজিরদের নানা দিক থেকে সাহায্য করতেন এবং নিজেদের সম্পদ থেকে যতটুকু সম্ভব তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

আনসাররা একদিন নবীজিকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমাদের খেজুরের বাগানগুলো আমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দিন।' নবীজি ﷺ বললেন, 'না, ভাগ করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।' তখন আনসাররা প্রস্তাব দিলেন, 'তাহলে এক কাজ করা যাক, মুহাজিররা আমাদের বাগানগুলো আবাদ করুক আর

---

[72] সহীহ বুখারি, অধ্যায় কেনা-বেচা, হাদীস ২।

[73] সহীহ বুখারি, অধ্যায় সাওম, হাদীস ৭৫।

উৎপাদিত খেজুরের একটা অংশের মালিক হোক।' মুহাজিররা বললেন, 'আমরা এতে রাজি আছি।'[74]

তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল যে, মুহাজিরগণ অর্ধেক কাজ করবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে অর্ধেকের বেশি কাজ আনসাররাই করে ফেলেছেন। মুহাজিরগণ নবীজির ﷺ কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমরা উনাদের মতো এত ভালো মানুষ কখনও দেখিনি। যখন তাদের অবস্থা স্বচ্ছল থাকে, তখন তাঁরা আমাদের সাহায্য তো করেনই, যখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ দেখেছি, তখনও তাঁরা আমাদের স্বস্তিতে রেখেছেন। নিজেদের ক্ষেতে তাঁরা নিজেরা কাজ করেন অথচ আমাদেরকে ফসলের অর্ধেক দিয়ে দেন।'

আনসারদের এমন উদারতা দেখে মুহাজিররা রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আনসারগণ তো সব সওয়াব পেয়ে গেলেন, আমরা তো কিছুই পাবো না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, তোমরা যদি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করো এবং তাদের প্রশংসা করো, তাহলেও তোমরা সাওয়াবের অধিকারী হবে।'[75] আনসার ও মুহাজিরদের সম্পর্কে দুটো জিনিস জড়িয়ে আছে–উদারতা ও কৃতজ্ঞতা। আনসাররা মুহাজিরদের জন্য নিজেদের হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন। আর মুহাজিররাও কখনো আনসারদের উদারতার কথা ভোলেননি। তাঁরা সবসময় আনসারদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাদের জন্য দুআ করেছেন।

প্রথমদিকে মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিল জোড়ায় জোড়ায়। উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে আপন ভাই ধরে সম্পদ ভাগাভাগি করা হতো। মুহাজিরদের অবস্থার উন্নতি হলে এই বিশেষ সম্পর্কগুলো লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধ রয়ে যায়। তারপর থেকে উত্তরাধিকার আইন শুধুমাত্র রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো।

> "আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।" (সূরা আনফাল, ৮: ৭৫)

সম্পূর্ণ নতুন একটি বন্ধনের উপর ভিত্তি করে মদীনাতে নতুন একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল। আরবদের জন্য এটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। তৎকালীন আরবে

---

[74] সহীহ বুখারি, আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ৭।

[75] আবু দাউদ, অধ্যায় আদাব, হাদীস ৪০।

রক্তের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, গোত্রীয় সম্পর্ক – গতানুগতিক এসব সম্পর্ক ছাড়া আরবরা অন্য কিছু চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর এমন একটি সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে যাদের সম্পর্কের ভিত্তি রক্ত, অর্থ বা জাতীয়তা নয়, বরং তা হলো আকীদাহ বা ধর্মবিশ্বাস। শুধু তাই নয়, ঈমানের এ নতুন বন্ধন গড়ার সাথে আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল মুসলিমদের আদেশ করলেন আগে কাফিরদের সাথে তাদের যে বন্ধন ছিল তা যেন ভেঙ্গে ফেলে।

> **"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৩)**

এখানে আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল মুসলিমদের বলছেন যে, যেসব গোত্রের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক আছে তারা যদি মুসলিম না হয় তবে সে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে হবে। তাদের প্রতি আর আনুগত্য পোষণ করা যাবে না। এ সম্পর্কে কুরআনে আছে

> "হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ কোরো না – তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বের হয়ে থাক তাহলে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং হাত ও জিহবা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন।" (সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১-৩)

মদীনায় ইসলাম আসার পর আগের আইনগুলো রদ হয়ে যায়। নতুন আইন অনুসারে মুসলিমদের সাথে কাফির গোত্রগুলোর আগের সকল সম্পর্কের ইতি ঘটে। মদীনায় আসার পর মুসলিম ও আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) মধ্যকার সম্পর্কের উপর কুরআনে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ মদীনাতে তখন অনেক আহলে কিতাব বসবাস করতো। মদীনার আরবদের সাথে ইহুদিদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কীরূপ হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল আয়াত অবতীর্ণ করেন।

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা মায়িদা, ৫: ৫১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেন, 'এখানে আল্লাহ তাআলা ইসলামের শত্রু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন – তারা কখনো তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। কেননা তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতা রয়েছে। হ্যাঁ, তারা একে অপরের বন্ধু বটে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে দেবে। আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত সমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসূল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তাকে সরলপথের দিশা দেওয়া হবে।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১০০-১০১)

এখানে মুসলিমদের আবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে যদি তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পথ অনুসরণ করে তবে তারা কাফির হয়ে যাবে।

"ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, সে পথই সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খার অনুসরণ করেন সেই জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে – তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই ।" (সূরা বাকারা, ২: ১২০)

জাহেলী যুগের প্রত্যেকটি সম্পর্ক মদীনায় বাতিল বলে ঘোষিত হলো। অতীতে যাদের সাথে বন্ধুত্ব বা মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটলো। এরপর থেকে সকল সম্পর্কের ভিত্তি হলো ইসলাম। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এই কালিমার প্রথমে আছে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং তারপরে স্বীকৃতি জ্ঞাপন। প্রথম অংশ হলো, লা ইলাহা, অর্থাৎ, কোনো ইলাহ নেই – এখানে একজন ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে যে, সে এতদিন যেসব জিনিসকে উপাস্য মনে করেছে – তার সব ক'টা বাতিল, সেগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। পরের অংশে বলা হচ্ছে, ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত – মানে হলো আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, একমাত্র মা'বূদ। এই স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে এখন মানুষের আল্লাহর উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলো।

ঠিক একইভাবে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে প্রথমে অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্ক

শেষ করে ফেলার আদেশ দিয়েছেন। এরপর বলে দিচ্ছেন কাদেরকে মুসলিমরা বন্ধু হিসেবে বেছে নেবে, কাদের প্রতি মুসলিমদের আনুগত্যবোধ থাকবে।

> “তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণ – যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।” (সূরা মায়িদা, ৫: ৫৫-৫৬)

একটি নতুন দল গড়ে উঠলো বিশ্বাস ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। এই ভিত্তি ছিল ঈমান, এটি ছিল আল্লাহর দল।

> “মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সদয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন – তওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ – যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে – যা চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে – যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।” (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৯)

আনসারদের মর্যাদা

বারা ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলতে শুনেছি, মু'মিন ছাড়া আনসারদের কেউ ভালবাসে না এবং মুনাফিক্ব ছাড়া কেউ তাদের ঘৃণা করে না। যে তাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন আর যে তাদের ঘৃণা করবে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন।’[76]

আনসারদের রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভালোবাসতেন এবং এই ভালবাসা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আনসাররা যদি এক পথে চলে আর বাকিরা অন্য পথে, তাহলে আমি আনসারদের পথেই চলবো। যদি না আমাকে হিজরত করতে হতো তবে আমি নিজেকে আনসারদের একজন ভাবতাম।’ আনসারদের ভুলত্রুটির মাফ করে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই আল্লাহর কাছে দুআ করে বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! আনসার ও তাদের সন্তানদের ক্ষমা করে দাও।’ তিনি তাদের ব্যাপারে বলেছেন, ‘আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি আনসারদের ভালোবাসি। তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন, এখন তোমাদের পালা।’

---

[76] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ৮।

এই ছিল সংক্ষেপে মদীনাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বিতীয় কর্মসূচি; আনসার ও মুহাজিরদের এক করা এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ গড়ে তোলা।

তৃতীয় প্রজেক্ট: মদীনার সনদ বা চুক্তিপত্র

মদীনায় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। এ ধরনের বহুত্ববাদী একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি সাধারণ সমস্যা। এ ধরনের জটিলতা নিরসনে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সনদ প্রণয়ন করলেন যাতে এসব বিষয়ে কোনো জটিলতার অবকাশ না থাকে এবং মদীনা একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে পারে। তিনি এ সনদে বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপ হবে, কোনো বিবাদ হলে কীভাবে তার মীমাংসা হবে, যুদ্ধে কে কার পক্ষ নেবে বা সাহায্য করবে, কারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে – এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন।

চুক্তিপত্রের কয়েকটি ধারা এখানে উল্লেখ করা হলো।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. এটি নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পাদিত। কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলিমদের মাঝে লিখিত। এটি তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা তাদের অনুসারী, মিত্র এবং সহযোগী।

২. এরা সকলে এক উম্মাত, অন্যদের থেকে আলাদা।

৩. কুরাইশের মুহাজিরগণ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে পূর্বের রীতিতে রক্তপণ আদায় করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

৪. বনু আউফ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে আগের রীতিতে রক্তপণ লেনদেন করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

[একই ধারা অন্য কিছু গোত্রের জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

৫. যারা বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে, যদিওবা তাদের সন্তান হয়।

৬. এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে কোনো কাফিরের বদলে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

৭. কোনো মুসলিম কাফির কুরাইশদের জানমালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দেবে না।

সূচিপত্র

৮. কোনো মু'মিন, যে এই লিপির ধারাগুলো স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছে তার জন্য বৈধ নয়, কোনো দুষ্কৃতিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দেওয়া।

৯. আর যে বিষয়েই তোমাদের মাঝে মতভেদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের ﷺ সমীপে উপস্থাপিত হবে।

১০. বনু আউফের ইহুদিরা মু'মিনদের সাথে এক দলভুক্ত- ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম।

[একই ধারা ইহুদিদের অন্যান্য গোত্রগুলো জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

১১. ইহুদিরা মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়া (যুদ্ধার্থে) বের হবে না।

১২. ইহুদিরা বহন করবে তাদের নিজেদের ব্যয়ভার ও মুসলিমরা তাদের নিজেদের। তাদের কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

১৩. মদীনাকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হবে।

১৪. এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা থেকে হানাহানি বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৫. নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না কুরাইশকে, আর না তাকে যে কুরাইশের সাহায্য করে।

১৬. চুক্তির সকল পক্ষ মদীনায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করবে।

মদীনার সনদ: কিছু পর্যালোচনা

বিশ্বাসভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকত্বের ধারণা

মদীনায় রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের মাধ্যমে আকীদাহ বা ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক একটি সমাজের গোড়াপত্তন ঘটে এবং গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ার এই ধারণাটি আরবদের জন্য নতুন ছিল। কারণ ইতিপূর্বে তাদের পরিচয় ছিল বংশ বা গোত্রভিত্তিক, রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা ঐক্য বজায় রাখত। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন একটি ধারণা নিয়ে আসেন। তিনি আরব থেকে "গোত্র" ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করে দিলেন "উম্মাহ" ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা দিয়ে। তিনি বনু আওস ও বনু খাযরাজকে এক করলেন, নাম দিলেন আনসার। মদীনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের এক করলেন এবং তাদের সাধারণ পরিচয় দিলেন মুসলিম এবং তারা প্রত্যেকে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক। এখানে কারো গোত্র-পরিচয় বা গায়ের রং বা জাতীয়তা প্রাধান্য পেল না, বরং যে বিষয়টি তাদের এক করলো সেটা হচ্ছে তাদের ধর্মবিশ্বাস। এমনকি যারা মক্কা-মদীনার বাইরে

সূচিপত্র

থেকে আগত, তারাও ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করলো শুধু এই যোগ্যতায় যে তারা মুসলিম। তিনি সবাইকে জানিয়ে দেন যে, মুসলিমরা একে অপরের ভাই।

চুক্তিপত্রে বলা হয়েছে – "ঈমানদাররা একে অপরের সহযোগী" – এই কথার মাধ্যমে মুসলিমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচয় লাভ করলো। সম্ভবত জাতি হিসেবে মুসলিমদের স্বকীয়তা বজায় রাখতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন অনেক নির্দেশ দিয়ে গেছেন যেখানে ইহুদিদের কাছ থেকে মুসলিমদের স্বকীয়তা ও পার্থক্য বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। মক্কার মুশরিক ও মুসলিমদের মধ্যে অনেক বিষয়ে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও মদীনার আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপারে সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের মুসলিম পরিচয়কে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিলেন। এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে মদীনার মুসলিমদেরকে ইহুদিদের থেকে ভিন্নভাবে চলাফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যেমন: রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ্য করলেন, মদীনার ইহুদিরা ইবাদাতের সময় চামড়ার মোজা পরে না, তাই তিনি মুসলিমদের ইবাদাতের সময় চামড়ার মোজা পরার অনুমতি দিলেন। আবার মদীনার ইহুদিরা মেহেদী দিয়ে চুল রঙ করতো না, তাই তিনি মুসলিমদেরকে মেহেদী দিয়ে চুল রঙ করার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশটি ছিল পুরুষদের জন্য। এরকম আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। ইবন আব্বাস ﷺ এটি বর্ণনা করেছেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন দেখলেন মদীনার ইহুদিরা আশুরার দিনে, অর্থাৎ মুহাররামের ১০ তারিখ রোজা রাখে এবং তারা এই দিনের ব্যাপারে বলে, 'এইদিনে মূসা ফির'আউনকে পরাজিত করেছেন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদের ﷺ বললেন, 'তাদের (ইহুদিদের) চাইতে আমি মূসার বেশি আপন।'[77] এরপর সাহাবারা সেদিন সাওম পালন করলেন।

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছেন যে মূসা ﷺ ছিলেন একজন মুসলিম, কিন্তু ইহুদিরা মুসলিম নয়, তাই সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে তাঁর প্রতি আমাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি, ইহুদিদের চেয়েও বেশি, যদিও বা তারা নিজেদের মূসার অনুসারী বলে দাবি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন (১০ই মুহাররাম) রোজা রাখা শুরু করলেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে তিনি যদি পরবর্তী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন তাহলে ১০ই মুহাররামের সাথে ৯ই মুহাররামও রোজা রাখবেন। এভাবে তিনি আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে একটি পার্থক্য করে দিয়েছিলেন যেখানে মুসলিমরা ৯ই ও ১০ই মুহাররাম রোজা রাখত আর অন্যদিকে ইহুদিরা শুধু ১০ই মুহাররাম রোজা রাখত।

সনদ থেকে এটাও স্পষ্ট যে ইহুদিরা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা নাগরিকত্বের সুবিধা লাভ করবে, নিরাপত্তা পাবে, শর্ত ছিল তারা ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত

---

[77] সহীহ বুখারি, অধ্যায় নবীদের কাহিনী, হাদীস ৭০।

সূচিপত্র

থাকবে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো দলকে সাহায্য করবে না।

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা

এই সনদ অনুসারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতীক, ধর্মীয়, পারিবারিক বিরোধ, ফৌজদারি – সকল বিষয়ের নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ রায় চূড়ান্ত বলে গন্য হবে। সনদে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে বিষয়েই মতভেদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের সমীপে উপস্থাপিত হবে।' অর্থাৎ মদীনার এই রাষ্ট্রটি হবে একটি শরীয়াহ শাসিত রাষ্ট্র এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হচ্ছেন সেই রাষ্ট্রের প্রধান।

ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য এখানেই, অন্য ধর্মগুলোতে 'ইবাদাত' করা হয় তাদের স্ব-স্ব উপাস্যের, কিন্তু জীবনের অন্যান্য দিক, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয় তাদের নিজেদের ইচ্ছায় বা নিজেদের বানানো আইনে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে 'ইবাদাত' যেমন আল্লাহর জন্য, তেমনি জীবনের অন্যান্য সকল বিষয় পরিচালিত হবে "শরীয়াহ" দ্বারা, অর্থাৎ সেই সকল আইন দ্বারা যেগুলো আল্লাহ কুরআনে নাযিল করেছেন, অথবা সুন্নাহর মাধ্যমে যে সকল আইনের বৈধতা দিয়েছেন।

> "নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন।" (সূরা নিসা, ৪: ১০৫)

অর্থাৎ ইবাদাত বা ধর্মীয় বিষয় (Religious) পালনের জন্য যেমন কিছু বিধান আছে, তেমনি দুনিয়াবী (Worldly) বিষয় গুলোর জন্যও ইসলামে নির্দিষ্ট বিধান আছে। এছাড়া আল্লাহর দেওয়া দ্বীন নিরাপদভাবে পালনের জন্য আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরি। আধুনিক শাসন ব্যবস্থাকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় – আইনবিভাগ (Legislative), বিচারবিভাগ (Judicial) ও কার্যনির্বাহী বিভাগ (Executive) – মদীনার সনদে প্রতিটি বিভাগের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত এবং ইহুদিরাও এটি মেনে নিয়েছিল। মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর ﷺ সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। অবশ্য ইহুদিদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল যে তারা যদি চায়, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যকার কোনো সমস্যা তাদের ধর্মীয় কিতাব অনুসারে ফয়সালা করতে পারবে, আবার তারা চাইলে তাদের নিজস্ব সমস্যা ফয়সালার জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদালতে দারস্থ হতে পারবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ স্বাধীনতা ছিল তিনি তাদের মামলা নিষ্পত্তি করে দেবেন অথবা তাদের মামলা তাদের আদালতে বিচার করতে ফিরিয়ে দেবেন। এছাড়াও মদীনাবাসীর কারো সাথে বহিরাগত কারো মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে সেই ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ও তাঁর রাসূলের ﷺ ফয়সালা সবাইকে মেনে নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্ব

এই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মদীনাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও তিনি মদীনাতে একজন অতিথি হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন কার্যত তাদের নেতা। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সূরা আন-নিসাতে বলেছেন,

> **"বস্তুত, আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।" (সূরা আন-নিসা, ৪: ৬৪)**

সনদে উল্লেখ করা হয়েছে: এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা থেকে হানাহানি বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত – এই ধারা থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট, সেখানে ভাগ বসানোর অধিকার কারো ছিল না।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহকে ﷺ পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে। নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন পন্থায় প্রতিষ্ঠা করেছেন আর সেসব পন্থার মাঝে মদীনার সনদ অন্যতম। মদীনায় এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ চারটি প্রকল্প হাতে নেন – মসজিদ নির্মাণ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ এবং সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা। প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সনদে শুধু একজন মানুষের নাম স্থান পেয়েছে আর তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। এভাবেই মদীনায় রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্ষমতা সুসংহত হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুমতি ছাড়া কারো মদীনা ত্যাগ করা বা যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। কুরাইশ এবং কুরাইশদের কোনো মিত্রকে সাহায্য করা এই সনদে নিষিদ্ধ করা হয়।

ইহুদি ও মুসলিমদের সম্পর্ক

মদীনার সনদ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎকালীন আহলে কিতাবদের প্রতি বেশ সহনশীলতা দেখিয়েছেন। এই চুক্তিপত্রে ইহুদিদেরকে মদীনার অর্থাৎ একটি ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তারা নিজেদের ধর্মীয় রীতি পালন করার সুযোগ পেয়েছিল এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এই যে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর। অন্যদিকে, ইহুদিদের উপর যে দায়িত্ব ও শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলো হলো:

- বহিঃশত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে ইহুদিরা মুসলিমদের পক্ষ নেবে।
- তারা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর মতামত প্রদান করবে এবং এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে না।
- মদীনার নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না।
- রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ ব্যতিরেকে কেউ মদীনা ত্যাগ করবে না।

এরকম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে মুসলিম ও ইহুদিদের সহাবস্থানের সূচনা হলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, বরং সম্পর্ক কেবল খারাপই হয়েছে। কেননা ইহুদিরা মদীনায় মুসলিমদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরু থেকেই তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ইহুদিরা তা হতে দেয়নি।

মদীনার পবিত্রতা বজায় রাখা

আরবদের কাছে মক্কা 'হারাম' বলে বিবেচিত ছিল, অর্থাৎ, সেখানে কোনো প্রকার রক্তারক্তি, অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা করা নিষিদ্ধ ছিল, এটি ছিল তাদের কাছে একটি পবিত্র স্থান। মদীনার একটি নির্দিষ্ট বর্ডার বা সীমানা ছিল এবং মদীনার সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাকে সকলের জন্য নিরাপদ স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মদীনার পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য সেখানে গাছকাটা, শিকার করা, যুদ্ধ ও অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

মক্কার জন্য মুহাজিরদের কাতরতা

মুহাজিরগণ মক্কার জন্য কাতরতা অনুভব করতেন। তাঁরা সেখানে ফিরে যেতে চাইতেন। বিলাল ؓ প্রায়ই বলতেন, 'উতবা ইবন রাবিআ, শায়বা ইবন রাবিআ ও উমাইয়া ইবন খালাফের উপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক; তাদের জন্যই আমাদেরকে মক্কা ছেড়ে এ রোগ-শোকের দেশে আসতে হয়েছে।' মদীনায় জলাবদ্ধতা থাকার কারণে সেখানে ম্যালেরিয়া, জ্বর প্রভৃতি রোগ একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

মুয়াত্তা ইবন মালিকে একটি হাদীস আছে যেটি বর্ণনা করেছেন আ'ইশা ؓ। তিনি বলেন,

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবু বকর ও বিলাল ؓ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাদেরকে দেখতে গেলাম এবং বললাম, বাবা, কেমন আছেন আপনি? বিলাল, আপনি কেমন আছেন? আমার বাবা আবু বকর ؓ জ্বরাক্রান্ত হলেই এ পংক্তিগুলি আবৃত্তি করতেন – প্রতিটি মানুষ রোজ সকাল তার আপনজনদের মাঝে কাটায়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী। আর

বিলাল ﷺ গলার স্বর উঁচু করে আবৃত্তি করতেন: হায়, আমি যদি জানতাম আমি কি মক্কার সেই উপত্যকায় আর একটি রাত হলেও কাটাতে পারবো, আমার চারপাশ জুড়ে থাকবে ইযখির আর জলীল ঘাস। হায়, আমার ভাগ্যে কি মাজান্না কূপের পানি জুটবে? আমি কি আর কখনো শামা আর তাফিল পাহাড়ের দেখা পাব?"

আ'ইশা ﷺ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানালাম। তখন তিনি এ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের ভালোবাসার শহর বানিয়ে দাও যেমন ভালোবাসার ছিল মক্কা, অথবা মদীনাকে মক্কা থেকেও প্রিয় করে দাও। আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। মদীনার সা ও মুদ্দার মাঝে বিশেষ বরকত দান করো (অর্থ-সম্পদে বরকত দান করো)। এখানের জ্বর রোগকে সরিয়ে জুহফায় নিয়ে যাও।'[78]

যখন আ'ইশা ﷺ জ্বরে আক্রান্ত আমর ইবন ফুহাইরাকে দেখতে গেলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন তখন আমর ইবন ফুহাইরা উত্তর না দিয়ে বলতে লাগলেন, "মৃত্যু হওয়ার আগেই আমি মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছি, কাপুরুষের মৃত্যু পেছনে লেগেই থাকে।"

এখানে আবু বকর ﷺ মৃত্যুর কথা বলছিলেন, বিলাল বলছিলেন শামা ও তাফিল নামক মক্কার দুটি পাহাড়ের কথা। আর আমরও মৃত্যুর কথা স্মরণ করছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মক্কায় ফেরার জন্য কাতর। তাঁরা সকলে নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এমন এক জায়গায় হিজরত করেছেন যেখানে তাঁরা আসতেই চাননি। তার উপর তাদের উপর শারীরিক অসুস্থতা জেঁকে বসলো। পুরো ব্যাপারটি তাদের জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। এমনকি তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য পরিবারের সদস্যরাও আশেপাশে ছিল না। সাহাবাদের ﷺ এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন; তাই তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। এ দুআটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুআর বরকতে মুহাজিরগণ দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মদীনাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

মদীনাকে তাঁরা এত ভালোবেসেছিলেন যে মক্কা বিজয়ের পরও তাঁরা মদীনায় থেকে গেলেন। আবু বকর ﷺ, উমার ﷺ, উসমান ﷺ, বিলাল ﷺ – তাদের কেউই মক্কায় ফেরত যাননি। মু'মিনদের অন্তরে মদীনার প্রতি ভালোবাসা থাকবে – এটাই স্বাভাবিক। এখনও মুসলিমরা যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ শহরে প্রবেশ করে তখন তাদের মধ্যে একটি বিশেষ অনুভূতি তৈরি হয়। মক্কায় প্রবেশ করলে বিশাল বিশাল স্তম্ভে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদ-উল-হারামের দিকে তাকালে বিশালতার একটি অনুভূতি তৈরি হয়, কিন্তু মদীনায় মক্কার মতো পাহাড়-পর্বত নেই, সেখানে সমতল, সেখানে একধরনের প্রশান্তি অনুভব হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ দুআর বরকতেই মদীনা মুসলিমদের

---

[78] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১৪।

কাছে অতি প্রিয় একটি স্থান।

ইসলামের প্রথম সন্তান

হিজরতের পর মদীনায় প্রথম শিশু জন্ম নেয় আসমা বিনত আবু বকরের কোলে। এই সন্তান হলো আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের। আসমা তাঁর সন্তানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যান এবং তাঁর কোলে তুলে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি খেজুর চিবিয়ে সেটিকে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের মুখে ঢুকিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দুআ করেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের ছিলেন মুহাজিরদের প্রথম সন্তান।[79]

পুরো ঘটনাটি আসমা বিনত আবু বকর ﷺ নিজ মুখে বর্ণনা করেছেন:

'আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি সন্তানসম্ভবা। আমি মদীনায় এসে কুবাতে থাকলাম, সেখানেই আমি আমার পুত্র সন্তানকে প্রসব করি। এরপর আমি তাঁকে নিয়ে নবীজির s কোলে তুলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনিয়ে তা মুখে দিলেন, চাবালেন এবং সেই খেজুরের রস আমার বাচ্চার মুখে ঢেলে দিলেন। তারপর নবীজি s চিবানো খেজুরের সামান্য অংশ নবজাতকের মুখের ভিতরের তালুতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দুআ করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম সন্তান।'[80]

এ হাদীসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে ইঙ্গিত করে, সাহাবাদের ﷺ কাছে ইসলামের সূচনাবিন্দু ছিল মদীনা। কারণ সেখানেই প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মক্কায় অতিবাহিত ১৩টি বছর যেন এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকাল ছিল। আসমা এখানে বলেননি যে হিজরতের পর জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু অথবা মদীনায় জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু; বরং তিনি বলেছেন "উলিদা ফীল ইসলাম" – অর্থাৎ, ইসলামের প্রথম সন্তান। মুসলিমরা যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম মেনে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে একমাত্র তখনই ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে। সাহাবিদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি দেখিয়ে দেয় বর্তমানের-মুসলিমরা ইসলামের অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছে।

ইহুদি পণ্ডিত থেকে মুসলিম: আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মদীনার ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী পণ্ডিত বা রাবী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ । নবীজির ﷺ আগমনের খবর শুনে তিনি তাঁর সাথে

---

[79] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ১৩৬।

[80] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আকীকা, হাদীস ৩।

দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইমাম আহমেদ থেকে জানা যায়, আবদুল্লাহ ইবন সালাম ﷺ যখন রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখলেন, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আল্লাহর রাসূলের ﷺ চেহারা থেকেই যেন সত্যের আলো উদ্ভাসিত হতো। আবদুল্লাহ ইবন সালাম একজন ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন, তাই তিনি মুহাম্মাদকে ﷺ পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন যে তিনি আসলেই রাসূল কি না। ইহুদি পণ্ডিতরা সর্বশেষ রাসূলের আগমনের নিদর্শন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আনাস ﷺ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন:

আবদুল্লাহ ইবন সালামের ﷺ কাছে নবী করীমের ﷺ আগমনের সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি এসে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি বললেন, "আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। এগুলোর সঠিক উত্তর একজন নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম লক্ষণ কী? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাবার কী? (৩) কী কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার মতো কখনো বা মায়ের মতো হয়?"

নবীজি ﷺ উত্তরে বললেন, "এ বিষয়গুলি সম্পর্কে এই মাত্র জিবরীল ﷺ আমাকে জানিয়ে গেলেন"। আবদুল্লাহ ইবন সালাম ﷺ একথা শুনে বললেন, "তিনিই ফেরেশতাদের মধ্যে ইহুদীদের শত্রু।" নবীজি ﷺ বললেন, '(১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্বপ্রথম লক্ষণ হলো লেলিহান আগুন যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে। (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাবার হলো মাছের কলিজার বাড়তি অংশ। (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হয় আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়।'

আবদুল্লাহ ইবন সালাম ﷺ বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, ইহুদীরা এমন একটি জাতি যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার ইসলাম গ্রহণের খবর প্রকাশ পাবার আগে আমার ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন তারা কী বলে। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাজির হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কেমন লোক?" তারা বললো, "তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। তিনি আমাদের সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তির সন্তান।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বল তো, যদি আবদুল্লাহ ইবন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে? তোমরা তখন কী করবে?" তারা বললো, "আল্লাহ তাকে এ কাজ থেকে রক্ষা করুন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার একথাটি জিজ্ঞেস করলেন, তারা একই উত্তর দিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ।" এ কথা শুনে ইহুদীরা বলতে লাগল, "সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বাজে লোক এবং খারাপ লোকের সন্তান।" অতঃপর তারা তাঁকে অপমান করে আরো অনেক

কথাবার্তা বললো। আবদুল্লাহ ইবন সালাম ﷺ বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি এমন কিছুরই আশংকা করছিলাম।"[81]

যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম জিবরীল ফেরেশতাকে ইহুদিদের শত্রু বলে উল্লেখ করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সামনে সূরা আল-বাকারাহর একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন,

> "যে শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের, জিবরীলের ও মীকাঈলের – তবে নিশ্চয় আল্লাহ সেসব কাফিরদের শত্রু।" (সূরা বাকারাহ, ২: ৯৮)

আল্লাহ তাআলা সব ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছেন আর সব ফেরেশতাই আল্লাহকে সম্মান করেন। কোনো নির্দিষ্ট ফেরেশতাকে বন্ধু বা শত্রু ভাবার কোনো কারণ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন সালামের এই ভুল ধারণাটিকে সংশোধন করে দিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তাতে আরেকটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার আছে। এই দুনিয়াতে মাছের কলিজা হয়তো খুব জনপ্রিয় কোনো খাবার নয়, কিন্তু জান্নাতের সবকিছুই দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। নাম শুনে একই রকম মনে হলেও জান্নাতে সবকিছু পুরোপুরি ভিন্ন হবে। আর তৃতীয় প্রশ্নের যে উত্তর আল্লাহর রাসূল ﷺ দিয়েছেন তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান বলে যে, যদি পিতার জিন (Gene) সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হবে আর একইভাবে যদি মায়ের জিন সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হবে। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক এ কথাটিই বলেছেন, কারণ বীর্যের মাধ্যমে পুরুষের জিন এবং ডিম্বাণুর মাধ্যমে মহিলার জিন প্রবাহিত হয়।

ইহুদিরা মুখের উপরে যেভাবে আবদুল্লাহ ইবন সালাম সম্পর্কে মিথ্যে বলেছে – তা দেখে বোঝা যায় তারা মিথ্যাচারে কতটা পারদর্শী। এই ধরনের ছোট ছোট ঘটনাগুলো মুসলিম ও ইহুদিদের সম্পর্কে ভাঙনে প্রভাবক হয়ে দাঁড়ায়। ইহুদিরা কোনোভাবেই মুহাম্মাদকে ﷺ রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে একমাত্র সত্য ও শেষ দ্বীন হিসেবে মেনে নিতে পারছিল না। তারা আড়ালে থেকে প্রায়ই ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতো।

অন্য এক বর্ণনায় ইবন আব্বাস ﷺ বলেছেন, যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম, সালাবা ইবন সা'ইয়া, উসাইদ ইবন সা'ইয়া, আসাদ ইবন উবাইদসহ আরও কিছু ইহুদি মুসলিম হয়ে গেল তখন ইহুদিদের আলিমরা বলতে লাগলো, "যারা মুহাম্মাদের দ্বীনের অনুসারী হয়েছে তারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক।" তারা মনে করতো যদি

---

[81] সহীহ বুখারি, অধ্যায় নবীদের কাহিনী, হাদীস ৪।

এই লোকগুলো আসলেই ধার্মিক হতো তাহলে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বীন ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করতো না।"

"তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল। তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোনো অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বিষয়ে অবগত।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১১৩-১১৫)

কিবলার পরিবর্তন

রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনায় হিজরতের ১৪ মাস পরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে। তা হলো কিবলার পরিবর্তন। মক্কাতে থাকাকালীন সময়ে কিবলা ছিল জেরুসালেম বরাবর; কিন্তু তখন কিবলা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ মক্কায় থাকাকালীন তিনি জেরুসালেম ও কাবা উভয়কে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। এভাবে তিনি জেরুসালেম ও কাবা – উভয়ের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর দেখা গেল যে, সেখান থেকে মক্কা ও জেরুসালেমের অবস্থান পরস্পরের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা বরাবর সালাত আদায় করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করার সাহস পাননি। এরপর আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ইবরাহীমের ﷺ কিবলা অর্থাৎ কাবাকে মুসলিমদের কিবলা বানানোর নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। এ আয়াতটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন কিবলা বরাবর সালাত আদায় করলেন। এরই মধ্যে একজন সাহাবী ﷺ মদীনার কয়েক মাইল দূরে তাঁর গোত্রকে কিবলা পরিবর্তনের খবরটি জানানোর জন্য বের হয়ে পড়েন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে তাঁরা পুরনো কিবলা অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর আসরের সালাত পড়ছে। ওই অবস্থাতেই সেই সাহাবী ﷺ তাদেরকে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি মাত্রই রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মক্কা বরাবর সালাত আদায় করেছি।' এ কথা শুনে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সালাতের মধ্যেই নিজেদের কিবলা মক্কার দিকে পরিবর্তন করে ফেললো। এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সাহাবিদের ﷺ প্রবল আনুগত্য যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় সেই সমাজে একজন মুসলিমের কথার উপর সবাই কতটা আস্থা রাখত।

কিন্তু এ ঘটনাটি বেশ কিছু বিতর্কের জন্ম দেয়। শুধুমাত্র কিবলা পরিবর্তনের বিষয় নিয়েই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সূরা আল-বাকারাহর ৪০টি আয়াত নাযিল করেছেন। ইবনুল কায়্যিম বলেন যে এটি ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুশরিকদের জন্য

একটি পরীক্ষা। কাবা ছিল আরবের মুশরিকদের ক্বিবলা, তাই ক্বিবলার দিক পরিবর্তনের পর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলতে শুরু করলো, "তিনি আমাদের ক্বিবলার দিকে ফিরে এসেছেন, এখন তিনি আমাদের ধর্মের দিকেও ফিরে আসবেন।" ইবনুল কায়্যিম আরও বলেন, এই কিবলা পরিবর্তন ছিল মুনাফিকদের জন্যেও একটা পরীক্ষা ছিল যারা বলতো মুহাম্মাদ ﷺ নিজেই জানে না সে কী করছে; সে বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে। ক্বিবলার পরিবর্তন ইহুদিদের জন্যেও একটি পরীক্ষা ছিল। ইহুদিরা জেরুসালেমকে নবীদের ক্বিবলা বলে বিশ্বাস করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ক্বিবলা পরিবর্তন করলেন, তখন তারা তাঁর সম্পর্কে বলতে শুরু করলো, 'তিনি পূর্বের নবীদের ক্বিবলা পরিত্যাগ করেছেন – এতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি আল্লাহর রাসূল নন।' পাশাপাশি এটা মুসলিমদের জন্যও একটি পরীক্ষা ছিল – আল্লাহ্ দেখতে চাইছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসরণে তারা কতোটা দৃঢ় – তারাও কি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ক্বিবলা পরিবর্তন করছেন কি না। অর্থাৎ এই একটি ঘটনা ছিল মুসলিম-মুশরিক-ইহুদী-মুনাফিক সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা।

> **"এখন নির্বোধেরা বলবে, কীসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ওই ক্বিবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুনঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ১৪২)**

কাবা, মক্কা কিংবা জেরুসালেম – সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, আর তাই মুসলিমরা কোন দিক বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জালের, তাই আল্লাহ বলছেন, "পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ।" ইবনে কাসীর বলেন, 'যদি আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন নতুন একটি ক্বিবলা নির্ধারণ করে দেন, তাহলে আমাদেরকে ঠিক সেই ক্বিবলামুখি হতে হবে। আমরা তাঁরই বান্দা এবং তাঁরই অধীনস্থ।' ইহুদিরা মনে করতো আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন না, তাই দুটো ক্বিবলার যেকোনো একটি ঠিক, আরেকটি ভুল। মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আরও বলতো, "যদি প্রথম ক্বিবলা ঠিক হয় তাহলে নতুন ক্বিবলা বরাবর ইবাদত করে তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আর যদি দ্বিতীয় ক্বিবলা ঠিক হয় তাহলে তো তোমাদের এতদিনের ইবাদত সব বিফলে গেল।" ইহুদিদের এ কথার জবাবে আল্লাহ্ তাআলা আরেকটি আয়াত নাযিল করেন।

> **"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর। আপনি যে ক্বিবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত) নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়।"**

(সূরা বাকারাহ, ২: ১৪৩)

উম্মাতান ওয়াসাত মানে হলো উত্তম ও সম্মানিত উম্মত। ইবন কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,

"আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'তোমাদেরকে এই পছন্দনীয় কিবলার দিকে ফিরাবার কারণ এই যে, তোমরা নিজেরাও পছন্দনীয় উম্মাত। তোমরা কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মাতের উপর সাক্ষ্য দেবে, কেননা তারা সবাই তোমাদের মর্যাদা স্বীকার করে।'

ইহুদিদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, কোনো ব্যক্তি যদি ওয়াহীর আগমনের পূর্বে মারা যায় তবে তার সমস্ত ইবাদত বিফলে যাবে। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, পূর্বের কিবলা বরাবর মুসলিমদের ইবাদত আল্লাহ নষ্ট করে দিবেন না।

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেই দিকেই মুখ করো। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে।"

সূরা আল বাকারাহর পরবর্তী আয়াতগুলোতে (১৪৪-১৫০) আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।

বাস্তব সত্য সেটাই যা আপনার পালনকর্তা বলেন। কাজেই আপনি সন্দিহান হবেন না। আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সে মুখ করে (ইবাদত করবে) । কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত

করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

আর যে স্থান থেকে আপনি বের হন, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরান – নিঃসন্দেহে এটাই হলো আপনার রবের পক্ষ থেকে সত্য। বস্তুতঃ তোমার রব তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন।

আর আপনি যেখান থেকেই বেরিয়ে আসুন এবং যেখানেই অবস্থান করুন, সেই দিকেই মুখ ফেরাও, যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক, তাদের কথা ভিন্ন, তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় করো। যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার অনুগ্রহ সমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরলপথ প্রাপ্ত হও।"

"...তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর..." – বর্তমান সময়ে ইসলাম যখন কাফির ও মুনাফিকদের কাছ থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ ও সমালোচনার শিকার, সেই সময়ে এই আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেয়। প্রতিটি যুগেই ইসলামবিদ্বেষী কিছু লোক থাকে। তারা ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিধানের দোষ খুঁজে বেড়ায়। যেমন এই যুগে তারা বলে, ইসলাম নারীদের শোষণ করে, অথচ তারাই একসময় মনে করতো ইসলাম নারীদেরকে বেশি-বেশি অধিকার দিয়েছে। ইসলাম সন্ত্রাসবাদের ধর্ম, অশান্তির ধর্ম – ইত্যাদি নানানরকমের প্রপাগান্ডা চালায়। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ঈমানদারদের বলেছেন যে, ঈমানদাররা যেন ওইসব লোকদের ভয় না পেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে। কাজেই একজন মুসলিম এসব ইসলামবিদ্বেষীদের কথায় পাত্তা না দিয়ে শুধু তা-ই করবে যা আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল করতে বলেছেন। আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি বিধান, প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মুসলিমদের জন্য একেকটি অনুগ্রহ।

মদীনার অর্থনৈতিক উন্নয়ন

নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ কিছু উদ্যোগ নেন। তিনি মসজিদ-উল-হারামের পাশের একটি জায়গাকে মদীনার বাজার হিসেবে নির্ধারণ করলেন। এটি ছিল মদীনার কেন্দ্রীয় বাজার। এ বাজারকে তিনি করমুক্ত বাজার হিসেবে ঘোষণা করেন। একবার হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল সাহাবারা ﷺ নবীজির ﷺ কাছে আসেন। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আনাস ইবন মালিক ﷺ।

লোকজন এসে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে গেছে, তাই আপনি আমাদের জন্য জিনিসপত্রের দাম স্থির করে দিন।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দাম নির্ধারণের মালিক,

তিনিই দাম কমান, তিনিই দাম বাড়ান। আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই যে আমার উপর কারো জুলুমের কোনো অভিযোগ থাকবে না।'[82]

দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি হলো: রিযিকের মালিক হলেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল। দ্রব্যের দাম উৎপাদন ও চাহিদার সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে এবং এই পরিবর্তন আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনিই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করে দেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে হাত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় ইসলামি অর্থনীতি ব্যবসার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করে, বেচাকেনায় দামের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে না। তবে কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টি করে বা মজুতদারির মাধ্যমে দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে ইসলামের কঠোর বিধিনিষেধ আছে এবং সে সংক্রান্ত বাজার পর্যবেক্ষণ নীতিমালাও রয়েছে।

আ'ইশার ﷺ সাথে বিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ আ'ইশার ﷺ সাথে সংসার শুরু করেন হিজরতের পর, সেটা হিজরতের প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের ঘটনা, যদিও তাদের বিয়ে হয়েছিল মাক্কী জীবনের শেষের দিকে যখন আ'ইশার ﷺ বয়স ছিল ছয় বছর। মদীনায় আসার পরে তাঁকে রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে তুলে আনা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আ'ইশাকে ﷺ বিয়ে করেন তখন তাঁর ﷺ বয়স ছিল ৫৪ বছর, কিন্তু তখনও তিনি আসলে যেন যুবক! আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আ'ইশার ﷺ সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। বয়স রাসূলুল্লাহকে ﷺ বেঁধে রাখতে পারেনি, তিনি তাঁর স্ত্রী আ'ইশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন! যেমন, একদিন তাঁরা দু'জন সফরে বের হয়েছিলেন, আ'ইশা সেদিনের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

'আমি তাঁর সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিলাম এবং জিতে গেলাম! কিন্তু পরে যখন আমি কিছুটা মোটা হয়ে গেলাম, তখন আবার তাঁর সাথে দৌড়ে অংশ নিলাম কিন্তু এবার তিনি আমাকে দৌড়ে হারিয়ে দেন। আর তখন তিনি বললেন, এটা হলো পূর্বের হারের বদলা!'[83] অর্থাৎ আগেরবার আ'ইশা ﷺ জিতেছিলেন, আর পরেরবার জিতলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ ছিলেন আর আল্লাহ্ তাআলার রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর এরকম শারীরিক দক্ষতার দরকার ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাবিআ গোত্রের প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করেন তখন তাঁর

---

[82] আবু দাউদ, অধ্যায় ইজারাহ, হাদীস ৩৬।

[83] আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১০২।

বয়স ছিল ৫০ বছর। কিন্তু রাবিআ গোত্রের নেতা তার গোত্রের লোকদের কাছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ 'যুবক' হিসেবে উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন খুবই প্রাণবন্ত এবং উদ্যমী একজন মানুষ। তাই তাঁকে দেখে তরুণ মনে হতো। এছাড়াও আনাস ইবন মালিকের বর্ণিত হিজরতের কাহিনিতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন ছিলেন তা বোঝা যায়। তিনি উল্লেখ করেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﵁ মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন লোকজন আবু বকরকে ﵁ চিনতে পারলেও রাসূলুল্লাহকে ﷺ চিনতে পারেনি কারণ রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে যুবকদের মতো লাগতো আর সেটা তারা ধারণা করেনি।' আনাস তাঁর সেই বর্ণনায় আবু বকরকে ﵁ 'বয়স্ক ব্যক্তি' আর রাসূলুল্লাহকে ﷺ উল্লেখ করেছেন 'যুবক' হিসেবে। এ সম্পর্কে ইবন হাজার আল-আসকালানি মন্তব্য করেছেন যে, আবু বকরের বয়স যেমন তেমনই লাগতো, বড় বা ছোট মনে হতো না। অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলেন কিন্তু তারপরও তাঁকে দেখতে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক মনে হতো।

চতুর্থ প্রজেক্ট: মুজাহিদ বাহিনী গঠন

জিহাদের সূচনা

মাদানী যুগ মানেই জিহাদের যুগ। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগে জিহাদ কী তা বোঝা জরুরি। মাদানী যুগ ছিল ১০ বছর স্থায়ী আর এই অল্প সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ১৯টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৫৫টির বেশি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ এই ১০ বছরের মধ্যে ৭০টিরও বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, বছরে গড়ে ৭টি করে যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই ব্যাপক প্রস্তুতি, অর্থায়ন, অস্ত্রায়ণ এবং সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করা – এই প্রতিটি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ। এছাড়াও তখনকার প্রযুক্তিতে আকাশপথের ব্যবহার ছিল না তাই একেকটি অভিযান বা যুদ্ধস্থলে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় করে পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যেতো। এর থেকে বোঝা যায় মদীনার যুগ ছিল কেবলই যুদ্ধের যুগ এবং এই যুদ্ধগুলোর পেছনে অনেক শ্রম, সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন এসব যুদ্ধের পেছনে এত সময় ও শক্তি ব্যয় করলেন।

জিহাদ নিয়ে আলোচনা করা আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো বর্তমানে জিহাদের ব্যাপারে নানা ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জিহাদ কী, এর উদ্দেশ্য কী এবং এর পেছনের কারণ কী ইত্যাদি এসব ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন দেখলে এই প্রতিটি প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন জবাব পাওয়া সম্ভব।

জিহাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'প্রচেষ্টা', এর মানে হলো 'সংগ্রাম বা চেষ্টা করা'। কিন্তু ইসলামে এ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। আরবিতে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর আভিধানিক অর্থ একরকম কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় শব্দগুলোর ভিন্ন অর্থ

রয়েছে। যেমন: আরবি শব্দ 'সালাত' এর আভিধানিক অর্থ হলো 'দুআ'। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় সালাত বলতে দুআ বোঝায় না, বরং বিশেষ একটি ইবাদাত বোঝায় যা মুসলিমরা দৈনিক পাঁচবার আদায় করে থাকে। তেমনিভাবে যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা হলেও ইসলামি পরিভাষায় যাকাত হলো একটি বিশেষ ইবাদাত, বছরান্তে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে দান করা। এভাবেই ইসলাম পুরনো শব্দকে নতুন অর্থে সংজ্ঞায়িত করে। তেমনি জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'প্রচেষ্টা' হলেও যেকোনো প্রকার প্রচেষ্টাকে, এমনকি হোক তা ইসলামের পথে, তাকে জিহাদ বলে গণ্য করা হয় না। বরং সালাত বা যাকাতের মতো জিহাদ শব্দ দ্বারাও একটি বিশেষ ইবাদাতের কথা বোঝানো হয়। তাই ইসলামি পরিভাষায় শব্দটির অর্থ হলো যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণ করে অর্থাৎ যারা আল্লাহর শত্রু তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করা। চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাযহাবের সংজ্ঞা অনুযায়ী জিহাদ মানে হলো আল্লাহর পথে আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করা।

আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পথে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধ হলো অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে যুদ্ধ। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে সকল প্রকার রক্তপাত নিষিদ্ধ, শুধু ব্যতিক্রম হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। এর পক্ষে দলীল হলো,

> "যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।" (সূরা নিসা, ৪: ৭৬)

এই আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সকল যুদ্ধকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, একটি যুদ্ধ হলো আল্লাহর পথে ঈমানদারদের যুদ্ধ এবং অপরটি তাগুতের পক্ষে কাফিরদের যুদ্ধ। সংক্ষেপে তাগূত হলো সেই সত্তা বা উপাস্য যাকে আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদাত করা হয় অথবা সেই সীমালঙ্ঘনকারী যে নিজেকে এমন আনুগত্য বা কর্তৃত্বের আসনে দাবি করেছে যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

আল্লাহর রাস্তায় ঈমানদারদের যুদ্ধ একটি প্রশংসনীয় ইবাদাত। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর দ্বীনকে সুসংহত করা। এই কারণে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধের বৈধতা ইসলামে নেই। ইসলামে জিহাদের একটাই উদ্দেশ্য, তা হলো শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' – এর জন্য যুদ্ধ, একমাত্র এই যুদ্ধই হলো ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা হলেন খালিক, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, তাই বৈধতা ও অবৈধতাকে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার একমাত্র তাঁর। যে কোনো আইনকে বৈধতা এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সপ্তাহের ৭টা দিনই সমান, কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়াজালের কাছে শুক্রবার

সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। ভৌগলিক বা সৌর ক্যালেন্ডারের হিসেবে রামাদান মাসের সাথে অন্যান্য মাসের কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অন্যান্য মাসের চেয়ে এই রামাদান মাসকে অধিক পছন্দনীয় মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। ঠিক একইভাবে তিনি জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনকে পছন্দ করেছেন, এ দশদিনের আমলগুলোর জন্য বিশেষ পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন। আবার রামাদানের শেষ দশ রাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শেষ দশ রাতের বিজোড় রাতগুলোর মধ্য থেকে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল লাইলাতুল কদর নির্ধারণ করেছেন যেটি বছরের শ্রেষ্ঠতম রাত। যেকোনো কিছুর পবিত্রতা ও যেকোনো কাজের বৈধতা প্রদানের মালিক কেবল আল্লাহ আযযা ওয়াজাল।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দাসে পরিণত করা। সুতরাং সৃষ্টির দাস না হয়ে বরং মানুষ সৃষ্টিকর্তার দাস হবে – এটাই মানুষের জন্য সাজে, কেননা, মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা এবং সৃষ্টির সেরা হয়ে সে আরেক সৃষ্টির ইবাদাত করতে পারে না। জিহাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মুসলিম-অমুসলিম সকলকে ইসলামের কল্যাণময় শাসনের ছায়াতলে নিয়ে আসা। ইসলামে কাউকে মুসলিম হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় না, তবে ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয় যাতে করে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারে এবং ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ সেইসব লোকদের দেখে অভিভূত হন যাদেরকে শেকলবদ্ধ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। একজন আলিম এই কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এরা হলো সেসব লোক যাদেরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এর ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

গড়পড়তা মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তিত নয়, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কাবাসীদের ডেকে বলেছিলেন, 'আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে' – তখন আবু লাহাব রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেছিল, 'ধ্বংস হোক তোমার হাত। এসব অনর্থক আলাপ করার জন্যই কি তুমি আমাদের ডেকেছ?'

আবু লাহাবের বিরক্তির কারণ হলো সে দুনিয়া কামানো বন্ধ করে এসেছিল এই ভেবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সত্যি, কিন্তু আবু লাহাবের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, কারণ সেখানে দুনিয়ার লাভের কোনো কথা নেই। তাই যখন আবু লাহাব দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে তাওহীদের পথে ডাকছেন তখন সে খুব রেগে গেল। ওই সময়ই আল্লাহ তাআলা সূরা আল-মাসাদ (১১১: ১-৫) নাযিল করেন।

জিহাদ হলো এমন একটি পন্থা যা মানুষকে ইসলামকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা

করতে বাধ্য করে। মাক্কী জীবনের ১৩ বছরের দাওয়াতী কার্যক্রমে খুব অল্প লোকই মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু যখন সাহাবারা ﷺ মদীনায় এসে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ শুরু করলেন এবং লোকেরা ইসলামের ছায়ায় আসলো তখন তারা তাদের কথা গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হলো, কারণ তখন তাদের হাতে কর্তৃত্ব ছিল। তাঁরা শাসনক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন বিধায় এই দাওয়াহ অনেক কার্যকরী হয়েছিল। মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

যেখানে মক্কায় ১৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মাত্র ১০০ জনের মতো সাহাবা ﷺ ছিলেন, সেখানে মদীনাতে প্রতি বছর হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতো। মক্কা বিজয়ের সময় অংশ নিয়েছিল দশ হাজার মুসলিম, বিদায় হাজ্জে অংশ নিয়েছে নব্বই হাজার, আর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন তখন জানাযা পড়েছিল ১ লক্ষ চৌদ্দ হাজার মুসলিম। এই পরিসংখ্যানটি দেখিয়ে দেয় জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকরী হলে কত দ্রুত ইসলাম মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

জিহাদের হুকুম নাযিল হয়েছে কয়েকটি ধাপে, ইবনুল কায়্যিম তাঁর যা'দ-উল-মাআদ গ্রন্থে বলেছেন প্রাথমিক যুগে জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল, জিহাদ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মুসলিমদের ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন। এরপর তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তা বাধ্যতামূলক ছিল না; নিছক অনুমতি দেওয়া হয়।

> "যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ৩৯)

পরবর্তী পর্যায়ে ধাপে তাদেরকে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়।

> "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা, ২: ১৯০)

অবশেষে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিলেন। এরপর সর্বশেষ ধাপের নির্দেশ এল এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উম্মাহর জন্য চূড়ান্ত বিধান প্রকাশ করলেন। এই ধাপে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহকে ﷺ সমস্ত কাফিরদেরদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

> "...আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে..." (সূরা তাওবাহ, ৯: ৩৬)

এ সম্পর্কিত একটি হাদীস রয়েছে যা ২০ জনেরও অধিক সাহাবী ﷺ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো,

ইবন উমার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ s আল্লাহর রাসূল, আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।'[84]

জিহাদের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা কুরআনের কিছু আয়াতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন:

ইসলামের প্রচার

আল্লাহ তাআলার দ্বীন বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়া।

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়..." (সূরা আনফাল, ৮: ৩৯)

ইবাদাতের স্থানসমূহ সুরক্ষিত রাখা

"আল্লাহ মু'মিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে – যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের নির্জন গির্জা, ইবাদত খানা, (ইহুদিদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী

---

[84] সহীহ বুখারি, অধ্যায় ঈমান, হাদীস ১৮।

শক্তিধর।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ৩৮-৪০)

জিহাদ হলো মানুষের রক্ষাকবচ। যদি জিহাদের হুকুম না থাকতো, তাহলে মু'মিনরা ধ্বংস হয়ে যেতো, একে বলা হয় সুন্নাত-উল-মুদাফা'আহ। যদি না আল্লাহ তাআলা জিহাদের হুকুম জারি করতেন, তাহলে খ্রিস্টানদের গীর্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো। যে কারণে মসজিদের সাথে খ্রিস্টানদের গীর্জা ও ইহুদিদের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ হলো, মুসলিমরা সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু করেনি, বরং সর্বপ্রথম যাদের উপর জিহাদের হুকুম নাযিল হয়েছে তারা হলো বনী ইসরাইল, তারাই সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে জিহাদে অংশ নিয়েছে। এ কারণে তাদের ইবাদাতখানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বনী ইসরাইলের আগের জাতিদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়নি। সে সময়ে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন মু'জিযার মাধ্যমে নবীদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিতেন, তাই তখন মু'মিনদের যুদ্ধে জড়ানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। সর্বপ্রথম জিহাদ করেছে মূসার ﷺ উম্মাত।

"তারা এমন লোক – যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ৪১)

দুনিয়ার বুক থেকে অন্যায়-অত্যাচার উচ্ছেদ করা

জিহাদের উদ্দেশ্য অশান্তি সৃষ্টি করা নয় বরং অশান্তি এবং যাবতীয় অন্যায় ও জুলম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য। শয়তানের উদ্দেশ্য ভালো কাজকে মন্দ হিসেবে উপস্থাপন করা এবং মন্দ কাজকে ভালো হিসেবে। জিহাদ একটি ইবাদাত এবং এই ইবাদাতকে অশান্তি বা ফিতনা ভাবার কোনো কারণ নেই, কেননা আল্লাহ তাআলাই বলছেন জিহাদের মাধ্যমে বস্তুত শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়।

"... আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।" (সূরা বাক্বারাহ, ২: ২৫১)

জিহাদ হলো মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা

"... আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান..." (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৪)

সুতরাং সশস্ত্র যুদ্ধ হলো মু'মিন ও কাফির – উভয়ের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। জিহাদের

মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের ধৈর্য পরীক্ষা করেন। তিনি যাচাই করেন মু'মিনরা তাঁর রাহে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। একজন মু'মিন আল্লাহ তাআলার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার হিসেবে নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে পারে, আর জিহাদের মাধ্যমেই প্রমাণ হয় বান্দা কাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, আল্লাহকে নাকি তাঁর সৃষ্টিকে।

জিহাদ হলো এমন একটি আমল যার মাধ্যমে অন্তরের রোগ ধরা পড়ে। যেমন মুনাফিকরা মুসলিমদের সাথে বেশ ভালোভাবেই মিশে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পেত জিহাদের সময়, এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

> "তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দুই-একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে..." (সূরা তাওবা, ৯: ১২৬)

রাসূলুল্লাহর ﷺ সময় প্রতিবছর প্রায় একটি অথবা দুইটি যুদ্ধ সংঘটিত হতো আর তখন মুনাফিকদের নিফাক প্রকাশ পেত।

> "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে – যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুক্রদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও – যাদেরকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬০)

> "যুদ্ধ কর ওদের সাথে – আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন – আর দূর করবেন তাদের মনের ক্ষোভ। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ১৪-১৫)

> "সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর আপনি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করেননি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ – যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। আর এমনিভাবেই আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল।" (সূরা আনফাল, ৮: ১৭-১৮)

সত্য থেকে বাতিলকে পৃথক করে দেওয়া, মুনাফিকদের দ্বিমুখিতা প্রকাশ করে দেওয়া

"আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মু'মিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছো – যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন নাপাককে পাক থেকে। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাটা প্রতিদান।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৭৯)

এভাবেই জিহাদ ভালো থেকে খারাপকে আলাদা করে ফেলে। এ আয়াতসমূহ উহুদ যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয় কারণ আবদুল্লাহ ইবন উবাই মাঝপথে এ অভিযান থেকে মূল বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে আলাদা হয়ে যায়।

জিহাদ হলো আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার একটি কৌশল

"আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মু'মিনদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" (সূরা নিসা, ৪: ৮৪)

মক্কায় যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের উপর কাফেররা নানাভাবে অত্যাচার করতো তবুও তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখাটা আরবদের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না, কারণ তাদের গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গোত্রের কেউ আক্রান্ত হলে কেউ ছেড়ে দিত না। তাই নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে সংযত রাখা মক্কার মুসলিমদের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। এটা ছিল তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা। জিহাদের হুকুম আসার পর আবু বকর ﷺ বললেন, 'আমি জানতাম জিহাদের হুকুম আসবে। একদিন না একদিন আমাদেরকে লড়তে হবেই। আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া উত্তরণের আর কোনো পথ নেই।'

মদীনার প্রাথমিক দিনগুলোতে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলে যে হিজরতের আগেই এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জিহাদের আসল প্রশিক্ষণ মদীনাতে শুরু হয়। আল্লাহ তাআলার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই প্রস্তুতি, আর তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরু থেকেই মুসলিমদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ ছিল শারীরিক ও আধ্যাত্মিক - উভয় প্রকারের প্রশিক্ষণ। এটিই ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ নেওয়া চতুর্থ প্রকল্প।

মুজাহিদ বাহিনী গঠন

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তাকে ঠিক প্রচলিত অর্থে সেনাবাহিনী বলা যায় না। কারণ তাঁরা পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। বরং তাদেরকে বলা চলে মিলিশিয়া বা বেসামরিক যোদ্ধা– তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল কিন্তু তাঁরা নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হতো। শর্তগুলো হলো:

১) ইসলাম

২) বয়ঃপ্রাপ্ত হতে হবে

৩) মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে

৪) এমন কোনো শারীরিক ত্রুটি না থাকা যা থাকলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না।

৫) আর্থিক সামর্থ্য থাকা, এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ প্রত্যেক যোদ্ধার খরচ বহন করার মতো সামর্থ্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল না। প্রত্যেককে নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হতো।

একই সাথে রাসূলুল্লাহ তাঁর বাহিনীকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। কুরআনে জিহাদ বিষয়ক অসংখ্য আয়াত আছে যা একজন মুসলিমকে জিহাদের ময়দানের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

> "নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং যে সওদা তোমরা (আল্লাহর সাথে) করেছো, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আত-তওবা, ৯: ১১১)

জিহাদের শিক্ষার সাথেই এসেছে ধৈর্যের শিক্ষা:

> "তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান।
>
> তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল। আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো

তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৪০-১৪৩)

এই আয়াতগুলো হলো মুসলিমদের জন্য জিহাদের ব্যাপারে প্রস্তুতিমূলক ও উদ্বুদ্ধকারী আয়াত। এছাড়াও জিহাদের মর্যাদার ব্যাপারে এসেছে রাসূলুল্লাহর ﷺ অসংখ্য হাদীস।

আবু হুরাইরা d থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বললো, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, এরকম কিছু নেই। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে থাকবে এবং এতটুকু আলস্য করবে না? আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙবে না। লোকটি বললো, তা কার সাধ্য? আবু হুরাইরা মন্তব্য করেন, 'মুজাহিদ তখনও নেকী পায় যখন তার ঘোড়া রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘোরাঘুরি করে।'[85]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একজন মুজাহিদের সওয়াব ক্রমাগত সালাত ও সিয়াম রাখার চেয়ে বেশি। কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা নাফসের জিহাদ থেকে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, সালাত ও সাওম নফসের জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমরা যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়ায ইবন জাবালকে ডেকে বললেন,

"তুমি যদি জানতে চাও তবে আমি তোমাকে দ্বীনের মূলভিত্তি, স্তম্ভ আর চূড়া সম্পর্কে বলবো। ইসলাম হলো দ্বীনের ভিত্তি, এর স্তম্ভ হলো সালাত আর এর চূড়া হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।"[86]

উমার ইবন উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত দাস আবুন নাযার ﷺ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি উমার ইবন উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম। তিনি বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা একটি চিঠি লেখেন। তখন আমি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হয়েছিলাম। আমি চিঠিটি পড়লাম, তাতে লেখা ছিল,

কোনো এক সম্মুখসমরে আল্লাহর রাসূল সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, শোনো, তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্খা কোরো না এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তার দুআ চাইবে। কিন্তু যদি তোমরা কখনো শত্রুর

---

[85] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৪।

[86] ইমাম নববীর ৪০ হাদীস, হাদীস ২৯।

সম্মুখীন হও তখন ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রেখো, তরবারীর ছায়াতলে জান্নাত।'[৪৭]

যাইদ ইবন খালিদ আল-জুহানি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

'যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করে দিল, সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করলো। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধান করলো, সেও জিহাদে অংশ নিল।'[৪৪]

একই সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সাহাবিরা শারীরিকভাবে শক্তসমর্থ ছিলেন, তাঁরা যে ধরনের কাজ করতেন তাতে তাদের যথেষ্ট শারীরিক দক্ষতা ছিল। তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল। যেমন, মক্কা ও মদীনার আশেপাশে কোনো সমুদ্র ছিল না, তাই তাঁরা সাঁতার জানতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাঁতার শেখার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে তীর চালনা, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানারকম সামরিক দক্ষতায় দক্ষ করে তুলছিলেন।

সামরিক প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে – যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও – যাদেরকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬০)

উকবাহ ইবন আমির d থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ s মিম্বারে বসে সূরা আনফালের এই আয়াতটি পাঠ করে বললেন,

আলা ইন্নাল কুওয়্যাতার রামী, ইন্নাল কুওয়্যাতার রামী, ইন্নাল কুওয়্যাতার রামী!
"শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী।"[৪৯]

এখানে রামী বলতে মূলত বোঝানো হচ্ছে নিক্ষেপ করা, তা হতে পারে তীর বা অন্য

[87] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১৭৫।

[88] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ইমারাহ, হাদীস ১৯৮।

[89] তিরমিযী, অধ্যায় রাসূলুল্লাহর তাফসীর, হাদীস ৩৩৬৩ (আরবি রেফারেন্স)।

যেকোনো কিছু যা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

উকবাহ ইবন আমীর এ বিষয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে সুনান আবু দাউদে। তিনি বলেন,

'আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি: মহান আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিনজন মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এক, তীর প্রস্তুতকারীকে, যে জিহাদের সৎ উদ্দেশ্যে তা তৈরি করেছে। দুই, তীর নিক্ষেপকারীকে এবং তিন, তীরের তূণবাহীকে, যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারীকে তীর নিক্ষেপের জন্য সহযোগিতা করেছে। কাজেই তোমরা তীর নিক্ষেপ করো এবং ঘোড়ায় চড়ো। তবে ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপই আমার কাছে বেশি প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া আর কোনো প্রকারের বিনোদন অনুমোদিত নয়, সেগুলো হলো, এক, পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান, দুই, নিজ স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা এবং তিন, তীর ধনুক চালনার প্রশিক্ষণ নেওয়া। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর, বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নি'আমত ত্যাগ করলো। সে নি'আমত ত্যাগ করলো এবং অকৃতজ্ঞ হলো।'[৭০]

এরকম আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে তিনটির বদলে চারটির কথা বলা হয়েছে এবং চতুর্থটি হলো নিজে সাঁতার শেখা এবং অন্যদেরকে তা শেখানো। সুতরাং এ চারটি জিনিস ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক উপকরণ সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।

সামরিক প্রশিক্ষণের উপর এই ব্যাপক গুরুত্ব দেখিয়ে দেয় মুসলিমরা একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এ ধরনের ক্ষেত্রে পুরো সমাজের ব্যাপক সামরিকায়ন করা হয় এবং সমাজের মনোযোগ ও প্রচেষ্টার একটা বড় অংশকে সমরশক্তির পেছনে ব্যয় করা হয় যেন তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে পারে। রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে এভাবেই মুসলিম সমাজ নিজেকে প্রস্তুত করছিল। নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদেরকে তাদের জান-মাল-কথা দিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৎকালীন অবস্থা মুসলিমদের অনুকূলে ছিল না। কুরাইশরা তাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পরপরই কুরাইশরা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কাছে চিঠি লিখে বলে,

'তুমি আশ্রয় দিয়েছ আমাদের সবচেয়ে ভয়ানক শত্রুকে। হয় তুমি তাকে হত্যা করবে,

---

[৭০] আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৩৭।

অথবা তাকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। যদি তা না করো, তবে আমরা শপথ করছি, তোমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমরা তোমাদের পুরুষদের হত্যা করবো এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে দাসী বানিয়ে ছাড়বো।'

এমন আরো একটি ঘটনা ঘটে যখন সাদ ইবন মুয়ায ﷺ কাবা তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় যান। তখন তিনি উমাইয়্যা ইবন খালাফের সাথে দেখা করেন। উমাইয়্যা ইবন খালাফের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব জাহেলিয়াতের সময় থেকেই। তিনি উমাইয়্যাকে কাবা তাওয়াফ করার জন্য সুবিধাজনক সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। যখন কাবায় লোকজন কম থাকবে তখন তিনি তাওয়াফ করতে চাচ্ছিলেন। তাঁরা কিছুটা দেরিতে তাওয়াফ করলেন। কিন্তু আবু জাহেল তাদের দেখে ফেললো। তখন সে উমাইয়্যাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার সাথে থাকা লোকটি কে?' উমাইয়্যা বললো, 'সে হলো সাদ ইবন মুয়ায।' সাদ ইবন মুয়ায বেশ পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মদীনায় যে দুইটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল এর মধ্যে একটি ছিল আল-আওস গোত্র। সাদ ইবন মুয়ায আল-আওস গোত্রের প্রধান ছিলেন। আবু জাহেল উমাইয়্যাকে বললো, 'তুমি তাকে কাবা তাওয়াফ করতে সাহায্য করে কাজটা ঠিক করোনি, কারণ তাঁর গোত্রের লোকেরাই মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছে।'

তখন সাদ ইবন মুয়ায আবু জাহেলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'দেখো, তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ করতে বাধা দাও, তাহলে তোমাদের কাফেলাকেও আমি চলাচলে বাধা দেবো।' কুরাইশদের কাফেলাগুলোকে মদীনা হয়ে যেতে হতো, তাই সাদ তাকে কাফেলা আটকানোর হুমকি দেন। এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, কুরাইশরা অনবরত বিভিন্ন উপায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ﷺ কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতো। নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে এ জাতীয় হুমকি ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিকীকরণের খুব প্রয়োজন ছিল।

সামরিক অভিযানের শুরু: গাযওয়া ও সারিয়া

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জিহাদের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠানো শুরু করলেন 'সারিয়া'। সীরাহর বইগুলোতে দু'ধরনের যুদ্ধের কথা এসেছে, একটি হলো সারিয়া ও অপরটি হলো গাযওয়া। বদর বা উহুদের যুদ্ধকে বলা হয় গাযওয়ায়ে বদর বা গাযওয়ায়ে উহুদ; অন্যদিকে আবু উবাইদাহর নেতৃত্বে সামরিক অভিযানকে বলা হয়েছে সারিয়ায়ে আবু উবাইদাহ। পার্থক্য হলো, যেসব অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ অংশগ্রহণ করেননি সেগুলোকে সারিয়া বলা হয় আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যেসব অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয় গাযওয়া। গাযওয়া বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় সেসব যুদ্ধ যেগুলোতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে সেনাদল পাঠানো হয় আর সারিয়া বলতে বোঝানো হয় সেনা অভিযান (Military Raid)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম যে গাযওয়ায় অংশ নিয়েছেন সেটি হলো গাযওয়াত উল আবওয়া। এই গাযওয়াতে কোনো যুদ্ধ হয়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাইদাহ ইবন হারিসের নেতৃত্বে সারিয়া পাঠান। এ দলে ৬০ জন মুহাজির ছিলেন। তাঁরা সবাই পায়ে হেঁটে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাতে হাঁটতেন আর দিনে লুকিয়ে থাকতেন। এ অভিযানে তীর ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল কিন্তু কেউ মারা যায়নি। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিমদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যিনি তীর ছুঁড়েছিলেন তিনি হলেন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ﷺ। তিনি বলেছেন, 'আমিই সেই জন যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করি।'

এরপর হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের ﷺ নেতৃত্বে আরেকটি সারিয়া পাঠানো হয়। এ অভিযানে ৩০ জন মুহাজিরকে পাঠানো হয়। এবার তাঁরা উটে চড়ে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কুরাইশদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার জন্য গিয়েছিলেন। এ কাফেলাতে কুরাইশদের প্রচুর সম্পদ ছিল এবং এর সাথে অনেক রক্ষক ছিল। শেষপর্যন্ত এ অভিযানেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, কেননা সে এলাকায় এক গোত্রনেতার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরাইশদের চুক্তি ছিল। কোনো ধরনের মারামারি যাতে না হয় সে ব্যাপারে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। এ ঘটনার পর আবু জাহেল তার লোকদের কাছে গিয়ে সতর্ক করে বললো যে, মুহাম্মাদ ﷺ 'ক্রুদ্ধ সিংহের' ন্যায় তাদের পেছনে লেগেছে, কেননা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আবু জাহেল তার লোকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বললো যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাদের কাফেলা ও তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে।

আরো একটি গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল যার নাম গাযওয়ায়ে বুয়াত। কুরাইশদের একটি কাফেলা দখল করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয় কিন্তু কাফেলাটি পাওয়া যায়নি।

গাযওয়াত আল আশিরাতেও একটি কাফেলা আটক করার জন্য সেনাদল পাঠানো হয় কিন্তু সেটিও পাওয়া যায়নি। এরপরে ঘটে সারিয়ায়ে সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস এবং গাযওয়ায়ে বদর উলা। হিজরতের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

সারিয়ায়ে নাখলা

ইসলামের ইতিহাসে এই সারিয়া বেশ তাৎপর্য বহন করে। এই সারিয়ার নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ﷺ। এই সারিয়াতে অল্পসংখ্যক সাহাবীকে ﷺ তাঁর সাথে পাঠানো হয়, উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের একটি কাফেলা আক্রমণ করা। অভিযানের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন জাহশের হাতে একটি চিঠি দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে বলেন। সেখানে গিয়ে দুইদিন পর চিঠিটি পড়ার নির্দেশ দিলেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ﷺ দুইদিন পরে চিঠিটি খুললেন। চিঠিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছিলেন মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় যেতে। চিঠিতে আরো লেখা ছিল, অভিযানে প্রেরিত সাহাবীদের ﷺ মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় যেতে চান তাঁরা যেন আবদুল্লাহ ইবন জাহশকে ﷺ অনুসরণ করেন। অর্থাৎ এই সারিয়াতে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না, কেউ চাইলে অংশ না নেওয়ারও সুযোগ ছিল।[91] সম্ভবত অভিযানটি বেশ বিপদজনক হওয়ায় এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইবন জাহশকে ﷺ যে এলাকায় যেতে বলা হয়েছিল সেটি কাফেরদের ভূখণ্ডের কাছাকাছি ছিল। সেখানে একটি কুরাইশ কাফেলা পাওয়া যাবে, সেটি আক্রমণ করাই ছিল এই সারিয়ার উদ্দেশ্য। এর আগ পর্যন্ত যতগুলো সারিয়া পরিচালিত হয়েছে সেগুলো ছিল মদীনার কাছাকাছি, কিন্তু এবারের বিষয়টি ভিন্ন। মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী এই জায়গাটি মদীনা থেকে বেশ দূরে হওয়ায় এ অভিযানটি বিপদজনক ছিল। আবদুল্লাহ ইবন জাহশ পত্রে যা লিখা ছিল তা দলের অন্যান্যদের জানিয়ে দিলেন এবং বললেন যে তিনি এই অভিযানে যাবেন এবং যার ইচ্ছা হয় তিনি যেন তাঁকে অনুসরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহশসহ দলের সবার জন্য এ অভিযানটি ঐচ্ছিক ছিল। দলের সবাই আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ﷺ এর সাথে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে কেউই দল থেকে বের হননি। তাদের এই অদম্য বাসনাই বলে দেয় তাঁরা দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করতেন না, বরং তাঁরা আল্লাহর জন্যই যুদ্ধ করতেন।

তাঁরা শেষ পর্যন্ত কুরাইশ কাফেলা খুঁজে পেলেন। কাফেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেমন একটা শক্তিশালী ছিল না, মাত্র চারজন লোক পাহারায় ছিল। তাঁরা কাফেলার খুব কাছাকাছি চলে আসলেন, তীরের সীমানার ভেতর কাফেলা চলে আসলো। কিন্তু তখন সাহাবারা ﷺ একটি ব্যাপার নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। সেদিন ছিল রজব মাসের শেষ দিন আর চারটি পবিত্র আরবি মাসের একটি হলো রজব। আরবরা এই চারটি পবিত্র মাসে নিজেদেরকে যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত রাখত। তাই তারা ভাবলেন, একদিন পরে আক্রমণ করলেই হয়, পবিত্র মাসে আর যুদ্ধ করতে হবে না। কিন্তু সমস্যা হলো তাঁরা যদি পরদিনের জন্য অপেক্ষা করেন তবে কাফেলা মক্কার পবিত্র সীমানার ভেতরে ঢুকে যাবে, পবিত্র সীমানার ভেতরেও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, হয় তাদেরকে পবিত্র মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করতে হবে, নতুবা মক্কার পবিত্রতা লঙ্ঘন করতে হবে। অবশেষে তাঁরা সেদিনই অর্থাৎ রজব মাসে কাফেলা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের ছোঁড়া তীরের আঘাতে চারজন পাহারাদারের আলহাদরামি নামে একজন মারা গেল, আরেকজন পালিয়ে গেল আর বাকি দুইজনকে কারাবন্দী হিসেবে আটক করা হলো। পুরো কাফেলা মুসলিমদের হাতে চলে আসে। এরপর তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন।

---

[91] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৯।

এ ঘটনাটি সবার চায়ের কাপে ঝড় তুললো, সবার মুখে মুখে এই অভিযান নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা। কুরাইশরা এই সুযোগের হাতছাড়া করতে ভুল করলো না। তারা এই ঘটনাকে পুঁজি করে ব্যাপক হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালো। তারা খুব বড় করে এই কাহিনি প্রচার করতে লাগলো। তারা বলে বেড়ালো – মুহাম্মাদ আর তাঁর লোকেরা পবিত্র মাসের রীতি ভেঙেছে। তাঁরা পবিত্র মাসে রক্তপাত করেছে, আমাদের লোকদের বন্দী হিসেবে তুলে নিয়েছে। পবিত্র মাসে আমাদের সম্পদ চুরি করেছে, এই করেছে, সেই করেছে – এভাবে তারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল তুললো। অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবীরা ﷺ ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, 'আমি তো তোমাদেরকে এই পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেইনি।' অন্যান্য মুসলিমরা তাদেরকে নিন্দা জানাতে লাগলেন – তোমরা এমন কাজ কীভাবে করলে? কার নির্দেশে করলে?

অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবীরা ﷺ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। তাঁরা মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত বোধ করতে থাকলেন। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারটি কীভাবে বিচার করবেন তা নিয়ে তাঁরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযানে বন্দী ব্যক্তি ও কাফেলার কোনোকিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে সারিয়ার সদস্যরা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, অথচ তাদের দখলকৃত কাফেলার সম্পদ কেউ গ্রহণ করছে না, বরং সবাই তাদের প্রতি নারাজ। অন্যদিকে কুরাইশরা এ ঘটনাটির সুযোগ নিচ্ছিল। এরপর সূরা বাকারাহর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়[92],

> "সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দ্বকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে"। (সূরা বাকারাহ, ২: ২১৭)

এই ঘটনার পর আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, 'সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা কি ইসলামের বিধানে আছে?; আল্লাহ তাআলা এই প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিলেন, ;হ্যাঁ, আবদুল্লাহ ও তাঁর লোকেরা যে কাজ করেছেন অর্থাৎ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা

---

[92] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪১।

অনেক বড় পাপ।' কিন্তু এরপরেই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে এই সব ঘটনা সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হয়।

আল্লাহ্ তাআলা বললেন, এই সাহাবারা ﷺ যা করেছেন তা ভীষণ গুনাহের কাজ কিন্তু এরপরই আল্লাহ তাআলা কুফফারদের দ্বারা সংঘটিত বড় বড় অপরাধগুলোর তালিকা তুলে ধরলেন।

প্রথমত, আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। কুরাইশের লোকেরা মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিত।

দ্বিতীয়ত, কুফরি করা, এটি হলো আরো একটি বড় গুনাহের কাজ যা কুরাইশের লোকেরা অনবরত করেই যাচ্ছিল।

তৃতীয়ত, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া । মুসলিমদেরকে তখন মক্কায় যেতে দেওয়া হতো না।

চতুর্থত, সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা- কুরাইশরা মুহাজিরদের মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল।

এই আয়াতটি সবাইকে পুরো বিষয়টি সঠিকভাবে দেখতে শেখালো। আল্লাহ তাআলা বললেন, আবদুল্লাহ ইবন জাহশ যা করেছিলেন, তা ভুল ছিল, কিন্তু কুরাইশরা ১৩ বছর ধরে যা করে আসছে তা আরো অনেক গুণ বড় অপরাধ। আল্লাহ্ চাননি, কাফিরদের প্রচারণার প্রভাবে মুসলিমরা নিজেদের ভুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ুক আর কাফিরদের অপরাধগুলো ভুলে যাক।

আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ও তাঁর সঙ্গীরা যখন দেখলেন যে আল্লাহ্ তাআলা কুরাইশদের কৃতকর্মের উপর বেশি আলোকপাত করেছেন এবং এই ব্যাপারে সব কিছু পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন তখন তাঁরা স্বস্তি পেলেন। এখন তারা আশা করছেন স্বীকৃতির! এরপর আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারাহর নিচের আয়াতটি (২: ২১৮) অবতীর্ণ করেন:

> **"আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়।"**

আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন, যদিও আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ও তাঁর সঙ্গীরা ভুল করেছেন, তবুও তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার রহমতের আশা করতেই পারেন। যেহেতু তাঁরা মুজাহিদ, কাজেই তাঁরা অবশ্যই জিহাদের পুরস্কারের আশা রাখবেন।

ইসলামের ইতিহাসে আবদুল্লাহ ইবন জাহশের এই সারিয়া ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ

সারিয়াতে সর্বপ্রথম যুদ্ধবন্দী গ্রহণ করা হয়, সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নেওয়া হয় এবং সর্বপ্রথম কোনো কাফিরকে হত্যা করা হয়। এটা ছিল তাদের জন্য মর্যাদার বিষয়।

উপরোক্ত দু'টো আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেলার সম্পদ ও দুইজন বন্দীকে গ্রহণ করলেন। কুরাইশের লোকেরা এই দুই বন্দীকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য এসেছিল। অন্যদিকে সারিয়ায় অংশ নেওয়া দুই সদস্য তাদের উট খুঁজতে বের হয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন সারিয়ার ওই দুইজন লোক ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে না। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশঙ্কা করছিলেন যে কুরাইশরা হয়ত তাদেরকে হত্যা করতে পারে। একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমকে কখনো শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবে না, যেভাবে দেননি রাসূলুল্লাহ ﷺ, তিনি তাদেরকে কতোটা ভালোবাসতেন তা তাঁর এই কাজ থেকে বোঝা যায়। অতঃপর সেই দুইজন মুসলিম – সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা ﷺ ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন। বন্দীদের একজন আল-হাকিম ইবন কেইসান মুসলিম হয়ে যান। তিনি মদীনাতেই থেকে যান। পরবর্তীতে তিনি শহীদ হন। আরেকজন বন্দী উসমান ইবন আল-মুঘিরা মক্কায় চলে যায় এবং কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করে।

সারিয়ায়ে নাখলা থেকে পাওয়া শিক্ষা

১) কাফিরদের একটি কৌশল হলো, তারা মুসলিমদের একটি ভুল খুঁজে বের করবে এবং ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে ব্যাপক হৈ-চৈ করবে। তারা সত্যকে অসম্পূর্ণ কিংবা বিকৃতভাবে তুলে ধরবে। মুসলিমদেরকে খুব বাজেভাবে উপস্থাপন করবে। মুসলিমদের কাফেরদের এই ধরনের অভ্যাসের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, তাকে পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং সঠিকভাবে পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারাহর উপরোক্ত আয়াতের (২: ২১৭-২১৮) মাধ্যমে সবার কাছে সারিয়ার পুরো ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

সুতরাং আজকের দিনে যদি মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে অথবা ইসলামকে সহিংসতার ধর্ম বলে অভিযুক্ত করা হয় তবে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ইরাকে এক মিলিয়নের বেশি মানুষকে খুন করা হয়েছে, ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে অত্যাচারিত হচ্ছে। কাশ্মীর, চেচনিয়া, চীনের মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়-অত্যাচারের স্বীকার হয়েছে। মুসলিমদের অত্যাচারিত হওয়ার এই তালিকা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। যদি মুসলিমরা কোনো ভুল করে ফেলে, তাহলে ইতিহাস থেকে এই ব্যাপারগুলো তুলে আনতে হবে আর এতে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে মুসলিমরা যদি ভুল কিছু করেও থাকে, তবুও তা মুসলিমদের উপর কাফেরদের কৃত অন্যায়-অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

পুরো পরিস্থিতিকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে... মুসলিমদের মিডিয়ার ধোঁকার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, মিডিয়া সত্যের পক্ষে নেই। আল্লাহ তাআলার শত্রুরা

মুসলিমদের পক্ষে নেই।

একজন মুসলিমকে এসব ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। যেকোনো কিছু শোনামাত্র বিশ্বাস করা উচিত নয়। কুরাইশরা সেদিন মুসলিমদের সাথে যা করেছিল, আজকে ইসলামের শত্রুরা ঠিক তা-ই করছে। তারা সেসব দাঈদের হত্যা করছে যারা সত্যিকারের ইসলাম প্রচার করছেন, অথবা তাদেরকে কারাবন্দী করছে কিংবা হত্যার হুমকি দিচ্ছে। সত্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করলেই মুসলিমদের নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে, মুসলিমদের রক্ত হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। এ অবস্থায় মুসলিমদের দিকে কাফিরদের আঙুল তোলার কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না, বরং মুসলিমদেরই উচিত কাফেরদের কৃত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অপরাধের তালিকা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারা।

২) মুসলিমদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা থাকা খুব জরুরি। নবীজি ﷺ দুইজন মুসলিমকে ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত বন্দী কাফিরদের ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ থেকে বোঝা যায়, মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা কতটা জরুরি।

অন্যান্য সারিয়া থেকে পাওয়া শিক্ষা

১) ছোট ছোট এইসব সামরিক অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল চারিদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের উপস্থিতি জানান দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন জায়গায় সারিয়া পাঠিয়ে সবাইকে একটি বার্তা পাঠিয়ে দিলেন যে, মুসলিমদের একটি সামরিক শক্তি আছে এবং তারা তা ব্যবহার করতে সক্ষম। সেই যুগে আরবে গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থায় যদি কোনো গোত্র দুর্বল হতো তবে শক্তিশালী কোনো গোত্র সেই দুর্বলতার সুযোগ নিত। তাই আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মুসলিমদের শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সারিয়া প্রেরণ করতেন। তখন পর্যন্ত কুরাইশরা আরব গোত্রগুলোর মাঝে বেশ উঁচু অবস্থানে ছিল। তাদের আরবের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হতো। তারা ছিল কাবার রক্ষক। তাই আরবের অন্যান্য গোত্রদের মাঝে তাদের প্রতি বিশেষ ধরনের সম্মান ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধারণাটিকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন এই অঞ্চলে কুরাইশদের একটি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিমরা আছে।

২) রাসূলুল্লাহ ﷺ সব গোত্রের সাথে যুদ্ধে জড়াননি। কিছু গোত্রের সাথে তিনি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তখন মুশরিকদের সাথে সন্ধিচুক্তি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সারিয়াগুলো সন্ধিচুক্তির পথ সুগম করে দেয়।

৩) সারিয়াগুলো প্রেরণ করা হতো মূলত অর্থনৈতিক কারণে। অধিকাংশ সারিয়া কুরাইশদের কাফেলা দখল করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ইসলামি ফিকহ অনুসারে, যখন মুসলিম রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধাবস্থায় থাকে, তখন শত্রুদের সম্পদ ও রক্ত মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে যায়। এসব সারিয়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ

কুরাইশদের অর্থনীতিতে আঘাত করেন। এটি ছিল কুরাইশদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। বদর যুদ্ধের সূচনাই হয়েছিল আবু সুফিয়ানের অধীনস্থ একটি কাফেলা আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

৪) এই অভিযানগুলো ছিল মুসলিমদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণস্বরূপ। তাঁরা এসব সারিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এসবের মাধ্যমে তাঁরা যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শন, শত্রুপক্ষকে আচমকা আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করা ইত্যাদি নানারকম সামরিক কায়দা-কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। একই সাথে তাঁরা আশেপাশের এলাকা ও গোত্রগুলোর শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিলেন। কুরাইশ ও মুসলিমদের এই বিরোধ চলাকালীন সময়ে যতগুলো সারিয়া প্রেরণ করা হয়েছে তার সবই করেছে মুসলিমরা। কুরাইশদের মধ্যে এই কৌশল প্রচলিত ছিল না, বলা যেতে পারে এটা পুরোপুরিই ইসলামি সমর সংস্কৃতির অংশ।

যদিও মদীনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমরা মদীনাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন না। তাদের সংখ্যা কম ছিল। একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুতেই ঘুমাতে পারছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন কেউ যেন তাঁকে সারা রাত পাহারা দেয়। আ'ইশা ﷺ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন,

'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক রাতে বিছানায় শুয়ে বলছিলেন: মু'মিনদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সারা রাত আমাকে পাহারা দেবে? আ'ইশা বললেন, 'আমরা অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি?' তখন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ﷺ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি।' আয়শা ﷺ বলেছেন, 'সেই রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।"[93]

ইবন হাজার এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন, নিরাপত্তার বিষয়ে মুসলিমদের উদাসীন বা অসতর্ক হওয়া উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুমকির আশংকা করছিলেন এবং তিনি এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ঘুমাতে পারছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন কেউ তাঁকে পাহারা দিক। এ থেকে বুঝা যায় যে, একজন মুসলিমের অসতর্ক হওয়া উচিত না। তিনি আরও বলেছেন যে, নেতা, কিংবা আলিমদের নিরাপত্তা দেওয়া মুসলিমদের দায়িত্ব। তৃতীয় যে মন্তব্যটি তিনি করেছেন তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরাপত্তা চেয়েছেন এই কারণে যেন তাঁর উম্মাহ নিরাপত্তা ও সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে মনোযোগী হয়। এটা ছিল তাদের জন্য একটি শিক্ষা। তবে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহর নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নিজের হাতে নিয়েছিলেন, সে পর্যন্ত সাহাবীরা ﷺ আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিরাপত্তার বিষয়টি দেখতেন।

---

[93] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ৬০।

"...আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন..."(সূরা মায়িদা,৫:৬৭)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ﷺ বলে দিলেন যে, তাঁর কোনো পাহারাদারের দরকার নেই। আল্লাহ নিজেই তাঁর রাসূলের ﷺ নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে এসে সাদকে চলে যেতে বললেন।

বদরের যুদ্ধ

পটভূমি

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ। কুরাইশদের সবচেয়ে বড় কাফেলাকে আশ-শামের উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো। কুরাইশদের অন্যতম নেতা আবু সুফিয়ান ছিল সেই কাফেলার নেতৃত্বে। রাসূলুল্লাহর ﷺ শক্তিশালী *ইন্টেলিজেন্স টিম* ছিল। তাদের মাধ্যমে তিনি নিয়মিত শত্রুপক্ষের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতেন। এই খবর পাওয়া মাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই কাফেলার খোঁজ নেওয়ার জন্য গুপ্তচর পাঠান। বুসাইসাহ ইবন উমরু তথ্য যোগাড় করে সরাসরি রাসূলুল্লাহর ﷺ বাসায় এলেন, সেই সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে ছিলেন শুধুমাত্র আনাস ﷺ ও বুসাইসাহ। বুসাইসাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ সে কাফেলার অবস্থান জানালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত বের হয়ে এসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা একটা অভিযানে বের হবো, আমাদের লোক দরকার। যাদের সাথে এই মুহূর্তে চড়ার মতো বাহন প্রস্তুত আছে, শুধু তারাই এসো।' অনেকেই তাদের চড়ার উপযোগী জন্তু মদীনার নিকটস্থ পাহাড়ে ঘাস খাওয়ানোর জন্য রেখে এসেছিলেন। তাঁরা সেগুলো আনার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, 'না, শুধু তারাই যোগ দেবে যাদের বাহন প্রস্তুত আছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ একদমই দেরি করতে চাচ্ছিলেন না। প্রস্তুতির জন্য তিনি আলাদাভাবে সময় নষ্ট করতে চাননি। এ কারণেই এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা খুব কম ছিল। মুসলিমদের মধ্যে সেই সময় যুদ্ধ করার মতো অন্তত ১৫০০ লোক গণনা করা হয়েছিল, কিন্তু এই অভিযানে অংশ নিতে পেরেছিল মাত্র ৩১৭ জন, মতান্তরে ৩১৯ জন।

আবু সুফিয়ানের অধীনস্থ কাফেলাটি দখল করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই কাফেলাটি কুরাইশদের। এতে প্রচুর সম্পদ থাকবে। এটিকে আক্রমণ করো যাতে আল্লাহ তাদের সম্পদ তোমাদেরকে গনীমত হিসেবে প্রদান করেন।' এদিকে আবু সুফিয়ান বেশ সতর্ক ছিল। কারণ এর আগে ঘনঘন বেশ কিছু কাফেলা আক্রমণ হওয়ায় আবু জাহেল তার লোকদের মুহাম্মাদের ﷺ সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। এ কারণে আবু সুফিয়ানও রাসূলুল্লাহর ﷺ অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য গোয়েন্দা পাঠায়। আবু সুফিয়ান বদরে পৌঁছে যায়, বদর আর মদীনার দূরত্ব প্রায় দেড়শো কিলোমিটার। বদরে পৌঁছে সে উটের বিষ্ঠা হাতে নিয়ে গুঁড়ো করে পরীক্ষা করলো। সে এই বিষ্ঠা দেখে বুঝে গেল যে, এই বিষ্ঠা মদীনার খেজুর খাওয়া উটের বিষ্ঠা। সে বুঝে ফেললো মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীরা কাফেলা আক্রমণ করার জন্য আসছে। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের কাছে সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করলো

এবং কাফেলা রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে খবর পাঠালো। এ সংবাদ দামদাম ইবন আমর আল-ঘিফারীকে দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সে মক্কায় পৌঁছবার আগেই মক্কায় এ বিষয়টি নিয়ে হৈ-চৈ লেগে যায়।

মক্কার পরিস্থিতি

রাসূলুল্লাহর ﷺ ফুফু আতিকা বিনত আবদুল মুত্তালিব মক্কায় থাকতেন। তিনি সে রাতে একটি স্বপ্ন দেখেন।[94] তিনি দেখলেন যে, এক লোক উটে চড়ে দ্রুত মক্কার দিকে আসছে এবং সে মক্কার অধিবাসীদেরকে চিৎকার করে ডাকছে। তার উট প্রথমে কাবাঘরের উপর, তারপর মক্কার এক পাহাড়ের চূড়ার উপর গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সে কুরাইশদের সাবধান করে বললো, 'তিনদিনের মধ্যে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।' এ কথা বলে লোকটি একটি পাথর নিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে ছুঁড়ে মারলো। পাথরটি মক্কার ভূমিতে পড়ামাত্র বিস্ফোরিত হলো। মক্কার প্রতিটি ঘরে সেই বিস্ফোরণ থেকে ছিটকে আসা বস্তু আঘাত হানলো।

আতিকা এই স্বপ্ন দেখে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর ভাই আল-আব্বাসকে স্বপ্নের কথা জানান এবং অন্য কাউকে এর কথা জানাতে নিষেধ করেন। আল-আব্বাস সব কিছু শুনে তাঁর বোনকে এ ব্যাপারে চুপ থাকতে বলেন। কিন্তু আল-আব্বাস নিজেই বন্ধু ওয়ালীদ ইবন উতবাকে এই স্বপ্নের কথা বলে দেন। আবার এও বলে দেন যেন সে অন্য কাউকে এই স্বপ্নের কথা না বলে। কিন্তু ওয়ালীদ তাঁর পিতাকে এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে দেন। আর এভাবেই এই সংবাদ সারা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। আল আব্বাস বলেছেন, 'আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে কাবা তাওয়াফ করতে গিয়ে দেখি সেখানে আবু জাহেল অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সাথে বসে আতিকার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছে।' আল-আব্বাসকে দেখে আবু জাহেল তাকে তাওয়াফ সেরে তাদের সাথে আলোচনায় বসতে বলে। তাওয়াফ শেষে আল-আব্বাস তাদের আলোচনায় যোগ দেয়। তখন আবু জাহেল তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তা কতদিন ধরে তোমাদের পরিবারে এই মহিলা নবী আছে?' আব্বাস আবু জাহেলের কথা না বুঝার ভান করলেন। আবু জাহেল এরপর আতিকার স্বপ্নের প্রসঙ্গ তুলে প্রচণ্ড শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বললো, 'তোমরা যারা আবদুল মুত্তালিবের পরিবার, তোমাদের তো একটা পুরুষ নবী আছেই, তাতেও দেখি তোমরা খুশি নও, এখন দেখছি মহিলা নবীও বানিয়ে নিয়েছ!' এরপর আবু জাহেল বললো, 'আতিকা তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়েছে, তো আমরা ভাবছি এই তিনদিন অপেক্ষা করে দেখবো আদৌ কিছু হয় কি না! এর মধ্যে সে যা বলেছে তা সত্যি না হলে তোমাদেরকে আরবের সবচেয়ে বড় মিথ্যুক বলে ঘোষণা দেওয়া হবে।'

আবু জাহেল আবদুল মুত্তালিবের পরিবারের সদস্যদের খুব অপমান করলো। আল-

---

[94] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৩।

আব্বাস বাড়িতে ফিরে এলে এবার তাঁকে পেল আবদুল মুত্তালিব পরিবারের মহিলা সদস্যরা। আব্বাসের নীরবতা দেখে তাঁরা তাঁর উপর খুব রেগে গেল এবং তাঁর উপর এক চোট নিল। তাঁরা তাঁকে বললো, 'তোমার মুখের উপর ওই বেয়াদব বুড়ো লোকটা তোমার পরিবারের পুরুষদের অপমান করলো, মহিলাদের অপমান করলো, আর তুমি কিছুই বললে না, শুধুই শুনে গেলে? তোমার কি এসব কথা গায়ে লাগে না?' আল-আব্বাস তখন বললেন, 'আমি অবশ্যই এসব মেনে নেওয়ার মতো মানুষ নই। কিন্তু সে আগে কখনো আমার সাথে এমনটা করেনি। তবে আমি কসম করে বলছি আমি তার কথার উচিত জবাব দিব। এরপর সে যদি আবার তোমাদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলে তবে আমি তাকে ছাড়বো না।' তিনদিন পর আব্বাস হারামে গিয়ে আবু জাহেলের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন যাতে আবু জাহেল তাঁকে ডাক দেয় আর এই সুযোগে তিনি আবু জাহেলের দুর্ব্যবহারের শোধ নিতে পারে।

আল আব্বাস বর্ণনা করেন, 'আতিকার স্বপ্ন দেখার তৃতীয় দিন সকালের কথা, এই ভেবে আমার মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছিল যে আমি কেন আবু জাহেলকে সেদিন কোনো কথা না শুনিয়ে ছেড়ে দিলাম। আমি মসজিদে গিয়ে আবু জাহেলকে দেখলাম। তাকে দেখে মনে মনে ভাবছি, আজকে তাকে কথা শুনিয়েই ছাড়বো, এই ভেবে আমি তার দিকে এগোচ্ছি। আবু জাহেল ছিল ঘাগু মানুষ। ধারালো চেহারা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর শাণিত তার চাহনি। কিন্তু তাকে মসজিদের দরজার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে আমি মনে মনে ভাবলাম, এই লোকের আবার কী হলো? সে কি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভয়ে এরকম করছে? আসলে সে কিছু একটা শুনে ভয় পেয়েছিল যা আমি তখনও শুনতে পাইনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তখন দামদাম ইবন আমর আল-ঘিফারী। এই লোককেই আবু সুফিয়ান জরুরি সংবাদসহ পাঠিয়েছিল। সে আতিকার স্বপ্নের তিনদিন পর মক্কায় এসে পৌঁছায়। সে মক্কায় এসে উট থেকে নেমে উটের নাক কেটে ফেলে এবং লাগামটি নিচে নামিয়ে নিজের জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলে চিৎকার করে লোকজনকে ডেকে বলতে লাগলো, 'হে কুরাইশ! কাফেলা! কাফেলা! মুহাম্মাদ ও তাঁর লোকেরা আবু সুফিয়ানের কাছে রক্ষিত তোমাদের সম্পদ দখল করার জন্য আসছে। আমার মনে হয় না তোমরা তা রক্ষা করতে পারবে। সাহায্য! সাহায্য!'

তার এই কর্মকাণ্ড দেখে মক্কার সবার তখন দিশেহারা অবস্থা। আল-আব্বাস বলেন, 'এ কথা শোনার পর সবাই ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা ভুলে গেল।' তখন সবার মনোযোগ পড়লো কাফেলা রক্ষার দিকে। কাফেলা রক্ষা করার জন্য কুরাইশের লোকেরা একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

মদীনার ঘটনাক্রম

রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযানের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সাহাবাদের ﷺ সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। আবু বকর ﷺ ও উমার ﷺ তাদের মতামত দিলেন কিন্তু

তাদের বক্তব্য শোনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তেমন আগ্রহী ছিলেন না। সাদ ইবন উবাদা বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি কি আমাদের মতামত জানতে চান?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, জানতে চাই।' এরপর সাদ ইবন উবাদা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, যদি আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আর আপনি যদি বারক উল-ঘামাদ পর্যন্ত যান তাহলে আমরাও সেদিকে যাব।"[95]

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব খুশি হলেন। আনসাররা বাইয়াতের সময় রাসূলুল্লাহকে ﷺ মদীনার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার বাইরে অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন তাই তিনি এ ব্যাপারে আনসারদের মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। এ কারণেই তিনি আবু বকর ﷺ ও উমারের ﷺ কথা শোনার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। আনসাররা চাইলে বলতে পারতেন যে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তাদের চুক্তি হয়েছিল শুধুমাত্র মদীনার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু তারা সেটা বলেননি, বরং তাঁরা উদগ্রীব ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য যুদ্ধ করতে, হোক সেটা মদীনার ভিতরে বা বাইরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটাই মনে মনে চাচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেলার অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবাকে যুদ্ধ করার মতো বয়স না হওয়ার কারণে ফিরিয়ে দেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমার ইবন খাত্তাব ও আল-বারাকে পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তাদেরকেই সাথে নেন যারা জিহাদে যেতে প্রবলভাবে উৎসাহী ছিল। ইসলামের প্রথম যুগের এই যোদ্ধাদের একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা হলো, তাঁরা আদর্শিকভাবে এতটাই অনুপ্রাণিত ছিলেন যে তাঁরা নিজ প্রেরণায় যুদ্ধে অংশ নিতে মুখিয়ে থাকতেন। অন্যদিকে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ সেনাবাহিনীতে সৈন্যরা যুদ্ধ করে মূলত বিভিন্ন সেবা ও অর্থের আশায়। তারা যুদ্ধকে নিছক 'চাকরি' হিসেবে দেখে। সুযোগ পেলেই বা পরিস্থিতি একটু কঠিন হলেই তারা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়।

আ'ইশা ﷺ বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বদরের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি যখন (মদীনা থেকে চার মাইল দূরে) হাররাত-উল-ওয়াবারাতে পৌঁছলেন, তখন এক লোক তাঁর কাছে আসলো। লোকটি বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য বেশ সুপরিচিত ছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গীরা লোকটিকে দেখে বেশ খুশি হলেন। লোকটি বললো, আমি এসেছি তোমার সাথে যেতে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করো? সে বললো, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের কাছ থেকে সাহায্য নেব না। এরপর সে চলে গেল, আমরা যখন শাজারায় পৌঁছলাম, তখন আবার

---

[95] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ এবং সারিয়া, হাদীস ১০৩। কিছু বর্ণনায় এসেছে সাদ ইবন মুয়াযের নাম।

লোকটির দেখা মিললো। সে আবার একই প্রস্তাব দিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একই কথা বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের কাছ থেকে সাহায্য নেব না। এরপর লোকটি আবার বাইদায় এসে রাসূলুল্লাহকে ﷺ নাগালে পেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করো? এবারে সে বললো, হ্যাঁ, করি, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আমাদের সাথে চলো।'

তখন মুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তাই তিনজন সাহাবীর ﷺ জন্য একটি করে উট বরাদ্দ ছিল। তাঁরা পালাক্রমে উটের পিঠে চড়তেন। অন্যান্যদের মতো রাসূলুল্লাহও ﷺ দুইজন সাহাবীর ﷺ সাথে একটি উট ভাগাভাগি করে চড়তেন। যখন তাদের পালা আসত তখন তাঁরা নিজেরা না চড়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ চড়ার জন্য অনুরোধ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলতেন, 'তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও আর আমিও তোমাদের মতো আল্লাহর কাছে পুরস্কারের প্রত্যাশী।'

যুদ্ধের ঘনঘটা

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ানের কাফেলা দখল করার জন্য বদর অভিমুখে যাচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। সে নিজেই ওই স্থানে পায়চারি করে দেখছিল কোথায় কী আছে। সে বদরের কুয়াগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার লোকদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, কারা এই কুয়াগুলো থেকে পানি তুলেছে?' তাঁরা বললো যে, তারা দুইজন অপরিচিত লোককে দেখেছে। আবু সুফিয়ান উটের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে উটের বিষ্ঠা পেল। সে হাতে সেই বিষ্ঠা নিয়ে পিষে ফেললো। বিষ্ঠা দেখে সে বুঝতে পারল যে, সেগুলো খেজুরের বিষ্ঠা আর খেজুরগুলো মদীনার। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনা থেকে তার কাফেলার উপর নজরদারি চলছে। সে তৎক্ষণাৎ কাফেলার দিক পরিবর্তন করে উপকূলের দিকে প্রবল বেগে পালিয়ে গেল। ফলে সে মুসলিমদেরকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো। সে মক্কার লোকদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিল যে, কাফেলা এখন নিরাপদ, আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আবু জাহেল তাতে রাজি হলো না। সে বললো, 'আল্লাহর কসম! বদরে পৌঁছানোর আগে আমরা ফিরে যাবো না।' তারা কাফেলা রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু কাফেলা নিরাপদ – এই খবর পাওয়ার পরও তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অটল থাকে। মুসলিমদের শেষ করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

বদরে প্রতি বছর আরবরা মেলার আয়োজন করতো আর বেচাকেনা করতো। আবু জাহেল যেতে যেতে সবাইকে বলছিল, 'আমরা সেখানে যাব। তিন দিন ধরে উৎসব করবো, উট জবাই করব, মদ খাব আর গায়িকারা আমাদের জন্য গান বাজনা পরিবেশন করবে! বেদুইনরা আমাদের অভিযান ও উৎসব সম্পর্কে জানবে, তারা

আমাদের সম্মান করবে। চলো আমরা এগিয়ে যাই।'[96]

আবু জাহেলের মূল উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের শক্তি সামর্থ্যের প্রদর্শনী দেখানো। আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল সূরা আনফালে বলেন,

> "আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের ঘর থেকে অহঙ্কার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বের হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে, আর তারা যা করে, আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪৭)

মুসলিমদের শুরা

কুরাইশদের যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাদের কাফেলা ইতোমধ্যেই নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে যায়, কিন্তু তবু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য আর অহংকার প্রকাশের জন্য বের হয়েছিল। তারা তাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে দম্ভ করছিল। রাসূল ﷺ বুঝতে পারলেন যে, কাফেলাটি অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু কুরাইশরা ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন তাদেরকে কাফেলার ৪০ জনের সাথে মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, ১০০০ জনের বিশাল বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শূরা ডাকলেন আর সাহাবাদের ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা এ ব্যাপারে কে কী ভাবছেন। আবু বকর ﷺ দাঁড়িয়ে কিছু কথা বললেন, উমারও ﷺ একই কথা বললেন। এরপর দাঁড়ালেন মিক্দাদ ইবন আসওয়াদ, তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তার জন্য অগ্রসর হোন। বনী ইসরাঈল তাদের নবী মূসাকে বলেছিল, মূসা, তুমি তোমার রবকে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখান থেকে নড়ছি না। কিন্তু আমরা আপনাকে কখনোই এমন কথা বলব না। আমরা যুদ্ধ করবো আপনার সামনে থেকে, আপনার পেছন থেকে, আপনার ডানে দাঁড়িয়ে এবং আপনার বামে দাঁড়িয়ে। আপনি আপনার রবকে নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হোন, আমরাও আপনার সাথে আছি।'[97]

একথা শুনে আল্লাহর রাসূলের ﷺ মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। তিনি উৎসাহের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। মিক্দাদের এই কথাগুলো ছিল সাহাবাদের ﷺ জন্য প্রেরণা। কিন্তু সবাই এ যুদ্ধে অংশ নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তাঁরা মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন কাফেলা আক্রমণ করতে, বিশাল বাহিনীর সাথে লড়বার জন্য নয়। তাদের এই মনের কথা তাঁরা গোপন রাখলেও, আল্লাহ্ তা কুরআনে প্রকাশ করে দেন। কুরআনে এই যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয় ইতিহাসগ্রন্থেও। কিন্তু পার্থক্য হলো এই যে, একজন ইতিহাসবেত্তা শুধু তা-ই লেখেন

---

[96] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৮।

[97] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬১।

যা তিনি উপলব্ধি করছেন, বাইরে থেকে দেখছেন। কিন্তু কার মনে কী আছে তা তিনি জানেন না। কিন্তু আল্লাহ তা জানেন, তাই বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> "যেমন করে আপনাকে আপনার রব ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৫)

কিছু কিছু সাহাবী ﷺ এই যুদ্ধে অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা ছিলেন মু'মিন। তাঁরাই ছিলেন সে সময়ের সেরা মুসলিমদের একেকজন। যুদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই একটি অপছন্দনীয় বিষয়। আর মুসলিম বাহিনী হিসাবে এটিই ছিল প্রথম।

> "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাকারাহ, ২: ২১৬)

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এরপর বলেন,

> "তারা আপনার সাথে বিতর্ক করছে সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হওয়ার পর। যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে, আর তারা তা দেখছে। স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দু'টি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে। তোমরা এই আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে। অথচ আল্লাহ চাচ্ছিলেন তাঁর 'কথা' দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদের মূল কেটে দেবেন – যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬-৮)

আল্লাহ মুসলিমদের মনের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, 'আর তোমরা চাইছিলে যে কণ্টকহীন, বাধা বিপত্তিহীন কাফেলাটি যেন তোমাদের ভাগে আসে'। অর্থাৎ, লোকেরা কাফেলা চেয়েছিল। সেটা আক্রমণ করা ছিল তুলনামূলক সহজ, সেটিতে মুহাজিরদের অর্থ ছিল। এটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা।

কিন্তু আল্লাহরও পরিকল্পনা ছিল, আর আল্লাহর পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয়। মুসলিমরা চেয়েছিল নিছক কাফেলা আক্রমণ করে সম্পদ নিয়ে যেতে, তারা বড় কোনো যুদ্ধে জড়াতে চায়নি। কিন্তু আল্লাহ চাননি এই যুদ্ধ হোক নিছক মুহাজিরদের

সূচিপত্র

সম্পদ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ, তিনি চেয়েছেন আরো বড় কিছু। তিনি চেয়েছেন এই যুদ্ধে হক্ব ও বাতিলের আদর্শ মুখোমুখি হোক আর তিনি হক্বকে জয়ী করেন এবং মিথ্যাকে পরাজিত করেন। তিনি পরিস্থিতিকে এমনভাবে বদলে দেন যে, মুসলিমদের এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আর একারণে এই দিনকে বলা হয় ফুরক্বানের দিন বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দিন।

গোপন তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন। বদরের কাছাকাছি তিনি তাঁর এক সাহাবির সাথে থামলেন। ইবনে হিশাম বলেছেন, এই সাহাবি ছিলেন আবু বকর ؓ। তাঁরা এক বৃদ্ধ বেদুইনকে থামিয়ে তার কাছে কুরাইশ এবং মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলেন। বুড়ো লোকটি বললো,

- আপনারা নিজেদের পরিচয় না দেওয়ার আগে আমি কিছুই বলবো না।

- আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যদি আমাদেরকে তথ্য দেন তাহলে আমরা কারা সেটা আপনাকে বলবো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন।

- আচ্ছা আমি তথ্য দিলে তোমরাও দেবে, তাই তো?

- হ্যাঁ।

- আমি শুনেছি, মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা অমুক দিন বের হয়েছে। যদি তা সত্য হয় তবে আজ তাদের অমুক জায়গায় থাকার কথা, (বৃদ্ধ ঠিক ঠিক সে জায়গার কথাই বললো, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা অবস্থান করছিলেন) আর আমি শুনেছি কুরাইশরা অমুক দিন বের হয়েছে। আর এটি যদি সত্য হয়, তবে তাদের আজকে অমুক জায়গায় থাকার কথা। এবার তোমরা বলো তোমরা কোথা থেকে এসেছ।

- আমরা 'মা' থেকে এসেছি।'

এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে চলে আসছিলেন আর বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞেস করছিলো 'মা থেকে মানে কী? এটা কি ইরাকের পানি থেকে?' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো উত্তর না দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন যেন লোকটি আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না পায়। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে চেয়েছিলেন 'আমরা মা অর্থাৎ পানি থেকে এসেছি।' কারণ আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনে বলেন 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে'। কথার কৌশলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বুড়ো লোকটিকে এড়িয়ে গেলেন এবং তাকে কোনো তথ্য দিলেন না।[98]

---

[98] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৬।

মুহাম্মাদ ﷺ কুরাইশদের অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে গেলেন। এই বৃদ্ধ লোকটির তথ্য বেশ নির্ভরযোগ্য ছিল, কারণ সে মুহাম্মাদ ﷺ আর তাঁর সাহাবিদের অবস্থান সঠিকভাবে আন্দাজ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের কাছে ফিরে গেলেন। তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে আরো খবর আনতে আলী ইবনে আবি তালিব, আয যুবাইর এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সাথে কিছু সাহাবিদের ﷺ পাঠালেন। তাঁরা কুরাইশদের বাহিনীর এক ক্রীতদাসকে দেখতে পেয়ে আটক করে নিয়ে আসেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাদের লোক?' সে বললো 'আমি কুরাইশ বাহিনীর লোক।' সাহাবারা ﷺ তাকে প্রহার করে আবু সুফিয়ানের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কিন্তু সেই ক্রীতদাসটি আবু সুফিয়ান কোথায় আছে তা জানতো না। সাহাবারা ﷺ তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আর কাদের সম্পর্কে জানো?' সে বললো, 'আমি আবু জাহেল, আবু উমাইয়্যা ইবন খালাফ, উতবা ইবন রাবিয়া এবং কুরাইশ বাহিনীর বিখ্যাত লোকদের সম্পর্কে জানি।' কিন্তু তাঁরা তাকে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য মারতে শুরু করলেন। এরপর সে বললো, 'ঠিক আছে আমি বলছি আবু সুফিয়ান কোথায়।' এ কথা বলার পর সাহাবারা ﷺ তাকে প্রহার করা বন্ধ করলেন। তখন সে বললো, 'আমি জানি না আবু সুফিয়ান কোথায়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সালাত শেষ করে বললেন, 'যখন সে সত্য বলেছিল তখন তোমরা তাকে প্রহার করেছো, আর যখন মিথ্যা বলেছে তখন তাকে ছেড়ে দিয়েছ।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

- আচ্ছা, কুরাইশদের লোকবল কেমন?

- অনেক হবে।

- তাদের সংখ্যা কতো?

- ঠিক বলতে পারছি না।

- আচ্ছা, তারা প্রতিদিন কয়টি উট জবাই করে তা জানো?

- তারা একদিন ১০টি উট জবাই করে আর পরের দিন জবাই করে ৯টি।

- হুম, তাহলে তাদের সংখ্যা ৯০০ থেকে ১০০০ জন।

দুই বাহিনীর পরিসংখ্যান

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সঠিক সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন। রাসূলুল্লাহর ﷺ হিসাব প্রায় ঠিক ছিল। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৩০০ জনের একটু বেশি, অর্থাৎ মুসলিমরা ছিল কুরাইশদের ৩ ভাগের ১ ভাগ। তাদের মধ্যে ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির, ৬১ জন ছিলেন আল আওস গোত্রের আর ১৭০ জন ছিলেন আল খাযরাজের। আল আউস গোত্রের বাসস্থান ছিল মদীনার উপরিভাগে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনা সংগ্রহ করার সময় বলেছিলেন, যাদের বাহন প্রস্তুত আছে শুধু তাঁরা সেনাদলে যোগদান করতে পারবে। তাই আল আউস গোত্রের লোকেরা একটু দূরে বসবাস করায় তাদের অল্পসংখ্যক লোক এই যুদ্ধে যোগদান করতে পেরেছে।

সূচিপত্র

বুখারি থেকে বর্ণিত, আল বারা ইবন আযিব ﷺ বর্ণনা করেন, 'আমরা, রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবারা ﷺ যখন বদরের কথা আলোচনা করতাম, তখন আমরা বলতাম – বদরে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যা আর তালুতের যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুজাহিদ, যারা নদীর পানিপান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে পেরেছিল তাদের সংখ্যা সমান। আর যারা এতে সফল হয়েছিল তাঁরা ছিল মু'মিন, তাঁরা ৩১০ জনের একটু বেশি ছিল।'

বদরের মুসলিম আর বনী ইসরাইলদের যারা তালুতের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একটা মিল ছিল। আল বারা এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা হলো, বনী ইসরাঈলের যেসব মু'মিন তালুতের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছিল তারাই ছিল তাদের যুগে সেরা। আর বদরে যেসব মু'মিন যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন তাদের যুগের সেরা। তাঁরা দুনিয়াবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাই তাঁরাই ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের ছিল নিজস্ব ব্যানার, পতাকা, স্লোগান আর রণধ্বনি। যুদ্ধে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধরে রাখাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য। বদরের যুদ্ধের ব্যানার ছিল সাদা। এটি ছিল মুসআব ইবনে উমাইরের হাতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি কালো পতাকা বহন করিয়েছিলেন; একটির নাম ছিল আল উকবা, এটি ছিল আলী ইবনে আবি তালিবের হাতে এবং অপর কালো পতাকাটি আনসারদের একজনের হাতে দেওয়া হয়েছিল।

পুরো বাহিনীর মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল। একটি ছিল যুবাইরের আর অন্যটি আল মিকদাদ ইবন আসওয়াদের হাতে। মুসলিমদের উট ছিল ৭০টি; প্রতিটি উট ৩ জনকে পালাক্রমে ভাগাভাগি করে চড়তে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উটটি আলী ইবনে আবি তালিব এবং মারসাদ ইবনে মারসাদ আল ঘানাওয়ীর সাথে ভাগাভাগি করেছিলেন।

রণক্ষেত্রে অবস্থান

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে। তিনি ভাবছেন কোন অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করলে কৌশলগত সুবিধা হবে। তিনি ভেবেচিন্তে একটি অবস্থান নির্বাচন করলেন। তখন একজন আনসারী সাহাবি, আল হাব্বাব ইবন আল মুনযির ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ, আল্লাহ্ কি আপনাকে ওয়াহীর মাধ্যমে এই জায়গা নির্ধারণ করতে আদেশ দিয়েছেন নাকি আপনি কৌশলগত কারণে জায়গাটি পছন্দ করেছেন?

আল হাব্বাবের প্রশ্নের ধরনটি লক্ষণীয়। তিনি জানতে চাইছেন সেই নির্দিষ্ট জায়গাটি পছন্দ করার কারণ কী। যদি এটি আল্লাহর তরফ থেকে ওয়াহী হয়, তাহলে আল হাব্বাব তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন, কিন্তু যদি যুদ্ধের কোনো কৌশল হয় তাহলে তাঁর কিছু বলার আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'না, এটা ওয়াহী নয়, এটা নিছক

যুদ্ধের কৌশল। আল মুনযির তখন প্রস্তাব করলেন যে, তাদের উচিত বদরের কুয়া পর্যন্ত পৌঁছানো এবং কুয়াকে পেছনে রেখে একটি জলাধার তৈরি করে কুয়ার সামনে অবস্থান নেওয়া। তিনি এর পেছনে যুক্তিও দেখালেন। মুসলিমরা যদি এই অবস্থানে থাকে তাহলে কুরাইশরা পানির নাগাল পাবে না কিন্তু মুসলিমদের দখলে প্রচুর পানি থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই প্রস্তাব খুবই পছন্দ করলেন এবং সে অনুযায়ী যুদ্ধের অবস্থান বেছে নিলেন।

আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের বৃষ্টিপাত

যুদ্ধের আগের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্বপ্ন দেখলেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মনে স্বপ্নের মাধ্যমে শক্তি যোগান। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম। কেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কম দেখালেন? আল্লাহ আযযা ওয়াজাল চেয়েছিলেন মু'মিনদের অন্তর দৃঢ় রাখতে। কুরাইশ বাহিনী ছিল মুসলিম বাহিনীর তিনগুণ। এটা মুসলিমদের মনোবল দুর্বল হওয়ার কারণ হতে পারে। যদি কোনো সৈন্য এটা ভেবে যুদ্ধের ময়দানে যায় যে, তাদের জেতার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাহলে সে যুদ্ধের ময়দানে ভেঙে পড়বে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেখান যেন মুসলিমরা হতোদ্যম হয়ে না পড়ে।

> "আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ স্বপ্নে আপনাকে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন – বেশি করে দেখালে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয় নিয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে – কিন্তু আল্লাহ (এটা হতে না দিয়ে) তোমাদের রক্ষা করেছেন। মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে, তা তিনি জানেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪৩)

আরবে তখন বৃষ্টির মৌসুম ছিল না, কিন্তু তবু পরদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছিল। ইবনে ইসহাক বলেছেন যে, উপত্যকাটি ছিল নরম আর বাদামী; আকাশ থেকে পানি মাটিকে এমনভাবে আর্দ্র করে দিয়েছিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর বাহিনীর অগ্রসর হতে কোনো কষ্ট হয়নি। অপরদিকে কুরাইশদের উপর এতই বৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁরা ঠিক মতো সামনে এগুতেই পারছিল না।

এই বৃষ্টি দুপক্ষের উপরেই বর্ষিত হয়েছিল; মুসলিম আর কাফিরদের উপর, কিন্তু মুসলিমদের জন্য মাটি হয়েছিল আর্দ্র আর নমনীয়। অথচ একই বৃষ্টি কুরাইশদের জন্য মাটিকে করে দিয়েছিল কর্দমাক্ত আর দুঃসাধ্য। এটা তাদের সেনাবাহিনীকে বিপাকে ফেলে দেয়। একই বৃষ্টি – কিন্তু দুপক্ষের উপর দু'রকম প্রভাব, এটি ছিল আল্লাহ আযযা ওয়া জালের পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য। সেই সকালে কিছু মুসলিম স্বপ্নদোষের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছিলেন। শয়তান মুসলিমদের মনে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছিল, 'কীভাবে তোমরা অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধ করবে?" তাই আল্লাহ

সূচিপত্র

ঐতিহাসিক
বদর যুদ্ধ
সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী দিন
১৭ই রমাদান ২য় হিজরী
১৩ই মার্চ ৬২৪ সাল
আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাগলানো প্রাচীর। (সূরা সফ-৪)
বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (সূরা আলে ইমরান-১২৩)
খেজুর বাগান
মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান
বদর প্রান্তরের কূপ
অসি বাহিনী
তীরন্দাজ বাহিনী
বর্শা বাহিনী
সুসংঘটিত মুসলিম বাহিনী
মিক্বদাদ বিন 'আমর এর ঘোড়া
উবায়দাহ
আলী
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ
হামযাহ
ওয়ালিদ
শায়বাহ
উতবাহ
আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের রীতিমত ছিন্নভিন্ন করছিল
কুরাইশ বাহিনী (৯৫০)
কুরাইশদের যুদ্ধ কৌশল ছিল বিশৃঙ্খল
মদিনাহ অভিমুখে
মুসলিম বাহিনী কর্তৃক কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন
মক্কা অভিমুখে
মদিনাহ
হিজায
আবওয়া
বদর
আল-জুহফাহ
রাবিঘ
লোহিত সাগর
বদর সংঘটিত হওয়ার স্থান
১৫০কি.মি.
১০০
৫০
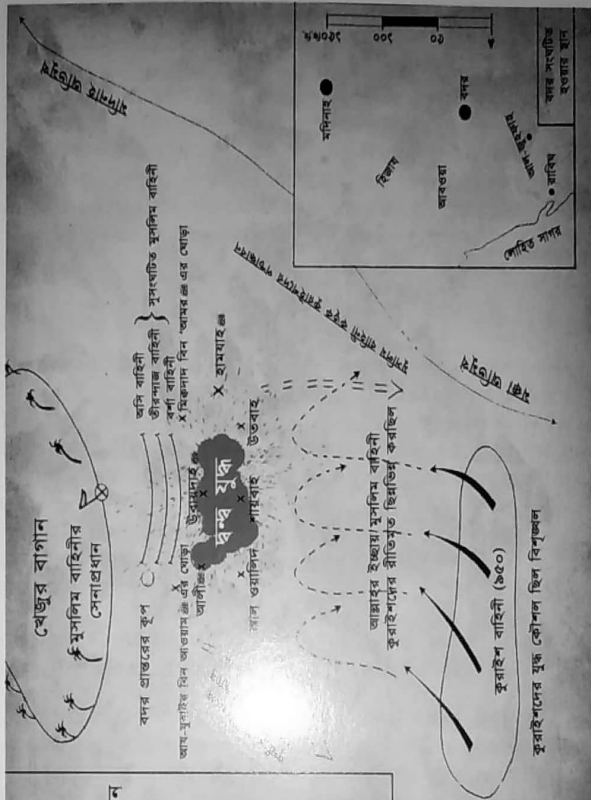
আযযাওাজাল ওই মুসলিমদের অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পানি বর্ষণ করে তাদের পবিত্র করে দিয়েছিলেন।

> "আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা আর স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন – উদ্দেশ্য ছিল এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের মন থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করবেন, তোমাদের মনে বৃদ্ধি করবেন সাহস এবং (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের পদক্ষেপ মজবুত করবেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১১)

যুদ্ধের পূর্বরাত্রি

আলী ইবনে আবি তালিব যুদ্ধের আগের রাতের ব্যাপারে বলেছেন, সকল মুসলিমরা ঘুমিয়ে ছিল। এই ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ, আল্লাহ বলেছেন, "তিনি আরোপ করেছিলেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা..." সাধারণত যুদ্ধের আগের রাতে সবাই খুব উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, ভীত অবস্থায় থাকে। কিন্তু সাহাবারা ﷺ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে আলিমরা বলেছেন, যুদ্ধের আগে ঘুমানো হচ্ছে ঈমানের লক্ষণ, আর নামাজে ঘুমানো হচ্ছে নিফাকের লক্ষণ, কেননা অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ আযযাওাজাল বলেছেন, যখন মুনাফিকরা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। যুদ্ধের আগে বা যুদ্ধের সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হলো ঈমানের লক্ষণ, কারণ এটি অন্তরে থাকা আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে।

কিন্তু একজন মানুষ সেই রাতে ঘুমাননি। সারা রাত জেগে ছিলেন। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন।

> "যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে, তারা ছিল দূর প্রান্তে, আর কুরাইশ কাফেলা ছিল তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে। (যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে) তোমরা যদি পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা-ই ঘটাতে চেয়েছিলেন যা হওয়ারই ছিল। (এ জন্যেই তিনি উভয় দলকে রণক্ষেত্রে মুখোমুখি করালেন) যাতে করে – যে দলটি ধ্বংস হওয়ার, তারা যেন ধ্বংস হয় সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর – আর যে দলটি বেঁচে থাকবে, তারাও যেন বেঁচে থাকে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪২)

মুসলিমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হয়নি। কাফিররাও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়নি, ময়দানে মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক কোনো অঙ্গীকার ছিল না। মুসলিমরা কুরাইশদের মুখোমুখি হতে চায়নি, আর না

কুরাইশরা মুসলিমদের। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন ভিন্ন কিছু। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিমরা কুরাইশদের মুখোমুখি হোক। আবু সুফিয়ানসহ আরও কিছু কুরাইশ যুদ্ধে জড়াতে চাইছিল না। এমনকি কিছু সংখ্যক কুরাইশ ভয় পাচ্ছিল এই ভেবে যে, তারা যুদ্ধ করছে আল্লাহর একজন নবীর সাথে। কিন্তু তাদের মনের ভেতরে ছিল ঔদ্ধত্য। তাই তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসরণ করেনি। এধরনের কুফরকে বলা হয় কুফর আল ইস্তিকবার, ঔদ্ধত্য থেকে কুফরি। অন্যদিকে অনেক মুসলিমও যুদ্ধ করতে চাননি, কারণ তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে, যুদ্ধে অংশ নিতে নয়। "যে দল ধ্বংস হওয়ার, তারা যেন সত্যমিথ্যা স্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয়, যে দল বেঁচে থাকার, তারাও যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট হওয়ার পর বেঁচে থাকে" - এই যুদ্ধ ছিল ঈমান আর কুফরের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

এদিকে সাদ ইবন মুয়ায ﷺ একটি পরামর্শ নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলেন। তিনি দাবি করলেন যেন রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য একটি তাঁবু বানানো হয় আর তাঁর নিরাপত্তার জন্য প্রহরী প্রস্তুত করা হয়। সাদ বলেছিলেন, 'আমরা আশা করি মুসলিমরাই এই যুদ্ধে জিতে যাবে। কিন্তু যদি মুসলিমরা পরাজিত হয় তাহলে রাসূলুল্লাহর ﷺ উচিত মদীনায় ফিরে যাওয়া। কেননা মদীনার মুসলিমরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ সেভাবে চায় যেভাবে আমরা তাঁকে চাই। আর তাঁরা যদি জানতো আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি, তাহলে তাঁরা বসে থাকত না। তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর মিশন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন - এটাই আমি বিশ্বাস করি।' সাদ এখানে সম্ভবত আল আওস গোত্রের কথা বলছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যোগদান করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য একটি তাঁবু বানানো হয়। তিনি সেখানেই থাকেন। আবু বকর ﷺ ছিলেন তাঁর দেহরক্ষী।

অবশ্যম্ভাবী সংঘাত এড়ানোর প্রচেষ্টা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন কুরাইশরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে আকানকাল পাহাড়ের পেছনে বালুময় উপত্যকার কাছে জড়ো হচ্ছে। তাদের দেখে তিনি ﷺ বলে উঠলেন,

> *'হে আল্লাহ! কুরাইশরা আজ নেমে এসেছে অহংকার আর দম্ভভরে – তোমার বিরোধিতায় আর তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! আজ তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের বড় বেশি প্রয়োজন। হে আল্লাহ! তুমি আজ ওদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।'*

কুরাইশ কাফির বাহিনীর মাঝে লাল উটে আরোহিত এক কাফিরকে দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'কুরাইশদের কারো মাঝে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে, তবে এ লাল উটের আরোহীর মাঝেই রয়েছে। অন্যেরা যদি তাঁর কথা মেনে নিত, তাহলে

সূচিপত্র

সঠিক পথ পেত।'[99] লাল উটের এই আরোহী ছিল কুরাইশদের অন্যতম নেতা উতবাহ ইবন রাবিয়াহ। কুরাইশরা মুসলিম বাহিনীর সামরিক শক্তি আর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য উমার ইবনে ওয়াহাবকে পাঠিয়েছিল। উমার ফিরে গিয়ে বলে, 'কুরাইশরা, তোমরা শোনো! আমি তাদের উটের পিঠে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখেছি। তাদের মধ্যে কারো অস্ত্র আর সম্বল শুধু তাদের তরবারি। আল্লাহর শপথ! তোমাদেরকে না মেরে তারা মরবে না। তাদের প্রত্যেকে যদি আমাদের একজনকেও হত্যা করে, তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ? কাজেই কুরাইশরা, তোমরা যা কিছু করবে, ভেবে চিন্তে কোরো।'

উমার ইবনে ওয়াহাব দেখেছিল যে, মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় বেশ কম। কিন্তু তাদের দেখে তার মনে হয়েছে তাঁরা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। তাঁরা এসেছে মারতে এবং মরতে। হাকিম ইবনে হিযাম লাল উটের আরোহী সে কুরাইশ নেতার কাছে গিয়ে বললো,

- আমি কি আপনাকে এমন পরামর্শ দিব যা গ্রহণ করলে সারাজীবন লোকেদের মুখে আপনার প্রশংসা থাকবে।

- হ্যাঁ, বলো সেটা কী? উতবা জানতে চাইলো।

- আপনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে মক্কায় ফেরত যান। হাদরামির রক্তপণ আপনিই পরিশোধ করে দিন, এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সবাইকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

- ঠিক আছে, হাদরামির রক্তমূল্য আমি নিজে থেকে পুষিয়ে দিতে রাজি আছি। তুমি এক কাজ করো। তুমি আবু জাহেলের কাছে যাও, তাকে বোঝাও। সে-ই সবাইকে যুদ্ধের ব্যাপারে উসকানি দিয়ে উত্তেজিত করছে।

উতবা হাকিমের প্রস্তাবে রাজি হলো, সে যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে চাইলো। এই যুদ্ধের একটা অন্যতম কারণ ছিল হাদরামি হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। হাদরামি নিহত হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে পরিচালিত সারিয়ায়ে নাখলার অভিযানে। উতবা ছিল হাদরামির মিত্র, তাই হাকিম তাকে এই যুদ্ধকে এড়ানোর জন্য বিকল্প পন্থা হিসাবে হাদরামির রক্তপণ দিয়ে দিতে অনুরোধ করে। এই প্রস্তাবটি উতবার পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু তাদের নেতা ছিল আবু জাহেল, তাই তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল। উতবা দাঁড়িয়ে কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বললো,

'শোনো, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে লড়াইয়ে আমাদের তেমন কোনো অর্জন নেই। যদি তোমরা তাঁকে মেরে ফেলো তাহলে এমন সব মানুষ মারা পড়বে যাদের নিহত চেহারা দেখতে তোমাদের কারোই ভালো লাগবে না। তোমরা তো তোমাদের চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই অথবা গোত্রের কাউকেই হত্যা করবে। তোমরা ফিরে

---

[99] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭২।

চলো এবং মুহাম্মাদকে আরবের অন্য গোত্রগুলোর হাতে ছেড়ে দাও। যদি তারা মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের মেরে ফেলে তবে তোমাদের ইচ্ছাই পূরণ হবে। আর যদি মুহাম্মাদ বিজয়ী হয়, তাহলে সে আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে না।'

উতবা কুরাইশদেরকে এসব কথা বলছিল। অন্যদিকে হাকিম ইবনে হিযাম, আবু জাহেলকে এসব ব্যাপার বুঝানোর চেষ্টা করছিল। আবু জাহেল তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাকে খোঁচা দিয়ে বললো, 'উতবা কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাঠানোর মতো পেল না!' হাকিম বললো, 'হ্যাঁ, হয়তো সে অন্য কাউকে পাঠাতে পারতো, কিন্তু মানুষটা উতবা বলেই আমি তার বার্তাবাহক হয়েছি, অন্য কারো হয়ে আমি কথা বলতে আসতাম না।'

এরপর আবু জাহেল বললো, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখে ভয়ে উতবার বুক শুকিয়ে গেছে। আমরা কক্ষনো মক্কায় ফিরে যাবো না, যতক্ষণ আল্লাহ, মুহাম্মাদ আর আমাদের মধ্যে একটি ফয়সালা না করেন। সে ভয় পাচ্ছে আমরা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের কচুকাটা করবো। তার ছেলে তো তাদের সাথেই আছে। ছেলেকে বাঁচাতেই সে মুসলিমদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে।'

কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করার জন্য এরপর আবু জাহেল আমর ইবন হাদরামির ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললো, 'ভাবতে পারো! তোমারই বন্ধু, তোমারই আশ্রয়দাতা উতবা চায় মক্কায় ফিরে যেতে! তুমি যাও, গিয়ে সবাইকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান করো।' আমর ইবন হাদরামির ভাই তার মৃত ভাইয়ের স্মৃতিকে তরতাজা করতে কুরাইশ বাহিনীর সামনে গিয়ে বলতে থাকে, 'হায় আমর, হায় আমর'! এভাবে সে নানাভাবে তাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

আবু জাহেল শুধু তার বাহিনীকে মুসলিমদের উপর উত্তেজিত করেনি, সে উতবাকেও ক্ষেপিয়ে দিতে সফল হয়। উতবা যখন শুনলো আবু জাহেল তাকে ছোট করার জন্য বলেছে, 'উতবার বুক শুকিয়ে গেছে', তখন সে নিজের পৌরুষ দেখানোর জন্য বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে, কার বুক শুকিয়ে গেছে, আমার না তার!' আবু জাহেলের কথাকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে বদরের দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে সবার আগে এগিয়ে যায়। আবু জাহেলের ব্যক্তিত্বই ছিল এমন। সে উসকানি দিয়ে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিতে পারত। সে একাই পুরো কুরাইশ বাহিনীকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হয়।

উতবার ঘটনা থেকে শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ উতবার ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, 'কুরাইশদের কারো মাঝে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে, তবে তা উতবার মাঝেই রয়েছে। তারা যদি তার কথা শুনতো তবে তারা সঠিক কাজটাই করতো।' কাফিরদের মধ্যে দু'ধরনের লোক আছে। একটি দল হলো উগ্রপন্থী, ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। তারা যুদ্ধ ও রক্তারক্তি পছন্দ করে। অপর দলটির জ্ঞান এবং বোধবুদ্ধি আছে, তারা মধ্যমপন্থায় বিশ্বাস

করে। কিন্তু, যখনই ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে কাফিরদের বিরোধ হয়, তখন এই মধ্যমপন্থী কাফিরদের মতামত, উগ্রপন্থী কাফিরদের কুযুক্তি ও উত্তেজক বিবৃতির নিচে চাপা পড়ে যায়। ফলে এই উগ্রপন্থীরা যুদ্ধে চালকের আসনে আসীন হয়।

অনেক মুসলিম সরলমনে এমনটা আশা করে যে, কাফিরদের মধ্যেও যেহেতু কিছু যুদ্ধবিরোধী, মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক আছে, নিশ্চয়ই তাদের কথা এসব 'উগ্রবাদী, জঙ্গী কাফির'দের উপর প্রাধান্য পাবে এবং কাফিররা যুদ্ধের পথ ছেড়ে দেবে। এক কুফর শক্তির সাথে আরেক কুফর শক্তির সংঘাতে এমনটা হলেও, যখন আল্লাহর দ্বীনের সাথে, আল্লাহর নবীদের সাথে বা নবীদের অনুসারীদের সাথে কুফরের সংঘাত হয় তখন শান্তিকামীদের কণ্ঠ উগ্রবাদীদের জোরালো মিডিয়া প্রপাগান্ডার নিচে চাপা পড়ে – এটাই বাস্তবতা।

যেমন, আবু সুফিয়ানের কথায় যুক্তি ছিল। সে কুরাইশ বাহিনীকে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ এড়াতে বলেছিল। বনু যাহরা গোত্রের নেতা ছিল আখনাস ইবন শুরাইক। তারা এ যুদ্ধে জড়ায়নি, তারা নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। একইভাবে উতবা এবং হাকিম ইবন হিযামও যুদ্ধের বিপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের কথায় কুরাইশরা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত হয়নি।

ইসলাম ও মুসলিমদের কোনো ব্যাপারে কাফিরদের আচরণ স্বাভাবিক থেকে ভিন্ন। যেমন আবু সুফিয়ানের ছেলেকে মুসলিমরা যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। আবু সুফিয়ানকে বলা হয় সে যেন মুক্তিপণ দিয়ে তার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিমরা তার এক ছেলেকে আগে হত্যা করেছিল। তাই সে জিদের বশে অপর ছেলেকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে প্রত্যাখ্যান করে। নিজের ছেলেকে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে ছাড়িয়ে আনেনি, বরং মুসলিমদের শিক্ষা দিতে সে কুরাইশদের দীর্ঘদিনের একটি প্রথা ভাঙে। কুরাইশরা হাজ্জযাত্রীদেরকে খুব সম্মান করতো। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে তারা সকল হাজ্জযাত্রীকে আদর-আপ্যায়ন করতো। কিন্তু সেবার কোনো এক আরব মুসলিম গোত্রের এক সদস্য হাজ্জ করতে গেলে প্রতিশোধ স্বরূপ আবু সুফিয়ান তাকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখে।

ইবনে ইসহাক বলেন, 'কুরাইশরা ঐতিহাসিকভাবে হাজীদের প্রতি অতিথিপরায়ণ ছিল। কিন্তু প্রথমবারের মতো তারা ওই রীতি ভঙ্গ করে। আবু সুফিয়ান ওই মুসলিমকে কারাবন্দী করে রাখে। কারাবন্দী মুসলিমের পরিবার রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বিষয়টি জানায়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ানের ছেলেকে মুক্ত করে দেন। এরপর আবু সুফিয়ান সেই কারাবন্দী মুসলিমকে মুক্ত করে দেয়।'

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুসলিমদের প্রতি কাফিরদের আচরণ স্বাভাবিক থেকে আলাদা। ইসলাম ও মুসলিম সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের নৈতিকতার মানদণ্ড পাল্টে যায়। সবার জন্য একই আইন, কিন্তু মুসলিমদের জন্য ভিন্ন। কাফিরদের মধ্যে কোনো প্রজ্ঞাবান, শান্তিকামী আর মধ্যমপন্থী মানুষ থাকলেও মুসলিমদের বিষয় আসলে তাদের চেহারা

পাল্টে যায়। শয়তান তার অনুসারীদের মধ্যে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে চায় যে, ইসলামের অনুসারীদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

আল্লাহ চেয়েছিলেন যেন এই যুদ্ধ হয়। আর যখন শত্রুরা দেখলো মুসলিমরা সংখ্যায় কম, তখন তারা খুশি হয়ে যুদ্ধে নামলো। কেননা তারা ভাবছিল এ যুদ্ধে তাদের জেতার সম্ভাবনাই বেশি। তারা বে-খেয়াল আর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে যুদ্ধে নামে। এটি ছিল তাদেরকে যুদ্ধে আনার জন্য টোপস্বরূপ। কিন্তু যখন তারা মুসলিমদের প্রকৃত শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে অনুধাবন করে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।

সামরিক কৌশল

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক সামরিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যার ব্যবহার আরবরা এর আগে করেনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই যুদ্ধে সারিবদ্ধ আক্রমণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি সৈন্যদেরকে তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, তৃতীয় সারি - এভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাতেন। প্রথম সারিতে তিনি রাখতেন বর্শাধারী সৈন্যদের, আর তার পেছনে রাখতেন তীরন্দাজদের। তীরন্দাজরা পিছন থেকে তীর ছুঁড়তো আর প্রথম সারির সৈন্যরা শত্রুদেরকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা দিত। এটি ছিল আরবদের জন্য নতুন কৌশল। আল্লাহ বলেন,

> **"আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।" (সূরা আস-সাফ, ৬১: ৪)**

যুদ্ধের এ সারিবদ্ধ কৌশলকে বলা হয় যাহ্‌ফ। রোমান আর পারস্যরা এই কৌশল ব্যবহার করতো। এই পদ্ধতিতে একজন সেনাপ্রধানের পক্ষে তাঁর বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ ছিল। এভাবেই নবীজি ﷺ বেশিরভাগ যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

মুজাহিদদের প্রতি রাসূলুল্লাহর ﷺ উৎসাহ প্রদান

বদরের ময়দান। ইসলামের প্রথম মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,

> *"যে কেউ তাদের সাথে বীরত্বের সাথে লড়াই করবে এবং পিছু না হটে সামনের দিকে অগ্রসর হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"*

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'ছুটে যাও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশ এবং পৃথিবীর সমান!' উমাইর ইবন আল হামাম জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি! সত্যিই এত বড় জান্নাত আছে?', রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ! অবশ্যই আছে!' একথা শুনে উমাইর বলে উঠলেন, 'বাহ! বাহ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাহ কেন

বললে?' উমাইর উত্তর দিলেন, 'আমি ভাবছি, ইশ! আমি যদি জান্নাতে যেতে পারতাম!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'অবশ্যই! তুমি জান্নাতীদেরই একজন!' এরপর উমাইর ইবন হুমাম উঠে দাঁড়ালেন এবং কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে শুরু করলেন। হঠাৎ উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে বললেন, 'আরে! খেজুরগুলো খেতে তো অনেক সময় লেগে যাবে!'

উমাইর রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর পথে মারা যেতে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শহীদ হওয়ার জন্য এতটা আকুল ছিলেন যে, তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল খেজুর খাওয়া শেষ করে যুদ্ধে যোগ দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই তিনি খেজুরগুলো ফেলে সাথে সাথে ময়দানে ছুটে যান।[100]

রাসূল ﷺ তাঁর বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, কারণ তা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ।

> "হে নবী, তুমি মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করো, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশো জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন এক জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না। (সূরা আনফাল, ৮: ৬৫)

যুদ্ধমঞ্চ: বদর

রাসূলুল্লাহ ﷺ তীক্ষ্ণ চোখে সৈনিকদের সারির দিকে লক্ষ্য রাখছেন। তাঁর হাতে একটি তীর। তিনি যুদ্ধে সেনাদের সারি এমনভাবে সোজা করে সাজাতেন যেন তিনি সালাতের কাতার সোজা করছেন। সারিতে দাঁড়ানো এক সৈন্যের নাম ছিল সাওয়াদ ইবন গাযিয়াহ। তিনি তাঁর সারি থেকে একটু সামনে এগিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেটে আস্তে করে তীর দিয়ে একটি খোঁচা দিয়ে তাকে সারির ভেতর ঠেলে দিলেন। সাওয়াদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাকে আঘাত করেছেন, আমি এর বদলা নিতে চাই।' এটা ছিল যুদ্ধের কিছুক্ষণ আগের ঘটনা। এক যোদ্ধা রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলছে সে বদলা নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেট উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'বদলা নেবে! নাও!'

রাসূল ﷺ রাগ করলেন না, সাওয়াদকে জেলে বন্দী করতেও বললেন না। কারণ এখানে একজন সৈনিক তার কমান্ডারের সাথে এমন আচরণ করছে। সাওয়াদ 'বদলা' নিলেন – তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ জড়িয়ে ধরে পেটে চুমু খেলেন – এই ছিল

---

[100] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৭।

তাঁর বদলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এমন আচরণের কারণ জানতে চাইলেন। সাওয়াদ জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কী হতে চলেছে। আমার জীবনের শেষ স্পর্শ আমি আপনার সাথে চেয়েছি আল্লাহর রাসূল ﷺ!'[101]

সাওয়াদ ﷺ আশঙ্কা করছিলেন তিনি এই যুদ্ধে নিহত হবেন। সাহাবীদের ﷺ জন্য বদরের আগে সেই মুহূর্তগুলো ছিল শঙ্কা দিয়ে ঘেরা। তাঁরা জানতেন না বাঁচবেন কি মরবেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন মৃত্যুর সামনে। রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য তাদের ভালোবাসা ছিল প্রচণ্ড। তাই শেষবারের মতো সাওয়াদ ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীরের স্পর্শ পেতে চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবী সাওয়াদকে ﷺ ইচ্ছা করে আঘাত দেননি, সাওয়াদ তা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু তিনি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন যেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারেন। মুসলিমরা এভাবে ভাবতেন না যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ কারণে আজকে তাদের বিপদ, তাঁরা মৃত্যুর সম্মুখীন। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়াদের ﷺ জন্য দুআ করলেন।

সাওয়াদ যেভাবে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবেসেছেন, সেটাই সত্যিকারের ভালোবাসা। কবিতা কিংবা নাশিদ নয়, রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য সত্যিকারের ভালোবাসা হলো তাঁর জন্য, তাঁর সম্মানের জন্য, তাঁর আনীত দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা না করা। নিজের জান, মাল, পরিবার, টাকা-পয়সা, সন্তান-সন্ততি, মেধা – সবকিছুকে কুরবানি করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসা মানে তাঁর দ্বীনকে ভালোবাসা, তাঁর শরীয়াহ ও সুন্নাহকে ভালোবাসা, তাঁর সবকিছুকে ভালোবাসা। একজন মু'মিন কুফরে ফিরে যাওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া পছন্দ করবে। এর আগে একজন মু'মিন কখনো ঈমানের মিষ্টতা উপলব্ধি করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনী সাজালেন, লড়াইয়ের স্থান বাছাই করলেন, তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন – একে একে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। জাগতিক সকল প্রস্তুতি নেওয়া শেষ করে এরপর তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জালের উপর ভরসা করে দুআ করলেন। এটিই হলো তাওয়াক্কুল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পাশে গিয়ে দুই হাত তুলে দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি খুব গভীরভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি বললেন,

> *'হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো, তা পূরণ করো। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন করছি। তা না হলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদাত করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।'*[102]

---

101 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

102 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৯।

আজকের মতো কোটি কোটি মুসলিম সেই দিন ছিল না। মুসলিমদের সংখ্যা সেদিন ছিল এতই অল্প যে, যদি যুদ্ধে তারা নিহত হতো, তাহলে আল্লাহর ইবাদাত করার মতো আর কেউ থাকতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেই যাচ্ছিলেন। একসময় তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাকুলতা দেখে আবু বকরের ﷺ খুব খারাপ লাগলো। তিনি বললেন, 'অনেক তো হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ।'

আবু বকর ﷺ বলতে চাচ্ছিলেন যে, কেন আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেকে ক্লান্ত করে তুলছেন যখন আল্লাহ তাঁকে ﷺ সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। আবু বকর ﷺ ছিলেন নরম মনের মানুষ। রাসূলুল্লাহর ﷺ আবেগ তাঁকে খুব স্পর্শ করতো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ উৎফুল্ল ভাব নিয়ে বাইরে গেলেন ও সূরা আল কামারের দুটি আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

> "সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে। বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও তিক্ততর।" (সূরা আল-ক্বমার, ৫৪: ৪৫-৪৬)

রাসূলুল্লাহর ﷺ দীর্ঘ দুআর পর আল্লাহ তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দেন।

> "আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট (কাতর কণ্ঠে) ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি।" (সূরা আনফাল, ৮: ৯)

আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানিয়ে দিলেন তিনি ১০০০ ফেরেশতা পাঠাবেন। কাফিরদের সাথে লড়তে একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট, জিবরীল ﷺ তাঁর পাখার সরু প্রান্ত দিয়েই পুরো লূত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপরেও আল্লাহ তাআলা এক হাজার ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। কারণ তিনি চেয়েছেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ মনে স্বস্তি এনে দিতে। এখানে সংখ্যা আসল কথা নয়, আসল কথা হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মনের প্রশান্তি।

> "সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১৭)

কুরাইশ বাহিনীতে ছিল এক প্রচণ্ড বদমেজাজি লোক। তার নাম আল আসওয়াদ আল

মাথমুন্ডি। সে জিদ ধরলো যে সে মুসলিমদের কব্জায় থাকা কুয়া থেকে পানি তুলে খাবে। আসওয়াদ কুয়ার দিকে এগোতে থাকলো। হামযা ﷺ তার পায়ে আঘাত করলেন, তার পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু সে এতই একগুঁয়ে ছিল কাটা-পা নিয়ে সে কুয়ার দিকে যেতে থাকলো। শপথ পূরণ করতে সে বদ্ধপরিকর। হামযা আবার তাকে আঘাত করলেন, শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়।

উতবা ইবন রাবিয়াহ, তাঁর ছেলে আল ওয়ালিদ ইবন উতবা ও তার ভাই শায়েবা – কুরাইশদের মধ্য থেকে এই তিনজন দাঁড়িয়ে গেল। তারা মুসলিমদের দ্বৈত যুদ্ধের আহ্বান জানালো। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনসারদের মধ্য থেকে তিনজন এগিয়ে যান। আউফ, মুয়ায ইবনে আফরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তাঁরা এগিয়ে গেলে উতবা তাদেরকে বললো,

- তোমরা কারা?
- আমরা আল আনসার।
- কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে লড়তে চাই না। আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের সাথে লড়বো, যারা আমাদের মধ্য থেকে মুসলিম হয়ে গেছে।[103]

উতবা মুহাজির কারো সাথে লড়তে চাইছিল। উতবা ছিল কুরাইশদের বিশিষ্ট নেতা। আবু জাহেল তাকে কাপুরুষ ডেকে এত ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল যে সে নিজের পৌরুষ প্রমাণে তার ভাই আর ছেলেকে নিয়ে দ্বৈত যুদ্ধে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহও ﷺ চাচ্ছিলেন দ্বৈত যুদ্ধে আনসাররা অংশ না নিক। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং পরিবারের মধ্যে থেকে কেউ লড়তে এগিয়ে যাক। কেননা এটাই ছিল মুশরিক আর মুসলিমদের মধ্যকার প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ, এর আগে যদিও বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু এটি ছিল একটি যুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধ। আর এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদেরকে ফেরত পাঠিয়ে তিনজন মুহাজিরকে বাছাই করলেন, 'হামযা, উবাইদা এবং আলী, তোমরা ওঠো!' এরা তিনজনই রাসূলুল্লাহর ﷺ আত্মীয়। হামযা ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা, আর আলী এবং উবাইদা ইবন হারিস – এ দু'জন ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচাতো ভাই। তাঁরা তিনজন দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুরাইশদের জবাব দিতে এগিয়ে যান। এই তিনজনের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন উবাইদা। তিনি তাই লড়লেন উতবার সাথে, সে ছিল মুশরিকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। আলী লড়লেন ওয়ালিদের সাথে, তাঁরা দু'জনেই ছিলেন স্ব স্ব পক্ষের দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের মাঝে কনিষ্ঠ। হামযা ﷺ মুকাবিলা করলেন শাইবার।

হামযা ﷺ আর আলী ﷺ দুইজনই খুব দ্রুততার সাথে তাদের প্রতিপক্ষকে খতম করে দেন। কিন্তু উতবা আর উবাইদা ﷺ একে অপরকে আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণ করতে

[103] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮০।

থাকেন। দু'জন দু'জনকে আঘাত করেন এবং দু'জনই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তখন আলী এবং হামযা এসে উতবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন।

আহত উবাইদাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উরুতে উবাইদার মাথা রেখে তাকে সম্মান করলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা আবু তালিব বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের কথা ভুলে যাবো কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ খেদমত করে যাবো, কখনো ভুলবো না।' রাসূলুল্লাহর ﷺ কোলে শুয়ে উবাইদা ﷺ বলেন, 'হায়, যদি আবু তালিব দেখতে পেতন যে আমি তাঁর কথা রেখেছি!' উবাইদা ইবন হারিস, রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য তাঁর জীবন দিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি একজন শহীদ।'

বদরের প্রান্তরের সেই দ্বৈত যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন[104],

> "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। যারা কুফর করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং তাদের চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, বলা হবেঃ দহন যন্ত্রণা আস্বাদন কর (এরা ছিল বিতর্কে প্রথম দল যারা ঈমানে আনে নি) ।
>
> (বিতর্কের দ্বিতীয় দল) যারা ঈমানে এনেছে এবং এবং ভালো কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন আর মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পথে।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ২০-২৪)

দ্বৈত যুদ্ধে হেরে গিয়ে কুরাইশরা রাগে অন্ধ হয়ে যায়। তারা মুসলিমদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন শত্রুরা কাছে না আসা পর্যন্ত যেন তারা আক্রমণ না করে। তিনি তাদের আদেশ করলেন, 'তোমরা তোমাদের তরবারি বের করো না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তোমাদের নিকটে আসে।'

যুদ্ধ শুরুর পর মুশরিকরা মুসলিমদের তাদের সংখ্যার দ্বিগুণ দেখতে লাগলো। যুদ্ধ শুরুর আগে তারা সংখ্যায় মুসলিমদের কম দেখেছিল, কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন তারা মুসলিমদের দেখলো যেন তাঁরা সংখ্যায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ, মুশরিকরা ছিল ১০০০ আর তারা দেখল যে ২০০০ জন মুসলিম। সেটা দেখে তাদের মনোবল আরো ভেঙে

---

[104] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযী, হাদীস ২২।

পড়ে।

> **“নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে, আর অপর দলটি ছিল কাফের, তারা স্বচক্ষে মুসলিমদের সংখ্যায় তাদের দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।” (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৩)**

যুদ্ধে মুসলিমদের রণধ্বনি ছিল ‘আহাদ! আহাদ!’ মুসলিমদের প্রতিটি যুদ্ধে সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু স্লোগান ও রণধ্বনি থাকতো। পুরো যুদ্ধজুড়ে তারা সেগুলো আবৃত্তি করতো।

একজন আনসারী সাহাবি হারিসা ইবন শুরাকা আল-খাযরাজি ﷺ এই যুদ্ধে ভুলক্রমে মুসলিমদের ছোঁড়া একটি তীরে নিহত হন। যুদ্ধের পর তাঁর মা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করে জানতে চাইলেন, ‘আমার ছেলে কি জান্নাতে যাবে? যদি সে জান্নাত পায় তাহলে আমি অনেক খুশি হবো। কিন্তু যদি না যায় তাহলে অনেক কষ্ট পাবো।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘কেন যাবে না? অবশ্যই যাবে! জান্নাতে অনেক বাগান আছে, আর তোমার ছেলে আছে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু বাগানটায়!’

> “বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। স্মরণ করুন আপনি যখন বলতে লাগলেন মু’মিনদেরকে – তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। অবশ্য, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে স্মরণ করো এবং শত্রুপক্ষ তোমাদের উপর হঠাৎ চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের রব (প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আসলে এ সংখ্যাটা বলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি সুসংবাদ দিয়েছেন, (বিজয়ের জন্য তো তিনিই যথেষ্ট) যাতে তোমাদের মন প্রশান্ত ও আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য ও বিজয়! সে তো পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।” (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১২৩-১২৬)

মুসলিমদের বিজয়ের জন্য ফেরেশতা পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন মুসলিমদের স্বস্তি প্রদান করার জন্য, তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিতে। এই যুদ্ধে সেদিন নেমেছিলেন স্বয়ং জিবরীল।

ফেরেশতারা ছিলেন সাদা রঙের পাগড়ি পরিহিত। শুধু জিবরীল পরেছিলেন হলুদ পাগড়ি, যেন তাঁকে আলাদা করা সহজ হয়। তিনি ছিলেন সেদিন ফেরেশতা বাহিনীর নেতা। যুদ্ধে এক মুসলিম প্রবল বেগে এক কাফিরকে ধাওয়া করছিলেন। ধাওয়া

করতে করতে সে হঠাৎ তাঁর মাথার উপরে চাবুকের শপাং শপাং আওয়াজ শুনে পান। তাঁর কাছে মনে হলো, কেউ একজন ঘোড়ার উপর থেকে বলছে, 'চল হায়যুমা চল!' এরপর সে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন তাঁর সামনের সেই কাফির মাটিতে পড়ে আছে, তার নাক থেঁতলে গেছে এবং চাবুকের আঘাতে তার মুখ দু'ভাগ হয়ে গেছে। এটি ছিল আগুনের একটি আঘাত। সেই আনসারী সাহাবি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বিষয়টি জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি সত্য বলছো, এটি ছিল তৃতীয় আসমানের সাহায্য।' অর্থাৎ, এটি ছিলেন একজন ফেরেশতা। তিনি "হায়যুম" নামক ঘোড়ায় আরোহণ করছিলেন।

গিফারী গোত্রের এক লোক তার নিজ মুখে বর্ণনা করেছে সেদিনের আসমানী সাহায্যের কথা: 'আমি আর আমার চাচাতো ভাই বদরের সেইদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা তখনো মুশরিক ছিলাম। আমরা একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে যুদ্ধ শুরুর অপেক্ষা করছি। সেখানে বসে দেখছি কে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। এক পর্যায়ে এক টুকরো মেঘ এগিয়ে আসলো। মেঘটি পাহাড়ের কাছাকাছি আসার পর আমরা ঘোড়ার ছোটাছুটির আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেইসাথে আরও একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'উক্বদিম হায়যুম!' আমার বন্ধু ঘটনাস্থলেই ভয় পেয়ে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যায়। আমিও ভয়ে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে পরে সুস্থ হয়ে উঠি।'

আবু দাউদ মাযুনী বলেন, 'আমি আমার সামনের এক মুশরিককে ধাওয়া করছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি তাকে মারার আগেই তার মাথা শরীর থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।' আনাস ইবন মালিক ؓ বলেন, 'লাশগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, কারা ফেরেশতাদের হাতে মরেছে আর কারা আমাদের তলোয়ারের আঘাতে মরেছে। যারা ফেরেশতাদের হাতে মরেছে তাদের ঘাড়ে আঙুলের ছাপ দেখে মনে হচ্ছিল তাদেরকে তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।'

ফেরেশতারা সেদিনের সেই যুদ্ধে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা ধরে ধরে যুদ্ধবন্দিদেরও পাকড়াও করেছিলেন। আল-আব্বাসকে সেদিন নবীজির ﷺ কাছে ধরে নিয়ে আসেন এক আনসারী সাহাবি। আল আব্বাস বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে তো এই লোক পাকড়াও করেনি। আমাকে পাকড়াও করেছে বর্মবিহীন এক সুদর্শন পুরুষ। সে সওয়ারী ছিল সাদা-কালো ছোপ-ছোপযুক্ত ঘোড়ার উপর। আমি তাকে আপনার সৈন্যদের মধ্যে দেখতে পাইনি।' একজন আনসারী বললেন, 'না! আমিই তাকে পাকড়াও করেছি আল্লাহর রাসূল ﷺ', রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "চুপ থাকো, আল্লাহ তোমাকে একজন সম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন"।

ইবনে আব্বাস বলেন, 'একমাত্র বদরের যুদ্ধেই ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেছেন। অন্য যুদ্ধে তাঁরা অতিরিক্ত সৈন্য বাহিনী এবং সহায়তা প্রস্তুত রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা যুদ্ধ করেননি। এই যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিক নিহত হয় এবং ৭০ জন যুদ্ধবন্দী হয়।

মুসলিমদের কেউ যুদ্ধবন্দী হয়নি, শাহাদাত বরণ করেন ১৪ জন। ৬ জন ছিলেন মুহাজির, আল খাযরাজ থেকে ৬ জন এবং আল আউস থেকে ২ জন।

আবু জাহেল: এক ফেরাউনের জীবনাবসান

এই যুদ্ধেই কুরাইশদের জাঁদরেল নেতা, ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবু জাহেলের শেষ পরিণতি হয়। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাহমান ইবন আউফ ﷺ।[105] যুদ্ধের ময়দানে সেদিন আব্দুর রহমান ইবন আউফের পাশে যুদ্ধ করছিল দুই বাচ্চা ছেলে। তিনি বাচ্চা দুটোকে দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেন। সৈনিকরা সবসময় চায় তাদের পাশে শক্তিশালী সহযোদ্ধা থাকুক। যুদ্ধ চলছে, এ অবস্থায় আব্দুর রাহমান ইবন আউফকে তাঁর ডান পাশের ছেলেটি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'চাচা, এখানে আবু জাহেল কে? আমাকে একটু দেখিয়ে দিন।' আব্দুর রাহমান ইবন আউফ জিজ্ঞেস করলেন, 'বালক, তুমি আবু জাহেলকে কেন খুঁজছো?' ছেলেটি জবাব দিল, 'আল্লাহর কসম! আমি যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে তাকে হত্যা করবো অথবা আমি নিজে মরে যাব।' এই কথা শুনে আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ বুঝলেন তিনি ছেলেগুলোকে যেমন ভেবেছিলেন তারা তেমন নয়, তারা অনেক সাহসী। আব্দুর রাহমান ডান পাশের সেই ছেলেকে আবু জাহেলের অবস্থান দেখিয়ে দিলেন।

আব্দুর রাহমানের বাম পাশের ছেলেটিও তাঁর কানে ফিসফিস করে একই প্রশ্ন করলো। এই দুই ভাই আবু জাহেলকে হত্যা করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছিল। তাই তারা ফিসফিস করছিলো যেন অপরজন শুনতে না পায়। আব্দুর রাহমানের বর্ণনায়, 'ছেলে দুটি বাজ পাখির বেগে আবু জাহেলের দিকে ধেয়ে গেল আর আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললো।'

এরা দু'জন ছিল মুয়ায ইবনে আমর ইবন জামুহ এবং মুয়ায ইবনে আফরা। তাঁরা ছিল সহোদর ভাই। এদের মধ্যে একজন আবু জাহেলকে আক্রমণ করে তার পা ভেঙে দেয়। আবু জাহেলের ছেলে ইকরিমা সেটা দেখতে পেয়ে মুয়াযের হাতে আঘাত করে। তার হাত শরীর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকে। কাটা হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে মুয়াযের অসুবিধা হচ্ছিল। তাই সে কাটা হাতে পা রেখে টান দিয়ে সেটা শরীর থেকে পুরোপুরি আলাদা করে আবার যুদ্ধে মনোযোগ দেয়। এই দুই কিশোর আবু জাহেলকে মারাত্মকভাবে আহত করে মাটিতে ফেলে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আছে আমাকে আবু জাহেলের শেষ পরিণতির কথা জানাবে?' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমি আবু জাহেলকে খুঁজতে গেলাম। দেখলাম মাটিতে এক লোক পড়ে আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি এটাই আবু জাহেল। আমি তার গলায় পা রাখলাম। মক্কায় সে একবার

---

[105] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৫।

আমাকে বন্দী করে লাথি মেরেছিল।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর দুশমন! দেখলি তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোকে কীভাবে অপমানিত করলেন?' আবু জাহেল বললো, 'আল্লাহ আমাকে অপমানিত করেছেন? আরে, যাকে হত্যা করলি তার চেয়ে অভিজাত আর কেউ কি আছে? বল আমাকে আজ কারা জয়ী হয়েছে?' আবু জাহেল তার শেষ মুহূর্তে এসেও যুদ্ধের ফলাফল জানতে চেয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন যে, 'আবু জাহেল মাটিতে শুয়ে তার ধারালো তরবারি নিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। আমার তরবারিটি ছিল ভোঁতা। আমি আবু জাহেলের হাতে আঘাত করে তার তরবারি ফেলে দিলাম আর তার বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়ালাম। আবু জাহেল আমাকে বললো, 'ওরে বকরীর রাখাল, তুই বহুত উঁচু জায়গায় উঠে পড়েছিস।' মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও আবু জাহেল তার ঔদ্ধত্য দেখিয়ে চলছিল। ইবনে মাসউদ বলেন, 'এরপর আমি তার মাথা কেটে নিয়ে সেটি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে নিয়ে গেলাম। আমার খুব খুশি লাগছিল কারণ আমি আবু জাহেলের মাথা আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আনন্দে আমি যেন হাওয়ায় ভাসতে থাকলাম।' ইবনে মাসউদ আবু জাহেলের কাটা মাথা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে হাজির হলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই হলো আল্লাহর দুশমনের মাথা!' রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশিতে আত্মহারা হলেন, 'সত্যি!' ইবনে মাসউদ বললেন, 'হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল ﷺ!'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তোকে অপমানিত করেছেন, তুই আল্লাহর শত্রু। প্রত্যেক উম্মতের একজন ফিরআউন আছে, আর এ হচ্ছে এই উম্মাতের ফিরআউন।'

আবু জাহেলকে হত্যা করতে আল্লাহ বেছে নিয়েছেন আনসারদের দুই কিশোর এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে আবু জাহেল অপদস্থ করতো। তিনি ছিলেন খুবই পাতলা গড়নের। একদিন তিনি খেজুর গাছে উঠে বসেছিলেন। বাতাস বইছিলো আর তিনি কেঁপে উঠছিলেন। তাঁর সরু সরু পা দেখে সাহাবারা ﷺ হেসে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'তোমরা কি একারণে হাসছো যে তাঁর পা খুবই সরু? আল্লাহর কসম, কিয়ামাতের দিনে এই পা দুটো মীযানে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারি হবে।'

কে কত পেশিবহুল বা শক্তিশালী – সেটাই সবকিছু নয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন খুবই হালকা-পাতলা, মক্কার নিচু গোত্রের একজন সদস্য, দাসীর সন্তান। কিন্তু তাঁকে দিয়েই আল্লাহ কুরাইশদের সবচেয়ে অভিজাত, প্রভাবশালী এবং জাঁদরেল নেতাকে হত্যা করিয়েছেন। একজন মুসলিম মুজাহিদ তার যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে কিন্তু সেগুলোর উপর তাওয়াক্কুল করবে না, তাওয়াক্কুল করবে শুধু আল্লাহর উপর।

ইবনে কাসির (রহ) আবু জাহেলের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন, 'আবু জাহেলের মৃত্যু হয়েছিল আনসারী এক যুবকের হাতে। এরপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ তার বুকের ওপর পা দিয়ে উঠে দাঁড়ান। এর মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দিয়েছেন। আবু

জাহেলের স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারতো, ছাদ ধসে কিংবা বজ্রপাতে। কিন্তু লাঞ্ছনার মাধ্যমে তার মৃত্যু হওয়ায় ঈমানদারদের অন্তর বেশি প্রশান্ত হয়েছে।'

> "যুদ্ধ কর ওদের সাথে – আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন – আর দূর করবেন তাদের মনের ক্ষোভ। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ১৪-১৫)

এখানে প্রতিশোধের ব্যাপারটি জড়িত। মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে মক্কার কুরাইশদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছিল। তাই আল্লাহ মু'মিনদের হাতে কাফিরদের শাস্তি দিয়েছেন যেন তাদের পরিণতি দেখে 'মু'মিনদের অন্তর শান্ত হয়' এবং 'তাদের মনের ক্ষোভ দূর হয়'।

নিয়তির টানে নিহত: উমাইয়া ইবন খালাফ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, সাদ ইবন মুয়ায ছিলেন উমাইয়া ইবন খালাফের অন্তরঙ্গ বন্ধু। যখনই উমাইয়া মদীনায় ভ্রমণে যেতো, সে সাদের ﷺ সাথে থাকতো। আর সাদ ﷺ যখন মক্কায় যেতেন তখন উমাইয়ার সাথে থাকতেন। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় পৌঁছালেন, সাদ তখন মক্কায় উমরা করতে এসেছিলেন। মক্কায় তিনি উমাইয়ার বাড়িতে উঠেছিলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, 'আচ্ছা উমাইয়া, কোন সময়ে কাবার চারপাশটা খালি থাকে? আমি কাবাঘর তাওয়াফ করতে চাই।' উমাইয়া তাকে নিয়ে দুপুরে বের হলো। তখন আবু জাহেলের সাথে দেখা। আবু জাহেল তাদের দেখে বললো, 'হে আবু সাফওয়ান! তোমার সাথে এই লোকটি কে?' সে বলেছিল, 'সে হচ্ছে সাদ'।

আবু জাহেল সাদ ইবন মুয়াযকে সম্বোধন করে বললো, 'বাহ! তুমি দেখি মক্কায় নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছো! অথচ তুমি মক্কার এমন লোকদের নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছো যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে! তুমি নাকি তাদের সবরকমের সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর! আল্লাহর কসম! আবু সাফওয়ান (উমাইয়া) যদি তোমার সাথে না থাকতো, তুমি তোমার পরিবারের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।'

সাদ নিজেই ছিলেন একজন গোত্রনেতা। তিনি আবু জাহেলের হম্বিতম্বি পছন্দ করলেন না। তিনি গলা উঁচু করে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ করতে বাধা দিতে, তাহলে আমিও তোমাকে এমন কাজে বাধা দেব যা তোমার জন্য আরো খারাপ হবে। মদীনার উপকণ্ঠ দিয়ে তোমার বাণিজ্যিক কাফেলার যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেব।' এই কথা শুনে উমাইয়া সাদকে বললো, 'সাদ, আবুল হাকাম মক্কার নেতা। তার সাথে উঁচু গলায় কথা বোলো না।' সাদ জবাবে বললেন, 'উমাইয়া, থামো!

আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বলতে শুনেছি যে, তুমি মুসলিমদের হাতে মারা পড়বে।' উমাইয়া জিজ্ঞেস করলো, 'মক্কায়? সাদ বললেন, 'তা আমি জানি না।' উমাইয়া রাসূলুল্লাহর ﷺ এ ভবিষ্যতবাণী শুনে খুবই ভয় পেয়ে গেল।

উমাইয়া তার পরিবারের কাছে গেল। তার স্ত্রীকে বললো, 'উম্মে সাফওয়ান! তুমি কি জানো সাদ আমাকে কী বলেছে?' সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলেছে সে?' উমাইয়া বললো, 'সে দাবি করছে যে মুহাম্মাদ ﷺ তার সাহাবাদেরকে ﷺ বলেছে যে তারা নাকি আমাকে হত্যা করবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেটা কি মক্কায় ঘটবে, সে বললো সে জানে না।' তারপর উমাইয়া নিজেই বললো, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনই মক্কার বাইরে যাবো না।' কিন্তু যখন বদরের দিন আসলো, আবু জাহেল সবাইকে যুদ্ধে যেতে আহ্বান করছিল এই বলে যে, 'যাও! তোমাদের কাফেলা রক্ষা করো।' কিন্তু উমাইয়া যেতে চাইলো না। সে ভয় পাচ্ছিল যদি সে মক্কার বাইরে গেলে মারা পড়ে। আবু জাহেল তার কাছে এসে বললো, 'দেখো আবু সাফওয়ান, তুমি একজন নেতা! তুমি যদি যুদ্ধে না যাও তাহলে অন্যেরাও বসে থাকবে।' আবু জাহেল তাকে চাপ দিতে লাগলো, একসময় উমাইয়া রাজি হলো। সে বললো, 'তুমি যেহেতু আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করেছো, আল্লাহর শপথ, আমি মক্কার সেরা উটে চড়ে যুদ্ধে যাবো।' সে তার স্ত্রীকে বললো, 'উম্মে সাফওয়ান, আমার যা যা লাগবে প্রস্তুত করো।' উম্ম সাফওয়ান তাকে বললো, 'তুমি কি ভুলে গেছ তোমার মদীনার ভাই তোমাকে কী বলেছে?' উমাইয়া বললো, 'না আমি ভুলিনি, কিন্তু আমি খুব বেশি দূর যাবো না।' রওনা হওয়ার পর সে রাস্তার যেখানেই কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে, সেখানেই সে তার উট বেঁধে রেখেছে। গোটা পথ জুড়ে সে এমনটা করলো এবং শেষ পর্যন্ত বদরের প্রান্তরে সে আল্লাহর হুকুমে মারা গেল।[106]

উমাইয়া ছিল একজন কাফির, কিন্তু মন থেকে ঠিকই সে বিশ্বাস করতো মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। তাই সে মক্কা ছেড়ে বের হতে ভয় পাচ্ছিল। যখন বদর যুদ্ধের ডাক আসলো, সে যেতে চাইলো না। তাই আবু জাহেল তাকে অপমান করার জন্য তার হাতে "মাবখারা" ধরিয়ে দিল, মাবখারা হচ্ছে এক ধরনের চুলা। বয়স্ক মহিলারা এই ধরনের চুলা ব্যবহার করে। উমাইয়াকে সে বুঝাতে চাইলো, 'তোমার মতো কাপুরুষের উচিত মহিলাদের চুলা নিয়ে বসে থাকা।' আবু জাহেল উমাইয়াকে ক্ষেপিয়ে তুলে যুদ্ধে নিয়ে যেতে চাইছিল। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহর ﷺ ভবিষ্যতবাণী মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে ভয়ে ভয়ে যুদ্ধে গেল। প্রতিটি বিরতিতে তার মনে হলো, "আর সামনে এগোবো না", কিন্তু সে অগ্রসর হতে হতে একেবারে যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

যুদ্ধে উমাইয়া বন্দী হয়। উমাইয়া তার জাহেলিয়াতের পুরোনো বন্ধু আবদুর রাহমান ইবন আউফকে দেখে ডেকে ওঠেন, 'হে আব্দ আমর...!' কিন্তু আব্দুর রাহমান ইবন আউফ শুনেও না শোনার ভান করলেন। কারণ এটা ছিল তাঁর জাহেলিয়াত যুগের

---

[106] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ২।

নাম। এদিকে উমাইয়াও তাঁকে তাঁর মুসলিম নাম "আব্দুর রহমান" ডাকতে চাচ্ছিল না। সে বললো, 'তোমাকে আব্দ আমর বলে ডাকলাম তুমি শুনলে না। আর আমিও তোমাকে আব্দুর রাহমান বলে ডাকবো না। এক কাজ করলে কেমন হয়, আমরা তোমার জন্য এমন একটা নাম ঠিক করি যে নাম শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যে থাকবে?' আব্দুর রাহমান ইবন আউফ বললেন, 'ঠিক আছে, তুমিই একটি নাম ঠিক করো।' উমাইয়া তাঁর নাম দিলেন আবদুল্লাহ, যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। আব্দুর রাহমান রাজি হলেন।

কথায় কথায় উমাইয়া আব্দুর রাহমানকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, যুদ্ধে তোমাদের দলে একটা লোককে দেখলাম যার বুক উটপাখির পালক দিয়ে ঢাকা। সে কে ছিল?' আব্দুর রাহমান ইবন আউফ উত্তর দিলেন, 'তিনি হচ্ছেন হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব'। উমাইয়া ইবন খালাফ বললো, 'হুম, এই লোকই আমাদের সর্বনাশ করেছে'।

আব্দুর রাহমান আর উমাইয়া ছিলেন জাহেলিয়াতের বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবদুর রাহমান ইবন আউফের সাথে উমাইয়া ইবন খালাফের এই মর্মে চুক্তি ছিল যে, আব্দুর রাহমান মদীনায় উমাইয়ার ব্যবসা ও সম্পদ দেখাশোনা আর উমাইয়া মক্কায় আব্দুর রাহমানের সম্পদ বা পরিবারের দেখাশোনা করবে। যাই হোক, যুদ্ধ শেষে আব্দুর রাহমান শত্রুদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কিছু বর্ম নিয়ে হাঁটছিলেন। উমাইয়া তাঁকে বললো,

- আচ্ছা, তুমি কি তোমার হাতের ওই বর্মগুলো থেকে দামি কিছু চাও না?

- হ্যাঁ চাই, কিন্তু সেটা কী? আব্দুর রাহমান ইবন আউফ জিজ্ঞেস করলেন।

- আমি আর আমার ছেলে, তুমি আমাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে বন্দী করো।

উমাইয়া নিজের জান বাঁচানোর জন্য আব্দুর রাহমান ইবন আউফের হাতে বন্দী হতে চাইলো। উমাইয়া ছিল বেশ ধনী। তাই তাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করলে আবদুর রাহমানও ভালো অংকের মুক্তিপণ লাভ করবেন, দু'জনেরই লাভ। আবদুর রাহমান ইবন আউফ তখন বর্মগুলো ফেলে দিয়ে বাপ-ছেলেকে আটক করলেন।

কিন্তু এমন একজন মানুষ উমাইয়াকে দেখে ফেললেন যে উমাইয়াকে শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি হলেন বিলাল ইবনে রাবাহ ﷺ, উমাইয়ার সাবেক দাস। উমাইয়ার সাথে আব্দুর রাহমান ইবন আউফের শত্রুতা খুব বেশিদিনের নয়। তার আগে তাঁরা বন্ধু ছিলেন, কিন্তু বিলালের সাথে উমাইয়ার সম্পর্ক ছিল প্রচণ্ড তেতো। জাহিলিয়াতের যুগে বিলাল ছিলেন উমাইয়ার দাস। উমাইয়া তাঁকে নির্মমভাবে অত্যাচার করতো।

উমাইয়াকে দেখে বিলালের দুঃসহ স্মৃতি মনে পড়ে গেল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'উমাইয়া! কাফিরদের সর্দার!' আব্দুর রাহমান বললেন, 'বিলাল শোনো! সে আমার কয়েদি, আমার অধীনে আছে।' আব্দুর রাহমান বিলালকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন

যেন সে উমাইয়ার সাথে কিছু না করে কারণ সে যুদ্ধবন্দী। বিলাল বুঝলেন আব্দুর রাহমান ইবন আউফ উমাইয়াকে তাঁর হাতে ছাড়বেন না। তখন তিনি আনসারদের কাছে গিয়ে বললেন, 'ওই লোক হলো উমাইয়া! কুরাইশদের নেতা! হয় সে বেঁচে থাকবে না হয় আমি। আমি তাকে ছাড়বো না।' বিলালের কথা শুনে আনসাররা ততক্ষণে ঘটনাস্থলে চলে এসেছে। আব্দুর রাহমান আশংকা করছিলেন যে তারা তাঁর ধরা যুদ্ধবন্দীদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে। তাই তিনি উমাইয়ার পুত্র আলিকে তাদের জন্য ছেড়ে দিলেন যেন আলিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আনসাররা আলিকে হত্যা করে আবার উমাইয়াকে ধরার জন্য ছুটে গেলেন। উমাইয়া ছিল মোটাসোটা। আব্দুর রাহমান তাকে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসিয়ে নিজ শরীরকে ঢাল বানিয়ে উমাইয়াকে রক্ষা করার জন্য তার উপর শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আনসাররা তাদের তরবারি আব্দুর রাহমানের শরীরের নিচে দিয়ে ঢুকিয়ে উমাইয়াকে হত্যা করলেন। ধস্তাধস্তির মধ্যে কোনো এক আনসারি সাহাবীর তরবারি আব্দুর রাহমানের পায়ে লেগে জখম হয়।

আব্দুর রাহমান বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা বিলালের উপর রহম করুন। আমার বর্মগুলো, আমার গ্রেফতার করা বন্দী দুটোই গেল।'[107]

উমাইয়া ইবন খালাফ ছিল কাফিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, এটাই ছিল তার শেষ পরিণতি। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ভবিষ্যতবাণী সত্য হলো। মুসলিমদের হাতে সে মারা পড়লো। সে যুদ্ধে আসতে চায়নি। আসার পরেও সে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। মুসলিমদের হাতেই তাকে মরতে হয়।

অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের মৃত্যু

মুশরিকদের অন্যতম বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল আবুল কিরশ। সে ছিল বেশ মোটাসোটা, ভুঁড়িওয়ালা, আগাগোড়া লোহার বর্মে আচ্ছাদিত। তার দুটি চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ ছিলেন কৌশলী ও সাহসী যোদ্ধা। তিনি তাঁর বর্শা ছুঁড়ে প্রথম চেষ্টাতেই সরাসরি আবুল কিরশের চোখে আঘাত করতে সমর্থ হন। বর্মের ছোটো ছিদ্র দিয়ে বর্শা আবুল কিরশের চোখ হয়ে মাথায় ঢুকে যায়, আবুল কিরশ মাটিতে পড়ে যায় এবং মারা যায়। বর্মের ছিদ্র এতই ছোট ছিল যে সেটাকে বের করা সম্ভব হচ্ছিল না। আয যুবাইর তখন আবুল কিরশের শরীরের উপর দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে টেনে বর্শাটিকে বর্মের ছিদ্র থেকে বের করে আনেন। সেটা করতে গিয়ে বর্শার দুই মাথাই বেঁকে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বর্শাটিকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজের জন্য রেখে দেন। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ইন্তেকালের পর আবু বকর ﷺ এই বর্শা নিজের কাছে রেখে দেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তা যায় উমারের ﷺ কাছে। তাঁর মৃত্যুর পর যুবাইর তা ফিরে পান। কিন্তু উসমান ﷺ আবার এটি চেয়ে বসলে যুবাইর তা খলিফার কাছে দিয়ে দেন। উসমানের মৃত্যুর পর সেই বর্শা ছিল আলির ﷺ কাছে। আলীর

[107] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০১।

মৃত্যুর পর যুবাইরের ছেলে আবদুল্লাহ ﷺ বর্শাটি পান।[108]

কুরাইশদের মধ্যে কিছু মহৎ ব্যক্তিত্ব ছিল। তার মধ্যে একজন হলো আবুল বাখতারি। কাফির হলেও মুসলিমদের প্রতি সে নিষ্ঠুর ছিল না। শেবে আবু তালিবে যখন বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে তিন বছর ধরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় তখন এই অবরোধের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন এই আবুল বাখতারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন, 'যদি আবুল বাখতারিকে যুদ্ধের মাঠে দেখো তাহলে তাকে হত্যা কোরো না।'

কোনো কাফির যদি মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে মুসলিমদেরও উচিত তার প্রতি সদয় হওয়া। একজন আনসার সাহাবী ﷺ সেদিন ময়দানে আবুল বাখতারিকে দেখে তাকে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তাকে যেন হত্যা করা না হয়। সে জিজ্ঞেস করলো, 'আর আমার সাথীদের কী হবে?' আনসার উত্তর দিলেন যে, 'তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব, কিন্তু তোমার সাথীদের ছাড়বো না।' আবুল বাখতারি বললো, 'আমি আমার সাথীদের রক্ষা করতে লড়াই করে যাবো।' সেই আনসারী সাহাবি বাধ্য হয়ে আল বাখতারির সাথে লড়াই করলেন। লড়াইয়ে আবুল বাখতারি নিহত হন।

ওই আনসারী সাহাবি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বলেন, 'সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমি তাকে বন্দী করে আপনার কাছে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছি কিন্তু সে জোরপূর্বক আমার সাথে লড়াই করে। তাই আমি পাল্টা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেছি।'[109]

যুদ্ধের অব্যবহিত পর

আল্লাহর রাসূল ﷺ বদরের যুদ্ধে নিহত ২৪ নেতার লাশকে একটি নোংরা পরিত্যক্ত কুয়ায় ফেলে দেওয়ার আদেশ করেন। এরপর সেই ২৪ জন নেতার লাশ ওই জায়গায় নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

এ যুদ্ধে নিহত হয় কাফিরদের বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতা। তাদের মধ্যে একজন ছিল উতবা ইবন রাবি'য়াহ। তার লাশ টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তারই পুত্র আবু হুযাইফা ﷺ। তিনি বিমর্ষ মুখে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখে বুঝলেন তাঁর মন বেশ খারাপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি তাঁর পিতার পরিণতি দেখে দুঃখ পেয়েছেন কি না। আবু হুযাইফা জবাবে বললেন,

---

[108] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৮।

[109] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০০।

'আমি কসম করে বলছি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আমার পিতার পরিণতিতে কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমি তাঁর মাঝে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং ভালো কিছু দেখে ভেবেছিলাম হয়তো এগুলো তাকে একদিন ইসলামের ছায়ায় নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন তাঁর পরিণাম দেখে, কুফরির উপর তাঁর জীবন শেষ হতে দেখে খুব কষ্ট লাগছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু হুযাইফার জন্য দুআ করলেন।

হিদায়াতের বিষয়টি আল্লাহর হাতে, কেউ এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আবু হুযাইফা বলছিলেন তাঁর পিতা ছিলেন প্রজ্ঞাবান, যুক্তিবাদী, ভালো মানুষ আর দূরদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু এসকল গুণ থাকা সত্ত্বেও সে ঈমান আনেনি, যেমনটা আবু হুযাইফা আশা করেছিলেন। আবু তালিবের ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যাপার হয়েছিল। আবু তালিবের মধ্যে অসাধারণ কিছু গুণ ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু আবু তালিব মুসলিম হননি। আবু তালিব সারাজীবন আল্লাহর নবীকে আশ্রয় দিয়ে কাফির অবস্থায় মারা গেছেন, আর আবু সুফিয়ান দীর্ঘদিন আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ অবধি মারা যান মুসলিম হিসেবে। অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব ؓ প্রাথমিক যুগে ইসলামের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পরে মুসলিম হয়েছেন। অথচ উমার ইসলাম গ্রহণ করবেন এমনটা কেউ আশাও করেনি। তিনি যে শুধু মুসলিম হয়েছিলেন তা নয়, তিনি শ্রেষ্ঠ মুসলিমদের একজন হয়েছিলেন।

ভালোবাসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে হওয়া চাই। আবু হুযাইফা তাঁর পিতার পরিণতিতে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু এজন্য তিনি দুঃখে ইসলাম ছেড়ে যাননি বা কাউকে দোষারোপও করেননি। তিনি আল্লাহর ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছিলেন। ইসলামের অবস্থান পরিবার, সমাজ – সবকিছুর উপরে। যদি কারো কাছে সুন্দর করে দাওয়াহ পৌঁছানোর পরেও সে মুসলিম না হয় তাহলে অস্থির হওয়া উচিত নয়, কেননা এটা আল্লাহরই ইচ্ছা। আর যদি তারা মুসলিম হয় তাহলে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাদের পথ দেখিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো গোত্র বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সে স্থানের উপকণ্ঠে তিনদিন অবস্থান করতেন। বদর প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিন তিনি তাঁর উট প্রস্তুত করতে আদেশ দেন। এরপর তিনি হাঁটতে থাকেন। সাহাবারা ؓ তাকে বরাবরের মতো অনুসরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ গিয়ে দাঁড়ালেন আল-ক্বালীবের সেই কূয়ার কিনারায়। কূয়ায় নিক্ষিপ্ত ওই নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে তিনি ডাকতে শুরু করলেন। তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

'হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে, সেটাই কি তোমাদের জন্য ভালো হতো না? আমাদের রব আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের রব তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তোমরা তা সত্য পেয়েছ

কি?'[110]

এ কথা শুনে 'উমার ﷺ অবাক হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি এমন সব দেহের সাথে কি কথা বলছেন, যাদের রুহ নেই!' নবীজি ﷺ বললেন, 'সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তোমরা ওদের চাইতে বেশি শুনতে পাও না। কিন্তু ওরা জবাব দিতে পারে না।' আল্লাহ তাদেরকে অপমান ও তাচ্ছিল্য করতে, অনুশোচনা ও লজ্জা দিতে তাদের দেহে সাময়িকভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তাদের যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিতে আল্লাহ কথাগুলো তাদের শুনিয়েছিলেন।

মদীনায় বিজয়সংবাদ প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর বিজয়ের সংবাদ সবার কাছে পৌঁছে দিতে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা এবং যাইদ ইবন হারিসাকে মদীনায় পাঠান । আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা গেলেন মদীনার বহির্ভাগ আওয়ালিতে। সেখানে তিনি প্রত্যেক আনসারের বাড়িতে সংবাদ পৌঁছে দিলেন। আর যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে যাইদ ইবন হারিসা মদীনার একদম ভেতরে চলে গেলেন। যাইদ ইবন হারিসা রাসূলুল্লাহর ﷺ উটনীর পিঠে বসে নিহত কুরাইশ নেতাদের নাম ধরে ধরে বলতে লাগলেন 'উতবা ইবন রাবিয়াহ নিহত হয়েছে! আবু জাহেলও নিহত হয়েছে!' এভাবে ঘোষণা দিয়ে তিনি যখন উচ্ছ্বাসের সাথে মদীনায় প্রবেশ করছেন, তখন মদীনার মুনাফিক আর ইহুদিরা বলাবলি করতে লাগলো, 'এ লোক পাগল নাকি! সে যে কী বলছে সে তো নিজেই জানে না! তার মাথা ঠিক নেই, সে মনে হয় ভয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। তোমরা দেখেছ যাইদ কার উটের পিঠে চড়ে এসেছে? এটা মুহাম্মাদের উট, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ যুদ্ধে মারা গেছে। তা না হলে তার উট যাইদ পেল কী করে?' তারা এসব কথা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিল।

উসামা এবং উসমান বদরের যুদ্ধে অংশ নেননি। নবীজি ﷺ তাঁর কন্যা রুকাইয়ার দেখাশুনা করতে তাঁদের রেখে গিয়েছিলেন। উসামা তাঁর বাবা যাইদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা! আপনি যে খবর দিলেন তা কি সত্যি?' যাইদ বললেন, 'হ্যাঁ সত্যি!' এরপর লোকেরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যাইদ ইবন হারিসা যা বলছেন তা সত্য কি না। তিনিও বিজয়ের সংবাদ নিশ্চিত করলেন। তিনি জানালেন পরদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধবন্দীদের মদীনায় নিয়ে আসবেন।

মানুষজন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না কী ঘটেছে! ৩০০ জনের বাহিনী হাজার জনের বাহিনীকে পরাজিত করেছে, তাদের বড় বড় নেতাদের হত্যা করেছে – এটা এতই খুশির খবর যে তাদের ঠিক বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ

---

[110] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২।

বন্দীদের নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন। বন্দীদেরকে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী সাওদাহ ﷺ, যুদ্ধে বন্দী বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা সুহাইল ইবন আমরকে দেখলেন তার হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায়। তাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি যুদ্ধ করে ইজ্জতের সাথে মরতে পারলে না সুহাইল?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই কথা শুনে বললেন, 'সাওদাহ, তুমি কি তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলছো?' সুহাইলের মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্য সেদিন সেভাবে হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা ছিল লজ্জা আর অবমাননার বিষয়। তাই দেখে সাওদাহ কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল এভাবে অপদস্থ হওয়ার চেয়ে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে মরে যাওয়াই সুহাইলের মতো নেতার জন্য সাজে। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মস্ত বড় অপরাধ, এর মাঝে কৃতিত্ব নেই। সাওদাহ ﷺ তাঁর ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি আসলে তার এ অবস্থা দেখে একথা না বলে থাকতে পারছিলাম না।'[111] বদরে পরাজয়ের কারণে কুরাইশ নেতারা এতটাই অপমানিত আর অপদস্থ হয়েছিল যে রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীও শত্রুর করুণ অবস্থা দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফেরার পথে একবার যাত্রাবিরতি দেন। সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকেরা এসে তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। একজন আনসার তাদেরকে বললেন, 'আপনারা কেন আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন? আমরা তো লড়েছি কিছু টেকো বুড়োর সাথে। তারা মরতেই এসেছিল আর আমরা তাদের উটের মতো জবাই করেছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এভাবে বলতে নিষেধ করলেন, কারণ যারা নিহত হয়েছিল তারা যেমন-তেমন লোক ছিল না, তারা ছিল কুরাইশদের নেতা। সেই আনসার যোদ্ধার কাছে মনে হয়েছিল তাদের সাথে লড়াই করা ছিল খুব সহজ কারণ এই বয়স্ক নেতারা জানতোই না কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আসলে এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতা পাঠিয়েছেন বলে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ করা সহজ হয়েছিল। এই যুদ্ধে কুরাইশরাই ছিল শক্তিমত্তা ও অস্ত্রশস্ত্রের বিচারে এগিয়ে। যদি আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য না করতেন তবে মুসলিমরা হেরে যেতো।

---

[111] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৩।

বদর পরবর্তী মক্কা: শোক ও গ্লানি

এদিকে মক্কায় কুরাইশদের পরাজয়ের বার্তা পৌঁছে দেয় হায়সুমান ইবনে আবদুল্লাহ খুযাই। সে মক্কার দিকে ছুটে যায়। যারা যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের সবার নাম সে এক এক করে উল্লেখ করেছিল। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তখন মক্কাতেই ছিল। সে ভাবতেই পারলো না কুরাইশরা যুদ্ধে হেরেছে। সে হায়সুমানের বার্তা শুনে তার বন্ধুদের বলে, 'পাগল হয়ে গেল নাকি! তাকে আমার কথা জিজ্ঞেস করে দেখো তো সে কী বলে। আমার নাম বললে বুঝবে তার মাথা ঠিক নেই।' তাকে সাফওয়ানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে ঠিক ঠিক উত্তর দিল, 'সাফওয়ান তো মরেনি। সে বসে আছে কাবার হাতীমে। কিন্তু আমি তার বাবা এবং ভাইকে নিজ চোখে মরতে দেখেছি।' মক্কার লোকেরা বিশ্বাস করতে পারছিল না তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে হেরে গেছে। তাদের কল্পনাতেও আসেনি তাদের বড় বড় নেতারা এভাবে যুদ্ধে মারা পড়বে।

আবু লাহাবের মৃত্যু

কুরাইশদের মধ্যে যারা যুদ্ধে যায়নি, তাদের মধ্যে একজন ছিল আবু লাহাব। তবে সে তার বদলে অন্য একজনকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিল। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আবু লাহাবের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করেছেন মক্কার এক মুসলিম, রাফি। রাফি ছিলেন আল আব্বাসের একজন দাস, সে পরিবারের সবাই ছিল মুসলিম। রাফি, আল আব্বাস, আল আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফাদল - তারা প্রত্যেকেই মুসলিম ছিলেন। রাফির কাজ ছিল তীর বানানো। একদিন সে কাবার উঠানে বসে তীরে ধার দিচ্ছিল, আবু লাহাব তার সামনে পিঠ দিয়ে বসা। কুরাইশদের এক যোদ্ধাকে আসতে দেখে আবু লাহাব তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এসো, যুদ্ধে কী ঘটেছে আমাদেরকে জানাও'। লোকটি বললো, 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমরা নিজেদেরকে তাদের হাতে মরার জন্য আর বন্দী হওয়ার জন্য তুলে দিলাম। কিন্তু আমি আসলে এজন্য কাউকে দোষারোপ করবো না, কারণ আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করছিলাম তারা ছিল আকাশ ও যমীনের মাঝে ঘোড়ায় সওয়ারী সাদা পোশাক পরা কিছু পুরুষ। তাদের সাথে মোকাবেলায় আমরা কিছুতেই টিকতে পারছিলাম না।'

এই সৈন্য বলতে চাচ্ছিল যে, হ্যাঁ এটি সত্য যে কুরাইশরা হেরেছে কিন্তু এখানে মুসলিমদের কোনো কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব হলো আকাশ থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসা সাদা পোশাকধারী সেই লোকদের। তাদেরকে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছিল না। এই বর্ণনা শুনে রাফি নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারলো না। মনের অজান্তেই সে আবু লাহাবের সামনে বলে বসলো, 'আল্লাহর কসম! তাঁরা ছিলেন মালাইকা!' আবু লাহাব সে কথা শুনে রাফির মুখে ঘুষি মেরে বসলো। বদলা নিতে রাফিও এগিয়ে গেল। কিন্তু আবু লাহাব তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। সে রাফির উপরে বসে তাকে মারতে

লাগলো। তখন উম্মুল ফাদল লাঠি দিয়ে আবু লাহাবের মাথায় জোরে আঘাত করে তাকে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'কী মনে করেছো তুমি? তার মনিব নেই বলে তুমি তাকে যেভাবে খুশি মারতে পারবে?'

আবু লাহাব চলে গেল। এক সপ্তাহ পরের ঘটনা, আবু লাহাব এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তার মাথায় আঘাতের স্থান থেকে সারা শরীরে ঘা হয়ে যায়। এই রোগটি এমনই ভয়ানক ছিল যে, এই রোগের রোগীর কাছেও কেউ যেতো না। আবু লাহাব মারা গেল, কিন্তু কেউ তাকে কবর দিতে আসলো না। তিন দিন পার হয়ে গেল, তার শরীর পঁচতে শুরু করলো। আবু লাহাবের দুই ছেলেকে ডেকে বলা হলো, 'লজ্জা লাগে না তোদের? তিন দিন ধরে তোদের বাপ ঘরে মরে পড়ে আছে আর তোরা কেউ তাকে কবরও দিচ্ছিস না!' তারা বললো তারা ওই রোগের ভয়ে কাছে যেতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত তারা কোনোমতে আবু লাহাবের লাশ টেনে-হিঁচড়ে মক্কার বাইরে একটি দেওয়ালের কাছে ফেলে রাখলো এবং দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে তার মৃতদেহ ঢেকে দিল। তারা আবু লাহাবের জন্য কবর পর্যন্ত খোঁড়েনি। অপমানের সাথে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।[112]

শোক পালনে নিষেধাজ্ঞা

মুসলিমদের বিজয়ের উল্লাসে ভাটা দিতে কুরাইশরা আইন জারি করলো পরাজয়ের দুঃখে মক্কায় কেউ প্রকাশ্যে কান্নাকাটি করতে পারবে না। কারো স্বজন হারানোর দুঃখে বিলাপ করতে পারবে না। তারা মুক্তিপণের বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেও সবাইকে নিষেধ করে দেয়, যেন মুক্তিপণের মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া না হয়। ইবনে কাসির এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'আমি মনে করি, যারা মরেছে তারা তো শাস্তি পেয়েছেই, উপরন্তু যারা জীবিত ছিল তাদেরও আল্লাহ শাস্তি দিলেন কাঁদতে না দেওয়ার মাধ্যমে। কেননা কান্না বেদনার্ত অন্তরকে শান্ত করে।' অর্থাৎ বিলাপের এই নিষেধাজ্ঞা জীবিত কুরাইশদের জন্য এক প্রকার শাস্তি হিসেবে কাজ করে।

এরপর ইবনে কাসির বলেন যে, ইবন ইসহাক বলেছেন, 'মক্কার আল আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব বদরের যুদ্ধে তার তিন পুত্রকে হারায়। এই লোকটি ছিল অন্ধ এবং বৃদ্ধ। তিন পুত্রকে হারিয়ে সে প্রবল শোকাহত। কিন্তু এই মানুষটিকেও ছেলের মৃত্যুতে কাঁদার অনুমতি দেওয়া হয়নি। একরাতে এক মহিলার কান্নার আওয়াজ শুনে সে বললো, 'যাও খোঁজ নিয়ে আসো কাঁদার উপর নিষেধাজ্ঞা এখনো আছে কি না। কুরাইশরা কি তাদের নিহত স্বজনদের জন্য কাঁদবে না? তাহলে আমি আমার বড় ছেলে আবু হাকিমের জন্য কাঁদতাম, কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।' খোঁজ নিয়ে জানা

---

[112] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৬।

গেল সেই মহিলা তার উট হারানোর দুঃখে কাঁদছে। এরপর আল আসওয়াদ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো,[113]

মহিলা কাঁদছে হায় উট হারালো তাই, উটের শোকে তার বুঝি চোখে ঘুম নাই।
উটের জন্য কাঁদিসনে যদিও তা হারিয়েছে, বদরের কথা ভেবে কাঁদ,
ওরে কপাল পুড়েছে।

এই বৃদ্ধ লোকটি তার তিন সন্তানদের জন্য কাঁদারও অনুমতি পায়নি কারণ কাফিররা চাচ্ছিল না মুসলিমরা জানুক যে কাফিররা দুঃখ করছে। তারা ভাব ধরছিল যে তারা নিহত স্বজন বা মুক্তিপণ বা বন্দীদের ব্যাপারে কোনো পরোয়াই করছে না।

গনিমাহ: বিরোধ ও বিধান

সূরা আনফাল নাযিল হয়েছিল বদরের যুদ্ধের পর। সূরা আল আনফালের প্রথম আয়াত সম্পর্কে উবাদাহ ইবন সামিত বলেন, 'এটি নাযিল হয়েছিল আমাদের মুসলিমদের ব্যাপারে। তখন আমরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে বিতর্ক করছিলাম।' এই যুদ্ধে মুসলিমদের একদল রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিরাপত্তা দিচ্ছিল। দ্বিতীয় দল শত্রুদের ধাওয়া করছিলো, আর তৃতীয় দল যুদ্ধের গনিমতের মাল সংগ্রহ করছিল। যারা গনিমতের মাল সংগ্রহ করেছিল তাঁরা বললো গনিমতের মালের তারাই মালিক। যারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিরাপত্তা দিয়েছিলো তারা বললো এই সম্পদে তাদেরও ভাগ আছে কারণ তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিরাপত্তার বিষয়টি দেখেছে। আর তৃতীয় দল যারা শত্রুদের ধাওয়া করেছিলো তারা বললো যদি তারা শত্রুর মোকাবেলা না করতো তাহলে কেউ কিছুই পেত না। তারা সকলে বিষয়টি নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ আযযাওয়াজাল নাযিল করলেন নিম্নোক্ত আয়াত:

> "লোকেরা আপনাকে গণিমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলে দিন, গণিমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের জন্য। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা আনফাল, ৮: ১)

অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের ﷺ হাতে। বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল সম্পদ আল্লাহর রাসূলকে ﷺ দেওয়া হয়েছিল, একেবারে সব কিছুই। এই আয়াতটি মুজাহিদদের ৩টি শিক্ষা দিচ্ছে, তাকওয়া, ঐক্য এবং আনুগত্য। প্রথম শিক্ষা হলো, "আল্লাহকে ভয় করো...", অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে মুজাহিদদের ভয় থাকতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য তাকওয়া জরুরি। তা না হলে

---

[113] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৭।

সূচিপত্র

সেটা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হবে না, অন্য উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ঐক্য বা নিয়ম শৃঙ্খলা – 'নিজেদের সম্পর্ককে সুষ্ঠু সুন্দর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করো', অর্থাৎ মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকা, মুজাহিদদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকতে হবে। তৃতীয় শিক্ষা এই ছিল যে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো' – মু'মিন হওয়ার জন্য অবশ্যই আল্লাহ্ আর তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ্ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনের ব্যাপারে বিধান জারি করেন।

> **"আর জেনে রাখ যে, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং যা আমরা আমাদের বান্দার কাছে নাযিল করেছি সেই ফুরকানের দিনে, যেদিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল – আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪১)**

অর্থাৎ, গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ বা শতকরা আশি ভাগ বণ্টন করা হবে সৈনিকদের মাঝে। পদাতিক সৈন্যরা পাবে এক ভাগ, আর অশ্বারোহী সৈনিকরা পাবে তিন ভাগ।

বাকি বিশ ভাগকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে, প্রতিটি ভাগে শতকরা ৪ ভাগ। এই পাঁচটি ভাগ হলো,

১) আল্লাহর জন্য

২) রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য

৩) রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট আত্মীয়দের জন্য

৪) এতিম, অভাবগ্রস্তদের জন্য

৫) মুসাফিরের জন্য

এখন আল্লাহ্ আর তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য যে ৮ ভাগ নির্ধারিত তা ইসলামের কল্যাণের যেকোনো কাজে খরচ করা যাবে। যেমন, মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি। এই ব্যাপারে খলিফা বা ইমামের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

যুদ্ধবন্দি

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের ৭০ জন মুসলিমদের হাতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ে। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরা ডাকলেন। তিনি সাহাবীদের ﷺ থেকে মতামত শুনলেন। আবু বকরের ﷺ মত ছিল,

"হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এরা তো আমাদের আত্মীয় এবং আমাদের গোত্রেরই লোক। আমার মতে আপনি এদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিন। মুক্তিপণ হিসেবে আমরা যা পাবো, তা আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবো। আর এমনও হতে পারে, আল্লাহ তাআলা এদেরকে হিদায়াত দেবেন আর তারা একদিন মুসলিম হবে।'

উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ দ্বিমত পোষণ করলেন, তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এরাই আপনাকে আপনার ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে, আপনাকে মিথ্যাবাদী অপবাদ দিয়েছে। আমি আবু বকরের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। এদেরকে এখানে আনুন আর এক এক করে গর্দান ফেলে দিন।' উমার তাঁর এক আত্মীয়ের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, 'একে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি একে মেরে ফেলি। আকীলকে তুলে দিন তার ভাই আলীর কাছে, আলী তার ভাইকে হত্যা করুক। হামযার হাতে তুলে দিনে হামযার ভাইকে, হামযা তাকে হত্যা করুক। এতে করে আল্লাহ জানবেন মুশরিকদের প্রতি আমাদের কোনো সমবেদনা নেই। এই লোকগুলো হলো নাটের গুরু, কাফেরদের নেতা।'

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ মত দিলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি এমন এক জায়গা বের করুন যেখানে অনেক গাছপালা আছে, আপনি সেখানে তাদের ঢুকিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিন।'

যে যার মত দিল। বিভিন্ন জনের মত শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন না কী করবেন। তিনি নিজে একা একা কিছুক্ষণ ভাবার জন্য সময় নিলেন। এসে দেখলেন মুসলিমরা দুইটি মতে স্থির হয়েছে, আবু বকর ﷺ এবং উমারের ﷺ মত। তিনি তখন এই দু'জন সাহাবীর ﷺ চারিত্রিক দিক সবার সামনে তুলে ধরলেন, 'আবু বকর হলো নবী ইবরাহীমের ﷺ মতো। তিনি বলেছিলেন, 'যারা আমার অনুসরণ করবে তারা আমার সাথে আর যারা আমার অনুসরণ করে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আবু বকর হলো ঈসার ﷺ মতো, তিনি বলেছিলেন, 'তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তারা তো তোমারই গোলাম আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।'

অর্থাৎ আবু বকর ﷺ ছিলেন নবী ইবরাহীম ও ঈসার মতো যারা তাদের কওমের প্রতি দয়ালু ছিলেন। রাসূল ﷺ এরপর বললেন উমারের কথা, 'উমার হচ্ছে নূহের মতো, তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ এই জমিনে তুমি কাফিরদের ছেড়ে দিও না। উমারের

উদাহরণ হলো মূসা নবীর মতো। তিনি বলেছিলেন 'হে আল্লাহ্ তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে দাও এবং তাদের অন্তরকে শক্ত করে দাও যেন তারা আযাব আসার আগে ঈমান না আনে।'[114]

এই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের পরিবার-পরিজন আছে, তাদের দেখাশোনার ব্যাপার আছে। কাজেই তোমরা মুক্তিপণ আদায় করো, মুক্তিপণের টাকা ছাড়া যেন কেউ মুক্তি না পায়। আর যদি মুক্তিপণ না দেয়, তাহলে তাদের মেরে ফেলো।'

শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের ﷺ মতই গ্রহণ করলেন। পরদিন সকালে উমার ﷺ গেলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে। গিয়ে দেখেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদছেন, সাথে কাঁদছেন আবু বকরও ﷺ । তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি এবং আপনার সাথি কাঁদছেন কেন, কী হয়েছে? আমাকে বলেন কেন কাঁদছেন, আমিও কাঁদি। যদি কান্না না পায় তাহলে জোর করে হলেও কাঁদবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করায় তোমার সঙ্গীদের উপর যে আযাব পেশ করা হয়েছে, তা দেখে কাঁদছি।' তিনি একটা গাছ দেখিয়ে বললেন, 'ওদের ওপর যে আযাব আপতিত হতে পারতো তা এই গাছের চেয়েও নিকটবর্তী করে আমাকে পেশ করা হয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন যে মুসলিমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেননি। তিনি বলেছেন,

> "নবীর জন্য এটা সঙ্গত নয় যে, তাঁর নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি শত্রুদের ব্যাপকভাবে পরাজিত করবেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। যদি আল্লাহর লিখন নির্ধারিত না হয়ে থাকতো তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করেছো, তাতে তোমাদের উপর কোন বড় শাস্তি এসে পড়তো।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬৭, ৬৮)

আল্লাহ বলছেন রাসূলুল্লাহর ﷺ উচিত ছিল বন্দীদের হত্যা করা, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সেটাই চেয়েছেন। সে সময়ে মুসলিমদের ইসলামি রাষ্ট্রের বয়স খুব বেশি নয়। একটি নবগঠিত রাষ্ট্র হিসেবে মুসলিমদের উচিত শুরু থেকেই দাপট দেখানো, ক্ষমতার প্রদর্শনী করা। মুক্তিপণ আদায় করা হলে কাফিররা মুসলিমদের তেমন সমীহের চোখে দেখবে না। কিন্তু যদি মুসলিমরা তাদের বন্দীদের হত্যা করতো, তাহলে তারা অনেক বেশি ভয় পেত এবং মুসলিমদের সমীহ করা শিখত।

---

114 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৮।

যদিও আল্লাহ তাদের এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করেননি, তথাপি তিনি মুসলিমদেরকে কোনো শাস্তি দেননি। 'মৃদু ধমক' দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ মুক্তিপণ নেওয়াকে আল্লাহ আগেই হালাল হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।

"অতএব তোমরা যে গণিমত নিয়েছ, সেটিকে হালাল ভেবে খাও, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬৭, ৬৮)

'মুতআম ইবনে আদি যদি জীবিত থাকতো আর এসকল যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতো, আমি তাহলে তার সম্মানে এদের সকলকে মুক্ত করে দিতাম।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বলেছিলেন আল মুতআম ইবনে আদি সম্পর্কে। মুতআম ইবন আদী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিরাপত্তা দিয়ে কাবাঘর তাওয়াফের জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি অমুসলিম ছিলেন, তারপরেও তার সততা ও মুসলিমদের প্রতি সদাচরণের কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। শুধু এক ব্যক্তির কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের সব যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সে অনুযায়ী আচরণ করতেন। তিনি কঠোরতা দেখিয়েছেন, তিনি নম্রতাও দেখিয়েছেন। তিনি ভালো মানুষদের প্রতি সদয় ছিলেন এবং খারাপ মানুষদের সাথে যথোচিত আচরণ করতেন।

তাই মুসলিমদের এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা কাফিরদের প্রতি কেবল নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শন করবে। আবার এমন আচরণ ও কাম্য নয় যে তারা নমঃনমঃ হয়ে কেবল তাদের খুশি করার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে। একজন মুসলিমের উচিত পরিস্থিতি বিবেচনা করা এবং বিচক্ষণের মতো কাজ করা। এক জন মানুষের আবেগকে বশ করা শিখতে হবে। লোকে কী ভাবছে সে ব্যাপারে অতি-উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

কটুক্তিকারীদের পরিণতি

৭০ জন বন্দীদের মধ্য থেকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আলাদা করে দুই ব্যক্তিকে বেছে নিলেন। তারা হলো উকবা ইবন আবি মুয়াইত এবং নযর ইবনে হারিস। রাসূলুল্লাহ ﷺ উকবাকে ডাকলেন, উকবা অবাক হয়ে বললো, 'আমি কেন আল্লাহর রাসূল! সবার মধ্য হতে আমাকে মেরে ফেলতে চান কেন? যদি বাদ বাকি সবাইকে মেরে ফেলতে চান তাহলে আমাকেও তাদের সাথে মেরে ফেলুন। আর যদি বাকিদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেন, তবে আমার সাথেও তাই করুন। আপনি সবার মাঝে কেবল আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য বাছাই করছেন কেন?' রাসূলুল্লাহ

ﷺ বললেন, 'তোমাকে হত্যা করার কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি তোমার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও শত্রুতা।' এরপর উকবা বলে উঠলো, 'তবে কে আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললে, 'আগুন! আসিম, যাও তাকে টেনে নিয়ে যাও। তার মস্তক কর্তন করো।'

আসিম ইবন সাবিত ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে উকবার শিরচ্ছেদ করলেন। আর নযর ইবনে হারিসকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন আলী ইবন আবি তালিব। এই দুইজন মানুষকে তাদের দুষ্কর্মের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করা হয়েছিল।

ইবনে কাসির মন্তব্য করেন, 'আমি শুধু এ কথাই বলব যে, এই দুই লোক ছিল আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য, অবাধ্য, খারাপ, হিংসুটে এবং কট্টর কাফের। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো। আল্লাহ তাআলা প্রকৃতপক্ষেই তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন।'

কী ছিল তাদের অপরাধ?

উকবা ইবন আবি মুয়াইত কাবার পাশে নামাজরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ওই মুহূর্তে তাঁর মনে হচ্ছিল যেন উনার চোখ কোটর থেকে বের হয়ে আসবে আর তিনি মারা যাবেন। এই একই লোক অন্য আরেকদিন রাসূলুল্লাহর ﷺ রুকুরত অবস্থায় তাঁর উপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। ফাতিমা ﷺ এসে সেগুলো সরান। কুরাইশদের মধ্যে উকবা ছিল জঘন্য এক শয়তান। তাই তার শাস্তি ছিল কঠোর।

নযর ইবনে হারিস রাসূলুল্লাহর ﷺ গায়ে হাত দেয়নি কিংবা মুসলিমদেরকে নির্যাতন করেনি। তার অপরাধ ছিল সে ইসলামের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। সে যুগে সাহিত্য চর্চা হতো মুখে মুখে। সে পারস্য থেকে ইসবান্দিয়া আর রুস্তমের গল্প শিখে মক্কায় ফিরে এসে সে সব গল্পের আসর বসায় আর দাবি করতে থাকে তার গল্প মুহাম্মদের গল্পের চেয়ে সেরা। সে মানুষদের বলতো: 'মুহাম্মদের কী এমন আছে যে সে নবী হয়ে গেল? আমি নযর ইবনে হারিসও তো তার মতো করে গল্প বলতে পারি!' এভাবে করে সে মানুষকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মজলিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নানারকম কারসাজি করতো।

সকল যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কেবল এই দুইজনকে হত্যা করা হয় আর বাকিদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের ﷺ বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, 'যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদয় আচরণ করো।' মুসআব ইবন উমাইরের ভাই আবু আযীয বলেন, 'আনসারদের এক দল আমাকে বদর থেকে নিয়ে ফিরছিল। দুপুর ও রাতের খাবারের সময় হলে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে রুটি দিয়ে আপ্যায়ন করলো আর নিজেরা খেজুর খেল। তাদের হাতে যতগুলো রুটির টুকরা ছিল সেগুলোর সবকটি তারা

আমাকে খেতে দেয়। আমি খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। রুটিগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চাইলাম, কিন্তু তারা সেগুলো স্পর্শও করেনি, আমাকেই আবার ফিরিয়ে দেয়।' রুটি ছিল খেজুরের থেকে ভালো মানের খাবার আর আনসাররা রুটি না খেয়ে খেজুর দিয়ে ভোজ সারছিলেন অথচ বন্দীদেরকে রুটি দিচ্ছিলেন।

এ ব্যাপারে ইবনে হিশাম মন্তব্য করেন, 'এই আবু আযীয ছিল বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকাবাহক।' সে কোনো সাধারণ পদাতিক সৈন্য ছিল না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে ﷺ এই ধরনের মানুষের সাথেও ভালো ব্যবহারের আদেশ করেন।

আরেক যুদ্ধবন্দী আল-ওয়ালিদ ইবন মুগীরাও প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছে, 'আমরা চড়তাম ঘোড়ার পিঠে আর তারা হাঁটতো।' অনেক বন্দী মুসলিমদের কাছ থেকে এরকম ভালো আচরণ পেয়ে মুসলিম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধ জীবনে এটা ছিল সাধারণ ঘটনা। অনেক যুদ্ধবন্দী মুসলিমদের কাছ থেকে ভালো আচরণ পেয়ে মুসলিম হয়ে তাদের সাথে থেকে যায়।

কোনো কোনো যুদ্ধবন্দী ইসলাম গ্রহণ করে বিষয়টা গোপন রাখতো। তারা মুসলিমদের সাথে না থেকে ইচ্ছে করেই নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতো আর তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফিরে এসে মুসলিম হতো। তারা নিজ গোত্রকে এটা দেখাতে চাইতো যে, তারা তরবারির ভয়ে মুসলিম হয়নি। যেমনটা হয়েছিল আবু আযীযের ক্ষেত্রে। সে ভালো আচরণ পেয়ে মুসলিম হয়েছে। কাজেই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করাটা জরুরি, হোক সেটা শত্রুর সাথে। মুসলিমদের উচিত শত্রুদের ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মানের সাথে আচরণ করা। একজন মুসলিম নিষ্ঠুর, অসৎ কিংবা প্রতারক হবে না। সে সততা ও সম্মান দিয়ে সকলের সাথে আচরণ করবে। তার মধ্যে কোনো লুকোছাপা থাকবে না। সে খোলাখুলি কথা বলবে। তবে যারা নির্দয় আচরণ পাবার যোগ্য তারা ব্যতিক্রম; এদের সাথে ভালো আচরণ করার কোনো কারণ নেই। এদের সাথে নম্রভাবে আচরণ করা হলো বোকামি। কেননা এরা সত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং মুসলিমদের ক্ষতি করে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো মুসলিম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'কুরাইশ বাহিনীর সাথে আপনার অবস্থান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। আপনার অন্তর ইসলাম গ্রহণ করেছে কি না তা আল্লাহই ভালো জানেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন। একটা মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই তাকে বিচার করতে হবে। কার হৃদয়ে কী আছে তা এক আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ছাড়া কেউ জানে না। মুসলিমরা এটাই দেখেছে যে, আল-আব্বাস কুরাইশদের পক্ষ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি শত্রুবাহিনীর সাথে

যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন, কাজেই তাঁকে শত্রু হিসেবেই বিচার করা হয়েছে, মুখের কথার উপরে নয়। খলিফা হওয়ার পর উমার ইবন খাত্তাব ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে একদিন বললেন,

'আল্লাহর রাসূলের যুগে আল্লাহর পক্ষ হতে ওয়াহী নাযিল হয়ে কখনো কখনো জানিয়ে দেওয়া হতো কার হৃদয়ে কী আছে। সে হিসেবে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানের কথা ভিন্ন, এখন আমরা কাউকে প্রকাশ্যে যা করতে দেখি তার উপর ভিত্তি করে বিচার করবো। যাকে আমরা ভালো কাজ করতে দেখি তাকে আমরা বিশ্বাস করবো এবং প্রাধান্য দেব। গোপন কাজের জন্য আমরা কাউকে পাকড়াও করবো না, সে বিচার আল্লাহ করবেন। কিন্তু আমরা এমন কাউকে বিশ্বাস করবো না যে প্রকাশ্যে খারাপ কিছু দেখায়, যদিও সে দাবি করে তার নিয়ত ভালো।'

এটি ইসলামের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। কার হৃদয়ে কী চলছে তার উপর ভিত্তি করে কোনো মানুষকে বিচার করা উচিত নয়। আমরা তাদের কাজকর্ম দেখে বিচার করব।

আল-আব্বাসের কাছে মুক্তিপণ চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আপনি মাটির নিচে যে টাকা রেখেছেন সেটার কী হলো? আপনি আপনার স্ত্রী উম্মে ফাদলকে বলে রেখেছেন, 'যদি আমি মারা যাই, তাহলে এই অর্থ খরচ করবে।'' আল-আব্বাস বললেন, 'আমি সাক্ষী এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি এবং আমার স্ত্রী ছাড়া এই গুপ্তধনের কথা কেউ জানে না।' এরপর আল-আব্বাস তাঁর মুক্তিপণ পরিশোধ করলেন। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আয়াতটি প্রকাশ করেছেন।

> "হে নবী, যারা আপনার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় (তাহলে আপনি ভাববেন না), এরা তো এর আগে আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অতঃপর তিনি তাদের উপর তোমাদের বিজয় দান করেছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী।" (সূরা আনফাল, ৮: ৭০)

যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করেছিল এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি পেয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলছেন, যদি তারা আসলেই মুসলিম হয়, তাহলে তাদের থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ যা কিছু মুক্তিপণ হিসেবে নিয়েছেন, আল্লাহ তার থেকে বেশি কিছু তাদের ফিরিয়ে দেবেন। আল-আব্বাস বললেন, 'আমি আমার

মুক্তিপণের জন্য ২০ উকিয়া স্বর্ণ পরিশোধ করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার আরো অনেক বেশি।'

আবুল আস ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা যাইনাবের ؓ স্বামী। আবুল আস ছিল কাফির। মুসলিমদের সাথে মুশরিকদের বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার আগেই তার সাথে যাইনাবের বিয়ে হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হয়েছিল। মক্কায় অবস্থানকারী যাইনাব তাঁর স্বামীকে মুক্ত করতে চাইলেন।

যাইনাব ؓ তাঁর স্বামীকে মুক্ত করার জন্য অনেক অর্থ পাঠিয়ে দেন। সাথে দিলেন তাঁর গলার হার। এই হার তাঁর মা খাদিজা ؓ বিয়ের সময় তাকে উপহার দিয়েছিলেন। মুক্তিপণ হিসেবে পাঠানো এই হার দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যান। যে আনসার আবুল আসকে বেঁধে রেখেছিল তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যদি আবুল আসকে তার স্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং তার স্ত্রীর জিনিস তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক মনে করো, তবে তা-ই করো।' তারা তৎক্ষণাৎ আবুল আসকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিল। গলার হারটিও ফেরত পাঠানো হয়।

তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। শর্তটি হলো আবুল আস আর কখনোই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে সাহায্য করবেন না এবং মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাইনাবকে পাঠিয়ে দেবেন। আবুল আস তার কথা রেখেছিল। সে মক্কায় ফিরে গিয়ে যাইনাবকে মক্কা ছেড়ে তাঁর বাবার কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

এরপর যাইনাব মক্কা ত্যাগের পরিকল্পনা করেন। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে তাঁর দেবর কিনানা ইবনে রাবী'আ একটি উট নিয়ে আসেন। উটের পিঠে 'হাউদাহ'তে যাইনাব চড়ে বসেন। হাউদাহ হলো উটের পিঠে বসার জন্য বানানো আসন। কিনানের সাথে তাঁর তীর-ধনুক ছিল। সে যাইনাবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন ছিল দিনের বেলা। কিছু কুরাইশ তাদেরকে দেখতে পেয়ে আটকানোর সিদ্ধান্ত নিল। তারা যাইনাবের পিছু নিয়ে দুতুয়া নামক স্থানে তাদের ধরে ফেললো। হাব্বার ইবনে আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব নামক এক লোক বর্শা দিয়ে যাইনাবকে ভয় দেখায়। যাইনাব হাউদাহ থেকে পড়ে যান। এতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। কিনান তার তূণীর থেকে তীর বের করে সবাইকে হুমকি দিলেন, 'আল্লাহর কসম, যদি কেউ আমার কাছে আসে তবে আমি তাঁর দিকে তীর ছুঁড়বো।' তখন অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে দ্রুত সরে যায়। তখন আবু সুফিয়ান সেখানে অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের নিয়ে পৌঁছে বললো, 'তোমার তীর নামিয়ে রাখো, আমরা তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

কিনান তাঁর অস্ত্র নামিয়ে রাখলেন। আবু সুফিয়ান এসে বললো,

'তুমি কাজটি ভালো করোনি কিনান। মুহাম্মাদ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। তা সত্ত্বেও এক মহিলাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছ। আর সেটাও প্রকাশ্য দিবালোকে। তুমি আর অন্য কাউকে নয়, বরং মুহাম্মাদের মেয়েকে প্রকাশ্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিচ্ছ। লোকেরা দেখে ভাবছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা আজকে দুর্বল, অপমানিত। তাই সবার সামনে এভাবে তুমি এই কাজ করছো। তোমার এই কাজ আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ করছে। আমি শপথ করে বলছি আমরা যাইনাবকে তাঁর বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই না, আমরা প্রতিশোধও নিতে চাই না। কিন্তু তোমার উচিত প্রকাশ্যে নয়, বরং গোপনে তাকে তাঁর বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসা।'

তৎকালীন কুরাইশরা ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হলেও মুসলিম মহিলাদের সম্মান করতো। এটুকুও আজকের যুগে কাফিরদের থেকে দেখা যায় না।

বদর যুদ্ধের আরেক বন্দী ছিল আবু আযযা। সে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো আমার আর্থিক অবস্থার কথা জানেন। আমি দরিদ্র এবং আমার পরিবার আছে। আমার প্রতি দয়া করুন।' আবু আযযা ছিল গরিব। তার মেয়েদের দেখাশোনা করার প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে এক শর্তে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করবে না। বদরে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ। কিন্তু এরপর যদি কখনো তোমাকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয় তুমি তাতে অস্বীকৃতি জানাবে।' আবু আযযা এই শর্তে রাজি হয়। ফলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে প্ররোচিত করে এবং তাকে যুদ্ধে আনতে সক্ষম হয়। আবারো সে মুসলিমদের হাতে ধরা পড়ে। এবারও সে দারিদ্র্যের ছুতো দিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু রাসূল ﷺ এবার আর তাকে কোনো সুযোগ দিলেন না। তিনি বললেন, 'তুমি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলবে আমি মুহাম্মাদকে দু'বার ধোঁকা দিয়েছি - এ সুযোগ তোমাকে আমি দেব না।'

মুহাম্মাদ ﷺ আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। তাকে সহজে ঠকানো বা প্রতারিত করা যেতো না। তিনি দয়ালু, সহানুভূতিশীল, সহিষ্ণু ছিলেন সত্যি, কিন্তু কেউ তার সরলতার সুযোগ নিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করবে - এটা তিনি মেনে নিতেন না। আবু আযযাকে সেখানেই শিরচ্ছেদ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মু'মিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।' এটি মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। একজন মুসলিমের এতটা সরলমনা হওয়া উচিত নয় যে সে যা শুনবে তা-ই বিশ্বাস করবে এবং মিডিয়ার চটকদার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। কারা ইসলাম ও মুসলিমদের উপকার করে এবং কারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করে -এ ব্যাপারে একজন মুসলিমের সতর্ক থাকা উচিত।

সুহাইল ইবন আমর ছিলেন কুরাইশদের উচ্চবংশীয় এক নেতা। যুদ্ধে তাঁকে একজন বন্দী হিসাবে আটক করা হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণায় তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর

বাগ্মিতা ও সুশীল ভাষা ব্যবহার করে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ছড়াতেন। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমাকে অনুমতি দিন আমি সুহাইল ইবন আমরের সামনের দুটো দাঁত ফেলে দিই। তার জিহ্বা ঝুলে থাকবে। সে আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে আজেবাজে বকতে পারবে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, আমি তার অঙ্গহানি করবো না, কেননা তাতে আল্লাহ আমার অঙ্গহানি করতে পারেন।' শত্রুর সাথে এরূপ ব্যবহার করা ইসলামি পন্থা নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হতে পারে সে কোনোদিন এমন অবস্থানে থাকবে যেদিন তার সমালোচনা করার সুযোগ তোমার থাকবে না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আশা করছিলেন হয়তো একদিন ইসলামের পক্ষেই সুহাইল কথা বলে উঠবে। আল্লাহর রাসূলের এই আশা সত্যি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর আরব গোত্রগুলো যখন ইসলাম ত্যাগ করে তখন এই সুহাইল ইবন আমরের কারণে মক্কার লোকেরা ইসলামের উপরে দৃঢ় ছিল। তিনি বলতেন, 'হে কুরাইশের লোকজন! সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করে সবার আগে তা ত্যাগ করে বসো না। যার উপরে আমাদের সন্দেহ জাগবে, তার শিরচ্ছেদ করা হবে।' এই কথাগুলো মক্কার লোকজনকে ইসলামের প্রতি অটল থাকতে সাহায্য করে।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যাদের অক্ষরজ্ঞান ছিল তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যদি তুমি দশজনকে পড়তে ও লিখতে শেখাতে পার, তবে সেটাই তোমার মুক্তিপণ হবে।' শিক্ষা ও সাক্ষরতার উপর ইসলামের গুরুত্ব এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান

যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য কী হবে তা নির্ভর করবে মুসলিম ইমামের সিদ্ধান্তের উপর। তিনি চারটি কাজের যেকোনো একটি করতে পারেন।

১) তিনি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন

২) তাদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিতে পারেন

৩) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিদান করতে পারেন

৪) যুদ্ধবন্দীদের দাস বানাতে পারেন

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মুসলিমদের নিজস্ব শরীআহ আছে। এই ব্যাপারে পার্থিব মানবরচিত আইন মানতে মুসলিমরা বাধ্য নয়। মুসলিমরা কেবল তাদের নিজস্ব শরীআহ মানতে বাধ্য, জেনেভা কনভেনশান নয়।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের ﷺ মর্যাদা

বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা ﷺ বিশেষ সম্মানে সম্মানিত। জিবরীল রাসূলুল্লাহকে ﷺ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'বদরে অংশ নেওয়া সাহাবীদের ﷺ আপনি কী হিসেবে বিবেচনা করেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, 'মুসলিমদের মধ্যে তারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।' জিবরীল বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়া ফেরেশতারাও অনুরূপ।' বদর শুধু মুসলিমদের জন্য নয় বরং সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতাদের জন্যেও বিশেষ একটি ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে হাতিব ইবন আবি বালতাহর একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। তিনি ছিলেন বদরে অংশ নেওয়া সাহাবী। কিন্তু একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মক্কার লোকেদের কাছে রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কা অভিযানের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়ে একটি চিঠি পাঠান। কাজটি তিনি করেছিলেন নিজের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য। এ খবর জানাজানি হলে, উমার ইবন খাত্তাব ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে মেরে ফেলি। সে একটা মুনাফিক!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'উমার, সম্ভবত আল্লাহ বদরের লোকজনদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, তোমরা যা খুশি কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' এই কথা শুনে উমারের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। শুধুমাত্র বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কারণে একটি বড় অপরাধ করেও হাতিব ইবন আবি বালতাহ মাফ পেয়ে যান।

বদর যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব

মুনাফিকদের উত্থান

বদরের যুদ্ধের পর নতুন এক শ্রেণির মানুষের উদ্ভব হয়, *আল-মুনাফিকুন*। মদীনার অনেক লোক মুসলিমদের বিজয় দেখে খুশি হতে পারেনি। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা ঘোষণা দেওয়ার মতো সাহস বা শক্তি তাদের ছিল না। তারা প্রকাশ্যে ইসলামকে স্বীকৃতি দিল ঠিকই কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তাদের মনের অবস্থা বোঝার উপায় ছিল না। তারা মুসলিমদের মতোই সালাত পড়তো, রোজা রাখতো, এমনকি যাকাতও দিত। কিন্তু মন থেকে তারা ইসলামকে অপছন্দ করতো, মুসলিমদের ঘৃণা করতো এবং চাইত যেন ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরা হচ্ছে মুনাফিক। তখন আধিপত্য ছিল ইসলামের আর মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী। তাই তারা মনের কথা ব্যক্ত করার সাহস করতো না।

এই মুনাফিকরা তখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। সকল শত্রুদের মধ্যে তারাই ছিল সবচেয়ে বিপদজনক, কেননা তারা মুসলিমদের সাথে থাকতো এবং তাদের কাছে সব খবরাখবর থাকতো। তারা এই তথ্যগুলো বহিঃশত্রুদের কাছে পাচার করে দিত। এদেরকে শায়েস্তা করা সহজ ছিল না। কারণ

তারা তাদের কুফরি প্রকাশ করতো না। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহও ﷺ এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না।

গুপ্তহত্যার চেষ্টা

উমাইর ইবনে ওয়াহাব ছিল কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম নিকৃষ্ট লোক। একদিন সে সাফওয়ান ইবন উমাইয়ার সাথে কাবার পাশে বসে বলছিল, 'যদি আমার এত ঋণ না থাকত, যদি বাচ্চাকাচ্চাদের দেখাশোনা করতে না হতো, তাহলে আমি নিজেই মুহাম্মদকে গুপ্তহত্যা করতাম।' সাফওয়ান এই কথার সুযোগ নিয়ে বললো, 'তুমি চিন্তা কোরো না, আমি আছি। যদি তোমার কিছু হয়, আমি তোমার ঋণ শোধ করে দেব আর তোমার বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করবো।'

উমাইর ইবনে ওয়াহাব সাফওয়ানের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলো যে, সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যা করতে মদীনায় যাবে। উমাইর তার তরবারী বিষের মধ্যে ভালো করে চুবিয়ে বিষ মাখিয়ে নিল। তারপর সেটি নিয়ে মদীনায় গেল। মদীনার রাস্তায় সে হাঁটছে, পথিমধ্যে পড়লো একটি ছোটখাট সমাবেশ। সেখানে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ কিছু লোকের সাথে বদর যুদ্ধ নিয়ে গল্প করছিলেন। মুসলিমদের মাঝে তখনো বদরের রেশ কাটেনি, সবার মুখে বদর নিয়ে কথা। যারা বদরে অংশ নেয়নি তারা আগ্রহভরে উমারের মুখে বদরের কথা শুনছে।

উমাইর ইবনে ওয়াহাবকে দেখে উমার ﷺ বলে উঠলেন, 'আল্লাহর দুশমন উমাইর ইবনে ওয়াহাব ভালো কোনো উদ্দেশ্যে এখানে আসেনি।' এই বলে উমার ﷺ সেখান থেকে উঠে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন আর খাপ থেকে তরবারী বের করে তার গলায় ঠেকালেন। তারপর তাকে ধরে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিয়ে গেলেন আর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর এই শত্রু এখানে কোনো ভালো উদ্দেশ্যে আসেনি!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'উমার, তাকে ছেড়ে দাও, আমি দেখছি বিষয়টা।' উমার ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু অন্যান্য সাহাবাদের ﷺ বলে দিলেন তারা উমায়ের ইবন ওয়াহাবকে যেন চোখে চোখে রাখে এবং রাসূলুল্লাহকে ﷺ পাহারা দিয়ে রাখে।

উমায়ের ইবন ওয়াহাব রাসূলুল্লাহকে ﷺ সম্ভাষণ জানাল, 'শুভ সকাল', রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে এই কথার পরিবর্তে একটি উত্তম সম্ভাষণ শিখিয়েছেন – আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ।' উমাইর ইবনে ওয়াহাব বললো, 'খুব বেশী দিন হয়নি আপনি এই সম্ভাষণ ব্যবহার করছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এ নিয়ে কথা বাড়ালেন না। তিনি আসল কথায় চলে গেলেন, 'তুমি কেন এসেছ বলোতো।' সে বললো, 'আমি এসেছি আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে।' তার ছেলের নাম ওয়াহাব। সে বদরে যুদ্ধবন্দী হয়েছিল সত্যি, কিন্তু এটা ছিল তার মদীনায় ঢোকার অজুহাত মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সত্যি করে বলো, কেন তুমি এসেছ?'

উমায়ের জোর দিয়ে বললো সে তার ছেলেকে মুক্ত করতেই এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে তুমি তরবারী কেন বহন করছ?' উমায়ের জবাব দিল, 'চুলোয় যাক এই তরবারি! এই তরবারি আমাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনেনি!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'না, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি এসেছ আমাকে হত্যা করতে। তুমি কাবার পাশে বসে সাফওয়ানের সাথে পরামর্শ করেছো। তুমি তাকে বলেছো যে, যদি তুমি ঋণে জর্জরিত না হতে, তোমার বাচ্চাকাচ্চাকে দেখাশোনা করতে না হতো, তাহলে তুমি আমাকে হত্যা করতে। এরপর সাফওয়ান তোমাকে বলেছে, 'যদি তোমার কিছু হয়, তখন আমি তোমার দেনা শোধ করে দেব আর আমি তোমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করব'। এরপর তুমি সাফওয়ানের সাথে এই মর্মে রাজি হয়েছ যে, তুমি এই ব্যাপারটি গোপন রাখবে এবং তুমি কাউকে এ কথা জানাবে না।'

উমায়ের বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল! সে বললো, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল! আর কেউ আমার ও সাফওয়ানের এই কথোপকথন আড়ি পেতে শুনেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আপনাকে এই কথোপকথনের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমাদের এই ভাইকে তোমরা সাহায্য করো। তাকে কুরআন শিক্ষা দাও এবং তার ছেলেকে মুক্ত করে দাও।' এভাবে উমায়ের ইবনে ওয়াহাব মুসলিম হয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

ওদিকে সাফওয়ান মক্কার লোকেদের আশ্বস্ত করছিলেন, 'শীঘ্রই তোমরা এমন খবর শুনবে যা তোমাদেরকে বদরের দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।' কিন্তু সাফওয়ানের আশায় গুড়েবালি ঢেলে দিয়ে উমায়ের ইবনে ওয়াহাব মক্কায় ফিরে ইসলামের ঘোষণা দিলেন। সাফওয়ান প্রচণ্ড রেগে গেল। সে পণ করলো আর কখনো উমায়েরের সাথে কথা বলবে না। উমাইর ইবনে ওয়াহাব, যিনি কুরাইশদের মধ্যে একজন খুব জঘন্য ধরনের লোক ছিলেন, তিনিই তখন ইসলামের একজন দাঈতে পরিণত হলেন, মুসলিমদের উপর নিপীড়ন করার পরিবর্তে এবার তিনি সেসব মানুষকে পীড়া দিতে থাকলেন যারা মুসলিমদের পীড়া দিত। অনেক লোক উমাইর ইবনে ওয়াহাবের দাওয়াতের ফলে মুসলিম হয়েছিল।[115]

বদর যুদ্ধের শিক্ষা

প্রথমত, বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।
বিজয়ের পর সাধারণত সৈন্যরা তাদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, সাহসিকতা নিয়ে গর্ববোধ করে। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কখনোই মুসলিমদের বিজয়ের জন্য তাদের প্রশংসা করেননি।

---

[115] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪২।

"(আসলে) এ সংখ্যাটা (বলে) আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ দিয়েছেন, (নতুবা বিজয়ের জন্য তো তিনি একাই যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন) যেন এর ফলে তোমাদের মন (কিছুটা) প্রশান্ত (ও আশ্বস্ত) হতে পারে, আর সাহায্য ও বিজয়! সে তো পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে, তিনিই সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১২৬)

"(যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে) তাদের তোমরা কেউই হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তাআলাই তাদের হত্যা করেছেন, আর তুমি যখন (তাদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ করছিলে, (মূলত) তুমি নিক্ষেপ করোনি বরং করেছেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং।" (সূরা আনফাল, ৮: ১৭)

সুতরাং কৃতিত্ব কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য কঠিন কাজকে সহজ করে দেন। নিজ যোগ্যতায় মুসলিমরা বদরে বিজয়ী হয়নি, বরং আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করেছেন। জীবনের যেকোনো অর্জন - হোক তা ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা কিংবা দাঈ হিসেবে সফলতা, শুধুমাত্র আল্লাহ তাওফীক দেন বলেই তা সম্ভব হয়।

"স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম, এই যমীনে তোমাদের মনে করা হতো তোমরা অত্যন্ত দুর্বল, তোমরা সর্বদাই এ ভয়ে থাকতে যে, কখন (অন্য) মানুষরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিযক দান করেছেন। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।" (সূরা আনফাল, ৮: ২৬)

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের তাদের আগের অবস্থা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা ছিল সংখ্যায় কম, নিপীড়িত এবং ভীতসন্ত্রস্ত। কিন্তু আল্লাহ তাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন ও সবকিছুর যোগান দিয়েছেন। বদরে অনেকগুলো আলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। যেমন:

সৈন্যের সংখ্যা কম দেখা।

যুদ্ধের আগে বৃষ্টি।

যুদ্ধের আগের রাতে মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ ঘুম।

ফেরেশতাদের অবতরণ।

উমাইয়্যা নিহত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর ﷺ ভবিষৎবাণী ফলে যাওয়া।

উকাশাহ ইবন মিহযানের তরবারি যুদ্ধে ভেঙ্গে যায়, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাঠের গুড়িকে সত্যিকারের তরবারিতে পরিণত করেন।

কাফির নেতৃবৃন্দের মৃত্যু – যুদ্ধের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে রেখেছিলেন, 'এই জায়গায় অমুক মারা যাবে। ওই জায়গায় তমুক মারা যাবে।' তিনি যেসব জায়গায় যাদের মৃত্যু হবে বলে দিয়েছিলেন, ঠিক সে সে জায়গায় তাদের মৃত্যু হয়।

কাতাদা ইবনে নোমান যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর একটি চোখ কোটর থেকে বের হয়ে ঝুলতে থাকে। সাহাবারা ﷺ সেটা কেটে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের তা করতে মানা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ঝুলে থাকা চোখটি হাতে নিয়ে কোটরের ভিতর আবার বসিয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। কাতাদা বলেন, 'ওই ঘটনার পর থেকে সেই চোখে আমি অন্য চোখ থেকেও ভালো দেখতে পেতাম।'

আল-আব্বাসের অর্থ-সম্পদ কোথায় আছে সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর ﷺ ওয়াহী মারফত জেনে যাওয়া।

ওয়াহাব ইবনে উমায়েরের গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে যাওয়া।

বদরের যুদ্ধের এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল আল্লাহর ইচ্ছায়। প্রতিটি ঘটনাই অলৌকিক। কুরআন ছাড়াও রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে অনেক মু'জিযা ছিল। সেগুলো বেশিরভাগই ঘটেছিল জিহাদের সময়ে। আল্লাহ তাআলার বেশিরভাগ আউলিয়ার 'কারামত' ঘটে জিহাদের সময়ে।

দ্বিতীয়ত, বদরের যুদ্ধের সৈনিকরা ঈমানকে নিজের পরিবার অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নিজ পরিবারের কাফির সদস্যদের চেয়ে তাঁরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিন ভাইদের বেশি আপন করে নিয়েছিলেন । তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছিলেন এবং কুফরির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন।

বদর যুদ্ধে আবু বকর ﷺ ছিলেন মুসলিমদের পক্ষে। তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান ছিল কুফফারদের পক্ষে। এই ঘটনার পরের কথা। আব্দুর রাহমান তাঁর বাবাকে বললেন, 'বাবা, আমি আপনাকে বদরের দিনে ময়দানে দেখেছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে এড়িয়ে গেছি, কারণ আমি আপনাকে আক্রমণ করতে চাইনি।' আবু বকর ﷺ বললেন, 'সেদিন আমি তোমাকে দেখিনি, তবে যদি দেখতাম, আমি তোমার পিছু নিতাম এবং তোমাকে হত্যা করতাম।' আবু বকর ﷺ নিজ ছেলের সাথে যুদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ঈমানের মূল্য রক্তের সম্পর্ক থেকেও দামি। তাই তিনি নিজের ছেলেকে আল্লাহর জন্য হত্যা করতে চেয়েছিলেন।

'তার হাত ভালো করে বাঁধো, দড়ির বাঁধন শক্ত করো। তার মা বেশ ধনী। তিনি তার ছেলের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দেবেন।'

এ কথাগুলো বলেছিলেন মুসআব ইবনে উমাইর। তাঁর ভাই আবু আযীয ছিল কুরাইশদের পক্ষে। যুদ্ধে আবু আযীয বন্দী হয়, আনসাররা তাকে বেঁধে রেখেছিল। বন্দী আবু আযীযের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মুসআব আনসারদেরকে এই

কথাগুলো বলেন। আবু আযীয অবাক হয়ে গেল এই ভেবে, কীভাবে একজন মানুষ তার ভাইকে শক্ত করে বাঁধা আর মুক্তিপণ চাওয়ার কথা বলতে পারে!

আবু আযীয বললো, 'ভাই! তুমি আমার সাথে এমন আচরণ করলে!' মুসআব বললেন, 'ভাই হিসেবে সে তোমার চেয়ে আমার বেশি আপন।' – তিনি ইঙ্গিত করলেন সেই আনসারের দিকে যে আবু আযীযকে ধরে রেখেছে, 'এরাই হলো আমার সত্যিকারের ভাই, তুমি নও। ইসলামের কারণে আজকে এরা আমার ভাই। যদিও তুমি আমার রক্তের ভাই কিন্তু তোমার কুফরি আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।'

কুরাইশদের মধ্যে কিছু তরুণ ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ কুরাইশদের বিখ্যাত পরিবারের সন্তান। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালো জানতেন। সাধারণত তরুণরা একটু অন্যরকম হতে পছন্দ করে। প্রায়ই তারা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যেতে চায়। এদের মধ্যে ছিল আলী ইবন উমাইয়া ইবন খালাফ, আবুল কায়েস ইবন আল-ওয়ালিদ ইবন মুঘিরা, আবু কায়েস ইবন ফাকিহ, আল-হারিস ইবন জামা'আ, এবং আল-আউস ইবন মুন্নাব্বিহ – এরা সকলেই ছিল ধনী কুরাইশ পরিবারের সন্তান। তারা মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু ইসলামের জন্য কোনো প্রকার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে রাজি ছিল না। তাই তারা মক্কায় রয়ে যায়, মদীনায় হিজরত করেনি। এরা ছিল বিগড়ে যাওয়া তরুণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা হিজরত করেনি। বলা চলে তারা হিজরতের 'ঝামেলায়' যেতে রাজি হয়নি। শুধু তাই নয়, তারা তাদের বাপ ও তাদের গোত্রদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়।

ইবনে হিশাম বলেন; 'তারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।' এরা সকলে কিন্তু মুসলিম ছিল। হয়তো তারা যুদ্ধে অংশ নিতে চায়নি, কিন্তু তাদের পরিণতি ছিল অবমাননাকর মৃত্যু।

ইসলাম মানে কেবল কালিমা পাঠ নয়, ইসলামের সাথে জড়িয়ে আছে ত্যাগ স্বীকার। নামকাওয়াস্তে মুসলিমের সাথে সত্যিকারের মুসলিমদের পার্থক্য এই যে, সত্যিকারের মুসলিমরা ইসলামের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। এই মুসলিমরা, যারা বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে এসেছিল, হয়তো তারা নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে যুদ্ধে এসেছিল, হয়তো তারা মুসলিমদের লক্ষ্য করে একটি তীরও ছোঁড়েনি, তরবারি চালায়নি। কিন্তু এদের ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন?

> **"নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম, কতো নিকৃষ্ট সে আবাস!" (সূরা আন-নিসা, ৪: ৯৭)**

ইসলাম অবহেলা বা হেলাফেলা করার দ্বীন নয়। ঠেলেঠুলে ইসলাম পালন করলে এর কোনো মূল্য ইসলামে নেই। ইসলাম গুরুত্বের সাথে নেওয়ার দ্বীন। এটা পার্ট-টাইম চাকরির মতো নয়, কিংবা এমন নয় যে যখন খুশি করলাম আর মন-না-চাইলে ছেড়ে দিলাম। এই ধরনের ধর্মকর্মের স্থান ইসলামে নেই। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল যে জান্নাতের অঙ্গীকার দিয়েছেন, সে জান্নাতের জন্য কষ্ট করতে হবে।

ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, 'মুশরিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের সাথে কিছু মুসলিম বদরে যোগ দিয়েছিল। তাদের কেউ নিহত হয়েছে মুসলিমদের ছোঁড়া তীরে, কেউ নিহত হয়েছে মুসলিমদের তরবারিতে, তাই আল্লাহ সূরা নিসার এই আয়াতটি নাযিল করেছেন।'

এই আয়াতে মক্কায় পড়ে থাকা এইসব নামকা ওয়াস্তে মুসলিমদের কথাই বলা হয়েছে। তাদের ইসলাম তাদের কোনো কাজে আসেনি। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাগ্যে জুটেছে জাহান্নামের আগুন। কেননা তারা হিজরত করেনি।

তৃতীয়ত, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেছিলেন, তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করেছিলেন। যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে ভালো স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন, তাদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন। এই সবকিছুর পর তিনি তাঁবুর ভেতরে গিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। এটাই হলো তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের অর্থ হলো দুনিয়াবী সকল উপায়ে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জালের উপর ভরসা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাধ্যমতো সবধরনের প্রস্তুতিই নিয়েছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে দুআ করা আরম্ভ করেছিলেন।

একবার কিছু লোক অলসভাবে হাঁটছিল আর এমন ভাব করছিল যেন তারা যুহ্দ করছে। উমার ইবন খাত্তাব رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কারা?' তারা বললো, 'আমরা মুতাওয়াক্কিলুন।' আল্লাহর উপর যারা তাওয়াক্কুল করে তাদের বলা হয় মুতাওয়াক্কিলুন । উমার رضي الله عنه এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে লাঠি দিয়ে পিটুনি দিয়ে বললেন, 'তোমরা কি জানো না যে, আকাশ থেকে স্বর্ণ ও রুপার বৃষ্টি বর্ষণ হয় না? যাও, তোমরা কাজ করে খেতে শেখ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি তোমরা আল্লাহর উপর সঠিক ভাবে তাওয়াক্কুল কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাখির মতো রিযিক প্রদান করবেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং বিকেলে ভরপেটে বাড়ি ফিরে।' পাখিরা বাসায় বসে থাকে না। তারা কাজ করতে বেরিয়ে যায় আর খাবার খুঁজে নেয়। তাই তাওয়াক্কুলের মধ্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। কেউ চেষ্টা না করে এই দাবি করতে পারবে না আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি। যদিও চেষ্টাই সবকিছু নয়, চেষ্টার উপর ভরসা করা যাবে না। নিজের বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা অথবা দুনিয়ার কোনো কিছুর উপর

নির্ভর করা চলবে না, ভরসা ও নির্ভরতা কেবল আল্লাহর উপর। তাই শুধু নিজের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করা কিংবা চেষ্টা না করে শুধু দুআ করা- দুটিই প্রান্তিকতা এবং বর্জনীয়। চেষ্টা এবং তাওয়াক্কুল – দুটিই একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ছয় বছর পর...

রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করছেন বিজয়ী হয়ে। তাঁকে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে না, জাতীয় সঙ্গীত বাজছে না, নেই কোনো লাল গালিচা, আর তাঁর মাঝেও নেই কোনো অহংকারের ছাপ। তিনি বুক উঁচু করে, অবনত মস্তকে, আল্লাহর প্রতি বিনম্র চিত্তে সেখানে প্রবেশ করছেন। তিনি উটের পিঠে, ঢোকার সময় তিনি আল্লাহর কাছে সাজদারত, তিনি এতটাই নীচু হয়ে আছেন যে তাঁর দাড়ি উটের সাথে লেগে আছে। তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য নেই, আছে নম্রতা, নেই উত্তেজনা, আছে সাকিনাহ, প্রশান্তি।

এভাবেই কাবাঘরের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর চারিদিক ঘিরে অসংখ্য মানুষ। মক্কার জনতার চোখেমুখে বিস্ময়, ভয়, কৌতূহল! তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে একটি মানুষের সিদ্ধান্তের উপর – সেই মুহাম্মাদ ﷺ, যাকে তারা অপমান করেছে, দিনের পর দিন অভুক্ত রেখেছে, দেশছাড়া করে ছেড়েছে – আজ তিনিই বীরের বেশে নেতা হয়ে ফিরে এসেছেন নিজের ঘরে। কুরাইশের লোকেরা আজ তাঁর তরবারীর নীচে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন,

- তোমাদের কী ধারণা? আজ তোমাদের সাথে আমি কেমন ব্যবহার করবো?
- আপনার কাছ থেকে এক মহৎ ভাইয়ের মতো আচরণ আশা করি।

রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সেটাই বলব যা ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, লা তাসরীবা 'আলাইকুমুল ইয়াওম - আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।

মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে কীভাবে এই বিশাল পরিবর্তন রচিত হলো? মক্কার মেষ চরানো এক যুবক হয়ে গেলেন অসাধারণ এক নেতা, আরবের অধিপতি, সাহাবীদের ﷺ কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়। মৃত্যুর পরেও যাঁর ছায়া আমাদেরকে আগলে রেখেছে। কী ছিল সেই মহান পুরুষের যাত্রা, প্রতিকূলতা ও সংগ্রাম? উত্তরগুলো পরবর্তী পর্বে সম্পূর্ণতা পাবে ইন শাআল্লাহ। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে তাঁর জীবনের বাকি অংশের কাহিনি। রাসূলুল্লাহর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, আমীন!

[পরবর্তী খণ্ডে সমাপ্য, ইন শা আল্লাহ]

রেইনড্রপস মিডিয়া

'আমার উম্মতের উদাহরণ হচ্ছে বৃষ্টির মতো'

রেইনড্রপস এর প্রকাশিত অন্যান্য বই:

- ❖ প্রাচীর
- ❖ সীরাহ শেষ খন্ড

অডিও লেকচার সিরিজ:

- ❖ পরকালের পথে যাত্রা
- ❖ পথিকৃৎদের পদচিহ্ন: নবীদের জীবন

চিরকুট ভিডিও:

- ❖ রামাদানের চিঠি

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

স্কুলজীবনে যে বিষয়গুলো একেবারেই উপভোগ করিনি, সেগুলোর মধ্যে আছে বাংলা এবং ইসলাম শিক্ষা। কখনই এই সাবজেক্টগুলোতে আগ্রহ পাইনি। পড়তে হবে, তাই পড়তাম। না তেমন কিছু শিখেছি, না উপভোগ করেছি। গল্পের বই পড়তে অবশ্য ভালোই লাগতো। আর ইসলাম শিক্ষা বই পড়ে যতো না ইসলাম শিখেছি, তার থেকে বেশি শিখেছি পরিবার আর চারপাশের কালচার থেকে। অবশ্য শিখেছি না বলে 'জেনেছি' বলাই ভালো, কারণ সিরিয়াসলি ইসলাম পালন করা শুরু করেছি অনেক পরে।

ইসলাম মানুষকে বদলে দেয়। এই পরিবর্তনটা অন্যরকম, বিশ্বাসে-আদর্শে, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, অনুভূতি আর মানসিকতায়। পুরো পৃথিবীটা অন্যরকম লাগে। যে ছেলেটা হুমায়ুন আহমেদের সাহিত্য পড়তো, ইসলাম গ্রহণের পর সে দেখবে অর্থহীনতাকে হেঁয়ালিপনার আবরণ দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া এই লোকটা আসলে কিছুই করেনি। যে মেয়েটা জাফর ইকবালের ফ্যান ছিল, সে আবিষ্কার করবে লোকটা কতো সূক্ষ্মভাবে ইসলাম আর মুসলিমদের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ আর বিরক্তির আবরণ তৈরি করে যত্নের সাথে। কিংবা কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখাগুলো পড়ে, তার কাছে মনে হবে কথাগুলো সুন্দর, কিন্তু মিথ্যা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, কিছু কথা হচ্ছে জাদুর মতো। কথাটার মানে কী? কথাটার একটা মানে হল, কিছু মানুষ খুব সুন্দর করে, গুছিয়ে, মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো মিথ্যে বলে। এতোটাই সুন্দর, গোছানো আর মায়াকাড়া -- যে মিথ্যাকে আর মিথ্যা মনে হয় না, সত্য বলে পাঠক বা শ্রোতা বিশ্বাস করতে থাকে।

বাংলা সাহিত্য বলে সেকুলাররা যে ধারার প্রচলন করেছে, সেই ধারাটাকে আমার একটা জাদুর মতো মনে হয়। সুন্দর, কিন্তু মিথ্যা। আকর্ষণীয়, কিন্তু ফাঁপা। চকচকে, কিন্তু অন্তঃসারশূণ্য। পড়ে একটা 'ফিল গুড' হয়, কিছু শব্দ আর লেখার ধরণও শেখা যায় বটে, কিন্তু এই সাহিত্য আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

অন্ধকারে, অর্থহীনতা, পথভ্রষ্টতায়।

বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছে? সবাই সমস্বরে একটাই উত্তর দেয়, রসাতলে! জাতি হিসেবে আমরা এ বিষয়ে একমত। ক্ষমতার আসনে বসে থাকা লোকটি এ কথা স্বীকার

না করলেও, সে আরো বেশি করে জানে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই অবনমন চলছে তো চলছেই। বাংলাদেশ ঠিক কবে ভালো ছিল -- এ কথা কেউ মনে করতে পারে না। কেন এমন হল? অনেক কারণ আছে, সেসব নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসি নি। তবে এর পেছনে একটা কারণ আছে, সেটা হলো প্রচলিত সাহিত্যের ধারা আমাদের কিছুই দিতে পারে নি। যা কিছু দিয়েছে তার পুরোটাই গারবেজ -- দেশপ্রেমের নামে উন্মাদনা, ভালোবাসার নামে নোংরামি আর মানবতার নামে ফাঁকাবুলি।

বই একটা জাতিকে বদলে দিতে না পারলেও বদলে দেবার একটা হাতিয়ার বটে। সেকুলার লাইন থেকে ইসলাম গ্রহণ করার পর বই পড়ার অভ্যাস থাকা মানুষরা একটা শূণ্যতা অনুভব করে। কারণ সেকুলার সাহিত্য পড়তে ভালো লাগে না, আর ইসলামী বইগুলোর বেশিরভাগের মান ভালো না, নিরস। এই অভিজ্ঞতা অনেকেরই।

আমার নিজেরও। ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি তার সিংহভাগ ইংরেজি বই বা লেকচার থেকে। বাংলা ভাষাভাষীদের মেজরিটি মুসলিম হওয়া সত্তেও সেকুলারদের একচ্ছত্র রাজত্ব দুঃখজনক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অসাধারণ বক্তা। তাঁর একটি কথায় মানুষ মুসলিম হয়েছে, এক বৈঠকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। মরুভূমি থেকে উঠে আসা ধুলোমলিন বেদুইন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মুহূর্তের মাঝে বুঝে ফেলতো বিন্দুমাত্র অসুবিধা ছাড়াই। আর আমরা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকছি দুর্বোধ্য ভাষায়, যেখানে যত্নের ছাপ নেই, সৌন্দর্যের ছটা নেই। এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?

এই মেনে-নিতে-না-পারা থেকেই রেইনড্রপসের জন্ম। যে বাংলা আর ইসলামশিক্ষাকে উপভোগ করতাম না, সে দুটোর মাঝে ইসলাম হয়ে গেলো আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, আর বাংলা হলো সেই প্রিয়কে ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার! ঠিক করলাম, আলিমরা যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলোই বলবো, কিন্তু, গুছিয়ে বলবো, সুন্দর করে বলবো -- যেন মানুষ বুঝতে পারে, ভালোবাসতে পারে। ইসলামের সাথে সাধারণ মানুষের মাঝে ভাষার কাঠিন্য আর অস্পষ্টতার যে দেওয়াল তৈরি হয়েছে -- সেটাকে পুরোপুরি ভাঙতে না পারি, কয়েকটা ইট হলেও খুলে নেওয়া চাই।

আলহামদুলিল্লাহ, এই লেখাটি যখন লিখছি, তখন আরো অনেকে এগিয়ে এসেছেন। আশা করা যায়, একটা শক্তিশালী সত্য ন্যারেটিভ তৈরি হবে মিথ্যুকদের বিরুদ্ধে। মিথ্যার দেওয়াল টোকা দিলেই ভেঙে যায়। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের আলো থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে শব্দের জারিজুরি দিয়ে। ইনশা আল্লাহ এভাবে আর বেশিদিন নয়।

সীরাতের দ্বিতীয় খণ্ডই শেষ খণ্ড। এই সীরাতের কাজ করতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে -- আরো কতো কথাই তো বলার ছিল! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনটাই এমন। যতো জানবো, ততো ভালোবাসবো, আর যতো ভালোবাসবো, ততো বেশি জানতে ইচ্ছা করবে! কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তো আছেই।

দ্বিতীয় খণ্ড বের করতে অনেক দেরি হয়েছে কাঙ্ক্ষিত সময় থেকে। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর নগণ্য কিছু বান্দাকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের জীবনকথাকে তুলে ধরার তৌফিক্ব দিয়েছেন। যারা যারা এই বইয়ের সাথে জড়িত, আল্লাহ যেন তাদের প্রত্যেককে কবুল করে নেন। এই বইয়ে যা কিছু ভুল তা আমাদের পক্ষ থেকে, আর কিছু সঠিক তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের ওপর।

জিম তানভীর
২৯ জুমাদা আল আওয়াল, ১৪৩৯।

সূচিপত্র

মদীনায় নতুন শত্রু

বদর যুদ্ধের পর মুনাফিকদের সাথে আরও একটি দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা হলো ইহুদি। মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য ইহুদিরা একটা স্বতন্ত্র প্রতিপক্ষ ছিল।

ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের এই বিরোধ জাতিগত বিদ্বেষঘটিত কিছু নয়। এই বিরোধ 'আরব বনাম ইহুদি' বিরোধও নয়, বরং এই বিরোধ বিশ্বাসের বিরোধ, এই বিরোধ আদর্শিক দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত বিরোধ। মুসলিম উম্মাহর একটা বড় অংশ শুরুতে জাতিগতভাবে ইহুদিই ছিল। মুসলিমরা একটি বিশ্বাসভিত্তিক জাতি। আরব, বাঙালি, ভারতীয়, আফ্রিকান বা ইউরোপিয়ান, জাতিপরিচয় (Ethnicity) যা-ই হোক -- যে কেউই মুসলিম হতে পারে, শুধু তাদের ঈমানের কালিমায় বিশ্বাস এবং সে অনুসারে আমল করতে হবে। কিন্তু ইহুদিদের ক্ষেত্রে তেমন নয়। ইহুদি ধর্মের (Judaism) অনুসারী হতে হলে ইহুদি জাতিরও সদস্য অর্থাৎ জাতিগতভাবেও ইহুদি (Ethnically Jewish) হতে হবে। আগে এমনটা ছিল না। একটা সময় ইহুদিধর্মও ছিল একটি বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম। ইহুদি জাতি না হয়েও একজন মানুষ ইহুদিধর্ম গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু এখন সেরকম নেই। এখন তারা তাদের ধর্মকে নিজস্ব জাতিসত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তাই কেউ চাইলেই ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না, বরং তাকে জন্মগতভাবে ইহুদি জাতির হতে হবে।

ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কেমন হবে তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বে (Ethnic superioirity) মুসলিমরা বিশ্বাস করে না। বংশ, গোত্র, জাতিপরিচয় বা রক্তের কারণে কারো ওপর মিছে শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করা মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয়, কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তাক্বওয়ায়। নিছক বিরুদ্ধাচারিতা করাও উদ্দেশ্য নয়। তবে কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে কথা বলার সময় যা সত্য তা-ই ব্যক্ত করা জরুরি; তা প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শ বা ভাবধারার (Political Correctness) সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক। প্রচলিত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ব্যবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করা যাবে না

মদীনার সনদ ছিল মদীনার মুসলিম, অমুসলিম এবং ইহুদিদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণকারী একটি সাংবিধানিক দলিল বা আইনি চুক্তিপত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতেন আর শুরু থেকে সেভাবেই তাদের সাথে আচরণ করে আসছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো গোপন এজেন্ডা ছিল না। তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা বা ঘৃণাও পোষণ করতেন না। সত্যি বলতে, আহলে কিতাব হিসেবে মুশরিকদের চাইতে তাদেরকে বরং মুসলিমদের আপন

ভাবা হতো। অথচ তারাই প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহর সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে।

মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পা ফেলার প্রথম দিন থেকেই ইহুদিরা মনঃক্ষুণ্ণ ছিল। পুরো ব্যাপারটি তারা সহজভাবে মানতে পারেনি। মদীনার দুই শীর্ষস্থানীয় ইহুদি নেতা--হুয়াই ইবন আখতাব আর আবু ইয়াসির ইবন আখতাবের কথোপকথনে তাদের এ বিদ্বেষ সম্পর্কে আঁচ করা যায়। এ দু'জন ব্যক্তি ছিল যথাক্রমে রাসূলুল্লাহর স্ত্রী সাফিয়ার ﵂ বাবা ও চাচা। তাঁর মুখেই ঘটনাটি শোনা যাক।

'আমি ছিলাম আমার বাবা ও চাচার সবচেয়ে আদরের, তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু আমর ইবন আউফদের গ্রাম কুবায় এলেন, আমার বাবা ও চাচা সকাল সকালই তাঁর কাছে চলে গেলেন। ফিরে এলেন সেই সূর্যাস্তের সময়। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। কোনোরকমে টলতে টলতে বাড়িতে ফিরলেন। সবসময়ের মতো সেদিনও আমি তাঁদের সাথে দেখা করতে ছুটে গেলাম। কিন্তু ওয়াল্লাহি! কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না! শুনতে পেলাম চাচা আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন,

- আচ্ছা, এই কি সেই রাসূল? (যার কথা আমাদের কিতাবে উল্লেখিত আছে?)
- আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনিই সেই।
- আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন? তাঁর বর্ণনা ও চরিত্র দেখে?
- হ্যাঁ, সেসব দেখেই তো বলছি।
- তাহলে, আপনি তাঁর সাথে কেমন সম্পর্ক বজায় রাখতে চান?
- আল্লাহর কসম, যতদিন বেঁচে থাকবো, তাঁর শত্রু হয়ে থাকবো।'

সাফিয়ার (﵂) বাবা হুয়াই ইবন আখতাব ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মাদই ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। কিন্তু জেনেশুনেও তাঁর অনুসারী না হয়ে সে শত্রুতার পথ বেছে নেয়। এর কারণ ছিল আরবদের প্রতি ইহুদিদের প্রচণ্ড হিংসা আর তীব্র বিদ্বেষ। তাদের আশা ছিল, শেষ রাসূল হবেন ইহুদি জাতির মধ্য থেকে। আরবদের মধ্য থেকে শেষ রাসূল এসেছেন, এটা তারা মেনে নিতে পারেনি। এ ঘটনাই তাদের মধ্যে হিংসার জন্ম দেয়। আর এই হিংসা থেকে জন্ম নেয় কুফরি। এমন ভয়ঙ্কর সে কুফরি যে, তারা খোদ রাসূলুল্লাহর ﷺ রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে। এটাই হলো নিকৃষ্ট পর্যায়ের কুফরি; সত্য জেনেও তা অস্বীকার করা। কিছু মানুষ মনে করে ইসলাম সত্য নয়। তাদের কাছে এটা একটা বানোয়াট ধর্ম। তাই তারা ইসলামে বিশ্বাস করে না। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা খুব ভালো করেই জানে ইসলাম হচ্ছে সত্য দ্বীন। তা সত্ত্বেও তারা এই দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে। হুয়াই ইবন আখতাব ছিল তেমনই এক কাফির।

ইহুদিদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম

মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা

ইবনে ইসহাক বলেন, শাস ইবন ক্বাইস নামের এক বুড়ো ইহুদি ছিল। সে ছিল এক ইসলামবিদ্বেষী। তার অন্তর জুড়ে ছিল কুফরি। মুসলিমদের সে খুব বেশি ঘৃণা করতো। ইসলাম গ্রহণের আগে আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরকে ঘৃণা করতো। সে দেখলো রাসূলুল্লাহর আবির্ভাবের পর গোত্র দুটি বন্ধু হয়ে গেছে। তারা মিলেমিশে আছে; একসাথে এক মজলিসে বসে কথা বলছে। এই দৃশ্য তার সহ্য হলো না। সে বলে উঠলো,

'এই জমিনে আজ আওস আর খাযরাজ এক হয়েছে। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যতদিন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন এই দেশে আমাদের কোনো জায়গা নেই। আমরা ইহুদিরা এই মদীনায় ততদিনই টিকে থাকবো, যতদিন আরবরা বিভক্ত থাকবে। আর যতদিন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন আমাদের বিপদ!'

সে আওস খাযরাজের জমায়েতে বসে থাকা এক ইহুদি যুবককে ডেকে বললো, 'আওস-খাযরাজের কাছে যাও! স্মরণ করিয়ে দাও তাদের অতীত জীবনের হানাহানি, বু'আস আর অন্য সব যুদ্ধের কাহিনী! অতীতের চেতনা আর উসকানিমূলক কবিতাগুলো আবৃত্তি করে করে ক্ষেপিয়ে তোলো!'

কবিতা ছিল সেই যুগের মিডিয়া। সেই তরুণ সাফল্যের সাথেই কাজটি করলো। সে দুই দলের জাহিলিয়াতি যুগের ঘটনাগুলো নিয়ে কথা বলা আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। তরুণও কবিতা আবৃত্তি চালিয়ে যেতে থাকে। পরিবেশ ক্রমেই আরও উত্তপ্ত হয়। এক সময় দুই দলের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। সবাই বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে, একে অপরকে যুদ্ধের দিকে আহ্বান করতে থাকে। এমনকি যুদ্ধ করার স্থানও ঠিক করে ফেলে! যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। কিছু অপ্রীতিকর শব্দ, কিছু জাহিলিয়াতি চেতনার বাণী--ব্যস এটুকুই। শান্তিময় পরিবেশকে নষ্ট করে অশান্ত আর অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। মুসলিমদের তাই শব্দচয়নের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা, শয়তান অসতর্ক কথাকে কেন্দ্র করে বিভেদ তৈরি করে।

> "(হে নবী) আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন (কথা বলার সময়) এমন সব কথা বলে যা উত্তম; (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়; আর শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা ইসরা, ১৭: ৫৩)

আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধের কথা রাসূলুল্লাহর ﷺ কানে পৌঁছলে তিনি ছুটে

এলেন। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন,

> *'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা কি আবার সেই জাহিলিয়াতের জীবনের ফেলে আসা শত্রুতাকে ফিরিয়ে আনতে চাও? অথচ আমি এখন তোমাদের মাঝে আছি! আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমান আর ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছেন। তোমরা কি ভুলে গেছ আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা যে অনুগ্রহের কারণে আজ তোমরা জাহিলিয়াত ও কুফরি থেকে মুক্তি পেয়েছ? যে অনুগ্রহ তোমাদের অন্তরে শত্রুতার পরিবর্তে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বীজ বপন করেছে?'*

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথা শুনে তারা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। সবকিছু ভুলে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করা আরম্ভ করল। একে অপরের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। অথচ কিছুক্ষণ আগেও তারা যুদ্ধে লড়তে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

> **"(হে নবী!) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুঝে) আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করো, অথচ তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তাআলাই তার ওপর সাক্ষী। আপনি (আরও) বলুন, হে আহলে কিতাবরা, যারা ঈমান এনেছে তোমরা কেন তাদের আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছো? (এভাবেই) তোমরা (আল্লাহর) পথকে বাঁকা করতে চাও অথচ (এই লোকদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে) তোমরাই তো সাক্ষী; আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই সব (বিদ্রোহমূলক) আচরণ সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন। তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (আগে) যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো একটি দলের কথা মেনে চলো, তাহলে (মনে রেখো), ঈমান আনার পরও এরা তোমাদের কাফির বানিয়ে দেবে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৯৮-১০০)**

আল্লাহ মুসলিমদের সতর্ক করে বলছেন, আহলে কিতাবদের অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুসরণ করার ফলাফল খুবই ভয়াবহ। এর পরিণতি কুফর। ইহুদিরা খুব ভালো করেই জানতো মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন সত্য নবী। তাদের কিতাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের কথা লেখা আছে। কিন্তু তবু তারা মুসলিমদের হিংসা করে। কারণ, আল্লাহ ইহুদিদের কাছে রাসূলুল্লাহকে প্রেরণ না করে আরবদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এটা তারা মানতে পারে না। তাই তারা চায় মুসলিমরা কুফরি করুক। তাদেরকে অনুসরণ করলে একটাই গন্তব্য, কুফরি। পেছনে ফেরার আর কোনো পথ নেই।

> **"আর তোমরা কীভাবে কুফরি করো, যখন তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে, তা ছাড়া (এ আয়াতে বাহক স্বয়ং) আল্লাহর রাসূল যখন তোমাদের মাঝেই মজুদ রয়েছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ (ও তাঁর বিধান)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সোজা**

পথে পরিচালিত হবে। হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো, ঠিক যতটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত, (আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ কোরো না।

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর (সেই) নিআমতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা (তাঁর দ্বীনের বন্ধন দিয়ে) তোমাদের একের জন্যে অপরের মনে ভালোবাসার সঞ্চার করে দিলেন, অতঃপর (যুগ-যুগান্তরের শত্রুতা ভুলে) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অথচ তোমরা ছিলে (হানাহানির) অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তসীমায়, অতঃপর সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা (তাঁর রহমত দিয়ে) তোমাদের উদ্ধার করলেন; আল্লাহ তাআলা এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষদের কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সাফল্যমণ্ডিত। তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেও না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে; এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১০১-১০৫)

দ্বীন ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-তামাশা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইহুদিদের আরও একটি অপকর্ম উন্মোচন করেন। সেটা হলো ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করা (Blashphemy)। তারা রাসূলুল্লাহকে নিয়ে, মুসলিমদের নিয়ে এবং ইসলাম ও আল্লাহ আযযা ওয়া জালের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতো। এমন একটি ঘটনা ঘটে আবু বকর ও এক ইহুদি পণ্ডিত ফিনহাসের মাঝে। তাদের কথোপকথনের পর একটি আয়াত নাযিল হয়। ঘটনাটি ছিল এমন, আবু বকর সিদ্দীক ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তখন ফিনহাস টিটকিরি মেরে বললো, 'শোনো, তোমার রব তো গরিব। আমরা হলাম ধনী। যদি তোমাদের রব ধনীই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে দান-খয়রাত করতে বলেন কেন? এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি অভাবী আর আমরা ধনী, আমাদেরকেই তাঁর প্রয়োজন।'

এই কথা শুনে আবু বকরের ﷺ মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হলো। তিনি ফিনহাসের মুখে ঘুষি মেরে বসলেন। ফিনহাসও কম যায় না। সে দৌড়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে

আবু বকরের ﷺ নামে নালিশ করে দিলো। রাসূলুল্লাহ আবু বকরের ﷺ কাছে এই বিষয়ে কৈফিয়ত চাইলেন। আবু বকর ﷺ রাসূলুল্লাহকে সব খুলে বললেন। ফিনহাস কী কটূক্তি করেছে তাও জানালেন। কিন্তু ফিনহাস একবাক্যে কটূক্তি করার কথা অস্বীকার করলো! তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করলেন,

> "আল্লাহ তাআলা সেই (ইহুদি) লোকদের কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, যখন তারা (বিদ্রূপ করে) বলেছিল (হ্যাঁ), আল্লাহ তাআলা অবশ্যই গরীব, আর আমরা হচ্ছি ধনী; তারা যা কিছু বলে তা আমি (তাদের হিসেবের খাতায়) লিখে রাখবো, (আমি আরও লিখে রাখবো) অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও, (সেদিন) আমি তাদের বলবো, এবার এই জাহান্নামের স্বাদ উপভোগ করো। এ (আযাব) হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছো, আল্লাহ তাআলা কখনো তাঁর নিজ বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন। (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৮১-১৮২)

ইহুদিরা নিয়মিত মুসলিমদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতো, উপহাস করতো। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন,

> "অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। এ অবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৮৬)

ইহুদিদের কাছ থেকে এমন আচরণ পাওয়াই স্বাভাবিক। তারা মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্তা বলবে, পত্র-পত্রিকায় ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করবে, মিডিয়ায় মুসলিমদের নিয়ে মিথ্যার বেসাতি সাজাবে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের বলছেন যদি মুসলিমরা ধৈর্যশীল আর তাক্বওয়াবান হয়, তাহলে তাদের এসব মিথ্যাচার ইসলাম ও মুসলিমদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ সত্য টিকে থাকে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বেয়াদবি

ইহুদিরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অসম্মান করে কথা বলতো। একবার তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে ফাজলামি করে বললো, 'আসসামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ'। কথাটি শুনতে 'আসসালামু আলাইকা' এর মতোই লাগে, কিন্তু তারা আসলে সালাম এর লামকে বাদ দিয়ে সালামের বদলে বললো সাম। যার অর্থ দাঁড়ায়, 'তোমার মৃত্যু হোক'। আইশা ﷺ এ কথা শুনে খুবই ক্ষেপে গেলেন। 'আসসামু আলাইকুম, বানরের

দল, শুকরের দল...' এই বলে তিনি ইহুদিদের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এভাবে বোলো না আইশা, আল্লাহ তাআলা নোংরা ভাষা পছন্দ করেন না।' তখন আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করলেন,

"তুমি কি তাদের লক্ষ করো না, যাদের (আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে কোনো) গোপন কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল; (কিন্তু) তারা (ঠিক) তারই পুনরাবৃত্তি করলো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিল। তারা একে অপরের সাথে সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ, মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও রাসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে কানাঘুষা করতে লাগলো, (অথচ) এরা যখন তোমার সামনে আসে তখন তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন জানায়, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে অভিবাদন জানান না। তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি সেজন্যে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!" (সূরা মুজাদিলাহ, ৫৮: ৮)

ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, 'আচ্ছা, আমরা যে এত আজেবাজে কথা বলি এজন্যে আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন? তাহলে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল নন।' আল্লাহ্ বলছেন তাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি হলো জাহান্নামের আগুন।

ইহুদিরা ছিল মুনাফিকদের আধ্যাত্মিক গুরু

"(মুনাফিকদের অবস্থা হচ্ছে) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আবার) যখন একাকী তাদের শয়তানের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, (ঈমানের কথা বলে ওদের সাথে) আমরা ঠাট্টা করেছিলাম মাত্র!" (সূরা বাকারাহ, ২: ১৪)

এখানে শয়তান বলতে বোঝানো হচ্ছে ইহুদিদেরকে। তাদের সাথেই মুনাফিকরা দেখা করতো।

"যাদের কাছে হিদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান এদের মন্দ কাজগুলো (ভালো লেবাস দিয়ে) শোভনীয় করে রাখে এবং তাদের জন্যে নানা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে রাখে। এটা এ জন্যেই (হয়েছে) যে, (মানুষের জন্যে) আল্লাহ তাআলা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যারা পছন্দ করে না -- এরা তাদের বলে, আমরা (ঈমানদারদের দলে থাকলেও) কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদের কথামতোই চলবো, আল্লাহ তাআলা এদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে খবর রাখেন।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ২৫-২৬)

'কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদের কথামতো চলবো' -- এ কথাটি ইহুদিদের উদ্দেশ্যে মুনাফিকদের বলা কথা। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলছেন যে, কাফির হওয়ার জন্য ইহুদি হওয়ার দরকার নেই বা তাদের সাথে পুরোপুরি একমত হবার দরকার নেই। কিছু ব্যাপারে একমত হওয়াই কাফির হবার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। মুসলিমদের এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান হওয়া জরুরি।

"(হে নবী) আপনি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ করেননি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায় যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন (ইহুদি জাতি); এ (সুযোগসন্ধানী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়, (তেমনি) তারাও ওদের আপন নয়, এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন; তারা যে কাজ করছে তা সত্যিই এক (জঘন্য) অপরাধের কাজ। তারা তাদের (মিথ্যা) শপথগুলোকে (নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়) ঢাল বানিয়ে নিতো, অতপর তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো, অতএব তাদের জন্যে (রয়েছে) এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা মুজাদিলাহ, ৫৮: ১৪-১৬)

ইসলামী দাওয়াহর বিরোধিতা

মদীনায় ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের আরেকটি কৌশল ছিল মানুষকে মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখা। যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম মুসলিম হলেন, তারা তাঁকে মিথ্যুক, বিশ্বাসঘাতক বলে অপবাদ দিতে শুরু করে। শুধু যে আবদুল্লাহ ইবন সালামের মতো ইহুদিদের সাথে তারা এমন আচরণ করতো তা নয়, আরবদের সাথেও এমনটাই করতো।

মদীনার সনদ অনুসারে মুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক ও রাসূলুল্লাহর প্রতি অনুগত থাকার কথা থাকলেও ইহুদিরা কখনো সে কথার ধার ধারেনি। প্রথম দিন থেকেই তাদের পন্থা ছিল শত্রুতা আর ঝগড়া-বিবাদ। ইহুদিদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও অপকর্ম মুসলিম ও ইহুদিদের মুখোমুখি দাঁড় করায়। বদর যুদ্ধের পর তাদের কর্মকাণ্ড সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বনু কায়নুকাকে বলেন, 'ইহুদিদের বলছি, তোমরা সতর্ক হও! নয়তো আল্লাহ কুরাইশদের মতো করে তোমাদের শাস্তি দিবেন। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। তোমরা ঠিকই জানতে পারবে যে, আমি ওয়াহীপ্রাপ্ত একজন রাসূল। তোমরা তোমাদের কিতাবেই তার প্রমাণ পাবে এবং আল্লাহর সাথে তোমরা যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ তাতেও এর প্রমাণ পাবে।'

প্রত্যুত্তরে শ্লেষভরে তারা বললো, 'মুহাম্মাদ! তুমি কি মনে করো আমরা তোমাদের সাথে আছি? ভ্রান্তির মধ্যে থেকো না। যাদের তুমি হারিয়েছ, তাদের যুদ্ধ সম্পর্কে

তেমন জ্ঞান নেই, তাই তুমি তাদের হারাতে পেরেছ। আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসলেই টের পাবে সত্যিকারের যোদ্ধা কাকে বলে!' এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বদরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন,

> "(হে নবী) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে সেসব (বিদ্রোহী) কাফিরদের আপনি বলে দিন, অচিরেই তোমরা (এ দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও) পরাজিত হবে এবং (পরকালে) তোমাদের জাহান্নামের (আগুনের) কাছে জড়ো করা হবে;(আর জাহান্নাম) তা তো হচ্ছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান! সে দল দু'টোর মধ্যে তোমাদের জন্যে (শিক্ষণীয়) কিছু নিদর্শন (মজুদ) ছিল, যারা (বদরের) সম্মুখসমরে একে অপরের সামনাসামনি হয়েছিল; (এদের মধ্যে) এক বাহিনী লড়ছিল আল্লাহর (দ্বীনের) পথে, আর অপর বাহিনীটা ছিল (অবিশ্বাসী) কাফিরদের, (এ সম্মুখসমরে) তারা তাদের (প্রতিপক্ষকে) তাদের দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল, আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাঁকে সাহায্য (ও বিজয়) দান করেন; এ (সব ঘটনার) মাঝে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের জন্যে অনেক কিছু শেখার আছে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২-১৩)

বদর যুদ্ধে সত্যের জয় হয়েছিল। যেকোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের জন্য বদর একটি শিক্ষা। মুসলিমরা যে সত্যের ওপর আছে--বদর তার প্রমাণ। এ যুদ্ধের সময় ইহুদিরা চোখের সামনে দেখেছিল, কীভাবে আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমরা বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু তবু তারা শত্রুতায় অটল থাকলো; ইসলামের সত্যতা উপলব্ধির সুযোগ পেয়েও তারা কাজে লাগালো না।

বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান

ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা মদীনা সনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। ক্রমাগত হুমকি-ধামকি, প্রকাশ্য শত্রুতা আর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তারা। মুসলিমদের সাথে তাদের বিরোধ হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে একটি ঘটনা ঘটে:

বদর যুদ্ধের পর। একদিন এক মুসলিম মহিলা বাজারে গেলেন। মদীনায় অলংকারের ব্যবসা ছিল ইহুদিদের হাতে। সেই মুসলিম মহিলা অলংকার কেনা বা বেচার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন। বাজারে এক দোকানের পাশে মেঝেতে বসলেন, ইহুদি দোকান মালিকের হাতে অলংকার দিলেন। সেখানে আরও কিছু ইহুদি লোক ছিল। তারা তাঁর মুখের পর্দা সরানোর জন্য পটাতে চাইলো। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। এর মধ্যে দোকানের মালিক চুপিচুপি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাপড়ের নিচ দিকটা পেরেক দিয়ে মাটির সাথে গেঁথে দিলো। মহিলা এসব খেয়াল করেননি। যখনই উঠে দাঁড়াতে গেলেন, পেরেকের টান খেয়ে তাঁর শরীর থেকে কাপড় সরে গেল। তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। একজন মুসলিম নারীকে এভাবে অপদস্থ হতে দেখে বাজারেরই এক মুসলিম পুরুষ প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তিনি ইহুদি

দোকানদারকে আক্রমণ করে মেরে ফেললেন। আর তার পরপরই ইহুদি মাস্তানগুলোও মুসলিম লোকটার ওপর চড়াও হলো। তাঁকে মারতে মারতে তারা মেরেই ফেললো। এর জের ধরে নিহত মুসলিম ব্যক্তির গোত্রের সাথে বনু কায়নুকার মারামারি বেঁধে গেল।

এই সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে প্রেরণ করা হলে তিনি মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে সেনাদল প্রস্তুত করে অভিযানে নামলেন। ঘটনাটি দ্বিতীয় হিজরী বছরের শাওয়াল মাসে। মদীনার অস্থায়ী গভর্নর ছিলেন আবু লুবাবাহ ইবন আল-মুনযির ؓ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দুর্গ আক্রমণ করে অবরোধ করলেন। তাদের জানিয়ে দিলেন, তাদের সাথে চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে।

১৫ দিনের জন্য তাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখা হলো। আর এই ইহুদিরা, যারা কিনা দু'দিন আগেও নিজেদের যুদ্ধ দক্ষতা নিয়ে আস্ফালন করছিল, তারা তখন দুর্গের মধ্যে ভয়ে কেঁপে অস্থির! উপায় না দেখে তারা আত্মসমর্পণ করতেও রাজি হয়ে গেল; কোনো প্রতিরোধ গড়লো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল মুনযির ইবন কুদামাহকে আদেশ দিলেন বনু কায়নুকার ইহুদিদের বেঁধে রাখতে।

ইহুদিদের বন্ধু, মুনাফিক্বদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই খুব কষ্ট পাচ্ছিল। ইহুদিদের এই করুণ পরাজয়ের দৃশ্য তাকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। সে আল মুনযিরকে আদেশের স্বরেই বললো,

- ওদের ছেড়ে দাও!

- কী! ছেড়ে দেবো মানে? আল্লাহর রাসূল আদেশ করেছেন এদের বেঁধে রাখতে আর তুমি বলছো এদের ছেড়ে দিতে? যে এদেরকে বাঁধন খুলে দেবে, আমি তাকে হত্যা করবো।

আল মুনযিরের কড়া জবাব পেয়ে আবদুল্লাহ ইবন উবাই বুঝতে পারলো এই মদীনা আর তার মদীনা নয়। এই মদীনা এখন আল্লাহর রাসূলের মদীনা, এখানে তার কথা চলে না। বাধ্য হয়ে সে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেল। ইহুদিদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো। বললো, 'আমার মিত্রদের প্রতি একটু সদয় হোন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সাড়া দিলেন না। ইবন উবাই দ্বিতীয়বার একই কথা বললো, 'আমার মিত্রদের প্রতি সদয় হোন, আপনার দোহাই লাগে!' রাসূলুল্লাহ পেছনে ফিরলেন, কিন্তু এবারও কোনো সাড়া দিলেন না। ইবন উবাই মরিয়া হয়ে উঠলো, সে রাসূলুল্লাহর ﷺ পকেটে আর বর্মের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উপেক্ষা করতে না পারেন।

'ছাড়ো আমাকে!' রাসূলুল্লাহকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন। তিনি বললেন, 'তোমার ওপর অভিশাপ পড়ুক! আমাকে যেতে দাও!'

ইবনে উবাই তার হাতের মুষ্টি আরও শক্ত করে বললো, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার মিত্রদের প্রতি সদয় হবেন না, ততক্ষণ আমি আপনাকে ছাড়ব না। তাদের মাঝে ৭০০ জন যোদ্ধা আমাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, আর আপনি তাদের সবাইকে এক সকালে মেরে সাফ করতে চান? আমি তো আমার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত বোধ করছি!'

'ঠিক আছে, তবে তারা তোমারই থাকবে।' ইবন উবাইয়ের চাপাচাপিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ছেড়ে দিলেন; হত্যা করলেন না। তবে মদীনা থেকে বের করার আদেশ দিলেন।

বনু ক্বায়নুক্বার লোকজন এ যাত্রায় জানে বেঁচে গেল। মদীনা থেকে বের হয়ে শামের (সিরিয়া) দিকে যাত্রা করল। যাত্রার তদারকিতে ছিলেন উবাদা ইবন সামিত ﷺ। মদীনা থেকে বেরোবার আগে তাদের কাছে থেকে যুদ্ধের গনিমত হিসেবে টাকা নেয়া হয়। এই টাকা মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

বনু কায়নুকার অভিযান থেকে শিক্ষা

প্রথমত, বিচক্ষণতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবন উবাইর সাথে সরাসরি শত্রুতা এড়িয়ে গেছেন। বরং ধৈর্যের সাথে তাকে সামাল দিয়েছেন। নম্রতা দেখানোর কারণে সম্ভাবনা ছিল যে, সে সত্যিকারের মুসলিম হবে আর মদীনায় ঐক্য ফিরে আসবে, যদিও সেটা হয়নি। তবে সংঘাত এড়িয়ে লাভ হয়েছে এই যে, তার মুনাফিক্বী ধীরে ধীরে আপনিই প্রকাশ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে বেশিরভাগ লোকই তার আসল উদ্দেশ্য ধরতে পেরে তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম নারীর সম্মান। আল্লাহর রাসূল ﷺ পুরো একটি গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন শুধু একজন মুসলিম নারীর সম্মান রক্ষার্থে। মুসলিম নারীর অধিকার ও ইজ্জত রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রাসূলুল্লাহর ﷺ এই একটি সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায়। আজকে মুসলিম বিশ্বে কত বোন কেঁদে চলেছেন, অথচ সাড়া দেওয়ার কেউ নেই। যেন দুনিয়া থেকে পুরুষ মানুষ উঠে গেছে। অথচ কথা ছিল, মুসলিম পুরুষ মাত্রই তার বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহও ﷺ আমাদের সে শিক্ষাই দিয়েছেন। পরবর্তী যমানার খলিফারাও সেই সুন্নাতেরই অনুসরণ করেছেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মু'তাসিমের সময়ে এক মহিলাকে রোমান এক সৈনিক লাঞ্ছিত করেছিল। আল-মু'তাসিম সেই বোনের আর্তিতে সাড়া দিয়ে তৎকালীন সুপারপাওয়ার রোমানদের বিরুদ্ধে পুরো একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন।

তৃতীয়ত, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা। এ প্রসঙ্গে উবাদা ইবন সামিতের ﷺ ঘটনা উল্লেখ্য। রাসূলুল্লাহর সাহাবি উবাদা ইবন সামিত জাহিলিয়াতের সময় ইহুদিদের বন্ধু ছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি নিজ থেকে গিয়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার আনুগত্য তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল আর মু'মিনদের প্রতি। আমি ঐসব

কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। যত যাই হোক, তাদেরকে আমি আর সমর্থন করবো না।' আবদুল্লাহ ইবন উবাই ঠিক সেই মুহূর্তে এসে উবাদাকে বললো, 'তুমি কী করে পারলে এই লোকগুলোকে ভুলে যেতে? এরা কি তোমাকে অমুক-অমুক সময়ে সাহায্য করেনি?' জবাবে উবাদা দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন,

'সেই দিন আর নেই আবদুল্লাহ, আমার অন্তর বদলে গেছে। ইসলাম আগের সকল বন্ধুত্বকে মুছে দিয়েছে। তুমি আজকে এমন কিছুকে আঁকড়ে ধরে আছো, যা আগামীকাল ভুল হিসেবে জানবে।'

বনু কায়নুকাকে মদীনা ছেড়ে যাওয়ার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। তারা উবাদাকে তাদের অতীত জীবনের বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করে যেন তাদের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তিনি তাদের বলেন, 'না, একটা ঘণ্টাও বাড়ানো হবে না। যেদিন থেকে তোমরা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ, সেদিন থেকে তোমরা আর আমার বন্ধু নও।'

ইবনে উবাই আর উবাদা -- দুটি মানুষ, দু'জনেই জাহিলিয়াতে ইহুদিদের বন্ধু ছিলেন, দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম পেয়ে উবাদা বদলে যান। আর ইবন উবাই যা ছিলো তাই রয়ে যায়। ইসলাম কিছু মানুষকে আপন করে, কিছু মানুষকে করে পর। জাহিলিয়াতে ইহুদিরা উবাদার বন্ধু হলেও ইসলাম গ্রহণের পর তারা উবাদার শত্রুতে পরিণত হয়। ইসলাম বন্ধুত্ব, আনুগত্য ও মিত্রতার নতুন সংজ্ঞা শেখায়। এ ঘটনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

> **"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (কখনো) ইহুদি-খ্রিস্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (কেননা) এরা নিজেরা (সব সময়ই) একে অপরের বন্ধু; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (কখনো) এদের কাউকে বন্ধু বানিয়ে নেয় তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে; আর আল্লাহ তাআলা কখনো জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। অতপর যাদের অন্তরে (মুনাফিক্বীর) ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে, তারা দৌড়ে গিয়ে তাদের সাথে এই বলে মিলিত হচ্ছে যে, 'আমাদের আশংকা হচ্ছে, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের ওপর আপতিত হবে।' পরে হয়তো আল্লাহ তাআলা (তোমাদের কাছে) বিজয় নিয়ে আসবেন কিংবা তার কাছ থেকে অন্য কিছু (অনুগ্রহ তিনি দান করবেন), তখন (তা দেখে এ) লোকেরা নিজেদের মনের ভেতর যে কপটতা লুকিয়ে রেখেছিল, তার জন্যে ভীষণ অনুতপ্ত হবে।" (সূরা মায়িদা, ৫: ৫১, ৫২)**

দ্বিতীয় আয়াতে ইবন উবাইয়ের কথা বলা হয়েছে। সে আশঙ্কা করছিল, যদি তার মিত্র ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, তাহলে সে বিপদে পড়বে। সে ধরেই নিয়েছিল ইহুদিদের সাথে থাকলেই সে নিরাপদে থাকবে। মুনাফিক্বরা সাধারণত কাফিরদের কাছেই আশ্রয় ও নিরাপত্তা খোঁজে, এটাই তাদের স্বভাব। আয়াতের বাকি অংশে

আল্লাহ বলেন তিনি মু'মিনদের বিজয় দেবেন। এর ফলে মু'মিনরা মুনাফিকদের প্রভু আর রক্ষক কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করবে।

> "(তখন) ঈমানদার লোকেরা বলবে, এরাই কি ছিল সেসব মানুষ, যারা আল্লাহ তাআলার নামে বড় বড় শপথ করতো (যে), তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে? (এই আচরণের ফলে) তাদের কার্যকলাপ বিনষ্ট হয়ে গেল, অতপর তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে মানুষ, তোমরা যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো, তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে (মুরতাদ হয়ে) ফিরে আসে, (তাতে আল্লাহ তাআলার কোনো ক্ষতি নেই) তবে আল্লাহ তাআলা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করবে না। (মূলত) এ (সাহসটুকু) হচ্ছে আল্লাহর একটি অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞার আধার।" (সূরা আল-মায়িদা, ৫: ৫৩, ৫৪)

মিডিয়া বা কাফিররা কী বলছে বিজয়ী দল কখনো তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ আযযা ওয়া জালকে সন্তুষ্ট রাখবে ততক্ষণ তা-ই যথেষ্ট।

কথার যুদ্ধ, মিডিয়ার যুদ্ধ

মদীনায় কিছু লোক মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়া যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এরা রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলতো এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতো। এই লোকগুলো কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের সরাসরি শত্রু থেকেও ভয়ঙ্কর; এদেরকে রাসূলুল্লাহ ছেড়ে দেননি। শাইখ ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আস-সারিম আল-মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল' কিতাবে এ প্রসঙ্গে বলেন:

"মুহারাবাহ, অর্থাৎ, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দুই প্রকারে হতে পারে: অস্ত্রের যুদ্ধ এবং কথার যুদ্ধ। কথা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে পারে অস্ত্রের যুদ্ধ থেকেও ভয়ংকর। আমরা দেখেছি, যারা মুখের কথা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হত্যা করেছেন, কিন্তু যারা কেবল অস্ত্র দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়েছে, তাদের কাউকে কাউকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর এই আইনটিকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

কথা ও কাজ -- দুভাবেই ফিতনা বা অশান্তি ছড়াতে পারে। কিন্তু কথার ফিতনা, কাজের ফিতনা থেকেও বহুগুণ বেশি ভয়ংকর। আবার অন্যদিকে কথার মাধ্যমে যে কল্যাণ অর্জিত হয়, তা কাজের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ থেকে অনেক গুণে বেশি। এটা

প্রমাণিত যে, আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে কথা দিয়ে যুদ্ধ করা অধিকতর নিকৃষ্ট অপরাধ। দ্বীনকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যত প্রচেষ্টা আছে, সেগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে কার্যকরী।"[1]

মদীনায় এরকম বেশ কিছু লোককে শায়েস্তা করা হয়, যারা আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আজেবাজে বকতো। একাধিক ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হলো কা'ব ইবন আশরাফের ঘটনা।

কা'ব ইবন আশরাফ: কাফির মিডিয়ার মুখপাত্র

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কথার কারণে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল কা'ব ইবন আল-আশরাফের গুপ্তহত্যা। কা'ব ছিল জাতিগতভাবে আরব। বনু নাযিরের এক ইহুদি মহিলাকে বিয়ে করে সে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। তার ধনদৌলতের কমতি ছিল না। একাধারে সে ভালো কবি আর বাকপটু। আরবরা তাকে বেশ সম্মান করতো। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যাম্পেইনে সে ছিল সবচেয়ে সরব। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ তৈরিতে তার ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ে শোকাহত কবি কা'ব ইবন আশরাফ অস্ত্র হিসেবে বেছে নিল কবিতার ভাষা। সে বলে বেড়াতে থাকে, মহান কুরাইশদের এভাবে পরাজিত হওয়ার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো ছিল। কবিতার মাধ্যমে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলতো। মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সাথে সময় কাটাতো, তাদের দুঃখের সঙ্গী হতো, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতো। মক্কায় বসেই রাসূলুল্লাহকে ﷺ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে সে বহু কবিতা লেখে। তার কবিতায় আরও এমন সব কথা থাকতো যা সহ্য করার মতো নয়। নাম উল্লেখ করে সে সাহাবিদের স্ত্রী ও তাঁদের সৌন্দর্য নিয়ে নোংরা কবিতা লেখা শুরু করে।

মুসলিমদের কাছে নারীদের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাদের একান্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। কা'ব ইবন আশরাফের মিডিয়া যুদ্ধের মোকাবেলায় রাসূলুল্লাহ প্রথমে বেছে নিলেন এই কাজের যোগ্য সাহাবি কবি হাসসান ইবন সাবিতকে ؓ। তিনি ছিলেন মুসলিমদের মাঝে সেরা কবি। হাসসান ইবন সাবিত এমন সব কবিতা লিখলেন যে মক্কার লোকেরা একে একে সবাই কা'ব ইবন আশরাফকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিল। তৎকালীন আরবে কবিতাই ছিল মিডিয়া। একটি তীক্ষ্ণ, সাহিত্যরসময় কবিতা মুহূর্তের মাঝে পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়তো; অনেকটা যেভাবে আজকাল কোনো একটি লেখা বা ছবি ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়। কবিতা যেমন কাউকে সম্মান এনে দিত, তেমনি এই কবিতাই ছিল কারো ইজ্জতহানি করার মোক্ষম অস্ত্র।

---

[1] আস-সারিম আল মাসলুল ১/৩৯২ (শামেলা সংস্করণ)

আজকের দিনের মিডিয়াও সেরকম। মিডিয়া মানুষকে যা বলে তা-ই মানুষ বিশ্বাস করে। মিডিয়া চাইলে যে কাউকে হিরো বানাতে পারে, আবার যে কাউকে বানাতে পারে সন্ত্রাসী। আন্তর্জাতিক মিডিয়া গোটা পৃথিবীর মানুষের চিন্তা প্রভাবিত করতে পারে, জনমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কা'ব ইবন আল-আশরাফও ঠিক একই কাজ করছিল, সে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে একটি মিডিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং সামরিক যুদ্ধের প্রভাবক হিসেবে কাজ করছিল।

মক্কা থেকে বিতাড়িত কা'ব মদীনায় ফিরে আসতে বাধ্য হলো। ফলে সে আবার মুসলিমদের হাতের নাগালের ভেতর চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্ষতি করেছে যে পাপিষ্ঠ, সেই কা'ব ইবন আল-আশরাফের হাত থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে এমন কে আছে?' এগিয়ে এলেন আনসারী সাহাবি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা ﷺ।

- আল্লাহর রাসূল, আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি?

- হ্যাঁ, চাই।

- তাহলে আমাকে কিছু (মিথ্যা) কথা বলার অনুমতি দিন।

- ঠিক আছে, অনুমতি দেওয়া হলো।

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ একা একাই কাবের কাছে গেলেন। বললেন, 'দেখো, কষ্টের কথা আর তোমাকে কী বলবো, এই মুহাম্মাদ লোকটা আমাদের কাছে সাদাকা (দান) চায় অথচ আমাদের নিজেদের পেটেই ঠিকমতো দানাপানি পড়ে না। তোমার কাছে এসেছি কিছু ঋণের জন্য।' মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা এসব কথা বলে কা'ব ইবন আশরাফের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

কাব বললো, 'সবে তো শুরু। আল্লাহর কসম, ঐ লোক তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে!'

- 'হুম, তার শেষ আমি দেখে ছাড়বো। তবে যেহেতু তাকে মেনে চলছি, এখনই তার সঙ্গত্যাগ করা মনে হয় ঠিক হবে না। সে যাই হোক, আমি তোমার কাছে কিছু খাবার ধার চাই। এই ধরো, দু-এক ওয়াসাক হলেই চলবে।'

- ঠিক আছে, কিছু একটা বন্ধক রাখো আমার কাছে।

- কী চাও তুমি?

- তোমাদের নারীদের বন্ধক রাখো।

- কী যে বলো তুমি! এটা কী করে হয়! তুমি হলে আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ!

- আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের ছেলেদের বন্ধক রাখো।

- না না, সেটাই বা কীভাবে করি! এটা খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। লোকে আমাদের ব্যাপারে বলাবলি করবে। সামান্য কিছু খাবারের জন্য আমরা আমাদের সন্তানকে বন্ধক

দিয়েছি! তারচেয়ে বরং তোমার কাছে কিছু অস্ত্র বন্ধক রাখি।

- আচ্ছা ঠিক আছে, তা-ই করো।

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ﷺ অস্ত্র আনতে চলে গেলেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায়, আরেকজন সাহাবি, কাবের দুধ ভাই আবু নাইলাও কাবের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে একইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, 'এই এক লোক মুহাম্মাদ! তার কারণে আজ আমাদের যত দুর্ভোগ! আরবরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে। আমাদের সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবার-পরিজন ধ্বংস হতে চলেছে। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েরা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।'

কাব বললো, 'আল-আশরাফের ছেলে আমি। পরিস্থিতি যে এই পর্যায়ে গড়াবে তা কি আমি তোমাদের বলিনি?'

রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলে আবু নাইলা কাবের কাছে বিশ্বস্ত হবার চেষ্টা করছিলেন। তিনিও কাবের সাথে কিছু অস্ত্রের বিনিময়ে খাবার কেনার চুক্তি করলেন। সেইসাথে আরও কিছু বন্ধুকে নিয়ে আসতে চাইলেন। বললেন যে তারাও অস্ত্র বন্ধক রেখে কিছু খাবার নিতে চায়। কা'ব রাজি হলো।

সেদিনের মতো তিনি চলে গেলেন। ফিরে এল পাঁচ জনের একটি দল। দিনটি ছিল ৩য় হিজরী, ১৪ রবিউল আউয়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁরদেরকে বাকী আল-গারকাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তাদের মিশন সফল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

আবু নাইলা কাবের বাসায় এসে তাকে ডাক দিলেন। কা'ব তখন মাত্র বিয়ে করেছে। তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী রাতের অন্ধকারে আবু নাইলার ডাক শুনে ভয় পেয়ে গেল। স্বামীকে বললো, 'কোথায় যাচ্ছো তুমি?'

কাব বললো, 'আমার ভাই আবু নাইলা আমাকে ডাকছে।'

- তুমি যেও না! আমি এই ডাকে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি!

- আরে চিন্তা কোরো না, ও আমার ভাই আবু নাইলা! যার পৌরুষ আছে, সে বর্শার লড়াইয়ে সাড়া দিতেও ভয় করে না।

নতুন স্ত্রীর কাছে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করে কা'ব নিচে নেমে এল। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, 'এক কাজ করি, চলো আজুজ ঘাঁটির দিকে যাই।' কা'ব রাজি হলো। তারা তাকে তার দুর্গ থেকে সরিয়ে দূরে নিতে চাচ্ছিলেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে, আবু নাইলা অথবা মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা -- দুজনের একজন কাবের চুলে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাহ! তোমার শরীর থেকে কী সুন্দর ঘ্রাণ আসছে!' কা'ব বললো এই সুঘ্রাণ তার স্ত্রীর থেকে এসেছে।

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আমি কি তোমার এই সুঘ্রাণ নিতে পারি?'

'অবশ্যই পারো!' কা'ব বললো।

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা কাবের চুল ধরে সুঘ্রাণ নিলেন। দলের অন্য সদস্যদের তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন, তিনি সংকেত দেওয়া মাত্র যেন তাঁরা একযোগে কাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা আবার গন্ধ শুঁকে দেখতে চাইলেন, কা'ব এবারও রাজি হলো। এইবার তিনি সুযোগমতো তার মাথা জাপটে ধরলেন, অন্যদের ডেকে বললেন, 'আসো তোমরা!' বাকিরাও এগিয়ে এলেন আর তরবারি দিয়ে কাবকে কোপাতে লাগলেন। কিন্তু শরীরে বর্ম থাকায় হত্যা করলে পারলেন না। কা'ব চিৎকার করে উঠলো, সাথে সাথে দুর্গের আলো জ্বলে উঠলো। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা ﷺ বুঝলেন সময় কম। একটা ছুরি বের করে কাবের তলপেটে সজোরে চালিয়ে দিলেন। কা'ব শেষ হয়ে গেল।

সবাই চলে এলেন। ধস্তাধস্তির সময় এলোপাতাড়ি তরবারি চালনার ফলে পাঁচ জনের একজন আহত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তাঁকে কোলে করে মদীনায় নিয়ে আসতে হয়। মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছেই তাঁরা দেখা পেলেন রাসূলুল্লাহর। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিশনের সাফল্য দেখে খুশিতে বললেন, 'এই মুখগুলো উজ্জ্বল হোক!' আর তাঁরাও বললেন, 'আপনার চেহারাও উজ্জ্বল হোক, ইয়া রাসূলুল্লাহ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ এগিয়ে এসে আহত সাহাবির ক্ষতস্থানে হাত রাখলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগের মতো সুস্থ হয়ে গেলেন।[2]

কা'ব ইবন আল-আশরাফের হত্যা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

১) সাহাবিদের নিবেদিত আত্মা। রাসূলুল্লাহর ﷺ যেকোনো আদেশ সাহাবিরা খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন। কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার দায়িত্ব নেওয়ার পর মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা দুশ্চিন্তায় তিন দিন কিছু খেতে পারেননি। এই খবর রাসূলুল্লাহর ﷺ পৌঁছলে তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা, কী হয়েছে তোমার?' তিনি জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো আপনাকে কথা দিয়েছি, কিন্তু জানি না সে কথা রাখতে পারবো কিনা।'

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভয় পাচ্ছিলেন এমনটা নয়। বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ দেওয়া মিশন সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। চিন্তায়, উদ্বেগে তিন দিনের জন্য তার খাওয়া-দাওয়াই বন্ধ হয়ে যায়। এটাই বলে দেয়, সাহাবিরা তাদের কাজের ব্যাপারে কতটা নিবেদিত ছিলেন। তারা

[2] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৩৮, ২৩৯; অধ্যায় বন্ধক, হাদীস ৩; অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ৮৪। কিতাবুল সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ১৪৬। সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ২৯২।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কোনো আদেশকে হালকাভাবে নিতেন না। যদি কথা দিতেন, তবে সেটা করেই ছাড়তেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শান্ত ও নির্ভার করতে বললেন, 'তুমি তোমার সাধ্যের সর্বোচ্চটা করো, ফলাফল আল্লাহর হাতে।' অর্থাৎ তুমি সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দাও, তাহলেই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তোমার আমলকে কবুল করবেন। তোমার কাজের পরিণতির জন্য তুমি দায়ী থাকবে না, দায়ী থাকবে কেবল সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছো কিনা সে ব্যাপারে। এরপর ফলাফল যা হওয়ার সেটাই হবে।

ভালো কাজে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। যাই করি না কেন, যেনতেনভাবে না করে তা সুন্দর ও সুচারুরূপে করা চাই। এবং একই সাথে দরকার নিজেদের করা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। কথা না রাখা মুনাফিক্বের লক্ষণ।

২) ঘটনার প্রতিক্রিয়া। আবু দাউদের একটি বর্ণনা[3] অনুসারে, এই ঘটনার পর ইহুদি এবং মুশরিকরা খুব ভয় পেয়ে যায়। তারা পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বলে, 'গতকাল রাতে আমাদের নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কা'বকে কেন হত্যা করা হয়েছে সে কথা উল্লেখ করেন। এরপর তাদের সাথে কৃত চুক্তি নবায়ন করেন বা তাদেরকে একটি অঙ্গীকারনামা লিখে নিয়ে আসতে বলেন যেখানে তারা এই ধরনের কাজ দ্বিতীয়বার না করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

৩) হত্যার কারণ। কাবকে কেন এবং কোন পন্থায় হত্যা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে শাইখ ইবন তাইমিয়্যার বিখ্যাত কিতাব আস-সারিম আল-মাসলুল আলা শাতিম আর-রাসূল। সেখানে আল-ওয়াকীদির একটি বর্ণনা এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে,

'পরদিন সকালে ইহুদিরা মুশরিকদের সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললো, আমাদের নেতাকে গত রাতে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি সে কোনো অপরাধ করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, যদি সে অন্যদের মতো চুপ থাকতো, তাহলে তাকে হত্যা করা হতো না। কিন্তু সে আমাদের কষ্ট দিয়েছে, তার কবিতার মাধ্যমে আমাদের ব্যঙ্গ করেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একই রকম কাজ করে, তাহলে তরবারি দিয়েই আমরা তার সাথে বোঝাপড়া করবো।'[4]

অর্থাৎ, ইহুদি ও মুশরিকদের অভিযোগ ছিল, কেন রাতের আঁধারে হামলা চালিয়ে অতর্কিতে কা'বকে হত্যা করা হয়েছে। তারা এই হত্যাকাণ্ডকে চুক্তিবিরোধী এবং বিচারবহির্ভূত হিসেবে সাব্যস্ত করতে চাইছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের বলেন, কা'বের মতো অনেকেই আছে যাদের অন্তরে ইসলামবিদ্বেষ আছে। কিন্তু কেবল

---

[3] আবু দাউদ, অধ্যায় কর, খাজনা, অনুদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে, হাদীস ৭৩।

[4] আস-সারিম আল-মাসলুল, পৃষ্ঠা ১৫২

কা'বকেই হত্যা করা হয়েছে কারণ সে কথার মাধ্যমে মুসলিমদের কষ্ট দিয়েছে এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছে।

কেন কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা করা হয়েছে, সে আলোচনায় শাইখ ইবন তাইমিয়্যা মন্তব্য করেন,

'কা'বকে হত্যা করা হয়েছে তার কবিতার জন্য, যা সে মক্কায় যাওয়ার আগেই লিখেছিল... কা'ব যা (অপকর্ম) করেছে সেগুলো করেছে জবান দিয়ে। কাফিরদের মৃত্যুতে তার রচিত শোকগাঁথা, (মুসলিমদের সাথে) যুদ্ধে (কুরাইশদের) উৎসাহ দেওয়া, তার অভিশাপবাণী, মানহানিকর কথাবার্তা, দ্বীন ইসলামকে ছোট করা এবং কাফিরদের দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়া -- সবকিছুই সে করেছে জবান দ্বারা। সে মুসলিমদের সাথে শারীরিকভাবে যুদ্ধ করেনি, বরং সে মুসলিমদের ক্ষতি করেছে তার জবান দিয়ে। এটা তাদের জন্য প্রমাণ, যারা (কা'বকে কেন হত্যা করা হয়েছে) এই বিষয়ে তর্ক করে। আর এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কবিতা এবং সম্মানহানির মাধ্যমে কষ্ট দেবে, তার জান-মালের কোনো নিরাপত্তা থাকে না।'[5]

৪) সামরিক অপারেশনে ধোঁকা দেওয়ার বৈধতা। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার কাছে মনে হয়েছিল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শত্রুর আস্থাভাজন হতে পারলে এই অপারেশনটি সফলভাবে করা যাবে। তাই তিনি মিথ্যা বলার অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সেটার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ যদি তার এ মিশন সফল করার জন্য কুফরি করার অনুমতি পান, তাহলে একজন মুসলিম এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিদেনপক্ষে কুফরি থেকে ছোট কাজ করার অনুমতি রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যদি শত্রুবাহিনীর মধ্যে একজন মুসলিমকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, সেক্ষেত্রে আলিমরা বলেছেন যে, সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়বে এবং বসে পড়তে না পারলে আঙুলের ইশারায় নামায পড়বে। সেটাও সম্ভব না হলে চোখের ইশারায় নামায পড়বে। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ নবীজি ﷺ সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন। সাধারণ অবস্থায় এটা ভয়াবহ কুফরি। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে সেটা অনুমোদিত ছিল। অর্থাৎ, সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।

৫) ইহুদিদের সাথে শত্রুতা জাতিগত কারণে নয়। ধর্মবিশ্বাসে কা'ব ইহুদি হলেও জাতিগতভাবে ছিল আরব। এটিই প্রমাণ করে, ইহুদিদের প্রতি মুসলিমদের যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তা জাতিগত কারণে নয়। হিটলারের আদর্শ ছিল জাতীয়তাকেন্দ্রিক। সে ভাবতো, ইহুদি জাতি থেকে জার্মান জাতি উত্তম। আমরা সেরকমটা মনে করি না। জাতিপরিচয় নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমাদের আপত্তি মনমানসিকতা নিয়ে। ইহুদিরা তাদের হীন মনমানসিকতার জন্যই মুহাম্মাদ ﷺ

---

[5] আস সারিম আল মাসলুল, ১/৮৪ (শামেলা সংস্করণ) ।

এবং মুসলিমদের নামে কটূক্তি করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ধোঁকা দেয়। তাদের পরিচয় নয়, বরং তাদের কাজই তাদেরকে মুসলিমদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়।

৬) সব যুদ্ধ ময়দানে হয় না। অনেক সময় গুপ্তহত্যার মাধ্যমে আল্লাহর দুশমনদের অনেক বেশি ক্ষতি করা সম্ভব। কা'ব ইবন আল-আশরাফের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তাকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন, ইসলামবিদ্বেষীদের মিডিয়া প্রোপাগান্ডার জবাব কেবল মিডিয়া দিয়েই দিতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ হাসসান ইবন সাবিতকে দিয়ে যেমন কা'ব ইবন আশরাফকে মিডিয়ার ময়দানে মোকাবেলা করেছেন, তেমনি তিনি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহকে পাঠিয়েছেন তাকে হত্যা করার জন্য। আল্লাহর রাসূলকে গালি দেওয়া কুফরি, আর এই কাজের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।

বদর এবং উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক কর্মকাণ্ড

১) গাযওয়াহ আল কুদর

বদর যুদ্ধের মাত্র সাত দিন পরেই এই অভিযান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারে যে, বনু সালিম গোত্র মুসলিমদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আকস্মিকভাবে তাদেরকে আগেভাগে আক্রমণ করে বসেন। এ অভিযানে তেমন কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বনু সালিম গোত্র পাঁচশো উট রেখে পালিয়ে যায়। উটগুলো মুসলিমদের মাঝে গনিমত হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের ভাগে দুটো করে উট পড়ে।

২) গাযওয়াহ আস-সাউয়ীক

বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার লজ্জা মোচন করতে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইহুদি গোত্র বনু নাযিরের কাছে যায়। বনু নাযির গোত্রের প্রধান সাল্লাম ইবন মিশকামের বাসাতেই মেহমান হিসেবে ওঠে। মদীনার উপকণ্ঠে কীভাবে আকস্মিক আক্রমণ করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়। ইহুদিদের কাছ থেকে কুরাইশরা অনেক মূল্যবান তথ্য লাভ করে। আবু সুফিয়ান ঠিক করলো, আকস্মিক আক্রমণ করে মুসলিমদের ভড়কে দেবে। সে কিছু সৈন্য নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে উরাইদ নামের এক স্থানে অতর্কিতে আক্রমণ করে দুইজন মুসলিমকে হত্যা করে। এরপর একটা খেজুর বাগানে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইশো সৈন্য নিয়ে তাদের তাড়া করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান তার সৈন্যসমেত পালিয়ে যায়। পালাবার সময় নিজেদের খাবার ফেলে চলে যায়। তবে কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

৩) গাযওয়াহ যি আমর

রাসূলুল্লাহর ﷺ গোয়েন্দা বিভাগ এবারও খবর পেয়ে যায় সালাবা এবং মুহারিব -- এ

দুটি গোত্র মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। তিনি সাড়ে চারশো মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে গোত্র দুটোর দিকে অগ্রসর হন। পথে হুবার নামে শত্রুপক্ষের এক লোককে গ্রেফতার করা হলো। তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলে সে মুসলিম হয়ে যায়। ওদিকে রাসূলুল্লাহর সেনাবাহিনী আসছে খবর পেয়ে গোত্র দুটো আশেপাশের পাহাড়ী এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালিয়ে যায়। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়দেরকে দাপট দেখানো আর বেদুইনদের সন্ত্রস্ত করে রাখা।

এ অভিযানে একটি মজার ঘটনা ঘটে, একটি মু'জিযা। যখন মুসলিমরা সেখানে পৌঁছালো, তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাপড় ভিজে চুপসে একাকার। তিনি বর্ম খুলে গায়ের কাপড় একটা গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে কাপড় শুকানোর অপেক্ষায় গাছের নিচেই শুয়ে পড়লেন। কখন যেন চোখ লেগে গেল। এমন সময় শত্রুপক্ষের মুহারিব গোত্রপ্রধান দাসুর ইবন আল-হারিস চুপিচুপি সেখানে চলে এল, হাতে খোলা তরবারি! রাসূলুল্লাহর ওপর দাঁড়িয়ে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে মুহাম্মাদ! কে তোমাকে এখন আমার হাত থেকে বাঁচাবে?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অকস্মাৎ আক্রমণে একটুও না ভড়কে আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিলেন, 'আল্লাহ আমায় রক্ষা করবেন।' আর এ কথা বলার সাথে সাথে দাসুরের হাত থেকে তার তরবারি পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারিটি কুড়িয়ে নিয়ে দাসুরের সামনে দাঁড়ালেন, 'দাসুর! তোমাকে এখন কে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?'

মুহূর্তের মাঝে দৃশ্যপট বদলে গেল। দাসুর ভড়কে যায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে থাকে, আল্লাহর রাসূলও তাকে মাফ করে দিলেন। দাসুর এরপর মুসলিম হয়ে যায়। এই কাহিনী গিয়ে তার গোত্রকে শোনায়, 'জানো কী হয়েছে? এক ইয়া লম্বা লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালো আর আমার বুকে ধাক্কা দিল।'

এই লম্বা লোকটি ছিলেন আসলে জিবরীল। ঘটনাটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মু'জিযা। দাসুর তার গোত্রের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিলে অনেকেই মুসলিম হয়ে যায়।

৪) সারিয়াহ আল ক্বারদাহ

ক্রমাগত সামরিক অভিযানের মুখে কুরাইশরা আর্থিক সংকটে পড়ে যায়। এছাড়া মক্কা থেকে সিরিয়াগামী যে বাণিজ্যপথ ছিল তাও হুমকির মুখে। হন্যে হয়ে কুরাইশরা ভিন্ন একটি পথে তাদের ব্যবসায়িক পণ্য বহনের চিন্তা করে। নজদ হয়ে এরপর সিরিয়া প্রবেশের একটি পথ বেছে নেওয়া হয়, যদিও সেটাও ছিল বেশ খরচসাপেক্ষ। তাদের এই নতুন পথে হানা দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদ ইবন হারিসের নেতৃত্বে একশো মুসলিম বিশিষ্ট সারিয়া প্রেরণ করেন। তাঁরা সফলভাবে কুরাইশ কাফেলা আক্রমণ করেন। কাফেলার প্রহরীরা পালিয়ে যায় আর মুসলিমরা কাফেলা দখল করে নেয়।

সামরিক অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য

#১ এই অভিযানগুলো মুসলিমদের জন্য নিছক সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না। বরং অন্যান্য ইবাদতগুলোর মতোই জিহাদ করাও একটি ইবাদত। আবার যখন জিহাদ করা ফরয হয়, তখন এর প্রশিক্ষণ নেওয়াও ফরয। এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর ইবাদতও করছিলেন।

#২ এই যুদ্ধগুলো চলাকালীন সময়ে সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাতে পারতেন। তাঁর সাথে ভ্রমণ, খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাফেরা করতে করতে রাসূলুল্লাহর ﷺ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কতরকম পরিচয় যে সাহাবিদের সামনে ফুটে উঠতো তার ইয়ত্তা নেই। ফলে সাহাবিরা অনেক কিছু শিখতেও পারতেন। এভাবেই আমরা বহু সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

#৩ এই অভিযানগুলো মুসলিমদের জামাতবদ্ধ হয়ে থাকতে শেখায়। দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হলে আনুগত্য, নিয়ম মেনে চলা, আত্মত্যাগের মতো গুণ থাকা চাই। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দীর্ঘ সময় থাকতে থাকতে সাহাবিরা এই কঠিন গুণগুলো আত্মস্থ করতে শিখেছিলেন। উম্মাহর সক্রিয় অংশ হিসাবে কীভাবে বাস করা যায় তার জন্য এটি ছিল একটি শিক্ষা। এই শিক্ষা খুব জরুরি। কারণ ইসলাম কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, এটি সামষ্টিক ধর্ম। ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই সমষ্টিগতভাবে পালন করা হয় যেমন সালাত, হজ্জ, উমরা, জিহাদ ইত্যাদি।

#৪ এই অভিযানগুলোতে শত্রুরা পালিয়ে যাওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে শত্রুর ঘাঁটিতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছেন। এই অবস্থানকে আধুনিক যুগের 'সামরিক মহড়া'র সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিবেশী গোত্রগুলোকে মুসলিম সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সতর্ক করে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

সাহাবিদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করেন। যেমন তিনি উমারের رضي الله عنه মেয়ে হাফসাকে رضي الله عنها বিয়ে করেন। হাফসার প্রথম স্বামী মারা যাবার পর উমার رضي الله عنه গেলেন উসমানের رضي الله عنه কাছে, নিজেই মেয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। উসমান ফিরিয়ে দিলে এরপর গেলেন আবু বকরের رضي الله عنه কাছে, আবু বকর কিছুই বললেন না। এর কিছুদিন পর আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই প্রস্তাব পাঠিয়ে হাফসাকে বিয়ে করে নেন। হাফসা এভাবে হয়ে গেলেন উম্মুল মু'মিনীনদের একজন।[6] এখানে দেখার মতো বিষয়, সাহাবিদের উদারচেতা আচরণ।

---

[6] আন-নাসাঈ, অধ্যায় বিবাহ, হাদীস ৫৩।

যোগ্য পাত্র পেলে তাঁরা নিজেরাই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তুলতেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনোরকম অহম বোধ বা অযথা সংকোচ কাজ করতো না।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মেয়ে ফাতিমার ﵂ বিয়ে দেন আলীর ﵁ সাথে। আলী তখন যুবক, হাতে তাঁর অর্থকড়ি নেই বললেই চলে। এদিকে ফাতিমার ﵂ বিয়ের বয়স। আলী তাঁকে বিয়ে করতে চান, রাসূলুল্লাহর কাছেও আসেন। কিন্তু লজ্জায় বিয়ের কথা তুলতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন নিজ থেকেই জানতে চাইলেন আলী কি ফাতিমাকে বিয়ে করতে চান কিনা। আলী বললেন,

- হ্যাঁ চাই, কিন্তু মোহরানা আদায় করার মতো কিছুই আমার নেই।
- তোমরা একটা বর্ম আছে না? ওতেই চলবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন।

আলী সেই বর্ম দিয়েই মোহরানা আদায় করলেন। বিয়ে হয়ে গেল আলী আর ফাতিমার। মদীনার নেতার মেয়ের বিয়ের মোহর হলো সামান্য একটি বর্ম। রাসূলুল্লাহ নিজে যেমন অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন, তেমনি নিজ পরিবারকেও সাদামাটা জীবনে উৎসাহ দেন। আলী আর ফাতিমার সংসার ছিল সাদাসিধে সংসার। বিলাসিতা তাঁদের জীবনে কখনোই ছিল না।

উহুদের যুদ্ধ

প্রেক্ষাপট

১) ধর্মীয় বিরোধ

কুরাইশের লোকজন দ্বীন ইসলামের অগ্রগতি মেনে নিতে পারছিল না।

> "নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ (এ খাতেই) ব্যয় করেছে যে, (এর দ্বারা) মানুষদের আল্লাহ তাআলার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে; (এদের জন্য তুমি ভেবো না)। এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরও ব্যয় করবে, অতপর একদিন সে (ব্যয় করা) টাই তাদের জন্যে মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর (দুনিয়ার জীবনেও) তারা পরাভূত হবে, আর যারা কুফরি করেছে আখিরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে।" (সূরা আনফাল, ৮: ৩৬)

কাফিররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখতে তাদের সম্পদ খরচ করবে। ইমাম আশ-শাওকানি এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, 'এই কাফিররা রাসূলের ﷺ সাথে যুদ্ধ করে, সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করে, তার জন্য যত লাগে অর্থ খরচ করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখা।'[7] বর্তমানকালেও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ইসলামের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আল্লাহর দুশমনরা ব্যয় করছে লক্ষ লক্ষ ডলার, যেন আল্লাহর আউলিয়াদের হত্যা করতে পারে, তাদের পাকড়াও করতে পারে, ইসলামের সুনাম মিটিয়ে দিতে পারে। এ যুগের কাফিররাও কুরাইশদের চেয়ে ব্যতিক্রম নয়।

২) প্রতিশোধ

কুরাইশরা চাচ্ছিল বদর যুদ্ধের গ্লানি মুছে যাক। বদরে পরাজয় তাদের অন্তর্জ্বালা বাড়িয়ে দেয়, তাই তারা প্রতিশোধের পথ খুঁজছিল।

৩) অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ

কুরাইশদের ওপর ক্রমাগত সামরিক হামলা তাদেরকে চাপের মুখে ফেলে দেয়। কুরাইশরা ছিল আরব গোত্রগুলোর চোখে শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের ব্যবহারের জন্য সিরিয়া ও ইয়েমেনের বাণিজ্যিক পথ বেদুইনরা উন্মুক্ত রেখেছিল। কিন্তু মুসলিমদের উত্থানের সাথে পরিস্থিতি ইতিমধ্যে অনেকটাই বদলে গেছে। কুরাইশরা ছিল কাবা ঘরের অভিভাবক। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর দ্বীনকে তারা পরিত্যাগ করেছে, তাই আল্লাহ তাদের

---

[7] তাফসির ফাতহুল কাদির, ৩/১৭৮।

জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে দিলেন। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথ অনিরাপদ হওয়ার কারণে মক্কা থেকে ইয়েমেন গিয়ে ব্যবসা করার ওপরও প্রভাব পড়ে। কারণ কুরাইশরা সিরিয়া থেকে কাঁচামাল কিনে তা ইয়েমেনে বিক্রি করতো, আবার ইয়েমেন থেকে কিনে সিরিয়াতে বিক্রি করতো। একটা বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়ার ফলে, সেই পথের ব্যবসা তো বটেই, অন্য পথের ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কুরাইশদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধ কেবল ময়দানের যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং একই সাথে তা ছিল অর্থনৈতিক যুদ্ধ। কুরাইশদের শঙ্কা সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার একটি কথাতেই পরিষ্কার বোঝা যায়,

'মুহাম্মাদ আর তার দলবল আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। বুঝতে পারছি না এখন কী করবো। অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তারা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর সাথেও শান্তিচুক্তি বা মিত্রতা করে রেখেছে। প্রতিনিয়ত সেখান থেকে হুমকি আসছে। এখন আমরা কোথায় থাকবো? কোথায় যাব? আমাদের ব্যবসা গ্রীষ্মে সিরিয়াগামী কাফেলা আর শীতে ইয়েমেন ও আবিসিনিয়াগামী কাফেলার ওপর নির্ভরশীল। যদি সেই ব্যবসা বন্ধ করে নিজের দেশে বসে থাকি তাহলে জমানো মূলধন ভেঙে খেতে হবে। আর দেখতে দেখতেই সেটা শেষ হয়ে যাবে।'

৪) রাজনৈতিক আধিপত্য পুনরুদ্ধার

আরব উপদ্বীপের সবাই কুরাইশদের সমীহের চোখে দেখত। কিন্তু মুসলিমদের উত্থান তাদের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র আধিপত্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়। তাই আরেকটি যুদ্ধে মুসলিমদের হারানোর মাধ্যমে তারা এই আধিপত্য ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে পড়ে।

কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি

সময়টি ছিল হিজরী ৩য় বছর, শাওয়াল মাস। কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। তিন হাজার সৈন্যবিশিষ্ট এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটায়। এই বাহিনীতে পুরুষদের সাথে নারী, দাস, এমনকি প্রতিবেশী গোত্রগুলোও অংশ নেয়। আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, ইকরিমা ইবন আবু জাহলের মতো কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনেকেই তাদের স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে আসে। নারীদের মূল ভূমিকা ছিল পুরুষদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা, বদরে পরাজয়ের তিক্ত ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করে রাখা। এই যুদ্ধের অর্থায়ন করা হয় বদরের সময় আবু সুফিয়ানের হাতে রক্ষিত সেই বিশাল কাফেলার মালামাল বিক্রি করে। সেই কাফেলাকে কেন্দ্র করেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বলা হয়ে থাকে, এই কাফেলায় মক্কার প্রত্যেক পরিবার কিছু না কিছু বিনিয়োগ করেছিল।

রাসূলুল্লাহর গোয়েন্দা বিভাগ ছিল সদা সক্রিয়। এবার আল-আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ মক্কায় বসে রাসূলুল্লাহর ﷺ হয়ে কাজ করছেন। তিনি নিয়মিত

রাসূলুল্লাহকে ﷺ মক্কার তথ্য পাঠাতেন। মদীনায় চলে আসার জন্য তাঁর অন্তর অস্থির হয়ে ছিল। কিন্তু তিনি মক্কায় থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন, তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মক্কাতেই থাকতে বলেন। কুরাইশদের যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা রাসূলুল্লাহকে ﷺ মাত্র তিনদিনের মধ্যে বার্তা পাঠিয়ে জানাতে সক্ষম হন। সে সময়কার যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে মাত্র তিনদিনে খবর দিতে পারাটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। চিঠির ভাষ্য ছিল অনেকটা এমন,

'কুরাইশরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়তে বিশাল সেনাবাহিনী জড়ো করেছে। আপনি আপনার পরিকল্পনা মোতাবেক তাদের মোকাবেলা করুন। তাদের সেনাদলে আছে তিন হাজার সৈনিক, দু'শো ঘোড়া, বর্ম পরিহিত সাতশো যোদ্ধা এবং তিন হাজার উট। তারা তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ যুদ্ধে নামতে যাচ্ছে।'

চিঠিটি পড়ে শোনান উবাই ইবন কা'ব ﷺ। তাঁকে খবরটি গোপন রাখার আদেশ করা হয়। আব্বাসের পাঠানো তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-হুবাব ইবন আল-মুনযিরকে কুরাইশ বাহিনীর মাঝে পাঠান। তিনিও মোটামুটি একই তথ্য নিয়ে ফিরে আসেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ পাল্টা পরিকল্পনা

কুরাইশদের পরিকল্পনার কথা জানার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ মানুষের কাছে এসব খবর গোপন রাখেন। তিনি প্রথমে যান আনসারদের প্রধান সাদ ইবন রাবীর কাছে। কুরাইশদের মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনার কথা তাঁর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করে তাঁর মতামত জানতে চান। চলে যাওয়ার আগে সাদকে পুরো বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে যাবার পর, সাদ ইবন রাবীর স্ত্রী এসে জানতে চাইলো,

- আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলে গেলেন?
- সেটা তোমার না জানলেও চলবে, সাদ জবাব দিলেন।
- আমি কিন্তু সবই শুনে ফেলেছি!
- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

সাদ চিন্তায় পড়ে গেলেন। স্ত্রীর সাথে খুব রাগ করলেন। রাসূলুল্লাহকে জানালেন যে তাঁর স্ত্রী তাদের কথোপকথন শুনতে পেয়েছে, তিনি নিজে থেকে কিছু জানাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আচ্ছা, বাদ দাও, তাকে ছেড়ে দাও।'

এখানে শিক্ষা হলো, গোপনীয়তা রক্ষা করার গুরুত্ব। গোপন কথা গোপনই থাকবে, কাউকে বলা যাবে না। নিজের পরিবারের সদস্যদেরকেও না। মুসলিমদের নিরাপত্তা

ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুতর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু সেসব সাহাবিদের সাথেই যোগাযোগ করতেন, যাদের বিষয়টি জানার প্রয়োজন আছে। এই নীতিটিকে বলা হয়ে 'দরকারের ভিত্তিতে জানা' (Need to know basis), শুধু সে-ই জানবে, যার জানা দরকার।

সা'দ ইবন রাবী তার স্ত্রীকে নিজ থেকে তাই কিছুই বলেননি। অথচ তিনি বলতে পারতেন, 'দেখেছো! আল্লাহর রাসূল ﷺ এসেছিলেন আমার কাছে পরামর্শের জন্য!' এমন নয় যে তাঁর স্ত্রীকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। বরং তাঁর স্ত্রীর জানার দরকার নেই বলেই তাকে কিছু বলেননি। বিশ্বাসই সবকিছু নয়, প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই তথ্য আদান-প্রদান করা উচিত।

অনেকে মনে করে স্বামীর তার স্ত্রীর সাথে সব কথা ভাগাভাগি করা উচিত, এ ধারণাটা ঠিক নয়। কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলো কাছের মানুষদেরও বলতে হয় না। অনেক নারীর হয়তো কথাটা পছন্দ হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি আবেগী হয়। তাই তারা অনেকসময় পুরুষদের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে না। এর মানে এই নয় যে, এই ঘটনার ধুয়া তুলে পুরুষরা সবকিছুই স্ত্রীর কাছে গোপন রাখবে! যেগুলো জানার অধিকার একজন স্ত্রীর আছে, সেসব তাকে বলতে হবে। তবে বিশেষ করে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থ সংক্রান্ত বা নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলো গোপন রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের ডাকলেন, আলোচনা শুরু হলো। কীভাবে কী করা যায়। মূলত দুটি মত পাওয়া গেল।

এক পক্ষ বললো, আমাদের মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা উচিত। মদীনাকে আমরা দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করবো। এভাবে যুদ্ধ করলে নারী আর শিশুরাও ছাদ থেকে পাথর ছোঁড়ার মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ আর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের প্রস্তাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রস্তাব করেছিলেন কৌশলগত কারণে। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই এই মতামত দিয়েছিল কেননা সে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে খুবই ভয় পাচ্ছিল।

অপরদিকে অধিকাংশের মতামত ছিল মদীনার বাইরে গিয়ে খোলা ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করা। মদীনার ভেতরে কাফিরবাহিনী ঢুকবে, ঢুকে মুসলিমদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করবে--তাদের মতে এটা খুবই লজ্জার বিষয়। যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারাই মূলত এই মত দিচ্ছিল। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে তাদের কেবলই মনে হচ্ছিল যেন তারা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছেন। তাই এবারের যুদ্ধে যেতে তারা উন্মুখ হয়ে ছিলেন! তাদের আশঙ্কা ছিল যে শত্রুরা হয়তো মদীনায় ঢোকার সাহসই করবে না। আর সেক্ষেত্রে যুদ্ধ যদি না হয় তাহলে তারা লড়বেন কার সাথে! তাদের চাপাচাপিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় মতটাই গ্রহণ করলেন।

সভা শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে গিয়ে বর্ম পরে ফিরে এলেন। সাহাবিদের তখন মনে হলো রাসূলুল্লাহকে ﷺ এত চাপাচাপি করা হয়নি। তখন তারা নিজেদের মধ্যেই তর্ক জুড়ে দিল, 'আল্লাহর রাসূল একটা মত দিলেন আর তোমরা ভিন্নমত দিচ্ছো! হামযা, তুমি যাও, এখনই গিয়ে তাঁকে বলো যে উনি যা ভালো মনে করবেন, আমরা সেটাই করতে রাজি আছি।'

হামযা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে সে কথা বললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বললেন 'যখন বর্ম পরে একজন নবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, তখন সে বর্ম খুলে ফেলা তাঁর জন্য সংগত নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে ফায়সালা করেন।' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, এখন বাস্তবায়নের পালা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা যাবে না। যদি একজন রাসূল শুরা বা আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি সেই গৃহীত সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন করবেন।

নেতৃত্বের দুটো শিক্ষা

১) সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা

একজন নেতার সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা উচিত নয়। তার যখন-তখন সিদ্ধান্ত বদল করা চলবে না। কারো কথা বা চাপাচাপিতে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তীতে দোলাচলে পড়া কাম্য নয়। সে সকলের মতামত শুনবে, আলোচনা করবে এবং তারপর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটা যাবে না; সেটাই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে যদি কোনো নতুন তথ্য আসে, অথবা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে। নতুবা আগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে কার্যকর থাকবে। নেতা যদি সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, তাহলে তার অধীনস্থরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা সৈনিকদের কাছে খুবই অপছন্দনীয় একটি বিষয়। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে একেকটা সিদ্ধান্তের ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নেতার জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যখনই কোনো নেতা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেটা চূড়ান্ত হবে। লোকের কথায় চট করে তা পাল্টে ফেলা যাবে না।

২) মতপ্রদানের আবহ বিরাজ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে তাদের নিজস্ব মতামত দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতেন। ব্যাপারটা এমন হতো না যে, সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর সামনে নিজেদের মত দিতে ভয় পাচ্ছেন বা অস্বস্তি বোধ করছেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন মিশুক প্রকৃতির, খোলা মনের মানুষ। যেসব বিষয়ে ওয়াহী নাযিল হয়নি, সেসব ব্যাপারে তিনি অন্যদের মত শুনতেন, ভালো মনে হলে গ্রহণ করতেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন, যেহেতু তিনিই নেতা।

ময়দানের উদ্দেশে যাত্রা

উহুদ পাহাড়ের পাশে তাঁরা তাঁদের গন্তব্য স্থির করলেন। মদীনা থেকে মাইলখানেক দূরে অবস্থিত উহুদ একটি বিশাল পর্বত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যাত্রার সময় হিসেবে ইচ্ছে করেই বেছে নিলেন মধ্যরাত। এসময় ক্লান্ত কুরাইশ বাহিনীর ঘুমিয়ে থাকার কথা। মুসলিম সৈন্যবাহিনী যাত্রা শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'কেউ কি এমন পথ দেখাতে পারবে যেটা দিয়ে গেলে শত্রুরা আমাদের গতিবিধি টের পাবে না?' আবু খাইতামা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এ কাজে এগিয়ে এলেন। তাঁরা সাধারণের চলাচলের পথ ছেড়ে কৃষিজমির ওপর উঠলেন। রওনা হলেন মদীনার বাইরে উহুদ অভিমুখে।

পথিমধ্যে মিরবা ইবন কাইযী নামের এক অন্ধ মুনাফিকের কৃষিজমি পড়ল। যখন তাঁরা খামারের কৃষিজমির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই কৃষিজমির ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়নি। মিরবা ক্ষেপে গেল, সে মুসলিম সেনাদলকে উদ্দেশ্য করে কাদা ছুড়তে লাগলো। রাগে অন্ধ হয়ে বললো, 'তুমি যদি আল্লাহর রাসূলও হও, তাহলেও আমি তোমাকে আমার বাগানে প্রবেশ করার অনুমতি দেবো না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো পাত্তা দিলেন না। বাহিনী নিয়ে যেমন চলছিলেন চলতে লাগলেন। অন্ধ লোকটা এবার বললো, 'আল্লাহর কসম! আমি যদি পারতাম, তাহলে মুহাম্মাদ আমি শুধু তোমার মুখেই কাদা ছুঁড়ে মারতাম।' সাহাবিরা রেগে গেলেন, তাকে মেরে ফেলতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও, এই অন্ধের অন্তর আর চোখ দুটোই অন্ধ', তাঁরা তাকে একা রেখে চলে গেলেন।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো, ইসলামে ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর সামষ্টিক স্বার্থ প্রাধান্য পায়। উপরোক্ত ঘটনায় ক্ষতি হয়েছে একজনের, কিন্তু তার বিনিময়ে অন্য সকলে লাভবান হয়েছে। কাজেই, যখন প্রয়োজন হবে, তখন ব্যক্তির ওপর সমাজের স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে।

যুদ্ধে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা: মুনাফিক্ব বনাম মু'মিন

মুসলিম সেনাবাহিনীতে ছিল এক হাজার সেনা। তারা আশ-শাউত বাগানে পৌঁছার পর মাঝপথে এসে মুনাফিক্ব নেতা আব্দুল্লাহ ইবন উবাই হঠাৎ করেই তার তিনশো সেনা নিয়ে বেরিয়ে গেল। 'মুহাম্মাদ ছেলে-ছোকড়াদের কথা শুনে মদীনার বাইরে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। এদের কথার কী কোনো দাম আছে! আর সে আমার মতামতকে দামই দিল না।' – এই খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে সে মদীনার পথ ধরলো।

ইবন উবাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ক্যাম্পে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা, তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। কিন্তু আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন মু'মিন ও মুনাফিক্বদের পৃথক করে দিতে।

সাধারণ শান্তিময় পরিবেশে মু'মিন আর মুনাফিক্বের মধ্যে পার্থক্য করা খুব কঠিন। যে কেউ মুনাফিক্ব হতে পারে। হতে পারে মসজিদে বসে ইবাদত করা লোকটা একজন মুনাফিক্ব। এমনকি একজন আলিম, হুজুর বা মুফতিও মুনাফিক্ব হতে পারে। কিন্তু একটা জায়গায় মুনাফিক্বদের পরিচয় বের হয়ে যায়, তা হলো যুদ্ধের ময়দান।

> "তোমরা বর্তমানে যে (ভালো মন্দে মিশানো) অবস্থার ওপর আছো, আল্লাহ তাআলা কখনো তার ঈমানদার বান্দাদের সে অবস্থা ওপর ছেড়ে দিতে চান না, যতক্ষণ না তিনি সৎলোকদের অসৎ লোকদের থেকে আলাদা করে দেবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৭৯)

> "(উহুদের ময়দানে) দুদলের সম্মুখ লড়াইয়ের দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিল, তা (এসেছে) আল্লাহর ইচ্ছায়, এ (বিপর্যয়) দিয়ে আল্লাহ তাআলা (এ কথাটা) জেনে নিতে চান, কারা তাঁর ওপর (সঠিক অর্থে) ঈমান এনেছে। (এর মাধ্যমে) তাদের (পরিচয়ও) তিনি জেনে নেবেন, যারা (এই চরম মুহূর্তে মুনাফিক্বী) করেছে। এ মুনাফিক্বদের যখন বলা হয়েছিল যে, (সবাই একসাথে) আল্লাহর পথে লড়াই করো, অথবা (অন্ততপক্ষে নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষাটুকু তোমরা করো, তখন তারা বললো, যদি আমরা জানতাম আজ (সত্যিই) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। এ সময় তারা ঈমানের চাইতে কুফরিরই বেশি কাছাকাছি অবস্থান করছিল, এরা মুখে যা কিছু গোপন করে আল্লাহ তাআলা তা সম্যক অবগত আছেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৬৬-১৬৭)

অর্থাৎ মুনাফিক্বদের পিছু হটার কারণ হলো জিহাদ। আরও দুটি গোত্র পিছু হটার উপক্রম করেছিল-- বনু সালিমা এবং বনু হারিসা গোত্র। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন।

> "(সেই নাজুক পরিস্থিতিতে) যখন তোমাদের দুটো দল মনোবল হারাবার উপক্রম করলো, (তখন) আল্লাহ তাআলাই তাদের উভয় দলের (সেই ভগ্ন মনোবল জোড়া লাগাবার কাজে) অভিভাবক ছিলেন, আর আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো (সর্বাবস্থায়) তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২২)

এ দুই গোত্রের মনোবল হারিয়ে ফেলাটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। তাই আল্লাহ তাদের দৃঢ়পদ রাখলেন। তাদের মাঝে সংকল্প ফিরে এল। জাবির ইবন আবদুল্লাহ বলেন, 'এই আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে নাযিল হয়। তারা এই আয়াতটাকে খুব পছন্দ করতেন, কারণ এখানে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ছিলেন তাদের ওয়ালী।[৪]

---

[৪] সহীহ বুখারি, অধ্যায় কুরআনের তাফসীর, হাদীস ৮১।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে অস্বীকৃতি জানান। কিছু ইহুদি তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিল। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'কাফিরদের কাছ থেকে আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ অল্পবয়সীদেরও সৈন্যদলে গ্রহণ করেননি, তাদের বেশ কয়েকজনকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। চোখের আন্দাজে বয়স দেখে কম মনে হলে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কম বয়সী ছেলেপেলেরা তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ চোখের আড়াল হয়ে ছিল যেন তিনি তাদের দেখতে না পান!

এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা আছে। রাফী ইবন খাতীয নামে এক কমবয়সী ছেলে ছিল। তাকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সে বললো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ভালো তীর চালাতে পারি!' এটা শুনে রাসূলুল্লাহ তাকে থাকার অনুমতি দিলেন। রাফীর কথা শুনে তার বন্ধু সামুরাহ তার পালক বাবার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করলো, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রাফাইকে অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেননি। অথচ কুস্তিতে তো আমি রাফীকে হারিয়ে দেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অভিযোগ শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা কুস্তি লড়ো!' সামুরা রাফীকে হারিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সামুরাহকেও বাহিনীতে নিয়ে নিলেন।

পুরো সীরাহ জুড়ে এমন কিছু উৎসাহী ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহাবিদের দেখা মেলে। ঘরে বসে থাকার সুযোগ পেলেও তাঁরা সেটা ছেড়ে ময়দানে নেমে এসেছেন ইসলামের জন্য কিছু করার আশায়। রাসূলুল্লাহও ﷺ তাদের উৎসাহের তারিফ করেছেন। বিশেষ দক্ষতা থাকায় কমবয়স্ক ছেলেদেরও তাঁর বাহিনীতে অংশ নিতে দিয়েছেন। তাঁরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

সেনাদের উদ্দেশ্যে নবীজির ﷺ বক্তব্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ মূল সেনাবাহিনীকে তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত করলেন:

- আল মুহাজিরীন, তাদের পতাকা দেওয়া হয় মুসআব ইবন উমাইরকে ؓ।

- আল-আওস, তাদের পতাকা তুলে দেওয়া উসাইব ইবন খুযাইরের হাতে ؓ।

- এবং আল-খাযরাজ, আল-হুবাব ইবন মুনযির ؓ তাদের হয়ে পতাকা বহন করেন।

যুদ্ধের আগে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে একজন কমান্ডারের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাস জুড়ে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যেখানে কমান্ডার সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এমন তেজোদ্দীপ্ত ঝাঁঝালো বক্তব্য দিয়েছেন যে সৈনিকরা প্রবল সাহসিকতায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হতে চেয়েছে। উহুদের প্রাক্কালেও এমন একটি ঘটনা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি বক্তব্য রাখলেন,

'ভাইয়েরা, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে আমাকে যা আদেশ করেছেন, আমি তোমাদের তা-ই আদেশ করছি: আল্লাহর আনুগত্য করো। যা কিছু তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। তোমরা যারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানো এবং ধৈর্য, দৃঢ় বিশ্বাস, আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার সাথে নিজেদের প্রস্তুত করেছো, আজ তাদের জন্য পুরস্কার লুফে নেওয়ার সুযোগ! নিশ্চয়ই শত্রুর সাথে জিহাদ করা সহজ কাজ নয়, বরং কষ্টকরই বটে। খুব অল্প ক'জনই ধৈর্যের সাথে তা করতে পারে। তবে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাঁকে মেনে চলে। আর যারা তাঁকে মানে না, তাদের সাথে থাকে শয়তান। তাই ধৈর্যের সাথে জিহাদ করো আর খুঁজে ফেরো সেই প্রতিশ্রুতি (শাহাদাহ) যা আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন। আর আমি তোমাদের যা আদেশ করেছি, তোমরা তা অবশ্যই পালন করবে। কেননা, আমি তোমাদেরকে তা-ই করতে বলি, যা সঠিক। মনে রেখো, অনৈক্য, মতভেদ আর হতাশাই হলো দুর্বলতা আর শক্তিহীনতার কারণ। যারা এমন করে, আল্লাহ না তাদের ভালোবাসেন, আর না বিজয় দান করেন।'

যুদ্ধের আগের মুহূর্তগুলো

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড়ের সামনে দাঁড়ালেন, যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। লক্ষ করলেন পেছনের দিক থেকে আক্রমণের একটি সম্ভাবনা আছে। সেখানে একটি ছোটখাটো পাহাড়। উহুদ পাহাড়ের ঠিক বরাবর। রাসূলুল্লাহ ﷺ পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে সেই আইনাইন পাহাড়ের ওপর অবস্থান নিতে বললেন। তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় দিকনির্দেশনা দিলেন, 'আমার কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা এই পাহাড়েই অবস্থান করবে। যদি তোমরা দেখ শকুন এসে আমাদের মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে, তবু আমার ইশারা ছাড়া এক পা-ও নড়বে না। যদি দেখ শত্রুদের ওপর আমরা বিজয় লাভ করেছি, আর তাদেরকে পায়ের নিচে পিষে ফেলছি, তবুও আমার ইশারা ছাড়া তোমরা এখান থেকে সরবে না।'

দিনের আলোর মতো পরিষ্কার নির্দেশনা। যুদ্ধক্ষেত্রে জয় পরাজয় যা-ই হোক না কেন--তীরন্দাজরা তাদের অবস্থানেই থাকবে আর শত্রুপক্ষকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে দেখলে তীরবর্ষণ করবে। কেননা শত্রুরা অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে পাশ থেকে কিংবা পেছন থেকে হামলা করে মুসলিমদেরকে বিপদে ফেলে দিতে পারে।

কুরাইশদের কূটচাল

যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশরা একটি কূট কৌশল অবলম্বন করলো। তারা মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইলো। আবু সুফিয়ান আল-আনসারকে সংবাদ পাঠালো, 'দেখো, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। আমাদের বোঝাপড়া আমাদের ভাইদের সাথে। কাজেই তোমরা আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও।'

আনসাররা জবাব দিল,

'এখন এ কথা বলছো! আরে, তোমরাই কি সেই কুরাইশ নও, যারা মাত্র কিছুদিন আগে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর আমাদেরকে চিঠি লিখে হুমকি দিয়েছিলে যে, যদি আমরা রাসূলুল্লাহকে তোমাদের হাতে তুলে না দিই, তাহলে তোমরা আমাদের হত্যা করবে, আমাদের মেয়েদেরকে দাসী বানাবে, আমাদের টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেবে? আর এখন হঠাৎ বলছো আমাদের সাথে তোমাদের কোনো শত্রুতা নেই? এটা মিথ্যা, এসব তোমাদের ছলনা!'

কুরাইশরা চেয়েছিল মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করতে, যাতে করে এক এক করে সবাইকে শেষ করতে পারে। আজকের দিনে কাফিররা যেমন করে বলে: মুসলিমদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, আমরা তো শুধু 'সন্ত্রাসী'দের দমন করছি। এটা আধুনিক সামরিক সংস্কৃতির একটি কৌশল যার মাধ্যমে শত্রুর মধ্যে অনৈক্য তৈরি করা হয়। বলা যেতে পারে এটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের (Psychological Warfare) একটি অস্ত্র। কাফিররা এ কথা বলে উম্মাহর একটি অংশের কাছে বিশ্বাস বা আস্থা অর্জন করে তাদের বন্ধু সাজতে চায় এবং যারা উম্মাহর পক্ষে লড়ছে তাদেরকে ভিলেন বানাতে চায়। বাস্তবতা হলো, প্রথমে তারা তথাকথিত 'সন্ত্রাসী'দের দমন করবে, আর এরপর বাদ বাকি উম্মাহর বিরুদ্ধে মাঠে নামবে। এরকম হওয়ার আগে মুসলিমদের এক হতে হবে।

কুরাইশরা আওস গোত্রের আবু আমরকে পাঠিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির দ্বিতীয় প্রচেষ্টা চালালো। সে আগে মদীনাতেই থাকতো। ইসলাম যখন মদীনায় আসে তখন সে মুসলিম হতে অস্বীকৃতি জানায় আর মদীনা ছেড়ে কুরাইশদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। আগে তার গোত্রের লোকেরা তাকে অনেক ভালবাসত, তাকে 'রাহিব' বা যাজক বলে ডাকতো। তাই কুরাইশদের সে বললো, 'আমি আমার লোকদের গিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধ করতে রাজি করাবো।' আবু আমর খুব আত্মবিশ্বাসী। গোত্রের লোকজন তাকে অনেক ভালবাসতো, তার কথা মেনে নেবে-- এটাই তার মাথায় ঘুরছে। কিন্তু ইসলাম যে মানুষের ভালো-লাগা, ভালোবাসা, আনুগত্য সবকিছু বদলে দিতে পারে সেটা আবু আমরের ধারণা ছিল না। তার গোত্রের কাছে এই বিদঘুটে প্রস্তাব নেওয়ামাত্র তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। সে কী বুঝলো কে জানে, বললো, 'নাহ, আমি চলে যাবার পর আমার লোকদের উপর শয়তান ভর করেছে।'

আসলে শয়তান না, আনসারদের অন্তরকে বদলে দিয়েছিল ইসলাম। এভাবে শত্রুদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ।

শুরু হলো যুদ্ধ

মূল যুদ্ধের আগে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছিল আরবদের প্রথা। উহুদেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কুরাইশদের পতাকাবাহক তালহা ইবন উসমান মুসলিমদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, 'মুসলিমদের মধ্যে কে আছো আমার সাথে লড়বে? আসো, আসো, পারলে আমাকে দোজখে পাঠাও। নইলে নিজেই বেহেশতে জায়গা করে নাও!'

তার ঔদ্ধত্যভরা কথা শুনে আলী ﷺ শান্ত থাকতে পারলেন না। তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে গেলেন। তরবারির এক কোপে তালহার শরীর থেকে তার পা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাকে সেভাবেই ফেলে রেখে চলে এলেন। তবে ভিন্ন বর্ণনায় এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আলী নয়, যুবায়ের ﷺ অংশ নিয়েছেন।

যুদ্ধের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তরবারি হাতে নিয়ে সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,

- কে আছে আমার হাত থেকে এই তরবারি নিতে চায়?

- আমি নেব! আমি! -- অনেক সাহাবি আগ্রহ দেখালেন।

- এই তরবারি নিতে চাইলে তার হক্ব আদায় করা চাই। কে আছে এই তরবারির হক্ব আদায়ের ক্ষমতা রাখে? রাসূলুল্লাহ শর্ত যোগ করলেন।

- কী এই তরবারির হক্ব? জানতে চাইলেন আবু দুজানা।

- এর হক্ব হচ্ছে এটা দিয়ে শত্রুকে এমনভাবে আঘাত হানবে হবে যেন এটা বেঁকে যায়!

শক্ত ধাতব তরবারি বাঁকিয়ে ফেলা যেনতেন কাজ নয়! সবাই যেন কিছুটা চুপসে গেল, কিন্তু এগিয়ে এলেন আবু দুজানা ﷺ, 'আমি এই তরবারির হক্ব আদায় করবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'[৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারি আবু দুজানার হাতে তুলে দিলেন। আবু দুজানা তরবারি নিলেন, মাথায় বাঁধলেন একটি লাল পট্টি। আবু দুজানা যখনই যুদ্ধে যেতেন, মাথায় লাল পট্টি বেঁধে নিতেন, এটা ছিল তাঁর যুদ্ধের সাজ। এরপর শত্রুদলের সামনে দাপটের সাথে হেঁটে বেড়াতেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে যেন শক্তি ঝরে পড়তো।

তাঁর এই বিশেষ হাঁটার ধরন দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'এইভাবে দর্পভরে হাঁটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। তবে এই পরিস্থিতির কথা ভিন্ন।', অর্থাৎ যুদ্ধের সময় শত্রুদের সামনে এভাবে হাঁটলে আল্লাহ তা পছন্দ করেন। একজন মুসলিম কখনই দাম্ভিক হবে না, তার মাঝে নম্রতা আর বিনয় থাকবে। কিন্তু নম্রতা থাকা মানেই দুর্বলতা নয়। তাই শত্রুদের সামনে হাঁটাচলায় কোনো দুর্বলতা দেখানো যাবে না। রাসূলুল্লাহর হাঁটায় দৃঢ়তা ও শক্তির ছাপ প্রকাশ পেত। আলী ইবন আবি তালিবের ভাষায়, 'তিনি যখন হাঁটতেন, দেখে মনে হতো যেন পাহাড় বেয়ে নামছেন।'

---

[৭] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ১৮৩।

কাফির বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ
উহুদ পর্বত
কাফিরদের বাহিনী
মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী
মুসলিম সেনাবাহিনী
মসজিদে নববী
উহুদের যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরাই ছিল এগিয়ে

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমদের আক্রমণের সামনে কুরাইশ বাহিনী দাঁড়াতেই পারেনি, বরং ময়দান ছেড়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছিল। পড়িমড়ি করে তারা পালাতে থাকে, তাদের নারীদের পর্যন্ত পায়ের নূপুর দেখা যাচ্ছিলো। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দকে দেখা গেল পালিয়ে পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নিতে। কুরাইশদের বিপর্যয় এতটাই সাংঘাতিক ছিল যে তাদের নারীদের প্রতিরক্ষা দেওয়ার মতো কোনো পুরুষ অবশিষ্ট ছিল না। যে যেভাবে পেরেছে, নিজের জান নিয়ে পালিয়েছে।

তবু কুরাইশদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মরিয়া। সেদিন যে পরিবারের হাতে কুরাইশ বাহিনীর পতাকা ছিল তারা হলো বনু আব্দুদ দার। আবু সুফিয়ান তাদের আগেই বলে দিয়েছিল, 'দেখো, বদরের দিনেও তোমরা পতাকা বহন করেছ আর সেবার কী ঘটেছে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। যদি এই পতাকার মর্যাদা রাখতে না পারো, তবে এই দায়িত্ব ছেড়ে দাও।'

যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা মানে বিশাল কিছু! পতাকার জন্য সৈনিকরা লড়ে যায়, পতাকা তাদের সাহস যোগায়, পতাকা তাদের প্রেরণার উৎস। পতাকা সমুন্নত থাকার অর্থ যুদ্ধ এখনও জারি আছে, এখনও শেষ হয়ে যায়নি। যদি কোনো দলের পতাকা পড়ে যায়, তার প্রতীকি অর্থ দলটি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

উহুদের যুদ্ধে বনু আব্দুদ দারের লোকেরা পতাকার সম্মান রক্ষার্থে বীরের মতো লড়ে যায়। একে একে সেই পরিবারের সাত জন লোক নিজের জান দিয়ে দেয়। প্রথমে একজন পতাকা ধরে, তাকে হত্যা করা হয়, এরপর দ্বিতীয় জন, তাকেও হত্যা করা হয়, এমনি করে সাত-সাত জন পতাকা ধরে রাখতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এরপর তাদের এক আবিসিনিয়ান দাস পতাকা উঁচু করে ধরে। তার হাতে মারাত্মক আঘাত পাবার পরেও সে পতাকাটি কোনোরকমে তুলে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়, ঐ কঠিন মুহূর্তেও বলতে থাকে, 'আমি কি আমার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেছি?' তারপর পতাকা মাটিতে পড়ে যায়, আর তখনই কুরাইশরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে। কুরআনের পর্দায় উহুদের যুদ্ধের এই পর্যায়কে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন,

> "আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫২)

রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাতে যুদ্ধের বর্ণনাকে ঠিক ধারাভাষ্যের ঢঙে বর্ণনা করা যায় না। কারণ ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা আকারে যুদ্ধের বর্ণনাগুলো এসেছে। উহুদের যুদ্ধে এমনই একটি ঘটনা হলো আবু দুজানার বীরত্ব।

উহুদের দিন যেন আবু দুজানার দিন! আবু দুজানা তরবারি নিয়ে সোজা মুশরিক বাহিনীর মাঝে ঢুকে গেলেন। তরবারি চালিয়ে তছনছ করে দিলেন শত্রুবাহিনীকে যতক্ষণ না তার তরবারি বেঁকে যায়। আয যুবাইর ইবন আউয়াম ﷺ সেদিনের 'হিরো' আবু দুজানার কাহিনী নিজ চোখে দেখলেন। তিনি বলেন,

'আল্লাহর রাসূল যখন আমাকে তরবারি না দিয়ে আবু দুজানাকে দিলেন, আমি মনে মনে বেশ দুঃখ পেলাম। ভাবলাম, দেখে নেব আবু দুজানা কী এমন বীরত্ব দেখায়! কিন্তু উহুদের সেই দিনে আবু দুজানা ছিলেন অপ্রতিরোধ্য! তাঁর সামনে যে-ই পড়ছে, সে-ই মারা পড়ছে। অপরদিকে কুরাইশদের মাঝেও ছিল তেমনি এক মুশরিক সৈনিক, সামনে যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করছে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেই মুশরিক যোদ্ধা আর আবু দুজানা -- দুজনেই দুজনের বেশ কাছাকাছি চলে এল। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকলাম যেন তারা দুজন পরস্পরের মুখোমুখি হয়, আর আল্লাহর ইচ্ছায় হলোও তা-ই! দুজন লড়াই শুরু করলো! দুজন একে অপরকে তরবারি দ্বারা আঘাত-পাল্টা আঘাত করছে। সেই মুশরিক আবু দুজানাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করতে গেলে আবু দুজানা ﷺ তৎক্ষণাৎ তাঁর ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিরোধ করলেন। কিন্তু তরবারি আটকে গেল আবু দুজানার ঢালে, আর সেই সুযোগে আবু দুজানা তাকে তরবারি চালিয়ে হত্যা করলেন!'

কাব ইবন মালিক ﷺ উহুদের একইরকম আরেকটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায়,

'আমি এক মুশরিককে সেদিন দেখেছি সে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলছিল, কোথায় আছিস ভেড়ার দল, জবাই হতে চাস বুঝি! এরপর দেখলাম আপাদমস্তক বর্মে ঢাকা এক মুসলিম যোদ্ধা সেই মুশরিকের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে এগিয়ে এলেন। আমি মনে মনে দুজনের মধ্যে তুলনা করতে লাগলাম--সেই মুশরিক সৈনিক পোশাক, অস্ত্রসজ্জা সবদিক দিয়েই বেশি এগিয়ে। দুজন কখন মুখোমুখি হবে আমি সেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সময় ঠিকই তারা সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, আপাদমস্তক ঢাকা সেই মুসলিম যোদ্ধা তাঁর তরবারি দিয়ে মুশরিক যোদ্ধার কাঁধে এত জোরে আঘাত হানলেন যে, তরবারি তার শরীর চিরে পায়ের কাছে উরু পর্যন্ত চলে এল! এরপর সেই মুসলিম নিজের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন উপভোগ করলে কাব? আমি হচ্ছি আবু দুজানা!'[10]

অর্থাৎ, তরবারির আঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে তার পুরো দেহ ঘাড় থেকে উরু পর্যন্ত দুভাগ হয়ে যায়।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ, তাঁর চাচা হামযা ﷺ

---

[10] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩।

শহীদ হন। এই পর্যায়ে আরও শহীদ হন হানযালা ﷺ। উহুদের শহীদদের ঘটনায় এই দুজনের কাহিনী বর্ণনা করা হবে।

হঠাৎ বিপর্যয়

মুসলিম বাহিনীর হামলায় কুরাইশরা বিপর্যস্ত হয়ে ময়দান ছেড়ে চলে যেতে থাকে। মুসলিম শিবিরে তখন বিজয়ের সুবাস। কিন্তু যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল কুরাইশরা আর প্রতিরোধ বা পাল্টা আক্রমণ গড়তে সক্ষম হবে না। আর সেটা ভেবেই একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন ক'জন সাহাবি।

সেই সাহাবিরা ছিলেন তীরন্দাজ বাহিনী। তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাহাড়ের ওপর থাকতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তীরন্দাজ সাহাবিরা ﷺ দেখলেন মুসলিমরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে, তখন তাঁদেরও ইচ্ছে হলো নিচে নেমে সবার সাথে এই কাজে যোগ দিতে। সম্ভবত যুদ্ধের উদ্দীপনায় তাঁরা আবেগী হয়ে পড়েছিলেন আর দায়িত্বকে হালকাভাবে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আমীর আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ﷺ উত্তেজনায় গা ভাসাননি। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশ ভুলে গেছো? তোমাদের কি মনে নেই যে তাঁর নির্দেশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের নিচে যাওয়া ঠিক হবে না?' কিন্তু তাঁরা বললো, 'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে।' এই বলে পঞ্চাশ জনের মাঝে চল্লিশ জনই রাসূলুল্লাহর ﷺ স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে চলে যায়।

শত্রুদের ক্যাম্পে একজন তখনো যুদ্ধে অংশ নেন নেননি। তিনি হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ। সেই যুদ্ধে তিনি ছিলেন কুরাইশদের অশ্ববাহিনীর প্রধান। মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া মাত্র, তিনি আর আবু জাহালের ছেলে ইকরিমা মুসলিম বাহিনীর দুর্বল অবস্থানটি লক্ষ করলেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা এতটুকু দেরি করলেন না। তাঁরা তাঁদের একশো থেকে দেড়শো সৈন্যের অশ্ব বাহিনীকে আইনান পাহাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে নিলেন আর আচমকাই মুসলিমদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসলেন। আচমকা আক্রমণে মুসলিম বাহিনী হতভম্ব হয়ে পড়ে। কুরাইশদের মূল সেনাদল এ দৃশ্য দেখে সাহস ফিরে পায়। তারা পালানো ফেলে এবার সামনের দিক থেকে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করা শুরু করে। দু'দিক থেকে হামলা আসায় মুসলিম বাহিনী তাল হারিয়ে ফেলে।

খালিদ ইবন ওয়ালিদ তাঁর বাহিনীকে নিয়ে এমন দিক থেকে হামলা চালান যে মুসলিম বাহিনী কার্যত দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ ছিল তাঁর বাম পাশে। এরা গনিমাহ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। আর ডান পাশে ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্যাম্প। আকস্মিক আক্রমণে মুসলিম মুজাহিদদের সারি ভেঙে যায়। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এটা ছিল একটা ছোটখাটো হত্যাযজ্ঞ। দিশেহারা হয়ে বন্ধু-শত্রুকে চিহ্নিত করতেও ভুল হয়ে যায়, নিজেরাই নিজের দলের লোককে মেরে ফেলে। এরকমই একটি আত্মঘাতী আক্রমণে মারা যান হুযাইফা ইবন আল-ইয়ামানের ﷺ বাবা ইয়ামান ﷺ। ওদিকে মুশরিকরা

মুসলিম বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়ে সমানে হত্যা করতে থাকে।

কুরাইশদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যা করা। হামলার এক পর্যায়ে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্যাম্পের খুব কাছাকাছি চলে আসে। রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঘিরে তখন মাত্র নয়জন সাহাবি। এটা ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তের একটি। তিনি কী করবেন এখন? নয়জন সাহাবিকে সাথে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়ে নিজের জীবন বাঁচাবেন? নাকি মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ডাক দেবেন? যদি তিনি নিজের জান বাঁচান, তাহলে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ মুসলিমদের হত্যা করে শেষ করে ফেলবে। আর যদি তিনি ডাক দেন, তাহলে একটা প্রতিরোধ গড়ার সম্ভাবনা থাকলেও শত্রুরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর অবস্থান জেনে যাবে আর তাঁর ওপর হামলা চালাবে।

কী করবেন তিনি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও মুসলিমদের ময়দানে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি ডেকে উঠলেন, 'আল্লাহর বান্দারা! তোমরা এগিয়ে আসো!' আর যা হওয়ার তাই হলো, সেই ডাক শুনে ফেলে কুরাইশ বাহিনীও। কাফিরদের একটি দল রাসূলুল্লাহর ﷺ অবস্থান আন্দাজ করে মুসলিমরা এগিয়ে আসার আগেই সেদিকে হামলা চালিয়ে বসলো ।

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে এতটা অনিশ্চয়তাঘেরা, এতটা সংকটাচ্ছন্ন, এতটা বিপদগ্রস্ত মুহূর্ত আর কখনো আসেনি। তাইফের লোকেরা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে তাড়া করেছিল, কিন্তু তাঁকে হত্যা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। হিজরতের রাতে কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এতটা কাছাকাছি আর কখনো আসতে পারেনি। হিজরতের সময় সুরাকা ইবন মালিক রাসূলুল্লাহকে ﷺ বন্দী করতে চেয়েছিল। কিন্তু উহুদের ময়দানে কুরাইশরা মরিয়া হয়ে চাইছিল যেকোনো মূল্যে রাসূলুল্লাহকে ﷺ পুরোপুরি শেষ করে দিতে।

সেই প্রচেষ্টায় উতবা ইবন আবি ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহর ﷺ গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারে। সেই ধাক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে পড়ে যান। তাঁর ঠোঁট কেটে যায়। দ্বিতীয় মারাত্মক আঘাতটিও হানে উতবা। এই আঘাতটি ছিল একটি তীরের আঘাত। রাসূলুল্লাহর ﷺ বর্মকে টার্গেট করে। এই আঘাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ দাঁত ভেঙে যায়। আর তৃতীয় আরেকটি আঘাত হানে ইবন কামিয়াহ। সে ঘোড়ায় চড়ে এসে তরবারি দিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে আঘাত করার চেষ্টা করে। তালহা তাঁর ঢাল দিয়ে সেই আঘাতকে রুখে দিতে চাইলেন, কিন্তু পুরোপুরি পারলেন না, রাসূলুল্লাহর ﷺ শিরস্ত্রাণে ইবন কামিয়ার তরবারি আঘাত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সাহাবিদের বাঁচানোর জন্য আহবান করেছিলেন, সেভাবে করে সাহাবিরা এবার নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে

এলেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচানোর জন্য। তবে তার আগে জেনে নেওয়া যাক ছত্রভঙ্গ মুসলিম শিবিরের কিছু অদম্য সাহাবিরা তখন কী করছিলেন।

পাহাড়সম দৃঢ়তা!

কুরাইশদের অতর্কিত হামলায় মুসলিমরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতিতে কুরাইশরা মুসআব ইবন উমায়েরকে ﷺ হত্যা করে । তারা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। মুসআবকে কাফিররা ঘিরে রেখেছে, আর মুসআব দেখলেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ কাফিররা ঘিরে রেখেছে। সংকটের সেই মুহূর্তে, বিপদের সেই ঘনঘটায়, মুসআব বলে উঠলেন,

'আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তাঁর আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান, অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে কি পশ্চাদপসরণ করবে?'

এটাই তো ঈমান! মৃত্যুর আগ মুহূর্তে মুসআবের বলা এই কথাগুলো আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে নাযিল করেছেন।

> "আর মুহাম্মাদ তো কেবল একজন রাসূল! তাঁর আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৪৪)

মুসআব ইবন উমায়ের এই কথাগুলো বলার পর ইবন কামিয়াহ মুসআব ইবন উমায়েরকে হত্যা করে। মুসআব ছিলেন এই যুদ্ধের পতাকাবাহী। শত্রুরা তার ডান হাত কেটে ফেলে, তিনি বাম হাতে পতাকা জড়িয়ে ধরেন! শত্রুরা তার বাম হাতও কেটে ফেলে, এরপর দুই হাতের কাটা অংশ নিয়ে তিনি পতাকা জড়িয়ে ধরেন আর সেই অবস্থায় শহীদ হয়ে যান।

মুসআব ইবন উমায়েরের অবয়ব ছিল কিছুটা রাসূলুল্লাহর ﷺ মতো। মুসআবের মৃত্যুর পর হঠাৎ গুজব রটলো -- রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেছেন! মুসলিমরা একটা বড় ধাক্কা খেল। কেন লড়ছেন তারা? কীসের জন্য লড়ছেন? কার জন্য লড়ছেন?

এই ধাক্কা সইতে না পেরে মুসলিমদের এক দল মনোবল হারিয়ে হাত থেকে অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে মদীনার দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। কেউ কেউ পালিয়ে উহুদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। কেউ ভাবলো যুদ্ধ করে কী হবে, তার চাইতে বরং আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কাছে ফিরে যাই। সে একটা সন্ধি করে আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক।

কিন্তু একদল মুসলিম ব্যতিক্রম। তাঁরা ছিলেন অপরাজেয়। তারা ছিলেন হার-না-মানা মানুষ। তাঁদের ছিল সামর্থ্যের শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মানসিকতা। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর গুজবে তাঁরা এতটুকু দমলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন শহীদ হবার আশায়। এমনই একজন ছিলেন আনাস ইবন নযর ﷺ।

আনাস ইবন নযর অনেকদিন ধরেই বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তিনি শুধু এতটুকুই বলেছিলেন, 'আল্লাহ যদি আর একটা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেন তাহলে তিনি দেখবেন আমি কী করি!'[11] তিনি তাঁর কথা রাখলেন। উহুদের যুদ্ধে যখন সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে, তিনি তখন এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে, আজ তাঁর দিন! আজ তাঁর দেখানোর পালা! অস্ত্র রেখে পালিয়ে যাওয়া কিছু মুসলিমকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছো তোমরা?' তারা উত্তর দিল, 'মুহাম্মাদের মৃত্যু হয়েছে।' তিনি বললেন, 'তোমরা জেনে রাখো, মুহাম্মাদ ﷺ যদি মারাও যান, তাঁর রবের মৃত্যু হয়নি। যে কারণে মুহাম্মাদ মারা গেছেন, তোমরাও সে কারণে মরে যাও!'

সাদ ইবন মুয়াজকে বললেন, 'সাদ! আমি তো উহুদের পাদদেশে জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি!' এই বলে অদম্য আনাস ছুটে গেলেন ময়দানে। ঢুকে পড়লেন শত্রুদের মাঝে। দুর্দান্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন প্রবল সাহসিকতার সাথে। তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করলেন, তরবারি চালিয়ে গেলেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

যুদ্ধ শেষে একটি মৃতদেহ পড়ে ছিল ময়দানে। শরীরে ছিল আশিটি আঘাতের চিহ্ন, দেখে বোঝা যাচ্ছিল না এটা কার লাশ। এক মুসলিম নারী এলেন, লাশের শরীর দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না এত আঘাত পুরো দেহে। একটা আঙুল দেখে সনাক্ত করে বললেন, এটা তাঁর ভাই, আনাস ইবন নযরের লাশ। এই ছিলেন আনাস ইবন নযর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন,

> "মু'মিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনোই পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ২৩)

এমন আরেক সাহাবি ছিলেন সাবিত ইবন দাহদাহ ﷺ। তিনি বলে উঠলেন, 'নবীজিকে ﷺ যদি হত্যা করা হয়েও থাকে, আল্লাহ তো জীবিত রয়েছেন! তিনি তো চিরঞ্জীব! কাজেই তোমরা দ্বীনের জন্য লড়ে যাও, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের বিজয় দেবেন!'

---

[11] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২২।

অপরাজেয় সাহাবিদের একজন ছিলেন আনসারী। তাঁর নাম আমরা জানি না। এক মুহাজির সাহাবির ভাষায়, 'আমরা এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তার সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাকে বললাম, তুমি কি জানো মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে? সে বললো, ঠিক আছে, যদি মুহাম্মাদকে হত্যা করে হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর দ্বীন-প্রচারের মিশন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে! সুতরাং তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও দ্বীনের জন্য। তাঁর মতো করেই মৃত্যুর স্বাদ নিই, ইসলামের জন্য লড়াই করে শহীদ হয়ে যাই।'

এই সাহাবিরা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছাকাছি যেতে সক্ষম হলেন। ইতিমধ্যে খবর এল, রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর খবরটি একটি গুজব। তখন মুসলিমরা আরও সাহস ফিরে পেলেন। মুসলিম বাহিনীর মাঝে শৃঙ্খলা ফিরে এল।

রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঘিরে সাহসী সাহাবিরা

রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর যখন কাফিররা হামলা চালালো, তখন তিনি বলে উঠলেন, 'যে আজ শত্রুদের রুখে দিতে পারবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে!' এই আহবান শুনে এগিয়ে গেলেন এক আনসার। শত্রুদের দিকে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর এলেন আরও একজন আনসার, তিনিও শহীদ হলেন। এরপর আরও একজন, এভাবে সাত সাতজন আনসার সাহাবি রাসূলুল্লাহকে বাঁচাতে বীরের মতো লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন।

আল্লাহু আকবার! এ কারণেই তাঁরা "আনসার"। আনসার মানে সাহায্যকারী। আনসাররা তাঁদের নামের প্রতি সুবিচার করেছিলেন। এ মর্যাদাময় খেতাব তাঁরা কিনেছিলেন জান, মাল ও রক্তের বিনিময়ে। সাত-সাত জন আনসার যুবাপুরুষ এক এক করে রাসূলুল্লাহর ﷺ পায়ের কাছে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচাতে এই ছিল তাঁদের আত্মত্যাগের নমুনা।

সাতজন সাহাবি শহীদ হয়ে যাবার পর রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ছিলেন আর মাত্র দু'জন -- তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ رضي الله عنه এবং সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه। রাসূলুল্লাহকে ﷺ আঘাত করেছিল উতবা ইবন আবি ওয়াক্কাস। আর রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন তারই আপন ভাই সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه! তীরের পর তীর ছুঁড়তে থাকেন শত্রুদের লক্ষ্য করে। আলী ইবন আবি তালিব رضي الله عنه বলেন, 'আমি কখনো রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর বাবা-মা উভয়ের নামে শপথ করতে শুনিনি। একমাত্র সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে তিনি এমনটা বলেছিলেন। উহুদের ময়দানে আল্লাহর রাসূল বলে ওঠেন, 'তীর ছোঁড়ো, সাদ! আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক!' সা'দ আল্লাহর রাসূলকে রক্ষা করেছিলেন আর সা'দকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন যা আবু বকর رضي الله عنه আর উমারও رضي الله عنه লাভ করেননি।

তালহা ইবন উবায়দুল্লার ﷺ। অসাধারণ বীরত্ব দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তালহা তো জান্নাতের জন্য নিজেকে যোগ্য করে নিয়েছে!' তালহা সেদিন যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন তা আর কোনো সাহাবি দেখাননি। রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচাতে গিয়ে তরবারির আঘাতে তালহার কিছু আঙুল কাটা পড়ে। উহুদের সেই দিনে তালহা নিজের গায়ে অন্তত ৩৫টি আঘাত সয়ে নেন। শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচানোর জন্য! তাঁর ডান হাত তীরের আঘাতে অবশ হয়ে যায় । তালহার সম্মানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'যদি কেউ জমিনের বুকে কোনো জীবিত শহীদকে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে নেয়!'

আরেকজন বীরসেনা ছিলেন আনসারী সাহাবি আবু তালহা ﷺ। রাসূলুল্লাহর ﷺ একেবারে সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান আর সমানে তীর ছুঁড়তে থাকেন। নবীজি ﷺ নিজেকে আবু তালহার পেছনে আড়াল করে রাখেন। আবু তালহা একটি একটি করে তীর ছোঁড়েন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঁচু করে দেখেন সেই তীর কোথায় আঘাত হানে। আবু তালহা তখন বললেন,

'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি মাথা উঁচু করে তাকাবেন না! একটি তীরও আপনাকে আঘাত করতে পারবে না, আমার বুকচিরে তবেই আপনাকে স্পর্শ করবে। আমি হাজির আছি রাসূলুল্লাহ। শুধু আমাকে বলুন আপনার জন্য কী করতে হবে। আপনার যেমন ইচ্ছা তেমন আমাকে আদেশ করুন!'[12]

সেদিন রাসূলুল্লাহকে ﷺ রক্ষা করার জন্য তীর-ধনুক আর তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসেন এক মুসলিম নারী। নুসাইবাহ বিনতে কা'ব ﷺ। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তীরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য আবু দুজানা তাঁর পিঠকে ঢাল হিসেবে পেতে দেন।

আবু বকর এবং আবু উবাইদাও ﷺ সেদিন রাসূলুল্লাহকে বাঁচাবার জন্য প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করে যান। শেষপর্যন্ত ত্রিশজন সাহাবির একটি দল বেষ্টনীর মতো তৈরি করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে উহুদ পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হন। সেই দলে ছিলেন ক্বাতাদা, সাবিত, সাহল ইবন হুনাইফ, উমার ইবন আল খাত্তাব, আবদুর রাহমান ইবন আউফ, আয-যুবাইর ইবন আল-আওয়্যাম। আল্লাহ তাঁদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট হোন।

অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব অন্যদের সহযোগিতায় খালিদ ইবন ওয়ালিদের বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। মুসলিমরা পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নেন। পাহাড়ে চড়তে রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব কষ্ট হচ্ছিল, তাই তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ ﷺ তাঁকে বহন করে নিয়ে যান। আলী ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্ষতস্থানে পানি ঢেলে দেন, জখমগুলো পরিষ্কার করে দেন। কিন্তু পানি ঢালায় রক্তপ্রবাহ বেড়ে যাচ্ছিল। তখন

---

[12] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ৩৭।

ফাতিমা এক টুকরো কয়লা নিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে ছাইগুলো ক্ষতস্থানে ঢেলে দিলেন, ফলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আর কয়লার উত্তাপে ক্ষতগুলো জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়।

যুদ্ধপরবর্তী বাকযুদ্ধ

যুদ্ধ পুরোপুরি বন্ধ হলো। কুরাইশরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করতে সক্ষম হলেও মদীনা আক্রমণ করার মতো সামর্থ্য বা সাহস কোনোটাই তাদের ছিল না। তারা চেয়েছে এই ধরনের একটি হামলা চালিয়ে মুসলিমদের সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষতি করতে। আর তাদের মূল বাহিনী যুদ্ধের প্রথমভাগে অনেকটাই পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল।

কুরাইশরা তাই পাহাড়ে উঠে মুসলিমদের পিছু নেওয়ার সাহস পায়নি। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বাকি মুসলিমরা উহুদ পর্বতের ওপরে, আবু সুফিয়ান তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো,

‘মুহাম্মাদ কি জীবিত?’

কেউ কোনো উত্তর দিল না। সে এরপর জিজ্ঞেস করলো,

‘আবু বকর বেঁচে আছে?’

এবারেও কেউ কোনো কথা বললো না।

‘উমার বেঁচে আছে?’

কোনো সাড়া নেই। আবু সুফিয়ান জানতো আবু বকর আর উমার ﷺ হচ্ছেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দুই সহকারী। আবু সুফিয়ান খুশিতে আত্মহারা! সে তার লোকেদের বলতে লাগলো, ‘সব কটা শেষ!’

উমার ﷺ আর সহ্য করতে পারলেন না, বলে উঠলেন, ‘তুমি যাদের নাম নিয়েছো, তোমার জ্বালা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেই তিনজনই জীবিত আছেন।’

জবাবে আবু সুফিয়ান বলে, ‘তোমাদের অনেকের মৃতদেহ বিকৃত করা হয়েছে। যদিও আমি এ কাজের আদেশ দেইনি। জেগে ওঠো হুবাল! তুমি জেগে ওঠো!’

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে বলেন, ‘তোমরা কি এ কথার জবাব দেবে না?’

‘কী জবাব দেবো আমরা?’ সাহাবিদের প্রশ্ন।

তিনি বললেন, ‘বলো, আল্লাহ তারচেয়েও মহান এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ!’

আরবিতে এ কথাটির ছন্দ আবু সুফিয়ানের কথার সাথে মিলে যাচ্ছিলো। তখন আবু সুফিয়ান বলে ওঠে,

- আমাদের উযযা আছে, তোমাদের উযযা নেই!

- আল্লাহ্ আমাদের মাওলা, তোমাদের কোনো মাওলা নেই! -- মুসলিমরা জবাব দিল।

- বদরের প্রতিশোধ নিলাম আজ, এভাবেই যুদ্ধের বদলা হয়।

- না! সমান নয়! আমাদের নিহতরা জান্নাতে, আর তোমাদের নিহতরা তো জাহান্নামে!

- সত্যি করে বলো তো উমার, মুহাম্মাদকে কি আমরা হত্যা করতে পেরেছি?

- নাহ্! আল্লাহর কসম, তোমরা পারোনি! তিনি তোমাদের কথা ঠিকই শুনছেন।

- উমার, আমি তোমাকে ইবন কামিয়ার চাইতে বেশি বিশ্বাস করি।

এ কথা বলে কুরাইশরা পরের বছর আবার বদর প্রান্তে মুখোমুখি হবার চ্যালেঞ্জ জানালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দুই বাহিনী ফিরে গেল।

কুরআনের চোখে উহুদের বিপর্যয়

> **"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেইদিন, যেদিন দুদল মুখোমুখি হয়েছিল, শয়তানই তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৫)**

অর্থাৎ উহুদের দিনে মুসলিমদের পদস্খলনের কারণ হলো শয়তান। আল্লাহ উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফিকদের চেহারাও প্রকাশ করে দিলেন।

> **"তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা, যা তোমাদের একদলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেয়, আর আরেকদল নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। তারা তাদের জাহেলী যুগের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করতে থাকে। (এক পর্যায়ে) তারা এও বলতে শুরু করে, এ কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা আছে?**
>
> **(হে নবী, তাদের) বলুন, (এ ব্যাপারে আমারও কোনো ভূমিকা নেই) নিশ্চয়ই সব বিষয় আল্লাহর হাতে। তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে এমন বিষয় যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি (যুদ্ধের) এ কাজে আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হতো না।**
>
> **বলো, যদি তোমরা আজ ঘরের ভেতরও থাকতে, তবু নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল, তারা তাদের মরণের বিছানার দিকে বের হয়ে আসতো। আর এভাবেই মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং এ ঘটনার (মাঝ) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা আছে**

> তা পরিশুদ্ধ করেন। তোমাদের মনের কথা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ জ্ঞাত।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৪)

মুনাফিকরা বলে, যুদ্ধ করে বিপদ আর মৃত্যু ডেকে আনার কী দরকার? আল্লাহ আযযা ওয়া জাল জবাব দিয়েছেন, মুসলিমদের মৃত্যুর কারণ জিহাদ নয়, তারা মারা গেছে কারণ তাদের মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। যদি তারা জিহাদে না গিয়ে ঘরের মধ্যেও বসে থাকতো, তবুও যাদের মারা যাওয়ার, তারা মারা যেতোই। অর্থাৎ মুসলিমদের মৃত্যুর জন্য জিহাদকে দায়ী করা ভুল। মৃত্যুর বিষয়টি আল্লাহর হাতে, আল্লাহ তাআলা যখন যার মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে ঠিক তখনই মারা যাবে। হোক সে ঘরের বাইরে থাকুক বা ভেতরে, মৃত্যুর সময়ের কোনো নড়চড় নেই। উহুদের যুদ্ধ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। মুসলিমদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে উহুদের যুদ্ধকে দায়ী করা যাবে না।

> "... পরে যখন তোমরা সাহস ও (মনোবল) হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহর রাসূলের) নির্দেশ সম্পর্কে মতপার্থক্য করলে, এমনকি, আল্লাহর রাসূল যখন তোমাদেরকে সেই ভালোবাসার জিনিস (আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তাঁর কথা অমান্য করে (তাঁর দেখিয়ে দেওয়া স্থান ছেড়ে) চলে গেলে। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তখন দুনিয়াবি ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত হয় পড়লো আর কেউ আখিরাতের কল্যাণ চাইতে থাকলো। আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তোমাদের অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫২)

হার-জিত, সুখ-দুঃখ, দুঃসময়-সুসময় সবকিছু দিয়েই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি জয় দিয়ে মুসলিমদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। উহুদের দিনে পরীক্ষা করেন পরাজয়ের মাধ্যমে। ইবন ইসহাক সেই দিনের বর্ণনায় বলেন, 'উহুদের দিন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে কষ্ট ও পরীক্ষার একটি দিন। এই দিনে আল্লাহ তাআলা কিছু মুসলিমকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। সেই দিন একটি পর্যায়ে শত্রুরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছাকাছি পৌঁছতেও সক্ষম হয়। তাদের ছুঁড়ে মারা পাথরের আঘাতে নবীজি ﷺ মাটিতে পড়ে যান। তাঁর দাঁত ভেঙে যায়, মুখে সজোরে আঘাত লাগে, ঠোঁট কেটে যায়।'

উহুদের শহীদেরা

হামযাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه

দু'জন নয়, চারজন নয়, উহুদের যুদ্ধে মাত্র একদিনে ৭০ জন মুসলিম শাহাদাহ লাভ

করেন। উহুদের যুদ্ধকে ঘিরে শাহাদাহ সম্পর্কিত অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়। উহুদ ছিল মুসলিম সমাজে শাহাদাতের সংস্কৃতির সূচনা। যিনি এ সংস্কৃতির বীজ রোপণ করে যান তিনি হলেন শহীদদের সর্দার, রাসূলুল্লাহর চাচা হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ। "মারা যাওয়া" বা "মৃত্যু" -- এ শব্দগুলো শহীদদের জন্য যথার্থ নয়, যদিও বোঝানোর জন্য এমনটি বলা হয়। তবে মনে রাখতে হবে একজন শহীদ কুরআনের দৃষ্টিতে কখনোই মৃত নন, শহীদরা জীবিত।

উহুদের দিনে হামযাহ তাঁর যোগ্যতার প্রতি সুবিচার করেছিলেন। প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে তিনি পতাকাবাহী গোত্র বনু আব্দুদ-দারের মুশরিকদের হত্যা করতে থাকেন। কিন্তু হামযাকে হত্যা করেছিল এমন এক ব্যক্তি, যাকে এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ বলা চলে। তার নাম ওয়াহশী। সে ছিল এক আবিসিনিয়ান দাস। এই যুদ্ধে সে এসেছিল তার মুক্তির আশায়। কুরাইশদের জয়-পরাজয়ে তার কিছুই আসে যায় না। তার একটাই লক্ষ্য, হামযাকে হত্যা করা, আর তাহলেই সে মুক্তি পাবে। কাহিনীটা তার মুখেই শোনা যাক।

'তখন আমি ছিলাম জুবাইর ইবন মুতইমের দাস। বদরের যুদ্ধে হামযা মুতইমের চাচা তুআইমাহ ইবন আদীকে হত্যা করে। কুরাইশদের উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিকাল চলার সময় তুআইমার ভাতিজা জুবাইর আমাকে এসে বললো, শোনো ওয়াহশী, তুমি যদি আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হামযাকে হত্যা করো, তাহলে তোমাকে আমি মুক্ত করে দেবো।

আমি রাজি হলাম, বেরিয়ে পড়লাম যুদ্ধবাহিনীর সাথে। আমি আবিসিয়ান, তাই খুব ভালো বর্শা ছুঁড়তে পারতাম। বর্শা ছুঁড়েছি অথচ লক্ষ্যভেদ হয়নি-- এমন ঘটনা আমার সাথে কমই ঘটেছে। ময়দানে দু' দল লড়ছে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার লক্ষ্যকে। তুমুল লড়াইয়ের মাঝে দেখতে পেলাম হামযা! এক প্রকাণ্ড উটের মতো তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আমাদের লোকদের ওপর তাঁর তরবারি চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুই তাঁকে থামাতে পারছে না। ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আমি একটু একটু করে তাঁর দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু সিবাআ আমার আগেই তাঁর কাছে পৌঁছে গেল। হামযা তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'এই যে সিবাআ, উম্ম আম্মারের ছেলে, ব্যাটা মেয়েদের খতনা করিস! তুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাস?' এই বলে হামযা এত জোরে সিবাআকে আঘাত করলেন যে মুহূর্তের মধ্যে সিবাআ অতীতের অংশ হয়ে গেল।

আমি আমার বর্শাটা খুব সাবধানে হামযার দিকে তাক করলাম, লক্ষ্য নিশ্চিত করে ছুঁড়ে মারলাম তাঁর দিকে। বর্শাটা ঠিক নাভীর নিচে দিয়ে ঢুকে দু' পায়ের মাঝ দিয়ে বের হয়ে আসলো। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মারা যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। এরপর বর্শা ছুটিয়ে আনতে মৃতদেহর কাছে গেলাম। বর্শাটা ছাড়িয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। হামযাকে মারা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। মুক্তির আশাতেই আমি উনাকে হত্যা করি।'

চাচা হামযা ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। এই মৃত্যুর খবর শুনে রাসূলুল্লাহ প্রচণ্ড কষ্ট পান। তিনি বললেন, 'কেউ কি আমার চাচার মৃতদেহ দেখেছে? তিনি এখন কোথায়?' এক সাহাবি বললেন তিনি দেখেছেন। সেই সাহাবিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর চাচার মৃতদেহ দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ ইবন উতবার নির্দেশে হামযার ﵁ শরীর বিকৃত করা হয়েছিল। তাঁর পেট কেটে কলিজা বের করে আনা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা হামযাকে সেরকম বিকৃত অবস্থাতে দেখেন। তাঁর জন্য এটা ছিল খুবই হৃদয় বিদারক ঘটনা। ওয়াহশীর বর্ণনায় ফেরা যাক,

'আমি মক্কায় ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কা বিজয়ের পর আমি তাইফে পালিয়ে গেলাম। যখন তাইফ থেকে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে দূত প্রেরিত হলো, আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করবো, কই যাবো। একবার ভাবলাম সিরিয়া চলে যাই, আবার ভাবলাম ইয়েমেন বা অন্য কোনো দেশ। খুব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছিল, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। তখন কেউ একজন আমাকে বললো, এসব চিন্তা ছাড়ো। আমি কসম করে বলছি, যে লোক মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করে আর ইসলামের সাক্ষ্য দেয়, তাদের তিনি হত্যা করেন না। এ কথা শুনে আমি সোজা মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে চলে গেলাম, তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে কালিমা পাঠ করে তাঁকে চমকে দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

- তুমি কি ওয়াহশী?

- জ্বী, আল্লাহর রাসূল।

- এখানে বসো। কীভাবে হামযাকে হত্যা করেছো সে কাহিনী আমাকে বলো।

আমি ঠিক সেভাবেই পুরো কাহিনীটি উনার কাছে বর্ণনা করলাম, যেভাবে আজ তোমাদের (উপস্থিত তাবেইনদের উদ্দেশ্যে) বলছি। আমি কাহিনী বলা থামতেই উনি বলে উঠলেন, ওয়াহশী, তুমি কি তোমার চেহারা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিতে পারো?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহশীর চেহারা দেখতে চাচ্ছিলেন না। যতবার ওয়াহশীর দিকে তাকাচ্ছিলেন, প্রতিবারই তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রিয় চাচা হামযার মৃত্যুর করুণ চিত্র।

'এরপর থেকে আমি যতটা সম্ভব রাসূলুল্লাহকে ﷺ এড়িয়ে চলতাম। উনি যেখানে যেতেন, আমি সেখানে যেতাম না পাছে উনার চোখে পড়ে যাই। আর এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উনাকে নিজের কাছেই তুলে নিলেন।'

ওয়াহশী বদলে যান, সত্যিকারের একজন মুসলিম হন। পরবর্তী জীবনে জিহাদে যোগ দেন। ভণ্ড নবী মুসাইলামা আল কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

'যে বর্শা দিয়ে আমি হামযাকে হত্যা করেছিলাম, সে বর্শা হাতে ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যখন দুই পক্ষ মিলিত হলো, আমি দেখতে পেলাম মুসাইলামা তরবারি হাতে দাঁড়ানো। আরেকজন মুসলিম যোদ্ধা তাকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। আমি আমার বর্শার লক্ষ্যস্থল ঠিক করতে থাকলাম, যখন মনে হলো ঠিকমতো লক্ষ্যস্থির করছি, বর্শা ছুঁড়ে মারলাম, বর্শা সোজা মুসাইলামাকে আঘাত করলো। ওদিকে সেই মুসলিম সেনাও তার তরবারি দিয়ে মুসাইলামাকে আক্রমণ করলো। মুসাইলামা মারা গেল।'

তরবারি দিয়ে আক্রমণ করা লোকটি হলেন উহুদ যুদ্ধের বীর, আবু দুজানা। ওয়াহশী বলতেন, 'যদি আমার আঘাতে সে মারা যেয়ে থাকে, তাহলে আমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে মেরেছি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষকেও আমি মেরেছি।' শ্রেষ্ঠ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন হামযাকে, আর নিকৃষ্ট বলে বুঝিয়েছেন মুসাইলামাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহশীকে বলেছিলেন, 'আজ থেকে তুমি আল্লাহর পথে সেভাবে যুদ্ধ করো, যেভাবে তুমি আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে।' ইসলামের বিষয়টি আসলে এমনই। কেউ যদি একটি গুনাহ করে থাকে, তাহলে একটি ভালো কাজের মাধ্যমে সেই গুনাহটি মোছার সুযোগ থাকে। ভাল কাজ খারাপ কাজগুলোকে মুছে ফেলে। আমাদের গুনাহগুলো মুছে ফেলার জন্য আমাদেরকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তর্ক করেন। তিনি বুঝতে পারলেন কাজটি ঠিক হয়নি। তিনি বলেন, 'এরপর থেকে আমি রোজা রাখা, সাদাকা দেওয়া এবং রাতে সালাত (কিয়ামুল লাইল) আদায় করতেই থাকলাম।' সাহাবিরা তাঁদের গুনাহর জন্য নেক আমল করতেন। খারাপ কাজ করা হয়ে গেলে তার পরিবর্তে ভালো কাজ করা পাপমোচন বা অনুশোচনার একটি অংশ।

মুসআব ইবন উমাইর ﷺ

মুসআব ইবন উমাইর কেমন ছিলেন সে বিষয়ে সবচাইতে চমৎকার মন্তব্যটি করেছেন খাব্বাব ﷺ। তিনি বলেন,

'কিছু লোক দুনিয়ার বুকে পুরস্কার পায় না, সব পুরস্কার জমা করে রাখে আখিরাতের জন্য। মুসআব ইবন উমাইর তেমনই একজন। উহুদের দিনে তিনি মারা যান, রেখে যান শুধু গায়ে জড়ানোর এক টুকরো চাদর। সে চাদর দিয়ে যখন আমরা তাঁর মাথা ঢাকতে যাই, তাঁর পা বের হয়ে আসে। আর যখন পা ঢাকতে যাই, মাথা বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁর মাথাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে পা দুটো যেন ইযকির ঘাস দিয়ে ঢেকে দিই।'[13]

---

[13] তিরমিযী, অধ্যায় মানাকিব, হাদীস ৪২২৫ (আরবি রেফারেন্স)।

অথচ এই মুসআব ইবন উমাইর ছিলেন জাহেলিয়াতের যুগে একজন 'সেলিব্রেটি'! কী ছিল না তাঁর! বাবা-মায়ের চোখের মণি, তরুণীদের ঘুম হরণকারী, দামী পোশাক আর সিরিয়ার সুগন্ধি ছাড়া যার চলতো না! অথচ ইসলাম মানুষটিকে আমূলে বদলে দিল। তিনি হয়ে গেলেন একেবারে সাদাসিধে। মৃত্যুর সময় তাঁর পুরো দেহ ঢাকার মতো এক টুকরো কাপড়ও তাঁর পরনে ছিল না।

অন্যদিকে আবদুর রহমান ইবন আওফ ﷺ ছিলেন ধনী সাহাবিদের একজন। একদিন ইফতারের কথা, তাঁর সামনে কিছু খাবার আনা হলো। তিনি বললেন, 'মুসআব মারা গেছে, অথচ সে ছিল আমার চাইতে উত্তম, একটা ছোট্ট চাদর ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না। হামযা মারা গেছে, অথচ সেও আমার চেয়ে উত্তম। তাঁরা মারা গেছে অথচ আমরা এখনও দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভোগ করে চলেছি।' এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন, আর কিছুই খেতে পারলেন না।[14]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসআব ইবন উমাইরের ﷺ মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে কুরআনের একটি আয়াত পড়লেন,

> "মু'মিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ [যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে] তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ [শাহাদাত বরণের] প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তনই করেনি।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ২৩)

এই আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহর সাথে আমাদের একটি ওয়াদা আছে, কিছু মানুষ আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে সেই ওয়াদা পূর্ণ করেছে। যেমন মুস'আব ইবন উমাইর ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এরাই হলো শহীদ। তোমরা আসো, তাদের দেখে যাও। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত যারাই তাদেরকে সালাম দেবে তাদেরকে তারা সালামের উত্তর প্রদান করবে।'

সাদ ইবন আর-রাবী ﷺ

সাদ ইবন আর-রাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের আগে পরামর্শ করছিলেন। সে কথা আগেই বর্ণনা করে হয়েছে। যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। বললেন, 'কে আমাকে সাদ ইবন রাবীর খবর দিতে পারবে? সে কি বেঁচে আছে না মারা গেছে? যদি তাঁকে জীবিত দেখতে পাও আমার সালাম পৌঁছে দিও।' একজন আনসারী সাহাবি, উবাই ইবন কাব, সাদের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সাদকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় খুঁজে পেলেন । তাঁকে পেয়ে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ

[14] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জানাযা, হাদীস ৩৬।

ﷺ তোমার অবস্থা জানতে চেয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। কী অবস্থা এখন তোমার?' সাদ رضي الله عنه বললেন,

'রাসূলুল্লাহর প্রতি সালাম এবং তোমাকেও। রাসূলুল্লাহকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিও, আমি জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি। আল্লাহ তাঁকে সকল নবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পুরস্কৃত করুক। আর আনসারদেরকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে বলে দিও, সাদ ইবন রাবী তাদের বলেছে, তোমরা বেঁচে থাকতে যদি তোমাদের নবীর উপর একটা আঁচড়ও আসে, তবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার মতো কোনো অজুহাত তোমাদের থাকবে না। যতদিন তোমাদের চোখের পাতা নড়বে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা নবীকে রক্ষা করে যাবে।'

মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও সাদ রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য শ্রেষ্ঠ বিনিময় কামনা করছেন। অথচ এই রাসূলুল্লাহকে বাঁচাতে গিয়েই আজ সাদ নিজের জীবনের শেষ প্রান্তে। আজকের মুসলিমরা তো এতই স্বার্থপর, এতই কৃপণ মনের অধিকারী হয়ে গেছে যে তারা দ্বীন ইসলামের জন্য জান ও মাল বিলিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। যখন বিপদ আসে, উল্টো ভাবতে থাকে যে ইসলামের জন্যই আজ তাদের এ দুর্দশা। প্রয়োজনে তারা তাদের দুনিয়ার নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি বজায় রাখার জন্য দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে দেয়।

একটু তুলনা করে দেখা যাক-- শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আশ্রয় দেওয়ার কারণে আনসারীদের জীবনে কী বিপর্যয় নেমে আসে! তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের পরিবার-পরিজনকে কষ্ট সহ্য করতে হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়াতে হয়, পুরো আরব তাদের শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু এরপরেও সাদ ইবন আর-রাবী এতটুকু বিরক্ত নন। বরং তিনি নবীজির ﷺ পুরস্কারের জন্য দুআ করছেন। শুধু তাই নয়, সাদ তাঁর আনসারী ভাইবোনের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী পাঠিয়েছেন এই বলে, তাদের মাঝে যতক্ষণ একবিন্দু প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেন নবীজিকে রক্ষা করে যায়। তাদের জীবদ্দশায় যদি নবীজির গায়ে একটি কাঁটাও লাগে, তাহলেও তারা এর জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে, তাদের কোনো কৈফিয়ত শোনা হবে না। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহায্যকারী আনসাররা দ্বীন ইসলামকে এভাবেই বুঝতেন।

আবদুল্লাহ ইবন জাহশ رضي الله عنه

উহুদ যুদ্ধের আগের কথা, আবদুল্লাহ ইবন জাহশ আর সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসের দেখা হলো। আবদুল্লাহ ইবন জাহশ বললেন, 'আসো, আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে দুআ করি।' তাঁরা ঠিক করলেন, প্রথমে তাঁদের একজন দুআ করবেন, অপরজন বলবেন আমীন। এরপর অপরজন দুআ চাইবেন, তখন প্রথমজন বলবেন আমীন। প্রথমে সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস দুআ করলেন,

'হে আল্লাহ! আমি যদি শত্রুর দেখা পাই, তাহলে আমার সাথে এমন এক শত্রুর সাক্ষাৎ করিয়ে দাও যে হবে প্রচণ্ড শক্তিশালী। সে আমার সাথে লড়বে এবং আমি তার সাথে লড়বো। এরপর তুমি আমাকে তার ওপর লড়াইয়ে বিজয়ী করে দিও। আমি যেন তাকে হত্যা করে তার দেহ থেকে বর্ম ছিনিয়ে নিতে পারি।'

আবদুল্লাহ ইবন জাহশ বললেন, 'আমীন'। সাদ বললেন, 'এবার তোমার পালা।' আবদুল্লাহ ইবন জাহশ দুআ করলেন,

'হে আল্লাহ! আমার সাথে একজন শক্তিশালী যোদ্ধার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও, যে আমার বিরুদ্ধে লড়বে এবং আমি তার বিরুদ্ধে লড়বো। এরপর সে আমাকে হত্যা করবে আর আমার নাক ও কান কেটে নেবে। আমি যেদিন তোমার সাথে মিলিত হবো, সেদিন যেন তুমি আমায় জিজ্ঞেস করতে পারো, তোমার নাক ও কান কেন কাটা হয়েছে হে আবদুল্লাহ? আর আমি বলব, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের জন্য। তখন তুমি বলবে, আবদুল্লাহ, তুমি সত্যি বলেছিলে!'

সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস এই দুআ শুনে বললেন, 'আমীন।' সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস তাঁর ছেলের কাছে যখন এ কাহিনীটি বলছিলেন, তিনি বলেন, 'শোনো বাবা, সেই দিন আমাদের দুজনের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন জাহশের দুআটাই বেশি ভালো ছিল। দিনশেষে দেখতে পেলাম, তাঁর নাক আর কান একটা দড়িতে বাঁধা।'

আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআটি সত্যিই কবুল করে নিয়েছিলেন! ঠিক সেভাবে কবুল করেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন! এই দুআ থেকে এটাও জানা যায় যে নিজের মৃত্যুকামনা করা জায়েয কেবলমাত্র তখনই, যখন আল্লাহর পথে মৃত্যুর দুআ হয়।

খাইসামা আবু সাদ ﷺ

খাইসামা ﷺ বেশ বয়স্ক একজন সাহাবি। তবুও তিনি যুদ্ধে যেতে উন্মুখ হয়ে ছিলেন। কিতালে অংশ নেওয়া বৃদ্ধদের ওপর ফরয নয়, কিন্তু তিনি খুব করে চাইতেন শহীদ হতে। খাইসামার এক ছেলে বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। খাইসামা বলেন,

'বদরের যুদ্ধে আমি যেতে পারিনি। বদরের সময় আমি জিহাদে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, তখন আমার আর আমার ছেলের মধ্যে লটারি হলো। লটারিতে ছেলে জিতলো। সে যুদ্ধে গেল আর আল্লাহ তাকে শাহাদাহ দান করলেন! গতরাতে ওকে স্বপ্নে দেখেছি, ওকে দেখতে অসাধারণ লাগছিল! সে খুব মজা করে জান্নাতের ফল খাচ্ছিল। আমাকে বললো, এসো, জান্নাতে আমাদের সঙ্গী হয়ে যাও! আমাকে আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন তা আসলেই সত্যি হয়েছে।'

হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি জান্নাতে তার সাথে মিলিত

হতে চাই! আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাকে শাহাদাহ দান করেন! তিনি যেন আমাকে সাদের সাথে জান্নাতে এক হওয়ার সুযোগ দেন!'

রাসুলুল্লাহ তাঁর অনুরোধ রাখেন, তাকে যুদ্ধে যেতে দেন। খাইসামা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। যুদ্ধে না যাবার যথেষ্ট অজুহাত খাইসামার ছিল, কিন্তু তিনি আর সবার মতো নন। বরং তাঁর ভয় ছিল না জানি বিছানায় শুয়েই মারা যান আর শাহাদাহ থেকে বঞ্চিত হন! জিহাদে না-যাবার অজস্র অজুহাতের বিপরীতে, বৃদ্ধ খাইসামার এই একটি আবেগী দুআ আমাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

ওয়াহাব আল মুযানী ﷺ এবং তাঁর ভাতিজা ﷺ

ওয়াহাব আল মুযানী ছিলেন একজন রাখাল। তিনি মদীনার স্থানীয় নন, এসেছিলেন মদীনার বাইরে মুযাইনা নামের এক গোত্র থেকে। তাঁর আত্মীয়স্বজনও ছিল রাখাল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করার জন্য একদিন তারা সবাই মদীনায় এল। তাদের ভেড়াগুলিও সাথে ছিল। কিন্তু মদীনায় এসে দেখলো সেখানে কেউ নেই! সবাই যুদ্ধ করার জন্য উহুদের ময়দানে গেছে। এ কথা শুনে ওয়াহাব ভেড়ার পাল মদীনাতেই ফেলে রেখে ভাতিজাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা দিলেন ।

মুসলিমরা তখন সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। তাঁরা পৌঁছেই যুদ্ধে যোগ দিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন খালিদ ইবন ওয়ালিদের অতর্কিত হামলায় মুসলিমরা কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন এল ওয়াহাব আল মুযানীর পালা। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে পেলেন যে শত্রুদের একটি দল জড়ো হয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি বলে ওঠেন, 'কে আছে এদের বিরুদ্ধে লড়বে?' ওয়াহাব আল মুযানী বলে ওঠেন, 'আমি লড়বো!' এই বলে তিনি এগিয়ে যান, তাদের ওপর ক্রমাগত তীর ছুঁড়ে তাদের পিছু হটিয়ে দেন। শত্রুপক্ষের আরও একটি দল এগিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আছে এদের থামাবে?' 'আমি থামাবো! ইয়া রাসূলুল্লাহ!' বলে আল মুযানী তরবারি নিয়ে এবারো শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আর পিছু হটতে বাধ্য করেন।

এরপর শত্রুদের বেশ বড়সড় একটি দল এগুতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন ওয়াহাবের জীবনের শেষ মুহূর্ত চলে এসেছে। তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন, 'এগিয়ে যাও! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো!' এ কথা শুনে ওয়াহাব আল মুযানী এই বিশাল দলটির সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এগিয়ে যেতে দেখে বলেন, 'হে আল্লাহ! তাঁর ওপর রহম করো!' ওয়াহাব আল মুযানীর দেহ তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত তিনি লড়াই করতেই থাকেন। তাঁর ভাতিজাও একইভাবে শহীদ হন। যখন তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল, তাঁর শরীরে তখন বিশটি মারাত্মক জখমের চিহ্ন!

ওয়াহাব আল-মুযানীর ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখে উমার ﷺ বলেছিলেন, 'এর থেকে চমৎকার মৃত্যু তো আমি কল্পনাও করতে পারি না!' ওয়াহাব আল মুযানীর এই মৃত্যু ছিল উমারের কাছে 'স্বপ্নের মৃত্যু!' তেরো বছর পরের কথা। ক্বাদিসিয়ার যুদ্ধের পর সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসের সাথে মুযাইনা গোত্রের এক লোকের দেখা হলো। লোকটার নাম বিলাল। তার আত্মীয়রা গনিমতের মালের অংশ পায়নি। কথাপ্রসঙ্গে সাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি ওয়াহাব আল-মুযানীর আত্মীয়?' সে বললো, 'জ্বী, আমি তার ভাতিজা।' সাদ বলে উঠলেন,

'ভাই! তোমার চাচার কাহিনী জানো তো? উহুদের দিনে যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো স্বেচ্ছাসেবকের জন্য ডাক দিচ্ছিলেন, প্রতিবারই তোমার চাচা এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের হামলা করেন। তৃতীয় বারে আমিও তাঁর সাথে যোগ দিলাম। আশা ছিল যে, তাঁর সমান পুরস্কার যদি পেয়ে যাই! কারণ রাসূলুল্লাহকে ﷺ তখন বলছিলেন, জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার চাচা শহীদ হয়ে গেলেন, আমিও খুব করে চাচ্ছিলাম তাঁর সাথে শহীদ হই। কিন্তু আমার সময় তখনও আসেনি। আমি ভাবি, ইশ! আমি যদি মুযানীর মতো শহীদ হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম!'

ওয়াহাব আল মুযানীর দাফনের সময় নবীজি ﷺ আহত-ক্লান্ত-বিধ্বস্ত; তবু তিনি দাফনের পুরোটা সময় জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হও, কারণ আমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট।' জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়াহাব আল মুযানী অসীম বীরত্ব আর সাহসিকতার সাথে লড়াই করে গেছেন। ওয়াহাব কিন্তু খুব নামকরা সাহাবি ছিলেন না, কিন্তু তার বীরত্বগাঁথা সাহাবিরা বহুদিন পর্যন্ত স্মরণ করেছেন।

আমর ইবন আল জামূহ ﷺ

আমর ইবন আল জামূহ ছিলেন খোঁড়া। তাঁর ছিল চার ছেলে। প্রত্যেকেই সাহসী যোদ্ধা। উহুদের যুদ্ধের সময় এলে আমর জিহাদে যোগ দিতে চান কিন্তু ছেলেরা বাধ সাধে। তাদের যুক্তি, আমরের জন্য জিহাদে যাওয়া ফরয নয়। আমর তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে অনুরোধ জানান, 'আমার ছেলেরা চায় না আমি আপনার সাথে জিহাদে যাই। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমার এই খোঁড়া পা আমি জান্নাতে ফেলতে চাই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন,

'তোমাদের বাবা যদি জিহাদে যেতে চায়, যেতে দাও। তাকে বাধা দেওয়া তোমাদের দায়িত্ব নয়। হয়তোবা আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাহ দান করবেন।'

আমর যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি পেলেন। শাহাদাতের স্বপ্নে বিভোর আমর রাসূলুল্লাহর কাছে এসে এক ফাঁকে জানতে চাইলেন,

- আচ্ছা রাসূলুল্লাহ, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় মারা যাই, তাহলে আমি জান্নাতে সুস্থ-সবল পা নিয়ে হাঁটতে পারবো তো?

- অবশ্যই পারবে!

আমর ইবন আল জামূহ শহীদ হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেন। একজন অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তির জন্য কিতালে যাওয়া আবশ্যক না হলেও অনুমোদিত। তবে প্রতিটি ঘটনার অসাধারণ দিকটি হলো সাহাবিদের মাঝে শহীদ হিসেবে মারা যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা, অধীর আগ্রহ আর অদম্য স্পৃহা।

হানযালা ইবন আবি আমীর ﷺ: ফেরেশতারা গোসল দিল যাকে

আনসারী সাহাবি হানযালা ﷺ, উহুদের যুদ্ধের আগের রাতেই তাঁর বিয়ে হয়। যুদ্ধের সময়টাতে সাধারণত মুজাহিদরা ক্যাম্পে অবস্থান করেন। কিন্তু হানযালা ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে বিশেষভাবে অনুমতি চাইলেন স্ত্রীর সাথে রাত কাটাবার। রাসূলুল্লাহ অনুমতি দিলেন। হানযালা রাতে স্ত্রীর সাথে থাকলেন। ভোরে ফিরে এসে সাহাবিদের সাথে ফজরের সালাহ্ আদায় করলেন। এরপর স্ত্রীর জামিলাহর ﷺ কাছে ফিরে এলেন বিদায় নিতে। কিন্তু জামিলাহ্ তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন, তাঁরা মিলিত হলেন।

এদিকে বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই ফরয গোসল না করেই হানযালা ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দুঃসাহসী হানযালা ঘোড়ার পিঠে বসে শত্রুপক্ষের নেতা আবু সুফিয়ানকে টার্গেট করলেন। হানযালা এগিয়ে গিয়ে আবু সুফিয়ানের ঘোড়াকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। আবু সুফিয়ান ঘোড়া থেকে পড়ে চিৎকার করে উঠলো। হানযালা আবু সুফিয়ানকে শেষ করে দিতে চাইলেন, কিন্তু তার আগেই এক মুশরিক এসে পড়লো। সে হানযালাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো। তাঁর বুক ভেদ করে বর্শা পিঠ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু হানযালা ﷺ থামবার পাত্র নন। তিনি আবু সুফিয়ানকে আবার আঘাত করতে উদ্যত হলেন। সেই মুশরিক তাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করলো। হানযালা ﷺ শহীদ হলেন।

হানযালাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখেন! তিনি বলেন, 'আমি হানযালাকে দেখেছি ঠিক আসমান আর জমিনের মাঝে। ফেরেশতারা তাকে জান্নাতী রুপার পাত্রে রাখা আল-মুযনের পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিচ্ছে!' রাসূলুল্লাহ ﷺ হানযালার খবর নিতে তার স্ত্রী জামিলাহর কাছে লোক পাঠালেন। জামিলাহ ছিলেন মুনাফিক্ব নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মেয়ে। কিন্তু তিনি বাবার মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুত্তাক্বী মুসলিমাহ। লোকেরা জামিলার কাছে গেল। তিনি বললেন, 'যাবার আগে তিনি গোসল করার সময় পাননি, যুনুব (অপবিত্র) অবস্থাতেই তিনি চলে

যান।' রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে বললেন, 'এজন্যই তাকে ফেরেশতারা গোসল করিয়ে দিচ্ছিল!'

আরও একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটে। জামিলাহ যখন হানযালার ﷺ সাথে থেকেছিলেন, তিনি চারজন সাক্ষী ডেকে বিষয়টা জানান। এ অদ্ভুত কাজটা তিনি কেন করলেন? সাধারণত স্বামী বা স্ত্রীর একান্ত গোপন কথা অন্যদের জানবার কথা নয়। জামিলাহ্ বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে আকাশ খুলে গেল আর তার ভেতর দিয়ে হানযালা চলে গেলেন, এরপর আকাশ আবার বন্ধ হয়ে গেল। তাই আমার মনে হলো যে হানযালা শহীদ হয়ে যাবেন।' স্বামী পরদিন মারা যাবে জানলে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক না করাটাই 'স্বাভাবিক'। কারণ তাহলে সে নারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা সহজ হবে। কিন্তু কীসের আশায় জামিলাহ জেনে শুনে স্বামীর সাথে মিলিত হলেন? কেন সবাইকে বিষয়টা জানালেন? কেন তিনি সেই পুরুষের সন্তান চাইলেন যে কিনা পরদিনই শহীদ হয়ে যাবে?

আসলে সাহাবিদের মানসিকতা আমাদের মতো ছিল না। তাঁরা দুনিয়াকে অন্যভাবে দেখতেন, তাঁরা দুনিয়াকে দেখতেন ওয়াহীর আলো দিয়ে। হানযালা শহীদ হবেন -- এটা জেনেশুনেই জামিলাহ তাঁর সন্তান গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন। জামিলাহর জন্য এটাই ছিল আনন্দের ব্যাপার যে তাঁর স্বামী হবে একজন শহীদ! হয়তো তাঁর জন্য পৃথিবীটা কঠিন হয়ে পড়বে। হয়তো কষ্ট আর দুর্দশা তাঁর ওপর চেপে বসবে, কিন্তু শহীদের স্ত্রী হবার মধ্যে যে মর্যাদা আছে, সে মর্যাদা লাভের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি জামিলাহ। তিনি যা-ই করেছেন, আল্লাহর জন্য করেছেন। আর আল্লাহ তাআলাই তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন।

জামিলার সাথে এরপর সাবিত ইবন ক্বাইসের ﷺ বিয়ে হয়। জামিলার গর্ভে জন্ম নেওয়া হানযালার সন্তানের নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ। আর সাবিতের সংসারে জন্ম নেয় মুহাম্মাদ। এই মুহাম্মাদই ছিল আবদুল্লাহর সবচেয়ে কাছের মানুষ। বাবা না থাকা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ ঠিকই তার সৎ বাবা ও ভাইয়ের থেকে আদর-স্নেহ-মমতা পেয়েছিল, ভালোবাসায় কোনো কমতি ছিল না। নিশ্চয়ই তাক্বওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ উত্তম কিছুই দান করবেন।

আল্লাহ তাআলার প্রতি সাহাবিদের ভালবাসার আরেকটি নিদর্শন এই ঘটনা। সদ্যবিবাহিত হানযালা ﷺ গোসল না করে ময়দানে ছুটে যান। পদাতিক সৈন্য হয়েও তিনি পাল্লা দেন ঘোড়সওয়ারির সাথে। যেসব ভাই ও বোনেরা বিয়ে করেছেন, তারা জানেন বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে দুনিয়ার প্রতি কী প্রবল মায়া কাজ করে! সেই তীব্র বন্ধন উপেক্ষা করে ময়দানে যুদ্ধ যাওয়া কতই না কঠিন! আর সেটাই করেছিলেন হানযালা, আর তাই 'ফেরেশতারা তাকে গোসল করিয়েছে!'

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম ﷺ

আবদুল্লাহ ইবন আমর তাঁর ছেলে জাবিরকে উহুদের আগে ডেকে বললেন,

'বাবা শোনো, রাসূলুল্লাহর ﷺ পর এই দুনিয়ায় তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয়। যদি তোমার বোনদের দেখাশোনা করতে না হতো, আমার ঋণ পরিশোধের বিষয়টি না থাকতো, তাহলে আমি চাইতাম তুমিও যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাও। নিজের ব্যাপারে আমি আশা করি, আমি প্রথম সারির শহীদ সাহাবিদের একজন হবো। তোমার কাছে ওসিয়ত এই যে, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও আর তোমার বোনদের দেখে রেখো।'

আবদুল্লাহ ইবন আমরের স্বপ্ন সত্য হয়েছিল, তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা তাঁর জন্যে কাঁদো বা না-কাঁদো, জেনে রেখো, তোমার বাবাকে ফেরেশতারা ঠিকই ছায়া দিয়ে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা তাকে দাফনের জন্য ওঠাচ্ছো।'[15]

জাবির তার বাবার লাশ দেখে খুব কাঁদছিলেন। জাবিরকে ডেকে নবীজি ﷺ বললেন, 'তুমি ভেঙে পড়ছো কেন জাবির?' জাবির জানালেন তার বোনদের দেখাশোনা আর তার বাবার রেখে যাওয়া ঋণের কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি কি তোমাকে একটা সুসংবাদ দেবো? শোনো, আল্লাহ তাআলা কোনো পর্দা ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন না, কিন্তু তিনি তোমার বাবা আবদুল্লাহর সাথে কথা বলেছেন সরাসরি! জানতে চেয়েছেন, আবদুল্লাহ তুমি কী চাও? আর আবদুল্লাহ উত্তর দিয়েছেন, হে আমার রব! আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠাও, যেন তোমার জন্য যুদ্ধ করে আবার শহীদ হতে পারি!'

মৃত্যুর পর শহীদ ছাড়া আর কোনো মানুষ দুনিয়াতে ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু শহীদের কাছে তার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এতই সুখকর যে, সে দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে আবারও সেই মুহূর্তটি উপভোগ করতে চায়।

শাহাদাতের মর্যাদা

১) সবুজ পাখির অন্তরে

শাহাদাতের মর্যাদার কথা অসংখ্য হাদীসে এসেছে, এর মধ্যে একটি চমৎকার হাদীস হলো সবুজ পাখির হাদীস। এটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

উহুদের যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইদের হত্যা করা হয়, আল্লাহ তখন তাদের

---

[15] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৩২।

রুহকে সবুজ পাখির অন্তরে স্থাপন করেন। তারা তখন সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতের নদীর ওপর উড়ে বেড়ায়, সেখানকার ফল খায়, মহান রবের আরশের ছায়ায় রাখা সোনার প্রদীপে যেয়ে বাসা বাঁধে। জান্নাতের সুস্বাদু খাবার, মজাদার পানীয়, শান্তিময় নিবাস উপভোগের পর তারা বলতে থাকে, কে আমাদের ভাইদের যেয়ে জানাতে পারবে যে আমরা জান্নাতে জীবিত আছি, আমাদের রবের রিযিক্ব প্রাপ্ত হয়েছি -- তারা যেন জিহাদ থেকে বিমুখ না হয়ে যায়, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে না যায়। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেন, আমি তাদেরকে তোমাদের এ কথা জানিয়ে দেবো। এরপর তিনি নাযিল করেন সূরা আলে-ইমরানের এ আয়াত (১৬৯-১৭১):

আর যাদের আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছে তাদের মৃত ভেবো না, বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার কাছে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাঁর করুণাভাণ্ডার থেকে তাদের যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কেননা তাদের উপরে কোনো ভয় নেই আর তারা অনুতাপও করবে না। তারা আনন্দ করবে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহের জন্য এবং করুণাভাণ্ডারের জন্য, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রাপ্য বিনষ্ট করেন না।[16]

অর্থাৎ, শহীদেরা চাইছিলেন তাদের দুনিয়ার ভাইদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে, যেন তারা জিহাদ থেকে পিছু না হটে। আল্লাহ তাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করেছেন, তাই তিনি সূরা আলে-ইমরানের আয়াতগুলো নাযিল করেন।

এই হাদীস থেকে আমরা দুটো জিনিস জানতে পারি। এক, শহীদেরা জীবিত, এবং দুই, তাঁরা চান যে, তাদের ভাইয়েরা জিহাদ অব্যাহত রাখুক। ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন মুজাহিদদের মাঝে এতই মজবুত যে, মৃত্যুর পরেও তাঁরা তাঁদের মুজাহিদ ভাইদের কাছে বার্তা পাঠাতে চেয়েছেন। তাঁদের এই আন্তরিক ইচ্ছার কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁদের হয়ে বার্তাটি পৌঁছে দেন।

এই ব্যাপারে আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন মাসরুক্ব। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম কুরআনের এই আয়াতটির অর্থ কী: 'যাদের আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছে তাদের মৃত ভেবো না, বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত...' তিনি বললেন, আমরা এই আয়াতের অর্থ রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন,

'শহীদদের আত্মাকে স্থাপন করা হবে সবুজ পাখিদের দেহে। মহান আল্লাহর আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড়বাতির মাঝে তারা বাসা বাঁধবে। জান্নাতের ফল

---

[16] সুনান আবু দাউ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৪৪।

থেকে যা ইচ্ছা খাবে, এরপর আবার নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসবে। একবার আল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী চাও? তারা জবাব দিলো, আমরা আর কী চাইতে পারি? আমরা তো যেখান থেকে খুশি জান্নাতের ফল খেতে পারছি!

তাদের রব তাদেরকে তিনবার একই প্রশ্ন করলেন। তারা যখন বুঝতে পারল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করতেই থাকবেন, তখন বললো, হে আমাদের রব, আমাদের ইচ্ছা হয় যে আপনি আমাদেরকে আবার দুনিয়ার জীবনে ফেরত পাঠান আর আমরা আবারো আপনার জন্যে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাই!

আল্লাহ তাআলা যখন দেখলেন তাদের আর কোনো চাওয়া নেই, তিনি তাদেরকে জান্নাতের আনন্দ উপভোগের জন্য ছেড়ে দিলেন।'[17]

২) সালামের জবাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যদি কেউ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবর যিয়ারত করে তাদেরকে সালাম প্রদান করে, তবে তারা প্রত্যেকের সালামের জবাব দেবে।' এ প্রসঙ্গে ইবন আবি দুনিয়ার বলা একটি ঘটনা আততাফ ইবন খালিদ বর্ণনা করেছেন। আবি দুনিয়া বলেন যে তাঁর চাচী প্রায়ই শহীদদের কবরে যেয়ে হামযার ﷺ জন্য দু'আ করতেন। তাঁর চাচী বলেন,

'একদিন আমি গোরস্থানে গেলাম। সেখানে আমার উটের লাগাম টেনে ধরার লোকটি ছাড়া আর কেউ-ই উপস্থিত ছিল না। আমি হামযার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুআ করলাম। দুআ শেষ করে আমি তাকে সালাম দিয়ে বিদায় জানালাম। আর ঠিক তখনই মাটির নিচ থেকে আমি আমার সালামের জবাব শুনতে পেলাম! এই ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন -- এ নিয়ে আমার যেমন কোনো সন্দেহ নেই; রাত আর দিনের তফাত নিয়ে যেমন করে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, তেমন এই বিষয়টা নিয়েও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমি সালামের উত্তর শুনেছি। আর তা শোনার সাথে সাথে আমার গায়ের প্রতিটা লোম খাড়া হয়ে গেল!'[18]

৩) সুগন্ধী কবর

আল ওয়াক্বিদী বলেন, 'মুআবিয়া একবার পরিখা (গর্ত) খুঁড়তে গেলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন যাদের আত্মীয় উহুদের যুদ্ধে শাহাদাহ লাভ করেছে, তারা যেন গর্ত খোঁড়ার আগে বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দেয়। কেননা পরিখা কাটতে গেলে শহীদদের কবর বের হয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি শহীদদের আত্মীয়দেরকে সেখানে উপস্থিত থাকতে

---

[17] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১৮১।

[18] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮।

বলেন যেন তারা কবরগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রয়োজনে সরিয়ে নিতে পারে। জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ সে ঘটনা সম্পর্কে বলেন,

'এক লোক আমাকে জানালো, জাবির, মুআবিয়ার লোকেরা পরিখা খোঁড়ার সময় তোমার বাবার কবরও খুলে ফেলেছে। উনার কিছু অংশ কবরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এ কথা শুনে জাবির বাবার কবর খুঁড়তে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁদের কবরগুলো খনন করতে গিয়ে দেখি আমার বাবার শরীরটা অবিকল আগের মতোই আছে, একটুও বদলায়নি। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি ঘুমোচ্ছেন। কবর খুড়তে গিয়ে তাঁর আরেক সাথী আমর ইবন জামুহকেও দেখতে পেলাম। তাঁর হাত দিয়ে শরীরের একটি ক্ষতস্থান ঢাকা ছিল। হাতখানি সরিয়ে দেখলাম, ক্ষত থেকে গলগল করে তাজা রক্ত বেরোতে লাগলো! গর্ত খুড়তে গিয়ে হামযার ﷺ পায়ে শাবলের আঘাত লাগে, সেখান থেকেও টাটকা রক্ত ঝরতে শুরু হয়। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি গতকালই তাঁদেরকে কবর দেওয়া হয়েছে!'

ইবন কাসির বলেন, 'তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! বলা হয়ে থাকে উহুদের শহীদদের প্রত্যেকের কবর থেকে মেশকের সুবাস ভেসে আসছিল।' এই মানুষগুলো শাহাদাহ লাভ করেছেন ৪৬ বছর আগে! অথচ তাঁদের দেহগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছে।

৪) শহীদদের গোসল বা জানাযার প্রয়োজন নেই

বান্দা যেখানে শাহাদাহ লাভ করে, সেখানেই তাকে কবর দেওয়া সুন্নাহ। ক'জন সাহাবি উহুদের শহীদদের মৃতদেহ নিয়ে মদীনায় যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে বললেন, 'তাদের নিয়ে ফিরে যাও আর উহুদের ময়দানেই কবর দাও।' ময়দানই শহীদদের গোরস্থান। মদীনা উহুদের ময়দান থেকে বেশ কাছেই ছিল। দেহগুলোকে মদীনায় নেওয়া যেত। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদের ময়দানেই শুহাদাদের কবর দিতে বলেন।

দাফন করার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ উহুদ যুদ্ধের দুইজন শহীদের ওপর এক টুকরো কাপড় বিছিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'এ দুজনের মাঝে কার কুরআনের জ্ঞান বেশি ছিল?' যার কুরআনের জ্ঞান বেশি, তাকে তিনি আগে কবরে নামাতেন। শহীদদের কবরে রেখে দুআ করতেন, 'আমি কিয়ামতের দিনে ওদের জন্য সাক্ষ্য দিবো।' দু'জন শহীদের জন্য একটি কাপড় বরাদ্দ ছিল কারণ দাফনের যথেষ্ট কাপড় পর্যন্ত ছিল না।

অবশ্য আরেকটি কারণ হতে পারে, যুদ্ধ করে সবাই এত বেশি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কবর খোঁড়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। আর তাই দুজনের জন্য একটি করে কবর খুঁড়ে, যার কুরআনের জ্ঞান বেশি আছে তাকে প্রথমে, এরপরে দ্বিতীয়জনকে এভাবে করে কবর দেওয়া হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দেন যেন শুহাদাদেরকে গোসল না দিয়ে শরীরের রক্ত সহ কবর দেওয়া হয়। শহীদদের জন্য জানাযার নামাজও আদায়

করতে হয় না, কেননা তারা 'মৃত নয় বরং জীবিত'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হাশরের ময়দানে তাদের রক্ত ও ক্ষতগুলো থেকে মেশকের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে।'

৫) নবীজির ﷺ সাক্ষ্য

উহুদ যুদ্ধের ধকলের কারণে নবীজি ﷺ সেদিন বসে যোহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি সাহাবিদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বলে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। ইমাম আহমেদ এই দুআটি বর্ণনা করেন,

'হে আল্লাহ! সকল প্রশংসার মালিক একমাত্র তুমি। হে আল্লাহ, তুমি যা ধরে রাখতে চাও তা কেউ ছাড়িয়ে আনতে পারবে না। আর যা তুমি ছাড়িয়ে নিতে চাও, তা কেউ ধরে রাখতে পারবে না। যাকে তুমি পথভ্রষ্ট করো, কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারবে না, আর তুমি যাকে হেদায়েত দাও, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করার করতে পারবে না। যা তুমি দিতে চাও, তা বাধা দেওয়ার কেউ নেই, আর যা তুমি আটকে রেখেছো, তা ছাড়িয়ে নেবার সাধ্য কারো নেই। তুমি যা দূরে সরিয়ে দিতে চাও, তার কাছাকাছি কেউ যেতে পারবে না আর তুমি যা কাছে নিয়ে আসো তা দূরে ঠেলে দেওয়ার কেউ নেই।

হে আল্লাহ! আমাদের ওপর তোমার রহমত, করুণা ও দয়া বর্ষণ করো!

হে আল্লাহ! আমি তোমার সে রহমতের প্রত্যাশী যার কোনো কমতি নেই, যার কোনো শেষ নেই। হে আল্লাহ! আমি নিরাপত্তার সময় তোমার রহমত চাই, আমি তোমার রহমত চাই পরীক্ষা আর ভয়ভীতির সময়ে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যা কিছু দিয়েছ, তার মন্দ থেকে, আর যা কিছু দাওনি, তার মন্দ থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

হে আল্লাহ, তাওফিক দাও যেন আমরা ঈমানকে তোমার রহমত হিসেবে দেখি। ঈমানকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ তাওফিক দাও যেন কুফর ও তোমার অবাধ্যতায় আমরা বিতৃষ্ণা অনুভব করি।

আমাদেরকে সরল পথপ্রাপ্তদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করো। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও আর মুসলিম হিসেবে পরকালে জীবন দান করো। আমাদেরকে সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। অপদস্থ ও উন্মত্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিও না! হে আল্লাহ, সেই সকল কাফিরদের ধ্বংস করে দাও যারা তোমার রাসূলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের বিরোধিতা করে, অত্যাচার করে আর কষ্ট দেয়। হে আল্লাহ, হে সত্যের রব! সেইসব কাফিরদের ধ্বংস করে দাও যাদেরকে তুমি কিতাব দান করেছিলে।'[19]

---

[19] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮।

স্নায়ুযুদ্ধ: হামরা আল-আসাদ

উভয় পক্ষ ময়দান ত্যাগ করলেও যুদ্ধের রেশ তখনো কাটেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হার মেনে যাওয়ার মানুষ নন। শত্রুপক্ষের মনস্তত্ত্বও তিনি বুঝতেন। তিনি ধারণা করলেন, কুরাইশরা যেহেতু এই যুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, তাই তারা আবার মদীনায় হামলা চালাতে পারে। তাঁর ধারণা সত্যি হলো। কুরাইশরা প্রথমে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও পথিমধ্যে তারা মত বদলালো। ইকরিমাহ ইবন আবি জাহল সবাইকে বলে বেড়াতে থাকে, 'কী করেছো তোমরা? না পারলে মুহাম্মাদকে হত্যা করতে, না পারলে তাদের নারীদের দাসী বানাতে! ছি! কিছুই তো পারলে না।' তার উসকানিমূলক কথায় কুরাইশরা মদীনায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল।

তবে এ খবর রাসূলুল্লাহর ﷺ দৃঢ়তায় এতটুকু আঁচড় কাটতে পারেনি। তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না, বরং কুরাইশদের মোকাবেলা করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে গেলেন। এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবন ইসহাক, তিনি বর্ণনা করেছেন,

'উহুদের যুদ্ধ মধ্য শাওয়ালের এক শনিবারে সংঘটিত হয়, আর ঠিক তার পরদিনই রাসূলুল্লাহর ﷺ মুয়াজ্জিন ঘোষণা দেন তারা শত্রুদের ধাওয়া করবে। তিনি বললেন, আগের দিন যারা যুদ্ধ করেছে, কেবল তারাই এই অভিযানে অংশ নেবে। কুরাইশদের বুকে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর রাসূল তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। উদ্দেশ্য -- তাদের জানান দেওয়া যে, মুসলিমরা মোটেও দুর্বল হয়নি। তারা এখনো শত্রুদের মোকাবেলা করতে সক্ষম।'

মুসলিমরা তখন সবে মাত্র ময়দান থেকে ফিরেছে। আর পরদিন সকালেই বলা হলো, অস্ত্র তুলে নাও আর শত্রুদের ধাওয়া করতে বেরিয়ে পড়ো! মুজাহিদরা ক্লান্ত, আহত, শরীর তাদের ক্ষত-বিক্ষত। আগের দিনই তারা ৭০ জন সঙ্গীকে হারিয়েছে! আর এমনই কঠিন পরিস্থিতিতে পরের দিনই তাদের বলা হলো আরেকটি যুদ্ধের উদ্দেশে রওনা দিতে।

ব্যাপারটা মোটেও সহজ ছিল না। অন্যদিকে মুনাফিকরা স্বভাববশত মুসলিমদের মনে ভয় ছড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ সাফ কথা, 'আমরা বের হবো এবং শত্রুদের মোকাবেলা করবো।' শত্রুদের ধাওয়া করার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ভয় দেখানো; তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া যে মুসলিম বাহিনী এখনও হেরে যায়নি। তাদের কাছে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দেওয়া যে, যুদ্ধে পরাজয় মুসলিমদেরকে একটুও দুর্বল করতে পারেনি। এমন বিপদ আর সংকটের মুখেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরিসীম ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। হেরে গেলেও উজ্জীবিত থাকা, লড়াই চালিয়ে যাওয়ার উদ্যম থাকা, আল্লাহ আযযা ওয়াজালের ওপর আস্থা রাখা মুজাহিদদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে আহত সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের আহবানে সাড়া দেন; বেরিয়ে পড়েন জিহাদে। তারা হামরা আল-আসাদে যুদ্ধের তাঁবু গাড়েন। কুরাইশরা অবাক দৃষ্টিতে দেখছে আর ভাবছে, 'আমরা কি আসলেই তাদের হারিয়েছি!' তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না যারা গতকাল তাদের সাথে যুদ্ধে 'হেরে' গেছে, তারা কী করে ঠিক তার পরদিন যুদ্ধে নামার সাহস পেল!

এর মধ্যে ঘটে গেল একটি ঘটনা। খুযাআ গোত্রের একজন মুশরিক মা'বাদের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখা হলো আর সে মুসলিম হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আবু সুফিয়ানের কাছে পাঠালেন যেন সে মুসলিমদের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। মা'বাদকে দেখে আবু সুফিয়ান বলে উঠলো,

- ওদিকটার খবর কী মা'বাদ, জানো কিছু?

- মুহাম্মাদ তার দলবল নিয়ে তোমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এমন বাহিনী আমি জীবনেও দেখিনি! তারা তোমাদের বিরুদ্ধে মহা ক্ষ্যাপা! উহুদের যুদ্ধে যারা আসেনি, তারাও এবার যোগ দিয়েছে। আগেরবার আসতে পারেনি দেখে ওদের অনুশোচনার শেষ নেই।

মা'বাদ ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে-চাড়িয়ে কথা বলছিল। আবু সুফিয়ান বললো,

- আচ্ছা তোমার কী মনে হয়? আমাদের এখন কী করা উচিত?

- কসম করে বলছি, তোমরা এখান থেকে পালাবার আগেই তাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী এসে পড়বে!

- কিন্তু আমরা তো চাচ্ছিলাম তাদের পুরোপুরি শেষ করে দিতে!

- সত্যি বলতে, আমি মনে করি এই পরিকল্পনা মাথা থেকে বাদ দিলেই ভালো। কসম আল্লাহর! তুমি জানো, আমি ওদের দেখে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম যে একটা কবিতাও রচনা করে ফেলেছি!

আবু সুফিয়ান তার কবিতাটা শুনতে চাইলে, মা'বাদ বলে,

'ওদের আওয়াজে পাহাড় যেন লজ্জায় মুখ লুকোয়,
টগবগ করে ছোটা সারিবাঁধা সুঠাম অশ্বের ঝংকারে ধ্বনিত হয় পৃথিবী-
ঘোড়সওয়ারিরা, তারা তো এক একটা মস্ত সিংহ।
এই সৈনিকেরা যুদ্ধকে ডরায় না, অস্ত্রের অভাব নেই তাদের
আমি দেখে দৌড়ে পালাই, মনে হয় যেন ধরণী কাঁপছে!
তাদের আছে এমন নেতা যাকে কেউ কোনোদিন একা ফেলে যাবে না।'

মা'বাদ এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করলেন। শত্রুর মনোবল ভেঙে দিলেন। কুরাইশরা মক্কায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। আবু সুফিয়ান তবু আক্রমণ করার মিথ্যা হুমকি দিয়ে মুসলিমদের ভয় দেখানোর শেষ চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসলিমদের এতটুকু টলানো গেল না। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে মুসলিমরা জয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে গেল। এ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

> "যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার। মুনাফিকরা যাদেরকে বলেছিল, নিঃসন্দেহে তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, অতএব তাদের ভয় করো। কিন্তু তাদের ঈমান বেড়ে গেল, আর তারা বললো, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি অতি উত্তম রক্ষাকর্তা। সুতরাং তারা ফিরে এল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিআমত ও করুণাভাণ্ডার নিয়ে, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি, বস্তুতঃ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করেছিল। আর আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত বিশাল। নিঃসন্দেহ শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো, -- যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭২-১৭৫)

শয়তান মু'মিনদের ভয় দেখায়, *'দেখো, শত্রুরা অনেক শক্তিশালী, ওদের অনেক ক্ষমতা! ওদের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে তাকাও, ওদের সংখ্যা গুনো, ওদের সহায়-সম্পদ দেখো! ওদের সাথে লড়তে যেও না।'* -- এসব বলে শয়তান মনের মধ্যে ভয় ঢোকাতে চায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ সবই শয়তানের দেওয়া ওয়াসওয়াসা। আমরা যদি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি, তাহলে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আমাদেরকেই বিজয়ী করবেন।

উহুদের যুদ্ধবন্দী

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের একমাত্র যুদ্ধবন্দী ছিল আবু আযযা। এই আবু আযযা বদর যুদ্ধেও বন্দী হয়েছিল। তখন সে অজুহাত দেখায়, সে খুব গরিব, তার মেয়েদের দেখাশোনা করার কেউ নেই। রাসূলুলাহ ﷺ সেবার কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেন। শুধু একটাই শর্ত জুড়ে দেন, তা হলো সে কখনই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আবু আযযা এ কথা মেনে নিয়ে মুক্তি পায়।

কিন্তু মক্কার কুরাইশরা উহুদের সময় আবারও তাকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য নানাভাবে ফুসলাতে থাকে। আবু আযযা রাজি হলো না। আবু সুফিয়ান তাকে বললো, 'আরে! আমাদের এবার তিন হাজার সৈন্য, আমরা কীভাবে হারতে পারি! আর তোমার মেয়েদের কথা ভাবছো? শোনো, যদি তোমার কিছু হয়েও যায়, এই আমি আছি তোমার মেয়েদের দেখাশোনার জন্য।'

টাকার লোভে আবু আযযা উহুদের যুদ্ধে অংশ নিতে রাজি হলো। আর বন্দীও হলো। এবারেও আবু আযযা পুরোনো অজুহাত খাড়া করে ছাড়া পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলবে, তুমি মুহাম্মাদকে

দুইবার ধোঁকা দিয়েছো -- সেটা আমি হতে দেবো না। মুসলিম এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।' তিনি আবু আযযাকে হত্যার আদেশ দেন।

মুসলিমদের অতি সরলমনা হলে চলবে না। কেউ যেন বোকা বানাতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সহানুভূতিশীলতা এবং সতর্কতা-এ দুয়ের মাঝে হতে হবে আমাদের অবস্থান। সবকিছুকে অতি সরল মনে গ্রহণ করা বা মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলা যেমন এক ধরনের চরমপন্থা, তেমনি সারাক্ষণ চরম নৈরাশ্যবাদে নিমজ্জিত থাকা, সবকিছুর মাঝে মন্দের আভাস খুঁজে পাওয়া আরেক ধরনের চরমপন্থা। উল্লেখিত দ্বিতীয় ধরনের চরমপন্থা একজন মানুষকে অন্যের প্রতি সদয় হতে নিরুৎসাহিত করে তোলে। তাই মুসলিমরা এ দুয়ের মাঝে এমন এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে যা হবে বাস্তবধর্মী।

'শেষ ভালো যার, সব ভালো তার'

মানুষের জীবনের শেষ মুহূর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। সেই সময়টিই বলে দেয় তাদের আখিরাত কেমন হবে। উহুদের যুদ্ধে এমন কিছু মানুষ পাওয়া যায়, যাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত তাদের জীবনের গতিপথকে অদ্ভুতভাবে বদলে দেয়। এমন একজন হলো কাযমান।

১) কাযমান

তার নাম কাযমান অথবা কুযমান। ছিল মদীনার সাধারণ এক বাসিন্দা, ইসলাম নিয়ে তার তেমন কোনো উৎসাহ নেই। উহুদের যুদ্ধে সে প্রথমে অংশ নেয়নি। কিন্তু তার গোত্রের মহিলারা তার কাপুরুষত্ব নিয়ে তাকে খোঁচা দিলে সে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিংহের মতো যুদ্ধ করে সাত-সাত জন মুশরিককে হত্যা করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে তার নাম উচ্চারণ করা হলেই তিনি বলতেন, 'এই লোকটা জাহান্নামী।'

সাহাবিরা অবাক হলেন, কাযমান কীভাবে জাহান্নামী হতে পারে! সে তো মুসলিমদের পক্ষে বীরের মতো লড়ছে! কিন্তু যুদ্ধের এক পর্যায়ে সে আহত হয়। শরীরে আঘাতের যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। সবাই তাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দেয়, অভিনন্দন জানাতে থাকে। কাযমান তখন বললো, 'তোমরা আমাকে কেন অভিনন্দন জানাচ্ছো? আমি তো ইসলামের জন্য লড়াই করিনি, আমি আমার গোত্রের জন্য যুদ্ধ করেছি।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'এই লোকটা জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বদ লোকদের দ্বারাও তার দ্বীনের কাজ করিয়ে নেন।' কাযমান 'জিহাদ' করেছিল সত্যি, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সে জিহাদ করেনি। সে জিহাদ করেছে তার জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে। এ কারণে তার স্থান ছিল জাহান্নাম। কাজেই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করাটাই সব নয়। বরং যুদ্ধ হতে হবে সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসের জন্য।

২) মুখাইরিক ﷺ

মদীনা সনদ অনুসারে উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করা ইহুদিদের দায়িত্ব ছিল। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে কোনো সাহায্য চাননি। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে এগিয়ে এল এক ইহুদি, নাম তার মুখাইরিক। সে তার লোকদেরকে ডেকে বললো, 'ইহুদিরা শোনো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব।' তারা বললো, 'আজকে তো শনিবার, আজকে আবার কীসের যুদ্ধ?' মুসলিমদের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ইহুদিদের গড়িমসি দেখে মুখাইরিক রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের জীবনে যেন আর কোনোদিন শনিবার না আসে। শোনো, আমি একাই যুদ্ধে যাচ্ছি। যদি আমি মারা যাই, তাহলে আমার সব সম্পদের মালিক মুহাম্মাদ। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা খরচ করবেন।'

এই বলে সে বেরিয়ে পড়লো। যুদ্ধে সে শহীদ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে বললেন, 'মুখাইরিক -- খাইরাল ইয়াহুদ', অর্থাৎ 'মুখাইরিক হলো ইহুদিদের মধ্যে সেরা।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তার রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়াকফ হিসেবে নির্ধারিত করলেন। সেটিই ছিল মদীনার প্রথম ওয়াকফ।

মুখাইরিক মুসলিম ছিল নাকি অমুসলিম ছিল, তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বেশিরভাগ উলামার মতে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাঁদের মতে, 'মুখাইরিক হলো ইহুদিদের মধ্যে সেরা', এই কথা দিয়ে আল্লাহর রাসূল জাতীয়তা বুঝিয়েছেন, দ্বীন বা ধর্ম বোঝাননি।

৩) উসাইরিম ﷺ

আওস গোত্রের এক লোক ছিল উসাইরিম। সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করেনি, তার গোত্রের লোকদেরও ইসলাম গ্রহণ করতে দেয়নি। সে ছিল মুশরিক। একদিন মদীনায় এসে বিভিন্ন লোকের খোঁজ করতে শুরু করছে, কিন্তু কেউই মদীনায় নেই!

- অমুক কোথায়?

- উহুদে!

- তমুক কোথায়?

- সেও উহুদের ময়দানে!

উসাইরিম যার কথাই জানতে চায়, প্রত্যেকেই উহুদে! উসাইরিম বললো, 'যদি এরা সবাই উহুদে যুদ্ধ করে, তাহলে আমিও তাদের সাথে যোগ দেবো।' এই বলে সে তরবারি, বর্শা আর যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা দিল। পৌঁছে গেল উহুদের প্রান্তরে। মুসলিমরা তাকে দেখে অবাক! 'তুমি এখানে? চলে যাও তুমি!' উসাইরিম জবাব দিল, 'না, আমি ঈমান এনেছি।' এই বলে উসাইরিম ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে মুশরিকদের হাতে বেশ কয়েকস্থানে আহত হলেন।

যুদ্ধ তখন শেষ, ক্লান্ত উসাইরিম মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। মারা যাবার কিছুক্ষণ আগে, তার কিছু আত্মীয় তাকে দেখে খুব অবাক হলো । তারা বলাবলি করতে থাকলো, 'আরে উসাইরিম এখানে! সে তো কাফির ছিল বলেই জানতাম। সে এখানে কী করছে?' তারা উসাইরিমকে জিজ্ঞেস করলো,

- উসাইরিম, তুমি এখানে কীভাবে এলে? ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় নাকি স্বজাতির শক্তি বৃদ্ধিতে?

- আমি ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় এসেছি। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি ঈমান এনেছি। রাসূলুল্লাহর ﷺ সমর্থনে যুদ্ধ করবো বলে হাতে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আমার অবস্থা তো তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছো।

এই বলে উসাইরিম মৃত্যুবরণ করলেন। উসাইরিম পরবর্তীতে বেশ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় না করেই জান্নাতে চলে গেছেন! এই বিষয়টা নিয়ে আবু হুরায়রা ﷺ সাহাবিদের কুইজ জিজ্ঞেস করতেন। উসাইরিম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চমৎকার কথা বলেছেন, 'তার আমল ছিল অল্প, কিন্তু যে পুরস্কার সে কামিয়ে নিয়েছে তা অসামান্য।' শাহাদাহ বা আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া হলো এমন একটি কাজ যা মানুষকে জান্নাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। বাদ বাকি সব আমল ছাড়াই মাত্র এই একটি আমলের মাধ্যমে সে জান্নাতে সবচেয়ে উঁচু অবস্থানে চলে যেতে পারবে। উসাইরিম নামাজ পড়েনি, রোজা রাখেনি, কিছুই করেনি। সে শুধু ঈমান এনেছে আর তারপরেই আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে গেছে, তাই সে জান্নাতে যাবে।

উহুদের যুদ্ধে মু'জিযা

১. কাতাদাহ ইবন আন-নুমানের চোখ

বদরের যুদ্ধের অলৌকিক ঘটনাবলির মধ্যে এই কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উহুদের যুদ্ধের ব্যাপারেও এই কাহিনীটি বলা হয়ে থাকে। কারণ আলিমদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই ঘটনা বদরের যুদ্ধে ঘটেছে নাকি উহুদের যুদ্ধে।

২. উবাই ইবন খালাফ

কুরাইশদেরদের এই নেতা মাক্কী জীবনে নবীজিকে হুমকি দিত, 'এই যে মুহাম্মাদ, দেখো, দেখো! আমি এই ঘোড়াকে দিনে বারো মুঠো শস্য খাওয়াই। এর পিঠে চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো।' নবীজি তখন জবাব দিতেন, 'না, বরং আমিই তোকে হত্যা করবো!'

উহুদের দিনে উবাই ইবন খালাফ ঘোড়ার পিঠে চড়ে নবীজির পেছনে ধাওয়া করতে লাগলো। সাহাবিরা এগিয়ে গেলেন তাকে প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু নবীজি তাদের

থামিয়ে দিলেন। একটি বর্শা হাতে নিয়ে সেটা ঝাঁকাতে শুরু করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবন খালাফের দিকে বর্শা তাক করে ছুঁড়ে মারলেন। উবাই ইবন খালাফের সমস্ত দেহ ছিল বর্মে ঢাকা। একটা বর্শায় তাকে আক্রমণ করা অসম্ভব! কিন্তু নবীজির বর্শা আঘাত করলো ঠিক তার বর্ম আর মাথার হেলমেটের মাঝখানে একটা ছোট্ট ফাঁকে।

সেই লোহার বর্মের ফাঁক গলে বর্শা খুব একটা ভেতরেও ঢুকতে পারেনি। কিন্তু উবাই ইবন খালাফ এতটুকু আঘাতেই ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। উন্মাদের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে তার লোকেদের কাছে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। তারা বললো, 'তোমার হয়েছেটা কী?' সে বললো, 'মুহাম্মাদ আমাকে মেরে ফেলেছে!' তারা তার বর্ম খুললো কিন্তু গলার কাছে কোনো আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পেল না। এরপর বললো, 'তোমার তো কিছুই হয়নি। এত ভয় পাচ্ছো কেন?' সে বললো, 'মুহাম্মাদ বলেছে সে আমাকে হত্যা করবে! সে যদি কিচ্ছু না করে শুধু আমার দিকে থুথু ছিটায়, তবুও আমি মারা যাব!' পরবর্তীতে যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মক্কার কাছে সারাফ নামক স্থানে সে সত্যি সত্যি মারা যায় । রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে মাত্র একজন লোককেই হত্যা করেছেন। সে হলো উবাই ইবন খালাফ।

সীরাহ্ থেকে একটি বিষয় বার বার প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিটা কথায় এমনকি শত্রুরাও বিশ্বাস করতো! কুরাইশ কাফিররা অক্ষরে অক্ষরে রাসূলুল্লাহ কথা বিশ্বাস করতো। কিন্তু ঔদ্ধত্য আর অহংকারের কারণে তাঁকে নবী বলে মেনে নেয়নি। যেমন, এই ঘটনায় উবাই সামান্য একটু আঁচড় খেয়েই এত ভয় পেয়ে যায় যে, তার কাছে মনে হয় সে মারা গেছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বহু আগে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিলেন। আর সেই হুমকি সত্য হওয়ার এই ঘটনা একটি মু'জিযাও বটে।

উবাই ইবন খালাফকে যেখানে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ এক রাতে হাঁটছিলেন। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে আমি আগুনের হলকা দেখতে পেলাম। এরপর দেখলাম একটা লোককে শিকল বেঁধে টেনে-হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর সে কেবলই পানি খেতে চাচ্ছে। আর তাকে বলা হচ্ছে, 'এই লোককে পানি দিও না, এ হলো সেই লোক যাকে রাসূলুল্লাহ হত্যা করেছে।'[20] আবদুল্লাহ ইবন উমার আসলে উবাই ইবন খালাফের শাস্তি দেখতে পাচ্ছিলেন। অনেক সময় কিছু মানুষ কাফিরদের প্রতি আল্লাহর আযাব, কিংবা মুসলিমদের আনন্দ ও পুরস্কার প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এটা স্বপ্নেও হতে পারে অথবা সামনা-সামনিও হতে পারে। যেমন হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবন উমারের ক্ষেত্রে, তিনি সরাসরি শাস্তি দেখতে পাচ্ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু মানুষকে গায়েবের বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হয়।

---

[20] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭।

উহুদের যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা

উম্মাহর জীবন থেকে জিহাদ অনুপস্থিত হয়ে পড়ায় মুসলিম নারীদের ভূমিকা অনেকাংশেই শুধুমাত্র পারিবারিক কাজে সীমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রথম যুগে বিষয়টা এমন ছিল না। সে সময়ে মুসলিম নারীরা জিহাদেও ভূমিকা রাখতেন। এ প্রসঙ্গে উহুদের যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা নিয়ে না জানলেই নয়। মুসলিম ভাইদের জন্য যেমন আদর্শ প্রয়োজন, তেমনি মুসলিম বোনেরাও যেন আদর্শ হিসেবে সাহাবিয়াতদের অনুসরণ করতে পারেন সে জন্য এই আলোচনা জরুরি। বর্তমান যুগে মুসলিম নারী এবং পুরুষ উভয়েই এমনভাবে জীবন যাপন করছে যার সাথে সাহাবিদের জীবনযাত্রার কোনো মিল-ই নেই। অথচ এই সাহাবিরাই ইসলামকে সবচেয়ে সঠিকভাবে বুঝতেন। কাজেই আমরা যদি ইসলামের অনুসরণ করতে চাই, আমাদের সাহাবিদের দিকে তাকাতে হবে। দেখতে হবে তারা কী করেছেন, কী করেননি। উহুদের যুদ্ধে মুসলিম নারীরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেননি, কিন্তু যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

১) যোদ্ধাদের পানি সরবরাহ ও চিকিৎসা

উহুদের যুদ্ধে পানি সরবরাহ ও চিকিৎসার কাজে মুসলিম নারীরা সরাসরি অংশ নেন। আনাস ইবন মালিকের ভাষায়, 'সেদিন আমি দেখতে পেলাম আইশা বিনত আবু বকর আর উম্ম সুলাইম তাদের কাপড় গুটিয়ে কাজ করছেন। তাদের গোড়ালি দেখা যাচ্ছিল (এটা হিজাবের বিধান আসার আগের কথা)। তাঁরা নিজেদের কাঁধে পানির বালতি নিয়ে এক এক করে মুজাহিদ ভাইদের কাছে যাচ্ছেন আর তাদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছেন। বালতির পানি শেষ হয়ে গেলে তাঁরা ফিরে গিয়ে আবার বালতি ভরে আনছেন আর মুসলিম সৈন্যদের পানি সরবরাহ করছেন।'[21] হামনাহ বিনতে আবি জাহশ এবং উম্ম আইমানও এই কাজে অংশ নিয়েছিলেন।

এখানে দেখার মতো বিষয় হলো, সাহাবিদের জন্য জিহাদ কোনো ব্যক্তিগত কাজ ছিল না। এটা ছিল একটি পারিবারিক ও সামাজিক প্রচেষ্টা। নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ সবাই জিহাদে নিজ নিজ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। মুসলিমদের আমীর রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী হয়েও তারা মুসলিম সৈন্যদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন।

আনাস ইবন মালিক বলেন, 'যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধের জন্য বের হতেন, তিনি তাঁর সাথে উম্মে সালীম আর আনসারী কিছু নারীদেরকে নিয়ে যেতেন, যাতে তাঁরা মুসলিম সৈনিকদের পানি খাওয়াতে পারেন আর আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন।' আর-রুবায়া বিনত মু'আউইয ﷺ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথেই থাকতাম, যোদ্ধাদের পানি পান করাতাম, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতাম। আহত আর নিহত সৈনিকদের মদীনায় নিয়ে আসতাম।'

---

[21] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৯৫।

উমার ইবন খাত্তাবের খিলাফতকালের কথা। তিনি একবার মদীনার মহিলাদের জন্য কিছু উলের কাপড় বিতরণ করছেন। সবাইকে দেওয়ার পরও এক সেট কাপড় বাকি রয়ে গেল। কাপড়টি ছিল বেশ উন্নত মানের। কেউ একজন বললো, 'আমীরুল মুমীনিন, এই কাপড়টি আপনি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কন্যাকে দিয়ে দিন।' তারা আসলে আলীর ﷺ কন্যা উম্মে কুলসুমের কথা বলছিল। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ নাতনি আর উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ স্ত্রী। উমার ইবন খাত্তাব বললেন, 'না! আনসারি সাহাবি উম্মে সালিত ﷺ এই কাপড়ের বেশি হকদার। কারণ উহুদের যুদ্ধে তিনি ছোটাছুটি করে আমাদেরকে পানি এনে দিচ্ছিলেন।' উহুদের যুদ্ধের বহু বছর পরেও উমার ﷺ এই আনসারী নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উহুদের মতো গুরুত্ববহ সময়ে এই সাহাবিয়াতের ভূমিকা অবশ্যই স্বীকৃতি পাবার মতো একটি বিষয়। আর এই সাহাবিদের অপরিসীম ত্যাগের জন্যই তাদেরকে আল্লাহ 'আনসার' অর্থাৎ দ্বীনের সাহায্যকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

নবীজির কন্যা ফাতিমাও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবীজি যখন রক্তাক্ত, ফাতিমা ﷺ নবীজির মুখের রক্ত ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যখন পানির কারণে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য খেজুর গাছের বাকল নিয়ে সেটা আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই আল্লাহ রাসূলের ক্ষতের ওপর চেপে ধরেন।

২) সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ

উহুদে একজন নারীই সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন, নুসাইবাহ বিনত কা'ব আল মাযিনিয়্যাহ ﷺ। শক্তিশালী এই নারী উহুদের যুদ্ধে ছাড়াও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আবু বকরের ﷺ খিলাফতকালে ভ্রান্ত নবী মুসাইলামা আল-কাযযাবের বাহিনীর বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর নাতনি তাকে গোসল করিয়ে দেয়। সে বলে, 'আমি নানীর শরীরে ১৩টি ক্ষত দেখেছি, সবচেয়ে গভীর ক্ষতটি ছিল উনার কাঁধে। সেখানে ইবন কামিয়ার তরবারির আঘাত লেগেছিল। ইবন কামিয়া যখন উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহকে ﷺ আক্রমণ করে, তখন নুসাইবাহ নবীজিকে রক্ষা করতে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান। ইবন কামিয়া তখন তাকে আঘাত করে।'

ইবনে কামিয়ার এই তরবারির আঘাত এত ভয়ানক ছিল যে, এক বছর পর্যন্ত নুসাইবাহর ﷺ কাঁধে ব্যথা থাকে। অন্যান্য যুদ্ধের সময়েও তিনি আহত হয়েছেন। ভণ্ড নবী-দাবিদার মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তিনি মারাত্মক আহত হন। জখম সারানোর জন্য তাঁর ক্ষতস্থানে গরম তেল ঢালা হয়। সে যুগে জখম সারাবার পদ্ধতি ছিল জখমের ব্যথার চাইতেও কষ্টকর। এত ব্যথা, এত কষ্টকর জখমও তাকে যুদ্ধে অংশ নেওয়া থেকে থামিয়ে রাখতে পারেনি।

উহুদের যুদ্ধের পরদিন যখন নবীজি ﷺ শত্রুদের ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে হামরা আল আসাদে যেতে চাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে নুসাইবাহ বিনত কা'বও সেখানে যেতে চাইলেন।

কিন্তু উঠে দাঁড়ানো মাত্র তিনি ধপ করে পড়ে গেলেন। জখমের কারণে আর চলতে পারছিলেন না। উহুদে মারাত্মকভাবে আহত হবার পরেও তাঁর উদ্যম বিন্দুমাত্র কমেনি। জিহাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল এতটাই প্রবল।

আল্লাহর রাসূলকে বাঁচাতে সাহাবিরা নির্দ্বিধায় শত্রুর তরবারির মুখে দাঁড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষটাই ছিলেন এমন যার জন্য হাসতে হাসতে জান দিয়ে দেওয়া যায়। হামরা আল আসাদ থেকে ফিরে আসার পর এত উদ্বেগ, ব্যস্ততা, ক্লান্তির মধ্যেও নবীজি ﷺ কারো কথা ভুলেননি। লোক পাঠিয়ে নুসাইবার খোঁজ নিলেন। সে নবীজিকে ﷺ জানালো, 'এখন তাঁর শরীরের অবস্থা আগের থেকে কিছুটা ভালো।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ওঠেন। এ আনন্দ কোনো লোক-দেখানো অভিনয় ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন বাবার মতোই সাহাবিদের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন। তাদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাদের কাছাকাছি থাকতেন, সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ রাখতেন। তাঁর মনে সবসময় সাহাবিদের চিন্তা লেগেই থাকতো।

সাহাবিয়াতদের অপরিসীম ধৈর্য

সাফিয়া বিনত আল-মুত্তালিব ﷺ

সাফিয়া ﷺ ছিলেন হামযার ﷺ বোন। হামযার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি ভাইয়ের মৃতদেহ শেষবারের মতো দেখতে চান। ওদিকে হামযার মৃতদেহ খুব বাজেভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। তাই তাঁর ছেলে আয-যুবাইর ইবন আওয়্যাম তাকে থামাতে চাইলেন। তিনি থামলেন না। বলে উঠলেন, 'তুমি আমাকে কেন আটকাচ্ছো? আমার ভাইকে কীভাবে বিকৃত করা হয়েছে সে কথা আমি শুনেছি। তাঁর সাথে যেটাই হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়েই হয়েছে। আর এটাই আমার জন্য সান্ত্বনা হিসেবে যথেষ্ট। চিন্তা কোরো না, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো আর শান্ত থাকবো, ইনশাআল্লাহ।'

হামযার ﷺ শরীর খুব খারাপভাবে বিকৃত করা হয়। শত্রুরা তাঁর নাক, কান, গোপনাঙ্গ কেটে ফেলে। তাঁর পেট আর বুক চিরে খুলে ফেলে। কিন্তু সাফিয়া ﷺ তারপরেও তাকে দেখার জন্য জোরাজুরি করতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাওয়ার অনুমতি দেন। সাফিয়া ﷺ ময়দানে যান, হামযার বিকৃত মৃতদেহর কাছে দাঁড়ান। 'ভাইয়ের মৃতদেহর দিকে তাকিয়ে তাঁর জন্য দুআ করেন। আল্লাহর কাছে হামযার ﷺ জন্য ক্ষমা চান। তারপর বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন - আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি, আর তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।' না, তিনি ভেঙে পড়েননি, কোনো বিলাপ করেননি। আপন ভাইয়ের এই মর্মান্তিক চিত্র দেখেও এতটুকু ধৈর্য হারাননি। তিনি ছিলেন আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট।

হামনাহ বিনত জাহশ ﷺ

হামনাহ বিনত জাহশ হলেন আবদুল্লাহ ইবন জাহশের বোন। উহুদের যুদ্ধে হামনা তাঁর স্বামী, চাচা আর ভাইকে হারান। একই দিনে জীবনের সবচাইতে আপন তিনজন মানুষকে হারিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

- ধৈর্য ধরো, আল্লাহর পুরস্কারের আশায় সন্তুষ্ট হও।

- কে মারা গেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ? হামনা বুঝতে পারলেন তার কোনো আপনজন মারা গেছে।

- তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবন জাহশ মারা গেছে হামনাহ।

- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, হামনা তার ভাইয়ের জন্য দুআ করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার তাকে বললেন,

- ধৈর্য ধরো আর আল্লাহর পুরস্কারের আশায় সন্তুষ্ট হও।

- আর কেউ কি মারা গেছে আল্লাহর রাসূল? হামনাহ জানতে চাইলেন।

- হ্যাঁ, তোমার চাচা, হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব।

- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তাঁর শাহাদাহ কবুল করে নিন!

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার তাকে বললেন,

- ধৈর্য ধরো আর আল্লাহর পুরস্কারের আশায় সন্তুষ্ট হও।

- আমার আর কে মারা গেছে রাসূলুল্লাহ? হামনা বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই তার আপন আরও কেউ মারা গেছে।

- তোমার স্বামী, মুসআব ইবন উমাইর।

হামনা চিৎকার করে ওঠেন। ভাই আর চাচার মৃত্যু সংবাদ তাকে টলাতে পারেনি, কিন্তু এরপর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। এ দৃশ্য নবীজি ﷺ দেখে বলেন, 'নারীর কাছে তার স্বামী খুবই বিশেষ একজন।' স্ত্রীর কাছে স্বামী সবচেয়ে আপনজন। তাই হামরা বিনত জাহশ নিজের বাবা ও ভাইয়ের মৃত্যুতে নিজেকে শান্ত রাখতে পারলেও, স্বামীর কথা শুনে ভেঙে পড়েন। হঠাৎ কেঁদে ওঠার ব্যাপারে পরে তিনি বলেন, 'আমার সন্তানদের কথা মনে পড়ে গেল। বাবাকে ছাড়া যে তারা এতিম হয়ে গেল।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

বনু দীনারের এক নারী ﷺ

উহুদের যুদ্ধের সময় বনু দীনার গোত্রের এক নারীর বাবা-ভাই আর স্বামী তিনজনেই শহীদ হয়ে যান। যখন তার কাছে খবর আসলো, যুদ্ধে তোমার বাবা, ভাই এবং স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে, শান্তস্বরে তিনি কেবল একটাই প্রশ্ন করলেন,

- রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন আছেন?

- উনি ঠিক আছেন। তুমি তাকে যেমন দেখতে চাও, তেমনি আছেন।

- কোথায় আছেন তিনি? আমাকে দেখাও, আমি তাকে দেখতে চাই!

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখে বনু দীনারের সেই মুসলিমাহ খুশিতে বলে ওঠেন, 'আপনি থাকলে বাকি সব কিছু হারানোর বেদনাই তুচ্ছ!'

আমরা সবাই মুখে মুখে বলি, আমরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসি, তাঁর জন্য জীবন দিতে চাই। আমরা ইসলামের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিতে চাই। কিন্তু এই ভালোবাসা হলো তাত্ত্বিক ভালোবাসা। যদি না আমরা এটা বুঝতে পারি যে, সাহাবিরা কীভাবে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসতেন, তাহলে এই ভালোবাসা নিছক মুখের কথাই রয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ এই সাহাবিয়াত তার স্বামী, বাবা, ভাইকে হারানোর কথা শুনেও কোনো ভ্রূক্ষেপ করেননি। শুধু জানতে চেয়েছেন একটি জিনিস, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন আছেন? তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ এক ঝলক দেখলেন। তাতেই তার চোখ জুড়িয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, 'যদি আপনি থাকেন, তবে তো সব বেদনাই তুচ্ছ।'

এটাই হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি আল্লাহর বান্দাদের ভালোবাসা!

উহুদের শিক্ষা

> "নিশ্চয়ই তোমাদের আগে বহু জাতি গত হয়ে গেছে। অতএব পৃথিবীতে ভ্রমণ করো ও দেখো কেমন হয়েছিল মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম। এই (কুরআন) হচ্ছে মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং যারা ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৩৭-১৩৮)

উহুদের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য পরাজয়। কেউ কেউ মনে করেন, উহুদ ছিল 'ড্র ম্যাচ', কারণ কুরাইশরা অনেক মুসলিমকে হত্যা করতে পারলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মদীনা দখল করা, যেটা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু শাইখ ইবনুল কায়্যিম বলছেন, না, উহুদ ছিল মুসলিমদের জন্য বিজয়। এর কারণ হলো উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত অনন্য সব শিক্ষা। এই শিক্ষাগুলো অনুধাবন করতে না পারলে সীরাহ অধ্যয়নই বৃথা। এমনই কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

মুসলিমদের চিরশ্রেষ্ঠত্ব

> “আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু’মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৩৯)

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হবার পর, উপরের এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিমদেরকে এটাই বলছেন যে, তোমরা যদি আসলেই মু’মিন হয়ে থাকো, তাহলে বিজয় তোমাদেরই হবে।

> “তোমরা মানবগোষ্ঠীর জন্য এক শ্রেষ্ঠ সমাজরূপে উত্থিত হয়েছো।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১১০)

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বদরের যুদ্ধে যখন মুসলিমরা বিস্ময়করভাবে জিতে গেল, কিংবা মুসলিমরা যখন পুরো মক্কা বিজয় করে নিল, কিংবা যখন পৃথিবীর বুকের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে ইসলামী রাষ্ট্র আধিপত্য বিস্তার করছে; তখন কিন্তু আয়াতটি নাযিল হয়নি। আয়াতটি এল উহুদ যুদ্ধের ঠিক পরে, যখন মুসলিমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এখান থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, মুসলিমরা দুর্বল হোক, অত্যাচারিত হোক, পরাজিত হোক -- তবুও তারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এটাই মুসলিমদের প্রকৃত পরিচয়, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

কষ্ট হলেও লড়তে হবে

> “তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে...” (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪০)

উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলিমরা পরাজিত হলো, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনোবল তখন ভেঙে গেল, আশাভঙ্গ হলো। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমাদের সাথে উহুদের যুদ্ধে যা হয়েছে, কুরাইশদের সাথে বদরের সময় ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। তোমরা এখন জখমের কষ্ট ভোগ করছো, তারাও তখন জখমের কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু এক বছর আগের বদরের পরাজয় তাদের আবার যুদ্ধ করা থেকে থামিয়ে রাখেনি। তারা আবারও প্রস্তুত হয়ে মাঠে নেমেছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, উহুদের পরাজয় যেন মুসলিমদেরকে তাদের লড়াই থেকে বিরত না রাখে। তারা যেন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তারা যেন আশা হারিয়ে না ফেলে, উদ্যম ও উদ্দীপনা ধরে রাখে। হয়ত কিছু মুসলিম মারা গেছে, তাতে ধৈর্য হারানোর কিছু নেই, পরাজয়ের মুখেও অটল-অবিচল থাকতে হবে।

যুদ্ধে জয় ও পরাজয় দুটোই দরকার, তবে চূড়ান্ত বিজয় মুসলিমদের

> “... আর (জয় ও পরাজয়ের) এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি...” (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪০)

একদিন কুরাইশরা জিতলো, আর একদিন মুসলিমরা জিতলো, এটাই দুনিয়ার নিয়ম। ইবনুল কায়্যিম বলেন, 'আল্লাহ তাআলার অপরিসীম প্রজ্ঞা এবং তাঁর সুন্নাহ হলো, আল্লাহর নবী ও তাদের অনুসারীরা কখনো জিতবে, কখনো হারবে। তবে পরিশেষে তারাই বিজয়ী হবে। যদি মু'মিনরা সবসময় বিজয়ী হতো, তাহলে মু'মিন-মুনাফিক্ব সবাই তাদের দলে ভিড়তো। তখন কে প্রকৃত ঈমানদার তা বোঝা যেত না।' দেখা যেত মানুষ দুনিয়াবি কারণে বা জেতার আশায় মুসলিমদের দলে যোগদান করছে। তাই জয়-পরাজয় দুটোই দরকার।

ইবনুল কায়্যিম আরও বলেন, 'আর যদি মুসলিমরা সবসময় পরাজিত হতে থাকে, তাহলে নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণ হবে না।' দুনিয়াতে নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে প্রচার করা, পুরো পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। যদি মুসলিমরা সবসময় হেরে যায় তাহলে এই দ্বীনের যাত্রা স্তিমিত হয়ে যাবে। তাই মুসলিমরা সবসময় জিতবে কিংবা সবসময় হারবে -- এর কোনোটাই যথাযথ নয়। তাই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল হার জিতের মাধ্যমে দিনবদল করে যাচাই করেন কে মু'মিন আর কে মুনাফিক্ব। পরাজয় মুনাফিক্বদের চেহারা প্রকাশ করে দিবে আর বিজয় আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। তবে যতই সময় লাগুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মু'মিনরাই বিজয়ী হবে।

> "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"

ঈমানের মাপকাঠি

> "...আর এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪০)

ঈমান পরীক্ষা করার সবচাইতে উৎকৃষ্ট উপায় হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এই পরীক্ষা দিতে গেলেই মানুষের ঈমানের খেদগুলো স্পষ্ট হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন যখন আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে বলা হয়, তখনই বোঝা যায় দ্বীনের জন্য কার কতটা ভালোবাসা। তাই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল এভাবে পরীক্ষা নিয়ে মু'মিনদেরকে মুনাফিক্বদের দল থেকে আলাদা করে ফেলতে চান।

জিহাদ হলো উচ্চ মর্যাদা লাভ করার একটি সুযোগ

> "...এবং তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪০)

ইবনুল কায়্যিম বলেন, 'শাহাদাত হলো আল্লাহর নজরে সবচাইতে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানের একটি। শহীদেরা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। শত্রুদের হাতে নিহত না হলে কীভাবে মুসলিমরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে?' শাহাদাত হলো বান্দার জীবনে

সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা। আর সেটা একমাত্র একভাবেই সম্ভব যখন সে আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রুদের হাতে নিহত হবে। উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের পেছনে এটাও একটি হিকমত। এই পরাজয় তো ছিল আল্লাহর বাহানা মাত্র। এর মাধ্যমে তিনি ৭০ জন বান্দাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন।

জিহাদ হলো একটি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া

"আর এই কারণে যেন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পবিত্র করতে পারেন..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪১)

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিমের খুব চমকপ্রদ কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁর কিছু কিছু বান্দাকে এত ভালোবাসেন যে, তাদেরকে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে স্থাপন করতে চান। কিন্তু দেখা যায়, জান্নাতের উঁচু স্থানে যাওয়ার জন্য সেই বান্দার যথেষ্ট পরিমাণ আমল নেই। তাহলে এই ব্যক্তি কীভাবে সেই উঁচু মর্যাদা হাসিল করবে? এটা সম্ভব হয় যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পৃথিবীতে সেই বান্দার ওপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত করেন; আর এইসব দুঃখ-কষ্ট পার করার মধ্য দিয়ে তার গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়, জান্নাতে তার মর্যাদা বেড়ে যায়।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল সাহাবিদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি তাদের জন্য জান্নাতে যে উঁচু স্থান রেখেছিলেন, তাদের আমল সেই স্থানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে উহুদের যুদ্ধের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-শোক আর জখমের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন। তাদেরকে সহ্য করতে হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু সংবাদের মতো ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক একটা সংবাদ। যদিও পরে জানা যায় যে তা একটি গুজব ছিল। তাদেরকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হলো। এত কষ্টের বিনিময়ে আসলে তাদের সওয়াবের পাল্লাটাই ভারী হচ্ছিল। কষ্ট হলে গুনাহ কাটা যায়, তাই কষ্টের সময়টা খারাপ লাগলেও আখিরাতের জন্য তা কল্যাণকর। ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, 'এটি হলো একটি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া।'

কাফিরদের খারাপের পাল্লা ভারী হতে দেওয়া

"...এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেন..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪১)

আল্লাহ তাআলা কিছু কাফিরদের এত ঘৃণা করেন যে, তিনি তাদের জন্য জাহান্নামে স্থান নির্ধারিত করে রাখেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে তাদের আমল দিয়েই ধ্বংস করেন। সুতরাং, কাফিরদের হাতে মুসলিমদের পরাজয় এবং তাদের কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে সেই কাফিরদের ধ্বংস নিশ্চিত করা হয়। কাফিরদের মধ্যে ইবন কামিয়া আর উতবা ইবন আবি ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহকে ﷺ আঘাত করেছিল। এটা কি আসলে তাদের জন্য কোনো সাফল্য? রাসূলুল্লাহকে আক্রমণ করতে পারা কি সত্যিই কোনো খুশির বিষয়? সত্যি বলতে, এটা ছিল তাদের জীবনে করা নিকৃষ্টতম অপরাধ।

আর এই একটা কাজের কারণে তারা আজীবনের জন্য জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাবে।

আমরা অনেক সময় দেখি, কোনো কোনো কাফির জাতি অত্যন্ত দুঃসাহস দেখাচ্ছে, কোনোকিছু তোয়াক্কা করছে না। মুসলিমদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করছে। যখন খুশি বোমা মেরে, গুলি করে হত্যা করছে, ইচ্ছেমতো বন্দী করে নির্যাতন করছে, হেনস্থা ও লাঞ্ছিত করছে, কারাগারে বিনা বিচারে আটকে রাখছে বছরের পর বছর। তাদের এই কাজগুলো কি তাদের জন্য কোনো সুখবর বয়ে আনবে? না, কখনোই না। বরং তাদের এই কাজ থেকেই প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ। আর সে কারণেই তিনি তাদেরকে এই দুনিয়াতে স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে করে তারা নিজের হাতেই জাহান্নামের আগুন কিনে নিতে পারে।

ফিরআউন আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সে বছরের পর বছর ধরে বনী ইসরাঈলের জনসাধারণকে অত্যাচারে জর্জরিত করে এসেছে। এই কাজের পরিণতি কি ভালো কিছু ছিল? তার শেষ প্রাপ্তি কী ছিল? আসলে আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন তার বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করতে, প্রমাণ দাঁড়া করাতে, আর তাই তাকে এসবের সুযোগ দিয়েছেন। এই মামলার নিষ্পত্তি হবে আখিরাতে, সেদিন সে জাহান্নাম থেকে কোনোক্রমেই নিষ্কৃতি পাবে না। আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরের ভেতরে কী আছে, সে সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু তিনি মানুষের কাজের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করে দেন, যেন শেষ বিচারের দিনে তারা নিজেদেরকে স্বপক্ষে কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে।

অনেকে ভাবে, খারাপ লোকদের জন্যই তো জীবনটা আনন্দের! চুরি-বাটপারি-বদমাইশি করেই তারা বেশি ভালো আছে। সত্যি বলতে, দুনিয়াতে যারা স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম আর দুর্নীতির ওপর টিকে আছে, বছরের পর বছর খারাপ কাজ করার পরেও যাদের কোনো শাস্তি হচ্ছে না, আসলে তাদেরকে আল্লাহ আখিরাতের কঠোর শাস্তির জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। ইবলিসকেও আল্লাহ একইভাবে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীতে সে কত খারাপ কাজই না করছে প্রতিদিন! এসব জালিমের বিচার একদিন নিশ্চয়ই হবে। ফয়সালা হবে আখিরাতে।

জান্নাতের জন্য কষ্ট করা চাই

> "তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল?" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪২)

জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। জিহাদ না করেই জান্নাতে চলে যাবার আশা করা যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে মুসলিমদের বলছেন, জান্নাতের

পথে অনেকগুলো ধাপ আছে। আর মুসলিমদেরকে একে একে প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহর পথে জিহাদ না করেই কেউ নিজেকে জান্নাতের দাবিদার বলতে পারে না। জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর পথে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। ইসলাম কোনো আধ্যাত্মিক ধর্ম নয়, যেখানে কেবল কিছু ধার্মিক আচার-প্রথা পালনের মধ্য দিয়েই আমরা জাদুবলে জান্নাতে পৌঁছে যাবো। ইসলামের অনুসারীদেরকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পরীক্ষা করবেন। জান্নাত বিনামূল্যে অথবা অল্প শ্রমে লাভ করার জিনিস নয়। জান্নাতের জন্য কষ্ট করা চাই। মানুষের আমল জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি আল্লাহর দয়া ছাড়া নবীজি ﷺ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবেন না। আল্লাহর রহমত ও দয়ার কারণেই একজন মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে, কিন্তু তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আন্তরিক চেষ্টাই আল্লাহর রহমত ও দয়ার দরজা খুলতে পারে।

বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা অবিশ্বাস্য রকমের বিজয় অর্জন করে। যেসব মুসলিম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা উহুদের যুদ্ধে যোগদান করার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। অনেকের শহীদ হয়ে যাবার জন্য দুআ চাইছিল। কিন্তু তাদের এই সব আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছাগুলো মনের মধ্যেই ছিল। এই নিয়্যতগুলো কতখানি সত্য তা যাচাই করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রের দরকার। আর তাই জিহাদের প্রয়োজন ছিল যাতে করে এর মাধ্যমে তাদের নিয়্যতের সত্যতা যাচাই করা যায়।

হতে পারে, তাদের মাঝে অনেকেই এমন ছিল, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগ পর্যন্ত নিজে কী চায়, তা নিয়ে সন্দিহান ছিল। এখনও দেখা যায় যে, আমাদের মাঝে অনেকেই অন্তরে শহীদ হবার ইচ্ছা রাখে। কিন্তু সত্যিই কি আমরা সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো এবং জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো? একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সে কথা ভালো জানেন। আর তাই তিনি আমাদের সামনে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেন, যাতে আমাদের অন্তরের খবর প্রকাশিত হয়ে যায়।

উহুদের যোদ্ধাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন

উহুদের যুদ্ধে কিছু সাহাবি ভুল করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের ভুলের ব্যাপারে কী বলেছেন? মুসলিমদের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তাআলা কখনোই তাদের প্রশংসা করেননি, কৃতিত্ব দেননি। বদরের যুদ্ধের পরে আল্লাহ এমন কোনো আয়াত নাযিল করেননি, যেখানে তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রশংসা করেছেন। বরং তিনি বলেছেন,

> **"বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর বিজয় শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকেই আসে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২৬)**

বদরের যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে যখন মতভেদ হলো, তখন আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাথে কঠিন ভাষা ব্যবহার করলেন।

> "যদি আল্লাহর তরফ থেকে বিধান না থাকতো যা আগেই উল্লেখ হয়েছে, তবে তোমরা যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলে সেজন্য তোমাদের উপরে এসে পড়তো এক বিরাট শাস্তি।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬৮)

মুসলিমরা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মুক্তিপণ আদায়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটার কারণে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব এসে পৌঁছাতে পারতো! কেননা আল্লাহ তাআলা এই সিদ্ধান্তের সাথে সম্মত নন। মুসলিমরা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা না করে, তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ পছন্দ করেননি।

এই আয়াতগুলো থেকে একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। বদরের যুদ্ধের পর, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের অন্তরগুলোকে সর্বপ্রকার কলুষতা ও অন্তরের ব্যাধি থেকে পবিত্র রাখতে চেয়েছেন। বদরের যুদ্ধের অসামান্য সাফল্যের পর তাদের মাঝে গর্ব, অহংকার ইত্যাদি অনুভূতি কাজ করা অসম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, বিজয় কেবলমাত্র আল্লাহ চেয়েছেন, সেজন্যই এসেছে।

কিন্তু উহুদের যুদ্ধে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। মুসলিমদের মনোবল কমে গেছে, তারা কষ্টের মধ্যে অবস্থান করছে। তাই আল্লাহ তাআলা তখন তাদের সান্ত্বনা দিলেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন, ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতি করুণা দেখালেন। মুসলিমরা নবীজির ﷺ আদেশ অমান্য করে গুনাহ করেছিল। এই দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের জন্য পাহাড় থেকে নেমে মারাত্মক অপরাধ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন।

ইলমচর্চা এবং জিহাদ

> "আর আরো কত নবী যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ছিল বহু আলিম..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৬)

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলছেন, আগের নবীরা যুদ্ধ করেছেন, আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন অনেক আলেম। এখান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার। আলিমদের কাজ ঘরে বসে থাকা নয়, তাদেরকেও ময়দানে যুদ্ধ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, সমাজে আলিমদের একটি বিশেষ স্থান তৈরি হয়েছে। লোকেরা সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তারা সবার চাইতে আলাদা কাপড় পরে, অন্যভাবে চলাফেরা করে। সৈনিকদের মতো তাদেরকে মাঠে-ময়দানে যেতে হচ্ছে না, আল্লাহর রাস্তার ধুলোবালি তাদের স্পর্শ করে না। মুজাহিদদের মতো শক্ত মাটিতে শুয়ে থাকতে হচ্ছে না, কাটাতে হচ্ছে না শত্রুর অপেক্ষায় নির্ঘুম রাত। ব্যথা-বেদনা-কষ্ট কী তারা একসময় ভুলে যান। এভাবে চলতে চলতে একসময় তাদের মনে হতেই পারে যে, তারা সবার মতো নন। শয়তান তখন তাদের বুঝায়, 'তোমার তো এতকিছু করার দরকার নেই। তোমার ইলম আছে। তুমি শুধু ঘরে বসে সবাইকে শিখাবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।' কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন, সৎকর্মশীল আলেমদের বৈশিষ্ট্য তা নয়।

নেককার আলেমগণ নবীদের সাথে ময়দানে নেমে যুদ্ধ করতেন।

> "আর আল্লাহর পথে তাদের যা কষ্ট হয়েছিল, তার জন্য তারা হতাশ হয়নি, আর তারা ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৬)

এই আলিমরা পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু দমে যাননি। পরাজয় যেন আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে, আমাদেরকে হতাশ করে না দেয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মু'মিনদেরকে সর্বদাই দৃঢ় থাকা চাই।

> "তারা বললো, হে আমাদের রব! ক্ষমা করো আমাদের সব অপরাধ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজকর্মে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৭)

আয়াতের এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবে আল্লাহর উপর ভরসা করে। নিজেদের প্রস্তুতি কিংবা সাজ-সরঞ্জামের ওপর নির্ভর করে নয়। মুসলিমদেরকে আল্লাহর কাছে থেকে ক্ষমা চাইতে হবে। মুজাহিদদের তাদের রবের সামনে বিনয়ী হতে হবে, কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিনয় দেখতে পছন্দ করেন। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আগেকার যুগের মুজাহিদদের পথ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এটাই ছিল তাদের পথ। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতো। হেরে গেলেও বিমুখ হতো না। আর আল্লাহর কাছে তারা নিজেদের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতো। তারা বলতো,

> "আর দৃঢ় করো আমাদের পদক্ষেপ, এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। কাজেই আল্লাহ তাদের দিয়েছিলেন ইহজীবনের পুরস্কার, আর পরলোকের পুরস্কার আরো চমৎকার! আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৭)

অবাধ্যতার খেসারত

> "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি কোনো বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে পেশ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা নিসা, ৪: ৫৯)

রাসূলুল্লাহর ﷺ অবাধ্যতা ছিল উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয় ও পরাজয়ের মূল কারণ। যদি কোনো বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তা সমাধান করতে হবে। কেননা কুরআন আর নবীজির সুন্নাতই হলো মুসলিমদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

দুনিয়াসক্তির পরিণতি ভয়াবহ

গনিমতের মাল নিয়ে মুসলিম উম্মাহর কাহিনী সত্যিই খুব দুঃখজনক। সেই বদরের যুদ্ধ থেকেই এর সূচনা। তখন আল্লাহ তাআলা সূরা আনফালের আয়াত নাযিল করেন। উবাদা ইবন আস-সামিত ﷺ বলেন, 'আমরা গনিমতের মাল নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম। আর আমাদের আচরণও শোভন ছিল না। তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হয়।' উহুদের যুদ্ধেও গনিমতের মালের আশাতেই পাহাড়ের ওপর থেকে তীরন্দাজ সৈন্যরা নিচে নেমে এসেছিল। আর সেটাই যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গনিমতের মাল পাওয়ার জন্য তাদের ধৈর্যহীনতাই বড় বিপদ ডেকে এনেছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই সমস্যা পরবর্তীতেও রয়ে যায়।

ইউরোপের পশ্চিমাংশে মুসলিমরা যখন জিহাদে একের পর এক জয় লাভ করতে থাকে, মনে হচ্ছিল সমগ্র ইউরোপ মুসলিমদের হাতে এসে যাবে। তাদের এই অগ্রযাত্রা শত্রুবাহিনী থামাতে ব্যর্থ হলেও দুনিয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষার কাছে মুসলিমরা হার মানে। স্পেন জয় করে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আমীর আবদুর রাহমান আল-গাফিকী ফ্রান্সের প্যারিসের দিকে যাত্রা আরম্ভ করলেন। ফ্রান্সের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মুসলিমদের আয়ত্বে চলে এল। তারা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে। পুরো ফ্রান্স দখল করে নেওয়া ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু যখন তারা প্যারিসের সীমানায় গিয়ে পৌঁছালো, ততক্ষণে গনিমতের মাল দিয়ে তারা এতটা বোঝাই হয়ে গেল যে, শত্রুদের নিয়ে চিন্তা করার বদলে নিজেদের গনিমতের অংশ নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। তারা যুদ্ধে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারলো না, যুদ্ধে পরাজিত হলো। এই যুদ্ধকে বলা হয়, 'বালাতুশ শুহাদা' বা 'শহীদদের প্রাঙ্গন'। কারণ এই যুদ্ধে বিশাল সংখ্যক মুসলিম নিহত হয়। মুসলিম সেনাবাহিনীর বীর মুজাহিদ আবদুর রহমান আল-গাফিকীও শহীদ হন। আর এরপর থেকেই মুসলিমদের অগ্রসর হওয়া থেমে যায়। পশ্চিম ইউরোপের সাথে মুসলিমরা আর কখনোই পেরে ওঠেনি। যুদ্ধ থেকে তাদেরকে পালিয়ে যেতে হয়েছে। মুসলিম বাহিনীর ইতিহাস এখান থেকেই অন্যদিকে মোড় নেয় শুধু একটি কারণে, গনিমতের প্রতি আসক্তি।

> **"তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা এই দুনিয়া চাচ্ছিল, আর তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা চাচ্ছিল পরকাল।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫২)**

এই আয়াত শুনে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমি জানতাম না যে আমাদের মাঝে, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহাবিদের মাঝেও এমন লোক আছে যারা আখিরাতের চাইতে দুনিয়াকে বেশি প্রাধান্য দেয়!' মু'মিনদের মাঝে দুনিয়ার লোভ থাকতে পারে -- এ বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের ﷺ কল্পনাতেও আসেনি। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হলো একটি পরীক্ষা। এর মাধ্যমে এমন সব বিষয় উন্মোচিত হয়, যা অন্য কোনোভাবে বোঝা যায় না।

দ্বীনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা

মুহাম্মাদ ﷺ এর মৃত্যু সংবাদের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর কিছু পরাজিত মানসিকতার মুসলিম আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কাছে ছুটে যেতে চাইল। তাদের ইচ্ছা ছিল সে যেন কুরাইশদের সাথে আপসের আলোচনায় বসে। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল শিক্ষা দিয়েছেন ভিন্ন কিছু,

> "আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো কিছুই নয়! তাঁর আগেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ অচিরেই তাদের পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৪)

মুহাম্মাদ ﷺ এর আগে বহু নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন এবং তাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহর রাসূলও ﷺ তাঁদের থেকে ব্যতিক্রম নন, তিনিও মৃত্যুবরণ করবেন। আল্লাহ যেন মুসলিমদের জিজ্ঞেস করছেন,

'যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছিয়ে যাবে? এই দ্বীন ত্যাগ করে জাহিলিয়াতের জীবনে ফিরে যাবে? তোমরা কি ব্যক্তি মুহাম্মাদকে অনুসরণ করো নাকি নবী মুহাম্মাদকে?'

ইসলাম একটি দ্বীন যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, ব্যক্তি বিশেষের উপর এই দ্বীন নির্ভরশীল নয়। কোনো ব্যক্তি যতই মহান এবং আদর্শবান হোক না কেন, ইসলাম কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে চলে না। কখনোই এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে দেখে ইসলামের অগ্রযাত্রা থেমে যাবে। বিজয় কোনো আমীরের কারণে আসে না। উমারের ﷺ খিলাফতকালে খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ﷺ মুসলিম সেনাবাহিনীর আমীর পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উমার তখন উম্মাহকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলিমদের কোনো বিশেষ একজন নেতার ওপর ভরসা করা উচিত নয়। তারা একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর আবু বকর ﷺ তাই বলেছিলেন, 'যারা মুহাম্মদের ইবাদত করতে, জেনে রাখো, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত করতে, তারা শুনে নাও, আল্লাহ জীবন্ত, এবং তিনি কখনো মারা যাবেন না।'

'বস্তুত, কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না' -- আল্লাহ তাআলা এই অংশের মাধ্যমে আমাদের কাছে এটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে, আমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আমাদেরই আল্লাহকে দরকার। কিন্তু তাঁর আমাদেরকে কোনো প্রয়োজন নেই।

মুনাফিক্ব আর গুনাহগার মু'মিন -- কখনোই সমান নয়

> "তারপর আল্লাহর করুণার ফলেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। আর আপনি যদি রুক্ষ ও কঠোর-হৃদয় হতেন, তবে নিঃসন্দেহে তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। আর কাজে কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুল-কারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫৯)

দাওয়াহ এবং ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর কাজ সাধারণভাবে কোমলতার ভিত্তিতে হওয়া চাই। রাসূলুল্লাহর ﷺ মধ্যে যদি তার অনুসারীদের প্রতি কঠোরতা থাকতো তাহলে তারা তাকে ছেড়ে চলে যেত। দিন শেষে যারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশ অমান্য করেছে, তারা তাঁরই অনুসারী। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে বলেছেন যেন তিনি তীরন্দাজ মুসলিম বাহিনীকে মাফ করে দেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অথচ এই তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের মাশুল গুনতে গিয়েই মুসলিমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আহত হয়েছেন এবং ৭০ জন মুসলিম নিহত হয়েছে! কিন্তু এদেরকে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষমা করে দেন এবং তাদের জন্য দুআ করেন সেটাই আল্লাহ চেয়েছেন।

উহুদের যুদ্ধে কিছু মুসলিম মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে ছিল। হতে পারে এটা উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের একটি কারণ। কিন্তু তবু আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে পরামর্শ নিতে বারণ করেননি। কেননা শুরা হলো সুন্নাহ, এটাই সঠিক পথ। শুরা করে অর্থাৎ সবার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা ইসলামে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার।

> "আর যেদিন দুদল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে প্রকৃত ঈমানদার কারা তা জানা যায়। যাতে শনাক্ত করা যায় মুনাফিক্বদের। আর তাদেরকে বলা হলো এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই করো কিংবা (অন্ততপক্ষে) শত্রুদেরকে প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তারা নিজের মুখে সে কথাই বললো। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৬৬-১৬৭)

মুনাফিক্বদের শাস্তি দেওয়া হয়নি, এমনকি কিছু বলাও হয়নি। শুধু বলে দেওয়া হলো, তারা হলো মুনাফিক্ব। তাদের আসল চেহারা সবার কাছে খুলে দেওয়া হলো।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা এসেই যায়। উম্মাহর বিজয়ের শর্ত কী -- এই বিষয়ে অনেক মুসলিমের মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তারা মনে করে, উম্মাহর সবাই যখন আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকবে, তখনই একমাত্র এই উম্মাহ বিজয়ী হবে। সত্যি বলতে, কিছু মুসলিমই শুধু নয়, কয়েকটি ইসলামী আন্দোলনই এই ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা মনে করে, উম্মাহর বিজয় অর্জনের জন্য আমাদের সবাইকে শুধরাতে হবে, প্রত্যেককে ভালো মুসলিম হতে হবে। যতক্ষণ আমাদের মাঝে এমন মুসলিম থাকবে, যারা নামাজ পড়ে না, যারা গুনাহ করে, ততদিন আমরা জিততে পারবো না। যতদিন ফজরের সালাতে জুমুআর সালাতের সমপরিমাণ মুসল্লী হাজির না হচ্ছে, ততদিন আমাদের বিজয় অর্জিত হবে না।

এই কথাটি এসেছে আসলে এক ইহুদি পণ্ডিত থেকে। সে জেরুসালেমের মসজিদে বলেছিল, 'যেদিন মুসলিমদের জুম্মাহ এবং ফজরের জামাতে সমান সংখ্যক লোক নামাজ পড়বে, সেদিনই জেরুসালেম মুসলিমদের হাতে বিজিত হবে।' এটা একটা ইহুদি পণ্ডিতের কথা মাত্র, কিন্তু তারা এমনভাবে এই রাবীর ঘটনাকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করে, যেন আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তির ওপর তাঁর আয়াত নাযিল করেছেন আর এই ইহুদি লোকটির সব ভবিষ্যদ্বাণী চিরায়ত সত্য!

সত্যি বলতে, এই চিন্তাধারা মোটেও সঠিক নয়! উম্মাহর মধ্যে সবসময়ই ফজরের সালাতের চাইতে জুমুআর সালাতে বেশি মানুষ হবে। উম্মাহর মাঝে সবসময়ই কিছু গুনাহগার মুসলিম থাকবে। অনেকেই ইসলামের বিধিনিষেধ পুরোপুরি মেনে চলবে না। আমরা সবাই 'ভালো মুসলিম' হয়ে গেলেই কেবল বিজয় আসবে--এই ধারণা সঠিক নয়। এর প্রমাণ হলো উহুদের যুদ্ধ।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পুরো তিন ভাগের এক ভাগ ছিল মুনাফিক্ব। কিন্তু তাদের কারণে মুসলিমরা হারেনি। কুরআন বা সুন্নাহতে কখনোই এক-তৃতীয়াংশ বাহিনীর পলায়নকে উহুদে পরাজয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। কোনো আলিমও কখনো এমন মত দেননি।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সবসময়ই কিছু মুনাফিক্ব থাকবে, কিন্তু ভালো ও মন্দের লড়াইয়ে মুনাফিক্বরা ফলাফল নির্ধারণ করে না। বরং যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয় আত-ত্বইফা আল-মানসুরাহ দ্বারা। আত-ত্বইফা আল-মানসুরাহ হচ্ছে মুসলিমদের কেন্দ্রীয় দল। একাধিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দলটকে নিয়ে কথা বলেছেন। এরা হচ্ছে সেই নাজাতপ্রাপ্ত দল, যারা সর্বদা হক্কের উপরে থাকবে। এই দলের মুসলিমরা যদি গুনাহতে লিপ্ত হয়, তারা যদি আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাহলে মুসলিমরা পরাজিত হবে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিজয় শুধু এই একটি দলের উপর নির্ভর করে, পুরো উম্মাহর উপরে নয়। উহুদের যুদ্ধ থেকে ৩০০ জনের পলায়নে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতিতে কিছু আসে যায়নি। বরং উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ সেই ৪০ জন, যারা আল্লাহর

রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল।

> "আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন, যখন তোমরা তাঁর ইচ্ছায় তাদের খতম করছিলে; যতক্ষণ না তোমরা দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়লে, আর তোমরা আদেশ সম্বন্ধে বিরোধ করলে ও যা তোমরা ভালোবাসো তা তোমাদের দেখাবার পরে অবাধ্য হলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা এই দুনিয়া চাচ্ছিল, আর তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা পরকাল চাচ্ছিল, তারপর তিনি তোমাদের তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) থেকে পলায়নপর করলেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫২)

পরাজয় আশাবাদী মনকে নিরাশ করে না

স্বাভাবিকভাবে এমনটাই মনে হওয়ার কথা যে, উহুদ পর্বত দেখলেই নবীজির ﷺ দুঃখের স্মৃতি জেগে উঠবে। এখানেই তিনি সাহাবিদের হারিয়েছেন, প্রিয় চাচা হামযাকে ﷺ হারিয়েছেন, নিজে আহত হয়েছেন। মুসলিমরা এই যুদ্ধেই শত্রুদের হাতে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু নবীজি পরাজিত মানসিকতার মানুষ ছিলেন না, হতাশা তাঁর মধ্যে কখনই দেখা যায়নি। আমাদের রাসূল ﷺ খুবই আশাবাদী এবং ইতিবাচক মানসিকতার একজন মানুষ। উহুদে হেরে গেলেও তিনি হার মানেননি। তিনি বলতেন, 'উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও উহুদকে ভালোবাসি।' তিনি বলতেন, 'উহুদ হলো জান্নাতের পাহাড়।' উহুদ পর্বতের সাথে তাঁর কষ্টের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল, কিন্তু হতাশাকে নিজের মনে কখনো স্থান দেননি। এটাই ইসলামের শিক্ষা। দুঃখ, কষ্ট, হতাশা দূরে ঠেলে কাজ করে যেতে হবে। উহুদের পরাজয় মুসলিমদের বেদনাহত করবে, হতাশাচ্ছন্ন করবে না। মুসলিমরা আশাবাদী হবে, পরাজয়ের মধ্য থেকে ভালো দিকটা দেখার চেষ্টা করে। হতাশাবাদ মুসলিমদের স্বভাবের সাথে একেবারেই যায় না।

বিজয়ের সূত্র

বিজ্ঞান যেমন কিছু সূত্র মেনে চলে, তেমনি জয় ও পরাজয় কিছু সূত্র মেনে চলে। এই চিরন্তন সূত্রগুলো কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে।

প্রথম নীতি, বিজয় একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে আসে।

> "আর বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না।" (সূরা আনফাল, ৮: ১০)

দ্বিতীয় নীতি, যদি আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করতে চান, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যা তা থামাতে পারবে।

> "যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৬০)

অর্থাৎ ভয় পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আর কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা মূসাকে ﷺ বিজয় দান করেছিলেন তৎকালীন 'সুপার-পাওয়ার' ফিরআউনের বিরুদ্ধে। কাজেই মুসলিমদের একমাত্র ভরসাস্থল আল্লাহ তাআলা। যদি তারা আল্লাহর ওপর ভরসা না করে অন্য কিছু বা অন্য কারো ওপর ভরসা করে, তাহলে তিনি মুসলিমদের পরিত্যাগ করবেন।

তৃতীয় নীতি, পরাজয়ের কারণ আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া

> "আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে যখন তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা যা ভালবাসতে তা তোমাদেরকে দেখানোর পর। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায় আর কেউ চায় আখিরাত। তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫২)

এই দুনিয়ার মোহ, আসক্তি, মায়া এবং আখিরাতের ওপরে দুনিয়াকে স্থান দেওয়া হলো মুসলিমদের অধঃপতনের কারণ। উহুদে তারা হেরেছিল কারণ তারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ অবাধ্য হওয়া এবং ঐক্য বজায় না রেখে দলছুট হয়ে যাওয়া ছিল তাদের পরাজয়ের প্রধান নিয়ামক।

চতুর্থ নীতি, জয় বা পরাজয়ের সাথে সৈনিকদের সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই।

> "আর আল্লাহ ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২৩)

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদের বিজয় দান করেছেন। আবার হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা অধিক হওয়ার পরেও তারা

সাময়িক পরাজয়ের শিকার হয়েছিল।

> "আল্লাহ ইতিমধ্যে বহুক্ষেত্রে তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন, আর হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি; এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করেছিলে।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৫)

পঞ্চম নীতি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করা।

ষষ্ঠ নীতি, ঐক্যবদ্ধ থাকা।

সপ্তম নীতি, ধৈর্য ধারণ করা।

বিজয়ের জন্য এই তিনটি গুণের কথা আল্লাহ একই আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

> "আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো। আর তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা করো, তবে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪৬)

অষ্টম নীতি, যুদ্ধের প্রস্তুতির মাধ্যমে বিজয় আসে না।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, কিন্তু এই প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামই যুদ্ধজয়ের নিয়ামক এমনটা ভাবা যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং সামরিক সবভাবে প্রস্তুত হতে বলেছেন।

> "আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন আল্লাহর শত্রুদের তথা তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারো, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদেরও যাদেরকে তোমরা চেনো না; (কিন্তু) আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে, তার প্রতিদান তোমাদের পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে এবং তোমাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬০)

নবম নীতি, দৃঢ়পদ থাকা, এবং

দশম নীতি, আল্লাহকে স্মরণ করা।

শেষ এই দুটো বিষয় আল্লাহ্ তাআলা একই আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

> "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোনো সৈন্যদলের সম্মুখীন হও, তখন দৃঢ়সংকল্প হও, আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪৫)

সুতরাং সফল হবার জন্য মুসলিমদের দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে আর বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।

মু'মিনদের জিহাদে ছোটার প্রেরণা হলো ঈমান

রাফী ইবন খাদীয, সামূরাহ ইবন জুনদুব, আবদুল্লাহ ইবন উমার এবং আল-বারাহ ইবন আযীবের মতো অল্প বয়স্ক ছেলেরা কেন উহুদের যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে এতটা উতলা ছিল? অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, সে যুগটাই যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ, তাই বাচ্চারাও যুদ্ধে যোগ দিতে উতলা থাকতো। কিন্তু এই একই যুদ্ধে দেখা গেছে ৩০০ প্রাপ্তবয়স্ক সৈনিক যুদ্ধ না করে পালিয়ে গেছে! যুদ্ধপ্রিয় সমাজ হলেই যে সবাই যুদ্ধকে ভালোবাসবে এমনটা নয়। এখানে মূল ব্যাপার হলো 'ঈমান' বা মুসলিমদের বিশ্বাস। যাদের ঈমান ছিল, তারা যুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহী ছিল। আর যাদের ঈমান ছিল না, তারা পালিয়ে যাবার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী ছিল। আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং তার অনুসারী তিনশো লোক উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। এমনকি তাবুক, খন্দক ও আরও অনেক যুদ্ধেই তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল।

মুনাফিক্বদের জিহাদে ছোটার প্রেরণা হলো দুনিয়া

উহুদের যুদ্ধে অংশ না নিলেও মুনাফিক্বরা ঠিকই হামরা আল আসাদের অভিযানে অংশ নিতে চাইলো। কিন্তু নবীজি ﷺ তাদেরকে অনুমতি দেননি। তিনি কেবল তাদেরকেই সঙ্গে নিলেন, যারা উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। হামরা আল-আসাদের অভিযানে মুনাফিক্বরা থাকতে চেয়েছে কারণ তারা মনে করছিল এই এই যুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা প্রবল আর যুদ্ধে জেতার অর্থ হলো গনিমতের মালে ভাগ বসানো যাবে!

আরামের সময়, শুধুমাত্র সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় ইসলামকে মেনে চলা, আর যখন ত্যাগ স্বীকারের সময় আসে তখন ইসলাম থেকে সরে যাওয়া নিফাক্বের লক্ষণ। জিহাদ ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। তাই সকলের উচিত নিজেদের নিয়তের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। নিজেদের খতিয়ে দেখা, ইসলামী কাজের সাথে যখন দুনিয়াবি স্বার্থ মিশে থাকে, তখন আমরা খুব আগ্রহ পাচ্ছি আর কষ্টের কাজ হলে পিছিয়ে পড়ছি না তো?

যেমন, ইসলাম বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানদের দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর গুরুত্ব দেয়, বাবা-

মায়ের আনুগত্য করার কথা বলে। কিছু বাবা-মা এই কথাগুলো শুনলে খুব খুশি হন, এই সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস তাদের মনের কথা বলে। কিন্তু যখন ঐ একই সন্তানের উপর ঐ একই ইসলাম জিহাদের কথা বলে, তখন তারা সেসব কথা শুনতে চান না। তাদের সন্তানদেরকেও তারা ইসলামের এই শিক্ষার দিকে মোটেও আকৃষ্ট করতে চান না। অর্থাৎ তারা ইসলামকে নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করছেন।

নিফাকের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে, আমরা যেন মুনাফিকদের কাতারে পড়ে না যাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেছেন দ্বীন ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আনসারী সাহাবিদের থেকে বায়াত নিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা সহজ সময়েও আমার আনুগত্য করবে এবং কঠিন সময়েও আমার আনুগত্য করবে।'

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'উহুদ যুদ্ধের একটি শিক্ষণীয় দিক হলো, সাহাবিরা যে সত্যিই আল্লাহর প্রতি অনুগত ছিলেন সে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সহজ হোক, কঠিন হোক, সবরকম সময়েই তারা আল্লাহ আযযা ওয়া জালের ইবাদত করতে রাজি ছিলেন। সুসময়, দুঃসময় উভয় অবস্থাতেই দ্বীনের ওপর দৃঢ় এবং অবিচল থাকা প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ। তারা সেসব লোকের মতো নন, যারা শুধুমাত্র সহজ অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করে আর বাকি সময় ভুলে থাকে।'

বিনয়

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, *'আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে পরাজয় এবং লাঞ্ছনা দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তাদের দুর্বল অবস্থার মাঝে রাখলেন। এভাবে তারা বিনয়ী হয়ে উঠলো। আর যখন তারা বিনয়াবনত হলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ কবুল করে নিলেন।'* বিনয়ের সাথে করা দুআ আল্লাহ কবুল করেন।

> **"আর আল্লাহ ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২৩)**

উহুদ ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি বড় বিপর্যয় মোকাবেলার প্রস্তুতি

ইবনুল কায়্যিম মন্তব্য করেছেন, 'উহুদের যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহকে সবচাইতে মারাত্মক দুর্যোগের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করেছে।' এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগ হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু। এই ঘটনাটির ব্যাপকতা এত বিশাল যে, তার জন্য আগে থেকেই মুসলিমদেরকে প্রস্তুত করা জরুরি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সাহাবিদের সবকিছু। তিনি ছিলেন তাদের দ্বীন ইসলামের উৎস। তাদের বই-পুস্তক বা ইন্টারনেট ছিল না। ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্য কোনো মাধ্যম ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাদের পিতার মতো ছিলেন, তাঁর থেকেই সাহাবিরা সবকিছু শিখেছেন। নবীজিকে হারানো সাহাবিদের জন্য প্রচণ্ড কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার ছিল। এই ঘটনা তাদেরকে চুরমার করে দিতে পারত, তাদের সমস্ত অগ্রগামিতা থামিয়ে দিতে যথেষ্ট ছিল। এই ঘটনা তাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে ধসিয়ে দিতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুতে সাহাবিরা যেন ভেঙে না পড়েন। সে জন্য উহুদের মাধ্যমে তাদের প্রস্তুত করে তুলেছেন। এই যুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ আর নেই। আর তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয়,

> "আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো কিছুই নন! তাঁর আগেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ অচিরেই তাদের পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেলেও কীভাবে তা সামলে উঠতে হবে সে ব্যাপারে এভাবেই মুসলিমরা শিক্ষা লাভ করে।

উহুদ থেকে খন্দক

উহুদে মুসলিমদের পরাজয়ে শুধু কুরাইশরা নয়, বরং কিছু আরব মুশরিক গোত্রও বেশ খুশি হয়। তারা অনেকেই মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। তারা আশা করছিল এই সুযোগে ইসলামকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া যাবে। এমনকি মুসলিমদের চুক্তিবদ্ধ কিছু গোত্রও মুসলিমদের দুর্বলতার সুযোগে ষড়যন্ত্র শুরু করে। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ কিছু তাৎক্ষণিক সামরিক পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন করা সম্ভব হয়। তাই উহুদ পরবর্তী বেশ কয়েক মাস অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলায় মুসলিমদের ব্যস্ত সময় কাটাতে হয় ।

বনু আসাদের সাথে যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন তুলাইহা আল আসদীর নেতৃত্বে বনু আসাদ গোত্র মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই লোকটির কাহিনী বেশ চমকপ্রদ। প্রথমে সে ছিল ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর শত্রু। পরে সে মুসলিম হয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে বসে। এরপর আবার সে তার মন পরিবর্তন করে এবং মুসলিম হয়ে যায়। সবশেষে সে একজন মুজাহিদ হিসেবেই মৃত্যুবরণ করে।

তুলাইহার পরিকল্পনা ছিল মদীনায় সর্বাত্মক সামরিক হামলা চালানোর। তার স্বপ্ন ছিল মদীনার সম্পদ লাভ করবে এবং কুরাইশদের সাথে এক হয়ে মদীনা দখল করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আগেই তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আবু সালামার رضي الله عنه নেতৃত্বে আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত দেড়শো সৈন্যের একটি দল পাঠান। আবু সালামাহ ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের একজন মুসলিম, উহুদের যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন। মুহাররাম মাসের এই অভিযানে অতর্কিত হামলায় বনু আসাদ তাদের গরুবাছুর রেখে পালিয়ে যায়। তাদের ধারণাই ছিল না মুসলিমরা তাদের এভাবে হামলা করে বসবে। আবু সালামাহ رضي الله عنه বিজয়ী হয়ে ফিরে আসলেন। কিন্তু এই অভিযান শেষে তার উহুদের জখম থেকে পুনরায় রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং তিনি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হন।

খালিদ ইবন সুফিয়ানি আল-হুযালিকে হত্যা

মুসলিমদের দুর্বল অবস্থার সুযোগে আরও একটি মুশরিক গোত্র মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছিল, তারা হলো হুযাইল গোত্র। এর নেতৃত্বে ছিল খালিদ ইবন সুফিয়ান আল হুযালি। সে মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে এবং যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। সে ছিল খুব প্রভাবশালী এবং এই যুদ্ধের মূল হোতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন পুরো গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না গিয়ে শুধু এই লোকটাকে

সরিয়ে দিতে পারলেই হুযাইল গোত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তিনি ডেকে পাঠালেন জুহাইনা গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন উনাইসকে, বললেন,

- আমি জানতে পারলাম খালিদ ইবন সুফিয়ান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে এখন আরিনায় আছে। তুমি তার কাছে যাবে এবং তাকে হত্যা করবে।

- আমি কীভাবে তাকে চিনবো? আপনি কি তার বর্ণনা দিতে পারেন?

- হ্যাঁ পারি, তুমি যখন তাকে দেখবে, ভয়ে কেঁপে উঠবে।

- কিন্তু আমি এই জীবনে কখনো কাউকে দেখে ভয় পাইনি!

- তুমি খালিদ ইবন সুফিয়ানকে দেখোনি। তাকে দেখলে অবশ্যই তুমি ভয় পাবে।

খালিদ ইবন সুফিয়ান ছিল খুব শক্তিশালী মারমুখী লোক। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ছিলেন খুব সাহসী, কাউকে ভয় করতেন না। এই কাজের জন্য তাই আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ই ছিলেন যোগ্য লোক। কাহিনীটি তার মুখেই শোনা যাক,

'এরপর আমি তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়লাম । চলতে চলতে এক সময় আরিনা পৌঁছে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি তার দেখা পেলাম। তাকে দেখে আমি কেঁপে উঠলাম। বুঝতে পারলাম যে, এই লোকটিই খালিদ ইবন সুফিয়ান। তার সাথে কিছু মহিলা ছিল, তাদের জন্য সে তাঁবুর জন্য জায়গা খুঁজছিল। সময়টা ছিল আসরের ওয়াক্ত। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম তার সাথে লড়াই করতে গিয়ে না আবার আসরের সালাহ ছুটে যায়। আমি তাই তার কাছে হেঁটে যেতে যেতে ইশারায় সালাত আদায় করে ফেললাম। রুকু আর সিজদাহ করছিলাম মাথা নেড়ে, ইশারায়। শেষ পর্যন্ত আমি তার মুখোমুখি হলাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

- কে তুমি?

- আমি একজন আরব বেদুইন। শুনেছি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছেন, তাই আমি আপনার সাথে যোগ দিতে এসেছি।

- হুম, ঠিকই শুনেছ। আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছি।

এভাবে তার সাথে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। এরপর সুযোগ বুঝে দিলাম তলোয়ার দিয়ে কোপ। আসার সময় দেখি তার সাথের মহিলারা তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে (অর্থাৎ তারা কান্নাকাটি করছিল) ।

এরপর আমি মদীনায় চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখে বললেন, আহ! এই মুখ উজ্জ্বল হোক! আমি বললাম, আমি তাকে হত্যা করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাকে হত্যা করেছ এবং আমি জানি তুমি সত্যি বলছো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাসা থেকে একটা লাঠি নিয়ে আমাকে দিলেন। আমি লাঠি নিয়ে

চলে আসলাম। আমার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলো,

- ইবন উনাইস, তোমাকে আল্লাহর রাসূল লাঠিটা কেন দিলেন?

- তা তো জানি না, তিনি শুধু আমাকে এটা দিলেন।

- আরে! তুমি জিজ্ঞেস করবে না! তুমি যাও উনাকে জিজ্ঞেস করে আসো কেন তোমাকে লাঠিটা দিয়েছেন!

আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, শেষবিচারের দিনে এই লাঠি হবে তোমার এবং আমার মধ্যকার একটি চিহ্ন। সেদিন অল্প কিছু লোকের সাথেই ভর দেয়ার মতো কোনো সম্বল থাকবে।'

আবদুল্লাহ ইবন উনাইস লাঠিটি তার তলোয়ারের সাথে বেঁধে নিলেন। আর কোনোদিন সেই লাঠি হাতছাড়া করেননি। সবসময় নিজের কাছে রাখতেন। তিনি যখন মারা গেলেন, তার লাঠিটিও কবরে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল শেষ বিচারের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার মধ্যকার চিহ্ন হিসেবে লাঠিটি যেন তার সাথে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'সেদিন অল্প কিছু লোকের সাথেই ভর দেয়ার মতো মতো কোনো সম্বল থাকবে।' আলিমদের মত হলো, সেই 'কিছু'টা হলো মানুষের 'আমল' যার উপর তারা ভরসা করতে পারে।

আর-রাযীর মিশন: একটি মর্মান্তিক ঘটনা

এই মিশনে আল্লাহর রাসূল ﷺ রাযী নামক একটি স্থানে দশজনের একটি ছোট্ট দল প্রেরণ করেন। কারো কারো মতে, এই দলটি পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা। তবে আল ওয়াক্বিদী বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, আল্লাহর রাসূল এই দলটি পাঠিয়েছিলেন 'কাররাহ' এবং 'আদুল' এই দুই গোত্রের অনুরোধে। তারা রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বলেছিল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আপনি আমাদের কাছে কয়েকজন সাহাবিকে পাঠিয়ে দিন। আমরা তাদের কাছে দ্বীন বুঝবো, কুরআন শিখবো এবং ইসলামের হুকুম আহকাম সম্পর্কে জানতে পারবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিম ইবন সাবিত আল-আক্বলাহর নেতৃত্বে দশ জন সাহাবির একটি ছোট্ট দল তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু 'কাররাহ' ও 'আদুল' গোত্রদুটি মিথ্যে বলেছিল। আল-ওয়াক্বিদীর মতে, খালিদ ইবন সুফিয়ানকে হত্যা করার পর হুযাইল গোত্রের একটি উপগোত্র বনু লায়হান প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা এই দুটি গোত্রকে ঘুষের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে প্রতারণা করে কিছু সাহাবিকে আটক করার প্রস্তাব দেয় যেন তারা এই সাহাবিদেরকে কুরাইশদের কাছে বেচে দিতে পারে। কাররাহ ও আদুল গোত্রদুটো প্রস্তাবে রাজি হয়।

আসিম ইবন সাবিতের নেতৃত্বে ﷺ দশ জনের দলটি উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি বনু লাইহান গোত্রের ভূমিতে যখন পৌঁছলো, তখন প্রায় ১০০ জনের তীরন্দাজ বাহিনী তাদের ঘিরে ধরে। আসিম ইবন সাবিত বুঝতে পারলেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। জান বাঁচানোর জন্য একটি ছোট পাহাড়ে তারা পালিয়ে গেলেন। মুশরিকদের পক্ষ থেকে তাদের বলা হলো, 'যদি তোমরা আত্মসমর্পণ করো, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।'

মুসলিমদের আমীর আসিম বুঝতে পারলেন তারা মিথ্যা বলছে। যদি ছেড়েই দেওয়া হয়, তাহলে আটক করা কেন? আসিম ইবন সাবিত তাদের কথায় টললেন না, বললেন, 'মুশরিকদের অঙ্গীকারে আমি বিশ্বাস করি না!' আর এই বলে আসিম একের পর এক তীর ছুঁড়তে লাগলেন। একে একে সবগুলো তীর শেষ হয়ে গেল, রয়ে গেল কেবল একটি তলোয়ার। এরপর আসিম আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'জীবিত থাকতে তোমার জন্য লড়েছি হে আল্লাহ! মরে যাবার পর তুমি আমার দেহকে সুরক্ষিত রেখো!' এরপর তিনি তলোয়ার হাতে লড়ে গেলেন শত্রুদের সাথে। দুজনকে হত্যা করলেন, একজনকে আহত করলেন। যুদ্ধ করতে করতে একসময় তার তরবারি ভেঙে গেল, বনু লায়হানের লোকেরা তাকে হত্যা করলো। ইসলামের এক নির্ভীক সৈনিক শহীদ হলেন।

কেন তিনি আল্লাহর কাছে তার দেহকে সুরক্ষিত করার জন্য দুআ করেছিলেন? কারণ বনু লাইহানের লোকেরা মুসলিমদের হত্যা করে তাদের দেহ বিবস্ত্র করছিল। তাছাড়া আসিমের প্রতি সেই গোত্রের এক মহিলার ছিল তীব্র বিদ্বেষ, কারণ তার দুই ছেলেকে তিনি হত্যা করেছিলেন। সেই মহিলা শপথ করেছিল কেউ যদি আসিমের ﷺ কাটা মাথা তার কাছে নিয়ে আসতে পারে তবে সেই আসিমের খুলিতে মদ পান করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আসিমের ﷺ দুআ কবুল করেছিলেন। তার মৃতদেহ রক্ষার জন্য এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠালেন। যখনই কেউ তাঁর মৃতদেহের কাছে যেতে চাচ্ছিল, তখনই সেই মৌমাছির দল তাদের উপর চড়াও হচ্ছিল। তারা ভাবলো পরেরদিন এসে লাশ নিয়ে যাবে। কিন্তু সে রাতেই প্রবল বৃষ্টিতে তাঁর মৃতদেহ ভেসে যায়। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে মর্যাদাহানি থেকে রক্ষা করলেন এবং তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করলেন। আল্লাহ চাইলে কী না হয়! বৃষ্টির পানি, অবুঝ মৌমাছিও মু'মিনের জন্য বন্ধু হয়ে যায়!

যুদ্ধ চলছে। মুসলিমদের দশ জনের মধ্যে সাত জন যোদ্ধা যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন, বাকি থাকলেন তিন জন। পালিয়ে যাওয়া অথবা শত্রুদের সাথে পেরে ওঠা -- কোনোটাই তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাই বাঁচবার আশায় তারা অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন। কিন্তু অস্ত্র ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে আক্রমণ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো।

আবদুল্লাহ ইবন তারিক ﷺ বুঝতে পারলেন এবারও তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে, তিনি কোনোভাবে দড়ির মধ্য থেকে তার হাত বের করে তলোয়ার হাতে নিয়ে শত্রুদের

আক্রমণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তারা ছিল নাগালের বাইরে। শত্রুরা এরপর তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করলো। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

বাকি ছিল দুজন খুবাইব ইবন আদী ﷺ এবং যাইদ ইবন আদদিসিনা ﷺ, তাদেরকে বনু লায়হান কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দিল।

কুরাইশরা তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তবু আবু সুফিয়ান তাদের টলাবার জন্যই যেন জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না যে আজকে তোমাদের জায়গায় মুহাম্মাদ থাকতো, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সাথে নিরাপদে থাকতে?'

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এমন চিন্তা করাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু তারা উত্তর দিলেন,

'না! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা মরতে রাজি, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের গায়ে মদীনার একটি কাঁটা বিঁধতে দিতেও রাজি নই। আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে থাকবো, আর আল্লাহর রাসূলের গায়ে একটা টোকা লাগবে, তা হতে দেবো না!'

এই কথা শুনে আবু সুফিয়ান যেন কিছুটা অভিভূত হলো। সে বললো,

'আমি এমন মানুষ আগে কখনো দেখি নি যারা তাদের নেতাকে এতটা ভালোবাসে...'[22]

পাঠক, একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাববার সময় এসেছে। ভেবে দেখার সময় এসেছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ সাহাবিরা কতটা ভালোবাসতেন! শত্রুরাও পর্যন্ত এই ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে বারবার। ভালোবাসা মানে এই নয় যে দিন-রাত আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিয়ে শুধু কথা হবে, মিলাদ-মাহফিল হবে। আল্লাহর রাসূলকে ﷺ ভালবাসা মানে তাঁর দেখানো পথে চলা, যত কষ্টই হোক। সাহাবিরা শরীরের রক্ত দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন তাদের হৃদয়ে নবীজির জন্য কতটা গভীর ভালোবাসা ছিল। শত্রুরা পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে মুহাম্মাদের প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা নজিরবিহীন।

খুবাইবকে ﷺ কুরাইশরা নির্মমভাবে শুলে চড়িয়ে হত্যা করে। হত্যার আগে তাকে আল-হারিসের বাড়িতে রাখা হয়। সে সময়ে কোনো কারাগার ছিল না। খুবাইব ﷺ বদরের যুদ্ধে আল হারিসকে হত্যা করেছিলেন। বন্দী খুবাইব ﷺ আল-হারিসের মেয়েকে বললেন, 'আপনি কি আমার জন্য একটি ব্লেড এনে দিতে পারবেন? আমি নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে চাই।' খুবাইব নাভির নিম্নাংশ পরিষ্কার করতে

---

[22] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১।

চাচ্ছিলেন, এটি একটি সুন্নাহ। মহিলা তার বাচ্চাকে দিয়ে তাঁর কাছে একটি ব্লেড পাঠিয়ে দিল।

এভাবে বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। খুবাইবের ﷺ সাথে বাচ্চাটির বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এতই ভাল যে, বাচ্চাটি তাঁর কোলে উঠে বসে থাকে। মহিলার হঠাৎ হুঁশ হলো তার বাচ্চার কোনো হদিস নেই। তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি ভেঙে এসে সে দেখলো তার বাচ্চা খুবাইবের কোলে বসা আর খুবাইবের ﷺ হাতে একটি ব্লেড।

এই দৃশ্য দেখে মহিলা আতঙ্কে জমে গেল। তার বাবার হত্যাকারী খুবাইবের হাতে ব্লেড আর কোলে তার বাচ্চা! খুবাইব ﷺ তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। আপনি যা আশঙ্কা করছেন, সেরকম কিছুই আমি করবো না ইনশা আল্লাহ।'

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, খুবাইব ﷺ জানতেন তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু এজন্য তিনি বাচ্চাটিকে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো চেষ্টা করেননি। যদিও তিনি চাইলেই তা করতে পারতেন। ইচ্ছে করে নিরপরাধ কাউকে হত্যা করা একজন মুসলিমের জন্য সংগত নয়। একজন মুসলিম কখনো ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে কোনো কাফিরকে হত্যা করে না। কারণ, জিহাদ কেবল আল্লাহর জন্যে। খুবাইবের এই আচরণে সেই মহিলা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

'উনার চাইতে ভালো কোনো কয়েদী আমি দেখিনি। আমি তাঁর রুমে গিয়ে দেখতাম তিনি প্লেট ভর্তি আঙুর খাচ্ছেন! অথচ মক্কার কোথাও তখন আঙুর পাওয়া যেত না। আমি নিশ্চিত ঐ আঙুরগুলো ফেরেশতাদের কাছ থেকে এসেছে।'

শুলে চড়ানোর আগে তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করতে চাইলেন। তাকে সে সুযোগ দেওয়া হলো। মৃত্যুর আগের শেষ কাজ। চাইলেই তিনি লম্বাচওড়া করে সালাত পড়ে মৃত্যুর সময়টা আরেকটু বিলম্ব করতে পারতেন। খুবাইব তা করেননি। সালাত শেষ করে তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'শোনো, তোমরা আমাকে মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়ার অপবাদ না দিলে আমি এই দু'রাকাত সালাত আরও দীর্ঘ করতাম।'[23]

কেউ যদি মর্যাদা কী জিনিস তা বুঝতে চায়, তবে খুবাইব একজন উজ্জ্বল উদাহরণ। মৃত্যুর আগে দু'রাকাত সালাত আদায়ের এই সুন্নাহ খুবাইব প্রচলন করেছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি দুআ করে যান,

'হে আল্লাহ, এদের গুনে গুনে হত্যা করুন। একজনকেও ছাড়বেন না।'[24]

আরেক বন্দী যাইদ ইবন আদদিসিনাকে কিনে নেয় সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ।

---

[23] আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১৮৪।

[24] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১।

পিতৃহত্যার প্রতিশোধে সে যাইদকে হত্যা করে। আর-রাযীর মিশনে দশজনের প্রত্যেকে মৃত্যুবরণ করলেন। মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগলো, 'আহারে, এদের ভাগ্যটাই খারাপ! না পারলো তারা পরিবারের সাথে থাকতে, না পারলো যুদ্ধে জিততে! এভাবে মরে গিয়ে লাভ কী?' ইনিয়ে বিনিয়ে এটাই বলতে চাচ্ছিল যে, এই দশজনের জীবন ব্যর্থ! অভিযান তো সফল হলোই না বরং তারা নিজেদের জীবনটাই হারালো। বাড়িতে বসে থাকলেই কাজের কাজ হতো। এই মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করেছেন,

> "এবং মানুষের মধ্যের যারা পার্থিব জীবনের কথাবার্তায় আপনাকে মোহিত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সাক্ষী রাখে, মূলত সে আপনার কঠোর বিরোধী।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ২০৪)

আর সেই দশজনের প্রশংসায় আল্লাহ বললেন,

> "আর অনেকেই রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে নিজের জীবন সমর্পণ করে দেয় এবং আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি দয়াবান।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ২০৭)

এই আয়াতগুলো এই ঘটনার প্রসঙ্গে নাযিল হয়। আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলিমদের শিক্ষা দিচ্ছেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় আসল কথা নয়, আসল কথা হলো এই, তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহই তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

বীর মাউনার হত্যাকাণ্ড

নজদের বনু আমর গোত্রের নেতৃস্থানীয় এক মাথামোটা ব্যক্তির নাম আমীর ইবন আত-তুফাইল। তার না ছিল চিন্তাশক্তি, আর না ছিল সুবুদ্ধি। কিন্তু ঔদ্ধত্য ছিল আকাশছোঁয়া। সে সমগ্র আরবের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। অথচ নিজের গোত্রের নেতাও সে নয়। সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ একবার প্রস্তাব দিল,

'হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি। প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, আপনি এই শহরের রাজা হবেন এবং আমি হবো বেদুইনদের শাসনকর্তা। দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, আপনি আমাকে আপনার মৃত্যুর পর খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করে যাবেন। আর শেষ প্রস্তাব হচ্ছে আমি বনু গাতফানের এক হাজার পুরুষ আর এক হাজার নারী নিয়ে আপনার উপর হামলা করবো।'

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পাত্তাই দেননি। তার একটি প্রস্তাবেও রাজি হননি। এর সূত্র ধরে সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে।

পরবর্তীতে একদিন সেই বনু আমর গোত্রের প্রধান নেতা আবু বারা আমীর ইবন মালিক রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে উপহার নিয়ে আসে। সে বললো, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি নজদের লোকদের মাঝে আপনার সাহাবিদের পাঠান, তাহলে আমার বিশ্বাস তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।' সে নিজে মুসলিম না হলেও ইসলামের প্রতি বেশ আন্তরিক ও আগ্রহী ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নজদে পাঠাতে ভরসা পেলেন না। কারণ তার কিছুদিন আগেই প্রতারণা করে দশ জন সাহাবিকে আর-রাজীতে হত্যা করা হয়েছে। আবু বারা তখন সেই সাহাবিদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ৭০ জন সাহাবি পাঠালেন। এদের বলা হতো আল-ক্বুররা, অর্থাৎ 'কুরআন তিলাওয়াতকারী'। তারা দিনের বেলা কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন আর রাতের বেলা ক্বিয়ামুল লাইলে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এটাই ছিল তাঁদের জীবনযাপনের ধরন। তাদেরকে নজদে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠানো হলো।

আমীর ইবন আত-তুফাইল ছিল গোত্রনেতা আবু বারার ভাতিজা। সাহাবিদের আগমনের খবর শুনে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে তার চাচার কথার বিরুদ্ধে গিয়ে বনু সুলাইম গোত্রের লোকদের নিয়ে সত্তর জন সাহাবির উপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। একশোর উপরে তীরন্দাজ যোগাড় করে সে বি'র মাউনা জলাশয়ের কাছে সাহাবিদের উপর হামলা চালালো। সাহাবিরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য অস্ত্র হাতে লড়াই করলেন। ৭০ জনের মধ্যে এক জন ছাড়া সবাই শহীদ হয়ে গেলেন।

শুধুমাত্র একজন ক্বুরার জীবন বেঁচে গিয়েছিল। তিনি হলেন আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরি। তারা তাকে বন্দী করলেও মুযার গোত্রের হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়। আমীর ইবন তুফাইলের মা শপথ করেছিল যে, সে মুযার গোত্রের এক লোককে মুক্ত করবে। তাই মায়ের শপথ রক্ষার্থে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

এই হত্যাকাণ্ডের খবর রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পৌঁছালে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। সেই সমাজে সত্তর জন সাহাবির মৃত্যু সহজে মেনে নেওয়ার মতো কোনো খবর ছিল না। তারা ছিলেন ইসলামের দাঈ। কিন্তু তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই সত্তর জন সাহাবি যেনতেন কেউ ছিলেন না। তারা কুরআন অধ্যয়ন করতেন। রাতের বেলা একসাথে বসে কুরআন নিয়ে পড়াশোনা করতেন। আর দিনের বেলা মসজিদে পানি নিয়ে আসতেন। কাঠ বিক্রি করে সেই টাকা আহলুস সুফফার জন্য ব্যয় করতেন। তারা ছিলেন সবাই উঁচু পর্যায়ের সাহাবি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ কুনূত পড়া শুরু করলেন। দুআ কুনূত পড়ার এটিই ছিল প্রথম ঘটনা। ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা -- সব ওয়াক্তের সালাতেই তিনি দুআটি পড়লেন। টানা কয়েক মাস ধরে প্রত্যেক সালাতে তিনি তাদের বিরুদ্ধে দুআ করলেন। তিনি দুআ করলেন সুলাইম গোত্রের বিভিন্ন উপগোত্র রা'ইল, যাকওয়ান এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে। তারা এই মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করেছিল এবং তাদেরকে ঠাণ্ডা

মাথায় হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ দুআর ফল তারা পেয়েছিল। শত্রুদের সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে আলোচনা হবে ষষ্ঠ হিজরির অংশে।

শিক্ষা

#১ রাসূলুল্লাহর ﷺ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকৌশল

অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রুকে অপ্রস্তুত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফেলা ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধের একটি নিয়মিত কৌশল। এভাবে তিনি শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দিতেন এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করে দিতেন। বনু আসাদ গোত্র ভাবতেই পারেনি তারা আক্রমণ করার আগে মুসলিমরা তাদের উপর এভাবে প্রচণ্ড হামলা চালাবে। অথচ এরাই কিনা মাত্র উহুদে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। এই আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

#২ গুপ্তহত্যার কারণ

অনেক মানুষ বিশ্বাসই করতে চায় না রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব গুপ্তহত্যার আদেশ দিয়েছেন। আসলে এই ধরনের রাজনৈতিক গুপ্তহত্যাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল অহেতুক রক্তপাত বন্ধ করা। খালিদ ইবন সুফিয়ানের পুরো গোত্রের সাথে যুদ্ধ না করে শুধু তাদের নেতা খালিদকেই হত্যা করা হয়েছিল। তার গোত্রের অন্য লোকেরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যুদ্ধ করতে তেমন আগ্রহী ছিল না। কিন্তু খালিদ ইবন সুফিয়ান ছিল এতটাই শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি যে, তার কথায় বাকিরাও যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হতো। সে ছিল নাটের গুরু, যাবতীয় কলকাঠি সে-ই নাড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার পুরো গোত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। এবং তিনি তা-ই করেছিলেন। ফলে হুযাইল গোত্র যুদ্ধের চিন্তা ছেড়ে দেয়। সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক সময়ে হত্যা করার মাধ্যমে পুরো বিষয়টা মোটামুটি রক্তপাতহীনভাবে সমাধান হয়ে যায়।

#৩ সুন্নাহর প্রতি সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি

খুবায়েব ؓ যখন কুরাইশদের হাতে বন্দী, মৃত্যু তখন তার দরজায় কড়া নাড়ছে। তিনি জানতেন আর কিছুদিন পরেই তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তবুও তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ ছাড়তে চাননি। আর তাই নাভির নিম্নাংশ পরিষ্কার করার জন্য ব্লেড চেয়েছেন। সাহাবিরা কোনো সুন্নাহকে 'ছোটখাটো মনে করতেন না। তারা সব সুন্নাহ পালনে সচেষ্ট ছিলেন।

#৪ 'কাবার রবের শপথ! আমি সফল হয়েছি!'

বি'র মাউনার মিশনে মুসলিমদের আমীর ছিলেন হারাম ইবন মিলহান ؓ। তাকে হঠাৎ করে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি যখন দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, তখন আমীর ইবন আত-তুফাইল তার এক লোককে ইশারায় হত্যার নির্দেশ দেয়। যে লোকটিকে ইশারা করা হয়েছিল তার নাম জাব্বার। জাব্বার হঠাৎ করে হারামের ؓ পিছনে বর্শা

দিয়ে আঘাত করলো, বর্শার ফলা হারাম ইবন মিলহানের বুক ভেদ করে বের হয়ে এল। হারাম ﷺ তখন বলে উঠলেন, 'কাবার রবের শপথ! নিশ্চয়ই আমি সফল হয়েছি!'[25] মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর রক্তাক্ত এক লোক, আর সে কিনা বলছে সে সফল হয়েছে! এ কথার অর্থ কী! ঘটনাস্থলে উপস্থিত সবাই বিস্মিত। তাদের চোখেমুখে অবিশ্বাস! তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না একটা মানুষ মারা যাচ্ছে আর সে বলছে সে সফল!

কথাগুলো হত্যাকারী জাব্বারের জন্য ছিল একটা বিরাট ধাক্কা। সে পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিল। তার মুসলিম হওয়ার কাহিনী সে নিজেই বর্ণনা করেছে, 'আমি তাকে পিছন থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলাম আর সে বলে উঠলো, 'কাবার রবের শপথ! আমি সফল হয়েছি!' আমি খুব অবাক হলাম, এই কথা সে কেন বললো? অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এই কথা দিয়ে সে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে। তারা বললো, তিনি শহীদি মৃত্যু লাভ করেছেন তাই নিজেকে সফল বলছেন। তারা আমার কাছে বুঝিয়ে বললো শহীদ মানে কী। আমি সব শুনে বললাম, সে ঠিকই বলেছে। আসলেই সে সফল হয়েছে।' এই ঘটনার সূত্র ধরেই জাব্বার মুসলিম হয়ে যায়।

হারাম ইবন মিলহান ﷺ ছিলেন একজন শহীদ এবং একই সাথে দাঈ। মৃত্যুর সময় তার বলা কথাগুলোও ছিল ইসলামের দিকে দাওয়াত। মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করে গেছেন। আর তার বলা কথাগুলো অনুধাবন করতে পেরে খোদ তার হত্যাকারীই ইসলাম গ্রহণ করে।

#৫ আবদুল্লাহ ইবন উনাইসের ﷺ সালাত থেকে শিক্ষা

আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ছিলেন একটি গুপ্তহত্যার অপারেশনে। তিনি ভয়ে কাঁপছেন, কিন্তু ঠিকই হেঁটে হেঁটে সালাত আদায় করেছেন। সালাতের ব্যাপারে সাহাবিদের এতটুকু ঢিলেমি ছিল না। সাহাবিদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে সাবধান করতে গিয়ে বলা হলো যে, সেসময়ের একেকটি দিন একেকটি বছরের সমান হবে। তখন তাদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল, এক বছরের সমান দিনে তারা কীভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবেন। একটি দিন কীভাবে এক বছরের সমান হতে পারে, সেই আলোচনা বা কুতর্কে তারা যাওয়ার চেষ্টাই করেননি। অথচ এটাই আমরা সচরাচর করে থাকি। আমরা অতি সামান্য অজুহাতে, অসুস্থতায় সালাত ছেড়ে দিই বা কাযা করি। অথচ আবদুল্লাহ ইবন উনাইস এর চাইতেও শতগুণ কঠিন পরিস্থিতিতে সালাত আদায় করেছেন।

#৬ হাসসান ইবন সাবিতের ﷺ মিডিয়া যুদ্ধ

বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা আমীর ইবন আত-তুফাইলের বিরুদ্ধে হাসসান

---

[25] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ইমারাহ, হাদীস ২১২।

ইবন সাবিত ব্যাপক মিডিয়া ক্যাম্পেইন শুরু করেন। তিনি বি'র মাউনার বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে একের পর এক কবিতা লেখেন। কবিতার মাধ্যমে বনু আমর গোত্রের নেতা আবু বারার ছেলে রাবীয়াহকে ক্ষেপিয়ে তোলেন যেন সে তার চাচাতো ভাই আমীর ইবন তুফাইলের উপর প্রতিশোধ নেয়। কেননা এই আমীর ইবন তুফাইল তার বাবার বিরুদ্ধাচারণ করে মুসলিমদের হত্যা করেছে। পুরো বিষয়টা আবু বারার জন্য বেশ মানহানিকর ছিল। হাসসানের লেখা কবিতা আরবদের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। রাবীয়াহর মর্যাদা প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। কীভাবে সে তার পিতার অপমানে চুপ থাকতে পারে? সে সিদ্ধান্ত নেয় আমীরকে মেরে হত্যা করবে। হত্যার উদ্দেশ্যে সে তরবারি নিয়ে আমীরকে আঘাতও করে। আমীর আহত হয়, তবে বিষয়টা আর বেশিদূর গড়ায়নি। আমীর পরবর্তীতে বাজে ধরনের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। একসময়ে যে আরব জয়ের স্বপ্ন দেখতো, সে আমীর একসময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। প্লেগ সংক্রমণের ভয়ে সবাই তাকে পরিত্যাগ করে। একাকি, ক্লান্ত আর হতাশ আমীর পাগল অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়।

#৭ কষ্ট ছাড়া বিজয় আসে না

আর রাযী এবং বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ড থেকে এটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। উহুদের পরাজয়, এরপর চারপাশে গোত্রের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা, আচমকা হামলার পরিকল্পনা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অনেকগুলো মুসলিম প্রাণের ঝরে যাওয়া -- এগুলো কিছুই সাহাবিদের দমাতে পারেনি। তারা জানতেন, এই ত্যাগ, এই রক্তের মাধ্যমে বিজয় আসবে। সবকিছুরই একটি মূল্য আছে। আর বিজয়েরও মূল্য আছে। তাই ইসলামের ইতিহাসে পরাজয়গুলো হলো মূল্য। আর বিজয়গুলো হলো সেই মূল্যের বিনিময়ে প্রাপ্তি।

কিছু টুকরো ঘটনা

উম্মুল মাসাকীনের সাথে বিয়ে

লোকে তাকে ডাকতো উম্মুল মাসাকীন বা গরীবের মা। তিনি মদীনার গরীব লোকদের খোঁজ খবর রাখতেন, খাওয়াদাওয়া, টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। তার আসল নাম হলো যাইনাব বিনত খুযাইমাহ ﷺ। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বিয়ের আগে যাইনাব ﷺ ছিলেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের ﷺ স্ত্রী। তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিয়ে করে নেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যাইনাব বিনত খুযাইমাহর সংসার স্থায়ী হয় নয় মাস। এরপর যাইনাব মারা যান। তাই তার ব্যাপারে খুব কমই জানা যায়। এই বিয়ের পেছনে রাসূলুল্লাহর ﷺ উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কল্যাণ। উম্মাহর প্রতি আল্লাহর রাসূল সবসময় সহমর্মী ছিলেন। সাহাবিরাও চাইতেন না কোনো মহিলা স্বামী বা পরিবার ছাড়া থাকুক। ইসলামে বহুবিবাহ চালু রাখার পেছনে এটি একটি প্রজ্ঞা।

উম্মু সালামার ﷺ সাথে বিয়ে

উম্মু সালামা ﷺ ছিলেন কুরাইশ বংশের বনু মাখযুম গোত্রের। তার আসল নাম হিন্দ বিনত আবু উমাইয়্যা। ইনি-ই সেই উম্মু সালামা যার কাছ থেকে হিজরতের সময় স্বামী-সন্তানকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সে কাহিনী আগে আলোচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন আবু সালামার স্ত্রী। তারা ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের দম্পতি। দ্বীন ইসলামে আবু সালামার ছিল 'বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার'। খুব অল্প ক'জন সাহাবি প্রথমে হাবাশায় এবং পরে মদীনায় - এই দুই হিজরতের সুযোগ পান। আবু সালামাহ তাদের একজন। তিনি বদরে অংশ নেন, উহুদে আহত হন। উহুদের যুদ্ধে শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষতটি ভালো হয়ে উঠতে শুরু করে। এরপর তিনি বনু আসাদের অভিযানে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু এই অভিযানে সেই ক্ষতস্থান গুরুতর আকার ধারণ করে এবং এতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই দম্পতির মাঝে ছিল চমৎকার ভালোবাসার সম্পর্ক। একটা সময় তারা দু'জন অনেক কষ্টের সময় পার করেছিলেন। হয়তো সে কারণে তাদের মধ্যে গাঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়। কেমন ছিল তাদের ভালোবাসা? একদিন উম্মু সালামা তাঁর স্বামীকে বলেন,

'শোনো, আমি রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছি। যদি কোনো মহিলার স্বামী মারা যায়, আর তখন সে মহিলা যদি আর বিয়ে না করে, আর তার স্বামী যদি জান্নাতে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের দু'জনকে জান্নাতে একত্রিত করবেন। তাই আমি চাই আমি মারা গেলে তুমি আর কোনো বিয়ে করবে না। আর তুমি মারা গেলে আমিও বিয়ে করবো না।'

আবু সালামা ﷺ বললেন, 'আমি তোমাকে যেটা বলি সেটা শুনবে? আমি যদি মারা যাই, তুমি আরেকটা বিয়ে করে নিও।' এরপর তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার চাইতে ভালো কারো সাথে উম্মু সালামার বিয়ে দিও, যে তাকে কষ্ট দিবে না, তার কোনো ক্ষতি করবে না।' যখন আবু সালামাহ মারা গেলেন, তখন উম্মু সালামা বলতেন, 'আবু সালামার চেয়ে ভালো মানুষ আমি আর কোথায় পাবো?' এই মৃত্যুর কিছুদিন পরেই উম্মু সালামার দরজায় কড়া নাড়লো আবু সালামা থেকেও উত্তম একজনের প্রস্তাব। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ।

উম্মে সালামাকে ﷺ বিয়ের জন্য আবু বকরও ﷺ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ প্রস্তাবও উম্মু সালামা ফিরিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রস্তাবে তিনি খুশি মনে রাজি হলেন, কিন্তু বললেন, 'খুবই উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু আমার মধ্যে অনেক ঈর্ষা কাজ করে। তাছাড়া আমার ছোট ছোট সন্তান আছে আর আমার অভিভাবকদের কেউ তো উপস্থিত নেই।' উম্মু সালামা নিজের ব্যক্তিত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে ধারণা দিতে চাইছিলেন। তিনি বলতে চাইছিলেন, তিনি কিছুটা 'অভিমানী' গোছের, তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ অন্য স্ত্রীদের নিয়ে তার মধ্যে ঈর্ষা কাজ করতে পারে। এছাড়া তার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে যাদের দেখাশোনা করা রাসুলুল্লাহর ﷺ জন্য বোঝা হতে পারে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সব শুনে

বললেন, 'তুমি বলেছ তোমার ছেলে মেয়ে রয়েছে, আল্লাহই তাদের দেখাশোনা করবেন। তুমি ঈর্ষার কথা বলেছো, আল্লাহর কাছে আমি দুআ করি তিনি যেন তা দূর করে দেন। আর তোমার ওয়ালিরা অনুপস্থিত হলেও তাদের কেউই আমাকে প্রত্যাখ্যান করতেন না।'

বিয়ের পর উম্মে সালামাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি তোমাকে সে পরিমাণ আসবাবপত্র দেবো যতটুকু যাইনাবকে দিয়েছি। তোমাকে আমি দুটো যাঁতাকল, দুটো মাটির কলস আর একটি পাতা দিয়ে ঠাসা চামড়ার বালিশ দেবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন তখন একটি রাষ্ট্রের অধিপতি। চাইলে বিভিন্ন যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মালের একটা বড় অংশ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারতেন, কারো কিছু বলার থাকতো না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর নবী হিসেবে 'আরামদায়ক জীবনযাপন' তো তারই প্রাপ্য। কিন্তু তিনি একান্তই সাদামাটা, ছিমছাম জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

বিয়ে হলো। কিন্তু উম্ম সালামার ﷺ কোলে তখন আবু সালামার সন্তান বাররাহ। তার নাম পরে বদলে রাখা হয় যাইনাব। বাররাহ তখন দুধের শিশু, তাই নববধূর সাথে রাসূলুল্লাহ একান্তে সময় কাটাতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন লাজুক, মুখ ফুটে বিষয়টা বলতেও পারছিলেন না। বিষয়টি খেয়াল করলেন তাঁরই সাহাবি আম্মার ইবন ইয়াসির। তিনি ছিলেন উম্ম সালামার দুধ ভাই। তিনি বোনের কাছ থেকে বাররাহকে নিয়ে অন্য এক মহিলার কাছে রেখে আসলেন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর সাথে সময় কাটাতে পারেন। রাসূলুল্লাহ যেমন করে সাহাবিদের দিকে খেয়াল রাখতেন, সাহাবিরাও রাসূলুল্লাহর সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ রাখতেন।

এরপর নবীজি উম্ম সালামার সাথে তিন দিন কাটালেন। তিনি ﷺ বলেছেন, 'নতুন স্ত্রী যদি কুমারী হয় তাহলে সাতদিন, আর যদি তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হয়, তাহলে তিন দিন।' অর্থাৎ কেউ যদি একের অধিক বিয়ে করে, তাহলে নতুন স্ত্রী যদি কুমারী হয় তাহলে তার সাথে প্রথমে সাতদিন কাটাবে, আর বিধবা হলে তিনদিন। এরপর থেকে সব স্ত্রীর সাথে পালা করে সমান সময় দিতে হবে।

উম্ম সালামা ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী নারী। তার বুদ্ধিমত্তার ছাপ পাওয়া যায় হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন প্রায় ৩৮৮টি হাদীস। এগুলোর অনেকগুলোই নবীজির ﷺ একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের টুকিটাকি ঘটনা। এগুলো পুরুষ সাহাবিদের জানার কোনো সুযোগ ছিল না। এই বিয়ে ছিল স্বামী-হারা উম্ম সালামার জন্য একটা আশ্রয়স্থল। এই বিয়ের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিচ্ছেন যেন আমরা আমাদের শহীদ ভাইদের পরিবারকে ভুলে না যাই। তাদের দেখাশোনা করি ও দায়িত্ব নিই।

হাসানের ﷺ জন্ম

একই বছর, চতুর্থ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহর ﷺ নাতি হাসান ইবন আলী

ইবন আবি তালিব ﷺ। এই খুশির খবরটি নিয়ে আলী ﷺ নবীজির কাছে গেলেন। নবীজি জানতে চাইলেন তার সন্তানের নাম কী রাখা হয়েছে। আলী ﷺ বললেন, 'হারব', হারব অর্থ যুদ্ধ। রাসূল ﷺ বললেন, 'না! সে হাসান।' নামের অর্থে কাঠিন্য থাকা রাসূল ﷺ পছন্দ করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাতির কানে আজান দিলেন। মেয়ে ফাতিমাকে ﷺ বললেন সন্তানের মাথা মুড়িয়ে দিতে, এরপর মুড়ানো চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সাদাকাহ করে দিতে। পরে আক্বীকার সময় তিনি ﷺ দুটো ভেড়া কুরবানি করলেন।

যাইদ ইবন সাবিতের ﷺ ভাষাশিক্ষা

একই বছরের ঘটনা, রাসুলুল্লাহ ﷺ যায়িদ ইবন সাবিতকে ﷺ ডেকে বললেন, 'যাইদ, তুমি হিব্রু ভাষা শিখে ফেলো। আমি ইহুদিদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।' রাসূল ﷺ যেসব চিঠি পেতেন, অথবা কারো কাছে লিখে পাঠাতেন সেগুলো ইহুদিরা তাকে পড়ে শুনাতো কারণ তাদের পড়াশোনা ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন বিশ্বস্ত মুসলিমকে নিয়োগ দিতে চাইলেন। কারণ ইহুদিদের উপর থেকে তিনি ক্রমেই আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে যায়িদ ﷺ মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে হিব্রু ভাষা রীতিমতো রপ্ত করে ফেললেন!

সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ যে কোনো আদেশে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আরবি ভাষা শিখতে আগ্রহী ভাই বোনদের জন্য নিঃসন্দেহে এই ঘটনা একটা বড় অনুপ্রেরণা। কোনো কাজে পদক্ষেপ নিতে বছরের পর বছর সময় লাগিয়ে দেওয়া উচিত নয়। মুসলিমদের জন্য আরবি ভাষা শেখা অনেক জরুরি। আরবি ভাষা থেকে দূরত্বের কারণে ইসলাম থেকেও মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ইসলামী শরীয়াহর মূল দুটি উৎস, কুরআন এবং হাদীস; দুটোই আরবি। আরবি না জানলে এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন। যদি যায়িদ ﷺ একটি বিদেশী ভাষা ১৫ দিনের মাথায় শিখে ফেলতে পারেন, তাহলে সে ভাষা শেখার ব্যাপারে কী অজুহাত থাকতে পারে যে ভাষা মুসলিমদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়?

বনু নাযিরের যুদ্ধ

কাব ইবন আশরাফের হত্যাকাণ্ড ছিল মদীনার ইহুদিদের জন্য একটা কঠিন সতর্কবার্তা। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। ইহুদিরা সেদিন থেকেই তাদের অবস্থান নিয়ে বেশ ভীত ছিল। এছাড়া তাদের বন্ধুগোত্র বনু কায়নুকাকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উহুদে মুসলিমদের পরাজয়, আর তার কিছুদিন পরেই আর-রাযী এবং বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে তারা কিছুটা আশার আলো দেখতে পায়। তারা মুসলিমদের মনে মনে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। যদিও সরাসরি তারা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু তাদের কাজ বলে দিচ্ছিল তারা মুসলিমদেরকে আর আগের মতো সমীহের চোখে দেখে না।

আর তাই সুযোগ বুঝে একদিন তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যার চেষ্টা চালায়। এই ঘটনার সূত্র ধরেই তারা মদীনাকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়।

সূত্রপাত

বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি উমাইয়্যা আদ-দামরি বি'র মাউনা থেকে মদীনায় ফিরছিলেন। পথেই বনু আমর গোত্রের দুই লোকের সাথে দেখা। এই বনু আমর গোত্রই বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। ৭০ সাহাবিকে হারিয়ে উমাইয়্যা তখন শোকে কাতর। মনের মধ্যে ক্ষোভ দাউদাউ করে জ্বলছে। প্রতিশোধ নেওয়ায় সুযোগ এভাবে সামনে এসে পড়বে ভাবেননি। তিনি বনু আমরের লোক দুটোকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেললেন।

তার মনে হলো তিনি ঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু এটা তার জানা ছিল না যে, এই দুই লোক বনু আমরের হলেও তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। রাসূল ﷺ এ ঘটনা শুনে বললেন, 'তুমি এমন দুই লোককে হত্যা করেছ যাদের জন্য আমাকে রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে।'[26] রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কথার বরখেলাপ করতেন না। ওয়াদা করলে পূরণ করতেন। তিনি রক্তপণ দিলেন। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান লক্ষণীয়, কোনো কাফিরকে হত্যার জন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করা হয় না। উমাইয়্যা ﷺ এমন দুজন লোককে হত্যা করেন যাদের হত্যা করা ছিল বেআইনি। কিন্তু এর শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হয়নি, বরং রক্তপণ শোধ করতে হয়েছে।

রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে ইহুদিদের চুক্তির একটি ধারা অনুযায়ী, রক্তপণ পরিশোধের ব্যাপারে মুসলিম ও ইহুদিরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার ব্যাপারে আইনগতভাবে বাধ্য ছিল। বনু আমরের এই দু'লোককে হত্যা করার পর তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে ইহুদিদের বনু নাযির গোত্রের কাছে গেলেন।

হত্যাচেষ্টা

ইহুদিরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অভ্যর্থনা জানালো, অভিনয় করলো রাসূলুল্লাহর আগমনে তারা খুব খুশি। রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি দেওয়ালের পাশে বসে বললেন, 'বনু আমরের দুই লোককে ভুলক্রমে হত্যা করা হয়েছে। তাদের রক্তপণ পরিশোধের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করছি।' তারা রাজি হবার ভান করলো। টাকা নিয়ে আসার কথা বলে ভেতরে গেল। ভেতরে গিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করলো কীভাবে রাসুলুল্লাহকে ﷺ মেরে ফেলা যায়। একজন বললো, 'এমন সুযোগ আর কক্ষণো পাবো না! উনি আজকে দেওয়ালের ঠিক পাশেই বসেছেন! ছাদে উঠে একটা পাথর ফেললেই খেল খতম! আহ! তারপর সারাজীবনের মুক্তি!'

---

[26] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪।

ইহুদিরা সবসময়ই এমন--মুখে এক আর মনে আরেক। কিন্তু তাদের দুরভিসন্ধির কথা জিবরীল ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানিয়ে দেন। তিনি কাউকে কিছু না বলে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন এবং মদীনায় চলে যান। সাহাবিরা তাঁর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, পরে তারাও মদীনা ফিরে আসলেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন,

> "হে মু'মিনগণ, তোমরা স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর সেই নিআমত, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের ওপর হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রাখলেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।" (সূরা মায়িদা, ৫: ১১)

এর আগেও ইহুদিরা বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। এর আগে তারা আহলুস-সুফফার এক মুসলিমকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তাদের নেতা মূসা ইবন উক্বাহ উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের গোপনে সাহায্য করেছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা মুসলিমদের বদর এবং উহুদে সাহায্য করেনি। উল্টো তাদের নেতা সালাম ইবন মিশকাম মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পরিচালিত একটি সামরিক অভিযানে তাদের স্পর্শকাতর তথ্য দিয়ে সাহায্য করে এবং আবু সুফিয়ানকে আতিথেয়তা করে।

এসব কিছু সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেননি। যদিও এগুলো ছিল মদীনা সনদের লঙ্ঘন। কিন্তু এবারের ষড়যন্ত্র সবকিছুর সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, বরং তারচেয়েও মারাত্মক। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার কঠোর পদক্ষেপ নিলেন। বনু নাযির গোত্রকে দশ দিনের আল্টিমেটাম দেন। তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

> *'আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। তিনি আদেশ করেছেন তোমরা আমার শহর ছেড়ে চলে যাও, কারণ তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছো। আমি তোমাদের চলে যাওয়ার জন্য দশদিন সময় দিচ্ছি। এরপর যদি কাউকে দেখা যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।'*

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাগুলো বনু নাযিরের কাছে পৌঁছে দেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ﷺ। কিছুদিন আগেও জাহিলিয়াতের যুগে এই মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহই ছিলেন বনু নাযির গোত্রের বন্ধু। তারা তাকে দেখে অবাক! 'আমরা ভাবতেই পারিনা যে তুমি আমাদের কাছে এই রকম একটা খবর আনতে পারো।' জবাবে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ বলেন, 'এখন আর সেই দিন নেই। ইসলাম আমাদের বদলে দিয়েছে। অতীতের সমস্ত বন্ধুত্ব আর মিত্রতা বাতিল হয়ে গেছে।' তার কাছে এখন ইসলামই সব। তার সমস্ত আনুগত্য এখন আল্লাহর জন্য। কে আগে বন্ধু ছিল, কে মিত্র ছিল, সেসব দেখার সময় নেই। তারচেয়ে অনেক বড় হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মর্যাদা আর

আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা।

দশ দিন পর...

ইহুদিরা বরাবরের মতোই ছিল কাপুরুষ প্রজাতির। আল্টিমেটাম পেয়ে প্রথমে তারা চলে যেতে রাজি হয়। কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ালো তাদের 'আধ্যাত্মিক ভাই', মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই। সে বললো,

'তোমরা দৃঢ় থাকো! প্রতিরোধ গড়ে তোলো! আমরা তোমাদের সাথেই আছি। তোমাদের আক্রমণ করা হলে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো! তোমাদের বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে চলে যাবো! আমার সাথে আমার গোত্রের ও আরবের অন্যান্য গোত্র থেকে আরও দুহাজার লোক আছে যারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শত্রুরা তোমাদের আক্রমণ করলে তারা তোমাদের জন্য জান দিতে প্রস্তুত!'

লক্ষণীয়, আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইসলাম গ্রহণের আগে ছিল মুশরিক আর বনু নাযির গোত্র হচ্ছে ইহুদি। কিন্তু মুসলিমদের বিরোধিতায় তারা একেবারে গলায় গলায় ভাই হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের আশ্বাস পেয়ে বনু নাযিরের ইহুদিরা কিছুটা সাহস পেল, বলা চলে একরকম ঝোঁকের মাথায় প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

আল্টিমেটামের দশ দিন শেষ। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বনু নাযির গোত্রের দুর্গ অবরোধ করলেন। বনু নাযির গোত্র ততদিনে বেশ ধনী হয়েছে। তাদের নিজেদের দুর্গ আছে। দুর্গের বাইরে প্রচুর আবাদি জমি, বিশাল খেজুরের বাগান। এগুলোর উপরই তাদের জীবিকা নির্ভর করতো। তারা আশা করছিল মুসলিমরা অবরোধ করতে করতে একসময় ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে চলে যাবে। অবরুদ্ধ অবস্থাতেও অনেক দিন টিকে থাকার মতো অবস্থা তাদের ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন এক কৌশল অবলম্বন করলেন যা তাদেরকে পুরোপুরি হতবুদ্ধি করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ তাদের খেজুর বাগানে আগুন লাগিয়ে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে তো তারা আতঙ্কে অস্থির। মদীনাতে তাদের আছেই হলো এই জমি। সেই জমিই যদি আগুনে পুড়ে যায় তাহলে মদীনায় থেকে কী লাভ! এদিকে আবদুল্লাহ ইবন উবাই বনু নাযীরের সাহায্যার্থে একটি আঙুলও তুললো না। বনু নাযীর হতাশ হয়ে গেল।

মরার আগে মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, তেমনি শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়াতে লাগলো, 'এই মুহাম্মাদ লোকটাই তো ফিতনা-ফাসাদ আর বিশৃঙ্খলা করতে নিষেধ করতো! গাছ কাটতে নিষেধ করতো! আর এখন তো সে নিজেই এই কাজ করছে! আমাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলছে, পুড়িয়ে ফেলছে!' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই প্রোপাগান্ডায় কোনো পাত্তা দিলেন না। তারা পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে পড়লো।

বনু নাযির আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুরোধ করলো যেন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা মদীনা ছেড়ে চলে যেতে সম্মত হলো, সহায় সম্পদ নিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হলেন, তবে কয়েকটি শর্ত দিলেন। এক, সাথে কোনো অস্ত্র নেয়া যাবে না। দুই, একটা উটের পিঠে যতটুকু মাল বহন করা যায় শুধু ততটুকু মালামালই নেওয়া যাবে। তিন, প্রতি তিন জনের জন্য একটি করে উট বরাদ্দ।

পুরো ব্যাপারটি দেখভাল করার দায়িত্ব পড়ে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহর ওপর। ইহুদিরা ছিল পয়সার পাগল। একটা উটের পিঠে যে যত পারছে ভরছে। কেউ কেউ তো ঘরের দরজার চৌকাঠ ভেঙে উটের পিঠে তুলে নিল! দেখার মতো দৃশ্য। টাকার কুমীর ইহুদি সাল্লাম ইবন আবি হুক্বাইক ষাঁড়ের চামড়া সোনা রূপা দিয়ে ভরে ফেলে। যাবার সময় আবার দম্ভভরে বলে, 'হুম! এভাবেই আমরা নিজেদের পৃথিবীর যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেছি। এখানে খেজুর বাগান ছেড়ে যাচ্ছি তো কী হয়েছে, খাইবারে গিয়ে আবার তা ফিরে পাবো।'

হেরে গিয়েও কত গর্ব, কত ভান! কিছুই যেন হয়নি। ইহুদি গোত্রগুলোর চোখে বনু নাযির অনেক সম্মানিত গোত্র, সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত। তারা চাচ্ছিল তাদের এ লজ্জাজনক নির্বাসনে কেউ তাদের নিয়ে হাসাহাসি না করুক। মুসলিমরা যেন তাদের এই পলায়ন উপভোগ করতে না পারে এজন্য তারা তাদের বহরের পেছনে গায়িকাদের দিয়ে গান-বাজনা করাতে করাতে ভেগে গেল।

কাপুরুষ পরাজিত বনু নাযির গোত্রের একটি অংশ চলে গেল শামে, আরেকটি অংশ গেল খাইবারে। খাইবারে তাদের বরণ করা হয় বীরের মতো করে। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে মহিলা আর কমবয়সী বাচ্চারা নেমে আসে। উপহার দিয়ে, খঞ্জনী আর বাঁশি বাজিয়ে, নেচে-গেয়ে গর্ব আর অহংকারের সাথে তাদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়। সে যুগে আর কোনো পরাজিত গোত্রকে এভাবে সংবর্ধনা দেওয়ার দৃষ্টান্ত নেই।

শিক্ষা

#১ কাফিরদের মনে ত্রাস

এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে একটি পুরো সূরা নাযিল হয়েছিল যার নাম সূরা হাশর। ইবন আব্বাস ﷺ একে 'বনু নাযিরের' সূরা বলেও অভিহিত করতেন।

> "আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তিনিই তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন প্রথমবারের মতো। তোমরা ধারণাও করোনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর আযাব এমন এক দিক থেকে আসলো যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এবং তিনি

তাদের অন্তরসমূহে ত্রাসের সঞ্চার করলেন, ফলে তারা তাদের বাড়ী-ঘর আপন হাতে ও মু'মিনদের হাতে ধ্বংস করতে শুরু করল। অতএব হে দৃষ্টিমান লোকেরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" (সূরা হাশর, ৫৯: ২)

কি মুসলিম কি ইহুদি, কোনো পক্ষই আশা করেনি ইহুদিরা চলে যেতে বাধ্য হবে। মুসলিমরা ভেবেছিল ইহুদিরা অনেক শক্তিশালী, ইহুদিরাও ভেবেছিল মুসলিমরা তাদের হারাতে পারবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলিমরাই জয়ী হয় আর তা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে। আল্লাহ তাদের বহিষ্কার করে দেন।

কোনো বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাদের দুর্বলতা থাকবেই. আর কার দুর্বলতা কোথায় তা আল্লাহ তাআলা ভালোই জানেন। কোনো জাতি যদি নিজেদের খুব শক্তিশালী কিছু মনে করে, যদি মনে করে যে আমাদের কাছে পারমাণবিক শক্তি আছে, সবার চেয়ে বেশি মারণাস্ত্র আছে, আল্লাহ তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন -- আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। আল্লাহ তাদের এমন এক দুর্বল দিকে আঘাত করবেন যা তারা কল্পনাও করে না। আল্লাহ তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবেন।

একবার যখন মনে ভয় ঢুকে যায়, তখন অস্ত্রশস্ত্র বা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা কিছুই কাজে আসে না। ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, 'রোমান ও পারসিকদের ছিল শক্তিশালী দৈহিক গঠন। সংখ্যায় তারা ছিল অধিক। মুসলিমদের চাইতে তাদের ছিল অনেক বেশি অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু তাদের ছিল না মনোবল। একারণে তারা হেরে যেত। আর যুদ্ধে জিততে মনোবলই সবচে বেশি দরকার।' সাহাবিদের অন্তরে ছিল ঈমান। এই ঈমান তাদের আল্লাহর পথে অটল-অবিচল রেখেছিল। আর আল্লাহর শত্রুদের মনে ছিল দুনিয়াপ্রীতি, আর একারণেই তারা হেরে গিয়েছিল।

#২ জিহাদের নিয়মে ব্যতিক্রম

"তোমরা যে সব নতুন খেজুর গাছ কেটে ফেলছ অথবা সেগুলোকে তাদের মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ। তা তো ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি ফাসিকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন।" (সূরা হাশর, ৫৯: ৫)

ইসলামে গাছ কাটা নিষেধ, তবুও কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছ কাটার আদেশ দিয়েছিলেন? অথচ তিনি নিজেই এই কাজ করতে নিষেধ করতেন। বিষয়টা নিয়ে ইহুদিরা বেশ জল ঘোলা করার চেষ্টা করে। এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমত, এটি করা হয়েছিল আল্লাহর অনুমতিতে। কিন্তু কেন? আল্লাহই তা ব্যাখ্যা করছেন। তা এজন্য যে, 'আল্লাহ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, যুদ্ধের সময় গাছপালা কাটা যাবে না, মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ লোকদেরকে হত্যা করে যাবে না, আশ্রমে বসবাসরত সন্ন্যাসীদের হত্যা করা যাবে না। কিন্তু এই বিধানগুলির প্রত্যেকটিরই ব্যতিক্রম আমরা আল্লাহর রাসূলের জীবনে দেখি। যেমন, বনু নাযিরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর গাছ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাইফের অভিযানে

রাতের বেলা কাফিরদের বাসায় আক্রমণ করা এবং তাদের অধিবাসীদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। এটা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার দু'জন মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এদের একজন ছিল এক ইহুদি মহিলা। সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। সালাহউদ্দীন আইয়ুবি رحمه الله ক্রুসেডারদের প্রতি বেশ সহনশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি শত্রুপক্ষের কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি যেমন টেম্পলারদের (যারা মূলত ছিল ধর্মযোদ্ধা) ছেড়ে দিতেন না। তাদের তিনি হত্যা করতেন, গীর্জার পুরোহিত হলেও হত্যা করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি শরীয়াহ লঙ্ঘিত হচ্ছে না? এই বৈপরীত্যের জবাব কী?

ইসলাম সহনশীলতার দ্বীন। কিন্তু এই সহনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে শত্রুরা সুবিধা নেবে এবং মুসলিমদের ক্ষতি করবে -- সেই অনুমতি ইসলাম দেয় না। ইসলামী জিহাদের কিছু নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু শত্রুরা যখন জিহাদের কোনো নীতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে সুবিধা নিতে চায়, তখন সেসব নীতি স্থগিত রাখা হয়। শত্রুরা যদি জিহাদের কোনো নীতি ব্যবহার করে পুরো জিহাদকে থামিয়ে দিতে চায় বা জিহাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তাহলে পরিস্থিতির বিচারে মুসলিমদের জন্য সেসব নীতিকে স্থগিত করার অনুমতি রয়েছে।

যেমন, সাধারণভাবে গাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও উপরোক্ত পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছগুলিকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ গাছ না কাটার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইহুদিরা নিরাপদে টিকে থাকার সুযোগ পাচ্ছিল। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ রেখেও তাদের বাগে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। অন্যদিকে তারা যে অপরাধ করেছিল, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যার ষড়যন্ত্র -- সে কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই ইসলামের বিধান মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ ইহুদিদের দেওয়া হয়নি। এটি ছিল সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম।

#৩ নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন

> "আল্লাহ তাদের (ইহুদিদের) নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফাই হিসেবে যা দিয়েছেন তোমরা তার জন্য কোন ঘোড়া বা উটে আরোহণ করে অভিযান পরিচালনা করনি। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যাদের ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আল্লাহ সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" (সূরা হাশর ৫৯: ৬)

যুদ্ধের পর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব মালামাল লাভ করে, সেগুলোকে বলা হয় গনিমাহ'। আর কাফিরদের যে সম্পদ তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই মুসলিমরা লাভ করে সেটাকে বলা হয় 'ফাই'। বদর যুদ্ধে মুসলিমরা 'গনিমাহ' লাভ করেছিল আর বনু নাযিরের অবরোধের পর মুসলিমরা লাভ করে 'ফাই'। কারণ বনু নাযিরের সাথে কোনো যুদ্ধ হয়নি। অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়াই মুসলিমরা এসব সম্পদ লাভ করেছে। এই সম্পদের ব্যাপারে কী করা হবে তা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। পাঁচ

ভাগের চার ভাগ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার যে নীতি -- সেটি ছিল গনিমাহ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বনু নাযিরের ফেলে যাওয়া এই সম্পদগুলো আল্লাহর রাসূলের হাতে এল। এগুলোর মাঝে ছিল খেজুর বাগান আর ক্ষেতখামার। এগুলো তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যায়। এগুলো থেকে তিনি ইচ্ছামতো ব্যয় করার অধিকার রাখেন। যদিও তিনি সমস্ত সম্পত্তি নিজের কাজে ব্যবহার করেননি। যখন সুযোগ পেয়েছেন গরীব এবং অভাবিদেরকে সাহায্য করেছেন। বনু নাযিরের যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের ডেকে একটা প্রস্তাব দিলেন,

'যদি তোমরা চাও তাহলে আমি এই সম্পত্তি তোমাদের সবার মাঝে বণ্টন করে দেবো। সেক্ষেত্রে মুহাজিররা তোমাদের বাড়ি ঘরেই থেকে যাবে এবং তোমাদের ক্ষেত খামারে কাজ চালিয়ে যাবে। আর তোমরা যদি চাও তাহলে এই সম্পত্তিগুলো শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেবো। সেক্ষেত্রে তারা তোমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এবং তোমাদের শস্যের কোনো ভাগ নেবে না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন আনসারদের উপর কষ্ট কিছুটা লাঘব হোক। আনসারদের দুই নেতা সাদ ইবন মুআয এবং সাদ ইবন উবাদা এই প্রস্তাব শুনে বললেন, 'আমরা চাই তারা বরং আমাদের সাথেই থাকুক। আর অর্থসম্পদ যা আছে সেসবও তাদেরকেই দিয়ে দিন।'

কীভাবে পারে মানুষ এতটা উদার হতে? এত বড় মনের মানুষ হতে? নিঃসন্দেহে এই মানুষগুলো ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব! সত্যিকার দয়া, মহত্ত্ব, ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন তারাই।

মুহাজিররা আনসারদের ঘর ছেড়ে বনু নাযিরের ঘরগুলোতে বসবাস করতে শুরু করেন। বনু নাযিরের ক্ষেত খামারগুলো শুধু মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। আনসারদের থেকে শুধু দু'জন কিছু ভাগ পেয়েছিলেন-- আবু দুজানা ﷺ ও সাহল ইবন হানিফ ﷺ। কারণ তারা ছিলেন দরিদ্র। বনু নাযিরের এই সম্পদের মালিকানা ছিল রাসূলুল্লাহর একার। কিন্তু তবু তিনি এগুলো ভাগাভাগি করার সময় আনসারদের ডেকে আলোচনা করেন যেন তারা সম্মানিত বোধ করে এবং বুঝতে পারেন যে, তারা আল্লাহর রাসূলের আপনজন।

ইবনে কাসির ﵀ বলেন, 'এই যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সম্পদ লাভ করেন। এ থেকে তিনি তার পরিবারের সারাবছরের খরচ দিতেন। এরপর যা থেকে যেত, সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে সামরিক খাতে ব্যয় করতেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবন শুরু করেছিলেন একজন মেষ পালক হিসেবে। এরপর তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। যখন নবী হলেন, তখন অন্যান্য কাজ বন্ধ করে দাওয়াহর জন্য তাঁর সমস্ত সময় ব্যয়

করেন। খাদিজা ﷺ এবং চাচা আবু তালিবের অর্থের উপরেই নির্ভর করতেন। মদীনায় আসার পর আনসারদের দেওয়া হাদিয়ার উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বনু নাযিরের যুদ্ধ থেকে অর্থ পাওয়ার পর তা থেকে এক বছর পরিবারের খরচ চালানোর জন্য অর্থ নিলেন এবং বাকি অংশ কোষাগারে ব্যয় করেন। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ দান করার মতো কিছু অর্থ পেলেন।

#8 মুনাফিক্বরা হলো মিথ্যাবাদী আর কাফিররা হলো কাপুরুষ

> "তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি যারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কাফির ভাইদেরকে বলে, তোমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্য বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা হাশর, ৫৯: ১২)

কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুনাফিক্ব ও ইহুদিদেরকে 'ভাই' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই মুনাফিক্বরা ছিল মিথ্যাবাদী। ইহুদিদের কাছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেকোনো পরিস্থিতিতেই তারা তাদের পাশে থাকবে। কিন্তু সে ওয়াদা তারা পূরণ করেনি। আল্লাহ বলছেন, এই মুনাফিক্বরা কখনোই তাদের সাহায্য করতো না। এগুলো সবই তাদের মুখের কথা। আর যদি সাহায্য করতো, তবু তারা পালিয়ে যেত। এটাই মুনাফিক্বদের আসল চরিত্র। তারা কাফিরদের পক্ষে থাকে, তাদের থেকে সাহায্য কামনা করে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

> "প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদেরই ভয় বেশি; এটা এই জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। তারা সম্মিলিতিভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, (যদি করেও, সেটা তারা করবে) কোনো সুরক্ষিত জনপদের ভেতরে বসে অথবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরাল থেকে। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছো, অথচ তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন। এটা এই জন্যে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।" (সূরা হাশর, ৫৯: ১৩-১৪)

কাপুরুষতা কাফির সেনাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুরক্ষিত অবস্থা ছাড়া তারা যুদ্ধ করে না। তাদের এই চারিত্রিক দিকটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে দেখা যায় যে, তারা দুর্গের ভেতরে নিজেদের সুরক্ষিত রেখে যুদ্ধ করতো। ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ও তাই। সিরিয়াতে ক্রুসেডারদের বানানো কিছু দুর্গ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। স্থাপত্যশৈলির বিচারে সেগুলো খুবই চমৎকার। এই দুর্গগুলোর ভেতরে থেকে তারা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো। আসলে এই দুর্গগুলো তাদের অন্তরের ভীতির নিদর্শন। বর্তমান সময়েও আল্লাহর দুশমনরা ফিলিস্তিনে প্রাচীর বানিয়ে রেখেছে। এটি তাদের ভয়েরই এক প্রতিচ্ছবি। এই প্রাচীর কুরআনের আয়াতকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় -- সুরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করতে আসবে না।

আল্লাহ্ বলছেন, 'তাদের অন্তর শতধা বিভক্ত।' কাফির, মুশরিক, মুনাফিকের দল যদিও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। ইউরোপের মানচিত্রে ছোট্ট একটু জায়গায় অনেকগুলো দেশের উপস্থিতি তাদের অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ইঙ্গিত দেয়। বিশ্বযুদ্ধ অথবা অন্যান্য যুদ্ধগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তারা নিজেরা মোটেও এক জাতি নয়। কিন্তু যখনই ইসলামের ব্যাপার আসে, তখনই তারা সবাই এক হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাদের মাঝেও কোন্দল রয়েছে।

সবশেষে আল্লাহ্ তাআলা বনু নাযিরকে তুলনা করেছেন তাদের পূর্বসূরি বনু কায়নুকার সাথে। তাদেরকেও একইভাবে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা ইহুদিদের প্রতি মুনাফিকদের অঙ্গীকারকে তুলনা করেছেন আদম সন্তানের প্রতি করা শয়তানের অঙ্গীকারের সাথে।

> "এদের অবস্থা সেই আগের লোকদের মতো, যারা মাত্র কিছুদিন আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম (হিসেবে বিতাড়িত হবার) শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি।" (সূরা হাশর, ৫৯: ১৬-১৭)

#৫ ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না

জাহিলিয়াতের সময় মদীনার আরবদের মাঝে একটি কুসংস্কার ছিল, কারো সন্তান যদি জন্মের পর না বাঁচে, তখন পরবর্তী সন্তানকে ইহুদি বানালে তার সন্তানরা বেঁচে থাকবে। এভাবে তাদের অনেকের সন্তানই ইহুদি হিসেবে বড় হচ্ছিল। যখন বনু নাযির গোত্রকে বহিষ্কার করা হলো তখন কিছু লোকজন রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কিছু সন্তান ও ভাই তো তাদের সাথে রয়েছে। আমরা এখন কী করবো?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে ওয়াহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত কোনো জবাব দিলেন না। অবতীর্ণ হলো সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াত। সেখানে বলা হয়েছে, দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। সত্যের পথ আর মিথ্যার পথ- দুটোই পরিষ্কার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'তোমাদের ভাই ও সন্তানদের যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে বলো। তারা যদি তোমাদের পছন্দ করে তাহলে তোমাদের সাথে থাকবে। আর যদি তারা ইহুদিদের সাথে থাকতে চায়, তাহলে তাদের চলে যেতে দাও।' অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না।

যাত আর-রিক্বার যুদ্ধ

উহুদে পরাজয়ের পর মদীনার ভেতরে ইহুদিরা এবং মদীনার বাইরে নজদের গোত্রগুলো বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বনু নাযিরকে শায়েস্তা করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এরপর তিনি মনোযোগ দেন নজদের গোত্রগুলোর দিকে। আরবের শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করাটা ছিল সময়ের দাবি। যাতুর রিক্বা অভিযান সে উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছে। নজদের গোত্রগুলো এরই মাঝে মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতা করেছে। ৭০ জন সাহাবিকে হত্যা করেছিল নজদেরই একটি গোত্র। এর জবাবে আল্লাহর রাসূল ৪০০ সাহাবিকে সাথে নিয়ে অভিযানে বের হন, টার্গেট গাতফানের দুটো গোত্র: বনু মুহারিব এবং বনু সালাবা। এই অভিযানই ইতিহাসে যাতুর রিক্বা নামে পরিচিত। রিক্বা মানে কাপড়ের টুকরো। এই অভিযানকে কেন যাতুর রিক্বা বলা হয় -- সে জবাব দিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া এক যোদ্ধা আবু মূসা আল-আশআরি ﷺ। অভিযানের বর্ণনায় তিনি বলেন,

'আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে একটি অভিযানে বের হলাম। প্রতি ৬ জনের জন্য বরাদ্দ হলো একটি করে উট। পালা করে একজন উটের পিঠে চড়ছি, বাকিরা পায়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে পা'গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, চামড়ায় ফোসকা পড়ে যাচ্ছে। আমার তো নখই খসে পড়ল। আর তাই আমরা আমাদের পায়ে কাপড়ের টুকরো বেঁধে নিলাম। এ জন্যই অভিযানের নাম হলো যাত আর-রিক্বা--কাপড়ের টুকরোর অভিযান।'

সালাতুল খওফ

এই যুদ্ধে কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো না। শত্রুরা মুসলিমদের হঠাৎ আক্রমণে ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে আশেপাশের পাহাড়ে পালিয়ে গেল। তাদের নারী-শিশু আর গরুবাছুর পর্যন্ত রেখে গেল। কিন্তু তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তারা হয়তো কাছেই আছে, যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন এক পন্থায় জামাতের সালাত আদায় করলেন।

> "এবং আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন ও তাদের নিয়ে নামায পড়বেন, তখন একদল যেন আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে; অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান করে, আর অপর এক দল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা তোমাদের সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসীরা কামনা করে যেন তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় বা তোমাদের অসুখ হয় আর তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা, ৪: ১০২)

এই সালাতের নিয়ম হলো, প্রথমে অর্ধেক সৈন্য ইমামের পেছনে সালাত আদায় করবে আর বাকিরা পাহারা দেবে। প্রথম রাকাতের পর ইমাম দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, প্রথম দল তখন নিজেরা দ্বিতীয় রাকাত পড়ে সালাত শেষ করবে। এরপর দ্বিতীয় দল এগিয়ে আসবে, ইমামের দ্বিতীয় রাকাতের সাথে নিজেরা প্রথম রাকাত পড়বে। ইমাম বসা অবস্থায় তারা নিজেরা দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাত শেষ করবে। এটা নিয়ে ভিন্ন মতও আছে। এই সালাতের নাম হলো সালাতুল খাওফ।

তবে এই আলোচনায় দেখার বিষয় হলো সালাতুল খাওফের ফিক্বহ নয়, বরং সালাতের গুরুত্ব। সালাতের গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, শত্রুর সীমানায় জীবন-মরণ অবস্থাতেও সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় যারা যুদ্ধ করছেন, তাদের জন্যই যদি এই বিধান হয় তাহলে যারা নিরাপদে আছে তাদের জন্য কী করণীয় হতে পারে? তবুও কিছু মানুষ সালাতকে বুড়ো আঙুল দেখায়। ইসলামে প্রতিটি ইবাদাহর ক্ষেত্রেই শর্ত থাকে, যেমন, গরীবদের যাকাত আদায় করতে হয় না, হজ্জ পালন করতে হয় না, এখানে সম্পদ থাকা হলো শর্ত। অসুস্থ-দুর্বলদের সাওম পালন না করলেও চলে, এখানে স্বাস্থ্য হলো শর্ত। কিন্তু সালাতের ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই, একজন মুসলিমকে সালাত আদায় করতেই হবে। যদি দাঁড়াতে না পারে তবে বসে, বসতে না পারলে শুয়ে মাথা নেড়ে। মাথা নাড়াতে না পারলে আঙুলের ইশারায়। আঙুল নাড়াতে অক্ষম হলে চোখের ইশারায় হলেও আদায় করতে হবে -- সালাতের কোনো মাফ নেই। সাহাবিদের জিহাদী অভিযানগুলো আমাদেরকে সালাতের গুরুত্বও শিক্ষা দেয়।

কুরআনের প্রতি ভালোবাসা: আব্বাদ ইবন বিশর ﵁

সে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আম্মার ইবন ইয়াসির ﵁ ও আব্বাদ ইবন বিশরকে ﵁ প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। দুজন পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছেন। আম্মারের ঘুমের পালা এল, আব্বাদ ﵁ বসে না থেকে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিরআত পাঠ করছেন, এমন সময় শত্রুর একটি তীর এসে বিঁধলো। মুহূর্তের মধ্যে গলগল করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। কিন্তু সেদিকে আব্বাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই! তিলাওয়াত করছেন তো করছেন। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে তাঁর কিরআতের সুর।

শত্রু আবারও আঘাত হানল। গায়ে বিঁধলো আরেকটি তীর, এরপর আরও একটি। তিন নম্বর তীর বিদ্ধ হওয়ার পর আম্মারকে ﵁ ঘুম থেকে ডাকলেন। আম্মার উঠে দেখলেন আব্বাদের ﵁ শরীর রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

- সুবহানাল্লাহ! আপনি এতক্ষণ আমাকে ঘুম থেকে ডাকলেন না কেন?
- সূরাটা শেষ না করে তিলাওয়াত থামাতে চাচ্ছিলাম না। আল্লাহর কসম, আজ যদি

পাহারার দায়িত্বে না থাকতাম, তাহলে সূরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিলাওয়াত চালিয়ে যেতাম, মৃত্যু হলেও পরোয়া করতাম না।'

কুরআনের প্রতি সাহাবিদের এ এক অদ্ভুত রকমের ভালোবাসা! একটা মানুষকে একের পর এক তীর বিদ্ধ করে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে তিলাওয়াতে। আবার তিলাওয়াতে বিভোর হয়েও মানুষটা তাঁর দায়িত্ব ভোলেনি, পাহারা দেওয়ার কথা তাঁর ঠিক মনে ছিল। এভাবেই সাহাবিরা তাদের দায়িত্বের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বন্ধু: একজন তরুণ সাহাবির সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথোপকথন

জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন শহীদের সন্তান। তার বাবা উহুদের শহীদ। এই অভিযানে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তাঁর অনেক সময় একসাথে কাটানোর সুযোগ হয়। ঘটনাটি জাবিরের মুখে শোনা যাক[27]:

'যাত আর-রিক্বার অভিযানে বেরিয়েছি একটা দুবলা পাতলা উট নিয়ে। বাকিরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমি পেছনে পড়ে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাক দিলেন,

- জাবির! কী হলো?

- উটটার কারণে বারবার পেছনে পড়ে যাচ্ছি রাসূলুল্লাহ।

- আচ্ছা তুমি উটটাকে বসাও তো। আর তোমার হাতের ছড়িটা আমাকে দাও নয়তো একটা ডাল ভেঙে আনো।

আমি হাতের ছড়িটা এগিয়ে দিলাম। তিনি ছড়ি দিয়ে উটকে কয়েকটা খোঁচা দিয়ে বললেন, উঠে পড়ো। উটের পিঠে উঠলাম, অবাক হয়ে দেখি আমার উট রীতিমতো দৌড়াচ্ছে! রাসূলুল্লাহর উটের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে!

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে গল্প করতে করতে চলছি, হঠাৎ তিনি বললেন,

- জাবির, তোমার উটটা আমার কাছে বিক্রি করবে?

- নাহ, আমি আপনাকে এমনিই এটা দিয়ে দেবো, উপহার হিসেবে।

- না, না, আমি কিনতে চাই।

- আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কত দেবেন?

- এক দিরহাম দিলে হবে? রাসূলুল্লাহ রসিকতা করলেন।

- নাহ! তাহলে তো আমি ঠকে যাবো।

- ঠিক আছে তাহলে দুই দিরহাম দিলে চলবে?

---

[27] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৬।

- না, না, আরও চাই!

রাসূলুল্লাহ উটের দাম বাড়াতে লাগলেন, দাম এক উকিয়ায় (চল্লিশ দিরহাম) গিয়ে ঠেকলো। রাজি হয়ে গেলাম, বললাম,

- আপনি এই দামে খুশি তো?

- হ্যাঁ।

- ঠিক আছে এই উটের মালিক এখন আপনি!

রাসূলুল্লাহর ﷺ মধ্যে নেতাসুলভ মেকি গাম্ভীর্য ছিল না। তরুণ সাহাবিদের সাথে বন্ধুর মতো মিশে যেতেন। জাবিরকে জিজ্ঞেস করলেন তার বিয়ের কথা।

- আচ্ছা জাবির, তুমি কি বিবাহিত?

- হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ, বিয়ে করেছি।

- কুমারী?

- না।

- কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তো তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে পারতে, সেও পারত।

- আসলে, আমার বাবা সাত মেয়ে রেখে মারা গেছেন। তাদের দেখাশোনার জন্য অভিজ্ঞ মানুষ প্রয়োজন। তাই বয়স্ক একজনকে বিয়ে করেছি।

- ইনশা আল্লাহ, আমার মনে হয় তুমি ঠিক কাজই করেছো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জাবিরের ওয়ালিমার আয়োজন করতে চাইলেন। বললেন, 'শোনো জাবির, আমরা যদি সিরারে পৌঁছতে পারি, তাহলে কিছু উট জবাই করবো। রাতটা সেখানেই কাটাবো। তোমরা আমাদের জন্য বালিশের ব্যবস্থা কোরো। জাবির বললেন, আমাদের তো বালিশই নেই আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ অভয় দিলেন, চিন্তা কোরো না, এখন না থাকলেও তখন থাকবে।'

সিরারে সেদিন জাবিরের বিয়ে উপলক্ষে উট জবাই করা হলো। রাসূলুল্লাহ জাবিরকে স্ত্রীর সাথে রাত কাটাতে বললেন। পরদিন সকালের কথা। জাবির বলেন,

'পরদিন সকালে সেই উটটা নিয়ে বের হলাম। রাসূলুল্লাহর ঘরের দরজার সামনে উটটাকে বেঁধে রেখে আসলাম। উটের উপর চোখ পড়তেই আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে চাইলেন,

- এটা কার উট?

- জাবির এই উট আপনার জন্য নিয়ে এসেছে। উপস্থিত সাহাবিরা জবাব দিল।

- জাবিরকে ডেকে পাঠাও।

আমি গেলাম। আমাকে বললেন, ভাতিজা শোনো, এই উট নিয়ে যাও, তোমার উট তোমারই থাকবে। বিলালকে ডেকে বললেন, যাও, জাবিরকে এক উকিয়া স্বর্ণ দিয়ে আসো। আমি বিলালের সাথে গেলাম। তিনি আমাকে এক উকিয়া স্বর্ণ থেকেও কিছুটা বেশি দিলেন। আল্লাহর কসম! এরপর থেকে আমার আর্থিক অবস্থা ক্রমেই ভালো হতে থাকে, যতদিন না আমাদের উপর ইয়াউম আল হাররার দুর্দশা আপতিত হয়।'[28]

আসলে কিছু মানুষ দান করার সময় বুঝতেও দেয় না যে তারা দান করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন জাবিরকে সাহায্য করতে। উট কেনার কথা, দরদাম করা এসব ছিল বাহানা মাত্র। সাহাবিদের জন্য তাঁর মমতা পৃথিবীর কোনো দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা যাবে না। তিনি তাদের ভালো-মন্দের খেয়াল রাখতেন, নিজে না খেয়ে তাদের খাওয়াতেন। মানুষকে আপন করে নেওয়ার এক অদ্ভুত গুণ নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। সাহাবিদের সাথে ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এমন একজন মানুষ যার কাছে মনের সব কথা খুলে বলা যায় -- নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে!

বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ: বদর আল-মাউইদ

বদর হয়েছিল হিজরী ২য় বর্ষে, আর উহুদের যুদ্ধ ৩য় বর্ষে। এর রেশ ধরে হিজরী চতুর্থ বছরে কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান মুসলিমদের তৃতীয়বারের মতো চ্যালেঞ্জ করে। সে দুই হাজার সৈন্যের শক্তিশালী একটি দল নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু কিছু পথ যাওয়ার পর সে মন পরিবর্তন করে। সবার উদ্দেশে বলে, 'আমার মতে, স্বচ্ছলতার বছর ছাড়া যুদ্ধে অংশ নেওয়া সমীচীন হবে না। বরং যে বছর তৃপ্তির সাথে পশুদের ভালো ঘাসপাতা খাওয়াতে পারবে এবং নিজেরা ইচ্ছেমতো দুধপান করতে পারবে, সে বছরই যুদ্ধ করা ভালো হবে। এবার শুষ্ক মৌসুম। আমি ফিরে যাচ্ছি, তোমরাও ফিরে চলো।' হতে পারে এ কথাগুলো আবু সুফিয়ানের অজুহাত মাত্র। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে কুরাইশরা এর আগেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। হয়তো ঝোঁকের বশে সে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে কিন্তু পরে বুঝতে পারছে খুব একটা সুবিধা করা যাবে না।

কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ দৃঢ়তায় কোনো ফাটল ধরেনি। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত জায়গায় দেড় হাজার মুজাহিদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে আট দিন অবস্থান করলেন। ওদিকে কুরাইশদের দেখা নেই। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর সাথে দেখা হলো বনু দামরা গোত্রের মুখশীর সাথে। ইতিপূর্বে এই গোত্রের সাথে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি ছিল। মুখশী রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কি

[28] ইয়াউম আল হাররা অনেক দিন পরের একটি ঘটনা। এটি ছিল মদীনাবাসীর একটি দুর্যোগের দিন, সেদিন অনেকে নিহত হয়। মুসলিমদের অন্তর্কোন্দলের এ ঘটনাটি ঘটে হিজরী ৬৩ সালে।

কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যই এখানে এসেছেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা সেজন্যই এসেছি। আর তোমরা যদি চাও তাহলে আমাদের সাথে যে চুক্তি ছিল তা প্রত্যাহার করতে পারো। সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন।' মুখশী জবাব দিল, সে বললো, 'নাহ, এমন কিছু করার কোনো প্রয়োজন দেখি না।'[29]

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাগুলো বলে মুখশীকে সূক্ষ্ম একটি ইঙ্গিত দিচ্ছেন; আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি, সেই শক্তি আমাদের ভালোই আছে। চুক্তির সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে তোমাদের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের নেই।

বর্তমান সময়ে চিত্রটা উল্টো। মুসলিমরা এখন বিপাকে পড়ে শান্তিচুক্তি করে আর শান্তিচুক্তির নামে যা হয় তা লাঞ্ছনা আর অবমাননার চুক্তি ছাড়া কিছুই না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো সাথে চুক্তি করতেন সেটা প্রতিপক্ষের চাপে করতেন না। মুসলিমরা দুর্বল বলে শান্তিচুক্তি করতেন এমন হতো না। মুসলিমরা শক্তিশালী -- তা তিনি পরিষ্কার করেই অপর পক্ষকে বুঝিয়ে দেন।

দুমাতুল জান্দাল

বনু আসাদ ও গাতফান গোত্র থেকে আরও উত্তরে, গাসাসিনাহ সীমানার কাছেই কুদাআহ গোত্র। এই কুদাআহ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান হলো দুমাতুল জান্দাল। এরা মূলত রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রভাববলয়ভুক্ত একটি গোত্র। অভিযানের নাম দুমাতুল জান্দাল হওয়ার কারণ হলো সেখানে এই নামে একটি বিখ্যাত বাজার ছিল। তাদের এলাকাটি ছিল মদীনা থেকে প্রায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার উত্তরে।

অন্য গোত্রগুলোর মতো এই গোত্রের পক্ষ থেকেও মদীনা আক্রমণের আশু কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কিংবা তারা সেভাবে মুসলিমদের প্রতি বৈরী আচরণ করেনি। তবু সাড়ে চারশো কিলোমিটারের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কেন তাদের দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযান পরিচালনা করলেন? এর বেশ কিছু কারণ আছে:

#এক, কুদাআহ গোত্রটি তাদের সীমানা ঘেঁষে যাওয়া যেকোনো কাফেলাকে আক্রমণ করতো। মুসলিমদের কোনো কাফেলা বা মুসলিমদের কাছ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কোনো কাফেলা তাদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অর্থ হলো মুসলিমদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া। একটি বিশ্বজনীন আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে মানুষের মন থেকে নিরাপত্তাহীনতার বোধটুকু নিশ্চিহ্ন করা জরুরি ছিল। সেই সাথে বাণিজ্যিক পথগুলোকে নিরাপদ রাখাও ছিল আরেকটি উদ্দেশ্য।

---

29 সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১।

#দুই, আরবে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান সামরিক প্রভাব সম্পর্কে কুরাইশদের একটি ধারণা দেওয়াও ছিল অভিযানের আরেকটি উদ্দেশ্য। কুদাআহ গোত্রের বাজারে কুরাইশদের যাতায়াত ছিল। তারা কাফেলা নিয়ে সেখানে যেত। এমন একটা স্থানে সামরিক শক্তির প্রদর্শনী দেখলে স্বাভাবিকভাবেই কুরাইশরা মুসলিমদের আরও সমীহের চোখে দেখবে। আল-ওয়াক্বিদী, আয-যাহাবীদের মতে এই অভিযানের মাধ্যমে রোমানদের একটি সূক্ষ্ম আভাস দেওয়া হয়। রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী গোত্রে হামলা চালানো হলে রোমানদের টনক নড়বেই। তারা জানবে আরবে নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটছে।

পঞ্চম হিজরীর এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাজার সৈনিকের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। তারা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন আর রাতের বেলা এগিয়ে যেতেন। দুমাতুল জান্দালে পৌঁছে গেলে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। একজন ধরা পড়ে এবং মুসলিম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অগ্রসর হওয়ার সামান্য সুযোগটুকুও দেননি। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় চলে আসেন।

অভিযানে মুসলিমদের অর্জন

১) এই অভিযান থেকে ফেরার পথে উয়াইনাহ নামের এক ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখা হয়। সে মদীনা থেকে ছত্রিশ কিলোমিটার দূরের মাঠে তার উট আর ভেড়া চরানোর অনুমতি চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিলেন। প্রতিবেশি গোত্রগুলোর উপর মুসলিমদের কী পরিমাণ প্রভাব ছিল এই ছোট্ট ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

২) এ অভিযানের মাধ্যমে মুসলিমরা নতুন নতুন এলাকা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে। একটি সুদীর্ঘ সামরিক অভিযানের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

৩) এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়। এক সময় যে বন্ধন ও আনুগত্য ছিল নিজ গোত্র আর পরিবারের প্রতি, সে বন্ধন এখন মুসলিমদের সাথে, আর আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ প্রতি। তাদের পরিচয় এখন আর আওসী, খাযরাজি কিংবা কুরাইশি নয়। তাদের পরিচয় তারা মুসলিম। অভিযান চলাকালীন সময়ে মদীনার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর ছিলেন গিফার গোত্রের সিবা ؓ। এই গিফার গোত্র ছিল ডাকাতির জন্য বিখ্যাত। এরকম একটা গোত্রের লোককে এত বড় পদে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। বলা চলে ব্যাপারটা ছিল মদীনাবাসীদের জন্য একটা পরীক্ষা। দেশ-গোত্র ভুলে তারা কি পরস্পরকে আপন করে নিতে পেরেছে? এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল তাদের শিক্ষা দিলেন, নেতার বংশমর্যাদা বা গোত্র যা-ই হোক, তার আনুগত্য করতে হবে। দেশ-গোত্র ভুলে মুসলিমদের পরস্পরকে আপন করে নিতে হবে।

বনু আল-মুস্তালিক্বের যুদ্ধ

সমসাময়িক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত বনু মুস্তালাক্বের যুদ্ধ। কুরাইশদের মিত্র এই গোত্রটির অবস্থান ছিল কৌশলগত বিবেচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মক্কার কুরাইশদের সাথে যদি বোঝাপড়া করতে হয়, তবে খুযাআ গোত্রের সাথে আগে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। মদীনা আক্রমণের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনার নিশ্চিত খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতশো মুজাহিদ নিয়ে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে বসেন। যে জায়গাটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেটার নাম আল-মুরাইসী।

মুসলিমদের অতর্কিত হামলায় প্রতিরোধ গড়ার কোনো সুযোগও তারা পায়নি। উপরন্তু তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, স্ত্রী-সন্তানদের বন্দী করে দাস হিসেবে নিয়ে আসা হয়।

সাধারণত, মুসলিমবাহিনী শত্রুদের উপর আক্রমণ করার আগে ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনদিন সময় দিয়ে থাকে। তাদের বলা হয় -- মুসলিম হও, না হলে জিযিয়া দাও, আর এ দুটো প্রস্তাবের কোনোটাতেই রাজি না হলে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করো।[30] কিন্তু বনু মুস্তালিক্বকে এক মুহূর্তের জন্যও সময় দেওয়া হয়নি কারণ তাদের কাছে আগেই দাওয়াহ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা আরবেই বসবাস করতো, ইসলাম সম্পর্কেও জানতো। জেনে শুনেই তারা কুরাইশদের পক্ষ নিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, বনু মুস্তালিক্বকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করা হয়। তারা তখন পশুদের পানি খাওয়ানোতে ব্যস্ত ছিল।[31]

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে জুয়াইরিয়্যাহর ﷺ বিয়ে

জুয়াইরিয়্যাহ ﷺ ছিলেন বনু মুস্তালিক্বের গোত্রনেতা আল হারিসের মেয়ে। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহর বিয়ে নিয়ে প্রবল ঈর্ষা আর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন মা আইশা ﷺ। মজার এই ঘটনাটি তাঁর মুখেই শোনা যাক.

'যখন আল্লাহর রাসূল বনু মুস্তালিক্বের বন্দী নারী ও শিশুদের বণ্টন করে দিলেন, তখন জুয়াইরিয়্যাহ পড়লেন সাবিত ইবন কাইসের ভাগে। তিনি সাবিতের সাথে মাকাতুবা (দাসমুক্তির চুক্তি) করলেন। জুয়াইরিইয়্যাহ দেখতে ছিলেন খুবই মিষ্টি, আর অসম্ভব সুন্দরী! এতটাই সুন্দরী যে, যে-ই তাকে দেখবে, সে-ই তার প্রেমে পড়ে যাবে! তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে দাসমুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য চাইলেন। আল্লাহর কসম! আমি যখন তাকে আমার দরজায় দেখলাম, (প্রচণ্ড ঈর্ষার কারণে) তাকে আমার

---

[30] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৩।

[31] সহীহ বুখারি অধ্যায় গোলাম আজাদ, হাদীস ২৫।

একটুও ভালো লাগেনি। আমি জানতাম, যে রূপ আমি তার মধ্যে দেখছি, তা আল্লাহর রাসূলের চোখ এড়াবে না।

জুয়াইরিয়্যাহ আসলেন, সরাসরি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল-হারিসের মেয়ে জুয়াইরিয়্যাহ, আমার বাবা গোত্রের নেতা। আর এখন আমি হয়েছি সাবিতের দাসী! আমার কেমন লাগছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আপনি আমাকে চুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য করুন! আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

- আচ্ছা, তোমাকে যদি এর থেকেও ভালো কিছু দেওয়া হয়?

- সেটি কী?

- আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করবো আর তোমাকে বিয়ে করে নেব।

- হে আল্লাহর রাসূল, আমি অবশ্যই তা কবুল করবো।

রাসূলুল্লাহ জুয়াইরিয়্যাহকে বিয়ে করে নিলেন। সবাই তখন বলতে লাগলো, আরে! এরা তো রাসূলুল্লাহর শ্বশুরবাড়ির লোকজন, এদেরকে আমরা কী করে দাস বানিয়ে রাখি! তাই তারা তাদের ভাগের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিল। জুয়াইরিয়্যাহর মতো আর কেউ নিজ গোত্রের জন্য এত বরকত বয়ে এনেছে বলে আমাদের জানা নেই। এই এক নারীর কারণে বনু মুস্তালিকের একশো পরিবার আজাদ হয়ে যায়।'[32]

এই ঘটনার পর বনু মুস্তালিক্ব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যক্তিজীবনে নেওয়া একটি সিদ্ধান্তে পাল্টে যায় হাজারো মানুষের ভাগ্য।

মুরাইসী থেকে ফেরার পথে: অনৈক্য তৈরির অপচেষ্টা

উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ একজন মুহাজির কাজের লোক ছিলেন। একদিন এক আনসারী সাহাবির সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়। বিষয়টা হাতাহাতির দিকে গড়ায়। আনসারী সাহাবি চিৎকার দিয়ে উঠলেন, 'আনসাররা সব কোথায়? সাহায্য করো আমায়!' মুহাজির সাহাবিও তখন চিৎকার দিয়ে মুহাজিরদের কাছে সাহায্য চাইতে লাগলেন। খবর কানে পৌঁছামাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুটে এলেন, 'কী হচ্ছে এসব! আমি তোমাদের মাঝে এখনো বেঁচে আছি, এখনই তোমরা জাহিলিয়াতের ডাক দিচ্ছ? ছাড়ো এসব!' তিনি দ্রুত তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে বিষয়টি শান্ত করে ফেলেন। এই ঘটনা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কানে পৌঁছলে তার প্রতিক্রিয়া হয় দেখার মতো। সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তরুণ সাহাবি যাইদ ইবন আরকাম। তিনি ছিলেন সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন:

[32] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় দাসমুক্তি, হাদীস ৬।

'আমি আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে বলতে শুনলাম,

কী! মুহাজিররা এই কাজ করেছে! এরা আমাদের দেশে এসে, আমাদের খেয়ে-পরে আমাদের উপর জারিজুরি ফলাচ্ছে! এই কুরাইশগুলোকে দেখলে আমরা একটি কথাই শুধু মনে পড়ে -- দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষো, আর সেই সাপই তোমাকে একদিন দংশন করবে! আল্লাহর কসম করে বলছি, মদীনায় গেলে আমাদের সম্মানী লোকেরা এই নিকৃষ্ট লোকগুলোকে বের করে দেবে। এই আপদ তো তোমরাই ডেকে এনেছো, নিজেদের শহরে জায়গা দিয়েছ, ধনসম্পদ ভাগাভাগি করেছো। খবরদার! মুহাজিরদের পেছনে আর টাকা নষ্ট কোরো না, তারা নিজেরাই অন্যত্র ভেগে যাবে।

আমি কথাগুলো চাচাকে জানালাম, চাচা রাসূলুল্লাহকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের মুখে যা যা শুনেছি বললাম। রাসূলুল্লাহ এরপর ইবন উবাই আর তার সঙ্গীদের তলব করলেন। তারা মুখের উপর সবকিছু অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ তাদের কথা বিশ্বাস করলেন, কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। এটা দেখে আমার যে কী কষ্ট হলো, জীবনে এত কষ্ট আমি কখনো পাইনি। এরপর কুরআনে আয়াত নাযিল হলো:

> *"মুনাফিক্করা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্করা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (সূরা মুনাফিক্কুন, ৬৩: ১)*

রাসূলুল্লাহ এরপর খবর পাঠালেন, আমাকে এই আয়াত শুনিয়ে বললেন, যাইদ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে বিশ্বাস করেছেন।[33]'

এই ঘটনার পর যাইদের কান ধরে রাসূলুল্লাহ বললেন, 'এটা হলো সেই কান যে কানকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন!' মুনাফিক্কদের এই আচরণের পর আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিক্কুন নাযিল করেছেন। মুনাফিক্কদের সমালোচনায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "ওরা এমন লোক যারা বলে, আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের জন্য কিছু ব্যয় করো না, তাহলে ওরা সরে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমূহ তো আল্লাহ্‌রই কিন্তু মুনাফিক্করা তা বোঝে না। ওরা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে আমরা হীন তুচ্ছদের/দুর্বলদের (মুসলমানদের) বহিষ্কৃত করবোই। কিন্তু প্রকৃত শক্তি যে কেবল আল্লাহরই, তাঁর রাসূলের ও বিশ্বাসীদের। তবে মুনাফিক্করা তা জানে না। (সূরা মুনাফিক্কুন, ৬৩: ৭-৮)

---

[33] ঘটনাটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত। সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৯। তিরমিযী, অধ্যায় তাফসীর, হাদীস ৩৬২৯ (আরবি রেফারেন্স)।

শিক্ষা:

১) ভালো কাজে ব্যস্ত থাকা।

এই ঘটনার পর নবীজি ﷺ তাঁর সৈন্যদের প্রায় দু'দিন ধরে টানা মার্চ করান। তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। দুদিন আগে কী ঘটেছে সেটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো সময়ই পেল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাই চাচ্ছিলেন। ভালো কাজে ব্যস্ত না থাকলে মানুষ আজেবাজে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু এই ফিতনাহর কারণে অনেক কানাকানি আর গুজব ছড়িয়েছিল, রাসূল ﷺ তাই তাঁর বাহিনীকে ব্যস্ত রাখলেন যেন তারা কানাঘুষা থেকে দূরে থাকে। একজন দক্ষ নেতার গুণ এটাই-- যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন দক্ষ নেতা হতে পেরেছিলেন।

২) মুসলিমদের সুনাম বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যখন উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারেন ইবন উবাই মুসলিমদের মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে, তখন তিনি ইবন উবাইকে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহর অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'দেখো উমর, যদি তাকে হত্যা করি আর মানুষ বলে: মুহাম্মাদ তার অনুসারীদের হত্যা করে। তখন বিষয়টা কেমন হবে ভেবে দেখেছো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সুনামের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতেন। তিনি চাচ্ছিলেন না মানুষ ভাবুক যে, তারা মুসলিম হলেও তাদের নেতা তাদের হত্যা কিংবা অত্যাচার করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগে কিছু মানুষকে হত্যা করেছেন। চাইলে তিনি ইবন উবাইকেও হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাকে ছেড়ে দেওয়াই ছিল প্রজ্ঞা। রাসূলুল্লাহর ﷺ বিচক্ষণতার কারণে ইবন উবাইয়ের আসল চরিত্র সবার কাছে প্রকাশিত হতে থাকে। এই ঘটনার পর থেকে খারাপ কিছু ঘটলেই লোকজন ইবন উবাইকে দোষারোপ করতো। কিন্তু যদি তাকে তখনই হত্যা করা হতো, তাহলে তার অনুসারীরা দম্ভ আর জাতীয়তাবাদের অন্ধ আক্রোশে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতো। তাকে ছেড়ে দেওয়ায় সময়ের সাথে সাথে তারা নিজেরাই ইবন উবাইয়ের আসল চরিত্র উপলব্ধি করে।

এ ঘটনার আগে যখনই নবীজি ﷺ জুম্মার খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরের দিকে অগ্রসর হতেন, তখন ইবন উবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলতো, 'তিনি আল্লাহর রাসূল, তাঁকে সাহায্য করো, আঁকড়ে ধরো।' কিন্তু যখন তার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করলো, তখন সে উঠে দাঁড়ালে লোকজন তাকে টেনে ধরে বসিয়ে দিত। এটিও রাসূলুল্লাহর ﷺ বিচক্ষণতারই ফল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, 'আজ যদি আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দেই, তাদের সবাই তাকে হত্যা করবে।' উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্তের বিচক্ষণতা উপলব্ধি করে বলেছিলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন রাসূলুল্লাহ। আমি এখন বুঝতে পারছি যে, আপনার সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্তের চেয়ে

প্রজ্ঞাময়।'[34]

৩) জাতীয়তাবাদ একটি ইসলামবিরোধী চেতনা।

মুহাজির ও আনসার -- এ দুটো শব্দ ছিল রাসূলুল্লাহর খুব প্রিয় দুটো শব্দ। কিন্তু যখন মুহাজির আর আনসারি সাহাবি এই নাম দুটো ধরে তাদের নিজেদের দলকে ডাক দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ এই ডাককে অভিহিত করলেন 'জাহিলিয়াতের ডাক' বলে। কেননা শব্দ দুটো চমৎকার হলেও তাদের এই ডাকের পেছনে ছিল জাতীয়তাবাদের চেতনা। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে যাচ্ছিলেন। এই ডাকের পেছনে তাদের 'হিজরাহ' কিংবা 'নুসরাহ'র কোনো সম্পর্ক নেই, বরং আছে গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যে বোধ। 'আমি মুহাজির, তুমি আনসার, আমি তোমার থেকে সেরা' -- এই ধরনের মানসিকতা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাহাবিদের গড়ে তুলতে চাননি। তিনি তাদের ভাই হওয়া শিখিয়েছেন। ইনসাফ ও সত্যের শিক্ষা দিয়েছেন। 'আমি আমার গোত্রের পক্ষে থাকবো। আমার জাতিই সেরা জাতি' -- এমন অযৌক্তিক বিশ্বাসের কোনো স্থান ইসলামে নেই।

উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য শয়তানের হাজারো পদ্ধতি আছে। তাই আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। আরব মুসলিম, পাকিস্তানি মুসলিম, ব্রিটিশ মুসলিম -- এ ধরনের তকমা উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। আমাদের পরিচয় আমরা মুসলিম। ইসলাম আমাদের গোত্র বা জাতিপরিচয়কে অস্বীকার করে না। তবে শুধুমাত্র জাতিপরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এটাই আমাদের মনে রাখতে হবে।

৪) ঈমান সবার আগে।

মুনাফিক্ব আব্দুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ছেলের নাম ছিল আবদুল্লাহ। বাবা মুনাফিক্ব হলেও ছেলে ছিলেন সত্যিকারের মুসলিম। তিনি যখলেন জানতে পারলেন তার পিতার আজেবাজে কথার কারণে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হতে পারে, তখন নিজেই নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে বললেন,

'আমি শুনেছি আপনি আমার পিতাকে হত্যা করতে চান। যদি তা-ই করেন, আমাকে নির্দেশ দিন, আমিই তাকে হত্যা করবো। পুরো খাযরাজ গোত্রে আমার মতো আর কেউ আমার বাবার অনুগত নয় -- এ কথা খাযরাজের লোকেরা ভালো করেই জানে। আমার সামনে দিয়ে আমার পিতার হত্যাকারী নিরাপদে চলাফেরা করবে -- আমি সেটা মেনে নিতে পারবো না। শয়তান তখন আমাকে পিতার হত্যাকারীকে হত্যার জন্য ফুসলাতে থাকবে। আর আমি তখন একজন কাফিরের বদলায় একজন মু'মিনকে হত্যা করে বসতে পারি। তাই যদি আপনি তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আমাকেই তা করতে আদেশ করুন।'[35]

---

[34] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬।

[35] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬।

নবীজি বললেন, 'না, আমরা তাকে হত্যা করবো না। এ দুনিয়ায় আমরা তাকে সঙ্গ দেবো।' এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবন উবাইয়ের পুত্রের জন্য দুআ করলেন। যে আবদুল্লাহ সারাটি জীবন 'বাবার বাধ্য সন্তান' হয়ে ছিলেন, সেই আবদুল্লাহ-ই রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুমতি চাচ্ছিলেন যেন তার বাবাকে হত্যা করা হলে তিনিই তা করার সুযোগ পান!

কেন তিনি নিজের বাবাকে হত্যা করতে চেয়েছেন? এর কারণ হলো ঈমান। ঈমান সবকিছুর ওপরে প্রাধান্য পায়, এমনকি পারিবারিক বন্ধনের ওপরেও। বাবা-ভাই-স্ত্রী সবকিছুর চেয়েও বেশি দামি আল্লাহর আদেশ মেনে চলা, আখিরাতে জান্নাতের যোগ্য হওয়া। ইসলাম গ্রহণের পর আবদুল্লাহ তাই মুহাম্মাদের ﷺ বিশ্বস্ত সৈনিক, অতীতের সকল আনুগত্য থেকে মুক্ত। কেননা ঈমান আনার পর চূড়ান্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি।

ইফকের ঘটনা

বনু মুসতালিক্ব থেকে ফেরার পথে মা আইশার ﷺ সাথে খুব দুঃখজনক একটি ঘটনা ঘটে। এটা ইফকের ঘটনা নামে পরিচিত। আইশার ﷺ মুখেই কাহিনীটি শোনা যাক:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে রওনা দেওয়ার আগে আমাদের নামে লটারি করতেন। যার নাম লটারিতে উঠতো, তিনি তাকে নিয়েই যাত্রা করতেন। বনু মুসতালিক্বের অভিযানের সময়েও লটারি হলো। সে বার লটারিতে আমার নাম উঠলো। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন। তখন হিজাবের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। সফরের সময়টায় আমি তাই একটা পালকির ভেতর বসে থাকতাম। ছোট্ট বাক্সের মতো একটা জিনিস। সেটাকে উটের পিঠে রাখা হতো। আর আমি তার ভেতর বসে থাকতাম। আশেপাশের লোকেরাই একে উটের পিঠে উঠিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত। এরপর মাথায় রশি টেনে ধরে উটকে চালানো শুরু হতো।

সেবার সফর শেষে মদীনায় ফিরে আসছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রা বিরতি নিলেন। ঠিক হলো রাতের কিছু সময় সেখানেই কাটানো হবে। এরপর যখন আবার যাত্রা করার সময় হলো, আমার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল। সবাই তৈরি হয়ে নিচ্ছে, এর মাঝেই আমি বাইরে বেরোলাম। সে সময় আমার গলায় ছিল জাফর পাথরের একটা হার। কিন্তু ফিরে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখি হারটি নেই। কখন গলা থেকে খুলে পড়ে গেল কিছুই টের পাইনি। হার খুঁজতে আবারও ফিরে গেলাম। যেয়ে দেখি ওখানেই হারটা পড়ে আছে।

ওদিকে সবাই ততক্ষণে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেছে। যারা আমার উট চালানোর দায়িত্বে ছিল, তারা আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল, পালকিটিও উটের পিঠে

চড়িয়েছিল। আমি যে পালকির মধ্যে নেই এটা ওরা বুঝতে পারল না। আসলে সে সময়ে মহিলারা বেশ হালকা পাতলা ছিলেন। যতটুকু না খেলেই নয় ততটুকুই খেতেন, এর বেশি না। আর আমার বয়সও তখন কম ছিল। ওরা ভেবেছিল আমি নিশ্চয়ই পালকির ভেতরেই আছি। সবাই আমাকে রেখেই রওনা দিয়ে দিল।

সেনাশিবিরে পৌঁছে দেখি সেখানে কেউ নেই! কিন্তু আমি জানতাম, তারা যখন আমাকে পাবে না, তখন আমার খোঁজে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। বসে বসে থাকতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এল, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল হয়ে এল। আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখানে এলেন সাফওয়ান ইবন আল-মুআত্তিল আস-সুলামী। উনি মুজাহিদ ভাইদের থেকে পেছনে ছিলেন (সম্ভবত কারো ফেলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে নিতে পিছিয়ে পড়েছিলেন)। তিনি দূর থেকে কালো মতন কিছু একটা দেখেই বুঝেছিলেন কেউ শুয়ে আছে। কাছে আসার পর আমার অবয়ব দেখে আমাকে চিনে ফেললেন। কারণ, হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠেই সাথে সাথে চাদর দিয়ে আমার মুখ ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সাথে আর একটা কথাও বলেননি, আমিও চুপ করে ছিলাম। একটা উট এনে তিনি সেটাকে আমার সামনে বসালেন। আমি উটের পিঠে চড়লাম, আর উনি উটের মাথা ধরে টানতে টানতে দ্রুত কাফেলার দিকে এগিয়ে চললেন।

সময়টা মধ্য দুপুর। ভরদুপুরের প্রচণ্ড গরমে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন একটা সময় উনি আমাকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। এ দৃশ্য দেখে যা হওয়ার হয়ে গেছে। কিছু লোক (আমার আর সাফওয়ানের ব্যাপারে) কুৎসা রটিয়ে দিল। মুসলিমদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো।

মদীনায় মানুষের মুখে মুখে সেই একই গল্প। আর সবকিছুর পিছে মূল হোতা হলো আবদুল্লাহ ইবন উবাই। আমি কিন্তু এসবের কিছুই জানি না। মদীনায় পৌঁছেই আমি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রায় এক মাস বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। বাইরে কী কথাবার্তা হচ্ছে কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আর আমার পরিবারের কান পর্যন্ত কাহিনী ঠিকই পৌঁছালো। কেউই আমাকে কিছুই বললো না। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম আমার প্রতি নবীজির আচরণ কেমন যেন বদলে গেছে, ঠিক আগের মতো আর নেই। এমনিতে আমি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি খুব আদর-যত্ন করতেন। কিন্তু এবার তেমনটা করলেন না। শুধু ঘরে আসতেন, সালাম দিতেন আর বলতেন, কেমন আছো? -- ব্যস, এটুকুই। এরপরই চলে যেতেন। আমার মন বলছিল, কী যেন একটা সমস্যা আছে।

ভেতরে ভেতরে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূলের এমন নির্লিপ্ত আচরণ একেবারেই মেনে নিতে পারছিলাম না। একদিন বললাম, আপনি অনুমতি দিলে আমি মায়ের কাছে যেতে চাই। তিনিই আমার দেখাশোনা করুক। তিনি বললেন, যেতে পারো। কোনো বাধা নেই। আমি তখন মায়ের কাছে চলে গেলাম। তখনও কিন্তু কী হচ্ছে তার কিছুই জানি না।

প্রায় তিন সপ্তাহ রোগে ভুগে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছি। সে সময় আরবদের মাঝে বিদেশীদের মতো ঘরের ভেতর পেশাবখানা ছিল না। ওগুলো আমরা খুব অপছন্দ করতাম। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার দরকার হলে বাইরে বেরিয়ে মদীনার খোলা জায়গাগুলো ব্যবহার করতাম। তেমনি এক রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বের হয়েছি উম্ম-মিসতাহকে নিয়ে। সে ছিল আবু রুহম ইবন আব্দ-মানাফের মেয়ে। আমরা দুজন আল-মাসানাই এর দিকে চলছি। হঠাৎ সে কাপড়ে বেঁধে আছাড় খেয়ে পড়লো, আর ফট করেই তার মুখ দিয়ে ছেলের নামে অভিশাপ বেরিয়ে এল, ওরে মিসতাহ, তুই শেষ হয়ে যা! আমি বললাম, কী বলছো এসব! যে মানুষটা বদরে অংশ নিয়েছে, তাকে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ? সে বললো, তুমি কি জানো না তোমার ব্যাপারে ও কী বলেছে? আমি জানতে চাইলাম। উম্ম মিসতাহ তখন আমাকে সমস্ত কাহিনী খুলে বললো।

ওয়াল্লাহি! আমার তখন এত বেশি খারাপ লাগছিল যে, আমি কিছুই করতে পারলাম না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন না সেরেই ঘরে ফিরে এলাম। অনেক কাঁদলাম আমি। কাঁদতে কাঁদতে মনে হচ্ছিল কলিজাটা ফেটে যাবে। মা'কে গিয়ে বললাম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক। লোকেরা যা বলার তা তো বলেছে। তুমি কেন আমাকে কিছুই জানালে না? ওরা আমার নামে এসব কী বলছে মা? মা বললেন, এমনটাই হয় রে মা। একজন সুন্দরী নারী যখন স্বামীর ভালোবাসা পায় তখন বাকি স্ত্রীরা তার দোষ খুঁজে বেড়াবেই। তুই দুশ্চিন্তা করিস না।

মানুষ আমার নামে এসব কী বলছে! আমি সারারাত কাঁদলাম। সকাল পর্যন্ত কেঁদেই গেলাম, কেঁদেই গেলাম। সকাল হয়ে গেল। চোখ বেয়ে অঝোর ধারা বইছে। সারারাত এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি।

সবচেয়ে বেশি কুৎসা রটিয়েছিল আবদুল্লাহ ইবন উবাই। সাথে ছিল খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক, মিসতাহ, আর জাহশের মেয়ে হামনাহ। হামনার এসব কথা ছড়ানোর কারণ ছিল। সে ছিল উম্মুল মুমিনীন যাইনাবের আপন বোন। নবীজির ﷺ বাকি স্ত্রীদের মাঝে এই এক যাইনাবই ﵂ আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। অথচ যাইনাব আমার নামে একটা খারাপ কথাও বলেননি। কিন্তু হামনা তার বোনের পক্ষ নিতে গিয়ে আমার নামে এমন বাজে কথা ছড়াল যে আমি খুবই কষ্ট পেলাম।

আমার ব্যাপারে ওয়াহী আসতে দেরি হচ্ছিল। নবীজি ﷺ আলী ﵁ আর উসামাহ ইবন যাইদের ﵁ সাথে আমার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। উসামাহ বললেন, আমরা তো

তাঁর ব্যাপারে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু কখনো শুনিনি। আলী বললেন, আল্লাহ তো আপনার জন্য বিষয়টা কঠিন করেননি। আরও কত মহিলা আছে। আপনি বরং আইশার সেবিকা বারীরার সাথে কথা বলে দেখুন, সে আপনাকে আইশার ব্যাপারে সত্য জানাতে পারবে।

নবীজি ﷺ বারীরাকে ডেকে জানতে চাইলেন আমার মধ্যে সে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কি না। বারীরা বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, কমতি বলতে আমি তার মধ্যে শুধু এটুকু গাফেলতি দেখেছি যে, ময়দার কাই বানিয়ে সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে, আর ছাগল এসে সেগুলো খেয়ে নেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। সবাইকে ডেকে বললেন, আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে তোমাদের কি কিছু বলার আছে? এই লোক আমার পরিবারকে নিয়ে মিথ্যা কথা ছড়িয়েছে। আমার পরিবার সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আর তারা এমন একজন লোকের (সাফওয়ান) বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছে যার সম্পর্কে আমি ভালো বাদে কিছু জানি না। আমি না থাকলে সে কোনোদিন আমার ঘরে ঢোকেনি।

সাদ ইবন মুআয বললেন, আপনি তার সাথে যা খুশি করুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। সে যদি আওস গোত্রের হয়ে থাকে, তাহলে আমরাই তার গর্দান আলাদা করে দেবো। আর যদি সে খাযরাজ গোত্রের হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমাদের যা আদেশ দেবেন আমরা তা-ই করবো।

খাযরাজের নেতা সা'দ ইবন উবাদা উঠে দাঁড়ালেন। এর আগে সবাই তাকে ভালোই জানতো, কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত গোত্রীয় চেতনা তাকে পেয়ে বসলো। তিনি বলে উঠলেন, মিথ্যে বলছো তুমি! তুমি তাকে এভাবে হত্যা করতে পারো না। সে মুরোদও তোমার নেই! তোমার নিজ গোত্রের হলেও তুমি এই কাজ করতে পারো না।

এই কথা শুনে সাদ ইবন মুয়াযের ভাই উসাইদ ইবন হুদাইর রেগে গেলেন। সাদ ইবন উবাদাকে বললেন, আরে ব্যাটা মিথ্যা তো তুই বলছিস। তুই নিজে একটা মুনাফিক। এখন এসে আরেক মুনাফিকের পক্ষ নিচ্ছিস! আমরা ঐ ব্যাটাকে মারবোই মারবো।

চেতনার উন্মাদনায় দুই গোত্রের মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম। রাসূলুল্লাহ তখন মিম্বরে বসা। তিনি দু'পক্ষকে শান্ত করলেন, নিজেও শান্ত হলেন।

আর আমি! আমি সেদিন সারাটা দিন শুধুই কাঁদলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমাতে পারলাম না। দুই রাত এক দিন টানা কেঁদেই গেলাম। আমার বাবা মা আমার পাশে এসে বসলেন। তাদের মনে হলো আমার বুক ফেটে কলিজাটা বুঝি বের হয়ে আসে। এক আনসারি মহিলা আমার ঘরে এল। আমি কাঁদছিলাম, আমার সাথে সেও কাঁদতে শুরু করল।

এমন সময় নবীজি ﷺ এলেন। আমার পাশে এসে বসলেন। এই ঘটনার পর এই প্রথম তিনি আমার পাশে বসলেন। আমাকে বললেন, শোনো আইশা, তোমার ব্যাপারে আমি এই এই কথা শুনেছি। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন। আর যদি কোনো পাপ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো। যখন বান্দা আল্লাহর কাছে তার দোষ স্বীকার করে তখন তিনি বান্দার তাওবা কবুল করে নেন।

এ কথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমার আশা ছিল আমার বাবা-মা আমার হয়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অন্তত কিছু একটা বলবেন। কিন্তু তারাও চুপ, কারো মুখে কোনো রা নেই। বাবা-মাকে বললাম, আমার হয়ে তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কিছু তো বলো! তারা বললেন, জানি না কী বলবো। বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না... বাবা-মা'র নীরবতা দেখে আমি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

আমার বয়স তখন অনেক কম। খুব বেশি কুরআনও আমি পড়িনি। কিন্তু সেই আমিই তখন আল্লাহর রাসূলকে বললাম, আল্লাহর শপথ! যে গুনাহর কথা আপনি বলছেন তার জন্য আমি কখনো আল্লাহর কাছে তাওবা করবো না। মানুষ যা বলছে, তা যদি আমি স্বীকার করি, তাহলে এমন কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া হবে যা কখনো ঘটেনি। আর যে কথা আমার ব্যাপারে বলা হচ্ছে, সে কথা আপনি এতবার শুনেছেন যে এটা আপনার অন্তরে গেঁথে গেছে। আপনি মানুষের কথাই বিশ্বাস করে ফেলেছেন। এখন আমি যা-ই বলি না কেন, আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি বলি আমি দোষ করেছি, সেটা আপনি ঠিকই বিশ্বাস করে ফেলবেন। কিন্তু আল্লাহ জানেন আমি নির্দোষ। আমার তো শুধু একটা কথাই মনে পড়ছে, যে কথা নবী ইয়াকুব তাঁর ছেলেদের বলেছিলেন,

> **"এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনলো। বললেন, এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন সবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল।" (সূরা ইউসুফ, ১২: ১৮)**

এই বলে আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। আমি নিশ্চিত জানতাম আল্লাহ অবশ্যই আমার পবিত্রতা প্রমাণ করবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, কখনো ভাবতেও পারিনি যে, আল্লাহ আমার জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল করে ফেলবেন আর সেই আয়াত মানুষ (কিয়ামত পর্যন্ত) পাঠ করে যাবে! নিজেকে আমার খুব নগণ্য মনে হয়। কুরআনের আয়াতে উল্লেখ্য হবার মতো যোগ্য নিজেকে কখনোই মনে হয়নি। আমার আশা ছিল নবীজি ﷺ হয়ত স্বপ্নে কিছু দেখতে পাবেন, যার দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রমাণ করবেন এবং কিছু তথ্য দেবেন।

ওয়াল্লাহি! নবীজি তাঁর আসন ছেড়ে ওঠেননি। তার আগেই আল্লাহ আয়াত নাযিল

করতে শুরু করলেন। তাঁকে তাঁর চাদর দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো। তাঁর মাথার নিচে একটা চামড়ার বালিশ রাখা হলো। আর আমি যখন আমার চোখের সামনে এগুলো দেখছিলাম, ওয়াল্লাহি, তখন আমার ভেতর কোনো উৎকণ্ঠা, ভয় কিছুই নেই। আমি জানতাম আমি পবিত্র। আমি জানতাম আল্লাহ আমার ক্ষতি করবেন না। আল্লাহর শপথ, যে মহান রবের হাতে আইশার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যখন নবীজির ﷺ ওপর আয়াত নাযিল হওয়া শেষ হলো, আমার বাবা-মায়ের ততক্ষণে মরার হাল! লোকেরা যা বলাবলি করছে, তা যদি ওয়াহীর মাধ্যমে সত্য প্রমাণ হয়ে যায়!

কিন্তু ওয়াহী নাযিল শেষ হবার পর আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রথম কথাটি ছিল, ও আইশা! তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেছেন! মা বললেন, যাও তোমার স্বামীর কাছে যাও। আমি বললাম, না, আমি যাবো না। আমি কেবল আল্লাহর কাছেই শুকরিয়া আদায় করবো।

নবীজি ﷺ কুরআনের আয়াতগুলো লোকেদের কাছে পড়ে শোনাতে বেরিয়ে গেলেন। মিসতাহ, হাসসান ইবন সাবিত আর হামনার উপর শাস্তি কার্যকর করলেন। কারণ তারা ছিল অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ যে আয়াতগুলো নাযিল করলেন সেগুলো হলো,

> “যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করতো। যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়? আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনো এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো এবং

আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত।" (সূরা নূর, ২৪: ১১-২০)

এই ছিল সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম[36] এবং সীরাতে ইবন হিশামে[37] বর্ণিত ইফকের ঘটনা।

ইফকের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) কোনো মুসলিম পুরুষ বা নারীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা একটি কবীরা গুনাহ।

২) এ দুঃখজনক ঘটনার মাঝেও ভালো কিছু ব্যাপার আছে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেছেন, তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করণীয় তা আমরা এই ঘটনা থেকে শিখলাম। আবু বকরের ﷺ পুরো পরিবার এই ঘটনায় অনেক কষ্ট আর বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু উম্মাহ এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে। অন্যদিকে আবু বকর ও তাঁর পরিবারের সকলে ধৈর্যের বিনিময়ে অনেক হাসানাত (সওয়াব) লাভের সুযোগ পান।

৩) মুসলিমদের উচিত অন্য মুসলিম ভাইবোনের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া এবং তাদের ব্যাপারে সুধারণা রাখা। কোনো ভাই বা বোনের নামে খারাপ কিছু শুনে কোনো মুসলিম খুশি হতে পারে না। বরং খারাপ কিছু শুনলে সে তার প্রতিবাদ করবে, এটাই হবে তার সহজাত আচরণ। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? ... তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান?"

মুসলিম ভাই বা বোনের ব্যাপারে খারাপ কিছু শুনলেও সেটা চট করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। বরং আগের সুধারণার ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে। আর গুজবে তো একেবারেই কান দেওয়া উচিত নয়। অর্থহীন খারাপ কাজে মুসলিমরা নাক গলাবে না। যেচে পড়ে রঙচঙে কাহিনী শোনার চেষ্টা করবে না, প্রচার করা তো দূরে থাক।

৪) অশ্লীল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। অনেক সময় ইসলাম পালন করা মুসলিমরাও উম্মাহর মধ্যকার ফিতনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় টেনে আনে। কিছু মানুষ আছে যারা অশালীন বিষয় নিয়ে কথা

---

[36] সহীহ বুখারি, অধ্যায় তাফসীর, হাদীস ৪৭৫০ (আরবি রেফারেন্স); অধ্যায় মাঘাযী, হাদীস ১৮৫। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় তাওবা, হাদীস ৬৫।

[37] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫।

বলতে পছন্দ করে। আল্লাহ বলেছেন, "যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"

খারাপ কাজকে বন্ধ করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় সেই খারাপ কাজ নিয়ে এত কথা বলে যা সেই খারাপ কাজকেই আরও উসকে দেয়। সমাজে যদি এমন কোনো খারাপ কাজ চলতে থাকে, যে ব্যাপারে কারো ধারণা নেই, তাহলে অনেকসময় এই না-জানাটাই সবার জন্য মঙ্গলজনক। বিশেষ করে যিনা, ব্যভিচার এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায়, তত উত্তম। এগুলো নিয়ে বেশি কথা বললে মানুষের মনে হতে পারে সমাজটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তখন সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে, মন্দ কাজ গা-সওয়া হয়ে যাবে এবং এসব কাজকে হালকাভাবে দেখা শুরু করবে। মানুষ তার সমাজকে যেমন মনে করে, নিজেও তেমনই আচরণ করে। দুর্বল ঈমানদারদের জন্য বিষয়টি খুবই বিপজ্জনক। তারা যদি সমাজের এসব গোপন পাপ সম্পর্কে না জানে, তাহলে তারা নিজেরাও সেসব থেকে দূরে থাকবে।

খারাপ কাজ থামানো আর খারাপকে আরও উসকে দেওয়া - এ দুয়ের মাঝে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে। কোনো পাপ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার সময় যেন তারা উল্টো তাতে উৎসাহিত বা কৌতূহলী না হয়, সে ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। যতটুকু বলা জরুরি, ততখানিই বলতে হবে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বললে এমন অনেক মানুষ সে বিষয়ে জেনে যায় যারা এই পাপ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পরে বরং তারাই সেই পাপে আগ্রহী হয়ে পড়ে। এভাবে অনেক সময় খারাপ কাজে বাধা দিতে গিয়ে আরও বিপদ ডেকে আনা হয়।

৫) যে বা যারা উম্মুল মু'মিনীনের চরিত্রে অপবাদ দেয় তারা কাফির -- এই ব্যাপারে আলিমদের ঐক্যমত আছে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট করে আইশার চরিত্রের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এরপরেও কেউ যদি আইশাকে অপবাদ দেয় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে কাফির।

৬) মিসতাহ নামের যে লোকটি মা আইশার ﷺ নামে কুৎসা ছড়িয়েছিল, সে ছিল বেশ দরিদ্র। আবু বকরই ﷺ আত্মীয় হিসেবে তাকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। যখন আবু বকর ﷺ জানতে পারলেন এই লোক তাঁর মেয়ের ব্যাপারে বাজে কথা ছড়িয়েছে, তিনি রাগ করে কসম করলেন যে, মিসতাহকে আর কখনো সাহায্য করবেন না। তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বললেন,

> "তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।" (সূরা নূর, ২৪: ২২)

এই আয়াত নাযিলের পর আবু বকর তার ভুল বুঝতে পারেন। তিনি মিসতাহকে ক্ষমা করে দেন। অর্থাৎ, কারো প্রতি রাগ বা ক্ষোভ যেন আমাদেরকে ভালো কাজ থেকে বা তার প্রতি ইনসাফ করা থেকে বিরত না রাখে।

৭) কোনো নারীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনা একটি গুরুতর অপরাধ। যদিও এ আয়াতে কেবল নারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, তবে পুরুষের ব্যাপারেও একই বিধান। নারীরা স্বভাবগতভাবে কিছুটা দুর্বল আর আবেগী। তাই কোনো সচ্চরিত্রা নারীর বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অভিযোগ তোলা আরও বেশি অপরাধ।

৮) মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ। কষ্ট তারও হতো, দুঃখ তিনিও পেতেন। গায়েবের খবর যেমন আমরা জানি না, তিনিও জানতেন না। পুরো একটা মাস যখন লোকেরা তাঁর স্ত্রীর নামে আজেবাজে কথা বলেছে, তখন তাঁর কষ্ট হয়েছে। আইশার ؓ সাথে স্বাভাবিকভাবে কথাও বলতে পারেননি। নবীজির জীবনে এটা ছিল এক বিশাল পরীক্ষা।

৯) যদি কেউ কোনো মুসলিমের ওপর যিনা বা ব্যভিচারের অভিযোগ আনে, তবে তাকে চারজন সাক্ষী হাজির করতে হবে। তা নাহলে অভিযোগকারীকেই ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে। তারা ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে আর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। মুসলিমদের ইজ্জত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই একে সুরক্ষিত রাখা খুব জরুরি। সেজন্যই এত কঠোরতা। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসব ব্যাপার খুবই তুচ্ছ হয়ে গেছে। মুসলিমরা উঠতে-বসতে একে-অপরকে অপবাদ দিচ্ছে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তোলা কবীরা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১০) হাসসান ইবন সাবিত এবং মিসতাহকে বেত্রাঘাত করা হলেও, আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অথচ আবদুল্লাহ ইবন উবাই-ই ছিল এই ঘটনার মূল হোতা। তাহলে তাকে শাস্তি না দেওয়ার কারণ কী? এই সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম চারটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, কাউকে কোনো গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হলে, সেটি গুনাহর জন্য কাফফারা হিসেবে কাজ করে। তখন তাকে আখিরাতে আর শাস্তি ভোগ করা লাগবে না। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই এতটাই জঘন্য এক লোক যে তার আখিরাতেই শাস্তি প্রাপ্য। তাই হয়তো এ কারণে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, হতে পারে সে এতটাই চতুরতার সাথে এই গুজবটি ছড়িয়েছে যে তাকে প্রমাণসহ পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়ত, মিথ্যা অপবাদ দানকারীর ওপর তখনই শাস্তি প্রয়োগ করা হয় যখন তার অপরাধের বিরুদ্ধে সাক্ষী থাকে কিংবা কেউ নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করে নেয়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ক্ষেত্রে সেটি হয়নি। কারণ সরাসরি মুসলিমদের

সামনে সে এসব কথা বলেনি, বলেছে তার অনুসারীদের কাছে। তার অনুসারীরাই মদীনায় এসব কথা ছড়িয়েছে।

চতুর্থত, তার অনুসারী লোকদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং ফিতনা এড়াতে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।

১১) আমীর বা নেতার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা দ্বীন ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর শত্রুদের একটি বড় অস্ত্র হলো ইসলামী নেতা বা আলিমের চরিত্রহনন। মদীনায় শত্রুরা প্রথমে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ হত্যার অপচেষ্টা চালায়, তাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর চরিত্রে কালিমালেপনের চেষ্টা করে। দ্বীনের শত্রুরা দ্বীনের কর্ণধারদের ব্যাপারে নোংরা সব কাহিনী রচনা করে যেন মানুষের মনে তাদের ব্যাপারে অবিশ্বাস জন্ম নেয়, শ্রদ্ধা হারিয়ে যায়। আমাদেরকে এই ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। আজকে আর কোনো নেতা বা আলিমের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হবে না। কিন্তু যা ইতিমধ্যে নাযিল হয়েছে, আমাদের উচিত তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করা।

১২) জাতীয়তাবাদ একটা রোগ এবং এই রোগ সারতে কিছুটা সময় প্রয়োজন। ইফকের ঘটনার প্রায় দীর্ঘ চার-পাঁচ বছর আগে আওস আর খাযরাজ গোত্র মুসলিম হয়েছে। অথচ এত বছর পরেও এই সমস্যাটি তাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থাতে কিছুটা রয়েই গেছে। তার জের ধরে মসজিদের ভেতর মারামারি শুরু হবার উপক্রম! মদীনায় আনসার বনাম মুহাজির কিংবা আওস বনাম খাযরাজের মধ্যে আকস্মিক লেগে যাওয়ার ঘটনা এবারই নতুন নয়, এর আগেও হয়েছে। প্রতিবারই ঘটনার সূত্রপাত নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় থেকে। তুচ্ছ বিষয়ও বড় হয়ে যায় যখন একপক্ষ নিজের গোত্র পরিচয় টেনে আনে।

জাতীয়তাবাদ বা আসাবিয়াহ একটা ফাঁপা আদর্শ। উসকানিমূলক বক্তৃতা আর চেতনার ধুয়া তুলে মানুষকে উন্মাদ বানানোই এর হাতিয়ার। এই জাতীয়তাবাদ দিয়েই মুসলিমদের বিভক্ত করে রাখা হয়েছে গত একশো বছর ধরে। মুসলিমরা এখন তাই আমেরিকান মুসলিম, বাঙালি মুসলিম, পাকিস্তানি মুসলিম। এভাবে বিভক্ত থেকে ইসলামের প্রকৃত ঐক্য আর ভ্রাতৃত্বের স্বাদ কখনোই মিলবে না।

খন্দকের যুদ্ধ

ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেওয়া ব্যাপার যাকে বলে, খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে তেমন মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যুদ্ধ। এই যুদ্ধ যতটা না ছিল ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধ, তার চাইতে বেশি ছিল স্নায়ুযুদ্ধ। এ যুদ্ধ মুসলিমদের যে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় হতে হয় তা আর কখনো হয়নি। না এর আগে, না এর পরে।

যুদ্ধের কারণ

খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী ৫ম বর্ষের শাওয়াল মাসে। সেই যে বনু নাযির গোত্রকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হলো, এরপর তারা তাদের বাক্স-পেটরা, ধন-দৌলত নিয়ে আশ্রয় নিল খাইবারে। ইহুদিরা মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা করে কখনো ক্লান্ত হয় না। খাইবারে এসেও তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পরিকল্পনা করলো একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক জোট গঠন করার। মুসলিমদের অগ্রগতি দমন করতে এরচেয়ে ভালো কোনো রাস্তা তাদের মাথায় আসলো না। তাদের নেতারা মক্কায় সফর করে। সফরে প্রতিনিধিদলে ছিল সালাম ইবন আবি আল হুকাইক, হুয়াই ইবন আখতাব, কুনানাহ ইবন আর-রাবী, হাউযাহ ইবন কাইস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সফরের উদ্দেশ্য সফল হয়। কুরাইশ, গাতফান ও তাদের আরও কিছু মিত্রশক্তি একটি সম্মিলিত সামরিক জোট গঠনের মাধ্যমে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ইহুদি ও কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের বিরোধ ছিল প্রতিটি ফ্রন্টে -- ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক। কিন্তু গাতফান গোত্রের ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের এই জোটে অংশ নেওয়ার একটাই কারণ, অর্থনৈতিক স্বার্থ। মদীনার গনিমতের মালে ভাগ পাওয়া। এই সম্মিলিত জোটে সৈন্য ছিল দশ হাজার, যার ছয় হাজারই সরবরাহ করে বনু গাতফান ও তাদের মিত্রশক্তি। বিনিময়ে তারা খাইবারের এক বছরের খেজুর পাবে। আর বাকি চার হাজার সৈন্য সরবরাহ করে কুরাইশ ও তাদের মিত্রশক্তি। ইহুদিদের নিজস্ব তেমন কোনো লোকবল ছিল না।

ইলম ও পাণ্ডিত্যের কারণে ইহুদিদের আরবরা সমীহ করতো। তারা পড়াশোনা করতো, তাদের মাঝে আলিম ছিল। এই বৈঠকে মক্কার মুশরিকরা ইহুদিদের জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, তোমরা তো ধর্মের ব্যাপারে অনেক জ্ঞান রাখো। একটা কথা বলো তো, কারা সঠিক পথে আছে -- আমরা নাকি মুহাম্মাদ? ইহুদিরা তখন উত্তর দেয়, 'তোমরাই সঠিক পথে আছো।'[38] আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করলেন,

---

[38] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৪।

"তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফিরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে? এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং। বস্তুতঃ আল্লাহ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।" (সূরা নিসা, ৪: ৫১-৫২)

আক্বীদা বিশ্বাসের বিবেচনায় ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে। ইহুদিরা ভালো করেই জানতো মুসলিমরা বিশুদ্ধ তাওহীদে বিশ্বাস করে। অন্যদিকে মুশরিকদের সাথে তাওহীদের যোজন যোজন দূরত্ব। তবুও শুধুমাত্র হিংসা, শত্রুতা আর অন্ধ বিদ্বেষে তারা মূর্তিপূজারি কুরাইশদের ধর্মকে সঠিক বলে দেয়। ওদিকে ইহুদিদের কাছ থেকে মনমতো 'ফতোয়া' পেয়ে কুরাইশরাও বিপুল উৎসাহে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

মুসলিম পক্ষ

সামরিক জোটের খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ সবই জানতে পারলেন। জরুরি ভিত্তিতে শুরা ডাকা হলো। এই পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ হবে। কিন্তু কেউই তেমন বাস্তবসম্মত বা কার্যকরী কোনো বুদ্ধি দিতে পারলো না। এবার মুখ খুললেন সালমান আল ফারসি ﷺ। এই সেই সাহাবি যিনি সত্যের সন্ধানে বহু দেশ ঘুরে অবশেষে ইসলামের দেখা পেয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ তার দেশের কথা তুললেন, পারস্যের অভিজ্ঞতার কথা। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি যখন পারস্যে ছিলাম, তখন ঘোড়সওয়ারি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে পরিখা খনন করতাম। আমার মনে হয় আপনি এই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।'

প্রস্তাবটি রাসূলুল্লাহর ﷺ মনে ধরল। বাকি সাহাবিদেরও বেশ পছন্দ হলো। পরিখা খননের জন্য বেছে নেওয়া হলো মদীনার উত্তর দিক। এ দিকটাতেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মদীনার পূর্ব-পশ্চিম দু দিকেই পাথুরে পাহাড়ি অঞ্চল, আর দক্ষিণে ঘন সন্নিবেশিত ঘরবাড়ি, কৃষিজমি। অর্থাৎ মদীনার উত্তর দিকটাই ছিল সবচাইতে অরক্ষিত।

পরিখা খনন

পরিখা খনন শুরুর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাদের বনু হারিসার দুর্গে পাঠিয়ে দেন যেন তারা নিরাপদে থাকে। এরপর শুরু হলো পরিখা খনন। পরিখা খনন যেমন-তেমন কাজ না, কঠিন কাজ! আর সীমিত লোকবল নিয়ে এই কাজ করা তো রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। মানুষজন উত্তেজিত,

উদভ্রান্ত। এমন সংকটের মুহূর্তে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাওয়া সহজ নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ অসাধারণ ব্যবস্থাপনায় পরিখা খননের কাজটি সহজ হয়ে গেল। সাহাবিদেরকে দশ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিলেন। প্রতিটি দলের উপর দায়িত্ব ছিল চল্লিশ হাত খনন করা। এভাবে করে পুরো উত্তর দিকজুড়ে নিয়োজিত হলো সাহাবিদের অনেকগুলো দল। খননের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলে এই পরিখাই মদীনাকে দেবে সুদৃঢ় নিরাপত্তা।

খননের কাজ শুরু হলো খুব প্রতিকূল আবহাওয়ায়। প্রচণ্ড শীত, কনকনে বাতাস। এরই মাঝে চলছে ঠুকঠুক করে মাটি খনন। রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুমতি ছাড়া কারো জায়গা থেকে সরার অনুমতি নেই। নয় জন মাটি কাটে, এক জন পাহারা দেয়। এভাবে পালাবদল করে কাজ চলতে থাকে। মাটি কাটার জন্য কোনো যন্ত্র নেই, নেই অত্যাধুনিক কোনো ব্যবস্থা। নিজ হাতে মাটি খুঁড়ে সেগুলোকে বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। শারীরিক কষ্ট তো আছেই, তার উপর যোগ হয়েছে প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর শঙ্কা। যেকোনো মুহূর্তে শত্রুরা চলে আসতে পারে।

নেতা ও সামরিক কমান্ডাররা সাধারণত পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা আর নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নেতার আসনে বসে থাকেননি। নিজেই নেমে পড়লেন পরিখা খননে। পৃথিবীর কজন নেতা অনুসারীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছোটখাটো কাজ করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। সারা বিশ্বের নেতা হয়ে তিনি মাটি কেটেছেন। তাঁর চোখ-মুখ-গা ধুলোয় ধূসরিত হয়েছে।

শুধু গায়ের জোরে কতক্ষণ টেকা যায়? কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ চালাতে হলে চাই প্রচণ্ড মনোবল, তীব্র উৎসাহ আর উদ্দীপনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরো সময়টা জুড়ে সাহাবিদের মনোবল চাঙ্গা রাখেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন। আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিনের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

'আনসার ও মুহাজিরগণ একদিন ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোনো ক্রীতদাস ছিল না, যাদেরকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হলেন। সাহাবিদের ক্ষুধায় ক্লিষ্টতা ও কষ্ট দেখে বললেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আখিরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। তুমি আনসার আর মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও।

সাহাবিরা উত্তরে বললেন,

আমরা তো সব বাইয়াত করেছি মুহাম্মাদের ﷺ হাতে,
জিহাদ করবো, লড়ে যাব, দেহে যতদিন প্রাণ থাকে।

সেসময় সাহাবিদের খাবার হিসেবে বরাদ্দ ছিল এক মুঠো যব। বাসি চর্বিতে মিশিয়ে

সেই যব রান্না করা হতো। বড় বিস্বাদ সে খাবার, বড় দুর্গন্ধময়।'[39]

নেতৃত্বের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত সেদিন রচিত হলো। আল্লাহর রাসূল কবিতা পড়ছেন, সাহাবিরাও সমবেত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করছে। এভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিখা খননের কাজ সহজ হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা এই আন্তরিক মানুষগুলোর ব্যাপারে আয়াত নাযিল করলেন,

> "মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহর ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসূলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ না করে চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।" (সূরা নূর, ২৪: ৬২)

জিহাদ এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে মু'মিন ও মুনাফিক্বদের আচরণে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। জিহাদের ব্যাপারে মুনাফিক্বদের কখনোই মু'মিনদের মতো উৎসাহ থাকবে না। খন্দক্বের যুদ্ধে জরুরি প্রয়োজনে মু'মিনরা রাসূসুল্লাহর ﷺ অনুমতি নিয়ে কাজ থেকে বিরতি নিতেন। প্রয়োজন মেটাতে শহরের ভেতরে যেতেন এবং দ্রুত চলে আসতেন। অন্যদিকে মুনাফিক্বরা ছোটখাটো অজুহাত দিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে থাকে। এমনকি অনুমতি না নিয়েই ভেতরে চলে যায়। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

> "রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহবানের মতো গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (সূরা নিসা, ২৪: ৬৩)

সাহাবিরা পরিখা খননের কাজ শেষ করলেন। কুরাইশ ও গাতফান বাহিনী মদীনার কাছে চলে আসে। পরিখা দেখে তারা হতচকিত হয়ে যায়। তারা এরকম কিছু আশাই করেনি! তারা ভাবছিল দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হামলা চালিয়ে খুব সহজে মদীনা দখল করে ফেলবে। তাদের মনোবলে কিছুটা ভাটা পড়ে গেল। কেননা তারা এসেছিল সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি নিয়ে। মদীনাকে অবরোধ করে রাখা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

খন্দক্বের যুদ্ধে বদর বা উহুদের মতো মুখোমুখি যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ হয়। জোট বাহিনী বিভিন্নভাবে মদীনায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালায়, কিন্তু

---

[39] সহীহ বুখারি, অধ্যায় ৬৪ মাঘাজি, হাদীস ১৪৪।

সেটা তারা করতে পারেনি।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ: আলী ﷺ বনাম আমর ইবন আব্দ আল-উদ

আমর ইবন আব্দ আল-উদ ছিল কুরাইশদের এক জনপ্রিয় বীরযোদ্ধা। সে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে দ্বৈতযুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করে, 'কে আছে আমার সাথে লড়বে?'

আলী ﷺ এগিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'আমি যেতে চাই আল্লাহর রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ বললেন, 'তুমি যেও না। ও হলো আমর ইবন আব্দ আল-উদ।' আমর ছিল বেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে নিরুৎসাহিত করলেন।

আমর তখন টিটকারি মেরে বলে উঠলো, 'কী হলো! তোমাদের কি একজনও নেই? কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যেখানে তোমরা শহীদ হলে যেতে পারবে?'

আলী ﷺ আবার উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ না করলেন। আমর তৃতীয়বার চ্যালেঞ্জ জানালে আলী ﷺ আবার অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

- আলী! বোঝার চেষ্টা করো। এটা হচ্ছে আমর ইবন আব্দ আল-উদ!
- হোক, তবু আমি লড়তে চাই।

এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুমতি পেয়ে আলী এগিয়ে গেলেন দ্বৈতযুদ্ধে। আমর আলীকে জিজ্ঞেস করলো,

- কে তুমি?
- আমি আলী।
- আবদ মানাফের ছেলে আলী?
- না, আমি আবু তালিবের ছেলে আলী।
- দেখো, ভাতিজা, তোমার চাচাগোছের কেউ নেই লড়াই করার জন্য? তোমার রক্ত ঝরানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই।
- কিন্তু আমার আছে! আল্লাহর কসম করে বলছি!

আমর ক্ষেপে গিয়ে আলীর বর্মে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো। সেই আঘাতে বর্ম ভেঙে আলী ﷺ মাথায় আঘাত পেয়ে যান। আমরের তলোয়ার আলীর বর্মে আটকে যায়। আলী তখন আমরের ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

বিপদের প্রথম কালো মেঘ: ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা

পরিখা খনন করে রাখায় সামরিক জোট খুব বেশি সুবিধা করতে পারছিল না। এদিকে দিনের পর দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে মুসলিমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। মদীনা অবরোধ করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ জোটবাহিনীর ছিল না। তাই তারা মদীনার অভ্যন্তরে বনু কুরায়যাকে দিয়ে মদীনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানোর পরিকল্পনা করে যেন মুসলিমরা ভেতরে-বাহিরে দু'দিকেই বিপদে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাব বনু কুরায়যার নেতা কা'ব ইবন আসাদের সাথে দেখা করতে যায়।[40]

হুয়াইকে দেখে তার দুরভিসন্ধির আঁচ করতে পেরে কা'ব দরজা বন্ধ করে দেয়। হুয়াই কড়া নাড়তে নাড়তে বলে,

- কা'ব! তোমার কী হলো! দরজা খোলো!

- তুমি একটা আস্ত অলক্ষুণে লোক! মুহাম্মাদের সাথে আমার চুক্তি আছে। আমি সেই চুক্তি কিছুতেই ভাঙবো না। সে সবসময় ওয়াদা রক্ষা করেছে। কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তুমি আমাকে এসবের মাঝে টেনো না।

- ধেত্তেরি! আগে তুমি দরজা খোলো তো! তোমার সাথে আমার কথা আছে!

- খুলবো না আমি দরজা।

- হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। তোমার খাবারে আমি ভাগ বসাবো সেই ভয়ে তুমি দরজা খুলছো না।

কথাটা কা'বের খুব গায়ে লাগলো, সে ক্ষেপে গেল। সে দরজা খুলে দিলো। হুয়াই বললো,

- শোনো কা'ব! তোমার জন্য আমি এসেছি বিরল সম্মান আর অতল সাগরের সন্ধান নিয়ে, আর আমার সাথে তুমি এই আচরণ করছো! তুমি কি জানো আমি কুরাইশদের সব নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে এসেছি? রুমার স্রোত-সংযোগস্থলে তাদের মোতায়েন করেছি। গাতফানের নেতা আর লোকদেরকেও নিয়ে এসেছি। তারা আছে উহুদের পাদদেশে নাকমা পাহাড়ে। ওরা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছে, মুহাম্মাদ ও তার দলবলকে উৎখাত না করে তারা এবার ছাড়বে না।

- তুমি কোনো খুশির খবর আনোনি হুয়াই। তুমি এনেছো আমার লাঞ্ছনা আর অপমানের খবর। তুমি এনেছ এক পানিশূন্য মেঘ, যা শুধু চমকে আর গর্জে, বর্ষে না মোটেও। তুমি আমাকে এর মধ্যে টেনো না, আমি এসবের মাঝে নেই।

কিন্তু হুয়াই তাকে ফুসলাতে লাগলো। একপর্যায়ে কা'ব কিছুটা নরম হলো। কা'বের

---

[40] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২০।

মনে মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার সুপ্ত ইচ্ছা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সাহস করতে পারছিল না। কিন্তু হুয়াই এর চাপাচাপিতে সে উৎসাহ বোধ করলো এবং চুক্তিভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি টের পেলেন। তিনি এই খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য আয-যুবাইর ইবন আওয়্যামকে ﷺ পাঠান । যুবাইর ফিরে এসে জানান, বনু কুরায়যা তাদের দুর্গগুলো প্রস্তুত করছে, রাস্তাঘাট খালি করছে আর তাদের গবাদিপশু জড়ো করছে। এগুলো ছিল যুদ্ধের প্রস্তুতির লক্ষণ। শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাদ ইবন মুআয, সাদ ইবন উবাদাহ, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা এবং খাওয়াত ইবন যুবাইর -- এই চারজন সাহাবিকে খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠান। তাদেরকে বলে দিলেন, 'যদি বনু কুরাইযা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সিদ্ধান্ত নেয় তবে আমাকে তা গোপনে জানাবে। আর যদি তেমন কিছু না হয় তাহলে সবাইকে জানাতে সমস্যা নেই।' এই চারজনের প্রতিনিধি দল বনু কুরায়যার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন তারা যা আশঙ্কা করছিলেন, অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। বনু কুরায়যা বলাবলি করছে, 'মুহাম্মাদ! সে আবার কে! তার সঙ্গে আমাদের কোনো চুক্তি নেই!'[41]

সাদ ইবন মুআয খুব ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু তারা বুঝলেন রাগারাগি করে লাভ নেই, অবস্থা বেগতিক। তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ফিরে এসে সালাম দিলেন, আর শুধু দুটো শব্দ বললেন, 'আদুল এবং কাররাহ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বোঝার বুঝে নিলেন। আদুল এবং কাররাহ হচ্ছে আরবের দুই গোত্র। এরা ইতিপূর্বে মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এ দুটো গোত্রের নাম দিয়ে তারা বুঝিয়েছেন বনু কুরায়যাও এদের পথ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামাহ ইবন আসলামের ﷺ নেতৃত্বে দুইশো এবং যাইদ ইবন হারিসার ﷺ নেতৃত্বে তিনশো সৈন্যের দুটো বাহিনী পাঠালেন বনু কুরায়যার এলাকায়। উদ্দেশ্য ছিল বনু কুরায়যাকে ইঙ্গিত দেওয়া: মুসলিমরা মোটেও ভেঙে পড়েনি, বরং তারা লড়াই করতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে জোটের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করতে বনু কুরায়যা ২০টি উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য জোটবাহিনীর কাছে পাঠানোর চেষ্টা করে কিন্তু মুসলিমরা সেগুলো আটক করে।

সংকটের কালো মেঘের ঘনঘটা: মুনাফিকদের পিছুটান

মদীনার উত্তরে দশ হাজার বহিরাগত সৈন্য, আর মদীনার অভ্যন্তরে বনু কুরায়যার বিদ্রোহ। এ পরিস্থিতিতে কী ছিল মুসলিমদের মনের অবস্থা? একজন ইতিহাস রচয়িতা ঘটনা বর্ণনা করেন, কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর মনের ভেতরে কী ঘটছে তা জানা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন স্বয়ং

---

[41] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২১।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

> "যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে, তোমাদের নিচ থেকে তোমাদের ওপর হামলা করার জন্য আসছিল, যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত, আর (আল্লাহর সাহায্যে বিলম্ব দেখে) তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ১০-১১)

সবার মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছিল। চাপের মুখে তাদের মনে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বিরূপ ধারণা আসতে থাকে। তারা ভাবতে থাকে -- আল্লাহ যদি আমাদের জয়ী না করেন? ইসলাম কি আসলে সত্য দ্বীন? আল্লাহ কি আসলেই আছেন? কিন্তু এই পরীক্ষা সত্যিকারের মু'মিনদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়।

> "যখন মু'মিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখলো, তখন বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ২২)

এই কঠিন পরিস্থিতিতে, এই অস্থিরতার মাঝে সত্যিকারের মুসলিমদের ঈমান ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি আনুগত্যবোধ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তারা জানতেন এটা আল্লাহ তাআলার একটা পরীক্ষা। তারা ভয় পেয়েছিলেন সত্যি। ভয় পেয়েছিল মুনাফিক্বরাও, কিন্তু পার্থক্য ছিল তাদের প্রতিক্রিয়ায়। মুনাফিক্বরা হাল ছেড়ে দিল, নিরাপত্তাহীনতার অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু মু'মিনরা হাল ছাড়লেন না। মু'আত্তাব ইবন কুশাইর নামের এক মুনাফিক্ব তো রাখঢাক না রেখে বলেই বসলো, 'মুহাম্মাদ তো আমাদের কিসরা আর সিজারের ধনদৌলতের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আর পরিস্থিতি এখন এমন যে, শান্তিতে পায়খানায় যাওয়ার অবস্থা পর্যন্ত নেই!'

হতাশা, ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দোষারোপ ও নিন্দা করা -- এগুলো মুনাফিক্বদের ট্রেডমার্ক। সামান্য বিপদে পড়লে তারা ভেঙে পড়ে, হাল ছেড়ে দেয়। শত্রুদের কাছে গিয়ে আশ্রয় চায় এবং মুজাহিদদের দোষারোপ করা শুরু করে। সেই যুদ্ধে মুনাফিক্বদের মনোভাব, আচরণ ও প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

> "এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, (আজ শত্রুবাহিনির সামনে) দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই। কাজেই, তোমরা ফিরে চলো। তাদের একটি অংশ তোমার কাছে এই বলে অনুমতি চাইছিল যে, আমাদের বাড়ি-ঘরগুলো সব অরক্ষিত। অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, পলায়ন করাই ছিল ওদের ইচ্ছা।

যদি শত্রুপক্ষ চারদিক থেকে শহরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হতো, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করতো, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করতো এবং তারা মোটেই বিলম্ব করতো না। অথচ এই লোকেরাই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। (তাদের জানা উচিত,) আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করতে চাও, তবে এ পলায়ন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে।

বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা (অন্যদের যুদ্ধে যেতে) বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদের বলে, আমাদের কাছে এসো। ওদের অল্পসংখ্যক লোকই যুদ্ধ করে।

তোমাদের বিজয়ে তারা কুণ্ঠিত বোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। এরপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা গনিমতের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে। তারা মু'মিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ।

(অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও) তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা মরুভূমির বেদুঈনদের সাথে থেকে যেতে পারতো আর সেখানে বসে তোমাদের খবর নিতে পারতো। যদিও ওরা এখনো তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু এরা খুব কমই যুদ্ধে অংশ নেয়।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ১৩-২০)

এই আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

১) দ্বীনের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে মুনাফিকরা রাজি থাকে না। কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে না, বরং তারা আল্লাহ সম্পর্কে উদ্ভট সব কথা বলতে থাকে। কাফিরদের সামান্য চাপে তারা ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ে।

২) মুনাফিকরা স্বার্থপর প্রকৃতির হয়। যে সময়টাতে মুসলিমদের এক হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা জরুরি ছিল, সেই সময় মুনাফিকরা নিজেদের গা বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়ে যায়। বিপদের সময় তারা চোখ উল্টে ফেলে। যখন বিপদ কেটে যায় তখন গনিমতের মালের হিসাব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

৩) মৃত্যু নির্ধারিত। সুতরাং এ মৃত্যু থেকে মানুষ পালানোর যত চেষ্টাই করুক না কেন

কোনো লাভ নেই। মুনাফিক্বরা ভুল জায়গা থেকে সাহায্য আশা করছিল। তারা কাফিরদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল বলেছেন যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই তাদেরকে রক্ষা করতে পারেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন।

৪) জিহাদে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে মুনাফিক্বদের অনীহা কাজ করে। মুনাফিক্বরা চাইছিল মদীনার অদূরে বসে সেখান থেকে সব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে, কিন্তু নিজেরা 'ঝামেলা' থেকে দূরে থাকবে। ব্যাপারটা অনেকটা এমন, মুনাফিক্বরা মুসলিমদের পাশে থাকবে না কিন্তু টেলিভিশনে মুসলিমদের অবস্থা দেখবে। তারা নিজেরাও জিহাদে অংশ নিচ্ছিল না, অন্যদেরকেও জিহাদে যেতে অনুৎসাহিত করছিল।

একের পর এক আক্রমণ

কুরাইশ ও গাতফানের সামরিক জোট মদীনার ব্যূহ ভেঙে ঢুকে পড়তে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যায়। প্রতি রাতে তারা পরিখার এক মাথা থেকে আরেক মাথা টহল দিয়ে অরক্ষিত জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। একবার খালিদ ইবন ওয়ালিদ তার ঘোড়সওয়ারি দল নিয়ে পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে থামিয়ে দেয় উসাইদ ইবন হুদাইরের ২০০ সেনার একটি দল। সেই খণ্ডযুদ্ধে তুফাইল ইবন আন-নুমান শহীদ হন। তাকে বর্শা ছুঁড়ে হত্যা করে হামযার হত্যাকারী ওয়াহশি। এই যুদ্ধে হাব্বান ইবন আল-আরিকাহর তীরের আঘাতে সাদ ইবন মুআয ﵁ আহত হন। হামলা-পাল্টাহামলা-প্রতিরোধ -- এভাবে কেটে যায় প্রায় বিশটি দিন।

কূটনৈতিক যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শত্রুদের কার কী উদ্দেশ্য তা খুব ভালোই জানতেন। শত্রু বলতে তখন তিনটি ভিন্ন দল। বহিরাগত শত্রু মক্কার কুরাইশ আর গাতফান তো আছেই, সাথে যুক্ত হলো অভ্যন্তরীণ শত্রু ইহুদি গোত্র বনু কুরায়যা।

কুরাইশ আর ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের বিরোধ ছিল ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিরোধ। তারা নিছক অর্থ-সম্পদের জন্য লড়ছিল না। তারা জানতো মুসলিমদের দমন করতে না পারলে আরবে তাদের আদর্শ, প্রভাব, প্রতিপত্তি সবই বিলীন হয়ে যাবে। তাদের কাছে এটা টাকা-পয়সা থেকেও গুরুতর বিষয়। ইসলামের উত্থান মানে তাদের জন্য অস্তিত্বের প্রশ্ন। অন্যদিকে গাতফানের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই অর্থনৈতিক স্বার্থ। কীভাবে নিজেদের পকেট ভারী করা যায় সেটাই তাদের একমাত্র চিন্তা। হোক তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিংবা অন্য কারো বিরুদ্ধে। সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে মনে হচ্ছিল শত্রুপক্ষের একটি অংশের সাথে চুক্তি করে তাদের ঐক্য ভেঙে

দেওয়ার মাধ্যমে এই অবরোধকে দুর্বল করে দেওয়া সহজ হবে। চুক্তির জন্য আল্লাহর রাসূল বেছে নিলেন গাতফান গোত্রকে।

জিহাদ যুদ্ধক্ষেত্রের ইবাদত বটে, কিন্তু কেবল সামরিক শক্তিই সবকিছু নয়। জিহাদকে সফল করতে চাই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক পারদর্শিতা। গাতফানের সাথে চুক্তি করার বিষয়টা আল্লাহর রাসূলের ﷺ অসাধারণ কূটনৈতিক পারদর্শিতাই প্রমাণ করে।

গাতফানের নেতাদের প্রস্তাব করা হলো, যদি তারা কুরাইশ-ইহুদির সম্মিলিত জোট ভেঙে চলে যায় আর মুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তি করে তাহলে মদীনার এক বছরে যত ফসল হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। যুদ্ধ না করেই এতগুলো শস্য পেয়ে যাওয়া কম কথা নয়! তারা অনায়াসে রাজি হয়ে গেল। চুক্তিপত্র লেখা হলো, বাকি থাকলো স্বাক্ষর করে চূড়ান্ত করা।

কিন্তু চুক্তি সাক্ষরের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের সাথে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা মদীনার সিংহভাগ ফসলের মালিক ছিল এই আনসাররাই। তিনি আনসারদের দুই নেতা, সাদ ইবন মুআয ﷺ এবং সাদ ইবন উবাদাহকে ﷺ গাতফানের সাথে সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়টি জানালেন।

সাদ ইবন মুআয ﷺ মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। এরপর বললেন,

- হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন এই চুক্তি করতে চান? এটা কি আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা নাকি আল্লাহর আদেশ? আল্লাহ তাআলার আদেশ হলে তো মানা অবশ্য কর্তব্য, আর আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হলেও আমরা মাথা পেতে নেব। তবে আপনি যদি আমাদের ভালোর কথা ভেবে এই চুক্তি করতে চেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন,

- আমি তোমাদের স্বার্থেই এই চুক্তিটি করতে চাই। আরবরা সবাই তোমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে, সবদিক থেকে তোমার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এই চুক্তি করা হলে তোমাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে বলে আমি মনে করি।

কঠিন এক মুহূর্ত। দীর্ঘ বিশ দিন ধরে শত্রুরা মদীনা অবরোধ করে রেখেছে। মুসলিমরা ক্লান্ত। এ অবস্থায় কতদিন নিজেদের মনোবল ধরে রাখা সম্ভব, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। দশ হাজার সেনাদল যদি মদীনায় ঢুকে পড়ে, হয়তো মৃত্যুই হবে মুসলিমদের পরিণতি। অন্যদিকে এই ধরনের একটা চুক্তিতে নিশ্চিতভাবে মুসলিমরা উপকৃত হবে। তবু সেই বিপদের ঘনঘটায় অবিচল সাদ ﷺ দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা একটা সময় মুশরিক ছিলাম। গাতফানরাও মুশরিক। আমরা

আল্লাহর ইবাদত করতাম না, মূর্তিপূজা করতাম। আল্লাহ যে কে -- সেটাই তখন জানতাম না। সেই (জাহিলিয়াতের) সময়ের কথা বলছি, এই গাতফানের লোকেরা আমাদের কাছ থেকে একটা খেজুর কেড়ে নেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। হয় তারা আমাদের অতিথি হিসেবে এসে আমাদের খেজুর খেতে পেরেছে, নয়ত নিজের পয়সা দিয়ে কিনে খেয়েছে। আর আজকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলাম দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন, আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন, আপনাকে আমাদের মাঝে পাঠিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন -- আজ কিনা আমরা আমাদের সম্পত্তি ওদের হাতে তুলে দেবো? এমন চুক্তির আমাদের প্রয়োজন নেই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম করে বলছি, ওদের আমরা কিচ্ছু দেবো না। ওদের জন্য আমাদের তরবারিগুলো উঁচিয়ে ধরবো -- যতক্ষণ না মহান আল্লাহ আমাদের আর ওদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'[42]

উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা ভালো মনে করো। সাদ ইবন মুয়াজ رضي الله عنه তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে চুক্তিপত্রের দলিল নিয়ে লেখাগুলো মুছে ফেললেন। বললেন, 'এবার তারা আমার সাথে লড়াই করুক।'

রাসূল ﷺ সমঝোতা করতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু আনসাররা যুদ্ধ করতেই আগ্রহী ছিলেন। তাদের ঈমান দৃঢ় ছিল। তারা ছিলেন মর্যাদাবান মানুষ। যে গাতফান গোত্র জাহিলিয়াতের যুগে তাদের সমীহ করে চলত, ইসলামের যুগে এসে সেই গাতফানের সাথে সমঝোতা করতে তাদের আত্মমর্যাদায় বাধে। মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত কারো সাথে কিছুমাত্র আপস করতে তারা রাজি ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা এই অসাধারণ মানুষগুলোর উপর রহম করুন।

এই কথোপকথন থেকে আরেকটা চমৎকার বিষয় শেখার আছে। তা হলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে তাঁর সাহাবিদের চমৎকার বোঝাপড়া। সাহাবিরা যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যেকোনো আদেশ মেনে নিতে এক পায়ে খাড়া ছিলেন, তেমনি আল্লাহর রাসূলও তাদের মতামত শুনতেন, সম্মান দেখাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ছিলেন নেতাদের মধ্যে সেরা আর তাঁর অনুসারীরাও ছিল অনুসারীদের মধ্যে সেরা!

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম সাহায্য: নুআইম ইবন মাসউদ رضي الله عنه

পরিস্থিতির এই পর্যায় পর্যন্ত মুসলিমরা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছে, তাঁর উপর ভরসা করে এসেছে এবং দ্বীন ইসলামের আদর্শে অটল থেকেছে। ঈমানের পরীক্ষায় মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছে, তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাহায্য করবেন। বাহ্যিক বিবেচনায় মুসলিমদের এই যুদ্ধে হেরে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ তাঁর

[42] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২২।

মক্কা
উহুদ পর্বত
পরিখা
মসজিদে নববী
বনু কুরাইযা গোত্র
খাযরায গোত্র
বনু নাযির গোত্র
খন্দকের যুদ্ধ
আউস গোত্র
মসজিদে কুবা

বান্দাদের অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য করেন। তিনি পাঠালেন নুআইম ইবন মাসউদ নামের এক ব্যক্তিকে।

নুআইম ইবন মাসউদ ছিলেন গাতফান গোত্রের। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার গোত্রের লোকজন তা জানে না। আপনি আমাকে যা খুশি আদেশ করুন।' গাতফান মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসলিমরা টিকে থাকবে নাকি কোনো ঠিক নেই। এমন সময়ে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে ভাবাই যায় না! কিন্তু এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ চেয়েছিলেন তাকে আল্লাহর সৈনিক বানাবেন, তাই উপযুক্ত সময়ে তাকে বের করে এনেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নুআইমকে বললেন, 'তুমি একা একজন মানুষ, যদি আমাদের সেনাদলে যোগ দাও, তাতে পরিস্থিতি খুব বেশি হেরফের হবে না। কাজেই এমন কিছু করো যাতে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। একটা কথা মনে রেখো, যুদ্ধ মানেই ধোঁকা।'

নুআইম ﷺ ছিলেন বুদ্ধিমান লোক। তিনি জানতেন কে কার আদর্শিক শত্রু এবং কে কার কৌশলগত মিত্র। এই সহজ সমীকরণটি আবিষ্কার করে তিনি প্রথমে বনু কুরাইযার ইহুদিদের কাছে গেলেন। তাদের বললেন,

'দেখো তোমরাও আমাকে এতদিন ধরে চেনো, আমিও তোমাদের চিনি। আমাদের বন্ধুত্ব নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। তোমরা ভালো করেই জানো, আমি যদি তোমাদের কোনো উপদেশ দিই, সেটা তোমাদের ভালোর জন্যই। তোমরা আসলে বেশ বড়সড় একটা ভুল করেছ। মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধে নামতে চাচ্ছো, অথচ তোমরা থাকো কিন্তু এই মদীনাতেই। এখানে তোমাদের স্ত্রী-সন্তান আছে, সহায়-সম্পত্তি আছে। কুরাইশ আর গাতফানের অবস্থা কিন্তু তোমাদের মতো না, এটা তাদের দেশ না। তারা পরিবার-পরিজন সব ঠিকঠাক রেখে যুদ্ধে এসেছে। এখন যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে যেমন এসেছে, তেমনি অবস্থা বেগতিক দেখলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেরত যাবে। তখন তোমাদের কী হবে ভেবেছো? তোমরা থাকবে মুহাম্মাদের হাতের মুঠোয়। তার সঙ্গে লড়ে তোমরা সুবিধা করতে পারবে না। তারচেয়ে বরং তোমাদের একটা বুদ্ধি দিই, শোনো: তোমরা কুরাইশদের নেতাদের থেকে কিছু লোককে বন্ধক হিসেবে তোমাদের কাছে রাখো। এটা নিশ্চিত করতে না পারলে যুদ্ধ কোরো না। তাদের সাথে তোমরা যে চুক্তি করলে, তার নিশ্চয়তাস্বরূপ তাদের কিছু লোক তোমাদের জিম্মায় থাকুক, যুদ্ধ শেষ হলে তারপর ছেড়ে দেবে।'[43]

তখনকার দিনে এভাবে কাউকে জিম্মি রাখা অস্বাভাবিক কোনো রীতি ছিল না। তাই

[43] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৭।

বনু কুরায়যা নুআইমকে সন্দেহ করলো না। আর তার কথায় যুক্তিও ছিল, তাই তারা রাজি হয়ে গেল। এরপর নুআইম ﷺ গেলেন কুরাইশদের কাছে, তাদের বললেন,

'তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব নিয়ে আশা করি নতুন করে কিছু বলতে হবে না। তোমরা তো আমাকে চেনোই। আমি তোমাদের ভালোর জন্যই উপদেশ দেবো, সেটাও তোমরা জানো। আমার কানে একটা খবর এসেছে। তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তোমাদের সেটা জানানো কর্তব্য বলে মনে করি। তোমরা হয়তো টের পাওনি, আমি শুনেছি, মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি বাতিল করে ইহুদিরা এখন অনুতপ্ত। তারা তার সাথে আবার পুরোনো চুক্তিতে ফিরে যেতে চায়। তারা যে আসলেই অনুতপ্ত সেটা প্রমাণ করার জন্য তারা মুহাম্মাদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে এই বলে যে: আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। এই কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যদি আমরা কুরাইশ ও গাতফানদের কিছু নেতাকে আপনার হাতে তুলে দিই আর আপনি তাদের হত্যা করতে পারেন -- আপনি কি তাতে খুশি?

মুহাম্মাদ তাদের এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছে বলেই জানি। কাজেই ইহুদিরা যদি তোমাদের কাউকে জিম্মি হিসেবে নিয়ে যেতে চায় তাহলে সাবধান! ভুলেও তোমাদের কাউকে তাদের হাতে দিও না।'[44]

এরপর তিনি গাতফান গোত্রের কাছে গিয়ে একই কথা পুনরাবৃত্তি করেন।

জোটের প্রত্যেকে নুআইমের কথা বিশ্বাস করলো আর তাদের নিজেদের মধ্যে জন্ম নিল অবিশ্বাস। কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে, নুআইম মুসলিম হয়ে এখন আল্লাহর রাসূলের পক্ষে কাজ করছে। এদিকে কুরাইশরাও অস্থির হয়ে ওঠে। তারা যে করেই হোক একটা দফারফা চাচ্ছিল। ইকরিমা ইবন আবু জাহলকে প্রতিনিধি হিসেবে তারা বনু কুরায়যার কাছে পাঠায়। সে বলে, 'দীর্ঘদিন অবরোধ করে আমরা বেশ ক্লান্ত। আমাদের ঘোড়া আর উটগুলো মারা যাচ্ছে। আমরা যুদ্ধের জন্য সরবরাহ চাই। তোমরা প্রস্তুতি নাও। আমরা আজকেই মুহাম্মাদের সাথে চিরতরে বোঝাপড়া করে ফেলি, তাকে খতম করে দিই।' ইহুদিরা বললো, 'আমরা তো শনিবারে যুদ্ধ করি না। আর তোমরা আদৌ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে কি না -- সেটা নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি। তাই জামানতস্বরূপ তোমাদের কিছু লোককে আমাদের কাছে দাও। মুহাম্মাদকে শেষ করা পর্যন্ত তারা আমাদের কাছেই থাকবে।'

ইকরিমা ফিরে এসে আবু সুফিয়ানকে এ খবর জানালে সে বলে, 'আরে! নুআইম তো ঠিক এই কথাটাই আমাদের বলেছিল!' আবু সুফিয়ান বনু কুরায়যার কাছে খবর পাঠায় যে, তারা ইহুদিদের কাছে কোনো কুরাইশিকে জিম্মি রাখবে না। সে কথা শুনে ইহুদিরা বললো, 'নুআইমের কথা দেখছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে গেল! এই কুরাইশের

---

[44] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৮।

লোকেরা মোটেও আন্তরিক নয়। বিপদে পড়লে ঠিকই আমাদের ছেড়ে পালাবে। কুরাইশ আর গাতফানকে সাফ জানিয়ে দাও আমাদের হাতে তাদের কাউকে জিম্মি না দিলে আমরা তাদের সাথে নেই।'

নবীজি ﷺ তখন আল্লাহর কাছে একটা দুআ করেছিলেন,

> *'হে আল্লাহ, হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! ঐ সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে দিন! তাদের পরাজিত করে দিন, তাদের নড়বড়ে করে দিন!'*[45]

তাঁর এই দুআ কবুল হয়েছিল, একটি বিশাল সামরিক জোটকে আল্লাহ ভেঙে দিলেন একটি মাত্র মানুষকে ব্যবহার করে -- নুআইম ইবন মাসউদ رضي الله عنه। মুসলিমরা ঈমান, ধৈর্য, অধ্যবসায় আর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহও তাদের সাহায্য করলেন।

গাতফানের সাথে চুক্তি ও নুআইমের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন গাতফানকে জোট থেকে আলাদা করে দিতে। এটা হিকমাহর পরিচায়ক। কারণ সবার সাথে একসাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যদি শত্রুদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা যায় কিংবা একটি অংশকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যায়, তবে সেটাই উত্তম। কেননা তাতে শত্রুকে দুর্বল করে ফেলা যায়।

২) নেতার উচিত তার প্রত্যেকটা সৈনিক এবং উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার করা। সবাইকেই ময়দানের সৈনিক হতে হবে এমন নয়। রাসূল ﷺ নুয়াইমের হাতে তরবারি তুলে দেননি। তিনি জানতেন কী কাজে তাকে ব্যবহার করা সর্বোত্তম। প্রত্যেককে তার উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত পরিবেশে নিয়োগ করা উচিত।

আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সাহায্য: ঝড়ো বাতাস

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল প্রথমে মুসলিমদের সাহায্য করেছেন নুআইম ইবন মাসউদের মাধ্যমে। এর পরেই তিনি পাঠান প্রচণ্ড ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস আর ফেরেশতাদের বাহিনী, যা শত্রুদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

> "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিআমতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে

---

[45] সহীহ বুখারি, অধ্যায় দুআ, হাদীস ৮৭।

তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৯)

এই হিমশীতল হাওয়ায় কুরাইশরা ধ্বংস হয়নি সত্যি, কিন্তু ভয়ানক বাতাসের তোড়ে তাদের মনে একটা ত্রাস সৃষ্টি হয়। ভয়াবহ সেই বাতাস, ভয়ানক সে বাতাসের জোর। তাঁবুর রশি ছিড়ে গেছে, রান্নার পাতিলগুলো উল্টে পড়ে কোথায় উড়ে গেছে। আলো নিভে গেছে, ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে গেছে। সেই সাথে ফেরেশতারা চারপাশ থেকে চিৎকার করে বলে ওঠেন, আল্লাহু আকবার!

সব মিলিয়ে শত্রু শিবিরে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, গোত্রের নেতারা সব চিৎকার করে উঠলো, 'কে আছো! জলদি আসো! আমাকে বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে!' প্রচণ্ড ভয়ে তাদের মনে হচ্ছিল তারা বুঝি মারাই যাবে। যুদ্ধ করার মতো মনোবল বা সাহস কিছুই আর অবশিষ্ট থাকলো না।

অদ্ভুত বিষয় হলো, এতকিছু হয়ে গেল অথচ মুসলিমরা কিছু টেরও পায়নি। এই বাতাস শুধু শত্রুশিবিরেই আক্রমণ করেছিল। আল-কুরতুবির মতে, এই বাতাস ছিল নবীজির একটি মু'জিযা।

খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ী হবার কোনো কারণ ছিল না। মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য সম্ভাব্য সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শত্রুদের সংখ্যা আর শক্তির সামনে সেসব নিতান্তই অপ্রতুল। যতই অভিনব কিংবা কার্যকরী সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হতো না কেন, এই যুদ্ধে জেতা অসম্ভব ছিল। পরাজয় ছিল সময়ের ব্যাপার। তাই আল্লাহর রাসূল সাহায্য চেয়েছিলেন সেই সত্তার কাছে যিনি চাইলে যে কোনো কিছু করতে পারেন। এবং তা-ই হয়েছে, আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করেছেন।

জোটবাহিনীর প্রস্থান

অবরোধের ক্লান্তি, হতাশা, কোন্দল আর সবশেষে ঝড়ো বাতাস -- সব মিলিয়ে কুরাইশরা মানসিকভাবে একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা যেন আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের অবস্থা ও কৌশল বোঝার জন্য একজন সাহাবিকে শত্রু ক্যাম্পে নজরদারি করার জন্য পাঠাতে চাইলেন। সবাইকে ডেকে বললেন, 'কে আছে যে আমাকে শত্রুর ব্যাপারে তথ্য এনে দেবে? যে এই কাজ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আমার সাথে স্থান দেবেন।'

চারদিকে পিনপতন নীরবতা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার ডাকলেন। কেউ সাড়া দিল না। তারপর আবার।

সাহাবিরা সাধারণত ভালো কাজের সুযোগ পেলেই লুফে নিতেন। আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশ মানতে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কেউই জবাব দিল না।

হিমশীতল রাত। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সারাদিনের ধকলের পর সবাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। এর মধ্যে শত্রুশিবিরের একেবারে ভেতরে গিয়ে খবর নিয়ে আসার মতো বিপজ্জনক মিশনে যাওয়ার অবস্থা কারোরই নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আর অপেক্ষা করলেন না। তাঁর দক্ষ নজরে বেছে নিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত সৈনিকটিকে। হুযাইফা ইবন আল-ইয়ামানের নাম ধরে ডেকে বললেন, 'হুযাইফা, তুমি যাও, শত্রুদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে আনো। কিন্তু এমন কিছু করে তাদের উসকে দিও না যাতে করে তারা আমাদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে নেমে পড়ে।'

এতক্ষণ বিষয়টা ছিল ঐচ্ছিক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সরাসরি আদেশ করলেন, হুযাইফাকে তাই যেতেই হলো। হুযাইফা ছিলেন বুদ্ধিমান, চোখ-কান খোলা, প্রত্যুৎপন্নমতি, পরিস্থিতি চট করে সামাল দিতে সক্ষম।

হুযাইফা ؓ বের হলেন। বাইরে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা, কিন্তু হুযাইফা ؓ তার কিছুই টের পেলেন না। সবই আল্লাহর সাহায্য! সেই অন্ধকার রাত্রিতে হুযাইফার ؓ অভিজ্ঞতা তার মুখেই শোনা যাক,

'আমি বের হয়ে এলাম, মনে হলো যেন উষ্ণ পানির উপর হাঁটছি। সুযোগ বুঝে শত্রুদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়লাম। গিয়ে দেখি লণ্ডভণ্ড অবস্থা। আবু সুফিয়ান আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে গা গরম করছে। তাকে দেখেই আমি আমার ধনুকে তীর বসিয়ে ফেললাম। তাকে হত্যা করতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ল, আল্লাহ রাসূল তো আমাকে নিষেধ করেছেন যেন উসকানিমূলক কোনো কাজ না করি। এই ভেবে আর কিছু করলাম না। কিন্তু আমি যদি চাইতাম, সেদিনই তাকে হত্যা করতে পারতাম।'

গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আবু সুফিয়ানের হঠাৎ সন্দেহ হলো এই অন্ধকারের মাঝে শত্রুপক্ষের কেউ তো চাইলে ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে! সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'কুরাইশরা, তোমরা দেখে নাও তোমাদের পাশে কে আছে। সবাই সবার পাশেরজনের পরিচয় জেনে নাও।'

হুযাইফা এ কথা শোনার পর এক সেকেন্ডও দেরি করলেন না। ঝট করে তার ডান পাশেরজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাই, তুমি কে?' উত্তর এল, 'আমি মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান।' ডানপাশের জনকে জিজ্ঞেস করেই সঙ্গে সঙ্গে বামদিকে ফিরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?' বাম পাশ থেকে উত্তর এল, 'আমি আমর ইবন আল-আস।' হুযাইফা এত বুদ্ধিমত্তার সাথে পুরো ঘটনা ঘটালেন যে পাশের দুইজন সন্দেহই

করলো না হুযাইফা বাইরের কেউ। তারা তাকে কিছু জিজ্ঞেসই করলো না।

'আমি আমার কাজ শেষ করে চলে এলাম। আসার সময় আবারও মনে হলো উষ্ণ পানির ওপর দিয়ে হাঁটছি। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যখন ফিরে গেলাম, তখন বেশ ঠান্ডা লাগতে শুরু করলো। আমি যা যা দেখে এসেছি তা রাসূলুল্লাহকে জানালাম (শত্রুরা চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে)। তিনি তখন আমাকে তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে আমাকে জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো ফজরের সময়ে, আল্লাহর রাসূল আমাকে ডাকছেন, এই যে ঘুমকাতুরে! ওঠো!'

হুযাইফার ﷺ ইন্টেলিজেন্স অপারেশন থেকে শিক্ষা

১) হুযাইফার শৃঙ্খলাবোধ

হুযাইফা চাইলেই আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে পারতেন।[46] আবু সুফিয়ান তখন মক্কার নেতা। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এটা ছিল একটা ইন্টেলিজেন্স অপারেশন, গুপ্তহত্যার অপারেশন নয়। তাই হুযাইফা সুযোগ পেয়েও হত্যা করেননি।

২) আল্লাহর সাহায্য

যতক্ষণ মিশনে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি একেবারেই ঠাণ্ডা অনুভব করেননি। যখন তিনি ফিরে এসেছেন, তখন তার ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করে। এটা ছিল একটা কারামাত।

৩) সাহাবিদের প্রতি রাসূলুল্লাহর ﷺ স্নেহ

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সাহসিকতা আর আনুগত্যের কদর করতে কখনো ভোলেননি। এই দুঃসাহসী অপারেশন শেষে হুযাইফা ফিরে আসার পর যখন তার ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের শরীর থেকে চাদর খুলে হুযাইফার গায়ে জড়িয়ে দেন। নিজে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। স্নেহমাখা কণ্ঠে বলেন -- এই যে ঘুমকাতুরে! স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘুম থেকে ডাকতে এসেছেন!

৪) সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটা অনেক পরের, হুযাইফা তখন বৃদ্ধ। কুফার এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি রাসূলুল্লাহকে দেখেছেন? আপনি কি তাঁর সাহাবি ছিলেন?' এই লোকটি ছিল তাবেয়িদের একজন, অর্থাৎ সাহাবিদের পরের প্রজন্ম। হুযাইফা বলেন, 'হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি। আমরা তাঁর সাহাবি ছিলাম।' তাবেয়ি তখন জিজ্ঞেস করলেন 'আপনারা তাঁকে কেমন কদর করতেন?' হুযাইফা বললেন, 'তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁকে যথাযথ কদর করা

---

[46] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১২২।

খুব কঠিন ছিল। তবু আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।' সেই তাবেয়ি তখন বললো, 'আল্লাহর শপথ, যদি আমরা তাঁর সময়ে বেঁচে থাকতাম তাহলে আমরা তাঁর পায়ে একটা ধুলোও লাগতে দিতাম না। আমরা তাঁকে মাথায় করে রাখতাম।'

হুযাইফা ﷺ সেই তরুণ তাবেয়িকে একটা শিক্ষা দেওয়া জরুরি মনে করলেন। তাকে শোনালেন খন্দকের সেই রাতের কাহিনী। তিনি তাঁকে বোঝাতে চাইলেন যে মুখে বলা অনেক সহজ, কিন্তু করে দেখানো খুব কঠিন। পরিস্থিতি কতটা কঠিন হলে রাসূলুল্লাহ তিন তিনবার ডাকার পরেও কেউ সাড়া না দিয়ে থাকে! শেষ পর্যন্ত তিনি হুযাইফাকে আদেশ করে এই মিশনে পাঠান।

সাহাবিদের পরবর্তী প্রজন্মকে সাহাবিদের সেই কষ্ট-ত্যাগ-সংগ্রামের কিছুই করতে হয়নি। তাদেরকে সাহাবিদের মতো নিজ বাবা-চাচা-ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়নি। খন্দকের যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি। দুনিয়াতে আসার সাথে সাথেই তারা সাহাবিদের মিশনের সুফল উপভোগ করতে শুরু করেছেন। তাই তাদের জন্য এটা বলা খুব সহজ যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ আরও বেশি কদর করতেন। রাসূলুল্লাহর যমানায় জন্ম নিয়ে অনেকেই কাফির হিসেবে মারা গেছে। পরবর্তী প্রজন্মকে সে ফিতনায় পড়তে হয়নি। সাহাবিদের যুগ ছিল শিরক, মূর্তিপূজা আর জাহিলিয়াতের যুগ। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার সময়ে তাদের ইসলামকে চিনে নিতে হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম সেসবের কিছুই দেখেনি। তারা জন্মের পর থেকেই ইসলামের শাসন, ন্যায় আর নিরাপত্তা উপভোগ করেতে পেরেছে। এ সবই অর্জিত হয়েছে সাহাবিদের রক্ত দিয়ে। কোনো প্রজন্মই সাহাবিদের সমান হতে পারবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ সত্যই বলেছিলেন, 'আমার প্রজন্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।'

খন্দকের যুদ্ধে অলৌকিক ঘটনা

১) মু'জিযা - এক বকরিতে আটশো লোকের খাওয়া!

এই মজার ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ,

'তখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম। জানতে চাইলাম, ঘরে কি কোনো খাবার আছে? রাসূলুল্লাহকে এত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে আর সহ্য হচ্ছে না! তোমার কাছে কোনো খাবার-টাবার কিছু আছে? সে বললো, খাবার বলতে আছে অল্প কিছু যব আর একটা বকরির বাচ্চা। আমি তখন বকরিটাকে জবাই করলাম। ওদিকে স্ত্রী যব পিষতে শুরু করে দিল। গোশত ডেকচিতে দিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে ফিরে এলাম। বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাড়িতে সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি দু-একজনকে সাথে নিয়ে চলে আসুন না! তিনি জানতে চাইলেন, কী পরিমাণ খাবার আছে? আমি বললাম কী কী আছে। শুনে তিনি বললেন, বাহ! বেশ ভালোই তো আছে! তোমার স্ত্রীকে গিয়ে

বলো, আমি না আসা পর্যন্ত যেন সে চুলা থেকে গোশত না নামায়।'

এর পরের ঘটনাটার জন্য জাবির ﷺ একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। জাবিরকে হতবাক করে দিয়ে নবীজি ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মুহাজির আর আনসাররা শোনো সবাই! জাবির আজ তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে। সবাই চলো।' জাবির ﷺ পড়লেন মহাচিন্তায়, যাকে বলে অতল সমুদ্রে। এত অল্প খাবার দিয়ে এতজনের আপ্যায়ন করবেন কীভাবে! বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন,

- আল্লাহর রাসূল তো মুহাজির, আনসার আর তাদের সব সঙ্গীসাথীকে নিয়ে চলে এসেছেন!
- আল্লাহর রাসূল কি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন খাবারের পরিমাণ কেমন?
- হ্যাঁ জানতে চেয়েছিলেন। তুমি আমাকে যা বলেছো আমি ঠিক তা-ই তাঁকে বলেছি।
- আচ্ছা, তাহলে চিন্তার কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের থেকে ভালো জানেন।

জাবিরের স্ত্রী পরম নির্ভরতার সাথে জবাব দিলেন। তার মধ্যে কোনো উদ্বেগের ছাপ দেখা গেল না!

সাহাবিরা আসা শুরু করলেন। সবাই ক্ষুধায় অস্থির। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে ধীরস্থির হতে বললেন। সাহাবিরা দশ জনের দলে ভাগ ভাগ হয়ে আসতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ রুটি টুকরো করে এর উপর গোশত দিয়ে সাহাবিদের মাঝে বিতরণ করে দিলেন, তাঁরা খেয়ে গেলেন। এরপর আসলো আরেকটি দল। এভাবে প্রায় আটশো থেকে এক হাজার লোক তৃপ্তি সহকারে খেলেন। যখন সবার খাওয়া শেষ, তখনও গোশতের ডেকচিটা গোশতে পরিপূর্ণ। আর রুটিও তৈরি হচ্ছে সমান তালে। সবার খাওয়া শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ জাবিরের স্ত্রীকে বললেন তিনি যেন নিজে খেয়ে নেন আর প্রতিবেশীদের মাঝে বাকি খাবারগুলো ভাগাভাগি করে দেন।[47] আল্লাহর রাসূলের ﷺ মু'জিযায় এক বকরি আর সামান্য যব দিয়েই আটশ'রও বেশি লোক সেদিন তৃপ্তি করে খেলো।

২) রাসূলুল্লাহর ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী

এটাও পরিখা খননের সময়ের একটা ঘটনা। পরিখা খনন করতে করতে এক বিশাল পাথর এসে পড়ে। সেটাকে কোনোভাবে ভাঙাও যাচ্ছিল না, সরানোও যাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহকে ﷺ বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বিসমিল্লাহ বলে পাথরে আঘাত হানলেন। একটা স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন,

> *'আল্লাহু আকবর! আমাকে শামের চাবি দেওয়া হয়েছে! আল্লাহর শপথ, আমি এখন শামের লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি!'*

---

[47] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ১৪৫।

এরপর তিনি আবার আঘাত করলেন। আবারো একটি স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ বললেন,

'আল্লাহু আকবার! আমাকে দেওয়া হয়েছে পারস্যের চাবি! আমি পারস্যের শ্বেতশুভ্র প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি!'

তৃতীয়বার আঘাত হানার পর পাথরটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ আবারো বলেন,

'আল্লাহু আকবার! আমাকে ইয়েমেনের চাবি দেওয়া হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে সানার দরজাগুলো দেখতে পাচ্ছি!'[48]

ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলিমদের অবস্থা খুবই করুণ। তারা তখন অবরুদ্ধ। ক্ষুধা, পিপাসা, আর অনিদ্রায় শরীর-মন অবসন্ন হয়ে আছে। এ অবস্থায় যদি এমন কেউ থাকতো, যার অন্তরে ঈমান নেই, সে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহর কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিত। কিন্তু সাহাবিদের দৃঢ় ঈমান। সেই কঠিন মুহূর্তেও তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথাগুলোকে দিনের আলোর মতো বিশ্বাস করেছে। চরম দুর্দশার দিনে বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছে। এটাই হলো সত্যিকার ঈমানওয়ালার পরিচয়।

এ ঘটনার কয়েক বছর পর সত্যি সত্যিই মুসলিমরা এই জায়গাগুলো জয় করেছিল। শাম, পারস্য, ইয়েমেন। সব তখন মুসলিমদের হাতে।

শোচনীয় অবস্থাতেই সুসংবাদ দিতে হয়। আমাদের এই সময়ে, যখন মুসলিমরা দুর্বল, ক্রমাগত মার খাচ্ছে, আমাদের জন্য সুসংবাদ কী? আমাদের জন্য সুসংবাদ হলো, শুধু শাম, পারস্য বা ইয়েমেন নয়, একটা সময় আসবে যখন মুসলিমরা সমগ্র বিশ্বকে পদানত করবে! নবীজি ﷺ বলেছেন,

'দিন আর রাত যেখানে পৌঁছেছে, এই দ্বীনও সে সমস্ত স্থানে পৌঁছে যাবে।'[49]

'আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীকে ভাঁজ করে আমার সামনে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর আমি এর পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ গুটিয়ে আমার সম্মুখে রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌছবে।'[50]

কাজেই এই উম্মাহর অবস্থা এখন যতই খারাপ হোক না কেন, বিশ্বাস হারালে চলবে

---

[48] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩।

[49] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস ১৬৫০৯।

[50] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ফিতান, হাদীস ২৪।

না। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে যে বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সে বিজয় অবশ্যই ঘটবে। আর আল্লাহ চাইলে খুব শীঘ্রই তা সম্ভব।

খন্দকের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা

১) মুসলিমদের ব্যাপারে কাফিরদের দ্বিমুখী নীতি

ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইহুদিরা মুশরিকদের চাইতে মুসলিমদের অধিক নিকটবর্তী। সে হিসেবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাথে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তাই হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখনও এমন ঘটছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলো সত্যের বিরুদ্ধে এক হতে মোটেই দ্বিধা করছে না। পশ্চিমা বিশ্বের যেসব সরকার নিজেদের 'গণতান্ত্রিক', 'মানবতাবাদী' ও উদারমনা হিসেবে দাবি করে তারা মুসলিম বিশ্বের স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, জালিম ও নিষ্ঠুর শাসকগুলোকে মদদ দিয়ে চলছে শুধুমাত্র ইসলামের উত্থানকে ঠেকানোর জন্য।

২) কাফিরদের প্রযুক্তি গ্রহণে কোনো বাধা নেই

অনেক মুসলিম কাফিরদের প্রযুক্তিকে তাদের বিশ্বাস-সংস্কৃতির সাথে গুলিয়ে ফেলে। কাফিরদের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, লাইফস্টাইল -- এসব গ্রহণ না করা গেলেও তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বা তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান নিতে কোনো বাধা নেই। পরিখা খননের যে প্রস্তাব সালমান ফারিসী ﷺ করেছিলেন সেটি ছিল কাফিরদের প্রযুক্তি। এ ধরনের কৌশলগত ব্যাপার বা কাফিরদের তৈরি প্রযুক্তির ব্যবহার ইসলামে জায়েজ।

৩) সামরিক শক্তি ও জিহাদ

এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা চাই যা সহজলভ্য। খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমরা যোজন-যোজন পিছিয়ে ছিল। কিন্তু তবু তারা হাল ছাড়েনি। অনেক মুসলিম মনে করে, আগে কাফিরদের সমপরিমাণ শক্তি ও প্রযুক্তি অর্জন করে তারপর জিহাদে অংশ নেব। সাহাবিরা কিন্তু বিষয়টা এভাবে দেখেননি। তারা তাদের হাতে যে প্রযুক্তি ছিল সেটা দিয়েই লড়ার চেষ্টা করেছেন। জিহাদ ছেড়ে আগেই সমঝোতার রাস্তায় চলার চেষ্টা করেননি।

৪) নেতৃত্বে আন্তরিকতা

লোক-দেখানো নেতারা অনেক বড় বড় কথা বলে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করে, পরিদর্শনে বের হয় -- তাদের উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। লোক-দেখানো, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ মধ্যে এসব মেকি আচরণ ছিল না। সাহাবিরা যা খেয়েছেন, তিনিও তা-ই খেয়েছেন। তাদের সাথে কাজ ভাগাভাগি করেছেন, কাদামাখা হয়ে গর্ত খুঁড়েছেন। সাহাবিদের খাটিয়ে নিজে আয়েশ করে থাকেননি। এটা লোক-দেখানো মেকি মমতা না, এটা ছিল সত্যিকারের মমতা।

৫) সৈনিকদের দৃঢ়তা ধরে রাখা

বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি চারজনের দল পাঠিয়েছিলেন। তাদের তিনি বলে দিয়েছিলেন বনু কুরাইযা যদি চুক্তিভঙ্গ করে থাকে তাহলে সেটা যেন জনসমক্ষে না বলে ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহকে জানানো হয়। যখন তিনি খবরটি শুনলেন তখন বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো!' তিনি চাচ্ছিলেন মুসলিমরা ভেঙে না পড়ুক। তিনি সুসংবাদ দিয়ে তাদের মনোবল ধরে রাখতে চাইছিলেন।

৬) জিহাদ হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ

> "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ২১)

রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কুরআনের এই আয়াতটি সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতে সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সুন্নাহ বলতে আমরা আজকাল কেবল বুঝি মিসওয়াক ব্যবহার করা, টাখনুর উপর পায়জামা পরা, দাড়ি রাখা এসব। কিন্তু কোনো মুসলিমের এসব সুন্নাহ পালন না করার কারণে এই আয়াত নাযিল হয়নি। নিঃসন্দেহে উপরোক্ত তিনটি আমলও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, আরও গভীর কিছু বোঝাতে। ইবন জারির আত-তাবারীর মতে, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জিহাদবিমুখদের তিরস্কার করেছেন। এরা জিহাদে অংশ না নিয়ে পেছনে রয়ে যায়, খন্দকের শিবিরে যোগ দেয়নি। আল্লাহ তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলছেন তাদের উচিত রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করা, তাঁর পাশে থাকা। আল্লাহ বলছেন, তোমরা কেন আমার নবীর অনুসরণ করছো না? তার আদর্শ তো তোমাদের সামনেই আছে!

ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেন, মুফাসসির আস সুদ্দী বলেছেন এই আয়াতের অর্থ হলো তোমরা রাসূলুল্লাহর সাথে থাকো এবং যুদ্ধ করো। জিহাদের প্রেক্ষাপটেই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকাল লোকেরা সুন্নাহ নিয়ে প্রচুর কথা বললেও জিহাদের কথা অবজ্ঞা করে। অথচ এই জিহাদ আল্লাহর রাসূলেরই সুন্নাহ।

বনু কুরায়যার অভিযান

খন্দকের যুদ্ধ শেষ। ক্লান্তিকর অনেকগুলো দিন পার করে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে ফিরে এসেছেন। অস্ত্রশস্ত্র রেখে বের হলেন গোসল করতে। যুহরের ওয়াক্ত চলছে। এমন সময় ধূলি-ধূসরিত বেশে তড়িঘড়ি করে জিবরীল ؑ হাজির হলেন। বললেন,

- ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন! কিন্তু আমরা ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র

নামাইনি। আপনি এখনই ওদের ধাওয়া করুন!

- কোন দিকে?

- এই দিকে, জিবরীল বনু কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

খন্দকের রেশ তখনও কাটেনি। এরই মধ্যে বনু কুরায়যাকে শায়েস্তা করার নির্দেশ চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের ﷺ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়তে আদেশ করলেন। বলে দিলেন তারা যেন বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে তবেই আসরের সালাত আদায় করে। মদীনায় ইবন উম্ম মাকতুমকে অস্থায়ী প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। সাহাবিরা যখন বনু কুরায়যার এলাকায় পৌঁছলেন তখন আসরের ওয়াক্ত শেষ, তবে একদল আগেই পথিমধ্যে আসর পড়ে নিয়েছিলেন। সবার আগে পৌঁছলেন আলী ﷺ। দেখতে পেলেন বনু কুরায়যা একেবারে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করছে। গালিগালাজ করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ।

অবরোধের সিদ্ধান্ত

রাসুলুল্লাহ ﷺ বনু কুরায়যাকে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

> "কিতাবিদের মধ্যে যারা (এ যুদ্ধে) তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণ করতে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন, এখন তোমরা তাদের কাউকে করেছো হত্যা এবং কাউকে করেছো বন্দী। এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমি যা তোমরা এখনও পদানত করোনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ২৬-২৭)

প্রায় পঁচিশ দিন অবরোধ করে রাখা হলো। বনু কুরায়যা বুঝতে পারছিল সময় শেষ হয়ে আসছে। নেতা কা'ব ইবন আসাদ একদিন সবাইকে ডাক দিয়ে বললো,

- তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো পরিস্থিতি খুব কঠিন। আমি তোমাদের তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি, তোমাদের যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারো। প্রথম প্রস্তাব, আমরা মুহাম্মাদের আনুগত্য করবো এবং তাঁকে সত্য বলে মেনে নেব। আল্লাহর কসম, তোমরা ভালো করেই জানো মুহাম্মাদ একজন নবী। তাওরাতে তোমরা যে নবীর বর্ণনা পেয়েছ, ইনিই সেই লোক। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনো, তাহলে বেঁচে যাবে। সেই সাথে তোমাদের জান-মাল-স্ত্রী-পুত্র সবকিছুই রক্ষা পাবে।

উত্তর এল,

- না, আমরা কখনোই তাওরাতের বিধান ত্যাগ করবো না। তাওরাত বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধান আমরা মানবো না।

কা'ব বললো,

- ঠিক আছে, তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা দিই -- আমরা আমাদের সন্তান ও নারীদের হত্যা করবো এবং তারপর খোলা তরবারি নিয়ে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। তাহলে আমাদের আর কোনো পিছুটান থাকবে না। এরপর ততক্ষণ লড়াই করবো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের আর তাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন। যদি হেরে যাই, তো এমনভাবে মরবো যখন আমাদের কোনো বংশধর বেঁচে নেই। কাজেই আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করারও কিছু থাকবে না। আর যদি জিতে যাই, তাহলে নারী আর শিশুর অভাব আমাদের কখনোই হবে না।

উত্তর এল,

- এই অসহায় নারী-শিশুদের শুধু শুধু মেরে ফেলবো? এদের যদি মেরেই ফেলি তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে লাভটা কী?

কা'ব তখন শেষ প্রস্তাবটি দিল।

ঠিক আছে, তোমরা যদি এটাও মানতে না চাও তাহলে অন্য একটা প্রস্তাব দিতে পারি। আজকে শনিবারের রাত, আমরা যে শনিবারে যুদ্ধ করি না তারা নিশ্চয়ই এটা জানে। এটা ভেবে হয়তো মুহাম্মাদ আর তার সঙ্গীরা কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। এই সুযোগে আসো তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে শেষ করে দিই।

উত্তর এল,

- আরে! তুমি কি পবিত্র শনিবারের পবিত্রতা নষ্ট করে দিতে চাও? তুমি কি জানো না এই শনিবারের অমর্যাদা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের কী ভীষণ শাস্তি হয়েছিল?

বনু কুরায়যার কাপুরষতা আর সিদ্ধান্তহীনতা দেখে কা'ব ভীষণ বিরক্ত হলো। বললো,

- ধুর! তোমাদের মধ্যে একটা বাপের ব্যাটা নেই, যে মায়ের পেট থেকে বেরোনোর পর একটা রাত কোনো বিষয়ে মনস্থির করে ঘুমাতে গেছে।'[51]

এই অল্প কদিনের মধ্যেই বনু কুরায়যা একেবারে ভেঙে পড়ে। লড়াই করার মানসিক শক্তিটুকু পর্যন্ত আর তাদের কারো মাঝে নেই। ভয়, সিদ্ধান্তহীনতা তাদের পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। যত সাহস আর আস্ফালন, সব তলানিতে গিয়ে ঠেকল। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই তারা ভাবতে পারছিল না। তারা আবু লুবাবার ﷺ কাছে পরামর্শ চাইলো। আবু লুবাবা ﷺ জাহিলিয়াতের যুগে তাদের বন্ধু ছিলেন। তাকে দেখে নারী ও শিশুরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাদের অবস্থা দেখে আবু লুবাবার মন

---

[51] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩।

একটু যেন দুর্বল হয়ে যায়। তারা আবু লুবাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'যদি আমরা আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে-- কোনো ধারণা করতে পারেন?' আবু লুবাবা হাত দিয়ে গলার দিকে ইঙ্গিত দেখালেন। বোঝালেন, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে মৃত্যুই হবে পরিণতি।

কিন্তু বনু কুরায়যার অবস্থা ততদিনে এতটাই শোচনীয় যে আত্মসমর্পণের সম্ভাব্য পরিণতির কথা জেনেও তারা অগত্যা সেই পথই ধরে। আসলে খন্দকের যুদ্ধে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করার পর তারা আর প্রতিরোধ গড়ার কথা ভাবতে পারছিল না।

বনু কুরায়যা আত্মসমর্পণের পথই বেছে নেয়। তাদের একটাই শর্ত, সাদ ইবন মুআয যেন তাদের বিচারক হয়। সাদ আওস গোত্রের লোক। আওস গোত্রের সাথে বনু কুরায়যার মিত্রতা ছিল। তাদের আশা ছিল সাদ ইবন মুআয ﷺ নিশ্চয়ই তাদের প্রতি কঠোর হবেন না!

সাদ ইবন মুয়াযের ﷺ দুআ

এই ঘটনার কিছুদিন আগের কথা। খন্দকের যুদ্ধের সময় সাদ ইবন মুআয ﷺ আহত হন। আহত অবস্থায় আল্লাহর কাছে একটি চমৎকার দুআ করলেন,

'হে আল্লাহ! যদি কুরাইশদের সাথে আমাদের আরও যুদ্ধ হয়, তাহলে সে যুদ্ধ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। যারা তোমার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি ভালোবাসি। আর যদি এই যুদ্ধই তাদের সাথে আমাদের শেষ যুদ্ধ হয়, তবে এই আঘাতের মাধ্যমেই আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নাও। কিন্তু বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার অন্তরের জ্বালা না মিটিয়ে আমাকে মৃত্যু দিও না।'[52]

সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিজ প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। খন্দকের যুদ্ধের চরম দুর্যোগের মুহূর্তে বনু কুরায়যা প্রিয় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে কথা সাদ ﷺ কী করে ভুলতে পারেন! তাঁর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ, বনু কুরায়যার শেষ পরিণতি দেখেই তিনি মরতে চান।

এর আগে বনু কায়নুকার ভাগ্য খাযরাজের হাতে দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাই বনু আওস চাপাচাপি করছিল যেন তাদের হাতে বনু কুরায়যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তোমাদের গোত্রের কেউ এই বিচার করে তোমরা খুশি তো?' বনু আওস এক কথায় রাজি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ইচ্ছে অনুসারে আওস গোত্রের নেতা সাদ ইবন মুয়াযের হাতে বনু কুরায়যার ভাগ্য ছেড়ে

52 সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৫।

দিলেন। ইহুদিদেরও এটাই ইচ্ছা ছিল।

আওসের লোকেরা সাদ ইবন মুআযকে খুব চাপাচাপি করতে থাকে যেন তিনি বনু কুরায়যার প্রতি সদয় হন। কেননা এর আগে খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন উবাই বনু কায়নুকার প্রতি সদয় হয়ে তাদের হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিল। আওসের সাথে খাযরাজের সবসময়ই একটা প্রতিযোগিতা কাজ করতো। তাই আওস গোত্র চাচ্ছিল বনু কুরায়যার সাথেও যেন তেমন কিছু হয়।

সাদ ইবন মুআয ﵁ তাদের সব কথা আর উপদেশ চুপ করে শুনলেন। এরপর শুধু এতটুকুই বললেন, 'সাদের সময় এসেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির ব্যাপারে সে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবে না।'

একটা মাত্র বাক্য। অথচ সবাই যা বোঝার বুঝে গেল। বুঝে গেল-- বনু কুরায়যার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বিচারের রায়

খন্দকের যুদ্ধে আহত সাদ ইবন মুআযকে ﵁ রাখা হয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ মসজিদের ভেতরে একটি তাঁবুতে। রুফাইদাহ আল-আসলামিয়্যাহ নামের এক আনসারী নারীকে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। বলা যেতে পারে, এই তাঁবু ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সামরিক হাসপাতাল। সাধারণভাবে কেউ আহত হলে তার পরিবার দেখাশোনা করতো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদকে নিজের কাছাকাছি রাখেন যেন তাকে বারবার দেখতে পারেন।

বিচারের দিন এল। কাঠগড়ায় ইহুদি গোত্র বনু কুরায়যা। বিচারক তাদের অতীতের বন্ধু সাদ ইবন মুআয ﵁। অপরপক্ষে আছে মদীনার মুসলিমরা। দু পক্ষই সাদ ইবন মুয়াযের রায় মেনে নিতে রাজি। সাদ তখন অসুস্থ, তাকে বহন করে নিয়ে আসা হলো। তার এক পাশে মুসলিম, আরেক পাশে ইহুদি।

আদালতে সাদের আগমন ঘটলো। সাদ ইবন মুআয ﵁ ইহুদিদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

- তোমরা সবাই কি আমার ফয়সালা মেনে নিতে রাজি?

- জ্বী, আমরা রাজি।

এরপর তিনি মুসলিমদের উদ্দেশ্য প্রশ্ন করলেন,

- তোমরা কি আমার ফায়সালা মেনে নেবে?

মুসলিমদের প্রশ্ন করার সময় সেদিকে তাকালেন না। কীভাবে তাকাবেন তিনি? মুসলিমদের মধ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত। যতবার মনে হচ্ছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ সেখানে আছেন, ততবার তিনি লজ্জিত বোধ করছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি প্রবল সম্মানে তাঁর দিকে তাকাতে পারছিলেন না।

- হ্যাঁ, আমরা মেনে নেব, রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন।

থমথমে আবহাওয়া। সবার মনে উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা, সংশয়। সময় যেন স্থির হয়ে আছে। সাদ ইবন মুয়াযের এই একটি রায়ের উপরে নির্ভর করছে পুরো একটি গোত্রের ভবিষ্যৎ যারা কিনা এই মদীনায় বছরের পর বছর ধরে বসবাস করে এসেছে।

সাদ ইবন মুআয ﷺ দৃঢ়কণ্ঠে রায় দিলেন।

'আমি এই মর্মে রায় দিচ্ছি যে, বনু কুরায়যার সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে। তাদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বণ্টন করে দেওয়া হবে আর তাদের নারী আর শিশুদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা হবে।'

সবাই নিশ্চুপ। আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রথম কথা বললেন, 'তুমি ঠিক সেই রায় দিয়েছ, যা আল্লাহ সাত আসমানের উপরে ফায়সালা করে রেখেছিলেন।'[53]

আল্লাহর পছন্দনীয় রায় বেরিয়ে এল তাঁর পছন্দনীয় এক বান্দার মুখ থেকে।

মদীনার বাজারে বিশাল কয়েকটি গর্ত করা হলো। পুরুষদের হাত বেঁধে ফেলা হলো। নারী ও শিশুদের আলাদা করা হলো। এরপর দলে দলে ইহুদি পুরুষদের নাম ধরে ডাকা শুরু হলো। কেউ কেউ বুঝতে পারছিল না কী হতে যাচ্ছে। তারা তাদের নেতা কা'বকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তুমি কি জানো আমাদের সাথে কী হতে যাচ্ছে?'

অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সাথে কা'ব উত্তর দিল, 'তোমরা কি সারা জীবন এমন বেকুবই থেকে যাবে? দেখতে পাচ্ছো না যাদের ডাকা হচ্ছে তারা কেউ ফিরে আসছে না? আল্লাহর কসম, এক এক করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে।'

বিশ্বাসঘাতক দুই ইহুদি শীর্ষনেতার শেষ মুহূর্ত

বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাব আন-নাযরীকে ধরে আনা হলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনার আগমনের প্রথম দিন থেকে সে রাসূলুল্লাহর শত্রু, সে ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বনু কুরায়যার বিদ্রোহের পেছনে মূল নায়কও ছিল হুয়াই। সে-ই কা'ব

[53] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৪৯।

ইবন আসাদকে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ফুঁসলে দিয়েছিল। কা'ব ইবন আসাদকে কথা দিয়েছিল যদি খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশরা মুসলিমদের পরাজিত করতে না পারে, তাহলে সে বনু কুরায়যার সাথে থেকে যাবে, তাদের ভাগ্য সেও বরণ করে নেবে।

হুয়াই ইবন আখতাবের হাত বেঁধে টেনে টেনে আনা হলো। তার গায়ে একটা দামি চাদর, সেই চাদরের জায়গায় জায়গায় ফুটো। সে নিজেই নিজের চাদরে ফুটো করে রেখেছিল যেন মুসলিমরা কেউ এই চাদরকে গনিমত হিসেবে নিতে আগ্রহী না হয়। রাসূলুল্লাহকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো, 'তোমার সাথে শত্রুতা করে আমার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, যে আল্লাহকে ত্যাগ করে তার ধ্বংস অনিবার্য -- যা আজকে আমার সাথে হচ্ছে।' এ কথা বলে সে তার নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে বললো, 'আজকে যা হচ্ছে তা আল্লাহরই ফয়সালা। বনী ইসরাঈলের কপালে আল্লাহ এটাই লিখে রেখেছিলেন।'[54] এরপর তাকে হত্যা করা হয়।

ধরে আনা হলো বনু কুরায়যার নেতা কা'ব ইবন আসাদ আল-কুরায়যীকে। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ বললেন,

- তুমিই কি কা'ব ইবন আসাদ?

- জ্বী, আমিই কা'ব ইবন আসাদ।

- ইবন খুরাশ তোমাকে একটা ভালো উপদেশ দিয়েছিল, সেটা তুমি শুনলে না। সে কি তোমাকে বলেনি আমার অনুসরণ করতে? সে কি বলেনি আমার সাথে তোমার দেখা হলে তার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিতে?

- তাওরাতের কসম, এ কথাগুলো সে আমাকে বলেছিল আবুল কাসিম! সত্যি বলতে কী, আমি আপনার অনুসারী হতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা করলে আজ ইহুদিরা বলতো আমি কাপুরুষের মতো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়েছি। সে ভয়ে আর অনুসরণ করা হলো না। আজ তাই আমি ইহুদিদের ধর্মের উপরেই অটল আছি।

এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ আদেশে কা'বকেও হত্যা করা হলো।

বনু কুরায়যার পরিণতি

অল্প কজন ছাড়া প্রায় সব প্রাপ্তবয়স্ক ইহুদি পুরুষকে হত্যা করা হয়। প্রত্যেক পুরুষের গোঁফ, দাড়ি বা লজ্জাস্থানের লোম পরীক্ষা করে দেখা হলো তারা যুবক না শিশু। যাদের লোম গজায়নি, তারা ছাড়া পেল। আর যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের প্রায় সবাইকে এক এক করে হত্যা করা হয়। সেদিনের এক নাবালেগ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন

54 সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮।

আতিয়া। তিনি বলেন, 'সেদিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা হয়। আমি সে সময় কিশোর, তাই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।'

এই অভিযানে এক মহিলাকেও হত্যা করা হয়। যখন বনু কুরায়যার পুরুষদের নাম ধরে ডাকা হচ্ছিল তখন এক মহিলা পুরো সময় জুড়ে হা হা করে হাসতে থাকে। এরপর হঠাৎ সেই মহিলার নাম ধরে ডাক দেওয়া হয়। তার কাছেই বসা ছিলেন মা আইশা ﷺ। তিনি অবাক হয়ে সে মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার হয়েছেটা কী? তোমার নাম কেন ডাকা হলো?' সে বললো, 'কারণ আমাকে এখন হত্যা করা হবে।' আইশা জানতে চাইলেন, 'কেন?' সে বললো, 'কারণ আমি একটা অন্যায় করেছি।'

আইশা ﷺ পরবর্তীতে সেই মহিলার অপরাধের কথা জানতে পারেন। সে যাঁতা ছুঁড়ে খাল্লাদ ইবন সুওয়াইদকে হত্যা করেছিল। নিহতদের মধ্যে সে-ই ছিল একমাত্র মহিলা।

মদীনার বাজারে সেদিন কয়েকশো ইহুদির উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সংখ্যাটি চারশো থেকে নয়শোর মাঝামাঝি। অল্প কিছু ইহুদিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আত্মসমর্পণের আগে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

১) রাসূলুল্লাহর সাহাবি সাবিত ইবন কায়িস ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে অনুরোধ করলেন যেন এক ইহুদিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জাহিলিয়াতের যুগে সেই লোক তার উপকার করেছিল। সেই ইহুদির নাম ছিল আয-যুবাইর ইবন বাতা। রাসূলুল্লাহ সাবিতের অনুরোধ রাখলেন, আয-যুবাইরকে ছেড়ে দিলেন।

সাবিত তার জাহিলিয়াতের বন্ধু আয-যুবাইরকে এই সুখবর দিয়ে আসলো। আয-যুবাইর ছিল অন্ধ। সে বললো, 'আমাকে দেখাশোনা করার তেমন কেউ তো নেই। এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী?' সাবিত তখন রাসূলুল্লাহর কাছে অনুরোধ করলেন যেন আয-যুবাইরের স্ত্রী সন্তানদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ রাজি হলেন, সাবিত তার কাছে সেই সুখবর দিয়ে আসলেন। কিন্তু তাতেও আয-যুবাইরের মন ভরলো না। সে বললো, 'অর্থ-সম্পদ ছাড়া একটি পরিবার কীভাবে হিজাযের মতো স্থানে বেঁচে থাকবে?' সাবিত খুব করে চাচ্ছিলেন আয-যুবাইরের জন্য কিছু একটা করতে, কারণ বুআসের যুদ্ধে এই আয-যুবাইর সাবিতকে সাহায্য করেছিলেন। তাই সাবিত আবারো আয-যুবাইরের পক্ষ হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে গেলেন যেন তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটাও মঞ্জুর করলেন।

সাবিত আয-যুবাইরের কাছে ছুটে গেলেন। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল তোমাকে তোমার পরিবার আর সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন। তুমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলো। আল্লাহর শাস্তি থেকে চিরদিনের জন্য নিরাপদ হয়ে যাও!' আয-যুবাইর তখন বনু কুরায়যার নেতাদের কথা জানতে চাইলো। সাবিত বললেন তাদের হত্যা করা হয়েছে। আয-

যুবাইর তখন জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা আমার সেই দুই সঙ্গীর খবর বলতে পারো?' সাবিত বললেন, 'তাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে। দেখো, আয-যুবাইর, ওদের যা হওয়ার হয়েই গেছে। কিন্তু তুমি তো বেঁচে আছো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার বেঁচে থাকার মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন।'

আয-যুবাইর তখন বললো, 'সাবিত, সেই অনুগ্রহের দোহাই, যা আমি তোমাকে বুআসের যুদ্ধে করেছিলাম। তুমি আমাকে আমার প্রিয় মানুষগুলোর কাছে যেতে দাও। তাদের থেকে বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারছি না।' এ কথা শুনে সাবিত নিজেই আয-যুবাইরের গর্দান উড়িয়ে দেন। 'প্রিয়জনের' সাথে তার মিলিত হবার আকুতি শুনে আবু বকর ﷺ মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর শপথ, এই লোক তার বন্ধুদের সাথেই মিলিত হবে। তবে সেটা হবে জাহান্নামে, সেখানেই সে চিরকাল থেকে যাবে।'[55]

২) সালমাহ ইবন কাইস ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর একজন খালা। তিনি অনেক পুরোনো একজন মুসলিম। দুই কিবলার দিকে সালাত আদায় করা এবং বায়াতে অংশ নেওয়া নারীদের একজন। বনু কুরায়যা আত্মসমর্পণ করার পরে রিফাআহ ইবন সামাআল নামের এক ইহুদি তার কাছে আশ্রয় চায়। সেই ইহুদি তার পরিবারের পরিচিত ছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে সালামাহ অনুরোধ করেন যেন রিফাআহকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ তাঁর খালার অনুরোধ রক্ষা করেন। রিফাআহকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রিফাআ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে।

৩) আমর ইবন সুদা নামের এক ইহুদি বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতায় অংশ নেয়নি, বরং সে এর প্রতিবাদ করেছিল। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ছিলেন বনু কুরায়যার অবরোধকালীন প্রহরী। তিনি আমরের বিষয়টি জানতেন, তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বনু কুরায়যার সম্পদ বণ্টন

১) সাদ ইবন মুয়াযের ﷺ রায় অনুসারে বনু কুরায়যার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। গনিমত হিসেবে মুসলিমরা সেগুলো লাভ করে। মুসলিমরা এই অভিযান থেকে দেড় হাজার তরবারি, দু'হাজার বর্শা, তিনশো শিরস্ত্রাণ, হাজার দেড়েক বর্ম এবং অসংখ্য উট আর ভেড়া লাভ করে। এই সম্পদের পাঁচ ভাগের চারভাগ মুজাহিদদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। মুসলিমরা বিপুল পরিমাণ মদও লাভ করে কিন্তু হারাম হওয়ার কারণে সেগুলো থেকে কিছুই গ্রহণ করা হয়নি। সেগুলো ফেলে দেওয়া হয়। এই অভিযানে শহীদ খাল্লাদ ইবন সুওয়াইদ ﷺ এবং আরেকজন সাহাবির পরিবারদের গনিমতের ভাগ দেওয়া হয়।

---

[55] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮।

বনু কুরায়যার কিছু সম্পদ মুসলিমরা অস্ত্রের জোর ছাড়াই লাভ করেছিল। সেগুলো দিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ শাম থেকে অস্ত্র কেনার জন্য সাদ ইবন উবাদাহকে ؓ পাঠান। আর কিছু যুদ্ধবন্দীদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় নজদে। সেখানে তাদেরকে ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ে আসেন সাইদ ইবন যায়িদ ؓ।

২) যেসব সম্পদ বহনযোগ্য ছিল না, যেমন বনু কুরায়যার বাড়িঘর, সেগুলো পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া হয় মুহাজিরদেরকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের আদেশ করলেন তারা যেন আনসারদের থেকে পাওয়া সকল খেজুর বাগান আর জমি আনসারদের ফিরিয়ে দেন। এভাবে তিনি তাদের মাঝে ভারসাম্য তৈরি করে দিলেন।

৩) রায়হানাহ বিনত আমর ইবন খুনাফাহ নামের একজন মহিলাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে দাসী হিসেবে নিয়ে আসা হয়। রাসূল ﷺ তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। প্রথমে তিনি রাজি হননি, কিন্তু পরে মুসলিম হয়ে যান। রাসূল ﷺ তখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন যেন তিনি তাকে বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু রায়হানা দাসী হিসেবেই থাকতে চাইলেন।[56] শেষ পর্যন্ত তিনি দাসী হিসেবেই থেকে যান। দাসপ্রথার কথা বললেই আমাদের চোখের সামনে একটা নির্মম দৃশ্য ভেসে ওঠে, কিন্তু ইসলামের দাসপ্রথা নিষ্ঠুরতা শেখায় না। এটা একটা চাকরির মতো। রায়হানার মতো অনেকেই স্বাধীন হবার চাইতে দাস হিসেবে থাকাকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন।

বনু কুরায়যার ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) শাস্তির ভয়াবহতা

বনু কুরায়যার এই ঘটনা ইসলামবিদ্বেষীদের একটি প্রিয় হাতিয়ার। সন্দেহ নেই বনু কুরায়যাকে অত্যন্ত গুরুতর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কয়েকশো পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে, নারী-শিশুদের দাস বানানো হয়েছে, সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এসব দেখিয়ে ইসলামবিদ্বেষীরা বলতে চায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন নিষ্ঠুর, মুসলিমরা হলো বর্বর।

কিন্তু পুরো ঘটনার প্রেক্ষাপটকে তারা এড়িয়ে যেতে চায়। কেন তাদেরকে এত বড় শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর এক শব্দেই দেওয়া যায়, তা হলো-- বিশ্বাসঘাতকতা। তারা যে অপরাধটি করেছিল, সেই অপরাধটিকে এখনকার আইনের ভাষায় বলা হয় -- রাষ্ট্রদ্রোহ। বনু কুরায়যার সাথে মুসলিমদের চুক্তি ছিল। তারা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। চুক্তিবদ্ধ ও নাগরিক থাকা অবস্থায় তারা একটি বহিঃশত্রুর সাথে ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদীনার রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া এবং মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানো। আইনের বিচারে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মানদণ্ডে এটি হলো সর্বোচ্চ অপরাধ। আর এখানে, ইহুদিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আল্লাহর

---

[56] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪১।

রাসূলের ﷺ সাথে -- সাধারণ কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা।

এর আগেও মদীনার দুটি গোত্র বনু কায়নুকা এবং বনু নাযিরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে এত ভয়ানক শাস্তি দেওয়া হয়নি। কারণ ইসলাম অপরাধের অনুপাতে শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করে। বনু কায়নুকা একজন মুসলিম মহিলার সম্মানহানি করে এবং একজন মুসলিমকে হত্যা করে। বনু নাযির রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যার চেষ্টা করে। এ দুটো গোত্রকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু বনু কুরায়যার অপরাধ ছিল সবচাইতে মারাত্মক। তারা খন্দকের সেই দুর্বল মুহূর্তে সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিমদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এটা ভয়াবহ মাত্রার অপরাধ।

২) তিরস্কারকারীদের তিরস্কার

সাদ ইবন মুআযকে ﵁ তার গোত্র খুব করে অনুরোধ করেছিল তিনি যেন বনু কুরায়যার ব্যাপারে উদারতা দেখান। কিন্ত তিনি তাদের অনুরোধ রাখেননি। কারণ তিনি জানতেন, এই ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো মানে দুর্বলতা। ক্ষমার অর্থ সবসময় উদারতা নয়। কখনো কখনো ক্ষমার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে জুলুম করার আরও সুযোগ করে দেওয়া হয়। কিছু পরিস্থিতিতে কঠোরতা দেখানোই উচিত। কিছু মুসলিম মনে করে, মুসলিমদের সবসময় উদার হতে হবে, ক্ষমাশীল হতে হবে। যাতে ইসলামের শত্রুরা কোনো অপবাদ দিতে না পারে। তারা চায় মানুষ যেন মুসলিমদের শান্তিপ্রিয়, মহানুভব মনে করে, সন্ত্রাসী মনে না করে। আসলে আল্লাহর রাসূল ﷺ, যিনি দুনিয়ার সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের মানুষ, তিনিও সবসময় ক্ষমার নীতি অবলম্বন করেননি।

বনু কুরায়যাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ ক্ষমা করে দেননি। সাদ ইবন মুআয ﵁ রায় দেওয়ার আগে বলেছিলেন তিনি এই ব্যাপারে তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় পাবেন না। মুসলিমরা শত্রুর সাথে কঠোর হতে পারবে না, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরাজিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। কিছু মুসলিম আজ কাফিরদের তিরস্কারকে এতটাই ভয় করে যে গোটা ইসলামকেই ভুলভাবে উপস্থাপন করে। শুধুমাত্র কাফিরদের খুশি করার জন্য। তারা কাফির এবং ইসলামবিদ্বেষীদের সমালোচনার মুখে পড়তে চায় না।

অথচ তারা জানে না, কাফিরদের এভাবে খুশি করে তাদের মুসলিম বানানো যায় না। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনেও সব কাফির মুসলিম হয়ে যায়নি। কখনো কখনো কঠোরতাই শ্রেয়। যে ইসলাম ক্ষমাশীলতার শিক্ষা দেয়, সেই একই ইসলাম ন্যায়বিচারের শিক্ষাও দেয়। এটা সত্য যে, মুসলিমদের ব্যাপারে অমুসলিমদের সুধারণা ধরে রাখতে পারলে ভালো। তবে সেটা যারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে তাদের ক্ষেত্রে মোটেও জরুরি নয়। সীরাহ থেকে শিক্ষা হলো, শত্রুদের সাথে পরিস্থিতিভেদে কখনো উদারতা দেখাতে হবে, আর কখনো কঠোরতা। কখনো কলম ধরতে হবে, আর কখনো তলোয়ার।

৩) একজন মুসলিমের জীবন-মরণ শুধুই আল্লাহর জন্য

সা'দ ইবন মুয়ায আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন,

'হে আল্লাহ! যদি কুরাইশদের সাথে আমাদের আরও যুদ্ধ হয়, তাহলে সে যুদ্ধ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। যারা তোমার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি ভালোবাসি। আর যদি এই যুদ্ধই তাদের সাথে আমাদের শেষ যুদ্ধ হয়, তবে এই আঘাতের মাধ্যমেই আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নাও। কিন্তু বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার অন্তরের জ্বালা না মিটিয়ে আমাকে মৃত্যু দিও না।'

সা'দের এই দুআটা বিস্ময়কর। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ছাড়া তাঁর বেঁচে থাকার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকতে চাননি তিনি। টাকা হবে, সংসার হবে, এসব চিন্তা মনে স্থান পায়নি। তিনি একটা জিনিসই চেয়েছেন -- আল্লাহর রাস্তায় লড়াই। ইসলামের শত্রুরা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন যেন তিনিও যেন বেঁচে থাকেন, যেন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারেন। যেন বনু কুরায়যার শেষ দেখে নিতে পারেন। এরপর আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই।

৪) আবু লুবাবাহর ﷺ তাওবা: আল্লাহর সাথে সততা, রাসূলুল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততা

আবু লুবাবাহর কাছে বনু কুরায়যা জানতে চেয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আত্মসমর্পণ করা হলে সম্ভাব্য কী পরিণতি হতে পারে। তখন তিনি গলার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন তাদের মেরে ফেলা হবে। কাজটা করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝলেন, কাজটা ঠিক হলো না। বনু কুরায়যার কাছে ইঙ্গিত দেওয়ার মাধ্যমে একটা গোপন সামরিক তথ্য পাচার হয়ে গেল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়ে গেল। কাজটা যে তিনি খুব ভেবেচিন্তে করেছেন, তা নয়। কিন্তু এই গুনাহর অনুশোচনা তাকে বারবার দংশন করতে থাকে। আবু লুবাবাহ ﷺ চাইলে পুরো বিষয়টা রাসূলুল্লাহর কাছে গোপন রাখতে পারতেন। বিষয়টা তিনি চেপে গেলে কেউ কিছু বুঝতোও না, জানতোও না। তিনি চাইলে এভাবেই গোটা জীবন পার করে দিতে পারতেন। মুখে একটা মেকি হাসি ধরে রেখে রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে এমনভাবে কথা বলতে পারতেন, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু সেটা চাননি। তিনি চেয়েছেন গুনাহ থেকে মুক্তি। তিনি সৎ ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন। তাই বিষয়টা গোপন করার চেষ্টা করলেন না, নিজেই জানিয়ে দিলেন। ফিরে এসে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করা না পর্যন্ত আমি নিজেকে মুক্ত করবো না।' খুঁটিতে বাঁধা সেই দিনগুলিতে সালাতের ওয়াক্ত হলে তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন, সালাত শেষ হলে আবার বেঁধে দিতেন।

এভাবে ছয়দিন পার হয়ে গেল। সপ্তম রাতের কথা, ভোরের দিকে উম্মু সালামাহ ﷺ

দেখলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ মুচকি হাসছেন। তিনি হাসির কারণ জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আবু লুবাবার তওবা কবুল করেছেন। উম্ম সালামাহ বললেন, 'আমি এই খবরটা তাকে দিয়ে আসি?' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি চাইলে অবশ্যই দিতে পারো!

উম্ম সালামাহ মহা উৎসাহের সাথে সুসংবাদ নিয়ে মসজিদে ছুটে গেলেন। আবু লুবাবাহকে বললেন, 'আপনার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহ আপনার তাওবাহ কবুল করেছেন!' সাহাবিরা দৌড়ে এসে তার বাঁধন মুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু আবু লুবাবা বললেন, 'নাহ! আল্লাহর রাসূল ﷺ ছাড়া এই কাজ কেউ করবে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ফজরের সালাতের জন্য বের হয়ে তাঁকে মুক্ত করলেন।[57] মসজিদে নববীতে তওবার খুঁটি নামে একটি খুঁটি আছে। এই খুঁটিতেই আবু লুবাবাহ رضي الله عنه নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। একটা মানুষ আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য কতটা কষ্ট করতে পারে! অথচ সে তিনি বুঝেশুনে ইচ্ছা করে ভুল করেননি। এটাই হলো সততা, এটাই হলো সত্যিকারের মানুষের সংজ্ঞা। আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন এই অসাধারণ মানুষগুলোকে তৈরি করার কারিগর।

৫) অন্তরের কাঠিন্য

হুয়াই ইবন আখতাব এবং কা'ব ইবন আসাদ-- জীবনের শেষ মুহূর্তে এই দুই নেতার বলে যাওয়া কথাগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে তারা জেনেশুনেই আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচারিতা করেছিল। মৃত্যু যখন নিজের ছায়ার চেয়েও কাছাকাছি, তখনো তারা নিজেদের ভুলের উপর অটল ছিল। তারা জানতো তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, অন্যায় করেছে। তারা জানতো জাহান্নামে তাদের ঠাঁই হবে। তবু শেষ মুহূর্তে এসেও তাদের হৃদয় এতটুকু গলেনি। নিজেদের ভুল স্বীকার করার মতো বাসনা জাগেনি। ঔদ্ধত্য আর অহংকার তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঔদ্ধত্য আর অহংকারের উপরই তারা মারা গেছে, এতটুকু আফসোস ছিল না। অন্তরের এই কাঠিন্যের কারণ কী? যখন একজন মানুষ অন্যায় করে কিন্তু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কেউ যখন অবাধ্যতা করতেই থাকে, করতেই থাকে, তখন একসময় তার অন্তর এতটা শক্ত হয়ে যায় যে, তার আর সত্যপথে ফিরে আসতেও ইচ্ছা হয় না। এই দুই নেতার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছিল।

৬) মতভেদ বা ইখতিলাফের ধারণা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের আদেশ করেছিলেন যেন তারা বনু কুরায়যার এলাকায় গিয়ে আসরের সালাত আদায় করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছার আগেই সূর্য ডুবে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সাহাবিরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যান। একদল বললো, 'আমাদের এখনই আসরের সালাত পড়ে ফেলা উচিত কারণ সূর্য ডুবে যাচ্ছে।' আরেকদল বললো, 'না আমরা বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে তারপরই সালাত পড়বো।' দুটো

---

[57] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪।

দল তাদের বুঝ অনুসারে সালাত আদায় করলো। পরে তারা তাদের এই মতভেদের বিষয়টা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন। তিনি তাদের কাউকেই ভুল বললেন না, দুটো কাজকেই স্বীকৃতি দিলেন।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় ইসলামী শরীয়াহ ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়। একটি বিষয়ে একাধিক মত থাকতে পারে। তবে তা দ্বীনের মৌলিক বিষয় নিয়ে হবে না। অন্যান্য বিষয়ে একাধিক দলিলের কারণে মতপার্থক্য হতে পারে। আবার বোঝার ভিন্নতার কারণেও নানা মত তৈরি হতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই। এর মানে এই নয় যে, কেউ একটা মত দিলেই সেটা গ্রহণযোগ্য মত হয়ে যাবে। একাধিক মতের ক্ষেত্রে কোন মত গ্রহণ করতে হবে, বা সেটার প্রক্রিয়া কী -- এই বিষয়টি এই বইটির আলোচনার গণ্ডির বাইরে বিধায় আলোচনা করা হলো না।

সাদ ইবন মুয়াযের ﷺ মর্যাদা

আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দা আছে। তারা যখন আল্লাহর কাছে কিছু চায়, আল্লাহ তা কবুল করে নেন। সাদ ﷺ ছিলেন এমন একজন।

সাদ চেয়েছিলেন কুরাইশদের সাথে শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত যেন বেঁচে থাকতে পারেন। চেয়েছিলেন বনু কুরায়যার পরিণতি দেখে যেন অন্তরকে শান্ত করতে পারেন। চেয়েছিলেন, খন্দকের যুদ্ধের সেই পুরোনো ক্ষত যেন বেড়ে যায়। যেন এই ক্ষতের মাধ্যমে তিনি শহীদ হতে পারেন। আল্লাহ তার সব দুআ কবুল করেছেন।

খন্দকের পর কুরাইশরা মুসলিমদের সাথে আর যুদ্ধ করার সাহস দেখায়নি। সাদ শুধু বনু কুরায়যার শাস্তি দেখেই যাননি বরং আল্লাহ তাআলা বনু কুরায়যার ওপর তাকেই বিচারক বানিয়ে দেন। আর এরপরই তার ক্ষতের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। তিনি যে শাহাদাত চেয়েছিলেন, আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদ ইবন মুয়াযের ﷺ সম্মানে বলেছিলেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াও।'[58] সাধারণভাবে কারো জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। কিন্তু সাদ ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের উঠে দাঁড়াতে বলেন। ইমাম নববীর মতে, কাউকে সম্মান দেখানোর জন্য কখনো কখনো দাঁড়ানো যেতে পারে। তবে সেটা অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে পারলেন সাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। তিনি রীতিমতো ছুটে গেলেন। এত দ্রুত হাঁটছিলেন যে, সঙ্গের সাহাবিদের জুতো ছিঁড়ে

---

[58] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় আদাব, হাদীস ৪৪৩।

যাচ্ছিল, গায়ের চাদর খুলে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ সেটা জানালে তিনি বললেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি, না জানি আমাদের আগেই ফেরেশতারা তার কাছে পৌঁছে যায়! আর হানযালার মতো করে তাকেও গোসল করিয়ে দেয়!'' পৌঁছে দেখা গেল সাদকে গোসল দেওয়া হচ্ছে। তার মা কাঁদছেন।

সাদ ইবন মুয়াযের লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সাহাবিরা বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এত হালকা লাশ এর আগে কখনো বহন করিনি।' রাসূল ﷺ বললেন, 'কেনই বা হবে না বলো? এমন সব ফেরেশতারা আজ জমিনে এসে সাদের লাশ বহন করছেন যারা এর আগে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি।' অন্য এক হাদীসে আছে, সাদের লাশ বহন করতে সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান থেকে জমিনে নেমে আসে।[59]

সাদ ইবন মুআয ؓ আল্লাহর কত প্রিয় ছিলেন একটা হাদিস থেকে বোঝা যায়। বলা হয় যে, তার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল![60] সাদের মৃত্যুর অনেক দিন পরের কথা, একদিন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে উপহার হিসেবে একটা চাদর আসে। চাদরের কাপড়টা খুব নরম, মোলায়েম। সাহাবিরা সব অবাক হয়ে চাদরটা নেড়েচেড়ে দেখছেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা এই চাদরের কোমলতা দেখে অবাক হচ্ছ? জেনে রাখো, জান্নাতে সাদ ইবন মুয়াযের যে রুমালটা আছে তা এই চাদরের চাইতেও উত্তম আর কোমল।'[61]

লক্ষনীয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ থেকে সাদের কথা স্মরণ করলেন, সাহাবিদের কাছে সাদের মর্যাদা প্রকাশ করলেন। এটাই বলে দেয় সাদ রাসূলের ﷺ চোখে কতটা প্রিয় ছিলেন! মৃত্যুর দীর্ঘ দিন পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্মরণ করেছেন। মানুষ মারা গেলে আমাদের মন থেকে আস্তে আস্তে মুছে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর অনুসারীদের কথা কখনো ভুলে যাননি। দুনিয়ার ব্যস্ততা, রাষ্ট্র চালাবার দুশ্চিন্তা, পারিবারিক কাজকর্ম, কোনো কিছুই সাহাবিদেরকে ভালোবাসার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এই মানুষটাই তার উম্মাহর জন্য প্রত্যেক দিন দুআ চাইতেন। এই মানুষটাই কিয়ামতের সেই কঠিন দিনে, আমাদের মুক্তির জন্য দুআ চাইতে থাকবেন। দুনিয়ার সবার চেয়ে উপরে ভালোবাসা পাবার যোগ্য হলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।

সাদ ইবন মুআযকে ؓ কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহর ﷺ চেহারা বদলে যায়। তাকে দেখতে বেশ চিন্তিত লাগে। তিনবার তাসবীহ পড়লেন, 'সুবহানআল্লাহ', সাহাবিরাও ؓ তাই করলেন। একটু পর তিনি ﷺ স্বাভাবিক হলেন। তিনবার তাকবীর দিলেন, 'আল্লাহু আকবার'। দেখাদেখি সাহাবিরাও তাই করলেন। সাহাবিরা জানতে চাইলেন রাসূলুল্লাহ কেন প্রথমে তাসবীহ এবং পরে তাকবীর দিলেন। রাসূল ﷺ বললেন,

---

[59] সুনান নাসাঈ, অধ্যায় জানাযা, হাদীস ২৩৯।
[60] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ১৪৭।
[61] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ১৪৬।

'কারণ কবর সাদকে চাপ দিয়ে ধরেছিল। যদি কেউ কবরের চাপ থেকে মুক্তি পেত সে হতো সাদ। এরপর কবর আবার প্রশস্ত হয়ে গেল।'

সাদ ইবন মুআয ﷺ যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স কত? মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। নিতান্ত তরুণ বয়সে তিনি নেতৃত্ব লাভ করেন। আল্লাহর নবীর আনসার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যখন, তখন তিনি ত্রিশ বছরের টগবগে যুবক। দ্বীনের জন্য একজন মুসলিম যুবক কীভাবে নিজের জীবন দিয়ে দেয়, তার উৎকৃষ্ট নমুনা সাদ ইবন মুয়াযের জীবন। সাদ ইবন মুআয ﷺ সফল। আখিরাতের দাঁড়িপাল্লায় তার জীবনটা সোনার চেয়েও দামি।

আজ আমরা যেন ভুলেই গেছি দ্বীনের খেদমত রক্ত দিয়ে করা লাগে। আজকাল অনেকের চোখে দ্বীনের খেদমতের অর্থ হলো -- ঘরের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা, ফাইভ স্টার হোটেলে কনফারেন্স করে ইসলামি লেকচার দেওয়া। এটুকু করেই তারা মনে করে আল্লাহর দ্বীনের বিশাল খেদমত করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহর রাস্তায় তাদের শরীরের এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। গ্রীষ্মের দিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে চড়ে আর শীতের দিনে হিটারের উষ্ণতা উপভোগ করে আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করাটা যথেষ্ট না। দ্বীনের খেদমত করতে হলে শরীর থেকে আরামের চাদরটা ঝেড়ে ফেলতে হয়। পরিশ্রম করতে হয়, ত্যাগ করতে হয়, রক্ত ঝরাতে হয়।

আনসাররা দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করেছেন। সেই যুদ্ধে নিজেদের জান-মাল, নিজের জীবন-সম্পদ সমস্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছেন। তাদের চোখে এটাই ছিল দ্বীনের জন্য খেদমত। আর তাই তো তারা দ্বীনের সাহায্যকারী, 'আনসার!'

খন্দক থেকে হুদাইবিয়া

খন্দক যুদ্ধের প্রভাব

খন্দকের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক 'টার্নিং পয়েন্ট'। খন্দক যুদ্ধের আগ পর্যন্ত মুসলিমদের লড়াই ছিল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কিন্তু এ যুদ্ধের পর একটা ভিন্ন ইতিহাস রচিত হয়। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এবার টিকে থাকার সংগ্রামকে ছাড়িয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজ ধারণ করে। রাজনৈতিক ময়দানে দাবার ছক উল্টে যায়। বিশাল এক সামরিক জোটকে পরাস্ত করার মাধ্যমে স্নায়ুযুদ্ধে মুসলিমরা যোজন যোজন এগিয়ে যায়। আরবের রাজনৈতিক শক্তিগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযান পরিচালনা করার মতো সাহস বা মনোভাব হারিয়ে ফেলে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল কুরাইশদের সর্বশেষ আক্রমণ। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, তারা মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে গেছে। বরং যুদ্ধে হেরে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। তাদের শক্তি কমে যায় এবং একটা সময় মুসলিমদের তারা সমীহের চোখে দেখা শুরু করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, মুসলিমদের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় বাকি ছিল না। খন্দক যুদ্ধের এক বছর পরের ঘটনাই এর প্রমাণ। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুসলিমদের অস্তিত্বকে কার্যত স্বীকার করে নেয়।

আল্লাহ সূরা আলে ইমরানে বলেন, 'ইসবিরু ওয়া সবিরু', অর্থ হলো, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং এই ধৈর্যে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করো।' অর্থাৎ শুধু ধৈর্য ধরাটাই যথেষ্ট নয়, বরং এমন ধৈর্য ধরা চাই যেন ধৈর্যশীল শত্রুর সাথেও পেরে ওঠা সম্ভব হয়। বদর, উহুদ, খন্দক -- তিনটি বড় বড় যুদ্ধ যখন মুসলিমরা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করলো, তখন কাফিররাই মানসিকভাবে ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে পড়ে। একারণে আবু সুফিয়ান আর কখনোই মদীনার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী জড়ো করতে সক্ষম হয়নি।

খন্দকের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুসলিমরা একটি কঠিন সময় শেষ করে। এটা ছিল টিকে থাকার সময়। যদিও বলা হয়ে থাকে হিজরতের সাথে সাথেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এর শুরুর বছরগুলো ছিল শঙ্কা, গোপনীয়তা আর নিরাপত্তাহীনতার বছর। প্রতিষ্ঠালগ্নে মদীনা রাষ্ট্র কোনো সমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল না। ত্রিমুখী আক্রমণের শঙ্কায় মদীনার পরিবেশ থমথমে হয়ে থাকতো। একদিকে মক্কার কুরাইশ, আরেকদিকে ইহুদি গোত্রগুলো আর অন্যদিকে বেদুইনরা। সে সময়টায় সাহাবিরা অস্ত্র পাশে রেখে ঘুমাতেন -- সময়টা এতটাই অনিরাপদ ছিল।

মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পাঁচটা বছর ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু

মুসলিমরা ছিলেন দৃঢ়পদ। তারা সাহস হারাননি, আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। তাই সময়ের পরিক্রমায় খন্দকের পর মুসলিমরা শক্ত অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে মুসলিমদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, কেবলই এগিয়ে যাওয়া। এই যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'এখন থেকে আমরা তাদের উপর আক্রমণ করবো, তারা আর আমাদের আক্রমণ করতে পারবে না।'[62] খন্দকের যুদ্ধের সাথে সাথে মদীনার পররাষ্ট্রনীতিতে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে, সেটা হলো আক্রমণাত্মক জিহাদের সূচনা। খন্দকের আগের জিহাদগুলো ছিল মূলত রক্ষণাত্মক। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মদীনা থেকে ইহুদিদের সর্বশেষ গোত্রটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মদীনার ভেতরের শত্রু বলতে বাকি থাকলো কেবল মুনাফিকরা। বলা যেতে পারে, খন্দকের যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করলো।

যাইনাবের সাথে বিয়ে

যাইনাব বিনত জাহশ ছিলেন প্রথম যুগের একজন মুসলিমাহ। সম্মানিতা এই নারী ছিলেন জাহশ ইবন রিবাব এবং আমীনাহ বিনত আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। উহুদে শহীদ আবদুল্লাহ ইবন জাহশের বোন। সম্পর্কের দিক থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ ফুপাতো বোন। মদীনায় একেবারে প্রথমদিকে হিজরত করেছিলেন। মুত্তাকী এই নারী দিনে রোযা রাখতেন, রাতে সালাতে দাঁড়াতেন। পা ব্যথা হয়ে যেত, তবু সালাত ছাড়তে চাইতেন না। তাঁর অন্তর ছিল উদার, দান করতেন হাত খুলে। তাঁর দানের চমৎকার একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন মা আইশা ﷺ। আসলে যাইনাব এতই গুণী একজন নারী ছিলেন যে খোদ আইশাও তাঁর সতীনের প্রশংসা না করে পারেননি।

'দ্বীনদারিতার বিচারে যাইনাবের মতো অসাধারণ আর কোনো নারীকে দেখিনি। তাক্বওয়ায় বলো, সত্যবাদিতায় বলো, তিনিই ছিলেন সেরা। আত্মীয়স্বজনের প্রতি তার যে দরদ ছিল, তেমনটাও আর কারো মাঝে দেখিনি। দান করার ক্ষেত্রেও সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। দান করার সময় কখনো নিজের কথা ভাবতেন না। এভাবেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন এই বান্দী। হ্যাঁ, দোষ বলতে একটা দোষ তার ছিল -- চট করে রেগে যেতেন, প্রচণ্ড রেগে যেতেন। তবে সেই রাগ কখনোই খুব দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতো না...'[63]

যাইনাবের দানশীলতা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। আইশা বলেন, 'একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচাইতে লম্বা সে-ই সবার আগে আখিরাতে আমার সাথে মিলিত হবে।' এ কথা শুনে তাঁরা সবাই নিজেদের হাতের দৈর্ঘ্য মাপতে শুরু করে দিলেন, দেখা যাক কার হাত বেশি লম্বা! আসলে 'হাত লম্বা' বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছিলেন কে কত বেশি সাদাকাহ করে।

---

62 সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাগাযি, হাদীস ১৫৪।

63 সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ১২০।

বিষয়টি পরে বুঝতে পেরে আইশা বলেন, 'আমাদের মধ্যে সবচাইতে লম্বা হাত ছিল যাইনাবের।'[64] রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদাকাহ করতেন যাইনাব। রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাটিও সত্যি হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে তিনিই সবার আগে মারা যান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন তাঁর এই ফুপাতো বোনকে পালকপুত্র যাইদ ইবন হারিসার ﷺ সাথে বিয়ে দিয়ে তৎকালীন আরবের কৌলিন্যপ্রথাকে ভেঙে দিতে। যাইদ অতীতে ছিলেন একজন দাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে যাইনাব কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। সামাজিক মর্যাদায় দু'জনের মাঝে বিশাল পার্থক্য। সে সময় আরবরা স্বাধীন হওয়া দাসকে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখতো না। কিন্তু এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন আরবদের বৈষম্যমূলক মনোভাব বদলে যাক। মুসলিমরা যেন তাকওয়া দিয়ে মানুষকে বিচার করে, বংশ-মর্যাদা দিয়ে নয়। আর তাই তিনি নিজ পরিবার, নিজ আত্মীয়দের দিয়েই স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার সূচনা করেন। যাইনাবের কাছে তিনি যাইদকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। যাইনাব রাজি হলেন না। তখন আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন,

> "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে (ভিন্ন) কোনো সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩৬)

এ আয়াত নাযিলের পর যাইনাব বিনা তর্কে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যায়িদকে বিয়ে করবেন। কাহিনীর এ পর্যায়ে যাইদ ইবন হারিসার পরিচয় জেনে নেওয়া যাক।

কে ছিলেন যাইদ ইবন হারিসা ﷺ

যাইদ ইবন হারিসা ছিলেন ইয়েমেনি গোত্রের সন্তান। তাকদীরের লিখনে এক অন্যায় যুদ্ধের বলি হয়ে মায়ের কোল থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে গেলেন। একটা মানুষের জীবনে এর চেয়ে খারাপ সময় আর কী হতে পারে? অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই দুঃসময়ের হাত ধরেই যায়িদের জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছিল। এক মর্যাদাবান নারী উকায মেলা থেকে যাইদকে দাস হিসেবে কিনে নেন। তাঁর সেবক হিসেবেই যাইদের মক্কার জীবন শুরু হলো। বিয়ের পর এই নারী যাইদকে তুলে দিলেন স্বামীর হাতে। নতুন স্বামীর জন্য উপহার!

এই নারী ছিলেন খাদিজা ﷺ। আর যে স্বামীর কাছে যাইদকে তুলে দিয়েছিলেন তিনি

---

[64] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ১২০।

হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এভাবেই খাদিজার কাছ থেকে যাইদ চলে এলেন নবীজির ﷺ কাছে। বড় হতে লাগলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মানুষ -- মুহাম্মাদের ﷺ হাতে।

এই ঘটনার বহু বছর পরে যাইদের বাবা জানতে পারেন যাইদ মক্কায় আছেন। এক দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সন্তানের সাথে মিলন হবে! যাইদের বাবার যেন আর তর সইছিল না। ভাইকে সাথে নিয়ে তড়িঘড়ি করে চলে এলেন মক্কায়। রাসূলুল্লাহকে ﷺ খুঁজে বের করলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি যাইদকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেন। বিনিময়ে যা পারেন সবই দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদকে ফিরিয়ে দিতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। ততদিনে যাইদের সাথে তাঁর একটা চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যাইদ তাঁর খুবই প্রিয় একজন, সন্তানের মতো আদরে আদরে তাকে বড় করেছেন তিনি, ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে হবেই-বা কেন? অন্যদিকে আরেকজনের সন্তানকে জোর করে রেখে দেওয়ার এখতিয়ারও তাঁর নেই।

কিন্তু মন না মানলেও কিছু কাজ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ যাইদের বাপ-চাচার থেকে কোনো বিনিময় চাইলেন না, পুরো বিষয়টা যাইদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। বললেন, যাইদ যা চায় তা-ই হবে। যাইদের বাবা-চাচা শুনে খুবই খুশি! তারা ভাবতেই পারেননি এত সহজে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদকে ডেকে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। যাইদ বহুদিন পর নিজের আপনজনদের দেখলেন। বাবা-চাচাকে দেখেই চিনতে পারলেন। কিন্তু তাদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে যাইদ বললেন, 'আমি আমার বাবা-চাচার চাইতে আপনার সাথে থাকা বেশি পছন্দ করি।'[65]

আল্লাহর রাসূল এরপর যাইদকে নিজের সন্তান হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। যাইদ ইবন হারিসা হয়ে গেলেন যাইদ ইবন মুহাম্মাদ, একজন স্বাধীন ব্যক্তি! যাইদের বাবার প্রথমে খুব মন খারাপ ছিল। ছেলেকে এতদিন পর পেলেন। কিন্তু ছেলে বাবার কাছে আসতে চাইল না। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে তারা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন, যাইদকে রেখে ফিরে গেলেন।

যাইদ ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ অত্যন্ত স্নেহভাজন। আর যাইদও রাসূলুল্লাহকে ﷺ এত বেশি পছন্দ করতেন যে, বাবার সাথে থাকার চেয়েও আল্লাহর রাসূলের সাথে থাকাটাই তার কাছে বেশি প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের ছেলের মতো আদর করতেন। যাইদের কখনো মনে হয়নি তিনি একজন দাস। বরং মনে হতো যেন তিনিও আল্লাহর রাসূলের পরিবারের একজন। যেন তিনি আল্লাহর রাসূলেরই সন্তান! এ সবকিছুই ঘটে নবুওয়াতের আগে।

যাইদের সন্তান উসামাও ﷺ বড় হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে। যাইদ শুধু আল্লাহর রাসূলের স্নেহভাজন ছিলেন না, ছিলেন আস্থাভাজনও। যাইদ প্রথম যুগের মুসলিমদের

---

65 সীরাহ ইবন হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯।

একজন, নবুওয়াতের শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর, উহুদ, খন্দক -- গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর একটিতেও তাঁর অংশগ্রহণ বাদ যায়নি। হিজরত করেছিলেন একদম শুরুর দিকে। রাসূলুল্লাহ আর আবু বকরের পরিবারের সাথে নিজ পরিবারকে মক্কা থেকে নিরাপদে মদীনায় নিয়ে আসার কাজটিও করেন এই যাইদ। একাধিক সামরিক অভিযানের কমান্ডার হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

নিজের সন্তানতুল্য, দায়িত্ববান, সাহসী এই যুবককেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ফুপাতো বোন যাইনাবের জন্য পছন্দ করলেন। বংশের মর্যাদায় দু'জনের মধ্যে যাইনাব এগিয়ে থাকলেও দ্বীনদারিতা, চরিত্র আর তাক্বওয়ায় দু'জনেই ছিলেন অনেক এগিয়ে। তাই বংশের কারণে উঁচু বা নিচু চোখে দেখার যে প্রথা আরবদের ছিল, সেই প্রথাকে ভেঙে দিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারের এই দুই সদস্যকে বেছে নিলেন। নিচু বংশের কারো সাথে সংসার করার ব্যাপারে মানুষের যে অস্বস্তি কাজ করতো, সেই অস্বস্তিটুকু যেন এর মাধ্যমে মুছে যায়।

যাইদ-যাইনাবের ﷺ সংসার ও বিচ্ছেদ

কিন্তু দু'জনের সংসারে বনিবনা হলো না। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দ্বীনদার হলেই যে সংসার সুখের হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাদের সংসার টিকেছিল মাত্র এক বছর। বিচ্ছেদের আগে যাইদ রাসূলুল্লাহর কাছে এসে অনুযোগ করতেন যে, তাদের সংসারে ভালোবাসা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদকে ধৈর্য ধরতে বলতেন। বলতেন, আল্লাহকে ভয় করো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সংসার টিকলো না। তারা দু'জনেই সংসার না চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। দুজনের সম্মতিতে যাইদ যাইনাবকে তালাক দিয়ে দেন।

জাহিলিয়াতি আরবে সন্তান দত্তকের ধারণা

দত্তক নেওয়া বলতে আমরা বর্তমান সময়ে যা বুঝি তৎকালীন আরবে তেমনটা ছিল না। সে সময়ে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে দত্তক হিসেবে নিত, তাহলে পালক পুত্র বা পালক কন্যা দত্তকগ্রহণকারীর আপন পুত্র বা কন্যার মতো সমস্ত অধিকার লাভ করতো। তারা দত্তক গ্রহণকারীর বংশনাম গ্রহণ করতো, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করতো। পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা ছিল জাহিলিয়াতের সংস্কৃতিতে 'হারাম', একেবারেই মেনে নেওয়ার মতো না। অর্থাৎ, সত্যিকারের পিতা-পুত্রের যেমন সম্পর্ক, সেটাই তাদের উপর প্রযোজ্য হতো। কিন্তু ইসলাম এসে এই নিয়মগুলো বদলে দেয়।

> "...আল্লাহ তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে

ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে (আগে) যদি তোমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে তাতে তোমাদের জন্য কোনো গুনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ৪-৫)

অর্থাৎ, পালক পুত্রকে পুত্র বললেই সে পুত্র হয়ে যায় না। বরং তাদের সম্পর্ক হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত যাইদকে ডাকা হতো যাইদ ইবন মুহাম্মাদ। এই আয়াত নাযিলের পর তিনি আগের নামে ফিরে যান -- যাইদ ইবন হারিসা। ইসলামে পোষ্যপুত্রের নাম তার আসল পিতার নামেই হতে হবে, পালক পিতার নামে নয়। নিঃসন্দেহে ইয়াতীমের দেখাশোনা ও ভরণপোষণ করা ইসলামের নজরে অত্যন্ত মহৎ একটা কাজ, অনেক বেশি সাওয়াবের একটা কাজ। কিন্তু ইয়াতীম বা পালকপুত্র (কিংবা কন্যা) কখনোই পালকপিতার নামে পরিচিত হবে না এবং পিতা-পুত্রের সম্পর্ক তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না।

একটি সামাজিক কু-প্রথার পরিসমাপ্তি

যাইদ এবং যাইনাবের সংসারে যখন টানাপোড়েন চলছে, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতেন তাদের এই সংসার টিকবে না এবং শেষ পর্যন্ত যাইনাবের সাথে তাঁর বিয়ে হবে -- আল্লাহ তাঁকে বিষয়টি আগেই জানিয়ে দেন। কিন্তু তবু তিনি যাইদকে যাইনাবের সাথে সংসার চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন। নিকট ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে সেটা ভেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠবে। সমাজের লোক ছি ছি করবে। কারণ সেই সময়ে পালকপুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা ছিল সমাজের দৃষ্টিতে খুব বাজে একটি বিষয়। কেমন ছিল তখন আল্লাহর রাসূলের মানসিক অবস্থা? আল্লাহ বলছেন,

"আর স্মরণ করো! যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন ও যার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো, আর আল্লাহকে ভয় করো। (কিন্তু এ পর্যায়ে) আপনার মনের ভেতরে যে কথা আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দিলেন। (আসলে আপনার পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে) আপনি মানুষদের (কথাকেই) ভয় করছিলেন, অথচ (আপনি জানেন) আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশি হক্বদার।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমাজের এই অর্থহীন প্রথাকে ভেঙে দিতে চাইলেন। এই প্রথা মুখের আদেশ দিয়েও ভাঙা যেত, কিন্তু আল্লাহ চাইলেন কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই প্রথাকে ভেঙে দিতে। আর তাই তাঁর রাসূলকে বিয়ে দিলেন

যাইনাবের সাথে। মুখে বলা আর করে দেখানো কখনোই এক নয়। কোনো কথা বলার চেয়ে করে দেখালে নিশ্চিতভাবেই সেটা অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে। আল্লাহ সেটাই ফয়সালা করেন, আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাবের বিয়ে দিয়ে দেন। এই বিষয়টা নিয়ে যাইনাব খুব গর্ব করে রাসূলুল্লাহর ﷺ অন্যান্য স্ত্রীদের বলতেন, 'তোমাদের বিয়ে তো হয়েছে জমিনে, আর আমার বিয়ে হয়েছে আসমানে!'

পুরো ঘটনায় দুটো বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

এক, দত্তক নেওয়া বলে কিছু নেই, পালকপুত্র বা কন্যাকে স্ব-স্ব পিতৃপরিচয়ে বড় করতে হবে।

দুই, পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে কোনো সমস্যা নেই, এটি সামাজিক কু-প্রথা মাত্র।

বিয়ে হলো, ওয়ালিমা হলো। প্রায় তিনশো জন অতিথিকে আপ্যায়ন করা হলো ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে। আনাস ইবন মালিকের ﷺ মা উম্মু সালিম ﷺ তার সাধ্যমতো কিছু খাবার রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য রান্না করে পাঠান। বলা বাহুল্য, এই খাবার তিনশো জনের জন্য মোটেও যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু এবারও ঘটলো একটি মু'জিযা, যেমনটা ঘটেছিল জাবির ইবন আবদুল্লাহর সাথে। এই অল্প খাবার তিনশো জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল।

যাইনাবের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিয়ে নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচার

কাফিররা রাসূলুল্লাহর ﷺ যে দুটো বিয়ে নিয়ে সবচাইতে বেশি আক্রমণ করে তার একটি হলো আইশার সাথে বিয়ে, আরেকটি হলো যাইনাবের সাথে বিয়ে। মজার বিষয় এ দুটো বিয়েই সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে।

১) ইসলামবিদ্বেষীরা বলে থাকে যাইদের বিয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ যাইনাবের প্রেমে পড়েছিলেন। তাই যাইদকে তিনি তালাক দিতে বলেছেন যেন যাইনাবকে বিয়ে করতে পারেন। এর জবাব হলো, আল্লাহর রাসূল অনেক আগে থেকেই যাইনাবকে চিনতেন। তখনো হিজাবের আয়াত নাযিল হয়নি, তিনি যাইনাবকে আগেই দেখেছেন। বিয়ে করতে চাইলে তিনি আগেই যাইনাবকে বিয়ে করতে পারতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই চেয়েছেন যাইদের সাথে যাইনাবের বিয়ে হোক। তাদের সংসারে যখন বনিবনা হচ্ছিল না, তখনো আল্লাহর রাসূল ﷺ যাইদকে বারবার বলেছেন যেন তিনি সংসার করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

২) ইসলাম বিদ্বেষীদের একটি বড় অপপ্রচার হলো আল্লাহর রাসূল নিজে কুরআন রচনা করেছেন। এই অপবাদ নিয়ে আলোচনার বিশাল জায়গা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শুধু

একটা বিষয়ের অবতারণা করা হলো: আল্লাহর রাসূল ﷺ ওয়াহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, যাইনাবের সাথে তাঁর বিয়ে হবে। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে তিনি কাউকে কিছুই বলতে পারেননি, বরং যাইদকে তালাক না দিতেই উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টির নিন্দা করেছেন।

> "আর তুমি মানুষকে ভয় করেছিলে, অথচ আল্লাহরই বেশি অধিকার যে তুমি তাঁকেই ভয় করবে।"

সমাজের মানুষ কী বলবে এটা ভেবে আল্লাহর রাসূল ﷺ ভয় পাচ্ছিলেন -- আর এজন্য আল্লাহ তাঁকে নিন্দা করেন। যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে কুরআন লিখতেন, তাহলে তিনি নিজের লেখা কিতাবে নিজের নিন্দা বা সমালোচনা করতেন না। কারণ একজন মানুষ কখনোই প্রকাশ্যে লজ্জায় বা অস্বস্তিতে পড়তে চায় না। কিন্তু এই আয়াতটি ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য অস্বস্তিকর, কেননা এখানে আল্লাহ তাঁকে মৃদু ভাষায় তিরস্কার করছেন। এই প্রসঙ্গে মা আইশার একটি চমৎকার মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য, 'যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআনের কোনো আয়াত গোপন করতেন, তবে তিনি তাঁকে নিন্দা করার এই আয়াতটি মানুষের কাছে গোপন করতেন।'

ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত কিছু সারিয়া

খন্দকের পরে কুরাইশরা দমে গেলেও নজদের গোত্রগুলো পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করেনি। তারা ছিল মুসলিমদের উত্থানের বিরুদ্ধে বড়সড় একটা হুমকিস্বরূপ। তাই রাসূলুল্লাহ এবার নজদের দিকে মনোযোগ দিলেন।

১) আল-কারতার অভিযান

নজদের বনু বাকর ইবন কিলাব গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ؓ। ত্রিশ জনের একটি দল নিয়ে তিনি বনু বাকরের শাখাগোত্র বনু আল-কারতাহর উপর হামলা চালান। তাদের দশ জন মারা যায়। গনিমত নিয়ে ফিরে আসার সময় সুমামাহ ইবন উসাল নামের লোককে গ্রেপ্তার করেন। সে ছিল বনু হানিফা গোত্রের নেতা। বন্দীত্বের তিনদিনের মাথায় সে মন পরিবর্তন করে। গোসল করে মসজিদে এসে শাহাদাহ পাঠ করে, উমরা করার অনুমতি চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পেয়ে তাকে অনুমতি দিলেন। সে মক্কায় গেল উমরা করতে[66], পথিমধ্যে মক্কার এক লোক তাকে বললো,

- এই, তুই নাকি মুরতাদ হয়ে গেছিস?

- না, আমি মুহাম্মাদের দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল-

[66] আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২০৩।

ইয়ামামা থেকে যেন এক দানা শস্যও তোদের মক্কায় রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুমতি ছাড়া না ঢুকে সেই ব্যবস্থা করছি।

সুমামাহর এই কথা ফাঁকা বুলি ছিল না। সে তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সত্যি সত্যি ইয়ামামা থেকে মক্কায় শস্য পাঠানো বন্ধ করে দেয়। তখন মক্কার নেতারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুরোধ করেন যেন তিনি সুমামাহকে সামলে রাখেন। রাসুলুল্লাহ তাদের অনুরোধ রাখেন। ইসলাম মানুষকে যখন সত্যিই বদলে দেয়, তখন আমূলে বদলে দেয়। সে নিজের বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা সবকিছু দিয়ে ইসলামের খেদমত করার চেষ্টা করে, সুমামাহ তেমনই এক উদাহরণ।

২) আল-খাবত অভিযান

এটি মাছের অভিযান নামেও পরিচিত। তিনশো সৈনিকের এ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবায়দাহ ইবন আল-যাররাহ। কুরাইশদের অর্থনীতির বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর সিরিজ হামলার মধ্যে এটি একটি। কারো মতে, এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল জুহাইনাহ গোত্র। উদ্দেশ্য যা-ই হোক, এই অভিযানে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু যাত্রাপথে মুসলিমদের রসদ প্রায় ফুরিয়ে যায়। খাবার বাঁচিয়ে রাখার জন্য আবু উবায়দাহ দিনে প্রত্যেক মুজাহিদের ভাগে একটি করে খেজুর খেতে দেন। দিনগুলি ছিল খুবই কষ্টের! সেই মুহূর্তের কথা স্মরণ করে জাবির ইবন আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'যখন সব খেজুর শেষ হয়ে গেল, দিনে একটা খেজুরের মর্ম যে কী আমরা তখন বুঝতে পেরেছি!'

কাইস ইবন সাদ ইবন উবাদাহ ছিলেন এই অভিযানে অংশ নেওয়া এক সৈনিক। এই অবস্থা দেখে তিনি ধার করে এনে নয়টি উট জবাই করে সবার খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মানুষ সাধারণত ধনী অবস্থায় বেশি সাদাকাহ করে, কিন্তু কাইস এমন ছিলেন না। তিনি ছিলেন আনসারী সাহাবি সাদ ইবন উবাদার সন্তান। এ পরিবার ছিল উদারতার জন্য বিখ্যাত।

এই অভিযান 'মাছের অভিযান' নামে পরিচিত হওয়ার কারণ ছিল। রসদের সব খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর মুসলিমরা সাগরের তীরে এক বিশাল তিমি মাছ পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন। প্রথমে তারা ভাবলেন সেই মাছ খাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু আবু উবায়দা ﷺ বললেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূলের সাহাবি। আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণ করছি। আমাদের যেহেতু প্রয়োজন, কাজেই তোমরা খেতে পারো।' এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মরা পশু খাওয়া জায়েয না হলেও মরা মাছ খাওয়া জায়েয।

তারা ছিলেন আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ। তাই আল্লাহই তাদের জন্য রিযিক্ব পাঠিয়ে দেন। বিশাল আকৃতির এক তিমি। এতই বিশাল যে, তিনশো মুজাহিদ আঠারো দিন

ভরপেট খেয়েও শেষ করতে পারেননি।[67] অভিযান থেকে ফিরে এসে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ এই ঘটনা বলা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে বললেন, 'এই মাছ ছিল তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো রিযিক্ব।' তারা ফিরে আসার সময় সেই মাছের কিছু অংশ নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আগ্রহ ভরে সেই রিযিক্ব খেয়ে দেখলেন।

৩) আবু রাফে: পাঁচ সাহাবির ﷺ দুঃসাহসী অপারেশন

এক আনসারি সাহাবির ভাষায়, 'আওস ও খাযরাজ গোত্রের উদাহরণ হলো দুই তেজী ঘোড়ার মতো যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।' একটি গোত্রের কেউ যখন নবীজির ﷺ সেবায় কিছু করতো, অন্য গোত্রও সেরকম কিছু করে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করতো। এই প্রতিযোগিতা দুনিয়ার সাফল্যের জন্য ছিল না, তাদের প্রতিযোগিতা ছিল আখিরাতকেন্দ্রিক। সাফল্য বলতে আজকের পশ্চিমা বস্তুবাদী পুঁজিবাদী বিশ্ব বোঝে অর্থ, ক্ষমতা আর মর্যাদা। কিন্তু ইসলামে সাফল্য বলতে বোঝায় আল্লাহর নৈকট্য।

আওস গোত্রের সাহাবিরা কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা করেছিল। এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট একটা অর্জন। খাযরাজ গোত্রও পেছনে পড়ে থাকতে চায়নি। তারাও চাইলো ইসলামের খেদমতে এরকম একটা কিছু করতে। এজন্য তারা বেছে নিলো কা'ব ইবন আশরাফের মতো আরেক ইসলামবিদ্বেষী ব্যক্তিকে। তার নাম হলো সালাম ইবন আবী আল-হুকাইক। সে পরিচিত ছিল আবু রাফাই বা আবু রাফে নামে।

আবু রাফে ছিল একজন জনপ্রিয় কবি। আর সে যুগে কবি মানেই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। আগেই বলা হয়েছে, সেই সময়ের একটি কবিতা হচ্ছে আজকের যুগে একটি নিউজসাইটের প্রবন্ধ, টুইটারের টুইট কিংবা ব্লগপোস্ট অথবা ফেসবুক স্ট্যাটাসের মতো। সেটা মুহূর্তের মাঝে সবার কাছে পৌঁছে যেত। আবু রাফে তার এই কাব্যিক 'প্রতিভা' কাজে লাগিয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখার কাজে। ইসলাম ও মুসলিমদের অপমান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ করা ছিল তার কবিতার মূল উপজীব্য। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়া-যুদ্ধে অংশ নেওয়া ছাড়াও সে ছিল খন্দক যুদ্ধের অন্যতম কারিগর। খন্দকের অর্থায়নে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গাতফান গোত্র যখন খন্দকের সামরিক জোটে অংশ নেয়, সে তখন গাতফানকে মোটা অংশের পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেয়।

খাযরাজের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এই আবু রাফের নাম প্রস্তাব করা হয়। আবু রাফেকে হত্যা করা হলে নিশ্চিতভাবেই ইসলামের বড় একটা শত্রুকে শেষ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমোদন দেন। পাঁচ জনের একটা দলকে পাঠানো হয় আবু

---

[67] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১৯২।

রাফেকে হত্যা করার মিশনে। এর নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন আতিক। এই দলে আরও ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ﷺ, গুপ্তহত্যায় তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি খালিদ ইবন সুফিয়ানকে হত্যা করেছিলেন। সে কাহিনী আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আবু রাফে ছিল ইহুদি। সে থাকতো খাইবারের নিরাপদ একটা দুর্গের মধ্যে। আবদুল্লাহ ইবন আতিকের নেতৃত্বে পাঁচ সাহাবির ছোট্ট দলটি যখন খাইবারে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা নেমেছে। সবাই পশুপাল নিয়ে বাড়ির পথে। দুর্গে ঢুকতে হলে এখনই ঢুকে পড়তে হবে, কারণ সন্ধ্যার পর দুর্গের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবন আতিক ﷺ তার সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে একাই দুর্গের দিকে যেতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে কোনোভাবে দুর্গের মাঝে ঢুকে পড়া।

তিনি চট করে একটা কাজ করলেন। একটা চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে এমন একটা ভান করলেন যেন মনে হয় দুর্গের দেওয়ালের পাশেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বসেছেন। মানুষ দেখলে ভাববে, তিনি এই দুর্গেই থাকেন, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হয়েছেন। সে যুগে এটা স্বাভাবিক ছিল। আর হলোও ঠিক তাই। তাকে দেখে প্রহরী বলে উঠলো, 'এই যে আল্লাহর বান্দা, ভেতরে যেতে চাইলে এখনই যাও। আমি কিন্তু দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি।'

আবদুল্লাহ ইবন আতিক ﷺ এই সুযোগটাই খুঁজছিলেন। টুপ করে দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়লেন। এরপরের কাহিনী ইতিহাস! আবদুল্লাহ ইবন আতিকের ﷺ মুখেই শোনা যাক সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী,

'আমি দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলাম। সবাই ভেতরে চলে এসেছে ভেবে প্রহরী দরজা লাগিয়ে দিল। আর চাবিটা একটা খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখল। বেশ খানিকক্ষণ পর চারদিক সুনসান নীরব হয়ে যাওয়ার পর আমি উঠে গিয়ে চাবিটা নিলাম, আর দরজা খুলে দিলাম (যেন দলের বাকি সদস্যরা যোগ দিতে পারে) ।

আবু রাফে থাকতো দোতলার একটা ঘরে। দেখলাম সেখানে কিছু লোক গল্পগুজবে মত্ত। আমি তাদের যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটা গাধার খোঁয়াড়ে বসে আছি। এক সময় লোকগুলো চলে গেল। তখন আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ভেতর থেকে দরজাটা দিলাম বন্ধ করে। ভাবলাম, তারা যদি আমার উপস্থিতি টেরও পায়, তবু আমাকে ধরার আগেই আমি আবু রাফেকে মেরে ফেলতে পারবো।

আবু রাফের ঘরে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সে তার তার পরিবার-পরিজন নিয়ে শুয়ে আছে। ঘরটা ছিল অন্ধকার। আবু রাফে ঠিক কোথায় আছে বোঝা যাচ্ছিল না। তাই তাকে ডাক দিলাম,

- আবু রাফে!

- কে রে, কে কথা বলে? আবু রাফে জিজ্ঞেস করলো।

আমি তার গলার আওয়াজ শুনে সে কোথায় আছে আন্দাজ করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তলোয়ার দিয়ে দিলাম এক কোপ। আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে ছিলাম তাই আঘাতটা ঠিক জায়গামতো লাগলো না। আবু রাফে চিৎকার করে উঠলো। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। একটু পর আবারও তার ঘরে ঢুকলাম। এবার ঢুকলাম বন্ধুর বেশে। ভান করলাম যেন তাকে সাহায্য করতে এসেছি। গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম,

- আবু রাফে! কী হয়েছে আপনার?

- তোমার মায়ের জীবন বরবাদ হোক! দেখছো না কী হয়েছে! এক লোক এইমাত্র আমাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেছে!

এবার আমি সুযোগ বুঝে তার কাছে গিয়ে তাকে আবার কোপ মারলাম। এবারও খুব একটা সুবিধা করতে পারলাম না। তার স্ত্রী চিৎকার করে উঠলো। আমি আবারও গলার স্বর পরিবর্তন করে সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। দেখলাম আবু রাফে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। এবার তার পেট বরাবর তলোয়ার চালালাম। এরপর তলোয়ার বাঁকিয়ে ধরলাম। তলোয়ার তার পিঠ পর্যন্ত ঢুকে গেল, হাড় ভাঙার মচমচ আওয়াজ শুনতে পেলাম। নিশ্চিত হলাম, এবার তাকে হত্যা করতে পেরেছি।

তারপর দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। একটার পর একটা দরজা খুলছি আর বেরোচ্ছি, এভাবে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, একদম নিচে পৌঁছে গেছি ভেবে যে-ই না পা ফেলেছি, ওমনি পিছলে পড়ে গেলাম।

সেদিন ছিল জোৎস্না রাত। আমার পা ভেঙে গেছে। পাগড়ি খুলে পা বাঁধলাম। (ভাঙা পা নিয়ে) সামনে এগোতে থাকলাম। দরজা পর্যন্ত এসে বসে পড়লাম। ভাবলাম, আবু রাফেকে হত্যা করতে পেরেছি কি না এটা নিশ্চিত না হয়ে এখান থেকে যাবো না।

সকাল হলো। মোরগের ডাক শুনতে পেলাম। কেউ একজন ঘোষণা করলো, হে হিজাজের অধিবাসী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু রাফে নিহত হয়েছেন। আমার মনে হলো, এর চাইতে মধুর কোনো কথা আমি কখনো শুনিনি।

ঘোষণা শোনার পর সঙ্গীদের কাছে চলে এলাম। বললাম, আমাদের এখন যেতে হবে। আল্লাহ আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলাম, তাকে সমস্ত ঘটনা শোনালাম। তিনি বললেন, দেখি তো তোমার পা'টা বাড়িয়ে দাও। আমি আমার পা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার পা'টা তাঁর হাত দিয়ে শুধু ছুঁয়ে দিলেন। ওমনি আমার পা একদম সুস্থ হয়ে গেল! মনে হলো যেন এই পায়ে কখনোই কিছু হয়নি।'

এই ঘটনাটি সহীহ বুখারিতে বর্ণিত।[68] ইবন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তারা পাঁচ জনই আবু রাফের ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করেছিলেন। তবে দুটো বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ আমরা ধরে নিতে পারি, উপরের বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন আতিক শুধু নিজের অংশের কথাই বর্ণনা করছিলেন।

আবু রাফের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) সুপরিকল্পনা

দুর্গে ঢোকার সময়ের কৌশল ছাড়াও আবু রাফের ঘরে প্রবেশের জন্য আবদুল্লাহ ইবন আতিককে ﷺ বেশ কিছু চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। আবু রাফের স্ত্রীকে তারা বলেন, তারা আরব থেকে আবু রাফের কাছে কিছু সাহায্যের জন্য এসেছেন। তারা নাটকটি এমনভাবে সাজান যেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়। আর এসব কথোপকথনই হচ্ছিল ইহুদিদের ভাষায়। আবদুল্লাহ ইবন আতিক ﷺ ইহুদিদের ভাষায় কথা বলেছেন যেন তার জন্য ভেতরে ঢোকা সহজ হয়। এ ধরনের কাজ অত্যন্ত পরিকল্পিত হওয়া চাই। সাহাবিরা সেটা নিশ্চিত করেছেন।

২) উপস্থিত বুদ্ধি

শুরু থেকেই আবদুল্লাহ ইবন আতিক ﷺ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেছেন। প্রস্রাব করার ভান করে দুর্গে ঢুকে পড়া, গাধার আস্তাবলে লুকিয়ে থাকা, আবু রাফের স্ত্রীকে ধোঁকা দেওয়া, আবু রাফের সাহায্যকারী সেজে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে কথা বলে তার অবস্থান খুঁজে বের করা -- প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় দিয়েছেন। এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে এটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। ঈমান-আমলের সার্বিক বিবেচনায় আবু বকর, উমর, উসমানরা ﷺ এগিয়ে আছেন সত্যি। কিন্তু কিছু কাজ আছে যেটার জন্য বিশেষ কিছু দক্ষতা লাগে যেটা ছিল মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ, আবদুল্লাহ ইবন উনাইস কিংবা আবদুল্লাহ ইবন আতিকদের ﷺ। একজন নেতার কাজ এই বিশেষ যোগ্যতা এবং সুপ্ত প্রতিভাগুলো খুঁজে বের করা।

৪) আল-গাবার অভিযান: পদাতিক সৈনিক সালামাহ ইবন আল-আক্বওয়ার বীরত্ব

এই অভিযানটি ছিল ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত সবচেয়ে বড় অভিযান[69]। আর অভিযানের মূল নায়ক ছিলেন সালামা ইবন আল-আকওয়া ﷺ। এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন পাঁচশো সাহাবি, কিন্তু সালামার বীরত্ব আর সাহসিকতা আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। সালামা ইবন আল-আকওয়া ﷺ ছিলেন মক্কা ছেড়ে আসা এক মুহাজির। পরিবার, সহায়-সম্পদ সবকিছু ছেড়েছুড়ে তিনি আল্লাহ ও তাঁর নবীর পথে হিজরত করেছিলেন।

---

[68] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ৮৬, ৮৭।

[69] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৭।

মদীনায় এসে তিনি তালহা ইবন উবায়দুল্লাহর ﷺ চাকরি নেন। তাঁর ঘোড়া চড়ানো, তাঁকে খেদমত করা, এভাবেই দিন কাটতে থাকে।

ঘটনার সূত্রপাত অনেকটা এভাবে, আবদুর রহমান উয়াইনা ইবন হিসন আল-ফিজারীর নেতৃত্বে গাতফানের কিছু লোক গাবাহ নামক স্থানে হামলা চালায়। গাবাহ মদীনার কাছেই একটা উর্বর জায়গা। সেখানে মুসলিমরা তাদের উট চড়ানোর জন্য পাঠাতো। একদিন আবদুর রহমান আল-ফিজারীর লোকেরা এসে মুসলিম মেষপালক যার ইবন আবি যারকে ﷺ হত্যা করে। তার স্ত্রী লাইলাকে ﷺ বন্দী করে এবং বিশটা উট লুট করে পালিয়ে যায়। উটগুলো ছিল আল্লাহর রাসূলের উট।

ঘটনাস্থলের কাছেই উপস্থিত ছিলেন সালামা ইবন আল আকওয়া এবং রাবাহ। তারা দুজনেই সেদিন উট চরাতে তৃণভূমিতে নিয়ে এসেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ভোর বেলায়। সালামা ﷺ এই ঘটনা দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ রাবাহকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠিয়ে দেন। আর তিনি নিজে শত্রুদের দৌড়ে ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন,

"ওয়া সুবহা! ওয়া সুবহা! ওয়া সুবহা!"

'ওয়া সুবহা' ছিল সে যুগের বিপদ সংকেত। আজকের যুগে অ্যামবুলেন্স বা দমকল বাহিনীর গাড়ির সাইরেনের মতো। সালামার চিৎকার মদীনা থেকেও শোনা গেল। সাহাবিরা দ্রুত রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে জমা হলেন। এই আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতেই হবে। রাসূলুল্লাহ তৎক্ষণাৎ পাঁচশো সৈনিকের দল প্রস্তুত করলেন।

এদিকে সালামা সৈন্যবাহিনী আসার অপেক্ষা না করে একাই উয়াইনা আর তার দলবলের পিছু নেওয়ার জন্য ছুটে গেলেন। কিন্তু তার কাছে তখন না আছে কোনো ঘোড়া, না আছে কোনো উট, ছিল শুধু দুটো পা। সেই পা দুটোকে পুঁজি করেই লুটেরাদের ধরার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। সালামার ভাষায়,

'আমি লুটেরাদের তাড়া দিতে বেরিয়ে পড়লাম। তাদের দিকে একের পর এক তীর ছুঁড়ছি আর ছন্দ মিলিয়ে হুংকার দিচ্ছি,

এই দ্যাখ! আমি হলাম আকওয়ার পুত্র!
আজকের দিন ইতরদের ধ্বংসের দিন!
আমি হলাম আকওয়ার পুত্র, দেখে নে-
ইতরের দল মরবে এই দিনে!

যাকেই হাতের নাগালে পাচ্ছি, এমনভাবে তীর ছুঁড়ে মারছি যে কাঁধ ছেদ করে তীরের মাথা বেরিয়ে আসছে। তাদের কেউ যখন আমার দিকে পিছু ফিরতো, আমি গাছের

গোড়ায় বসে পড়তাম আর আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে তাকে কিংবা তার পশুকে ঘায়েল করতে লাগলাম!'

লুটেরাদের সবাই ছিল ঘোড়ায় আর সালামা ইবন আল আকওয়া পদাতিক একজন সৈনিক মাত্র। অথচ সালামার ধাওয়া খেয়ে তাদের রীতিমতো পাগল হওয়ার মতো অবস্থা! তারা কোনোরকমে একটা পাহাড়ের পাশে সরু গিরিপথের মতো জায়গায় আশ্রয় নিল। সালামা ﷺ এরপর সেই পাহাড়ে উঠে উপর থেকে তাদের উপর একের পর এক পাথর মারতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে তারা লুট করা সবগুলো উট ছেড়ে দিয়ে ক্ষান্ত হলো।

শত্রুরা ক্ষান্ত হলেও সালামা ইবন আল আকওয়া মোটেও ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তাদের ধাওয়া করতেই থাকলেন, করতেই থাকলেন। ধাওয়া খেতে খেতে শত্রুদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম! কোনোমতে ত্রিশটা জোব্বা আর ত্রিশটা বর্শা ফেলে নিজেদের বোঝা হালকা করে পড়িমরি করে পালাতে লাগলো। ফেলে যাওয়া জিনিসগুলোও সালামা চমৎকারভাবে কাজে লাগালেন। জিনিসগুলোর উপর সালামা একটা করে নিশানা রেখে দিতে দিতে এগোচ্ছিলেন যেন জিনিসগুলো পরে খুঁজে পেতে সমস্যা না হয় আর রাসূলুল্লাহর ﷺ পাঠানো বাহিনীও যেন এই চিহ্ন দেখে পথ চিনে নেয়। সালামা বর্ণনা করেন,

'শেষ পর্যন্ত লুটেরার দল এক সরু পাহাড়ি পথে গিয়ে থামলো। সেখানে তারা বদর আল ফাজরির ছেলের সাথে মিলিত হলো। সবাই মিলে সকালের নাস্তা খেতে বসেছে, আমি তখন একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়ানো। আমাকে দেখিয়ে ফাজারি বললো, এই লোকটা কে? তারা বললো, এই লোক-ই তো আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে! সেই ভোর থেকে আমাদের পিছু ছাড়েনি! তীর মারতে মারতে আমাদের থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। ফাজারি বললো, তোমরা তাকে তাড়া করছো না কেন! যাও, চার জন গিয়ে এখনই এই লোককে শেষ করে দাও।

তাদের মধ্যে চারজন পাহাড়ে উঠে আমার কাছাকাছি এল। আমি বললাম,

- তোরা চিনিস আমাকে?

- না, চিনি না। কে তুমি?

- আমি হলাম সালামা ইবন আল-আকওয়া। সেই সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, আমি চাইলে তোদের প্রত্যেককে এক এক করে শেষ করে দিতে পারি কিন্তু তোরা কেউ আমার কিছুই করতে পারবি না!

এই কথা শুনে তাদের একজন বললো, আমার মনে হয় সে ঠিকই বলছে।

এরপর তারা চলে গেল। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ঘোড়সওয়ারিরা আসা পর্যন্ত আমি

সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। সবার আগে দেখতে পেলাম আখরাম আল-আসাদীকে। তার পেছনে পেছনে আসছে আবু ক্বাতাদা আল-আনসারি, আর তারও পেছনে ছিল মিকদাদ ইবন আল-আসওয়াদ। আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম টেনে বললাম, আখরাম, তুমি সতর্ক থাকো। ওরা একা পেলে তোমাকে মেরে ফেলবে।

আখরাম আমাকে বললো, সালামা! যদি তুমি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো, তুমি যদি বিশ্বাস করে থাকো যে জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য -- তাহলে আমার আর শাহাদাতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িও না।'

কারো কারো বুকের ভেতর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বাসনা কত যে তীব্র হয়! আখরামের অদম্য সাধ শহীদ হবেন। এরপর সালামাহ আর বাধা দিলেন না। পথ ছেড়ে দিলেন। আখরাম ছুটে গেলেন লুটেরাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হতে। উয়াইনার মুখোমুখি আখরাম। দু'জন প্রচণ্ড লড়াই করছেন। আখরামের আঘাতে উয়াইনার ঘোড়া আহত হলো, কিন্তু উয়াইনার পাল্টা আঘাতে আখরাম শহীদ হয়ে গেলেন। শাহাদাত। আখরামের কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত। আল্লাহর রাসূলের ﷺ থেকে শিক্ষা নেওয়া মানুষগুলো এভাবেই মৃত্যুকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। তাঁরা মৃত্যুকে ভয় পেতেন না। বরণ করে নিতেন।

আখরামকে হত্যা করে উয়াইনাহ তাঁর ﷺ ঘোড়ায় চড়ে বসলো। এরপর দৃশ্যপটে আসলেন দ্বিতীয় বীরযোদ্ধা আবু কাতাদা। আবু কাতাদা ﷺ উয়াইনাকে আক্রমণ করলেন, পাল্টা আঘাতে উয়াইনা আবু কাতাদার ঘোড়াকে মেরে ফেললো। কিন্তু আবু কাতাদা আল্লাহর ইচ্ছায় উয়াইনাকে হত্যা করলেন আর তার ঘোড়া নিজের দখলে নিয়ে সেটায় চড়ে বসলেন। সেটা আসলে আখরামের ঘোড়া ছিল। সালামা এরপর আবারও ডাকাতদলকে তাড়া করতে শুরু করলেন। আবার ফেরা যাক সালামার বর্ণনায়,

'সেই সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মাদের মুখকে উজ্জ্বল করেছেন, আমি তখন এতটাই ক্ষিপ্রগতিতে তাদের ধাওয়া করছি যে পেছনে রাসূলুল্লাহর ﷺ কোনো সাহাবিকেই দেখতে পেলাম না। এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের উড়ানো ধূলিও আমার চোখে পড়ল না। এভাবে চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ডাকাতদল একটা গিরিপথে থামলো। সেখানে যি-কারদ নামে একটা ঝর্ণা ছিল। খুব তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি খাবে, এরকম মুহূর্তে তারা আমাকে দেখে পানি খাওয়া ছেড়ে পড়িমরি করে পাহাড়ের উপরে পালাতে শুরু করলো! আমি হুংকার দিয়ে বলে উঠলাম,

এই দ্যাখ! আমি আকওয়ার পুত্র!
আজকের দিন ইতরদের ধ্বংসের দিন!'

সারাদিনের ছুটোছুটির পর লুটেরার দল তখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিধ্বস্ত। তাদের আর চলার শক্তি বাকি নেই। সালামাকে দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেল! তারা বিশ্বাসই

করতে পারছিল না এই একটি লোক সেই ভোর থেকে দৌড়ে তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে তাদের একজন বললো,

- তুমিই কি সেই লোক যে ভোর থেকে আমাদের তাড়া করে ফিরছো!
- হ্যাঁ! আমিই তোদের জানের দুশমন! ভোরবেলার সেই আকওয়া!'

লুটেরার দল সারাদিন ঘোড়ায় করে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তাদের ঘোড়াগুলোও ছুটতে ছুটতে কাহিল হয়ে পড়েছে, শক্তির আর লেশমাত্র নেই। তারা দুটো ক্লান্ত ঘোড়া উপত্যকায় রেখে চলে গেল। সালামা বলেন,

'তারা যে দুটো ঘোড়া পেছনে ফেলে পালিয়েছিল আমি সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ফেরত গেলাম। তিনি তখন সেই ঝর্ণার কাছে। সেখান থেকে সকালে মুশরিকদের পানি খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে শত্রুদের ফেলে যাওয়া চাদর আর বর্শাগুলো রাসূলুল্লাহর ﷺ হস্তগত হয়েছে। আর বিলালকে দেখলাম উদ্ধার করা উটগুলোর একটিকে জবাই করে সেটার কলিজা ভুনা করছেন। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে তাঁকে বললাম,

- ইয়া আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ দিন, আপনার বাহিনী থেকে একশো জন লোক নিয়ে এই কাফিরদের ধাওয়া করবো। এমনভাবে তাদের হত্যা করবো যে তাদের খবর আনার মতো একটা লোকও থাকবে না।

এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, আগুনের আলোয় আমি তাঁর দাঁত দেখতে পেলাম!

- তুমি আসলেই এই কাজ করতে পারবে তো সালামা?
- সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, অবশ্যই পারবো!'

গাতফানের এক লোক থেকে পরে সাহাবিরা জানতে পারেন যে, সেদিন তারা একটা উট জবাই করেছিল । এমন সময় তারা সালামাহ ইবন আল-আকওয়ার আগমন টের পেয়ে জবাই করা উট ফেলেই পালিয়ে যায়। এই ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবিদের কাজের নমুনা! শত্রুদলের লোকগুলো তাদের খাবার পর্যন্ত মুখে তোলার সুযোগ পায়নি।

পরদিন সকাল রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দিলেন, 'আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হলো আবু কাতাদা আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক সৈন্য হলো সালামা।' রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামাকে পদাতিক এবং অশ্বারোহী দুটো ভাগেরই গনিমত দেন।

যখন কোনো সাহাবি কৃতিত্বের কোনো কাজ করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কদর

করতে ভুলতেন না। তিনি সালামা ইবন আল আকওয়াকে ﷺ তাঁর উট 'আদবা'র পিঠে নিজের পেছনে বসালেন। দুজন একই উটের পিঠে চেপে একসাথে মদীনায় ফেরত আসলেন।

রাসূলুল্লাহর উট: আদবা

রাসূলুল্লাহর উটের নাম ছিল আদবা। অত্যন্ত দ্রুতগামী একটি উট। হজ্জের সময় দৌড় প্রতিযোগিতায় এটি ব্যবহৃত হতো। রাসূলুল্লাহর ﷺ মালিকানায় আসার আগে উটটি বনু আকিলের এক লোকের মালিকানায় ছিল। সেই লোক একবার উটসমেত মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছেই ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলো, 'মুহাম্মাদ, তুমি কেন আমাকে আর আদবাকে আটক করেছো?' বনু আকিল গোত্র মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত ছিল না। তাই লোকটি তাকে বন্দী করার ব্যাপারে প্রতিবাদ করছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দেন, 'তোমাকে আটক করেছি তোমাদের মিত্র সাকীফ গোত্রের কারণে।' সাকীফ গোত্রের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ না হলেও তারা ছিল কুরাইশদের পক্ষে এবং তারা ইসলামের বিরোধিতা করে আসছিল। সাকিফ গোত্রের কাছে দু'জন মুসলিম বন্দী অবস্থায় ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাকীফের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বনু আকিলের এই লোককে আটক করেছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে লোকটি বলে বসলো, 'আমি তো মুসলিম!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি যদি স্বাধীন অবস্থায় এই কথা বলতে তাহলে কথাটা মেনে নেওয়া যেতো। এখন তুমি একজন বন্দী। তাই এই কথা এখন তোমার কাজে আসবে না।' লোকটি তখন খেতে চাইলো। তাকে খাওয়া দাওয়া করতে দেওয়া হলো। বন্দী হওয়া দুই মুসলিমকে ফিরে পেতে পরবর্তীতে এই ব্যক্তিকে মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উটটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য রেখে দেন।

গাতফানের লুট করা বিশটি উটের মাঝে এই আদবাও ছিল। গাতফানের ডাকাতরা রাতে বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামলে উটগুলোকে সেখানেই ছেড়ে রাখত। সেই সময়ের কথা, একদিন তারা সবাই যখন ঘুমাচ্ছে। তখন তাদের হাতে বন্দী হওয়া সেই মুসলিম নারী লাইলা ﷺ, চুপে চুপে উটের পালের কাছে চলে গেলেন। তিনি কোনো একটি উটে চেপে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু কোনো উট উঠে দাঁড়াচ্ছিল না। অবশেষে তিনি আদবার কাছে এলে সে সহজেই পোষ মেনে যায়।

লাইলা খুশি হয়ে মানত করলেন, যদি তিনি এই উটে সওয়ার হয়ে পালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে এই উটকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করে দেবেন।

লাইলা মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ তার মানতের কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সব শুনে হেসে বললেন, 'হায়! সে তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে আর তুমি তাকে জবাই

করে দিতে চাচ্ছো! কী মন্দ প্রতিদান! শোনো, যে মানতের সাথে আল্লাহর অবাধ্যতা জড়িত, সেই মানত পূর্ণ করতে হয় না। সেই মানতও পূর্ণ করতে হয় না যেখানে তুমি এমন কিছু দান করার মানত করেছো যা তোমার নয়।'[70]

উটটি ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ, সেই মহিলার নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বুঝাচ্ছিলেন অন্যের সম্পত্তি নিয়ে মানত করতে হয় না, এটা আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাকে মানত পূর্ণ করতে নিষেধ করেন।

আল-গাবার অভিযান থেকে শিক্ষা

প্রথমত, শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার গুরুত্ব। সালামা ইবন আল-আকওয়া ﷺ ছিলেন সুস্থ-সমর্থ, শক্তিশালী একজন মানুষ। দীর্ঘ সময় ধরে অনায়াসে পরিশ্রম করে গেছেন। ঘোড়াও তার সাথে দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি ক্লান্ত হননি। সেই অভিযান থেকে আসার পথেও এক আনসারী সাহাবির সাথে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতায় নামেন। আজকের দিনের যুবকদের মধ্যে এমন ফিটনেস বিরল। সাহাবিরা ঘরের কোণে বসে থেকে বইপত্র বা কম্পিউটারে মাথা গুঁজে থাকার মানুষ ছিলেন না। দৌড় প্রতিযোগিতা, তীর ছোঁড়া -- এসব ছিল সাহাবিদের নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন। জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে তারা নিয়মিত এসব অনুশীলন করতেন।

দ্বিতীয়ত, লাইলার ঘটনা থেকে ইমাম নববী মহিলাদের একা ভ্রমণের উপর একটি মাসআলা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'জরুরি প্রয়োজনে মুসলিম নারী নিজের স্বামী বা অভিভাবক ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবেন। এরকম জরুরি প্রয়োজন উদ্ভূত হতে পারে যদি কোনো মহিলা দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করতে চায় কিংবা কেউ তাকে পাপ কাজে লিপ্ত করাতে চায় বা এরকম কিছু। প্রয়োজন ছাড়া একাকী ভ্রমণ মুসলিম মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ।' অর্থাৎ প্রয়োজনে মুসলিম নারীদের একা ভ্রমণ করা জায়েয তবে প্রয়োজন বলতে কী বোঝায় সেটা ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হওয়া চাই।

৫) উরাইনার রাখালদের কাহিনি: কুরয ইবন জারির আল-ফিহরীর অভিযান

উরাইনাহ গোত্র থেকে কিছু লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসেছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ইসলাম নিয়ে কথাবার্তা বলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। মদীনায় এসেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রথমবার মদীনায় আগতদের জন্য এটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল। তারা তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললো, 'আমরা তো মেষপালক, শহুরেদের মতো এক জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত নই।' তারা আর মদীনায় থাকতে

[70] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় মানত, হাদীস ১১।

চাচ্ছিলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের কিছু উট দেন। একজন মেষপালককে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন আর অসুস্থতার চিকিৎসা হিসেবে উটের দুধ ও মূত্র পান করতে বলে দিলেন। লোকগুলো রাখালসহ উটগুলো নিয়ে মদীনার বাইরে চলে এল। আস্তে আস্তে সবাই সুস্থ হয়ে উঠলো।

কিন্তু শরীর সুস্থ হলেও তাদের হৃদয় ছিল অসুস্থ। বেদুইন এই লোকগুলো ছিল অদ্ভুত রকমের অকৃতজ্ঞ। কঠোর তাদের হৃদয়। সুস্থ হওয়ার কিছুদিন পরেই তারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল। খুব নৃশংসভাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ মেষপালককে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল।

এই খবর আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে পৌঁছলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন যেন তাদের পথ সংকুচিত হয়ে যায়, হলোও তাই। তারা পথ হারিয়ে ফেললো। কুরয ইবন জারির ﷺ বিশ জন মুসলিমকে সাথে নিয়ে তাদের খুঁজতে বেরোলেন। ভরদুপুরে কুরয ইবন জারির বিশ্বাসঘাতকদের ধরে নিয়ে রাসুলের ﷺ শহরে ঢুকলেন। জালিমদের শাস্তি এবার বাস্তবায়িত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, লোহার গরম শিক দিয়ে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে। ঠিক যেভাবে করে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ মেষচালককে হত্যা করেছিল। এটাই ছিল লোকগুলোর অপরাধের শাস্তি। এরপর তাদেরকে না মেরে মদীনার আল-হুররাহ পাহাড়ের কাছে ফেলে রাখা হয়। প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা পানি চাইতে থাকে, কিন্তু তাদেরকে এক ফোঁটা পানিও খেতে দেওয়া হয়নি। এভাবেই তাদের কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হয়।[71]

শিক্ষা

১) এই ঘটনায় আমরা দেখেছি রাসূলুল্লাহ বেদুইনদেরকে উটের মূত্রকে ওষুধ হিসেবে খাবার পরামর্শ দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে এটা বিতর্কিত একটা ব্যাপার। ইসলাম বিদ্বেষীরা এই হাদীসকে নিয়ে মুসলিমদের উপরে এক চোট নেয়। তারা বলে, ছি! ছি! মুহাম্মাদ উটের মূত্র পান করার আদেশ দিয়েছেন, কী বিচ্ছিরি ব্যাপার! আবার কেউ কেউ এই হাদীসের কারণে পুরো হাদীসশাস্ত্রকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। তারা বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের মূত্র পান করতে বলেছেন এটা হতেই পারে না। অথচ এই ঘটনাটি সহীহ, মুসলিম এবং বুখারি দুই কিতাবেই আছে।

খুব বিশদ আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকু বলা যায় যে, পৃথিবীর অনেক দেশেই মূত্রকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা অস্বাভাবিক কিছু না। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রেই এমনটা হচ্ছে। প্রিমারিন (Premarine) নামের একটি ঔষধ আছে যার উপাদান হচ্ছে সংশ্লেষিত ইস্ট্রোজেন (Conjugated Esrogen) । এটি সংগ্রহ

---

[71] সহীহ বুখারি, অধ্যায় যাকাত, হাদীস ১০২।

করা হয় মাদী ঘোড়ার মূত্র থেকে। এই ওষুধটি প্রস্তুত করে ওয়েথ ফার্মাসিউটিক্যালস এবং এটি বাজারজাতকরণ হয়ে আসছে সেই ১৯৪৩ সাল থেকে।

গর্ভবতী ঘোড়ার মূত্র থেকে আধুনিক চিকিৎসাবিদরা ঔষধ তৈরি করলে ইসলামবিদ্বেষীদের মধ্যে তেমন গুঞ্জন শোনা যায় না, অথচ একই কাজ যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আদেশ করেছেন তারা সেটা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল তৈরি করে। অমুসলিমদের উচিত ইসলামের বিষয়গুলো সততার সাথে বোঝার চেষ্টা করা। ইসলাম বিরোধিতার হুজুগে গা ভাসানো উচিত নয়।

আর আমাদের মুসলিমদের উচিত হচ্ছে যখনই আমরা দেখব কোনো ঘটনা সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত, তখনই আমরা একে সত্য বলে ধরে নেব। সেই ঘটনাকে সত্য বলে গ্রহণ করার জন্যে কোনো ধরনের ফার্মাসিউটিক্যাল বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই। রাসূল ﷺ বলেছেন, তাই আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি। এটাই হচ্ছে ঈমান। মুসলিমদের অবস্থান হবে এরকম। কথাটা অবৈজ্ঞানিক, বা সমাজের রীতিবিরুদ্ধ শোনালেও আমাদের তাতে বিশ্বাস করতে হবে। নিজেদের পছন্দ বা যুক্তির সাথে খাপ না খেলে হাদীসকে বাতিল বা দুর্বল বলে সাব্যস্ত করা -- এটা মুসলিমদের জন্য একেবারেই সঙ্গত নয়।

২) দ্বিতীয় বিষয়টি হলো শাস্তির তীব্রতা। রাহমাতাল্লিল আলামিন রাসূলুল্লাহর ﷺ গোটা সীরাতে এরকম কঠোরভাবে শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার আর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কেন এত কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হলো? সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আবু কিলাবা। তার মতে, 'এই লোকগুলো হত্যা করেছে, চুরি করেছে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং জমিনের বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করেছে।' তাদের দ্বারা সংঘটিত সবগুলো অপরাধই মারাত্মক পর্যায়ের অপরাধ। তারা শুধু ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদই হয়নি, তারা হারাবা করেছিল অর্থাৎ অস্ত্রসহ ডাকাতি করেছিল।

এই ধরনের অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনের সূরা মায়িদায় আছে তাদের একহাত এবং এক পা কেটে ফেলতে হবে। এটা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের উপর প্রযোজ্য। লোকগুলোর চোখ উপড়ে ফেলা সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে তারা মেষপালকের চোখ উপড়ে ফেলেছিল, তাই তাদের সাথেও একই রকম কাজ করা হয়েছে। এটা হলো কিসাস। যদিও সাধারণভাবে এই কাজ জায়েয নয়। কিছু আলিমের মতে অবশ্য এই ধরনের শাস্তির বিধান রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক আলিমই এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের মতে, এসব ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'যদি সানার সকল মানুষ মিলে একজন মানুষকে হত্যা করে তাহলে সানার সকল মানুষকেই কিসাসের বিধান হিসেবে হত্যা করা হবে।' এটাই হচ্ছে হুদুদের ক্ষেত্রে শরীয়াহর সাধারণ বিধান।

৬) বনু কালবের বিরুদ্ধে অভিযান

আবদুর রহমান ইবন আউফকে ﷺ পাঠানো হয় দাউমাতুল জান্দালে, বনু কালবের কাছে। এটি ছিল রোমান সাম্রাজ্য নিকটবর্তী একটি খ্রিস্টান গোত্র। আবদুর রাহমান ইবন আউফ ছিলেন মুহাজির, রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব কাছের মানুষ। এই অভিযানে যাওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন। এরপর সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

'যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। জিহাদ করো কাফিরদের বিরুদ্ধে। কিন্তু অন্যায়ভাবে গনিমতের সম্পদ ভক্ষণ কোরো না, চুক্তিভঙ্গ কোরো না, কোনো শিশুকে হত্যা কোরো না।'

জিহাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। মুসলিমরা জিহাদ করে শুধু আল্লাহর জন্য। নিজেদের দল নিয়ে গর্ব করাও জিহাদের নিয়ত হতে পারে না। এ বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ সবসময় তাঁর সৈনিকদের মনে করিয়ে দিতেন। যুদ্ধের উত্তেজনায় যেন তারা বাড়াবাড়ি না করে বসে।

নির্দেশ মোতাবেক আবদুর রহমান বনু কালবকে ইসলামের দাওয়াত দেন। প্রথমে তারা প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু তৃতীয় দিনে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশে তিনি তাদের নেতার মেয়ে তুমাদির বিনত আসবাগকে বিয়ে করে ফিরে আসেন। এর মাধ্যমে মদীনার বাইরের কোনো স্থানে সর্বপ্রথম ইসলামী আইন চালু হয়।

অন্যান্য কিছু অভিযান

ষষ্ঠ হিজরী মুসলিমদের জন্য ব্যস্ত একটি বছর ছিল। বড় কোনো যুদ্ধ সংঘটিত না হলেও পুরো সময় ধরে অনেকগুলো আক্রমণাত্মক অভিযানে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এরকম আরও কিছু অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১) রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উকাশাহ ইবন মিহসানের ﷺ নেতৃত্বে চল্লিশ জনের একটি দলকে পাঠান বনু আসাদ গোত্রকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে। তারা বনু আসাদের এলাকায় যান। তাদের পানির কুয়া 'আল-গামর' দখল করে নেন এবং সেখানেই তাঁবু গাড়েন। শত্রুরা সবকিছু রেখে পালিয়ে যায়। তাদের রেখে যাওয়া দু'শোর মতো উট গনিমাহ হিসেবে নিয়ে উকাশাহ ফিরে আসেন।

২) মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার নেতৃত্বে ﷺ দশ সদস্যের একটি বাহিনী পাঠানো হয় যিল-কিসসায়। উদ্দেশ্য ছিল বনু সালাবা এবং উওয়্যাল গোত্রকে ভয় দেখানো যেন গোত্র দুটি মুসলিমদের ভূমিতে অতর্কিত আক্রমণ করতে সাহস না পায়। তাদের লক্ষ্যস্থল ছিল মদীনা থেকে মাত্র চব্বিশ মাইল দূরে। রাতের বেলা সেখানে পৌঁছলে

একশোর মতো লোক তাদের ঘিরে ধরে। তারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। দশ জনের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ছাড়া প্রত্যেকে শহীদ হয়ে যান। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ আহত অবস্থায় মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সাথে সাথে আবু উবায়দার ﷺ নেতৃত্বে চল্লিশ সদস্যের একটি বাহিনী পাঠান। তাদের আগমন আঁচ করতে পেরে শত্রুরা পলায়ন করে। তাদের কিছু সম্পদ আর একজন লোককে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসা হয়।

৩) যায়িদ ইবন হারিসাকে ﷺ পাঠানো হয় আল-ঈসে। জায়গাটি ছিল মদীনা থেকে চার রাতের দূরত্বে। মক্কার একটি কাফেলাকে আক্রমণ করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তারা কাফেলা আটক করেন, কাফেলার সম্পদ জব্দ করেন এবং কিছু লোককে বন্দী করেন। বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা যাইনাবের ﷺ স্বামী আবুল-আস।

৪) একই বছরে আলী ইবন আবি তালিবকে ﷺ পাঠানো হয় বনু সাদ ইবন বকরের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে। গোত্রটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে খাইবারের ইহুদিদের সাহায্য করার পরিকল্পনা করছিল। আলীর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ না করে গোত্রটি সেখান থেকে সরে পড়ে। একজন লোক বন্দী হয়। তার থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

অভিযানগুলো থেকে দুটো বিষয় লক্ষণীয়,

প্রথমত, চারপাশের কোথায় কী ঘটছে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সজাগ ছিলেন। মুসলিমরা যুদ্ধের ময়দানেই কেবল শক্তিশালী ছিলেন না, বরং গোয়েন্দাগিরিতেও তারা ছিলেন সমান পারদর্শী। নজরদারি (Surveillance) এবং তথ্য সংগ্রহ (Intelligence) দুটো কাজে তাঁর গোয়েন্দা বাহিনী সবসময়ই পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহকে ﷺ কখনই শত্রুরা চমকে দিতে পারেনি, বরং তিনিই সবসময় তাদেরকে চমকে দিতেন।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধ কেবল কুরাইশদের বিরুদ্ধে সীমিত ছিল না। বরং যে বা যারা মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রুদের গোপনে বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে আসছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন এবং অভিযান পরিচালনা করেছেন। যদি শুরু থেকেই তাদেরকে প্রতিহত করা না হতো, তাহলে অনেকেই মদীনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস দেখাতে শুরু করতো। রাষ্ট্রপরিচালনার কাজটি সবসময়ই জটিল। কিতাবি জ্ঞান এই কাজের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং আরও প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তি এবং তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ধারণা।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

রাসূলুল্লাহর ﷺ স্বপ্ন

"আমি কা'বাকে করেছি মানুষের জন্য মাসাবাহ..." (সূরা বাকারাহ, ২: ১২৫)

কা'বার একটা অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি আছে। যে কা'বাকে একবার দেখে, সে বার বার সেখানে ফিরে যেতে চায়। তীব্র একটা টান তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, বাইতুল্লাহ হলো মাসাবাহ। মাসাবাহ মানে সম্মিলনস্থল। কোনো বাচ্চা উট যখন খেলতে যায়, সে একটু পর পর তার মাকে দেখার জন্য ফিরে আসে। এই ঘটনাকেই বলে মাসাবাহ। কা'বাঘর ঠিক তেমনই মানুষের জন্য মাসাবাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবরাহীমের ﷺ দুআর কারণে মানুষের অন্তরে কা'বার প্রতি একটা তীব্র ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন । যে এই ঘরে যাবে সে এর প্রেমে আটকে যাবে।

প্রায় ছয় বছর কা'বা থেকে দূরে থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মনে কা'বার কাছে যাওয়ার তীব্র বাসনা জেগে উঠলো। তিনি স্বপ্নে দেখলেন তিনি আর সাহাবিরা একসাথে কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করছেন। তাওয়াফ শেষে কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করেছেন, আবার কেউ কেউ চুল ছেঁটে ছোট করেছেন। স্বপ্ন দেখার পর রাসূল ﷺ মুসলিমদের তাঁর সাথে উমরা করার আহবান জানালেন। মক্কায় যাওয়ার জন্যে, আল্লাহর ঘরকে এক নজর দেখার জন্যে সাহাবিরাও উতলা হয়ে উঠলেন।

মক্কার পথে যাত্রা

আল্লাহর রাসূলের ﷺ ডাকে সাড়া দিলেন প্রায় চৌদ্দশ সাহাবি। সবাই মিলে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যুল হুদাইফায় ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানীর পশুগুলোর গায়ে চিহ্ন লাগিয়ে দিলেন। কুরবানীর আগে পশুর গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন দেওয়া ছিল আরবের ঐতিহ্য। এই যাত্রায় নবীজির ﷺ সাথে ছিল প্রায় সত্তরটি উট।

সফর শুরু হলো। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথীরা তালবিয়া পাঠ করছেন-- লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ মেজাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিরা এগিয়ে চলছেন। কোনো যুদ্ধংদেহী ভাব নেই। সবার সাথে শুধুমাত্র একটি তরবারি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। এই অস্ত্র রাখাও ছিল আরবদের ঐতিহ্য মাত্র। অস্ত্র ছাড়া ভ্রমণ করার কথা আরবরা চিন্তাও করতে পারত না। যার অস্ত্র নেই তার সাথে একটা উটের কোনো পার্থক্য নেই। যুদ্ধের কোনো পরিকল্পনা ছিল না বিধায় রাসূলুল্লাহ কোনো ভারী

অস্ত্রশস্ত্র সাথে রাখেননি।

যুদ্ধে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি কোনো অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাননি। তাই বিশ সদস্যের একটা অশ্বারোহী দলকেও সাথে রেখেছিলেন। তাদের কাজ ছিল পুরো জামাআতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পথে কোনো বাধাবিপত্তি আছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখা। গুপ্তচর হিসেবে সাথে ছিলেন বিশর ইবন সুফিয়ান আল-খুযাই ﷺ। তার কাজ ছিল প্রতিপক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নবীজির ﷺ কাছে পৌঁছে দেওয়া।

উমার ﷺ ছিলেন খুবই বুদ্ধিদীপ্ত এবং সতর্ক একজন মানুষ। তাকে বোকা বানানো যেত না। তিনি নিজেই নিজের ব্যাপারে একবার বলেছিলেন, 'আমি নিজে ধুরন্ধর নই, কিন্তু ধুরন্ধর লোকেরা আমাকে বোকা বানাতে পারবে না।' তাঁর এই গুণের পরিচয় মেলে তাঁর কথা, কাজ এবং নবীজিকে ﷺ দেওয়া পরামর্শে। উমরা করার উদ্দেশ্যে একেবারে খালি হাতে যাওয়াটা তাঁর কাছে কেমন যেন ঠেকলো। তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি কোনো রকম অস্ত্র ছাড়া এমন লোকদের দেশে প্রবেশ করতে চান যারা আপনার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত?'

রাসূল ﷺ বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন এবং উমারের সাথে একমত পোষণ করলেন। তাই তিনি মদীনা থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। কিন্তু অস্ত্রগুলোকে দল থেকে দূরে রাখা হলো। তিনি চাননি মানুষ ভাবুক যে তিনি যুদ্ধ করতে এসেছেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ গোয়েন্দা বিশর ইবন সুফিয়ান ﷺ কুরাইশদের ব্যাপারে তথ্য নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি জানালেন কুরাইশরা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যেকোনো মূল্যে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কা প্রবেশ ঠেকাবে। এজন্য তারা লোকও জড়ো করছে। নারী-শিশুদের নিয়ে ময়দানে নামছে। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *"হায় রে কুরাইশ! যুদ্ধের চিন্তা ওদের পাগল করে রেখেছে! তাদের কী এমন ক্ষতি হতো যদি তারা পুরো বিষয়টাকে আমার আর আরবদের হাতে ছেড়ে দিত! আরবরা যদি আমাকে হত্যা করতো, তাহলে তো এমনিতেই তাদের মনের আশা পূর্ণ হয়ে যেতো। আর আল্লাহ যদি আমাকে বিজয়ী করেন, তাহলে কুরাইশরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরাই লাভবান হতো। কিন্তু না, যতদিন তাদের শক্তি আছে ততদিন তারা আমার সাথে লড়ে যেতে চায়! কুরাইশরা ভেবেছেটা কী? আমি হাল ছেড়ে দেবো? আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন, আমি সে উদ্দেশ্যে জিহাদ চালিয়ে যাবো -- যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করেন অথবা আল্লাহর পথে আমার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়!'*

মুসলিমদের কা'বায় প্রবেশের বাধা দেওয়ার কোনো নৈতিক অধিকার কুরাইশদের ছিল না। কুরাইশরা ছিল কা'বার রক্ষণাবেক্ষণকারী, কা'বা তাদের সম্পত্তি ছিল না। কা'বা তৈরি করে গেছেন আরবদের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল ﷺ। তাই সবারই কা'বাঘরে যাওয়ার অধিকার আছে। কাউকে কা'বায় প্রবেশ করতে না দেওয়া খুবই গুরুতর বিষয়। আর বিশেষত যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি শুধু উমরা করতে চান, যুদ্ধ করতে চান না। কুরাইশদের এই সিদ্ধান্ত আরবরা তেমন পছন্দ করলো না। জনমত রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষেই গেল।

দেখতে দেখতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলো। রাসূল ﷺ সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চাইলেন, 'তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তোমরা কী চাও? যারা আমাদের কাবাঘরে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, আমরা তাদের সন্তান এবং পরিবারদের দিকে অগ্রসর হই?'

এখানে সেসব গোত্রের কথা বোঝানো হয়েছে যারা রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবিদের কাবাঘরে প্রবেশে বাধাদানের মতো ঘৃণ্য কাজে কুরাইশদের সাহায্য করছে। এই যুদ্ধে কুরাইশরা একা ছিল না, তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিল আল হাবিশ। তারা ছিল তিন বা ততোধিক গোত্রের মিলিত জোট। রাসূল ﷺ সাহাবিদের কাছে জানতে চাইছিলেন হাবিশদের আক্রমণ করা ঠিক হবে কিনা। আবু বকর ﷺ তখন নবীজিকে ﷺ বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কাবাঘর তাওয়াফে এসেছেন, কারো সাথে যুদ্ধ করতে নয়। আপনি আপনার লক্ষ্যে অটল থাকুন। যারা এই লক্ষ্যে বাধা দেবে, আমরা কেবল তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।'

আবু বকরের ﷺ পরামর্শ নবীজির ﷺ পছন্দ হলো। তিনি নিজ থেকে যুদ্ধে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হলেন।

কুরাইশরা খালিদ ইবন ওয়ালিদ এবং ইকরামা ইবন আবু জাহলের নেতৃত্বে দুইশো সৈন্যের এক বাহিনী পাঠালো। খবর পেয়ে রাসূল ﷺ বিকল্প পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিলেন যেন খালিদ ইবন ওয়ালিদকে এড়াতে পারেন। আসলাম গোত্রের এক লোক মুসলিম বাহিনীকে বিকল্প পথে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিলেন। নতুন পথটি ছিল খুবই রুক্ষ, বন্ধুর। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হলেন। মক্কার অদূরে হুদাইবিয়া নামক জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। হুদাইবিয়া থেকে মক্কার দূরত্ব ছিল মাত্র এক দিনের। মক্কার বিপদসীমার ভেতরে। খালিদ ইবন ওয়ালিদ তখন তড়িঘড়ি করে বাহিনী নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

হুদাইবিয়া পৌঁছে নবীজির ﷺ বিখ্যাত উট কাসওয়া হঠাৎ বসে পড়ল। অনেক পীড়াপীড়ি করেও তাকে ওঠানো যাচ্ছে না। সাহাবিরা মন্তব্য করতে লাগলেন, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, 'না, কাসওয়া অবাধ্য হয়নি। অবাধ্যতা কাসওয়ার স্বভাব নয়। সে তাঁর নির্দেশেই থেমেছে যিনি আবরাহার

হাতিগুলোকে থামার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[72]

অর্থাৎ, স্বয়ং আল্লাহর আদেশেই কাসওয়া বসে পড়েছিল। যখন আবরাহা ও তার বাহিনী মক্কা আক্রমণ করতে গেল তখন তার হাতিগুলো মাটিতে বসে পড়েছিল। অনেক ঠেলেও হাতিগুলোকে ওঠানো সম্ভব হয়নি। মুসলিমদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটলো, উট বসে পড়লো। কিন্তু আবরাহার বাহিনী ছিল কাফির বাহিনী, আর রাসূলুল্লাহর ﷺ বাহিনী ছিল মুসলিম বাহিনী। সেক্ষেত্রে এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য কোথায় থাকলো? ইবন হাজার আসকালানি এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

"আল্লাহ আযযা ওয়া জাল অতীত বর্তমান সবই জানেন। তিনি জানতেন যে, মক্কার লোকেরা একসময় মুসলিম হবে। তাই তিনি অতীত এবং বর্তমান কোনো সময়ই রক্তপাত হতে দেননি। আবরাহার ক্ষেত্রে সেটি করেছেন আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসের মাধ্যমে, আর হুদাইবিয়ার সময় তা করেছেন শান্তির দরজা উন্মোচনের মাধ্যমে। রাসূল ﷺ যদি সেদিন সামনে অগ্রসর হতেন তাহলে যুদ্ধ লেগে যেত, অনেক রক্তপাত হতে পারতো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কাসওয়াকে থামিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের যুদ্ধে জড়ানো থেকে বিরত রেখেছিলেন।"

কাসওয়াকে বসে পড়তে দেখে রাসূল ﷺ বললেন,

> *"সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কুরাইশদের যেকোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি আছি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর মর্যাদা রক্ষিত হয়।"*

রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে দিলেন যে তিনি শান্তি চান এবং তিনি তাদের যে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। শুধুমাত্র আল্লাহর মর্যাদা বা অধিকার লঙ্ঘিত না হলেই হলো, এই ক্ষেত্রে সেটি ছিল হারামের ভেতরে রক্তপাত।

হুদাইবিয়াতে একটি কুয়া ছিল। কিন্তু সাহাবিরা পানি পান করতে গিয়ে দেখলেন যে কুয়াটি খালি। রাসূল ﷺ একটি তীর তাদের হাতে দিলেন, বললেন সেটিকে কুয়ায় নিক্ষেপ করতে। তীর নিক্ষেপ করতেই কুয়া থেকে কলকল করে পানি বের হতে শুরু করে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ আরও একটি মু'জিযা।

দুই পক্ষের মধ্যে দূত প্রেরণ

মুসলিমদের প্রথম দূত: খাররাশ ইবন উমাইয়্যাহ

একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল দুই শিবিরেই। রাসূল ﷺ কুরাইশদের কাছে বার্তা পৌঁছাতে চাইলেন যে, তারা যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন আল্লাহর ঘর

[72] সহীহ বুখারি, অধ্যায় শর্তাবলী, হাদীস ১৯।

তাওয়াফ করতে। এই কাজের জন্যে পাঠানো হলো খাররাশ ইবন উমাইয়্যাহকে ﷺ। খারাশ মক্কায় গেলেন। কিন্তু খাররাশের ﷺ সাথে মক্কাবাসীর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত রূঢ়। তারা তার উটকে হত্যা করে এবং তাকেও মেরে আধমরা করে ফেলে।

একজন দূতের সাথে এরকম হীন আচরণই বলে দেয় মক্কাবাসীরা তখন চূড়ান্তভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে ছিল। তাদের ছিল প্রচণ্ড অহংকার কিন্তু এখন তারা অপমানিত। তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ধীরে ধীরে খর্ব হচ্ছিল। তারা বিষয়টা মানতে পারছিল না বিধায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো আচরণ করতে থাকে।

মুসলিমদের দ্বিতীয় দূত: উসমান ইবন আফফান ﷺ

রাসূল ﷺ আরেকজনকে দূত হিসেবে পাঠাতে চাইলেন, উমারকে ﷺ ডাক দিলেন। উমার ﷺ বললেন,

'ইয়া রাসূলুল্লাহ, মক্কায় আমার পরিবারের এমন কেউ নেই যে আমাকে নিরাপত্তা দেবে। আর আমি কুরাইশদের কী পরিমাণ ঘৃণা করি সেটাও তাদের ভালোই জানা আছে। তারপরও আপনি যদি যেতে বলেন, আমি যাবো।'

রাসূল ﷺ কিছু বললেন না। উমার তখন আরেকটি নাম প্রস্তাব করলেন-- উসমান ﷺ। কারণ উসমানের ﷺ গোত্র তখনো মক্কায় ছিল।

উসমান ﷺ ছিলেন বনু উমাইয়্যা গোত্রের। উমাইয়্যা গোত্র কুরাইশদের অন্যতম প্রধান শাখা বনু আবদে মানাফের অন্তর্ভুক্ত। মক্কা শহরের নেতৃত্ব ছিল দুই গোত্রের হাতে। বনু মাখযুম আর বনু আবদে মানাফ। বনু মাখযুমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিল আবু জাহল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে নেতৃত্ব দিয়ে গেছে। এই গোত্রে আরও ছিল ওয়ালিদ ইবন মুগিরা এবং তার ছেলে খালিদ ইবন ওয়ালিদ। অন্যদিকে বনু আবদে মানাফের প্রধান দুই শাখা গোত্র হচ্ছে বনু হাশিম আর বনু উমাইয়্যা। এই শাখা গোত্র দুটির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। রাসূল ﷺ ছিলেন বনু হাশিমের আর উসমান ﷺ ছিলেন বনু উমাইয়্যার। বনু উমাইয়্যার শীর্ষনেতা ছিল আবু সুফিয়ান। রাসূল ﷺ যখন উসমানকে ﷺ কুরাইশদের কাছে পাঠালেন, সাথে সাথেই তিনি বনু উমাইয়্যার দ্বিতীয় শীর্ষ নেতার কাছে থেকে সুরক্ষার আশ্বাস লাভ করলেন। এই ব্যক্তিটি হলেন উসমানের ﷺ চাচাতো ভাই আব্বান ইবন সায়িদ ইবন আল আস। তিনি উসমানকে ﷺ নিজের উটের পিঠে করে কুরাইশদের সামনে নিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিলেন যে, এই লোকটিকে আমি আমার তরফ থেকে নিরাপত্তা দান করলাম।

উসমানের ﷺ সফরের উদ্দেশ্য ছিল মূলত দুইটি।

প্রথমত, এটা ঘোষণা করা যে, মুসলিমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে মক্কায় আসেনি।

আর দ্বিতীয়ত, মু'মিন নরনারী যারা তখনো মক্কায় রয়ে গেছেন তাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ আশ্বাসবাণী পৌঁছে দেওয়া যে ইসলাম অবশ্যই বিজয়ী হবে।

উসমান মক্কার ভেতর পুরো সময়টিকে কাজে লাগালেন। কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে আলোচনায় বসলেন, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন মুসলিমদের অভিপ্রায়। কিন্তু কুরাইশা গোঁ ধরেই থাকলো। তাদের এক কথা -- তোমাদের আমরা মক্কায় ঢুকতে দেবো না, বলেছি তো দেবো না। উসমান ﷺ মক্কার জনগণের কাছে গেলেন। তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

'আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাঠিয়েছেন যেন তোমাদেরকে আল্লাহ আর ইসলামের পথে ডাকি, যেন তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দান করবেন এবং তার রাসূলকে সম্মানিত করবেন। তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও যেন অন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। যদি তারা আমাদের পরাজিত করতে পারে, তাহলে তো তোমাদের মনের আশা পূর্ণ হয়েই যাবে। আর যদি আমরা তাদের পরাজিত করি তাহলে তোমরা আমাদের অনুসরণও করতে পারো, আবার চাইলে আমাদের সাথে যুদ্ধও করতে পারো। কিন্তু এখন আমার মনে হয় তোমাদের বিশ্রাম দরকার। আমাদের সাথে যুদ্ধে না যাওয়াই তোমাদের জন্য ভালো হবে। তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছ। তোমাদের সেরা লোকগুলোও সব মারা গেছে। তোমরা জেনে রাখো, আমরা এখানে এবার যুদ্ধের জন্যে আসিনি, এসেছি উমরা করতে। কুরবানির পশু চিহ্নিত করে রেখেছি, পশুগুলো কুরবানী করে চলে যাবো।'

আবান ইবন সায়িদ উসমানকে ﷺ বললেন, 'তুমি চাইলে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে পারো, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।' মুসলিমরা তখন বলতে লাগলো উসমান ﷺ কতই না সৌভাগ্যবান। তিনি কাবাঘর তাওয়াফের সুযোগ পেয়েছেন! কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, 'তার প্রতি আমার চাওয়া, সে যদি যুগ যুগ ধরেও সেখানে থাকে, আমি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত সে কাবাঘর তাওয়াফ করবে না।'

উসমান ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ চাওয়া অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। এক পা বাড়ালে যেই কাবাঘরকে ছোঁয়া যাবে, তা না ছুঁয়ে আবান ইবন সায়িদকে তিনি বলে দিলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি কাবাঘর তাওয়াফ করবো না।'

এই একটা কথা অনেক কিছুই বলে দেয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সাহাবিদের ভক্তি আর ভালোবাসা কত গভীর, তা বুঝতে এই একটি কথাই যথেষ্ট।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রেরিত বুদাইল ইবন ওয়ারকা

কুরাইশরাও দূত পাঠাতে লাগলো। প্রথমে তারা পাঠালো বুদাইল ইবন ওয়ারকাকে। সে ছিল বনু খুযাআ গোত্রের। সে সাথে করে নিজ গোত্রের আরও কিছু লোক নিয়ে এসেছিল। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খুযাআ গোত্র হচ্ছে রাসূল ﷺ এবং

মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ত। এমন বর্ণনা আছে যে, খুযাআ গোত্র মক্কার যাবতীয় তথ্য নবীজিকে ﷺ পাচার করতো।

নবীজির ﷺ যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক। কুরাইশরা তার শত্রু হলেও বনু খুযাআর সাথে তার সুসম্পর্ককে তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছেন। যাই হোক, বুদাইল রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'কুরাইশরা এমন উট নিয়ে এসেছে যে দুধ দেয়।' অর্থাৎ, কুরাইশরা দীর্ঘদিন অবস্থানের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। পরিস্থিতি যদি থাকার দাবি করে, তাহলে তারা সেটাই করবে। তারা যুদ্ধের জন্যে তৈরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বুঝিয়ে বললেন যুদ্ধ করার তার উদ্দেশ্য নয়, বায়তুল্লাহর যিয়ারত করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বুদাইল রাসূলুল্লাহর ﷺ এই বার্তা নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাকে পাত্তাই দিল না, তারা তাকে উপেক্ষা করলো। তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনলো, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো। সে তাদের বললো, 'কুরাইশরা, তোমরা মুহাম্মাদের সাথে বাড়াবাড়ি করছো। যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে তিনি আসেননি, তিনি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে এসেছেন।'[73] বলা বাহুল্য, এসব কথা কুরাইশদের মোটেও পছন্দ হলো না।

মিখরাজ ইবন হাফস

বুদাইলের পর কুরাইশরা পাঠালো মিখরাজ ইবন হাফসকে। তাকে দেখামাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'সে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক!' মিখরাজের স্বভাব সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই জানতেন। দেখা গেল মিখরাজ কুরাইশদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল নিয়ে মুসলিমদের তাঁবুর চারপাশে ঘুরঘুর করছে। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মধ্যে কাউকে একা পেলে তাকে বন্দী করে কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু ঘটনা ঘটলো উল্টো, মিখরাজের পুরো বাহিনীই মুসলিমদের হাতে ধরা পড়ল। শুধুমাত্র সে কোনোমতে পালিয়ে বাঁচল। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তাই তিনি বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

হুলাইস ইবন আলকামাহ

এরপর পাঠানো হলো হাবশীদের প্রধান হুলাইস ইবন আলকামাহকে। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'এই লোকটা আন্তরিক। কুরবানির পশুগুলো তার দিকে ঠেলে দাও যেন সে সেগুলো দেখতে পায়।'

মুসলিমদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল এটা প্রমাণ করা যে, তারা শুধু উমরা করতে এসেছেন। একদল লোক কাবাঘরে উমরা করতে এসেছে, তারা কুরবানির পশু নিয়ে

---

[73] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭।

হাজির হয়েছে -- এই দৃশ্য দেখেই তার মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। সে মক্কায় চলে গেল, এমনকি সে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করারও প্রয়োজন বোধ করলো না। সে সোজা কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। শোনো, এই লোকগুলোকে মক্কা থেকে দূরে ঠেলে রাখা একেবারেই ঠিক হচ্ছে না।'

হুলাইস ছিল মুশরিক, একজন কাফের। কিন্তু সে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মতো নীতিহীন ছিল না। মুসলিমদেরকে কা'বাঘরে আসতে বাধা দেওয়া যে অন্যায় হচ্ছে, সেটা সে ঠিকই বুঝতে পারছিল। বললো, 'তোমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের কা'বায় প্রবেশ করতে দেবে না আর লাখাম, জুদাম, হিমইয়ার আর কিন্দার লোকরা কা'বা পরিদর্শন করতে পারবে -- আল্লাহ্‌ তাআলা এটা হতে দেবেন না।' এই চারটি গোত্র হলো কাহতানি শাখা, আরবদের ইয়েমেনি শাখা থেকে উদ্ভূত। আর এদের অবস্থান কা'বা থেকে অনেক দূরে -- লাখাম, জুদাম এই দুটোর অবস্থান আরবের একদম উত্তরে, আর হিমইয়ার এবং কিনদার অবস্থান একদম দক্ষিণে, ইয়েমেন সীমান্তের কাছাকাছি। দূরদুরান্তের গোত্ররা কা'বায় তাওয়াফ করছে অথচ বনু মুত্তালিবের কিছু সন্তান মক্কায় বড় হয়েও কা'বায় প্রবেশ করার অধিকার পাচ্ছে না -- কুরাইশদের এই দ্বিমুখী আচরণের সমালোচনা করায় কুরাইশরা ক্ষেপে গিয়ে তাকে বললো, 'চুপ থাক, কাণ্ডজ্ঞানহীন বেদুইন কোথাকার!'

হুলাইস খুব রেগে গেল। সে বললো, 'দেখো, তোমাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করিনি যে, কেউ কা'বাঘর পরিদর্শনে আসবে আর তোমরা তাদেরকে বাধা দিবে। শপথ সেই সত্তার যার হাতে হুলাইসের প্রাণ, হয় তোমরা মুহাম্মাদকে কাবাঘরে প্রবেশ করতে দিবে, না হলে আমি হাবশিদের নিয়ে আলাদা হয়ে যাবো!' কুরাইশরা তখন অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে বললো, 'আচ্ছা, তুমি শান্ত হও, দেখি কী করা যায়।'

উরওয়া ইবন মাসউদ

কুরাইশদের সব প্রচেষ্টা একে একে ব্যর্থ হতে লাগলো। তারা যাকেই পাঠায়, প্রত্যেকেই মুসলিমদের উমরা করতে দেওয়ার পক্ষে মত দিতে থাকে। তাদের মনমতো কাউকে তারা পাচ্ছিল না। বিষয়টি খেয়াল করলেন উরওয়া ইবন মাসউদ। উরওয়া ছিলেন তাইফের বিশিষ্ট কূটনীতিক। সে বুঝতে পেরেছিল জনমত মুসলিমদের পক্ষে, কুরাইশদের একগুঁয়েমিতে কাজ হবে না। অবস্থার হাল ধরতে সে নিজেই এগিয়ে গেল, কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বলল,

- তোমরা কি আমার পিতা নও?

- হ্যাঁ।

- আমি কি তোমাদের ছেলে নই? উরওয়া ছিলেন তাইফের কিন্তু তার মা ছিলেন কুরাইশি।

- হ্যাঁ, তুমি আমাদের ছেলে।

- বলো, আমার বিরুদ্ধে কি তোমাদের কোনো অভিযোগ আছে?

- না, নেই।

- উকাযের ঘটনা মনে আছে? আমি কি সে সময় তোমাদের পক্ষ নিইনি?

- হ্যাঁ, নিয়েছো।

এসব কথাবার্তা মনে করিয়ে দিয়ে সে কুরাইশদের কাছে আস্থা অর্জন করে নিলো। কুরাইশরাও দেখলো তাইফের হলেও উরওয়া তো তাদের পক্ষেরই লোক, তার উপর ভরসা করা যায়। এবার তারা তাকেই দূত হিসেবে নিযুক্ত করলো। উরওয়া ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেল। তার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহকে ﷺ মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া। বর্তমানের পরিভাষায় যাকে বলে -- *Psychological Warfare* বা *মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ*। রাসূলুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলল,

'মুহাম্মাদ! ধরে নিলাম তুমি তোমার স্বজাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করলে, আচ্ছা, তুমি কি কখনো এমন আরবের কথা শুনেছো যে নিজ জাতিকে ধ্বংস করেছে? আর যদি কুরাইশদের হাতে তুমি পরাজিত হও, তাহলে আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি যে কাপুরুষ লোকগুলোকে জড়ো করেছো, এরা একটাও তোমার পাশে থাকবে না, সবকটা তোমাকে ছেড়ে পালাবে!'

উরওয়া তার বক্তব্যকে এমনভাবে সাজালো যেন রাসূলুল্লাহই ﷺ হচ্ছেন অপরাধী আর কুরাইশরা সাধু! যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন যুদ্ধ করতে আর কুরাইশরা শান্তি চায়! অথচ ঘটনা ছিল পুরোই উল্টো -- রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন শান্তিপূর্ণভাবে উমরা করতে আর কুরাইশরা তাঁকে বাধা দিচ্ছিল। বর্তমান সময়ে আমরা দেখি, পশ্চিমা শক্তি এভাবেই তাদের বক্তব্যকে সাজায়। তাদের ভাবটা এমন যে মুসলিমরা হলো সন্ত্রাসী, তারাই শান্তি বিনষ্ট করছে আর পশ্চিমারা হলো শান্তিকামী। অথচ বাস্তবতা হলো, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে পশ্চিমারাই মুসলিম ভূমিগুলোতে দখলদারিত্ব চালাচ্ছে এবং লুটপাট-সন্ত্রাস-ধ্বংসযজ্ঞ করে চলেছে। আর আমরা অনেক মুসলিমরাও তাদের এই 'পিসফুল' ন্যারেটিভে বিশ্বাস করে বসে আছি।

যাই হোক, উরওয়া ইবন মাসউদ এর কথা থেকে আরেকটা বিষয় স্পষ্ট। সে ইসলামকে বিচার করছিল জাহিলিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আরবদের সমাজ ছিল গোত্রভিত্তিক, তাদের কাছে গোত্রপরিচয়টাই ছিল সব! অন্যায় করলেও তারা নিজ গোত্রের পক্ষ নেবে, নিজ গোত্রের জন্য তারা জীবন দিতেও রাজি। তাই একজন মানুষ নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে, নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে -- এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। আজকের হিসেবে অনেকটা নিজ দেশের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করছিলেন। তিনি কুরাইশ হয়েও কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। দ্বীন বা ধর্মের অবস্থান যে গোত্র বা

জাতিপরিচয়েরও ওপরে -- জাহিল আরবরা সেটা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই উরওয়া বলতে চাইছিল, কেমন করে তুমি নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো? এমন নিকৃষ্ট একটা কাজ তুমি কীভাবে করতে পারো?

উরওয়ার জাহিলি দৃষ্টিভঙ্গি আরও একটি ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেটা হলো মুসলিমদের ঐক্যের ভিত্তি। সাহাবিরা ছিলেন বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত। সেখানে যেমন সম্মানিত কুরাইশ বংশের লোক ছিল, তেমনি ছিল আওস, খাযরাজ গোত্র, ছিল আসলাম এবং গিফারের মতো নিচু শ্রেণির গোত্র। এই গোত্রগুলোকে উরওয়া তৃতীয় শ্রেণীর গোত্র বলে মনে করতো। তার ধারণা ছিল মানুষ শুধু নিজ গোত্রের জন্যই যুদ্ধ করে। কিন্তু একজন মুসলিম যুদ্ধ করে তার দ্বীনের জন্য, আদর্শের জন্য, গোত্র পরিচয় এখানে মুখ্য নয়। বরং উচুঁ-নিচু সকল গোত্রের মানুষকে ইসলাম এক সমতলে আনতে পেরেছে। কারণ এই বন্ধন হলো ঈমানের বন্ধন, জাতীয় বা গোত্রীয় বন্ধন থেকে তা অনেক বেশি শক্তিশালী। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা কত নিখাদ আর গভীর, উরওয়া সেটা তখনো টের পায়নি। তাই সে খোঁচা মেরে বলতে চাইছিল, বিপদে পড়লে তোমার সঙ্গীসাথীরা তোমাকে ফেলে পালিয়ে যাবে!

বলা বাহুল্য, এই কথাটি ছিল খুবই অপমানজনক। আবু বকর ﷺ পাশেই ছিলেন, এই কথা শুনে তিনি প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। উরওয়াকে বললেন, 'যা ভাগ এখান থেকে! তুই গিয়ে তোদের দেবী আল-লাতের লজ্জাস্থান চোষ! আমরা আল্লাহর রাসূলকে ছেড়ে পালিয়ে যাবো? এই আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করবো? হ্যাঁ?'[74]

লজ্জাস্থান চোষার এই কথাটি ছিল আরবের প্রচলিত একটি গালি। আবু বকর ﷺ এমনিতে শান্তশিষ্ট মানুষ ছিলেন, কিন্তু উরওয়ার এই কথায় তিনি শান্ত থাকতে পারলেন না। একেবারে গালি দিয়ে বসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনলেন, কিছুই বললেন না। উরওয়া গালি হজম করে নিয়ে বললো, 'অতীতে তুমি আমাকে একবার উপকার করেছিল আবু বকর, সেটা আমার শোধ করা হয়নি। তা না হলে আজকে তোমার এই কথার উচিত জবাব দিয়ে দিতাম।'

উরওয়াকে একবার একশো উট রক্তপণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু রক্তপণ আদায়ের সামর্থ্য তার ছিল না। আবু বকর ﷺ তখন উরওয়াকে দশটি উট দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এটা জাহিলিয়াতের যুগের কথা। এই কারণে উরওয়া আবু বকরকে কিছু বললো না।

উরওয়া ইবন মাসউদ ছিলেন একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। কথার জোরে তিনি প্রতিপক্ষের মনোবল গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিলেন। নিজ গোত্রের সাথে তুমি কীভাবে যুদ্ধ

[74] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১২।

করছো -- এই কথা বলে তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে চাচ্ছিলেন। আর সাহাবিদের গোত্রভিন্নতার দিকে আঙুল তুলে, তাদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ আর সাহাবিদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছিলেন। পেশাদার রাজনীতিকের মতো তার কথায় আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ। কিন্তু এসবের কিছুই মুসলিমদের টলাতে পারলো না, উল্টো উরওয়াই আবু বকরের আচরণ দেখে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল।

এরপরে ঘটলো আরও একটি ঘটনা। সমঝোতার আলোচনা চলাকালীন সময়ে উরওয়া আল্লাহর রাসূলের ﷺ দাড়ি স্পর্শ করছিলেন। এটা সে যুগের জন্য খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। দেহরক্ষী হিসেবে রাসূলুল্লাহর ﷺ মাথার কাছে ছিলেন আল মুগীরা ইবন শু'বা ﵁। ব্যাপারটা তার মোটেও পছন্দ হলো না। উরওয়াকে দাড়ি ধরতে দেখে আল-মুগীরা তার সাথে থাকা তলোয়ারের বাট দিয়ে উরওয়ার হাতে আঘাত করে বললেন, 'তোমার ঐ হাত আল্লাহর রাসূলের দাড়ি থেকে সরিয়ে রেখো। বেশি দেরি করলে ঐ হাত আর তোমার কাছে ফেরত যাবে না।'

উরওয়া হতভম্ব হয়ে গেল, কেউ তার সাথে এমন রূঢ় আচরণ করতে পারে তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কে এভাবে তার সাথে এভাবে কথা বললো সেটাও বোঝার উপায় নেই কারণ আল-মুগিরা ইবন শু'বা ﵁ ছিলেন আপাদমস্তক বর্মে ঢাকা। উরওয়া রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই লোক? তোমার বাহিনীতে এত রুক্ষ লোক আর একটিও দেখিনি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন, 'এ হচ্ছে তোমার ভাতিজা আল-মুগিরা ইবন শু'বা।'

উরওয়া যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে তার ভাতিজা মুগীরাকে ﵁ উদ্দেশ্য করে বললো, 'বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! তোর অপকর্মের দাগ তো মাত্র সেদিন পরিষ্কার করলাম!'

উরওয়া তার ভাতিজা মুগীরাকে অতীতের একটা ঘটনা নিয়ে খোঁচা দিলেন। একবার মুগীরা তেরো জন মুশরিকের সাথে সফরে বের হন এবং পথিমধ্যে তাদের লুট করে তাদের হত্যা করেন। সাকিফের গোত্রগুলোর মধ্যে তখন সেটা নিয়ে ব্যাপক যুদ্ধ লাগার মতো অবস্থা তৈরি হয়। উরওয়া নিজের ভাতিজাকে বাঁচানোর জন্য তার হয়ে রক্তমূল্য পরিশোধ করে দেন। ইতিমধ্যে মুগীরা মদীনায় চলে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার মুসলিম হওয়া আমি মেনে নিলাম, কিন্তু যে ধনসম্পদ নিয়ে এসেছো সেটা আমি গ্রহণ করবো না।' যেহেতু মুগীরা অন্যায়ভাবে সফরের মধ্যে তাদের সম্পদ হস্তগত করেছিলেন, তাই সেই সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রহণ করেননি। একই সাথে তিনি মুশরিকদের কাছে এ বিষয় নিয়ে কোনো ক্ষমাও চাননি।

এখানে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, ইসলাম মানুষের চরিত্রকে কী অদ্ভুতভাবে বদলে দেয়!

জাহিলিয়াতের জীবনে মুগীরা ইবন শু'বা ছিলেন মদখোর, লুটতরাজ আর খুনখারাপি করা একজন মানুষ। ইসলামে এসে তিনি হলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দেহরক্ষক, রাসূলুল্লাহর ﷺ ভালোবাসায় নিবেদিত প্রাণ! আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি ভালোবাসা যে বাকি সবকিছুর ঊর্ধ্বে তার দৃষ্টান্ত হলেন আল-মুগীরা। মুগীরা ইবন শু'বাকে তার চাচা উরওয়া একটা বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এই জন্যে মুগীরা ইবন শু'বার ﷺ উচিত ছিল উরওয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কিন্তু না, রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি উরওয়াকে এতটুকু ছাড় দেননি।

উরওয়া ফিরে এলেন। উরওয়া গিয়েছিলেন মুসলিমদের মনোবলকে নষ্ট করে দিতে, অথচ নিজেই হার মেনে গেলেন। ইসলাম আর মুসলিমদের ব্যাপারে এক নতুন ধারণা নিয়ে ফিরে এলেন। কুরাইশদের বললেন,

"হে কুরাইশ, আমি আমার জীবনে পারস্যের বাদশাহ কিসরাকে দেখেছি। রোমের সম্রাট কায়সারকে দেখেছি, দেখেছি রাজা নাজাশীকে। আল্লাহর কসম করে বলছি, মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে যেভাবে করে সম্মান করে -- এমনটা আমি আর কোথাও দেখিনি। তিনি শুধু একটা কাজের কথা বলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুসারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কাজ করে ফেলে। তিনি যখন থু থু ফেলেন, তাঁর অনুসারীরা হাত বাড়িয়ে সেই থুথু তালুতে নেয়, বরকতের আশায় শরীরে মাখে। তিনি যখন ওযু করেন, তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ঘিরে জড়ো হয়, আর প্রত্যেকে সেই পানি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যখন তিনি কোনো কথা বলেন, তাঁর অনুসারীরা চুপ করে তাঁর কথা শোনে, সম্মানের আতিশয্যে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকায় পর্যন্ত না।

... তোমরা নিশ্চিত থাকো, তোমরা যদি তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চাও, এই লোকগুলো কখনো তাদের নেতাকে ছেড়ে যাবে না। নিজেদের নেতাকে তারা যেকোনো মূল্যে রক্ষা করে যাবে। তারা কোনোকিছুর তোয়াক্কা করবে না ... এমন একজন মানুষ যখন তোমাদের প্রস্তাব দিয়েছে, আমার পরামর্শ হচ্ছে তার প্রস্তাব গ্রহণ করা। তোমরা তাদেরকে হারাতে পারবে না। আমি তোমাদের জন্য কোনো আশা দেখছি না। তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্যই তার প্রস্তাব গ্রহণ করো।"

উরওয়ার এই চমৎকার কথাগুলো কুরাইশদের মন ভরাতে পারলো না। যদিও তারা ঠিকই জানতো উরওয়া যা বলছেন সত্যিই বলছেন।

উরওয়া ইসলামের ব্যাপারে শুনেছেন, কিন্তু যখন নিজের চোখের সামনে ইসলামকে দেখলেন, তার ধারণা পাল্টে গেল। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ উরওয়ার জন্য এটা ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। মুসলিমদের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। এই ঘটনা ছিল উরওয়ার প্রতি ইসলামের দাওয়াহ। এই দাওয়াহ খালি কথার দাওয়াহ ছিল না, এই দাওয়াহ ছিল কাজের মাধ্যমে দাওয়াহ। নিঃসন্দেহে কাজের মাধ্যমে দাওয়াহ অন্তরে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে।

সংঘর্ষের ঘটনা

> "তিনি মক্কা উপত্যকায় তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করার পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৪)

কুরাইশদের অনেকেই খুব করে চাচ্ছিল একটা যুদ্ধ বেঁধে যাক। সত্যি বলতে মুসলিমদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ বাঁধার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন মক্কায় যেন কোনো যুদ্ধ না বাঁধে এবং তাই হয়েছে। কুরাইশদের ৮০ জনের একটি অস্ত্রশজ্জিত দল মুসলিমদের উপর অতর্কিতে হামলা চালানোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা ধরা পড়ে যায় এবং তাদের বন্দী করে রাখা হয়। আরও একটি ঘটনা ঘটে, সালামা ইবন আল-আকওয়াও ﵁ ঘটনাক্রমে চার মুশরিককে বন্দী করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা উপরের আয়াত নাযিল করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত বন্দীকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের ছেড়ে দেন। পুরো ঘটনাকে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর রাসূল এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যে, সন্ধির পথে পা বাড়ানো ছাড়া কুরাইশদের আর কোনো উপায়ই থাকলো না।

বাইয়াতুর রিদওয়ান

এই ঘটনার সময় উসমান ﵁ ছিলেন মক্কায়। হঠাৎ গুজব উঠলো, উসমানকে ﵁ হত্যা করা হয়েছে। এই কথা শুনামাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা আলাদা আলাদা তাঁবুতে অবস্থান করছিল। উম্মে আম্মারা ﵂ নামের বনু নাজ্জারের এক মহিলা রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, 'আমি নবীজিকে ﷺ আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমি ভাবলাম রাসূলুল্লাহর ﷺ বুঝি কিছুর দরকার হয়েছে।' রাসূল ﷺ এসে বসলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছ থেকে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।' এরপর সাহাবিরা একে একে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাইয়াত করলেন।

কীসের ওপর এই বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়ে একাধিক বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনায় আছে এই বাইয়াত হচ্ছে মৃত্যুর বাইয়াত। অন্য বর্ণনায় আছে এই বাইয়াত হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার বাইয়াত। তৃতীয় বর্ণনা বলছে এই বাইয়াত ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ অন্তরে যা আছে তার প্রতি বাইয়াত। এই বর্ণনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, সাহাবিরা জানতেন না নবীজি কী চান। কিন্তু তারা সেই না-জানা জিনিসের উপরই বাইয়াত দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে এই বাইয়াতের অর্থ দাঁড়ায় -- আমরা এই শপথ করছি যে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের যা করতে বলবেন আমরা তা-ই করবো । এই বাইয়াতকে বলা হয় বাইয়াতুর রিদওয়ান। রিদওয়ান মানে সন্তুষ্টি। এই বাইয়াতের পর আল্লাহ মুসলিমদের উপর তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।

এই বাইয়াত নেওয়া হয়েছিল বনু নাজ্জারের তাঁবুর সামনে। বনু নাজ্জার ছিল আল খাযরাজের অন্তর্ভুক্ত। সম্পর্কের দিক থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মায়ের দিকের আত্মীয়। তারা ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব কাছের। বলা যেতে পারে রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনীর মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার সময় প্রথমে মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি ছিলেন বনু আমর ইবন আউফ গোত্রের সাথে। মদীনায় প্রবেশ করার পর তিনি থেকেছেন বনু নাজ্জারদের বাড়িতে। বনু নাজ্জারের লোকেরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঘিরে রেখেছিল। তার সুরক্ষার জন্যে তারা সেদিন তলোয়ার নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ চারিদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই বাইয়াতে রিদওয়ান নেয়ার জন্যেও তিনি বনু নাজ্জারের তাঁবুর সামনেই গিয়েছিলেন। উম্মে আম্মারার ﷺ বর্ণনায়,

'আমার স্বামীর বাইয়াত দেওয়ার সময় হাতে তলোয়ার ধরা ছিল, কারণ এটি হচ্ছে মৃত্যুর বাইয়াত। এই দৃশ্য দেখে আমি আমার কোমরবন্ধনীর সাথে একটি ছুরি বেঁধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। তখন যদি আমার সামনে কোনো লোক যুদ্ধ করতে আসতো তাহলে আমি তার শরীরে ছুরি ঢুকিয়ে দিতাম, ছুরির বাট দিয়ে তাকে আঘাত করতাম।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ মহিলা সাহাবিরাও এমনই সাহসিকতার অধিকারী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের জন্যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে এক মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যে কাজটি করতে আজকের অনেক পুরুষও আমতা আমতা করবে।

সর্বপ্রথম বাইয়াত দেন আবু সিনান আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব আল-আসদী। সালামাহ ইবন আল-আকওয়া থেকে আল্লাহর রাসূল তিনবার বাইয়াত নেন। শুরুতে, মাঝে এবং শেষে। সেদিন বাইয়াত নেন সব মিলিয়ে চৌদ্দশো সাহাবি।

বাইয়াতে রিদওয়ান প্রসঙ্গে শিয়াদের একটি দাবি নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। শিয়ারা উসমানকে ﷺ পছন্দ করে না। উসমানের মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তাই তারা বলে, উসমান ﷺ বদর যুদ্ধে অংশ নেননি, উসমান বাইয়াতে রিদওয়ানের সময়ও ছিলেন না ইত্যাদি। বদরের যুদ্ধে উসমানের ﷺ অংশ না নেওয়ার আগেই বলা হয়েছে, সে মুহূর্তে উসমানের ﷺ স্ত্রী, রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলই ﷺ তাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বারণ করেন এবং স্ত্রীর পাশে থাকার নির্দেশ দেন। আর উসমানের ﷺ বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ না নেয়ার কারণ কী? এই প্রশ্ন একমাত্র বোকারাই করতে পারে। কারণ বাইয়াতে রিদওয়ানের পুরো ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছেন উসমান ﷺ। তাঁর মৃত্যুর গুজব শুনেই মুসলিমদের থেকে বাইয়াত নেওয়া হয়েছিল। আর সত্যি বলতে, তিনি বাইয়াহ দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ নিজের এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, 'এইটা হচ্ছে উসমানের বাইয়াত।'[75] উসমান ﷺ নিজের হাতে বাইয়াত দেননি কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ﷺ হাত তার প্রতিনিধিত্ব করেছে।

---

[75] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযী, হাদীস ১১১।

বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেওয়া সাহাবিদের মর্যাদা

১)

> "যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১০)

যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের জন্য এটা একটা বিরাট সম্মান। তারা বাইয়াত করেছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন এই বাইয়াত ছিল আল্লাহর কাছেই। ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন আল্লাহ তাআলা এবং সাহাবিদের মাঝে একজন প্রতিনিধিস্বরুপ। কারণ যে আনুগত্যের শপথ তারা আল্লাহর রাসূলের কাছে করেছিলেন, সেটা ছিল আসলে স্বয়ং আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ।'

২)

> "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১৮-১৯)

আল্লাহ সেই চৌদ্দশো সাহাবির উপরে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে দিলেন। এর থেকে বিশাল ঘটনা আর কী হতে পারে! দুনিয়ার জীবনেই আল্লাহ তাআলা এই মানুষগুলোকে সবচাইতে বড় সুখবর জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন এই লোকগুলোর অন্তরে কী আছে তা তিনি জানতেন। অর্থাৎ এই সাহাবিদের আন্তরিকতা আর ঈমান নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। একই সাথে আল্লাহ তাআলা তাদের আসন্ন বিজয় এবং বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভের সুসংবাদ দিচ্ছেন। এটি হলো খাইবারের বিজয়ের সুসংবাদ, এই আলোচনা পরবর্তীতে আসবে ইনশা আল্লাহ।

৩) বাইয়াতে রিদওয়ানের সাহাবিরা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না। জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ হাফসাকে ﵂ বলেছেন, 'ইনশা আল্লাহ, গাছের নিচে যারা বাইয়াত করেছিল, তারা কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।' ইমাম নববীর মতে, এখানে ইনশা আল্লাহ বলার অর্থ আল্লাহর বরকতের আশা করা, সন্দেহ পোষণ করা নয়।

৪) অন্য একটি হাদীসে আছে যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নিয়েছে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র লাল উটের মালিককে ছাড়া। এই লাল

উটের মালিক হচ্ছে জাদ ইবন কায়েস। বাইয়াত দেওয়ার ভয়ে সে নিজেকে রাসূল ﷺ থেকে আড়াল করে রেখেছিল। মর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করা হলে প্রথমেই আসবে সেই দশজন সাহাবি যাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর হচ্ছেন সেইসব সাহাবি যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আর তারপর হচ্ছেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিরা। তারা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

৫) বাইয়াতে রিদওয়ানের এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা তাদের শুধুমাত্র একজন সাথীর জন্যেও যুদ্ধ করতে এবং মৃত্যুবরণ করতে একতাবদ্ধ। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত। শরীরের একটি অংশ ব্যথা পেলে সমস্ত শরীরেই সেই ব্যথা সংক্রমিত হয়। সেই জন্যেই পুরো ১৪০০ লোকের মুসলিম বাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র একজন মানুষের জন্যে।

পরবর্তীতে জানা যায় যে, উসমান ﷺ জীবিত আছেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল গুজবমাত্র। কিন্তু তারপরও এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা হয়ে আছে। এই বাইয়াতের ঘটনা অনন্যসাধারণ এই কারণে যে, এর মাধ্যমে ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্যে সাহাবিরা মৃত্যুর শপথ নিয়েছিলেন। তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। বাইয়াতের ঘটনা মক্কার মুশরিকদের অন্তরে প্রবল ভীতির সৃষ্টি করেছিল। তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাইয়াত দেওয়া শেষ হলে রাসূল ﷺ সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা হচ্ছো এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ।'[76]

সমঝোতার পথ

কুরাইশের লোকেরা শেষ পর্যন্ত চুক্তি করতে রাজি হলো। এদিকে উসমানও ﷺ ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। কুরাইশরা মুসলিমদের কাছে মুখপাত্র হিসেবে পাঠালো সুহাইল ইবন আমরকে ﷺ। সুহাইল তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন একজন কুশলী কূটনীতিক। বাক্যবাগীশ, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। সুহাইলের দায়িত্ব ছিল চুক্তির শর্তগুলো নিয়ে মুসলিমদের সাথে বোঝাপড়া করা। সুহাইলকে দেখামাত্র নবীজি ﷺ সাহাবিদের বলে উঠলেন, 'তোমাদের কাজ এবার সহজ হয়ে যাবে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সুহাইল ইবন আমর বেশ খানিকক্ষণ ধরে সন্ধির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করলেন। তবে মুসলিমরা যাতে সে বছর মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে -- সে ব্যাপারে কাফিররা ছিল বদ্ধপরিকর। এই একটা জায়গাতে তারা কিছুতেই ছাড় দেবে না। তারা এটা মানতেই পারছিল না যে, লোকে বলাবলি করবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ওপর জোর খাটিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পেরেছে। এটা ছিল তাদের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন। নবীজি ﷺ এই বিষয়ে তাদের সাথে আপস করার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু

76 সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ১৯৮।

কিছুতেই কিছু লাভ হলো না।

নবীজি ﷺ চেষ্টা করেছেন যতটুকু সম্ভব ছাড় দিয়ে হলেও একটা মীমাংসা হোক। তিনি আগেই বলেছিলেন, 'তারা যদি আমাকে এমন কোনো চুক্তিতে আহবান করে যাতে ইসলামের পবিত্রতা লঙ্ঘিত না হয়, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে তাদের প্রস্তাব কবুল করবো।'

শান্তিচুক্তির শর্তাবলি এতক্ষণ পর্যন্ত মুখে মুখে আলোচনা করা হয়েছে। বাকি ছিল খালি লিখিত করা। উমার ইবন খাত্তাব চুক্তির শর্তগুলো শুনে খুবই আহত হলেন। নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে বললেন,

- আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?

- হ্যাঁ।

- আমরা কি মুসলিম নই?

- হ্যাঁ।

- ওরা কি কুফফার নয়?

- হ্যাঁ।

- তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনকে কেন ছোট করবো?

উমার ইবন খাত্তাবের চোখে মনে হচ্ছিল এই ধরনের একটি চুক্তির মাধ্যমে মুসলিমদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তার বক্তব্য ছিল অনেকটা এমন -- আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল, আপনি হকের ওপরে আছেন। আমরা মুসলিমরা সত্যের অনুসারী। আর তারা হলো মুশরিক, তারা আছে বাতিলের ওপরে। তাদের সাথে কেন আমাদের এমন চুক্তি করতে হবে যার মাধ্যমে আমাদের অবস্থান নিচু হয়ে যাবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'শোনো, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি তাঁর অবাধ্য হবো না, আর তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করবেন না।'

উমার তার কথা বোঝাতে না পেরে মরিয়া হয়ে আবু বকরের ﷺ কাছে গেলেন।

- আবু বকর, আমাকে বলুন, তিনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ নন?

- হ্যাঁ।

- আমরা কি মুসলিম নই?

- হ্যাঁ।

- ওরা কি কুফফার নয়?

- হ্যাঁ।

- তাহলে আমরা কেন আমাদের দ্বীনকে ছোট করছি?

আবু বকর ﷺ শক্তভাবে বললেন, 'তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল, তাঁর অনুসরণ করো। আল্লাহ কক্ষণো তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না।'

এরপর আর উমার কিছু বললেন না। পরবর্তীতে এই আচরণের জন্যই উমার ইবন খাত্তাব অনেক অনুশোচনা করেছিলেন। যদিও ভালো নিয়তেই তর্ক করেছিলেন। আসলে উমার ইবন খাত্তাব হক্কের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন, তাকে বলা হতো আল ফারুক। তিনি ছিলেন একজন সতর্ক ব্যক্তি। হক্ব-বাতিলের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতেন, নফসের ধোঁকায় পড়তেন না, কেউ তাকে ধোঁকা দিতে পারতো না, এমনকি শয়তান পর্যন্ত তাকে ভয় পেতো! তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী ব্যক্তি। এখানে তিনি চুক্তির শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কারণ তিনি চাচ্ছিলেন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হোক। চুক্তির শর্তগুলো আপাতদৃষ্টিতে তার কাছে অপমানজনক মনে হচ্ছিল, তাই কাফিরদের সাথে বোঝাপড়া করে চুক্তি করাটা তিনি মানতে পারছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন -- ব্যাপারটি নবুওয়াতের মাধ্যমে ফায়সালা করা হয়েছে, নবীজি নিজে থেকে কিছুই করেননি -- তখন উমার চুপ হয়ে গেলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। পরবর্তীতে এই ঘটনার কথা স্মরণ করে উমার ইবন খাত্তাব বলতেন, 'সেই দিনে আমি যা বলেছি আর যা ভুল করেছি, সেই ভয়ে আমি নিয়মিত (নফল) সালাহ, সাওম, দান-সাদাকাহ আর দাস আযাদ করতে থাকি।' কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ভালো কাজ খারাপ কাজকে মুছে দেয়।' কাজেই আমাদের উচিত কোনো ভুল করলে, বেশি বেশি ভালো কাজ করা, যেমনটা উমার ﷺ করেছিলেন।

সন্ধির শর্তাবলি

সন্ধির শর্তগুলো মৌখিকভাবে ঠিকঠাক হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে ﷺ ডাকলেন শর্তগুলো লেখার জন্য। তাকে বললেন, 'লেখো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম...'

বাগড়া বাঁধালেন সুহাইল। তিনি বলে বসলেন, 'আর-রাহমান? আর-রাহমানকে তো আমরা চিনি না। আপনি লিখতে বলুন, বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা (অর্থাৎ, আপনার নামে হে আল্লাহ)

সাহাবিরা প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা -- এটাই লেখো।'

সাহাবিরা চুপ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে বললেন, 'এরপর লেখো, নিম্নোক্ত বক্তব্যের উপরে আল্লাহর রাসূল চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন...'

আবারও আপত্তি জানালেন সুহাইল। বললেন, 'আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে জানতাম, তাহলে তো আপনার সাথে যুদ্ধ না করে আপনার অনুসরণ করতাম। আপনি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ লিখতে বলুন।'

সুহাইলের এই কথা সাহাবিদের মোটেও পছন্দ হলো না। কিন্তু এবারও তাদের থামিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ আলীকে বললেন, 'মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ লিখে দাও আর রাসূলুল্লাহ শব্দটা মুছে দাও।' আলী ইতস্তত করছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'লেখাটা কোথায় আমাকে বলো,' তিনি নিজ হাতে সেটা মুছে দিলেন। এরপর সন্ধির শর্তগুলো লেখা হলো।

সন্ধির মূল ধারাগুলো নিম্নরূপ।

- উভয় পক্ষ দশ বছরের শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবে। এই দশ বছরের মধ্যে কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে।

- যদি কুরাইশদের কেউ তার গোত্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মাদের ﷺ দলে যোগ দেয়, তাহলে তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

- যদি মুহাম্মাদের ﷺ দলের কেউ কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

- উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি ভালো নিয়ত রাখবে।

- কোনো প্রকার চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

- যার ইচ্ছা সে মুহাম্মাদের সাথে জোট বাঁধতে পারবে আর যার ইচ্ছা সে কুরাইশের সাথে জোট বাঁধতে পারবে।

- মুহাম্মাদ ﷺ এবং সাহাবিরা এই বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ঘরে ফিরে যাবে। পরবর্তী বছরে কুরাইশরা মক্কা খালি করে চলে যাবে, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন এবং তারা তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। এই সময়টায় ততটুকু অস্ত্রশস্ত্র রাখা সংগত হবে, যতটুকু অস্ত্রশস্ত্র সাধারণত একজন মুসাফির তার সাথে রাখে, এর বেশি নয়।

আবু জান্দালের رضي الله عنه আগমন

চুক্তি লেখা শেষ, স্বাক্ষর দেওয়ার পালা। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে সেই মুহূর্তে আগমন ঘটলো আবু জান্দালের رضي الله عنه। তিনি সুহাইল ইবন আমরের আপন ছেলে। বাবা স্বয়ং কাফিরদের মুখপাত্র, আর ছেলে কিনা মক্কা থেকে পালিয়ে এসেছেন নবীজির ﷺ সাথে যোগ দিতে! আবু জান্দালকে মক্কায় কারাবন্দী ছিলেন বেশ কয়েক বছর। মুসলিমরা উমরা করতে এসেছে শুনে তিনি পালিয়ে এসেছেন। তার শরীরে তখনও শিকল বাঁধা। সে অবস্থাতেই পাহাড়ি পথ, উপত্যকা সবকিছু ডিঙিয়ে মুসলিমদের ঘাঁটিতে এসে পৌঁছেছেন। আজ তার মুক্তির দিন! কিন্তু বাধ সাধলেন তার বাবা। সুহাইল তাকে দেখেই রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলে উঠলেন,

- চুক্তির আওতায় এই হলো আমার প্রথম ব্যক্তি। একে আমার কাছে ফেরত দিন।

- তাকে তুমি আমার কাছেই থাকতে দাও।

- না না! হয় আপনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন, না হলে কোনো সন্ধিই করবো না।

নবীজি ﷺ তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন বললেন, 'দেখো, আমরা কিন্তু এখনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করিনি।'

কিন্তু সুহাইল নাছোড়বান্দা, কিছুতেই রাজি হলেন না। শেষমেশ আবু জান্দালের দিকে ফিরে নবীজি ﷺ বললেন, 'তোমাকে ফিরে যেতে হবে।'

আবু জান্দালের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো! এমন পরিস্থিতির জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কী করে আমাকে কাফিরদের মাঝে ফিরে যেতে বলছেন? ওদের মাঝে থাকলে আমি ফিতনায় পড়ে যাবো...'

নবীজি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'ধৈর্য ধরো আবু জান্দাল। আল্লাহর জন্য তোমার কষ্টগুলো সহ্য করে যাও। নিশ্চয়ই তোমার এবং তোমার মতো আরও যারা কষ্টভোগ করছে, তিনি তাদের সবার কষ্ট দূর করবেন। আমরা এই লোকদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। চুক্তির প্রতিটি শর্ত রক্ষা করবো বলে আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছি। আমরা আমাদের অঙ্গীকার ভাঙতে পারি না।'

আবু জান্দালকে মারধোর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উমার ﷺ তখন ইচ্ছা করেই নিজের তরবারিটার হাতলটা আবু জান্দালের পাশে ঝুলিয়ে রেখে হাঁটছেন আর আবু জান্দালের কানে কানে ফিসফিস করে বলছেন, 'এরা কাফের। এদের জীবনের কোনো দাম নেই। এদের রক্তের দাম কুকুরের রক্তের দামের সমান!'[77] তিনি চাচ্ছিলেন আবু জান্দাল যেন তাঁর তরবারিটা কেড়ে নিয়ে তাঁর বাবাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলুক। কিন্তু আবু জান্দাল পর্বতসমান ধৈর্য নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সবকিছু সহ্য করে নিলেন।

এই দৃশ্য দেখে সাহাবিদের হৃদয়ে হাহাকার সৃষ্টি হয়, চোখের পানি ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। তাদের একজন দ্বীনি ভাইকে তাদেরই চোখের সামনে এভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা চুপচাপ দেখছেন -- এটা তারা মানতেই পারছিলেন না। সাহাবিরা ছিলেন মর্যাদাবান লোক। এই ঘটনা মেনে নেওয়া তাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। তাদের চোখ বেয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে থাকে।

চুক্তি লেখা শেষ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে আদেশ করলেন পশু কুরবানি করতে আর মাথা মুড়িয়ে নিতে। কিন্তু সাহাবিরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনবার আদেশ করার

[77] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬।

পরেও সবাই একদম নিথর দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য সময় নবীজি ﷺ আদেশ করলে সবাই ছুটে গিয়ে তা পালন করতেন। এবার যেন কারো মধ্যে কোনো ভাবাবেগ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের এ আচরণে মর্মাহত হলেন। সাহাবিরা হলেন মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ জাতি। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহর ﷺ অবাধ্যতা করলে জান্নাতে কেউ ঠাঁই পাবে না, জাহান্নামের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। সাহাবিদের ওপর রাগ করে আল্লাহর রাসূল ﷺ স্ত্রী উম্ম সালামাকে ﷺ বললেন, 'মুসলিমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলছে! আমি তাদেরকে একটা আদেশ দিলাম আর তারা অবাধ্যতা করছে!' উম্মুল মু'মিনীন উম্ম সালামাহ ﷺ ছিলেন বিচক্ষণ নারী। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি এই বিষয়টা নিয়ে কারো সাথে আর কোনো কথা তুলবেন না। আপনি আগে নিজে যান, পশু জবাই করুন আর নাপিত ডেকে নিজের চুল মুড়িয়ে নিন।'

এই শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে গিয়ে সাহাবিরা অনেক চাপের মধ্য দিয়ে গেছেন। তাদের কাছে মনে হচ্ছিল তারা কিছুই অর্জন করতে পারেননি। তারা নবীজির ﷺ অবাধ্য হয়েছিলেন, এটা ভাবা ঠিক হবে না। বরং তারা আদেশ পালনে কিছুটা বিলম্ব করছিলেন। তাদের ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো নবীজির কাছে ওয়াহী আসবে। হয়তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে, আর তারা মক্কায় ঢোকার অনুমতি পাবেন। তারা এসেছিলেন কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে, খালি হাতে ফিরে যেতে তারা আসেননি।

কিন্তু উম্ম সালামার বিচক্ষণতায় পরিস্থিতি সহজ হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নবীজি ﷺ যদি নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে কাজগুলো করেন তাহলে তাঁর দেখাদেখি সাহাবিরাও সেসব করবেন। নবীজি ﷺ বেরোলেন, তাঁর নাপিতকে ডাকিয়ে নিজের মাথা মুড়িয়ে নিলেন এবং পশু জবাই করলেন। এরপর তাঁর দেখাদেখি সব সাহাবি তৎক্ষণাৎ নবীজির আদেশ পালন করলেন। অবশ্য তখনও সবাই বেশ বিমর্ষ হয়ে ছিলেন।

মুসলিমরা মদীনায় ফিরে এল। ফেরার পথে তাদের মনে দুটো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। উমার ﷺ ভণিতা করার মানুষ নন। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ অকপটে জিজ্ঞেস করলেন,

- আচ্ছা রাসূলুল্লাহ, আমাদের ওয়াদা করা হয়েছিল আমরা তাওয়াফ করতে পারবো। সেটা কেন হলো না?

- আমি কি তোমাকে বলেছি যে আমরা এই বছর তাওয়াফ করবো?

- না।

- তাহলে তোমরা অবশ্যই তাওয়াফ করবে।

নবীজির আশ্বাসে সাহাবিরা আশ্বস্ত হলেন। সাহাবিরা দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে

ভুগছিলেন তা হলো আবু জান্দালকে কুরাইশদের কাছে ছেড়ে দেওয়া। তারা খোলাখুলিভাবে বিষয়টি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বুঝিয়ে বললেন আবু জান্দাল এবং তার মতো যারা আছে, তাদের নিষ্কৃতির পথ শীঘ্রই উন্মুক্ত হবে -- আল্লাহ তাকে এমনটাই ওয়াদা করেছেন। সাহাবিরা তাদের খটকা নিয়ে খোলাখুলিভাবে নবীজির সাথে আলোচনা করলেন এবং নবীজি ﷺ তাদের কথা শুনে বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না। বরং তাদের শান্তভাবে বুঝিয়ে দিলেন যেন তাদের খটকাগুলো দূর হয়ে যায়।

তবে এখানে দুটো ব্যাপার উল্লেখ্য, মক্কার কেউ মুসলিম হয়ে মদীনায় আসলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া -- এই নিয়মটি মুসলিম নারীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়নি। আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন,

> "মু'মিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা নিশ্চিত জানো যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না..." (সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১০)

তবে এই আয়াত দিয়ে মুসলিম নারীদের ব্যাপারে মূল চুক্তির শর্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, নাকি মূল চুক্তির শর্তে কিছুই উল্লেখ না থাকায় আল্লাহ তাআলা আয়াত পাঠিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করে দিয়েছেন--সেটা নিশ্চিত নয়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ইসলামের প্রথম গেরিলা যোদ্ধা: আবু বাসীর ﵁

মুসলিমরা মদীনায় ফিরে যাবার কিছুদিন পরের ঘটনা। আবু বাসীর উতবাহ ইবন উসাইদ ﵁ নামের এক মুসলিম লোক মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে চলে এলেন। তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনতে দুই মুশরিক মদীনায় এল। এদের একজন বনু আমীর গোত্রের, আরেকজন ছিল আযাদকৃত দাস। তারা দাবি করলো আবু বাসীরকে ﵁ যেন তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কেননা হুদাইবিয়ার সন্ধি মতে মক্কা থেকে কেউ মদীনায় আসলে তাকে মক্কার হাতে হস্তান্তর করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বাধ্য থাকবেন।

নবীজি ﷺ আবু বাসীরকে ডেকে বললেন, 'তোমাকে ফিরে যেতে হবে।'

আবু বাসীর বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে মুশরিকদের মাঝে ফিরিয়ে দিচ্ছেন! এদের মাঝে থাকলে তো আমি দ্বীন নিয়ে ফিতনায় পড়ে যাবো!'

একজন মুসলিমকে কাফিরদের হাতে এভাবে তুলে দেওয়ার চাইতে দুঃখজনক আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

একটি বিষয়। প্রতারণা করা ইসলামে বৈধ নয়। নবীজি ﷺ আবু বাসীরকে তাই বললেন, 'দেখো, এই লোকগুলোর সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ। আমাদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা শোভা পায় না। তুমি ফিরে যাও, নিশ্চয়ই তুমি এবং তোমার মতো যারা আছে -- আল্লাহ তোমাদের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।'

নবীজি ﷺ কাফিরদের হয়ে কাজ করছিলেন না। কিংবা তাদেরকে খুশি করার জন্য মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন না। শুধুমাত্র একটি কারণে তিনি আবু বাসীরকে ﵁ ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, তা হলো চুক্তি রক্ষা করা। আর আল্লাহর তরফ থেকে ওয়াদা পাওয়ার পরেই এমন একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতেই হবে, সে চুক্তি মুসলিমদের সাথে হোক বা কাফিরদের সাথে হোক।

আবু বাসীরকে ﵁ কুরাইশদের সেই দুই ব্যক্তির সাথে ফিরে যেতে হলো। মক্কায় যাওয়ার পথে যুল হুলাইফা নামক স্থানে জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে যুহরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। আবু বাসীর ﵁ সালাত আদায় করলেন। এরপর কিছু খেজুর নিয়ে বাকি দু'জনের সাথে একসাথে খেতে বসে গল্পগুজব করতে লাগলেন। কথাপ্রসঙ্গে আবু বাসীর জিজ্ঞেস করলেন,

- 'বনু আমীরের ভাই, তোমার তলোয়ারটা তো বেশ!'

- 'হ্যাঁ! আসলেই তাই!' নিজের তরবারির প্রশংসা পেয়ে লোকটাও বেশ গদগদ হয়ে উত্তর দিলো।

- আমাকে একটু দাও তো, আমি একটু পরখ করে দেখি!

আবু বাসীরের হাতে তরবারি আসামাত্র মুহূর্তের মাঝে বনু আমীরের লোকটির লাশ পড়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে দ্বিতীয় ব্যক্তি আতঙ্কে দিল ভোঁ দৌড়। একেবারে জান হাতে নিয়ে পালানো যাকে বলে! দৌড়াতে দৌড়াতে নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড়। এক দৌড়ে সে মদীনায় চলে এল। তাকে ওভাবে দৌড়াতে দেখেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন মারাত্মক কিছু ঘটেছে। সে রাসূলুল্লাহকে জানালো, 'আমার সাথীকে ঐ লোক হত্যা করেছে! সে পেলে আমাকেও মেরে ফেলবে!'

ততক্ষণে আবু বাসীরও তরবারি হাতে মদীনায় ঢুকলেন। নবীজিকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, আমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।'

নবীজি ﷺ বললেন,

> *'ওয়াইলুই উম্মিহি! সাথে আর কয়জন লোক থাকলে তো এই ছেলে রীতিমতো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারতো!'*

কথাটা ছিল প্রশংসাসূচক। আবু বাসীর ছিলেন একজন টগবগে যুবক, সাথে কিছু লোকবল থাকলে তিনি একাই কুরাইশদের নাস্তানাবুদ করার ক্ষমতা রাখেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু চুক্তিমতে তিনি আবু বাসীরকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। এই কথা শুনে আবু বাসীর মদীনা ছেড়ে চলে গেলেন। কারণ কুরাইশদের কেউ তাকে ফেরত চাইলে নবীজি ﷺ আবারো তাকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকবেন। তাই তিনি চলে গেলেন সাইফুল বাহরে।

ওয়াকিদির বর্ণনা মতে, আবু বাসীর নবীজির কাছে বনু আমীরের লোকটির জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু নবীজি সেগুলো নিতে রাজি হননি, কারণ সেক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হয়ে যায়। যা-ই হোক, সাইফুল বাহরে আবু বাসীরের ﷺ নতুন জীবন শুরু হলো। সমুদ্রতীরে তিনি একাকী দিন কাটাতে লাগলেন, কোনো সঙ্গীসাথী নেই। ওদিকে কুরাইশরা হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্বল বলতে তার কাছে ছিল কয়েকটা খেজুর। খেজুর শেষ হয়ে গেলে সমুদ্রতীরে ভেসে ওঠা মাছ খেয়ে সারাদিন পার করে দিতেন। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

এত বড় খবর তো চাপা থাকে না। আবু বাসীরের ঘটনা মক্কায় জানাজানি হয়ে গেল। আবু জান্দালের কানে এ খবর পৌঁছলে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো মক্কা থেকে পালিয়ে গেলেন। এবার গিয়ে আবু বাসীরের সাথে যোগ দিলেন। জুলুমের শিকার মক্কার আরও কিছু মুসলিমও আবু বাসীরের সাথে যোগ দিলেন এবং শুরু করলেন একের পর এক গেরিলা অপারেশন। এভাবেই আবু বাসীরের নেতৃত্বে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়। আজ পর্যন্ত আবু বাসীরের ﷺ নাম মুসলিমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে।

আবু বাসীর ﷺ আর তাঁর সঙ্গীরা মিলে কুরাইশদের অতর্কিতে হামলা করা শুরু করলেন। তারা অবস্থান করছিলেন 'ঈস' নামক স্থানে। জায়গাটা ছিল কুরাইশদের সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক রুটের একেবারে কাছেই। তারা সেখানে ওঁৎ পেতে থাকতেন আর কুরাইশদের কোনো কাফেলাকে অতিক্রম করতে দেখলে সেটাকে আক্রমণ করে কাফেলার সবাইকে হত্যা করে কাফেলার সম্পদ লুট করতেন। কুরাইশদের জীবন রীতিমতো দুর্বিষহ হয়ে গেল। এই অপারেশনগুলোর কথা দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়াতে লাগলো আর অনেক মুসলিম সেই গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করল। এভাবে প্রায় সত্তর জনের একটি দল কুরাইশদের পর্যুদস্ত করে দিল।[78]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছুই জানতেন কিন্তু তিনি কিছুই বলছিলেন না। তিনি এসবের সাথে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু তিনি এসব ঘটনার প্রতি 'তীব্র নিন্দা'ও জ্ঞাপন করেননি। চুক্তির কারণে আবু বাসীরকে তিনি মদীনায় আশ্রয় দেননি, আবার তাকে থামানোরও কোনো চেষ্টা করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল দায়িত্বশীল ছিলেন মদীনার

[78] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৮।

অভ্যন্তরে মুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে। মক্কার মুসলিমরা মদীনার বাইরে সমুদ্রতীরে কী করছে -- সেসবের ব্যাপারে তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল না। তাই নবীজি ﷺ এসব থামানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ নিলেন না।

বনু আমীরের লোকটির হত্যার খবর যখন মক্কায় পৌঁছলো তখন সুহাইল ইবন আমর খুব দুঃখ পেলেন। কারণ সেই লোকটি ছিল তার গোত্রের লোক। কাবাঘরে পিঠ ঠেকিয়ে সুহাইল মরিয়া হয়ে বলতে লাগলো, 'এই লোকের রক্তপণ আদায় করার আগ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হচ্ছি না, ঠিক এইভাবে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো! মুহাম্মাদকে এই অর্থ দিতেই হবে!' আবু সুফিয়ান বলে উঠলো, 'পুরোই পাগলামি! মুহাম্মাদ এই টাকা কেন দিতে যাবে? সে তার কাজ করেছে। সে তো আবু বাসীরকে ফিরিয়ে দিয়েছেই।'

যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে চিঠি লিখে তাকে মদীনায় পাঠিয়েছিল, তারাও এই মৃত্যুর ব্যাপারে দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালো। এভাবে বনু আমীরের সেই লোকের রক্তপণ হারিয়ে গেল। সুহাইল ইবন আমর তার বংশের লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে কোনো টাকাই পেলেন না। আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্বদর অনুযায়ী সবকিছুই মুসলিমদের পক্ষে কাজ করছিল।

আবু বাসীরের গেরিলা আক্রমণে কুরাইশদের নাকানি-চুবানি খেয়ে দমবন্ধ হবার মতো অবস্থা। যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি করা হলো, কুরাইশরা ভেবেছিল যেন তাদেরই বিজয় হচ্ছে। কোনো মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে আসলে তাকে মদীনায় ফিরিয়ে দেওয়া -- চুক্তির এই ধারার জন্য তারাই চাপাচাপি করেছিল। অথচ শেষ পর্যন্ত এই চুক্তিই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। কয়েক বছর মুসলিমদের সাথে টানা যুদ্ধের পর হুদাইবিয়ার সন্ধি কেবলই তাদের একটু দম নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এর আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ বাহিনীর ক্রমাগত হামলায় তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শান্তিচুক্তি করার পর তারা ভেবেছিল তারা আবার ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করতে পারবে। কিন্তু তারা ভাবতেই পারেনি আবু বাসীরের কারণে তাদের এভাবে নাস্তানাবুদ হতে হবে। এই পরিস্থিতির কোনো কূলকিনারা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তারা নবীজির ﷺ শরণাপন্ন হলো।

আল্লাহ এভাবেই ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেন। যে শর্ত ছাড়া কুরাইশরা সন্ধি করতেই রাজি হচ্ছিল না, সেগুলোই বদলাবার জন্যে তারা এবার নবীজিকে চিঠি পাঠিয়ে মিনতি করতে লাগলো। সে চিঠির ভাষা ছিল অনেকটা এমন,

'আপনার ও আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই লাগে, দয়া করে এই লোকদেরকে ডেকে আপনি মদীনায় স্থান দিন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অনুরোধ রাখলেন। তিনি চিঠি পাঠিয়ে আবু বাসীর এবং

অন্যান্যদের মদীনায় চলে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ চিঠি যখন আবু বাসীরের হাতে পৌঁছালো, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দ্বীন ইসলামের ছায়ার নিচে থাকার জন্য যার এত প্রয়াস, রাসূলের শহর মদীনায় ঢোকার জন্য যার এত আকুতি, সেই স্বপ্ন সত্য হতে হতেও যেন হলো না। তার এই ব্যাকুলতার সমস্ত প্রতিদান অপেক্ষা করে ছিল তার জান্নাতের বাড়িতে। যে আবু বাসীরের আক্রমণের সূত্র ধরে মক্কার নিপীড়িত মুসলিমরা মদীনায় আসার সুযোগ পেলেন, সেই আবু বাসীর আল্লাহর রাসূলের চিঠি বুকে চেপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তার আর মদীনায় আসা হলো না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মযলুম মুসলিমদের অবস্থার উত্তরণ ঘটাবেন, আল্লাহ তাই করেছেন। এই মযলুম মুসলিমরা কুরাইশদের মনে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে উঁচু নাক নিয়ে কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি করেছিল, আল্লাহ তাআলা এই দুর্বল মুসলিমদের মাধ্যমে কুরাইশদের উঁচু নাককে ভোঁতা করে দিয়েছেন। তাদের সমস্ত হম্বিতম্বিকে ধূলিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। করজোড়ে তাদের দিয়ে নতি স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে আবু জান্দাল এবং অন্যান্য নও মুসলিমদের মদীনায় চলে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদা সত্য -- মুসলিমরা যখন আল্লাহ আযযা ওয়াজালের কথা মেনে চলে, আল্লাহ তাআলা তাদের মুক্তির পথ বের করে দেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে শিক্ষা

১) হুদাইবিয়া ছিল ইসলামের বিজয়

এ বিষয়ে আয়াত নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারকে ডেকে পাঠালেন। উমার ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন, ভাবলেন নিশ্চয়ই তাকে তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারকে বললেন,

- আমি এমন কিছু আয়াত পেয়েছি যেগুলো এই দুনিয়ার সবকিছু থেকেও উত্তম।

- এখানে কি মুক্তির কথা বলা হচ্ছে?

- সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, এখানে মুক্তির কথাই বলছে!

বিজয় বা মুক্তি বলতে কুরআনে 'ফাতহ' এবং 'নাসর' দুটো শব্দ এসেছে। ফাতহ শব্দের অর্থ খোলা। বদ্ধ কিছু খোলা বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হতো। আর কোনো একটি যুদ্ধে জয়ের কথা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে নাসর শব্দটি। যেমন, বদরের বিজয়ের কথা বোঝাতে নাসর কথাটি আসে। ফাতহ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না, কেননা বদর একটা ময়দান মাত্র, একে মুক্ত করার কিছু নেই। অন্যদিকে মক্কা হলো একটি ভূমি, তাই বলা হয় ফাতহে মক্কা।

হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বলা হয়েছে ফাতহ, কারণ এই চুক্তির মাধ্যমেই মক্কা বিজয়ের পথ

উন্মুক্ত হয়ে যায়। নবীজি সেবার চৌদ্দশো সাহাবি নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর লোকেরা খোলামেলাভাবে আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। আরবের মুসলিমরা প্রথমবারের মতো স্বাধীনভাবে লোকেদের সাথে কথা বলার অবকাশ পেল আর লোকেরাও নির্ভয়ে ইসলামের কথা শোনার সুযোগ পেয়ে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠলো। কুরাইশদের চাপের কারণে এতদিন মুসলিম হবার পথে মানুষের মনে ভয় বা বাধা কাজ করতো। এই চুক্তির মাত্র দু'বছর পর যখন মুসলিমরা মক্কা বিজয় করে, তখন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে হয় দশ হাজার। অথচ এর আগের বিশ বছরে এত মুসলিমের কথা কল্পনাও করা যায়নি -- নিঃসন্দেহে এটা ছিল সুলহুল হুদাইবিয়ার (হুদাইবিয়ার সন্ধি) একটা বড় অর্জন।

২) কুরাইশদের নিষ্ক্রিয়করণ

ইসলামের উত্থানে কুরাইশরা ছিল সবচাইতে বড় হুমকি। মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার মাধ্যমে তারা দশ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আরব জয়ের পথে কোনো বাধা আর অবশিষ্ট থাকলো না। এই চুক্তি করতে কুরাইশরা যতই হামবড়া ভাব দেখাক না কেন, এই চুক্তির মাধ্যমে তারা কার্যত মুসলিমদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। যদিও কাফিরদের কাছে মুসলিমরা স্বীকৃতি খোঁজে না। কিন্তু এটা দেখিয়ে দেয় যে, মক্কা থেকে প্রায় বিতাড়িত হাতে গোনা কয়েকজন মুসলিম মদীনায় আশ্রয় নিয়ে যে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে, তা কয়েক বছরের মধ্যে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, একে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া কাফির শক্তির আর কোনো পথ থাকে না।

এই স্বীকৃতি ছিল সমীহের স্বীকৃতি, দয়া-দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতি নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ কাফিরদের কাছে স্বীকৃতির জন্য ধর্ণা দেননি, তিনি তাদের কাছে স্বীকৃতির জন্য আবদারও করেননি। বরং তিনি তরবারি ব্যবহার করেছেন আর তারা নিজেদের তাগিদেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি এমন একটা অবস্থায় চুক্তি করেছিলেন যখন তিনি ছিলেন শক্তিশালী। ছয় বছর ধরে জিহাদ করে তখন তিনি কুরাইশদের যথেষ্ট কোণঠাসা করে রেখেছেন। কুরাইশরা তাদের নিজেদের লাঞ্ছনা ঠেকাতে চুক্তি করে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজকের বিশ্বে ঠিক উল্টোটা ঘটছে। কাফিরদের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিয়ে মুসলিমরা তাদের খুশি করতে চাইছে এবং স্বীকৃতির আশা করছে। এটা 'স্বীকৃতি' নয়, বরং এটা হলো লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

৩) সাহাবিদের আপত্তি এবং আল্লাহর রাসূলের ﷺ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি

উমার ﷺ এবং অন্য মুসলিমরা বেশ কিছু কারণে প্রথমে এই চুক্তি নিয়ে খুশি হতে পারেননি। দলিল থেকে আর-রাহমান মুছে ফেলা, রাসূলুল্লাহ মুছে ফেলা -- এই বিষয়গুলো হজম করতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। কুরাইশদের কেউ মদীনায় আসলে তাকে ফিরিয়ে দিতে মুসলিমরা বাধ্য থাকবে, কিন্তু মুসলিমদের কেউ মক্কায় গেলে তাকে ফেরত দিতে কুরাইশরা বাধ্য থাকবে না -- চুক্তির এই শর্তগুলোও ছিল তাদের অসন্তোষের কারণ।

প্রথমত, আর-রাহমান মুছে ফেলার বিষয়টা অপছন্দ করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে মুসলিমদের কোনো ক্ষতি নেই কিংবা এখানে ইসলামের কোনো হুকুম নিয়ে আপস করা হচ্ছে না। কাফিররা আল্লাহ তাআলাকে আর-রাহমান বলে বিশ্বাস না করলেও কার্যত এই চুক্তি আল্লাহর নামেই করা হচ্ছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা, দেবতা, মানুষ বা মানবরচিত আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে না।

দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই সুহাইলকে বলেছেন, 'তোমরা আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস না করলেও আমি আল্লাহর রাসূল।' কাফিররা মুহাম্মাদকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেবে -- সেটা জরুরি নয়। তাই এখানে সুহাইলের দাবি নবীজি মেনে নিয়েছেন। তবে সুহাইল যদি এই চুক্তিতে তাদের কোনো দেবতার নাম অন্তর্ভুক্ত করতো কিংবা তাদের প্রশংসা করতো, তাহলে সেটা কখনই মেনে নেওয়া হতো না। তাই এই ব্যাপারটিকে আপস বা সমঝোতা ভাবাটা ভুল হবে।

তৃতীয় বিষয়টিও রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। যদি কেউ মদীনা থেকে মক্কায় চলে যেতে চায়, তাহলে মুসলিমদের তাকে প্রয়োজনও নেই, কেননা একমাত্র মুরতাদ হলেই কেউ মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে যাবে আর একজন মুরতাদকে মদীনায় ধরে রাখার কোনো দরকার নেই। অন্য দিকে, মক্কার কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে মদীনায় আসতে পারবে সত্য, কিন্তু আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। সে অন্য যেকোনো জায়গায় চলে যেতে পারবে। এমন লোকের মুক্তির ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন।

আবু বাসীরের ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা

আবু বাসীরের ঘটনা থেকে এমনটা ভাবা সমীচীন হবে না যে, একজন মুসলিমকে কাফিরের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। এটা জায়েয নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার ওপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না।'[79]

প্রথমত, মক্কার মযলুম মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তাআলা উপায় বাতলে দেবেন -- এমন ওয়াদার ভিত্তিতে আল্লাহ রাসূল ﷺ চুক্তিতে এই শর্তটি রেখেছিলেন। এটা ছিল ওয়াহী। এটা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য জায়েয ছিল কারণ তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেবেন।'

দ্বিতীয়ত, 'ওয়াইলুই উম্মিহী, তার সাথে যদি আরও লোক থাকতো...' রাসূলুল্লাহর এই কথা থেকে প্রতীয়মান হয় আবু বাসীরের কাজে তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। ইবন হাজার

[79] রিয়াদুস স্বলেহীন, পরিচ্ছেদ ২৭, হাদীস ১২/২৩৮।

আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারী কিতাবে এমনটাই মত দিয়েছেন। ওয়াইলুই উম্মিহী -- এই কথার কারণে অনেকে মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাসীরের কাজটির অনুমোদন দেননি। ওয়াইলুই উম্মিহী -- এই কথাটি আরবিতে বহুল প্রচলিত। এর আক্ষরিক অর্থ অনেকটা এমন -- তার মায়ের সর্বনাশ হোক। আক্ষরিক অর্থে এটাকে নেতিবাচক মনে হলেও আরবরা প্রশংসা করতে এই কথাটি ব্যবহার করে।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাসীরের অপারেশনগুলোর কোনো সমালোচনা করেননি বা নিন্দা জানাননি। যদি আবু বাসীরের ﷺ কাজগুলো ভুল হতো, একজন নবী ﷺ হিসেবে আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এই বিষয়টি উম্মাহর কাছে জানিয়ে দিতেন। শাসক হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, তাই আবু বাসীরকে তিনি এইসব অপারেশন করার আদেশ দেননি। একই সাথে শাসক হিসেবে তিনি তার ব্যাপারে দায়বদ্ধ ছিলেন না, কারণ আবু বাসীর মদীনা প্রশাসনের অধীনে ছিলেন না।

চতুর্থত, আবু বাসীর ﷺ যখন দ্বিতীয়বার মদীনায় এলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বন্দী করে কুরাইশদের হাতে তুলে দেননি। কাফিরদের খুশি করার বা তাদের মন যুগিয়ে চলার কোনো উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল না।

পঞ্চমত, আবু বাসীরের কাজে রাসূলুল্লাহর ﷺ নীরবতা এটাই প্রমাণ করে যে, জিহাদের জন্য শাসক বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

বিবিধ শিক্ষা

১) ইসলামে বস্তুগত প্রতীকের কোনো স্থান নেই

উমারের ﷺ খিলাফতের সময়ে একটি ঘটনা ঘটে। যে গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, কিছু মুসলিম সে গাছের নিচে গিয়ে সালাত আদায় করা শুরু করে। তারা ভাবছিল, যেহেতু এই গাছের নিচে এতবড় একটা ঘটনা ঘটেছে আর কুরআনেও এই গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে -- তার মানে এই গাছটি বিশেষ কিছু। মুসলিমদের এই কাজ করতে দেখে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ সোজা গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। এই গাছের নিচে ইবাদত করা এক সময় শিরকে পরিণত হতে পারে, মানুষ হয়তো গাছটিকে 'কল্যাণকর' কিছু ভেবে বসতে পারে -- এই আশঙ্কায় উমার গাছটি কেটে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ গাছের নিচে বসেছেন। কুরআনে এর কথা উল্লেখ হয়েছে সত্য, কিন্তু ইসলামে বস্তুগত প্রতীকের কোনো স্থান নেই।

২) শত্রুদের সাথে চুক্তির সময়কাল

যেহেতু আল্লাহর রাসূল ﷺ শত্রুদের সাথে দশ বছরের শান্তিচুক্তি করেছেন, সে হিসেবে ইমাম শাফী, ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য আলিমরা মত দিয়েছেন শত্রুরাষ্ট্রের সাথে সর্বোচ্চ দশ বছরের চুক্তি করা জায়েয, এর বেশি নয়। দশ বছরের পর চুক্তি নবায়ন করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা এবং অন্য কিছু আলিম মনে করেন, পরিস্থিতি

প্রেক্ষিতে দশ বছরের বেশি সময়ের জন্যেও চুক্তি করা যেতে পারে। তবে আগেকার আলিমদের সবাই একমত যে শত্রুরাষ্ট্রের সাথে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা চিরস্থায়ী চুক্তি করা জায়েয নয়।

কুরআনের চোখে হুদাইবিয়ার সন্ধি: সূরা ফাতহ

সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয় হুদাইবিয়া সন্ধির সময়ে। এই সূরা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। সে উদ্দেশ্যে এর কয়েকটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হলো।

মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি

> "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ আপনাকে আগে পরের যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারেন, আপনার ওপর তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে পারেন, আর আপনাকে পরিচালিত করতে পারেন সহজ-সঠিক পথে।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১-২)

হুদাইবিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ﷺ বিজয় দান করেছেন এবং এই বিজয়ের মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলা নবীজির ﷺ সমস্ত গুনাহ মুছে দিবেন। এর মানে কি নবীজি ﷺ গুনাহের কাজ করেছেন? না, আসলে একজন রাসূলের পদমর্যাদা অনেক ওপরে, তাই তাদের ভুল বা দুর্বলতাগুলোকে এখানে গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে, আক্ষরিক অর্থে গুনাহ বোঝানো হচ্ছে না। আর হিদায়াহ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে দিক-নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিলেন, এখানে বলা হচ্ছে, পরবর্তীতে তাঁর কাছে শরীয়াহর আরও আইন অবতীর্ণ হবে, এটাই হলো হিদায়াহ বা সরল পথ প্রদর্শন।

> "এবং যেন আল্লাহ আপনাকে দান করেন মহা-বিজয়। তিনিই সেই সত্তা যিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন, যাতে তাদের (বর্তমান) ঈমানের সাথে সাথে ঈমান আরও বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ৩-৪)

হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল মুসলিমদের জন্য রহমত-স্বরূপ। এই সন্ধির সূত্র ধরে পরবর্তীতে মক্কা বিজয় সহ মুসলিমদের যতগুলো বিজয় অর্জিত হয়েছে, তাকেই এখানে 'মহাবিজয়' বলা হচ্ছে। মুসলিমরা এসেছিল উমরা করার আশায়। কিন্তু তাদের মক্কায় ঢুকতেই দেওয়া হলো না। ঘটনাচক্রে মুসলিমরা মৃত্যুর শপথ করলো -- হয় লড়বো নাহয় মরবো। পরিস্থিতি বার বার নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। একের পর এক অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা সাহাবিরা নিশ্চয়ই চাননি। আল্লাহ তাই বলছেন, অন্তরের এই অনিশ্চিত ও অশান্ত অবস্থানকে তিনি সুকুন বা প্রশান্তি দিয়ে মুছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার বিজয়ের ওয়াদা তাদের অন্তরকে শান্ত করে দেয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলির সমস্ত শক্তির মালিক তিনিই। তাঁর ইচ্ছাতে নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুও আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হতে পারে। বদরের যুদ্ধে বৃষ্টি আর ফেরেশতারা ছিল আল্লাহর সৈনিক, খন্দকের যুদ্ধে বাতাস ছিল আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর সৈনিক কে বা কারা, তা আমরা জানিনা, শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন।

সুসংবাদ মু'মিনাহদের জন্য

সূরা ফাতহের প্রথম আয়াত শুনে মুসলিমরা খুব খুশি হলো। তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে জানতে চাইলেন, 'আর আমাদের জন্য কী আছে?' আল্লাহ তাআলা বললেন,

> **"যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের গুনাহগুলো মুছে দেবেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ৫)**

এ আয়াতে মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারী উভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে নারীদের কথা কেন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো যেখানে সুলহুল হুদায়বিয়্যাতে কেবল পুরুষরা ছিল? পুরুষদের সাথে নারীরাও পুরস্কার পাবে কারণ যখন তাদের স্বামী যুদ্ধে গেছে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে -- তখন তারা সবর করেছে, পরিবারকে আগলে রেখেছে। তাই মুসলিম নারীরাও পুরুষদের সাথে সাথে সর্বোচ্চ মর্যাদার অংশীদার হবে।

> **"আর যেন তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক্ব পুরুষদের ও মুনাফিক্ব নারীদের এবং মুশরিক পুরুষদের ও মুশরিক নারীদের--যারা আল্লাহ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা ধারণ করে থাকে। তাদের পরিণাম মন্দ। তাদের ওপর আছে আল্লাহর ক্ষোভ। তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, আর তাদের জন্য তিনি জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ৬)**

এবার আল্লাহ তাআলা শত্রুদের পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এখানেও নারীদেরকে কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তারা ছিল পুরুষদের সহযোগী। তাই শাস্তির বেলায় পুরুষদের সাথে সাথে নারীদেরকেও এর ভাগ বহন করতে হবে।

সাহাবিদের বিশেষ মর্যাদা

> **"নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে (হে মুহাম্মাদ), তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; তাহলে এর ভয়াবহ পরিণাম তার**

নিজের ওপরই এসে পড়বে। যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১০)

আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের বলছেন -- তোমরা রাসূলুল্লাহর কাছে নয়, বরং আল্লাহর কাছেই অঙ্গীকার দিয়েছো! নিশ্চয়ই এটা ছিল সেই চৌদ্দশো সাহাবির জন্য এক বড় মর্যাদা। এই সাহাবিদের কেউই সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননি।

মুনাফিক্ব চিহ্নিতকরণ

"বেদুইনদের মধ্যে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তারা শীঘ্রই আপনাকে বলবে--আমাদের ধনসম্পত্তি ও আমাদের পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা আমাদের মশগুল করে রেখেছিল, তাই আমাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা তাদের জিহবা দিয়ে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন, কে তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করবার ক্ষমতা রাখে যদি তিনি তোমাদের অপকার করতে চান অথবা তোমাদের উপকার করতে চান? বস্তুত তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকেবহাল।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১১)

মরুবাসীদের অনেকেই কুরাইশদের শক্তিমত্তার ভয়ে হুদাইবিয়ায় যোগ দেয়নি। তারা ভাবছিল মুসলিমরা নির্ঘাৎ তাদের হাতে মারা পড়বে। তারা অজুহাত দেখিয়েছে তাদের পরিবার-পরিজন আর ধনসম্পদের দেখাশোনা করতে গিয়ে তারা আসতে পারেনি। আল্লাহ তাদের এই অজুহাত গ্রহণ করেননি। পরিবার-পরিজন আর ধনসম্পদ বাকিদেরও ছিল, তারা এই অজুহাতে পেছনে পড়ে থাকেননি। পরিবার, ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরির অজুহাতে জিহাদ থেকে মাফ পাওয়া যাবে না।

"না, বরং তোমরা মনে করেছিলে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের বাড়ি-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না। আর এই ধারণা তোমাদের কাছে খুবই সুখকর লাগছিল। তোমরা তাদের সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা করেছিলে, (আসলে) তোমরা হচ্ছো একটি নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ জাতি!

আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করে না, আমরা তো অবশ্যই সেসব কাফিরদের জন্য তৈরি করেছি জ্বলন্ত আগুন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে আসতে দাও। এভাবে তারা আল্লাহর ফরমানই বদলে দিতে চায়। বলুন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ আগে থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং

> তোমরাই আমাদের ঈর্ষা করছো। না! বস্তুত তারা এসব বিষয়ের সামান্যই বোঝে।" (সূরা আল-ফাতহ, ৪৮: ১২-১৫)

মুনাফিকরা হুদাইবিয়ার সময় যেতে চায়নি, কারণ তারা ধরেই নিয়েছিল মুসলিমরা পরাজিত হবে। যখন তারা আবিষ্কার করলো মুসলিমদের কিছুই হয়নি, উল্টো আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য গনিমতের সম্পদের ওয়াদা করেছেন, তখন তারা যুদ্ধে যোগ দিতে আগ্রহী হয়ে উঠলো! এরা আসলে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে চায়নি, তারা বের হতে চেয়েছে দুনিয়ার সন্ধানে। তাদের এই হঠকারী আচরণের শাস্তি স্বরূপ পরবর্তী যুদ্ধে অর্থাৎ খাইবারের সময় তাদের যুদ্ধে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়।

তখন তারা বলাবলি করতে থাকে, 'তোমরা আমাদেরকে হিংসে করছো! তোমরা গনিমতের মাল সব নিজেরা ভোগ করতে চাও!' আল্লাহ তাআলা এদের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন -- এদের বোধশক্তি নেই। দুনিয়া ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না। সবকিছুকে কেবল টাকার অঙ্কে বিচার করে। দুনিয়াই তাদের সব, আল্লাহ বা আখিরাতের জন্য তাদের চিন্তা নেই। এটাই হচ্ছে সেকুলারিজম।

সন্ধির পেছনে হিকমাহ

> **"যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকতো, যাদের কথা তোমরা জানতে না, তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা যদি না থাকতো, অতঃপর সে কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা মক্কায় শক্তির সাথে প্রবেশের অনুমতি পেতে। কিন্তু তোমাদের হাতকে আল্লাহ বিরত রাখলেন যাতে তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর করুণার মাঝে নিয়ে আসতে পারেন। তারা যদি আলাদা থাকতো (অর্থাৎ মক্কার মু'মিনরা যদি কাফিরদের থেকে আলাদা থাকতো), তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে শাস্তি দিতাম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৫)**

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুদ্ধ বাধার অনুকূল পরিস্থিতি বারবারই তৈরি হয়েছে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সেটা হয়নি। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন মক্কার মু'মিনরা যেন হেফাযতে থাকে। মুসলিম বাহিনী যদি যুদ্ধ করে মক্কায় প্রবেশ করতো, তাহলে মক্কার মুসলিম নারী-পুরুষ নিহত হতো। এজন্যই আল্লাহ তাআলা মুসলিম ও কাফির উভয় বাহিনীকেই যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছেন। আর যুদ্ধ না হওয়ার ফলে মক্কার বহু লোক ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেল। মুসলিম হয়ে গেল। এ সবই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা এবং আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনার অংশ। যুদ্ধ করা যাবে না--এমন কোনো হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ফয়সালা এসেছিল। মুসলিম বাহিনী যদি তাড়াহুড়ো করতো, তাহলে যুদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সংযমের ওপর দাখিল রাখেন, আর এটাই মুসলিমদের জন্য পরবর্তীতে সুফল বয়ে আনে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সত্য স্বপ্ন

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চান তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, নিরাপদে, মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়, তখন তোমাদের মাঝে কারো প্রতি কোনো ভয় থাকবে না। তিনি জানেন যা তোমরা জানো না। এবং তিনি তোমাদের জন্য আয়োজন করেছেন একটি আসন্ন বিজয়।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৭)

আল্লাহ বলছেন হুদাইবিয়ার আগে যে স্বপ্ন তিনি নবীজিকে ﷺ দেখিয়েছেন সেটা একদিন অবশ্যই সত্য হবে। সত্যিই তা-ই হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ও সাহাবিরা হজ্জ করেছিলেন, যা ইতিহাসে 'বিদায় হজ্জ' নামে পরিচিত। সেদিন কারো মনে কোনো ভয় ছিল না।

সাহাবিদের বৈশিষ্ট্য

> "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, আপনি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবেন। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মতো, যে তার কচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের কিছু গুণাবলির কথা বলেছেন।

১. তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর।

২. তারা নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ মুসলিমদের প্রতি কোমল। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বর্তমানে এমন কিছু মুসলিম আছে যারা এই কুরআনের এই বিবরণ থেকে একশো আশি ডিগ্রি বিপরীত। তারা মুসলিমদের প্রতি শক্ত আর কাফিরদের প্রতি দরদে বিগলিত।

৩. তাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের সালাত। তারা আল্লাহর করুণার আশায় সালাত আদায় করবে।

৪. সিজদা তাদের চেহারায় চিহ্ন তৈরি করেছে। এখানে সিজদার ফলে কপালে যে কালো দাগ পড়ে, সেটার কথা বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে সিজদার কারণে চেহারা দিয়ে যে নূর বের হয় তার কথা।

৫. মু'মিনদের মাঝে দৃঢ়তা থাকবে। তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি গভীর শেকড়যুক্ত মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের মতো। জীবনের বিপদ আপদ বা পরীক্ষা তাদের টলাতে পারে না। তাদের এই দৃঢ়তা কাফিরদের ক্ষোভের কারণ হবে। তারা হবে কাফিরদের চক্ষুশূল।

খাইবারের যুদ্ধ

প্রেক্ষাপট

খাইবারের ইহুদিরা মাক্কী যুগে কিংবা মদীনার প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করেনি। কিন্তু বনু নাযিরের নেতাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে মুসলিমদের প্রতি তাদের মনোভাব বদলে যেতে থাকে। বনু কায়নুকা, বনু নাযির এবং বনু কুরায়যা -- এই তিনটি গোত্রকেই পর্যায়ক্রমে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বনু নাযিরকে বের করে দেওয়া হলে তারা আশ্রয় নিয়েছিল খাইবারে। আর এরপর থেকেই খাইবারের ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে বিদ্বেষ দেখাতে শুরু করলো। কেননা বনু নাযিরের বিভিন্ন নেতা যেমন সালাম ইবন আবি আল-হুকাইক, কিনানাহ ইবন আবি আল-হুকাইক, হুয়াই ইবন আখতাব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ খাইবারের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তারাই খাইবারের ইহুদিদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে উসকে দেয়। খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ এবং গাতফানকে এক করে সম্মিলিত সামরিক জোট গঠন করে এবং গাতফানকে বিপুল অর্থ দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এভাবেই নিরপেক্ষ খাইবার হঠাৎ করেই মুসলিমদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের সময়টা ছিল তাদেরকে আক্রমণ করার সবচাইতে উপযুক্ত সময়। কেননা ততদিনে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশদের দশ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই খাইবার আক্রমণ করা হলে কুরাইশদের থেকে প্রতিরোধের কোনো সম্ভাবনা নেই।

অভিযানের সূচনা

খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম বর্ষে। হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদন করে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের বিশ দিনের মাথায় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের নিয়ে খাইবার অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। গোটা আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল খাইবারে। মুসলিমরা জানতেন খাইবারে তাদের বিজয় হবেই। কারণ কয়েকদিন আগেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খাইবারে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন।

> "...তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন আসন্ন বিজয় দিয়ে। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে..." (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১৮-১৯)

সাহাবিরা উদ্যমের সাথে পথ চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে আমীর ইবন আল-আকওয়াকে ﵁ বলা হলো নাশীদ তৈরি করতে। আমীর ইবন আল-আকওয়া ছিলেন সালামা ইবন আল-আকওয়ার চাচা। বেদুইনদের গান গাওয়ার বিশেষ একটা ভঙ্গি

ছিল। তাদের নাশীদ উটের উপর অন্যরকম প্রভাব ফেলত। উটগুলো চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন নাশীদগুলো অনেকটা গরমের দিনের এক গ্লাস লেবুর শরবতের মতো কাজ করতো। নাশিদ শুনে তারা চাঙ্গা হয়ে উঠত।

আমীর ইবন আল-আকওয়া নাশিদ ধরলেন, নাশীদটির অর্থ বাংলায় অনেকটা এমন,

ও আল্লাহ! তুমি ছাড়া কীভাবে আমরা পথের দিশা পেতাম--
কীভাবে জানতাম সালাতের কথা, দান-সাদাকাই বা কীভাবে করতাম?
ও আল্লাহ, তোমার কাছেই আমাদের আর্তি
আমাদের ক্ষমা করে দাও, যত ভুল আমাদের সব মুছে দাও
তোমার জন্য আমাদের কুরবান হয়ে যেতে দাও
আমাদের আর্তি শুনে নাও ইয়া রব!
তোমার শান্তির ঝর্ণা ঝরিয়ে দাও,
শত্রুর মুখে আমাদের পাগুলো যেন ইস্পাতের চেয়েও দৃঢ় হয়ে যায়
ওরা আর কত ভয় দেখাবে আমাদের?
যতোই ভয় দেখাক, আমরা দমব না।
ওরা তো সেই কবেই আমাদের বিরুদ্ধে বুনো নেকড়ের দলকে হন্যে হয়ে ডেকে চলেছে।

গানের কথাগুলো রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব মনে ধরল। তিনি মুগ্ধ হয়ে জানতে চাইলেন, কে এই নাশীদ গাইছে? সাহাবিরা আমীর ইবন আল-আকওয়ার নাম বললেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর জন্য দুআ করলেন, 'ইয়ারহামুহুল্লাহ' -- আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুক।

এ কথা শোনামাত্র সাহাবিরা বুঝে গেলেন, আমীর ইবন আল-আকওয়ার জন্য শাহাদাত অপেক্ষা করে আছে। শাহাদাত আর ক্ষমা -- এই দুই বস্তু যে আলো আর ছায়ার মতো একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে সেটা সাহাবিরা ভালোভাবেই জানতেন। আলো থাকলে যেমন ছায়া হবেই, আল্লাহর পথে শহীদ হলেও তেমনি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে ইয়ারহামুহুল্লাহ শুনে উমার ইবন খাত্তাব উতলা হয়ে নবীজিকে ﷺ বলে উঠলেন 'আল্লাহর রাসূল! শাহাদাত তো আমীর ইবন আল-আকওয়ার জন্য অবধারিত হয়ে গেল! ইশ, আল্লাহ যদি আমাদেরও তা দিয়ে ধন্য করতেন!'

আব্বাদ ইবন বিশরকে পাঠানো হলো ইহুদিদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে। এখনকার মতো সেই সময়েও যুদ্ধকে ঘিরে প্রোপাগান্ডা চলতো। মদীনায় ইহুদিদের পরিণতি দেখে খাইবারের ইহুদিরাও বেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। কিন্তু তারা প্রোপাগান্ডা ছড়াতে লাগলো এই বলে যে, তাদের বাহিনী ভীষণ শক্তিশালী, অবরোধের মধ্যেও তারা কয়েক বছর টিকে থাকার সামর্থ্য রাখে ইত্যাদি। অবশ্য এসব প্রোপাগান্ডায় মুসলিমরা মোটেও দমলেন না, তারা খাইবারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এরপর দুআ করলেন।

'হে আল্লাহ! আপনি আসমান ও তার ছায়াতলে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক! আপনি জমিনে যা কিছু হয় তার প্রতিপালক! আপনি শয়তান ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রতিপালক! আপনি বাতাস ও যা কিছু সে বাতাস উড়িয়ে নেয় সেসবের প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে এই জনপদ এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে নিহিত কল্যাণ প্রার্থনা করছি। এর মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে, সেসবের প্রার্থনা আপনার কাছে করছি। এই জনপদের বাসিন্দা এবং তাদের যত অকল্যাণ, সেসব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।'

এই বলে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও!'

রাতের বেলা মুসলিম বাহিনী আর-রাযী উপত্যকায় তাঁবু ফেললেন। জায়গাটি ছিল খাইবার এবং গাতফানের মাঝে, যেন গাতফান থেকে খাইবারে কোনো প্রকার সাহায্য আসতে না পারে। পরদিন সকালে খাইবারের ইহুদিরা নিত্যদিনের কাজকর্ম করার জন্যে সকাল বেলা দুর্গ থেকে বাইরে বেরোচ্ছিল। হঠাৎ তারা আবিষ্কার করলো দিগন্ত জুড়ে মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের ঘিরে রেখেছে। আতঙ্কিত ইহুদিরা 'মুহাম্মাদের বাহিনী, মুহাম্মাদের বাহিনী' বলে চিৎকার করতে করতে দুর্গের ভিতরে ঢুকে গেল। মুসলিমরা দুর্গ অবরোধ করলেন। অথচ খাইবারের এই ইহুদিরা কিছুদিন আগেও গর্ব করে বলে বেড়াত, 'আমরা অন্যদের মতো নই। আমাদের সাথে যুদ্ধ করা অন্য আরবদের সাথে করা যুদ্ধের মতো চাট্টিখানি কথা নয়।' শক্তিশালী দুর্গ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সামরিক শক্তিমত্তা আর তাদের বিখ্যাত যোদ্ধাদের নিয়ে তাদের বড়াইয়ের অন্ত ছিল না। কিন্তু যেই মাত্র তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ বাহিনী দেখলো, তাদের যাবতীয় আস্ফালন ফুটো বেলুনের মতো চুপসে তো গেলই, ভয়ে যেন তারা আধমরা হয়ে গেল। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'শত্রুর মনে ভীতি তৈরির মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে বিজয় দান করেন।'

মুখোমুখি মুসলিম এবং খাইবারের ইহুদিরা

খাইবার ছিল এক বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দুর্গের সমাহার। এই দুর্গগুলো খাইবারের বিভিন্ন স্থানে, পাহাড় পর্বতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ কারণে খাইবার যুদ্ধ ইহুদিদের সাথে আগের সব যুদ্ধগুলোর তুলনায় বেশ জটিল ছিল। অবস্থানগত দিক থেকেও খাইবার ছিল সুরক্ষিত একটি এলাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক এক করে সবগুলো দুর্গ জয় করার জন্য অগ্রসর হলেন। শুরু হলো নাঈম দুর্গ দিয়ে।

যুদ্ধ শুরু হলো। ইহুদিদের এক সাহসী যোদ্ধা বেরিয়ে এল, তার নাম মারহাব। সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ডাক দিল। মুসলিমদের মধ্য থেকে এগিয়ে গেলেন আমীর ইবন আল-আকওয়া رضي الله عنه, যার কথা একটু আগেই এসেছে। তিনি খাইবারের যাত্রাপথে নাশীদ

গেয়ে সবাইকে চাঙ্গা করে রেখেছিলেন। দু'জন দু'জনকে আঘাত করে কাবু করতে চাইলেন। এক পর্যায়ে মারহাব তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে চাইলে সেই তলোয়ার আমীরের ঢালে আটকে যায়। সেই সুযোগে আমীর মারহাবের উরুতে আঘাত করে তাকে শেষ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর তলোয়ার ছোট হবার কারণে আঘাত করতে গিয়ে তলোয়ার ধাক্কা খেয়ে তার নিজের হাঁটুতে লাগে। এই আঘাত থেকে শুরু হয় রক্তক্ষরণ আর সেই রক্তক্ষরণ থেকে মৃত্যু। এভাবেই আমীর শহীদ হয়ে গেলেন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ কবুল হলো। এরপর আমীরের জায়গায় আসলেন আলী। এসেই মারহাবকে হত্যা করলেন। অবশ্য অন্য বর্ণনামতে মারহাবকে হত্যা করেছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ।

জীবন সবসময় মানুষের পরিকল্পনামাফিক চলে না। আমীর বীরের মতো শত্রুর দিকে আঘাত হানতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে নিজেই নিজের তরবারিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো আমীরের সকল আমল ধ্বংস হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। চাচার ব্যাপারে এই কথা শুনে সালামা ইবন আল আকওয়ার ﷺ খুব মন খারাপ হলো। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। সালামা ﷺ জানতে চাইলেন, 'আমার চাচার সকল আমল কি ধ্বংস হয়ে গেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ? রাসূল ﷺ তাকে আশ্বাস দিয়ে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'যে এই কথা বলেছে সে মিথ্যে বলেছে। আমীর দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে!'

ইহুদিদের এই নাঈম দুর্গ মুসলিমদের পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবরোধের প্রথম কিছুদিন আবু বকরের ﷺ হাতে ছিল মুসলিম বাহিনীর পতাকা। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে বিজয় আসছিল না। সবাই যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘোষণা দিলেন,

> *'আগামীকাল আমি এমন একজনকে পতাকা দান করবো যার জন্যে আল্লাহ দুর্গের দরজা খুলে দিবেন। সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, এবং আল্লাহ আর তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসে।'*

এই ঘোষণা যেন টনিকের মতো কাজে দিল। সবার ক্লান্তি নিমিষে কোথায় চলে গেল। কার হাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ পতাকা তুলে দেবেন সেটা ভেবে সবাই রোমাঞ্চিত বোধ করতে লাগলেন। পরদিন সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর কাছে জড়ো হলেন। মনে মনে সবাই আশা করছিলেন -- ইশ! আল্লাহর রাসূল যদি আমার হাতে পতাকা তুলে দিতেন! উমার ইবন খাত্তাব নিজেই বলেছেন তার মনে সেদিন কী ছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি কোনোদিন নেতৃত্ব বা পদের আকাঙ্ক্ষা করিনি। তবে খাইবারের সেই দিনে আমার মনে নেতৃত্বের আশা জেগেছিল।'

সবাইকে ছাপিয়ে সেদিন যিনি পতাকা লাভ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আলী ইবন আবি তালিব ﷺ। কিন্তু যিনি এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হলেন, তিনি নিজেই ছিলেন

অনুপস্থিত। সকাল বেলা আলী সেখানে ছিলেন না। সাহাবিরা জানালেন আলী চোখের সমস্যায় ভুগছেন। রাসূল ﷺ আলীকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর মুখের কিছু লালা আলীর ﷺ চোখে লাগিয়ে দিলেন আর সাথে সাথে আলী সুস্থ হয়ে উঠলেন। আল্লাহর রাসূলের আরও একটি মু'জিযা। এরপর তার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, 'এগিয়ে যাও! আল্লাহ বিজয় দান করা পর্যন্ত পিছু হটো না।' আলী ﷺ জানতে চাইলেন, 'কোন কথার উপর আমি লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে -- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। যখনই তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে তখনই তাদের জান-মাল তোমার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে (আইনগত) অধিকারের কথা হলে ভিন্ন। আর তাদের (আন্তরিকতার) হিসাব আল্লাহর কাছে।'[৪০]

আলী হুংকার দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। সাহাবিরাও তার পিছু পিছু ছুটছেন। দুর্গের সামনে এসে পতাকাটি পাথরের মধ্যে গেঁথে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে ইহুদিরা জিজ্ঞেস করলো,

- কে তুমি?

- আমি আলী ইবন আবি তালিব।

- তাওরাতের কসম! তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছো!

দশ দিনের মাথায় শেষ পর্যন্ত আলীর নেতৃত্বে নাঈম দুর্গ জয় হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূলের ওয়াদা সত্য হলো। এরপর মুসলিমরা অগ্রসর হলেন আস-সা'ব দুর্গের দিকে। তিন দিনের মাথায় আস-সা'ব দুর্গ জয় হলো। এ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন আল-হাব্বাব ইবন আল-মুনযির ﷺ। এই দুর্গ জয়ের মাধ্যমে মুসলিমরা অনেক খাদ্যের সন্ধান পেলেন। এরপর তারা অগ্রসর হলেন আয-যুবাইর দুর্গের দিকে। সেখানে তাদের অবরোধ করে তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার তিন দিনের মাথায় তারা যুদ্ধ করতে নেমে আসলো এবং পরাজিত হলো।

এরপর মুসলিম সেনাবাহিনী অভিযান চালালো উবাই দুর্গে। গোলাবর্ষণের মাধ্যমে খুব সহজে উবাই দুর্গ আয়ত্তে চলে আসলো। এরপর মুসলিমরা একে একে জয় করলেন আল-কামূস, আল-ওয়াতীহ এবং আস-সুলালাম দুর্গ। চৌদ্দ দিন অবরোধ করে রাখার পর এই দুর্গের ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। এভাবেই বিজয় হলো সমগ্র খাইবার। এরপর ইহুদিরা অস্ত্র ছেড়ে সন্ধি আলোচনার জন্য নেমে আসে। এ যুদ্ধে নিহত হয় তিরানব্বই জন ইহুদি। আর মুসলিমদের থেকে শহীদ হন পনেরো থেকে বিশ জন, আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[৪০] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ২৫০।

খাইবারের কিছু ঘটনা

১) আল্লাহর সাথে সততা: নাম-না-জানা এক বেদুইনের গল্প

খাইবার যুদ্ধের আগে এক বেদুইন মুসলিম হন এবং যুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধ জয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের মধ্যে গনিমতের সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করলেন। দীর্ঘ দিনের দারিদ্র্যের পর মুসলিমরা কিছু সম্পদ লাভ করেছে। সেই বেদুইনের ভাগেও গনিমতের কিছু সম্পদ পড়ল। রাসূল ﷺ সেগুলো এক সাহাবিকে দিয়ে বললেন সেই বেদুইনের কাছে তার প্রাপ্য ভাগ বুঝিয়ে দিতে। সেই সাহাবি বেদুইনের কাছে সম্পদ নিয়ে এলে বেদুইন লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- এগুলো কী?

- এগুলো হচ্ছে তোমার গনিমতের অংশ।

উত্তরটা শুনে বেদুইন সাহাবির যেন মন ভরলো না। তিনি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে গেলেন। জানতে চাইলেন,

- এগুলো কী?

- এগুলো হলো তোমার গনিমতের অংশ।

- ও আল্লাহর রাসূল, আমি তো গনিমতের আশায় মুসলিম হইনি! আমি তো আপনার অনুসরণ করেছি এজন্যে যে আমার এইখানে আঘাত লাগবে, আমি শহীদ হবো আর জান্নাত লাভ করবো!

কথাগুলো সে বললো নিজের ঘাড়ের দিকে হাত ঠেকিয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি যদি আল্লাহর সাথে সৎ হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ তোমার এই কথাকে সত্যি করবেন।'

কিছুকাল পরের কথা, অন্য আরেকটি যুদ্ধে সেই বেদুইন মারা গেলেন। অবাক করা বিষয় হলো খাইবার বিজয়ের দিনে তিনি শরীরের যে দিকে নির্দেশ করেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান। তার মৃতদেহ আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনে আনা হলে তিনি জানতে চাইলেন, 'এই কি সেই লোক?' সাহাবিরা বললেন, 'হ্যাঁ, এই সেই লোক।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গায়ের চাদর খুলে সেই বেদুইনের গায়ে জড়িয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ চাদর জড়ানো অবস্থাতেই তাকে দাফন করা হয়। নাম-না-জানা এক বেদুইন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাদরকে নিজের কাফন হিসেবে পেয়ে গেলেন! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করেছে এবং শহীদ হয়েছে। আমি এর সাক্ষী থাকলাম।'[81]

---

[81] সুনান নাসাঈ, অধ্যায় জানাযা, হাদীস ১৩৭।

২) নাম-না-জানা এক আবিসিনিয়ান রাখালের গল্প

খাইবারের যুদ্ধের খানিক আগের কথা, খাইবারের এক আবিসিনিয়ান রাখাল দেখলো সেখানকার অধিবাসীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে জানতে চাইলো তারা কার সাথে যুদ্ধ করবে। তারা উত্তর দিলো, 'আমরা এমন লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি যে দাবি করে সে আল্লাহর নবী।' এ কথা শুনে তার মনে পড়ে গেল নবীজির কথা। তাঁর কথা সে আগেও শুনেছে। সে সোজা চলে গেল মুসলিমদের ক্যাম্পে, দেখা করলো আল্লাহর রাসূলের সাথে, জানতে চাইলো ইসলাম সম্পর্কে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন,

- আমি মানুষকে আহ্বান করি ইসলামের দিকে, যেন মানুষ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি হচ্ছি আল্লাহর রাসূল এবং মানুষ যেন কেবল আল্লাহর ইবাদাত করে।

- যদি আমি সাক্ষ্য দিই, আল্লাহর উপর ঈমান আনি, তাহলে আমি বিনিময়ে কী পাবো?

- তুমি পাবে জান্নাত।

সেই আবিসিনিয়ান রাখালের জন্য এতটুকুই ছিল যথেষ্ট। সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং জিহাদে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল। জিহাদে কেন যেতে হবে, কবে যেতে হবে, সালাতের আহকাম কী -- এসব নিয়ে সে কোনো তর্ক করলো না। শুধু এতটুকুই জানতে চাইলো, তার সাথে যে ভেড়াগুলো আছে সেগুলো সে কী করবে। আসলে এটাই ছিল সময়ের দাবি। সেই আবিসিনিয়ান রাখাল, সে ছিল একজন দাস, সে যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। যুদ্ধের পর তার লাশ আনা হলো, রাসূলুল্লাহ বললেন,

> *'এ হচ্ছে এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন এবং তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে খাইবারের ময়দানের দিকে ধাবিত করেছেন। নিশ্চয়ই আমি তার পাশে দেখেছি জান্নাতের দুই হুরকে, অথচ সে এক ওয়াক্ত সালাতও কখনো আদায় করেনি (অর্থাৎ আদায়ের সুযোগ হয় নি)।'*[82]

৩) যুদ্ধের ময়দানের একজন হিরো, আখিরাতের খাতায় যার প্রাপ্তি শূন্য

এই যুদ্ধে এক মুসলিম সৈনিক প্রচণ্ড বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। শত্রুপক্ষের কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। সাহাবিরা তাকে দেখে বলাবলি করছিলেন এই লোকের জান্নাত বুঝি নিশ্চিত! কিন্তু রাসূল ﷺ বলে উঠলেন, 'এই লোক জাহান্নামে যাবে।' সাহাবিরা কথাটা শুনে চমকে উঠলেন। এমন বীরের মতো যোদ্ধা জাহান্নামে যাবে এটা কারো বিশ্বাসই হচ্ছিল না! একজন সাহাবি সেই সৈনিকের পিছু নিলেন, তিনি দেখতে চান এই লোকের সাথে কী হতে চলেছে। তিনি দেখলেন, যুদ্ধ করতে

---

[82] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭।

করতে সেই লোকটি একসময় বেশ আঘাত পেল, আর আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেললো। প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবি এবার রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ছুটে গেলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী চোখের সামনে সত্য হতে দেখে দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল!' এরপর রাসূল ﷺ সেই সাহাবিকে বললেন, 'যাও, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, শুধুমাত্র মু'মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তাআলা চাইলে একজন ফাসিক্ব লোককেও তাঁর দ্বীনের কাজে লাগাতে পারেন।'[83]

৪) আবু ইয়াসার কা'ব ইবন আমরের ﷺ কাহিনী

ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন সাহাবি, খাইবারের যুদ্ধে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

'খাইবারের এক সন্ধ্যায় আমরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে ছিলাম। এমন সময় দেখলাম এক ইহুদি ভেড়ার পাল নিয়ে দুর্গের ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে। সে সময় আমরা দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বললেন, কে আমাকে এই ভেড়ার পালগুলো থেকে ভেড়া ধরে এনে খাওয়াতে পারবে? আমি বললাম, আমি পারবো! রাসূল ﷺ তখন বললেন, যাও! নিয়ে এসো!

আমি উটপাখির মতো জোরে দৌড়াতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্যে দুআ করলেন এই বলে -- হে আল্লাহ আমাদেরকে তার সঙ্গ দ্বারা উপকৃত করো। আমি যখন ভেড়ার পালকে নাগালে পেলাম তখন পালের প্রথম ভেড়াটি দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাই আমি পালের শেষ দিকের দুটো ভেড়া ধরে বগলদাবা করে এত জোরে দৌড় দিলাম যে আমার মনে হচ্ছিল আমার সাথে কিছুই নেই! এরপর সেগুলো আল্লাহর রাসূলের কাছে ছুঁড়ে মারলাম। তারপর সেই ভেড়া জবাই করা হলো এবং সবাই খুব তৃপ্তি সহকারে খেল।'

ঘটনাটি মজার, কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আবু ইয়াসার কেঁদে দেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহচর্য পাবার দুআ করেছিলেন আর যে কারণে তিনি ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম: তার বন্ধুরা অনেকেই তার আগে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান, আর তিনি রয়ে যান।

৫) আল্লাহর রাসূলের ﷺ জন্য ভালোবাসা: উমাইয়্যা বিনত আবি আস-সালতের ﷺ কাহিনী

তিনি ছিলেন গিফার গোত্রের। খাইবারের সময়ের ঘটনা, গিফারের এক মহিলা আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'আমরা আপনার সাথে ময়দানে যেতে চাই,

[83] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ২৪২।

যাতে আমরা আহতদের সেবা করতে পারি এবং মুসলিমদের অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করতে পারি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হলেন। গিফার গোত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে, এরা ছিল ডাকাত গোছের একটি কুখ্যাত গোত্র। কিন্তু আবু যার আল গিফারীর ؓ বদৌলতে এই গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। আর ইসলামের আলো তাদের পুরোপুরি বদলে দেয়।

গিফার গোত্রের মহিলারা মুসলিম বাহিনীর সাথে খাইবারের দিকে যাত্রা শুরু করল। সেই দলের এক বাচ্চা মেয়েকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর উটের পেছনে তুলে নিলেন। উটের পিঠে অনেক মাল-সামান টাল করে রাখা। বাচ্চা মেয়েটাকে বসানো হলো সেই মালের স্তূপের ওপর।

সকাল বেলা হলে যাত্রাবিরতির সময় হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ উট থেকে নেমে পড়লেন। বাচ্চা মেয়েটি নামতে গিয়ে দেখলো মালামালের ওপরে যেখানে সে বসে ছিল সেখানে কিছু রক্ত লেগে আছে।

মেয়েটি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল, এ কী হয়ে গেল! এমন কাণ্ড ঘটবে সে তো কল্পনাই করেনি! সে চুপটি করে উটের পাশে বসে রইলো। নবীজি ﷺ এর ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি। মা যেভাবে করে তার সদ্যজাত শিশুর জন্য প্রতিমুহূর্তে খেয়াল রাখে, সাহাবিদের সবার জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ তার চেয়েও বেশি খেয়াল থাকতো। তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন বাচ্চা মেয়েটা কেমন এক অস্বস্তিতে গুটিসুটি মেরে আছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার? হায়েজ হয়েছে?' মেয়েটি সংক্ষেপে বললো, 'হুঁ।' কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে নবীজি তাকে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি পরিষ্কার হয়ে নাও। এরপর একটা জগে পানি আর কিছু লবণ নিয়ে মালামাল থেকে রক্তগুলো পরিষ্কার করে ফেলো। আর এরপর আবার উটের পিঠে বসে পড়ো।'

সেই বাচ্চা মেয়ে নবীজির ﷺ কথামতো সবকিছু করলো। যুদ্ধের পর গনিমাহ ভাগাভাগি করার সময় এল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুদ্ধে অংশ নিলেও নারী ও শিশুরা গনিমত পায় না। তবে আমীর চাইলে তাদের কিছু অংশ দেওয়ার অধিকার রাখেন। গনিমতের সম্পদ থেকে নবীজি সেই ছোট্ট উমাইয়্যার জন্য একটা গলার হার নিলেন। তারপর নিজ হাতে তাকে সেটা পরিয়ে দিলেন।[84]

আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে উমাইয়্যা খুব অল্প কিছু মুহূর্তই কাটিয়েছে। কিন্তু সেই সময়টি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। দেখতে দেখতে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি একদিন বড় হলেন। কিন্তু খাইবারের সেই অসাধারণ মুহূর্তের কথা তিনি আজীবন মনে রেখেছেন। সেদিনের পর থেকে জীবনে যতবার তার ঋতুস্রাব হয়েছে, প্রত্যেক বার তিনি পানি আর লবণ ব্যবহার করে পবিত্র হতেন, একবারের জন্যেও এর অন্যথা

[84] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

হয়নি! তার জীবনের শেষ ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পরেও যেন তাকে এভাবেই পরিষ্কার করা হয়। সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে যখন বৃদ্ধা হয়ে গেলেন, তখন এই হাদীস সংগ্রহকারীর কাছে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! যে হার আমার ছোটবেলায় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই হার আমি কখনো খুলিনি!' মৃত্যু এসে তাকে এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো, তখনো তার গলায় সেই হার ঝুলছে, যেন আখিরাতের সেই সুদীর্ঘ একাকী সফরে পা বাড়ানোর সময়েও আল্লাহর রাসূলের ﷺ স্নেহটুকু তিনি বুকে করে যাত্রা শুরু করলেন।

সম্মানিত পাঠক! এই ঘটনার উপর মন্তব্য করে এর সৌন্দর্য নষ্ট না করাই শ্রেয়। ছোট্ট অথচ অনন্যসাধারণ এই গল্পটা যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকুক। আল্লাহর রাসূলকে তাঁর সাহাবি আর সাহাবিয়াতরা কতটা ভালোবাসতেন তা আসলে লিখে বা বলে কখনই বোঝানো যাবে না। তাদের ভালোবাসার গভীরতা হয়তো আমরা কিছুটা আঁচ করতে পারবো যখন এই গল্পগুলো আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আল্লাহর রাসূল সেই ছোট্ট মেয়েটিকে বলেননি যে নিজেকে পবিত্র করতে চাইলে সবসময় পানি আর লবণই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তবু তিনি সারাজীবন ধরে রাসূলের কথাটা মান্য করেছেন --- এটাই হচ্ছে ভালোবাসা। কাউকে ভালোবাসলে মানুষ তাকে মনে রাখে. তার ছোট ছোট কথাগুলিও যত্ন করে স্মরণ করে, তার বলা কাজগুলো মমতা নিয়ে আগ্রহের সাথে করে যায়। সাহাবিদের কাছে রাসূলুল্লাহর ﷺ স্থান ছিল তাদের অন্তরের গভীরে। তাঁরা তাঁকে শুনতেন আর একবাক্যে মেনে নিতেন। শুধু তাহারাতের ফিক্বহ পড়ে এই ভালোবাসাকে উপলব্ধি করা যাবে না।

সেই বেদুইন নারীর নাম কী ছিল সেটাও আসলে নিশ্চিত নয়, কেউ বলেন উমাইয়্যা, কেউ বলেন আমীনাহ, আল্লাহই ভালো জানেন। তার নাম যা-ই হোক, তিনি আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে তার ছেলেবেলার সেই অল্প কিছু মুহূর্ত মনে রেখেছিলেন সারাটি জীবন ধরে। সেই ছোট্ট বয়সে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ বাহিনীর সাথে যাবেন বলে, তাদের সাহায্য করবেন বলে। কী অসাধারণ ত্যাগ তিতিক্ষা আর ভালোবাসাই দেখিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূলের চারপাশের মানুষগুলো। পাঠক, আজকে আমাদের অবস্থা কোথায়, আমরা কী তা ভেবে দেখেছি?

আল্লাহর রাসূল ﷺ যেমন ছিলেন, তেমন ছিলেন তার চারপাশের মানুষগুলো। কোথাকার এক বেদুইন মেয়ে, নিতান্ত সাধারণ এক গোত্রের অতি সাধারণ এক বালিকা। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ কত যত্ন আর আদরভরেই না তার সাথে কথা বলেছেন! যুদ্ধের পর এত এত সৈনিকের মাঝে আলাদা করে তার নাম ধরে তাকে ডেকেছেন, নিজ হাতে তার গলায় হার পরিয়ে দিয়েছেন! সত্যিই তিনি ছিলেন সৃষ্টির সেরা। তাঁর আচরণ ছিল অভাবনীয় রকমের সুন্দর, আর উম্মাতের প্রতি তাঁর মায়া এবং ভালোবাসা ছিল নিখাদ। যে মানুষগুলো তাঁর জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উন্মুখ হয়ে থাকতো, তাদের তিনি কখনো ভুলে যাননি। স্নেহের চাদরে মুড়ে সবসময় তাদের আগলে রেখেছেন।

৬) আল্লাহর রাসূলকে ﷺ হত্যার চেষ্টা

খাইবারের ইহুদিরা পরাজিত হবার পর নবীজি ﷺ এবং তাঁর কিছু সাহাবিদের দাওয়াত করেন। সাহাবিদের জন্য তারা ভেড়ার মাংস রান্না করে দিলো। আপ্যায়ন করা আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবীজিকে হত্যা করা। যাইনাব বিনতে আল-হারিস নামের এক ইহুদি মহিলা এজন্য সেই মাংসে বিষ মিশিয়ে দেয়। রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে খেতে বসলেন। তারা কেউ ভাবতে পারেনি দাওয়াতের খাবারে বিষ মেশানো থাকতে পারে। বিশর ইবন আল-বারা ؓ নিশ্চিন্ত মনে মাংস মুখে নিলেন। নবীজিও ﷺ মাংস মুখে নিলেন কিন্তু গিলে ফেলার আগেই মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন এই খাবারে বিষ মেশানো আছে। ওদিকে বিশর ইবন আল-বারা ততক্ষণে মাংস গিলে ফেলেছেন।

সেই মহিলাকে ডাকা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো সে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ মিশিয়েছে কিনা। সে স্বীকার করলো। নবীজি ﷺ তার এই কাজের কারণ জানতে চাইলেন। মহিলা উত্তর দিল, 'আপনি যদি মিথ্যা নবী হন তাহলে এই বিষে আপনি মারা যাবেন। আর যদি আপনি সত্য নবী হন তাহলে আল্লাহ আপনাকে তা জানিয়ে দেবেন।'[85] রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার উপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি আল্লাহ তোমাকে দেননি।'

রাসূল ﷺ মহিলাকে তখন ছেড়ে দিলেন। এই বিষের কারণে বিশর ইবন আল-বারা মারা যান। কিছু বর্ণনামতে সেই মহিলাকে তখন হত্যা করা হয়।[86] এই ঘটনার পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও তিন বছর বেঁচে ছিলেন। নবীজির ﷺ শেষ দিনগুলোতে যখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন তখন আইশাকে ؓ বলেছিলেন, 'আইশা, আমি এখনো সেই খাবারের স্বাদ[87] পাই যা আমাকে খাইবারে খাওয়ানো হয়েছিল।'

খাইবারের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা

১) নেতৃত্বের প্রতি লোভের ভয়াবহতা

নেতৃত্বের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ থাকে। কিন্তু ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়ার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা হওয়া সত্ত্বেও আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব ؓ যখন নেতৃস্থানীয় পদ চেয়েছিলেন রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন, 'আমরা তাকে এই পদ দেবো না, যে এই পদের জন্যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।' এটাই ইসলামের শিক্ষা। উমারের ؓ ঈমানের উচ্চতা নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, নেতৃত্বের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহই ছিল না। কিন্তু খাইবারের সেইদিন উমারের মতো মানুষের মনেও নেতৃত্ব পাবার ইচ্ছে কাজ করছিল। এর কারণ হলো সেদিন

---

[85] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিযিয়া এবং সন্ধি স্থাপন, হাদীস ১১।

[86] যাদুল মা'আদ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০।

[87] এখানে বিষাক্ততার কথা বলা হচ্ছে।

এমন এক লোককে নেতৃত্ব দেওয়া হবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালোবাসেন এবং সেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ﷺ ভালোবাসে। নিঃসন্দেহে এত বড় সম্মান পেতে কার না ইচ্ছে করবে!

নেতৃত্বের প্রতি লোভ কতটা খারাপ সেটা আমরা বুঝতে পারি তিরমিযীর একটি হাদীসে, রাসূল ﷺ বলেন 'যদি দুটি নেকড়েকে একপাল ভেড়ার নিকট পাঠানো হয় তাহলে নেকড়েদের দ্বারা ভেড়াগুলো যতটা না ক্ষতির সম্মুখীন হবে তার চেয়েও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয় একজন মানুষ যখন সে সম্পদ এবং নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করে।' কাজেই নেতৃত্বের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা নির্মূল করা চাই, কারণ এই নেতৃত্বের বোঝা একদিন আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

২) জিহাদের উদ্দেশ্য

আলীর ﷺ হাতে যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ পতাকা তুলে দিচ্ছিলেন তখন তাকে বলে দিয়েছিলেন,

> *'...তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। আল্লাহর যে হক্ব তাদের আদায় করতে হবে সে ব্যাপারে তাদের অবহিত করবে। আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের চাইতেও মূল্যবান।'*

এই হাদীস থেকে আমরা শিক্ষা পাই, কাফিরদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদের একটি উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত দেয়া। মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করা, ইসলামের ছায়াতলে মানুষকে প্রবেশ করানো। জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাহিলিয়াতের প্রভাব এবং কুফর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা -- যেন ইসলাম গ্রহণের পথে মানুষের কোনো বাধা না থাকে।

জিহাদের সাথে অন্য যেকোনো যুদ্ধের পার্থক্য এখানেই। অন্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদ অর্জন, ক্ষুধার তাড়না, কিংবা ক্ষমতার লোভ। কিন্তু মুসলিমরা যুদ্ধ করে একটি পবিত্র উদ্দেশ্যে, তা হলো আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দেওয়া। রাসূল ﷺ বলেছেন 'আমি কিছু মানুষকে জান্নাতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে দেখেছি।' এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা এক সময় মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছে। রাসূল ﷺ আলীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর উচিত হবে আগে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। এই দাওয়াতের ফলে যদি একজন লোকও ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেটাই হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গনিমাহ।

৩) অন্তরের আন্তরিকতা

বেদুইন এবং আবিসিনিয়ান সেই রাখালের গল্প থেকে শিক্ষা হলো, কেউ যদি আল্লাহর পথে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। সেই বেদুইন যেমন মৃত্যু

চেয়েছেন, আল্লাহ তাকে ঠিক সেভাবে মৃত্যু দিয়েছেন। এর কারণ হলো তিনি ছিলেন সৎ এবং আন্তরিক। জিহাদের নিয়ত তার এতটা বিশুদ্ধ ছিল যে তিনি গনিমাহ পর্যন্ত চাননি। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমাকে তরবারি সহ পাঠানো হয়েছে এবং আমার রিযিক্ব তরবারির ছায়াতলে।' এ কারণে আলিমরা বলেন গনিমতের রিযিক্ব হলো শ্রেষ্ঠ রিযিক্ব। কিন্তু এই বেদুইন সাহাবি ঈমানের এমন উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে তিনি জান্নাত ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না। এবং তার এই চাওয়ার মাঝে কোনো খাদ ছিল না। তাই তিনি লাভ করেছিলেন এক বিরল সম্মান, আল্লাহর রাসূলের ﷺ চাদর। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওযুর পানির জন্য সাহাবিরা কাড়াকাড়ি করতেন। আর এই বেদুইন সাহাবি কোনো কাড়াকাড়ি ছাড়াই শুধুমাত্র নিয়তের বিশুদ্ধতার জোরে আল্লাহর রাসূলের ﷺ চাদর গায়ে জড়িয়ে কবরে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ এক বিরল সম্মান।

৪) গনিমতের সম্পদ চুরির ভয়াবহতা

ঘটনাটি ঘটে খাইবার অথবা খাইবার পরবর্তী ওয়াদী আল-কুরা অভিযানে। রাসূলুল্লাহর ﷺ এক সাহাবি ইহুদিদের তীরের আঘাতে মারা যান। একদল সাহাবি বলতে থাকেন, 'অমুক শহীদ হয়েছে! অমুক শহীদ হয়েছে!' কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'কিছুতেই না। গনিমতের মাল থেকে যে চাদর সে চুরি করেছে, আমি দেখেছি সেই চাদর তাকে আগুন হয়ে ঘিরে রেখেছে।'[৪৪] এই লোকটি ছিলেন একজন মুসলিম, একজন মুজাহিদ। কিন্তু গনিমতের সম্পদ চুরি করা এতই ভয়াবহ অপরাধ যে, এজন্য একজন মানুষকে জাহান্নামের আগুনে যেতে হয়।

খাইবার যুদ্ধের ফলাফল

খাইবারের ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করার পরে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে তাদের এই মর্মে চুক্তি হয় যে, তারা পরনের কাপড় পরে খাইবার ছেড়ে চলে যাবে এবং যাবতীয় অর্থ-সম্পদ, জায়গা-জমি, সোনা-রুপা, ঘোড়া, বর্ম সবকিছু রেখে যাবে। রাসূল ﷺ তাদেরকে বলে দিলেন যদি তারা কোনো অর্থ-সম্পদ লুকানোর চেষ্টা করে তাহলে এর জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। ইহুদিদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা নতুন কিছু নয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই জাতিটি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে।

চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে খাইবারের ইহুদিরা এবার কিছু সম্পদ লুকিয়ে ফেললো। এই সম্পদগুলো ছিল বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাবের। বনু কুরায়যার ঘটনায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। বনু নাযিরকে যখন বের করে দেওয়া হয়, তখন হুয়াই ইবন আখতাব বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার একটি চামড়ার মাঝে লুকিয়ে খাইবারে রেখে এসেছিল। তার সেই অঢেল সম্পদ তখনও খাইবারে ছিল। বিষয়টা আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতেন। কিনানা ইবন আর-রাবীকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হলো,

[৪৪] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঈমান, হাদীস ২১৭।

- হুয়াইয়ের সেই সম্পদ কোথায়?

- সেই সম্পদ তো যুদ্ধ আর আমাদের থাকা খাওয়ায় খরচ হয়ে গেছে।

- না, সেটা হতে পারে না। যুদ্ধ তো মাত্র সেদিন হলো। এই অল্প ক'দিনের মাঝে এই পরিমাণ সম্পদ খরচ হয়ে যাবার কথা না।

কিনানা তবু অস্বীকার করতে থাকলো। ইহুদিরা কত সাবলীলভাবে মিথ্যা বলতে পারে এই তার একটা নমুনা। পরে এক বুড়ো ইহুদি বললো, 'আমি হুয়াই ইবন আখতাবকে প্রায়ই অমুক জায়গায় ঘুরঘুর করতে দেখতাম।' সাহাবিরা তখন সে জায়গায় গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে সেই সম্পদের কিছু অংশের সন্ধান পেলেন। কিনানাকে জিজ্ঞেস করা হলো বাকি সম্পদ কোথায়। সে আবারও বললো সে কিছুই জানেনা। তাকে আল যুবাইর ইবন আওয়্যামের হাতে তুলে দেওয়া হলো। সোজা আঙুলে যখন ঘি ওঠে না, তখন তাকে বাঁকা করতেই হয়। তিনি তাকে মারধোর করে বাকি সম্পদের ব্যাপারে তথ্য বের করলেন। এরপর কিনানাকে তুলে দেওয়া হয় মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার ﷺ হাতে। এই সেই কিনানা যে তার ভাই মাহমুদ ইবন মাসলামাকে হত্যা করেছে। আজ সে তার হাতের মুঠোয়! তিনি কিনানাকে হত্যা করে ভাই হত্যার প্রতিশোধ নেন।[89]

দুর্গ থেকে বের হয়ে ইহুদিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুরোধ করলো যেন তাদেরকে খাইবারে থাকতে দেওয়া হয়। তারা বললো, 'আমরা আপনাদের চাইতে এই ভূমি চাষাবাদে বেশি দক্ষ।' এই কথা বলে আসলে তারা খাইবারে তাদের থাকতে দেওয়ার জন্য নবীজিকে মানানোর চেষ্টা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন। উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক ইহুদিরা পাবে -- এই শর্তে ইহুদিরা খাইবারে থেকে যাওয়ার অনুমতি পেল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শর্ত আরোপ করে দিলেন। তা হলো -- মুসলিমরা যখন চাইবে, তখনই তাদেরকে খাইবার থেকে বের করে দেওয়ার অধিকার রাখে।

ইহুদিদের খাইবারে চাষাবাদ করতে দেওয়াটা মুসলিমদের জন্য লাভজনক ছিল। কেননা সাহাবিদের হাতে জমি দেখাশোনা করার সময় ছিল না। তারা ব্যস্ত ছিলেন ইলম, দাওয়াহ আর জিহাদ নিয়ে। উপরন্তু ইহুদিরা ছিল খাইবারের জমি চাষাবাদে দক্ষ।

ইহুদিদের সাথে আল্লাহর রাসূলের ﷺ অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। এ পর্যন্ত প্রতিটি ইহুদি গোত্র মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করেছে। তাই যেকোনো মুহূর্তে তাদের খাইবার থেকে বের করে দেওয়ার শর্তারোপ করে তাদের সার্বক্ষণিক চাপের মুখে রাখলেন। এতকিছুর পরেও তাদের চরিত্র বদলায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে খাইবারের উৎপাদিত শস্যের পরিমাপ করে আনতে পাঠাতেন। প্রথমে তারা তার পরিমাপ করার পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানায়, পরে তারা তাকে ঘুষ দিয়ে

---

[89] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৪।

কিনে নিতে চায়। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ খুব রেগে যান। তাদের বলেন, 'আল্লাহর দুশমন কোথাকার! তোরা আমাকে ঘুষ দিতে চাস? তোরা জেনে রাখ, তোদের প্রতি ঘৃণা আর আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি আমার ভালোবাসা আমাকে তোদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার পথে কোনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না!'

পরে অবশ্য তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণই করেছিলেন। পরবর্তীতে খাইবারের ইহুদিরা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। উমারের ﷺ খিলাফতকালে তারা আবদুল্লাহ ইবন উমারকে ﷺ ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে দুই হাত ভেঙে দেয়। এর আগে আল্লাহর রাসূলের ﷺ যুগেই এক সাহাবিকে হত্যা করেছিল কিন্তু সেবার শক্ত প্রমাণ ছিল না। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উমারের সাথে তারা যা করেছিল সেটা ছিল সন্দেহাতীত। তাই উমার ﷺ তাদেরকে আর সুযোগ দেননি, খাইবার থেকে বের করে দেন। এরপর তারা শামে চলে যায়।

খাইবার বিজয়ের মাধ্যমে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা বেশ সচল হয়। কারণ খাইবার থেকে মুসলিমরা বিপুল গনিমাহ অর্জন করে। আবদুল্লাহ ইবন উমারের ﷺ একটি কথাতেই বোঝা যায় খাইবারের বিজয় তাদের জীবনে কতটা পরিবর্তন এনেছিল। তিনি বলেন, 'খাইবার বিজয়ের আগ পর্যন্ত আমাদের পেট ভরে এক বেলা খাওয়া হতো না।' মুহাজিররা খেজুর বাগানগুলো আনসারদের ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। খাইবারের যখন পতন হচ্ছিল তখন ফাদাকের অধিবাসীরা আগেভাগেই আত্মসমর্পণ করে ফেলে। তাদের সাথেও অর্ধেক ফসল ভাগাভাগির চুক্তি হয়। তবে এই ফসলের মালিক হন কেবল আল্লাহর রাসূল কেননা, তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ছিল ফাঈ, গনিমাহ নয়। কারণ ফাদাক সামরিক শক্তির জোরে বিজয় হয়নি। এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের ﷺ আর্থিক অবস্থা সহজ হয়ে যায়।

খাইবারের সাথে আরও দুটি অঞ্চল বিজয় হয়। সেগুলো হলো ওয়াদী আল-কুরা এবং তাইমা। ওয়াদী আল-কুরার ইহুদিদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেই তাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদের সাথে খাইবারের অনুরূপ চুক্তি করা হয়। আর তাইমার অধিবাসীরা ফাদাকের মতো যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করে।

মুসলিমদের হাতে খাইবার, ফাদাক, ওয়াদী আল-কুরা এবং তাইমার পতন নিয়ে গোটা আরব আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলো। কুরাইশরা বিশ্বাসই করতে পারছিল না দুর্ভেদ্য দুর্গ, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আর দীর্ঘকালীন রসদ সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও খাইবারের পতন হয়েছে। এই পরাজয়ের মাধ্যমে কুরাইশরা একটি বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকলো। আরব উপদ্বীপের দরজা ইসলামের জন্য আরও উন্মুক্ত হয়ে গেল।

সাফিয়া বিনত হুয়াইয়ের ﷺ সাথে নবীজির ﷺ বিয়ে

সাফিয়া বিনত হুয়াইয়ের ﷺ সাথে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিয়ের কাহিনী জানার আগে একটু পেছনে তাকানো যাক। এই সাফিয়া হচ্ছেন ইহুদি গোত্র বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা। এ হচ্ছে সেই হুয়াই, যে আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় আসার পর থেকেই তাঁর সাথে শত্রুতা করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছিল। এটি সাফিয়ার ছোটবেলার একটি ঘটনা। এই প্রতিজ্ঞার ঘটনাটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই হুয়াই-ই খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যা গোত্রের বিদ্রোহের পেছনে অন্যতম হোতা। তাকে বনু কুরায়যার ঘটনায় হত্যা করা হয়। তার ভাইও খন্দকের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাকেও হত্যা করা হয়। সাফিয়ার স্বামী ছিলেন কিনানা ইবন আর-রাবী। সে ছিল বনু নাযিরের কোষাধ্যক্ষ। তার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সাফিয়া যেনতেন কোনো পরিবারের কন্যা ছিলেন না। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় একটি পরিবারের মেয়ে। বলা যেতে পারে তাঁর গোত্রের 'ফার্স্ট লেডি'।

খাইবারের যুদ্ধে তাঁর বাবা, ভাই এবং স্বামী -- প্রত্যেকে মুসলিমদের হাতে মারা যায়। সাফিয়া ﷺ দাসী হিসেবে বন্দী হলেন। গনিমতের সম্পদ ভাগাভাগি হওয়ার পর তিনি পড়লেন দাহিয়া আল-কালবির ﷺ ভাগে। তখন কেউ একজন আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বললেন, 'সাফিয়া তো ইহুদিদের মধ্যে উঁচু বংশের সন্তান। তিনি দাহিয়ার ভাগে পড়েছেন, কিন্তু সত্যি বলতে, তার জন্য উপযুক্ত পাত্র কেবল একজনই আছে। তিনি হচ্ছেন আপনি।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন দাহিয়াকে ডেকে বললেন সাফিয়াকে ﷺ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে বেছে নিতে। দাহিয়া তাই করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ সাফিয়াকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। সেক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বিয়ে করে নেবেন এবং তার দাসমুক্তি হবে বিয়ের মোহর। দ্বিতীয় আরেকটি প্রস্তাব দিলেন, সাফিয়া চাইলে ইহুদি হিসেবে থেকে যেতে পারেন। সাফিয়া বেছে নিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সাফিয়া বিনত হুয়াইয়ের বিয়ে হলো। এই বিয়ে হয়েছিল সাফিয়ার মাসিক সম্পন্ন হওয়ার পর। সে পর্যন্ত তারা খাইবারেই ছিলেন।

এবার খাইবার থেকে ফেরার পেলা। সাফিয়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের পেছনে বসালেন। ফিরতি পথে ছয় মাইল গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতি নিতে চাইলেন যেন স্ত্রীর সাথে থেকে বিয়ে পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু সাফিয়া ﷺ রাজি হলেন না। বিষয়টা রাসূলুল্লাহকে ﷺ একটু অসুবিধায় ফেলে দিল, কিন্তু তিনি সাফিয়াকে কিছুই বললেন না। পরে তারা আস-সাহবায় থামলেন এবং সেখানেই ওয়ালিমা অনুষ্ঠিত হলো। বিয়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলো, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়ার ﷺ কাছে জানতে চাইলেন কেন তিনি প্রথমবার থামতে রাজি হলেন না। তখন সাফিয়া ব্যাখ্যা করলেন, 'ঐ এলাকাটা ছিল ইহুদিদের কাছে, তাই আমি আপনার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছিলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়ার উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন। সাফিয়ার উত্তর সাফিয়ার অন্তরের কথাকে

প্রকাশ করে। তিনি যদি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ না করতেন, তাহলে আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিরাপত্তা নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন হতেন না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে নারীর স্বামী, ভাই, বাবা সবাই মুসলিমের হাতে মারা গিয়েছে, সেই নারী কীভাবে সেই মুসলিমদের নেতাকে ভালোবাসতে পারে? কীভাবে সে সেই ইসলামকে দ্বীন হিসেবে বেছে নেয়, যার অনুসারীরা তার সবচেয়ে আপনজনদের হত্যা করেছে? সেই প্রশ্নে একটু পরেই আসা যাক।

ওয়ালিমা শেষে যখন তারা ফিরে আসবেন, তখনকার ছোট্ট একটা ঘটনা রাসূলুল্লাহর ﷺ পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বড় একটা ধারণা দেয়। তারা মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন, সাফিয়া উটের পিঠে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গায়ের চাদর খুলে সাফিয়ার বসার জন্য বালিশ বানিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিলেন। এরপর নিজের হাঁটু উঁচু করে তুলে ধরলেন যেন সেই হাঁটুর উপর ভর করে সাফিয়া উটের পিঠে উঠতে পারেন।[90]

ইহুদিদের চোখে যিনি আরবদের নেতা, মুসলিমদের কাছে যিনি আল্লাহর রাসূল, সদ্য যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আসা সেই বীর মানুষটি তাঁর স্ত্রীর জন্য মাটিতে বসে পড়েছেন। সবার সামনে স্ত্রীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। এত বিনয়, দয়া আর মমতা যে মানুষটির তাঁকে ভালো না বেসে কি থাকা যায়?

সাফিয়া ছোটবেলাতেই জেনেছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর সত্য নবী। তার বাবার মুখেই তিনি তা জেনেছেন। কিন্তু এটাই ছিল তার জন্য দুঃখজনক বাস্তবতা যে তার বাবা, স্বামী, ভাই -- সবাই আল্লাহর রাসূলের বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। তার গোত্রের লোকদের আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনা থেকে বের করে দিয়েছেন। এসব কিছুই ঘটেছে তার চোখের সামনে। তিনি তখন একজন কমবয়সী নারী। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি তার একটা ক্ষোভ কাজ করার কথা। আল্লাহর রাসূল ﷺ কিন্তু বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সাফিয়ার আবেগগুলোকে উপেক্ষা করেননি, বরং নিজের আবেগটাও প্রকাশ করেছেন। তিনি সাফিয়ার কাছে তার বাবা আর স্বামীর মারা যাবার বিষয়টা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতেন। তাকে বুঝিয়ে বলতেন তার বাবা হুয়াইয়ের কী অপরাধ ছিল। এভাবে বোঝাতে বোঝাতে একসময় সাফিয়ার মন থেকে সব রাগ-ক্ষোভ দূর হয়ে গেল। দুঃখের যে ভারী বোঝাটা তার মনে পাথরের মতো চেপে ছিল, সেটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে গেল। পিতা, স্বামী আর আপনজনদের হারালেন সত্যি, কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিয়ে সাফিয়ার নতুন জীবন শুরু হলো।

বিয়ের পরের ঘটনা, আল্লাহর রাসূল দেখলেন সাফিয়ার মুখে নীল দাগ। তিনি জানতে চাইলেন এই দাগ কীভাবে হলো। সাফিয়া বলতে শুরু করলেন, 'একদিন আমি

---

[90] সহীহ বুখারি, অধ্যায় ক্রয়-বিক্রয়, হাদীস ১৮১।

ঘুমাচ্ছিলাম। আমার মাথা ছিল আমার স্বামীর কোলে, তখন আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার কোলের উপর চাঁদ এসে পড়লো। জেগে উঠে স্বামীকে স্বপ্নের কথা বললাম। আমার স্বামী আমাকে থাপ্পড় মেরে বললো, তুই আরবের বাদশাহকে পেতে চাস!'[91]

সেদিন হয়তো সাফিয়া সেই ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্নই পরবর্তীতে কত চমৎকারভাবে সাফিয়ার জীবনকে পাল্টে দিলো। এই স্বপ্ন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ যে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সাফিয়ার বিয়ে হবে। কিনানা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে সাফিয়া আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বিয়ে করতে চান। আসলে এটা তার চাওয়া ছিল না। এটা ছিল আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পক্ষ থেকে একটি সত্য স্বপ্ন, ভবিষ্যতে কী হবে তার ব্যাপারে ইঙ্গিত।

আগের সেই প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক, কীভাবে একজন নারীর পক্ষে তার স্বামী আর পিতার হত্যাকারীকে বিয়ে করা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর এক শব্দে দেওয়া সম্ভব, তা হচ্ছে ঈমান। সাফিয়া তাঁর স্বামী আর বাবার সাথে বন্ধন থেকে ঈমানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি ঈমানকে সবকিছুর ওপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আর তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ হয়ে যান তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ! রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াতের কথা তিনি সেই ছোটবেলা থেকেই জানতেন। আর যখন সেই প্রতীক্ষিত নবী তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, তিনি স্বেচ্ছায়, আগ্রহের সাথে এই বিয়েতে সম্মত হলেন। যার অন্তরে ঈমান নেই, সে কখনো সাফিয়ার এই সিদ্ধান্তকে কদর করতে পারবে না।

সত্যি বলতে এই বিয়ে ছিল সাফিয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। এই বিয়ের মাধ্যমে সাফিয়া জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে শুধু যে জান্নাতী হলেন তা-ই না, তিনি হয়ে গেলেন সেরা নারীদের একজন -- উম্মুল মুমিনীন। সাফিয়ার পরবর্তী জীবন থেকে এটা স্পষ্ট যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ কতটা ভালোবাসতেন। তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিজের জীবন থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুশয্যায় কষ্ট পাচ্ছেন, তখন সাফিয়া বলে উঠেন, 'ইশ! আজ যদি আপনার জায়গায় আমি থাকতাম!' ঈমান এভাবেই মানুষের অন্তরকে বদলে দেয়। আল্লাহ তাআলা উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়ার ﵂ ওপর সন্তুষ্ট হোন।

এ প্রসঙ্গে আবু আইয়ুব আল আনসারীর ﵁ একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। সাফিয়ার ﵂ সাথে বিয়ে হওয়ার পর যে রাতে আল্লাহর রাসূল তার সাথে থাকলেন, সে রাতে আবু আইয়ুব আল আনসারী সারা রাত সেই তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে নবীজিকে ﷺ পাহারা দেন। সকাল বেলা উঠে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু আইয়ুবকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার আবু আইয়ুব! তুমি এখানে কেন?' আবু আইয়ুব তখন উত্তর দিলেন, 'আমি এই মহিলাকে নিয়ে আপনার জীবনের ব্যাপারে

---

91 আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬।

আশঙ্কাবোধ করছিলাম আল্লাহর রাসূল। এই মহিলার বাবা, স্বামী আর আপনজনেরা নিহত হয়েছে। আর কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন একজন কাফির। আমি আশঙ্কা করছিলাম যদি প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে তিনি আপনার কোনো ক্ষতি করতে চান -- তাই আমি সারারাত আপনাকে পাহারা দিয়েছি।' আবু আইয়ুবের এই সন্দেহ যদিও অমূলক ছিল, তবু তার দুশ্চিন্তা বলে দেয় তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ কতটা ভালোবাসতেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ওপর খুশি হয়ে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ আবু আইয়ুব, আমাকে সারারাত যেভাবে পাহারা দিয়েছে, আপনি সেভাবে তাকে রক্ষা করুন।'

মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

'আমি জানি না আজ আমি কেন এত খুশি ... খাইবার বিজয় নাকি জাফর ইবন আবি তালিবের ফিরে আসা... '

আবিসিনিয়ার মুহাজিররা যখন মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন এভাবেই আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব ছিলেন আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই। দীর্ঘদিন পরে তাকে ফিরে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেন। জাফর ইবন আবি তালিবকে কাছে পাওয়া ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনে অত্যন্ত আনন্দের একটা ঘটনা। জাফর ইবন আবি তালিব ছিলেন আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের আমীর। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরীকে নাজাশির কাছে পাঠান যেন তিনি মুহাজিরদের মদীনায় পাঠিয়ে দেন। নাজাশি সানন্দে দুটো জাহাজে করে সবাইকে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। এই দলের সাথে আরও একটি দল ছিল। সেটি হচ্ছে আশআরী গোত্র থেকে আগত ৫৩ থেকে ৫৯ জনের একটি দল। সেই দলে ছিলেন রাসূলুল্লাহর সাহাবি আবু মূসা আল-আশআরী ﵁। তারা যখন আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা শুনলেন, তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে হিজরত করে চলে আসবেন। তারা জাহাজে উঠে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু খারাপ আবহাওয়া বা অন্য কোনো কারণে তাদের জাহাজ মদীনায় না পৌঁছে আবিসিনিয়ার তীরে ভিড়ে। তখন তারা জাফর ইবন আবি তালিবের সন্ধান পেলেন এবং সেখানেই থাকতে শুরু করলেন।

জাফর ইবন আবি তালিবের নেতৃত্বে মুসলিমরা আবিসিনিয়ায় ছিলেন প্রায় দশ বছর। এই দশ বছরে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে যায়। আল্লাহর রাসূলের হিজরত, ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি। এ কারণে মদীনার কেউ কেউ মনে করেন তারা বুঝি আবিসিনিয়ার মুসলিমদের থেকে এগিয়ে আছেন। এই প্রসঙ্গে মদীনার মুসলিম উমার ইবন খাত্তাব ﵁ এবং আবিসিনিয়া ফেরত সাহাবিয়াত আসমা বিনত উমাইসের ﵂ একটি কথোপকথন আছে, যা প্রথম খণ্ডে ভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল। ঘটনাটি আবার উল্লেখ করা হলো।

আসমা ছিলেন জাফর ইবন আবি তালিবের স্ত্রী। তিনি একদিন উমারের বাসায় হাফসার সাথে দেখা করতে আসলেন। আসমাকে দেখে উমার বললেন, 'ইনি কি সেই আবিসিনিয়া থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে আসা মহিলা?' হাফসা বললেন, 'হ্যাঁ, ইনিই সেই।' উমার তখন আসমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা আপনাদের আগে হিজরত করেছি তাই আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর আপনাদের থেকে বেশি হক্বদার।'

এই কথায় আসমা কিছুটা রেগে গেলেন। পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন, 'না, তা হতে পারে না, আপনারা আমাদের চাইতে রাসূলের ﷺ বেশি ঘনিষ্ঠ নন। আপনারা তো আল্লাহর রাসূলের সাথে থাকতেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাইয়ে দিতেন, মূর্খদের শিক্ষা দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে, অপ্রিয় এক রাজ্যে। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাচ্ছি। আপনি যে কথা বললেন, সেটা তাঁকে বলবো। বাড়িয়ে-চড়িয়ে কিছুই বলব না, এরপর দেখি উনি কী বলেন।'

আসমার অভিযোগ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে চাইলেন, 'তুমি উত্তরে কী বলেছো?' আসমা তাঁর দেওয়া উত্তরটি রাসূলুল্লাহকে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো আসমা, আমার প্রতি উমার আর তার সঙ্গীদের হক্ব তোমাদের চেয়ে বেশি তো নয়। তারা একটি হিজরতের পুরস্কার পাবে আর তোমরা পাবে দুটি হিজরতের পুরস্কার।'

এ কথা শুনে আসমার মন খুশিতে ভরে উঠলো! এতদিন তারা আল্লাহর রাসূলের থেকে দূরে ছিলেন, সেই শূন্যতার যে নিদারুণ কষ্ট তা যেন এই অসামান্য প্রাপ্তির জন্য নিমিষেই মিলিয়ে গেল। এই হাদীস ছিল আবিসিনিয়া ফেরত সাহাবিদের প্রিয় হাদীস। তারা ঘুরেফিরে বারবার এই হাদীসটা শুনতে চাইতেন। দল বেঁধে আসমার কাছে আসতেন এই কথাগুলো শুনতে, এই হাদীস শুনে তাদের মন ভরে যেতো। আসমার ভাষায়, 'গোটা দুনিয়ায় এ হাদীসের চাইতে প্রিয় তাদের আর কিছু ছিল না।'

একই সময়ে আরও দুটো দল আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে আসে। এর মধ্যে একটি হলো শাম অঞ্চলের আদ-দারিঈন থেকে আগত আল-লাখাম গোত্রের লোক। সেখানে ছিলেন তামিম আদ-দারী ﷺ। তিনি দাজ্জালের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরেকটি দলের আগমন ঘটে ইয়েমেন থেকে, তারা ছিল ইয়েমেনের দাউস গোত্রের। এই দলে ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা ﷺ। সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার মদীনায় হিজরত করে। মদীনায় এসে তারা জানতে পারেন আল্লাহর রাসূল ﷺ খাইবারে অবস্থান করছেন। তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে মিলিত হতে এত আগ্রহী ছিলেন যে তারা মদীনায় অপেক্ষা না করে খাইবারে চলে যান। সেখানে আল্লাহর রাসূলের দেখা পান।

খাইবার থেকে ফিরে আসার পথে একটি ছোট্ট শিক্ষণীয় ঘটনা আছে। খাইবার থেকে ফেরার পথে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বিলালকে ﷺ বলেন তিনি যেন ফজরের সময় সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু বিলাল ঘুম থেকে উঠতে না পারায় সবারই ফজরের

সালাত ছুটে যায়। সূর্যের তাপে সবার ঘুম ভাঙে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা যদি কখনো সালাতের কথা ভুলে যাও, তাহলে যখনই সালাতের কথা মনে পড়বে, সাথে সাথে আদায় করবে।' এই বিষয়টা অনেকেই ভুল করে। অনেককে দেখা যায়, ফজরের সালাত ছুটে গেলে সাথে সাথে আদায় না করে যুহরের ওয়াক্তের জন্য জমা করে রাখছে। এটা ঠিক নয়। ঘুমের কারণে বা ভুলে গিয়ে কোনো সালাত অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে সেটা আদায় করে নিতে হবে, ফেলে রাখা যাবে না।

আল-হাজ্জাজ ইবন ইলাত আস-সালামির রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনা

আল-হাজ্জাজ ছিলেন বনু সুলাইম গোত্রের ধনী ব্যবসায়ী। মক্কায় তার অনেক সম্পত্তি ছিল। তার স্ত্রীও থাকতেন মক্কায়। তিনি মুসলিম হয়ে গেছেন এই খবর শুনলে কুরাইশরা তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমার পরিবার আর সম্পদ মক্কায় ফেলে এসেছি। আমি এসব ফিরে পেতে চাই। এগুলো উদ্ধার করার জন্য কি আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি?' আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আল-হাজ্জাজের পরিকল্পনা ছিল কুরাইশদের কাছে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে তাদের আস্থাভাজন হয়ে তাদের কাছ থেকে তার সম্পদ নিয়ে মদীনায় চলে আসা।

আল-হাজ্জাজ মক্কায় গিয়ে গুজব ছড়ালেন -- মুসলিমরা খাইবারে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। খাইবারের ইহুদিদের পরাজয়ের খবর তখনো কুরাইশদের কানে পৌঁছায়নি। আল-হাজ্জাজের এই গুজব দাবানলের মতো মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো। কুরাইশরা খুশিতে আটখানা হয়ে গেল। আল-হাজ্জাজ সেই সুযোগে বললেন, 'আমি এসেছি আমার সম্পদ নিয়ে যেতে।' কুরাইশরা খুশি মনে তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিলো। আল-হাজ্জাজ যে তাদের এভাবে বোকা বানাবে সেটা তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি।

এদিকে মক্কার মুসলিমদের যেন শোকের কালো ছায়া গ্রাস করলো। কষ্টে-দুঃখে তারা একেবারে ভেঙে পড়লেন। আল-আব্বাস এই গুজব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও পাচ্ছিলেন না। তিনি আল-হাজ্জাজের কাছে তার দাসকে পাঠালেন। আল-হাজ্জাজ সেই দাসকে বললেন, 'আব্বাসকে বলবে সে যেন আমার সাথে গোপনে দেখা করে।' আব্বাস এই কথা শুনে সাথে সাথে বুঝে ফেললেন এই খবর আসলে একটা গুজব। খুশির চোটে তিনি তার সেই দাসটিকে আযাদ-ই করে দিলেন।

আল-হাজ্জাজ এরপর আল-আব্বাসের সাথে সরাসরি দেখা করলেন। বললেন, 'শোনো, তুমি যেটা শুনেছো, সেটা সত্য নয়। আসল খবর হচ্ছে, মুহাম্মাদ ﷺ ইহুদিদের

পরাজিত করেছেন। তাদের জায়গা দখল করেছেন এবং তাদের গনিমত বণ্টন করেছেন। আর তাদের রাজার মেয়েকে মুহাম্মাদ ﷺ বিয়ে করে নিয়েছেন। আমি গুজব ছড়িয়েছি যেন আমি আমার সম্পদ উদ্ধার করে নিতে পারি। আমি মুসলিম হয়েছি জানলে কুরাইশরা আমার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রেখে দিতে পারে। আব্বাস, তুমি আমাকে তিন দিন সময় দাও। এই কথাগুলো তুমি তিন দিনের জন্য গোপন রাখবে, এরপর যা খুশি তা করো।'

তিন দিন পর আব্বাস গেলেন আল-হাজ্জাজের স্ত্রীর কাছে। আল-হাজ্জাজ ততক্ষণে চলে গেছেন। আল-হাজ্জাজ তার স্ত্রীকেও জানাননি তার আসল উদ্দেশ্য কী ছিল। আল-হাজ্জাজের স্ত্রী তাই আব্বাসকে মুসলিমদের পরাজয়ের ব্যাপারে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আব্বাস তখন আসল কথা জানালেন, বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, সেই ঘটনাই ঘটেছে যা আমরা শুনতে ভালোবাসি! আল্লাহ নবীজিকে ﷺ খাইবারের বিজয়ের বরকত দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফিয়াকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন। তুমি যদি তোমার স্বামীকে চাও, তাহলে তুমি বরং তার সাথে যোগ দাও।' আল-হাজ্জাজের স্ত্রী তখন স্বামীর কাছে চলে গেলেন।

এরপর আল-আব্বাস ভালো পোশাক পরে কুরাইশদের আড্ডাখানায় গেলেন। আব্বাসের কুনিয়া নাম ছিল আবুল ফাদল। কুরাইশরা তাকে দেখে বললো, 'তোমার কল্যাণ হোক আবুল ফাদল!' আব্বাস উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, আমার উপর কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে। হাজ্জাজ আমাকে জানিয়েছে আল্লাহ মুহাম্মাদকে ﷺ খাইবারের বিজয় দিয়েছেন। মুসলিমরা খাইবার জয় করেছে আর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফিয়াকে বিয়ে করেছেন। সে আমাকে বলেছে এই খবর যেন আমি তিন দিন গোপন রাখি। কারণ সে এসেছে কেবল তার সম্পদ ফিরিয়ে নিতে এবং সেটা সে করে চলে গেছে।'[92]

মক্কার আবহাওয়া মুহূর্তের মাঝে একশো আশি ডিগ্রী মোড় নিল। মুসলিমদের তিনদিনের কষ্ট উবে গিয়ে উচ্ছ্বাসের জোয়ার বয়ে গেল! আর কুরাইশদের ছেঁকে ধরলো হতাশা আর গ্লানি।

শিক্ষা

মক্কার মুসলিমরা মক্কায় থাকতেন ঠিকই, কিন্তু তারা নিজেদের মুসলিমদের মূলধারার অংশ হিসেবে দেখতেন এবং তারা বিশ্বস্ত ছিলেন মদীনার প্রতি। তারা নিজেদেরকে "মক্কার নাগরিক" হিসেবে নয়, বরং একজন মুসলিম হিসেবে দেখতেন। তারা নিজের দেশের স্বার্থ দেখতেন না, তারা দেখতেন মুসলিমদের স্বার্থ। মদীনার মুসলিমদের কষ্টে তারা কষ্ট পেতেন, তাদের আনন্দে খুশি হতেন। তারা মক্কার অধিবাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু মক্কার কুরাইশদের প্রতি তাদের কোনো সমর্থন ছিল না। তাদের অন্তর ছিল

[92] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০।

আল্লাহর রাসূল আর মুসলিমদের সাথে একাত্ম। কুরাইশদের চাপ থাকা সত্ত্বেও তারা মদীনাকে সমর্থন করে গেছেন। তারা আত্মপরিচয় সংকটে ভোগেননি, যেমনটা আজ কিছু পশ্চিমা মুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। মক্কার মুসলিমদের উপর অনেক জুলুম-নির্যাতন হয়েছিল। কিন্তু সবার কথা ভেবে তারা সেসব সয়ে নিয়েছেন, সেজন্য তারা জিহাদের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় এর বিপরীতটা দেখা যায়।

খাইবার পরবর্তী সামরিক অভিযান

১) বনু ফাজারার বিরুদ্ধে সারিয়া

এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আবু বকর আস-সিদ্দীক ﵁। মুসলিমদের আক্রমণের মুখে তারা তাদের নারী-শিশু সহ পাহাড়ের দিকে পালাতে থাকে। তাদের পিছু নেন সালামাহ ইবন আল-আকওয়া ﵁, তিনি তাদের পালাবার পথে এমনভাবে তীর ছুঁড়তে থাকেন যে তারা থামতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি তাদের বন্দী করে আবু বকরের ﵁ কাছে নিয়ে আসেন। বন্দীদের মধ্যে একজন নারীকে সালামাহর খুব পছন্দ হয়ে যায়। তিনি তাকে দাসী হিসেবে রাখতে চাইলেন। আবু বকর সেই সুন্দরী নারীকে দাসী হিসেবে সালামাহকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সালামাহকে বলেন যেন তিনি এই নারীকে ফিরিয়ে দেন। সালামাহ কিছুটা অনিচ্ছার সাথে সেই নারীকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ হাতে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন সেই নারীকে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দেন যেন তার বিনিময়ে কুরাইশদের হাত থেকে কিছু বন্দী মুসলিমদের ছাড়িয়ে আনা যায়।[93]

এই সারিয়া থেকে শিক্ষা হলো মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার গুরুত্ব। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'বন্দীকে মুক্ত করো।' মুসলিম বন্দীদের কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করা একটি ওয়াজিব দায়িত্ব। এই ঘটনায় আমরা দেখি একজন নারীকে একজন সাহাবির পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল তাকে ফিরিয়ে নিয়ে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন যেন তার বিনিময়ে কিছু মুসলিমদের ছাড়িয়ে আনা যায়।

২) গালিব ইবন আবদুল্লাহর ﵁ সারিয়াহ

ত্রিশ জন মুসলিমকে পাঠানো হয় বনু মুলাউয়ি গোত্রের বিরুদ্ধে। এরা ছিল গাতফানের একটি গোত্র। অভিযান করতে গিয়ে তারা শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়েন এবং তাদের প্রায় সবাই শহীদ হয়ে যান। অভিযানের নেতা বাশির ইবন সাদ আহত হন, জান নিয়ে কোনোরকমে মদীনায় ফেরত আসেন। এই আক্রমণের জবাব দিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরেকটি সারিয়া প্রেরণ করেন। এই সারিয়ার কমান্ডার ছিলেন গালিব ইবন আবদুল্লাহ ﵁। যাত্রাপথে বনু মুলাউয়ির এক লোককে গুপ্তচর মনে করে গ্রেপ্তার করেন।

---

[93] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৫৪।

লোকটির নাম হারিস ইবন মালিক। সে বললো, 'আমাকে তোমরা কেন গ্রেপ্তার করলে? আমি তো মুসলিম হতে এসেছি।' গালিব তাকে বললেন, 'তুমি যদি সত্য বলে থাকো, তাহলে একদিন একরাত বন্দী হয়ে থাকলে এমন কিছু যায় আসে না।' গালিব তাকে একদিনের জন্য বন্দী রাখতে চাচ্ছিলেন কারণ সে যদি গুপ্তচর হয়ে থাকে তাহলে সে শত্রুদের কাছে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে। সমস্যা হচ্ছে লোকটি দাবি করেছে সে মুসলিম হতে চেয়েছে আর একজন মুসলিমকে বন্দী করে রাখা যায় না। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি এমন ছিল যে তাকে একদিনের জন্য বন্দী না রাখলে পুরো বাহিনীই বিপদের মুখে পড়তে পারে।

যা-ই হোক, শত্রুপক্ষের উপর নজরদারি করার জন্য জুনদুব ইবন মাকিস একটা পাহাড়ে ওঠেন। পাহাড়ে উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন যেন শত্রুরা তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু তবুও কীভাবে কীভাবে যেন শত্রুপক্ষের একজন তাকে দেখে ফেলে, তাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ে মারে। সেই তীর এসে জুনদুবের শরীরে বিদ্ধ হয়। প্রচণ্ড ব্যথায় তার শরীর যেন বিষিয়ে উঠলো। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার উপর পুরো বাহিনীর নিরাপত্তা নির্ভর করছে। টুঁ শব্দটি করলেও মুসলিমদের অবস্থান শত্রুদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। সমস্ত প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে।

জুনদুব সেই ভয়ঙ্কর ব্যথা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিলেন। শত্রুরা যেন তার উপস্থিতি টের না পায়, তার জন্য যেন মুসলিমদের অভিযান ভণ্ডুল না হয়ে যায়। এরপর আস্তে করে তীরটি খুলে ফেলেন। এই কঠিন মুহূর্তে কীভাবে একটা মানুষ এতটা সবর করতে পারে? যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, তবু জুনদুব নিজের শরীরকে স্থির ধরে রেখেছেন। এই অধ্যবসায়, এই ধৈর্য কোথা থেকে এল? এটা ছিল তাদের ঈমানের ফল। আল্লাহর ওপর তাদের বিশ্বাস কতটা জোরালো ছিল আর জিহাদের ব্যাপারে তারা কতটা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন -- এই ঘটনা তার একটি চমৎকার উদাহরণ।

এরপর আরও একটি তীর জুনদুবের গায়ে বিঁধে। এবারো তিনি নড়াচড়া না করে তীরটি আস্তে করে খুলে ফেলেন। কোনোকিছুর নড়াচড়া না দেখে সেই তীর নিক্ষেপকারী লোকটি চলে যায়। সে ভাবলো কেউ বুঝি নেই। পরবর্তীতে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করে তাদের উট এবং অন্য সম্পদ দখল করে নেন। শত্রুরাও তাদের বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ধাওয়া করা শুরু করে। এই পর্যায়ে তাদের মোকাবেলা করার মতো অবস্থা মুসলিম বাহিনীর ছিল না। তারা পিছু হটতে থাকেন। তখন আল্লাহ তাআলা সেই স্থানে বৃষ্টিবর্ষণ করে প্লাবন ঘটান যার মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসে।

গালিব ইবন আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন আরেকটি সারিয়া ছিল বনু আউয়াল এবং বনু আবদ ইবন সালাবার উদ্দেশ্যে। এই অভিযানে উসামা ইবন যাইদের ﷺ একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। তিনি এই অভিযানে এক লোককে গ্রেপ্তার করেন। সে তখন বলে

উঠে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' কিন্তু উসামা তাকে হত্যা করে ফেলেন। তার যুক্তি ছিল নিশ্চয়ই লোকটা জান বাঁচানোর জন্য কালিমা পড়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ঘটনা শুনে প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেন। উসামাকে বললেন,

> *'তুমি কি লোকটার বুক চিরে দেখেছো সে সত্যি বলছে না মিথ্যা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছো?'*[94]

এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, বাহ্যিক অবস্থার উপর একজন মানুষকে বিচার করতে হবে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, তুমি কি তার বুক চিরে দেখেছো যে সত্যি বলছে নাকি মিথ্যা? একজন মানুষ যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, তখন তাকে ঈমানদার ধরতে হবে, নিছক সন্দেহের কারণে তাকে কাফির ভাবা যাবে না। তবে ঈমান আনার দাবি করার পরেও যদি তার কাছ থেকে স্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পায়, সেক্ষেত্রে প্রকাশ্য কুফরির দিকটাই নিতে হবে। অন্তর ফেঁড়ে দেখা আমাদের দায়িত্ব নয়।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো মুসলিম রক্তের পবিত্রতা। বিনা কারণে একজন মুসলিমকে হত্যা করা ভয়াবহ একটি পাপ। আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতিক্রিয়া দেখেই বোঝা যায় এটা মারাত্মক পর্যায়ের গুনাহ। একজন মুসলিমের রক্ত পবিত্র, এবং হাদীসে এসেছে কাবাঘর থেকেও মুসলিমদের রক্ত দামি।

৩) আবু হাদরাদের ﷺ সারিয়াহ

আবু হাদরাদ ﷺ দুইশো দিরহাম মোহরের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু মোহর আদায় করার সামর্থ্য তার ছিল না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে সাহায্য চাইতে আসলেন। এত মোটা অংকের মোহর রাসূলুল্লাহর ﷺ পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, 'সুবহানআল্লাহ! টাকা যদি স্রোতের মতো ভেসে আসতো তবুও তো এত মোহর ধরা ঠিক হতো না। তোমাকে সাহায্য করার মতো কিছুই আমার কাছে নেই।'[95]

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু হাদরাদ সহ আরও দুজনকে পাঠালেন কায়েস নামের এক লোককে শায়েস্তা করার জন্য। সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ করছিল। এই অভিযানে দেওয়ার মতো রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে ছিল একটি দুবলা পাতলা উট। সেই উটকে সম্বল করে তারা তিনজন বের হলেন। তারা সেই লোককে হত্যা করতে সমর্থ হন। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু হাদরাদকে তেরোটি উট দেন। এই উট দিয়ে তিনি মোহর পরিশোধ করেন।

---

[94] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঈমান, হাদীস ১৮৩।

[95] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮।

৪) আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার ﷺ সারিয়াহ

ইয়াসির ইবন রাজাম নামের এক ইহুদি গাতফানের লোকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক করার চেষ্টা করছিল। তার কাছে ত্রিশ সৈনিক সহ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে পাঠানো হয়। তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, তাকে খাইবারের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। তখন ইয়াসির তার ত্রিশ সঙ্গীসহ মদীনায় যেতে রাজি হয়। কিন্তু পথিমধ্যে সে তার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আফসোস করতে থাকে। তখন সে আবদুল্লাহ ইবন উনাইসকে ﷺ হত্যা করার চেষ্টা করে। আবদুল্লাহ ইবন উনাইস আহত হন কিন্তু নিজেকে সামলে নেন। দুই দলের মধ্যে মারামারি শুরু হয় এবং ইহুদিদের একজন ছাড়া সবাই মারা পড়ে।

৫) বাতনু ইদামের সারিয়াহ

এই অভিযান প্রেরিত হয়েছিল ইদামে, নেতৃত্বে ছিলেন আবু হাদরাদ ﷺ অথবা আবু কাতাদা ﷺ। এই অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিযানে অংশ নেওয়া মুহাল্লিম ইবন জাসসামার কাহিনী। অভিযান চলাকালীন সময়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আমর ইবন ইদবাত আশযায়ী। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। মুসলিম হিসেবে তিনি সেই বাহিনীকে সালাম দেন। বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম।' সেই সুযোগে মুহাল্লিম ইবন জাসসামা তাকে সেখানেই খুন করে ফেলে। জাহিলিয়াতের সময় মুহাল্লিমের সাথে সেই লোকের কোনোকিছু নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। তার জের ধরে মুহাল্লিম তাকে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করে।

এই ঘটনার পরে হুনাইনের সময়ে গাতফানের নেতা উয়াইনা ইবন হিসন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে এই হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ রক্তের বদলে রক্ত দাবি করলো। আর মুহাল্লিমের পক্ষের লোকেরা রক্তপণ দিতে অস্বীকার করলো। ফিতনা এড়ানোর জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে রক্তপণ হিসেবে একশোটি উট দিতে চাইলেন। উয়াইনা তখন বললো, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাকে ছাড়বো না, যতক্ষণ না তার পরিবার সেই কষ্ট পাবে, যে কষ্ট আমার পরিবার পেয়েছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয়বারের মতো রক্তপণ নিতে প্রস্তাব করলেন। শেষপর্যন্ত তারা রাজি হলো এবং রক্তপণ গ্রহণ করলো।[96]

মুহাল্লিমের লোকেরা মুহাল্লিমকে বললো, 'তুমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাও এবং তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলো। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।' লম্বা সুঠামদেহী মুহাল্লিম আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে আসলো। পরনে ছিল মৃত্যুর পোশাক। বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুহাল্লিম, আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাল্লিমকে ক্ষমা করবেন না।' মুহাল্লিম চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

---

[96] ইবন মাজাহ, অধ্যায় রক্তপণ, হাদীস ২৭২৬ (আরবি রেফারেন্স)।

এই ঘটনার পর মুহাল্লিম আর এক মাস বেঁচে ছিল। তাকে দাফন করা হয়, কিন্তু কবরের মাটি তাকে গ্রহণ করেনি। তাকে ছুঁড়ে ফেলে, বারবার। এরপর তার লাশ দুই পাহাড়ের মাঝে পাথরচাপা দিয়ে দাফন করা হয়। এই ঘটনা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর কসম! মুহাল্লিমের চাইতে নিকৃষ্ট লোককেও মাটি গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ এই ঘটনার মাধ্যমে তোমাদের পারস্পরিক জানমালের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে সতর্ক করতে চেয়েছেন।' মুসলিমের রক্তের পবিত্রতার বিষয়ে এই ঘটনা আরেকটি শিক্ষা।[97]

৬) আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা আস-সাহমীর ﷺ সারিয়ার কাহিনী

এই সারিয়াহর নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা। অভিযান চলাকালীন সময়ে তার অধীনস্থ সৈনিকরা এমন কিছু একটা করে বসে যে কারণে তিনি খুব রেগে যান। রেগে গিয়ে তাদের বলেন, 'তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও।' সৈনিকরা উত্তর দিল, 'এই আগুন থেকে রক্ষা পেতেই তো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি!' তখন আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা বললেন, 'আমি হচ্ছি আমীর এবং আমীরকে মান্য করা ওয়াজিব!' সৈনিকরা তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো। পরে তার রাগ পড়ে গেল, আগুনও নিভে গেল। তারা ফিরে এলেন। এ ঘটনা শুনে রাসূলুলাহ ﷺ মন্তব্য করলেন, 'যদি তারা তাদের আমীরের কথামতো আগুনে ঝাঁপ দিতো, তাহলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেই আগুনেই থেকে যেত। আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো আনুগত্য চলে না। আনুগত্য কেবল ভালো কাজে।'[98]

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো, আমীরের আনুগত্য তখনই করা উচিত যখন তিনি ভালো কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি তিনি খারাপ কাজের আদেশ করেন তাহলে তাঁকে অনুসরণ করা যাবে না। এটা শুধু সামরিক অভিযানের আমীরের ক্ষেত্রে নয়, বরং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন কারো বাবা-মা যদি মেয়েকে বলেন হিজাব পরা যাবে না -- সেক্ষেত্রে বাবা-মায়ের আনুগত্য করা যাবে না। যদি পেশাগত জীবনে কর্তৃপক্ষ কোনো হারাম কাজের আদেশ দেয় সেক্ষেত্রে তার কথা শোনা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে শাসক যদি জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহ নিষিদ্ধ করে দেয় অথবা মুসলিমদেরকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুগত বানিয়ে রাখতে চায় -- তাহলে তার আনুগত্য করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে ইসলাম পালনের ব্যাপারে সর্বদিক থেকে বাধা আসছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে -- কারো আদেশ মান্য করতে গিয়ে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করা যাবে না।

উমরাতুল কাযা

দেখতে দেখতে হুদাইবিয়ার সন্ধির এক বছর হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল ﷺ উমরার

---

[97] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় রক্তপণ, হাদীস ৪৫০৩ (আরবি রেফারেন্স)।

[98] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলে দিলেন আগের বছর যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে ছিলেন তাদের কেউ যেন বাদ না পড়ে। তাদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ খাইবার এবং অন্যান্য অভিযানে শহীদ হয়ে গেছেন। তবে নতুন অনেকেই যোগ দিল। নারী এবং শিশু ছাড়াই উমরা যাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় দুই হাজার। সে এক অসাধারণ দৃশ্য! বিশাল এক বাহিনী আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে এগিয়ে চলেছেন! সবার পরনে একই রকম পোশাক, সাথে কুরবানির জন্য চিহ্নিত পশুর পাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উট কাসওয়ার পিঠে বসা, আর তাঁকে ঘিরে রেখেছেন সাহাবিরা। তাদের সবার হাতে কোষবদ্ধ তরবারি উঁচু করে রাখা। সবাই সরবে পড়ছেন,

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক! লাব্বাইক লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদ ওয়া নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।

আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিআমত এবং সাম্রাজ্য আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই!

তাওহীদের এই বাণীতে আকাশ-বাতাস সেদিন মুখরিত হয়ে উঠলো।

সাবধানতা অবলম্বন

কথা ছিল মুসলিমরা মক্কায় ভারী কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না, কেবল তরবারি রাখতে পারবেন। কিন্তু সফরে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তীর-ধনুক-বর্শা জাতীয় ভারী অস্ত্র-শস্ত্র আনলেন, সাথে আরও ছিল মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার ﷺ নেতৃত্বে দুইশো ঘোড়সওয়ারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো লুকোছাপা রাখলেন না। কুরাইশরা যখন দেখলো তিনি ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মক্কার দিকে আসছেন, তখন তারা পাঠালো মিখরাজ ইবন হাফসকে। রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর সাহাবিরা তখনো মক্কা থেকে আট মাইল দূরে বনু ইয়াজুজে। মিখরাহ আল্লাহর রাসূলকে বললো,

'মুহাম্মাদ! যৌবনে বা বার্ধক্যে কখনো আপনি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। আপনি আর আপনার লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হারামে প্রবেশ করছেন। অথচ আপনি বলেছেন চুক্তিমতে যেভাবে প্রবেশ করার কথা আপনি সেভাবেই প্রবেশ করবেন। কথা ছিল আপনাদের সাথে কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু এখন এসব কী দেখছি?'

মক্কার কুরাইশরা বলাবলি করছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ চুক্তিভঙ্গ করে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ মিখরাজকে আশ্বস্ত করলেন, 'চিন্তা কোরো না, আমাদের যেভাবে প্রবেশ করার কথা ছিল আমরা সেভাবেই প্রবেশ করবো।' এ কথা

শুনে মিখরাজ কুরাইশদের বলে আসলো, 'মুহাম্মাদ অস্ত্র সহকারে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। তিনি চুক্তির শর্ত মেনেই মক্কায় আসবেন।'

লক্ষণীয় হলো, কুফফারদের চোখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন ছিলেন। মক্কার কাফিররাই সাক্ষ্য দিত তিনি একজন সত্যবাদী লোক -- আল আমীন। শত্রুরাও জানতো, তিনি এক কথার মানুষ। তারা তাঁকে অপছন্দ করতো ঠিকই কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি এত অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন যে তাকে কদর না করে উপায় ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভারী অস্ত্রশস্ত্র মক্কার সীমানার ঠিক বাইরে রেখে গেলেন যেন হঠাৎ প্রয়োজন পড়লে সেগুলো ব্যবহার করা যায়। তিনি এগুলো সাথে রেখেছিলেন তাঁর নিরাপত্তার জন্য, যুদ্ধ করার জন্য নয়। এগুলোর দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার উপরে। তাঁর সাথে ছিল দুশো ঘোড়সওয়ারি। তারা মক্কার বাইরে অবস্থান করছিলেন। কুরাইশদের সাথে তার শান্তিচুক্তি ছিল সত্যি কিন্তু তিনি তাদের অঙ্গীকারের উপর শতভাগ আস্থা রাখেননি, কারণ ইসলামের শত্রুদের কখনই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

সাহাবিদের নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ উমরা সম্পাদন

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। সাহাবিরা খাপখোলা তলোয়ার হাতে তাঁকে ঘিরে রেখে এগোতে লাগলেন। মক্কার লোকেরা অনেকেই আগ্রহভরে মুসলিমদের দেখছিল। কেউ কেউ এই দৃশ্য দেখার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়ে।

মক্কার মুশরিকরা গুজব ছড়ালো মদীনার মুসলিমরা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল আর নিস্তেজ হয়ে গেছে। তারা হয়তো এসব কথা বলে মুসলিমদের মানসিকভাবে দুর্বল করতে চাইছিল। তাদের এই গুজবের জবাব দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের আদেশ করলেন যেন তারা নিজেদের ডান কাঁধ উন্মুক্ত করে দিয়ে জোরে জোরে তাওয়াফ করেন। তিনি চাইছিলেন কুফফাররা মুসলিমদের মাঝে দুর্বলতার বিন্দুমাত্র ছাপও যেন খুঁজে না পায়। আর হয়েছিলও তাই, কুফফাররা মুসলিমদের এভাবে তাওয়াফ করতে দেখে বলে, 'ওদেরকে দেখে তো মোটেও দুর্বল মনে হচ্ছে না...'

মুসলিমরা রুকন ইয়ামিন এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি জায়গাটা ছাড়া বাকি অংশে খুব দ্রুত হাঁটলেন। রুকন ইয়ামিন এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝে তারা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেন কেননা সেখানে তাদেরকে কাফিররা দেখতে পাচ্ছিলো না। এভাবে সাতবারের মধ্যে প্রথম তিনবার তারা এভাবেই জোরে হেঁটে তাওয়াফ করলেন।

তারা এসেছিলেন উমরা করতে। কিন্তু একটা চাপা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছিল দুই শিবিরের মাঝে। জোরে জোরে তাওয়াফ, ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা, জোরে জোরে হাঁটা এই সবই তাঁরা করছিলেন কুরাইশদের কাছে একটি বার্তা দেওয়ার জন্য --

আমাদেরকে দুর্বল ভেবো না। এমনটা উহুদের যুদ্ধেও দেখা গেছে। আবু দুজানাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাথায় লাল পট্টি বেঁধে বীরদর্পে হাঁটার অনুমতি দিয়েছেন যেন কুফফারদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন মুসলিমরা কুরবানি করার পশু নিয়ে যায়, তখন বেছে বেছে আবু জাহলের একটা উটকেও সাথে রাখা হয় যেন সেটা দেখে কুরাইশরা রাগে-দুঃখে ফুঁসতে পারে। এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, ইচ্ছে করেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কুফফারদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ কেবল মাঠে-ময়দানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই যুদ্ধ মন আর মননের যুদ্ধও বটে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবিরা তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। এরপর তিনি কিছু সাহাবিকে মক্কার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে, যেন বাকি যারা তাওয়াফ করতে পারেনি তারা মক্কায় এসে তাওয়াফ করে নিতে পারে। এভাবেই মক্কায় আগত সমস্ত মুসলিম উমরা সম্পন্ন করলো।

মাইমুনা বিনত আল-হারিসের ﷺ সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিয়ে

মাইমুনাহ বিনত আল হারিস ﷺ ছিলেন আল-আব্বাস ইবন মুত্তালিবের স্ত্রী উম্ম ফাদলের বোন। তার আগের স্বামী আবু রুহম মারা গেলে তিনি আরেকটি বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করলেন। আল-আব্বাস তার ভাতিজা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ মাইমুনাহর স্বামী হিসেবে পছন্দ করলেন, মোহরানা নির্ধারিত হলো চারশো দিরহাম। আল-আব্বাস নিজের পকেট থেকে চারশো দিরহাম দিয়ে রাসূলুল্লাহর পক্ষে বিয়ের মোহরানা আদায় করলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় বেশ দ্রুতই বিয়েটি হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন মক্কায় থাকতে থাকতেই এই বিয়ের ওয়ালিমা করে যেতে, কিন্তু ততদিনে তিনদিন পার হয়ে গেছে। হুয়াইতাব ইবন আবদুল উযযাহ, সুহাইল ইবন আমর -- এরা এসে রাসূলুল্লাহকে ﷺ মক্কা ছেড়ে যাবার জন্য তাগাদা দিতে লাগলো। 'আপনার সময় শেষ, আপনি চলে যান।' চুক্তিবদ্ধ একটি মানুষের সাথে ন্যূনতম ভদ্রতাবোধ বজায় রাখার মতো অবস্থাও তাদের ছিল না। বিদ্বেষের বিষাক্ত গরল যেন তাদের অন্তর দিয়ে উপচে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তারা তিনদিনের বেশি একটা দিনও সহ্য করতে পারছিল না, এতটাই ছিল তাদের বিদ্বেষের মাত্রা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'আমি তো তোমাদেরই এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। আমি যদি এখানেই আমার বিয়েটা সম্পন্ন করি আর তোমাদের জন্য কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করি, তাহলে ক্ষতি কী?' নবীজি চাইছিলেন এই বিয়ের মাধ্যমে কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে। কিন্তু কুরাইশরা গোঁয়ারের মতো বলতেই থাকলো, 'না, আপনার ভোজের কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই, আপনি চলে যান।' এই কথার পরে আর মক্কায় থাকা যায় না। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন এবং সারিফে তার ওয়ালিমা সম্পন্ন করলেন। মাইমুনাহ ﷺ ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ সর্বশেষ স্ত্রী। মাইমুনাহ মারা যান সেই সারিফেই, যেখানে তার ওয়ালিমা হয়েছিল।

হামযা-কন্যাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে চলে যাচ্ছিলেন, সে মুহূর্তে এক অল্পবয়স্ক বালিকা দৌড়ে এসে বলতে লাগলো, 'চাচা! চাচা! চাচা!' সে মদীনায় যেতে চাচ্ছিল। এই হলো উহুদ যুদ্ধে শহীদ হামযা ইবন আল-মুত্তালিবের ﷺ মেয়ে। আলী ইবন আবু তালিব তাকে খপ করে ধরে এনে স্ত্রী ফাতিমার কাছে দিয়ে বললেন, 'তোমার চাচাতো বোনের যত্ন নাও। তাকে মদীনায় ফিরিয়ে নিতে হবে।' ওদিকে জাফর ইবন আবি তালিব বাধ সাধলেন, বললেন, 'না, ওকে আমি নিতে চাই।' আলী অধিকার দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি ওর চাচাতো ভাই!' জাফরও ছাড়বার পাত্র নন, বললেন, 'আমিও ওর চাচাতো ভাই আর আমার স্ত্রী ওর খালা!'

যেন এই বিবাদ যথেষ্ট ছিল না, তৃতীয় আরও একজন সেখানে উদয় হলেন -- যাইদ ইবন হারিসা ﷺ। তিনি এসেই বললেন, 'ও তো আমার ভাইয়ের মেয়ে!' হামযার মেয়েকে নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রিয় চাচার মেয়ের দায়িত্ব বলে কথা-- কেউই এত বড় একটা কাজের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আসলেন তাদের এই মধুর দ্বন্দ্ব মিটমাট করতে। সেই বালিকার দায়িত্ব তুলে দিলেন জাফর ইবন আবি তালিবের স্ত্রীর হাতে, আর সেই সাথে কারণটাও ব্যাখ্যা করলেন, বললেন, 'খালার মর্যাদা মায়ের সমতুল্য।' বাকিরা যেন মন খারাপ না করে এজন্যই হয়তো নবীজি এরপর একে একে প্রত্যেকের প্রশংসা করলেন। আলীকে বললেন, 'তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে।' যাইদকে বললেন, 'তুমি হলে আমাদের ভাই এবং আমাদের মাওলা।' আর জাফরকে বললেন, 'চেহারায় আর চরিত্রে আমার সাথে যার সবচাইতে মিল সে হচ্ছো তুমি।'[99]

অন্ধকার থেকে আলোর পথে

দীর্ঘ শীতের রাতের ঘন জমে থাকা অন্ধকারের পর হঠাৎ করেই যেমন ভোরের আলোর রেখা একটু একটু করে দিগন্ত জুড়ে আলোকিত করে তোলে, ঠিক তেমনি উমরাতুল কাযার মাধ্যমে মক্কার লোকদের অন্তরে ইসলামের আলো প্রবেশ করতে শুরু করলো। দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে যুদ্ধ করেও যখন তারা নবীজিকে ﷺ পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা আস্তে আস্তে এটাই বুঝতে শুরু করলো তিনি আসলেই আল্লাহর একজন রাসূল। কুরাইশ নেতাদের অনেকেই উপলব্ধি করতে থাকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে তারা ইতিমধ্যেই হেরে গেছে, ময়দানের যুদ্ধে পরাজয় কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। এরই হাত ধরে অষ্টম হিজরীতে কুরাইশদের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তারা হলেন আমর ইবন আল-আস, খালিদ ইবন ওয়ালিদ এবং উসমান ইবন তালহা।

---

[99] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ২৮৬।

আমর ইবন আল আসের ﷺ ইসলাম গ্রহণ

'আমি বদরের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম এবং আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম এবং আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছিলেন। আমি খন্দকের যুদ্ধেও আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম এবং আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছিলেন।'

কথাগুলো আমর ইবন আল-আস ﷺ বলেছিলেন মুসলিম হওয়ার পর। এই কথাগুলো বলে আমর ﷺ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন এই ভেবে যে, আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি কত বড় ভুলই না করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ তবু তাকে সুযোগ দিয়েছেন। যদি আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি মারা যেতেন তাহলে তার স্থান হতো নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে, কিন্তু আজ তিনি ইসলামের ছায়ায় এসে নিরাপদ হয়েছেন।

আমর ছিলেন একজন কুশলী রাজনীতিক। তিনি বুঝতে পারছিলেন কুরাইশদের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিস্তীর্ণ পৃথিবী কুরাইশদের জন্য দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। যে ইসলামের বিরুদ্ধে জান বাজি রেখে এতদিন যুদ্ধ করে এসেছেন, আজ সে মুসলিমরাই কুরাইশদের দরজায় কড়া নাড়ছে। হতাশা আর গ্লানিবোধ আমরকে চেপে ধরে। ইসলামের বিজয় তার সহ্য হচ্ছিল না, তিনি সিদ্ধান্ত নেন সবকিছু ছেড়েছুড়ে আবিসিনিয়ায় চলে যাবেন। সত্যকে গ্রহণ করার মনোবল তার ছিল না। সত্য থেকে পালিয়ে বেড়ানোর জন্য অন্য কোথাও চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না।

'আমি মনে করিনা মক্কায় থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বরং আমাদের উচিত আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশীর কাছে চলে যাওয়া এবং সেখানেই থাকা। যদি মুহাম্মাদ বিজয়ী হয়, তাহলে আমরা নাজ্জাশীর অধীনেই থাকবো। মুহাম্মাদের রাজত্বে থাকার চাইতে নাজ্জাশীর রাজত্বে থাকা ঢের ভালো। আর যদি আমাদের লোকেরা জয়ী হয়, তাহলে তারা আমাদের প্রতি সদয় হবে বলে আমার বিশ্বাস। তারা তো আমাদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে জানেই।'

আমর আবিসিনিয়ায় চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। নাজ্জাশীর সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। আমর আবিসিনিয়ার পথে তার লোকবল নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন, সাথে উপহার হিসেবে নিয়ে গেলেন একগাদা চামড়া। আবিসিনিয়ায় আরবের চামড়ার খুব কদর ছিল।

নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে আমরের মাথা খারাপ হয়ে গেল। তিনি দেখলেন নাজ্জাশীর দরবার থেকে বের হয়ে আসছেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহাবি আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরী ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিশেষ কাজে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। বন্ধুদের পেছনে রেখে আমর একাই দরবারে ঢুকে পড়লেন। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান

জানালেন, তাকে সাদরে বরণ করা হলো। আন-নাজ্জাশী তাঁকে বললেন, 'স্বাগতম বন্ধু! তোমার দেশ থেকে আমার জন্য কী এনেছো?' আমর বললেন, 'আপনার জন্য কিছু চামড়া নিয়ে এসেছি।'

আমর নাজ্জাশীকে এরপর বললেন, 'হে সম্রাট! আমি একটা লোককে আপনার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছি। এই লোক হলো আমাদের শত্রুর বার্তাবাহক। এরা আমাদের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। আপনি কি তাকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন যেন আমরা তাকে হত্যা করতে পারি?' এই কথা শুনে আন-নাজ্জাশী প্রচণ্ড রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে আমরের মুখে আঘাত করে বসলেন। বললেন,

'তুমি আমাকে সেই মানুষটির বার্তাবাহককে তোমার হাতে তুলে দিতে বলছো যার কাছে খোদ আন-নামূস আল-আকবর (জিবরীল) আসা-যাওয়া করেন? এই একই নামূস আল-আকবর আসতেন নবী মূসার কাছে! তুমি চাও তাঁর বার্তাবাহককে আমি তোমার কাছে তুলে দিই? তোমার জন্য দুর্ভোগ! এই আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা শোনো আমর! তুমি এই মানুষটিকে মেনে নাও। যারা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করবে, তাদের সবার বিরুদ্ধে তিনি জয়ী হবেন। যেভাবে মূসা বিজয়ী হয়েছিলেন ফিরআউন আর তার সেনাবিহিনির বিরুদ্ধে।'

লজ্জায়-অপমানে আমরের সেদিন মরে যেতে ইচ্ছে হলো। আর একই সাথে তার হৃদয়ে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনও এল। জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি অনুভব করলেন তিনি আসলে এতদিন ধরে একটা মিথ্যাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে আছেন। বুঝতে পারলেন ইসলামই হলো সত্য দ্বীন। এই দ্বীন থেকে এভাবে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। তৎক্ষণাৎ আমর সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম হয়ে যাবেন। নাজ্জাশীকে বললেন, 'আপনি কি আল্লাহর রাসূলের হয়ে আমার কাছ থেকে ইসলামের বাইয়াত নেবেন?' নাজ্জাশী হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমর আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। জীবনে অনেক ভুল করেছেন। আর দেরি নয়। সঙ্গে সঙ্গে আমর কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন।

পুরো ঘটনাটি ঘটেছিল গোপনে, আমর তার লোকদের কাছে তখনকার জন্য পুরো ব্যাপারটিই বেমালুম চেপে গেলেন।

বেশ কিছুদিন সেখানে থাকার পর একদিন তিনি আরবের দিকে রওনা হলেন। এবারের উদ্দেশ্য মক্কা নয়, মদীনা। পথিমধ্যে তার সাথে দেখা হলো আরও দু'জনের -- খালিদ ইবন ওয়ালিদ এবং উসমান ইবন তালহা। তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' খালিদ ইবন ওয়ালিদ উত্তর দিলেন, 'সত্য পথ আজ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঐ মানুষটি আসলেই আল্লাহর একজন রাসূল। আমি তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি।' আমর বললেন, 'সেই একই কারণে আমিও আজ ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি।'

তাঁরা মদীনার দিকে রওনা হলেন। তাদের আগমনের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই টের পেয়েছিলেন। বিশাল মনের সেই মানুষটি হাসিমুখে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই লোকগুলো কিছুদিন আগেও ছিল তাঁর শত্রু, তাঁকে তারা দেশ বের করে দিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু যখনই তারা ইসলাম গ্রহণ করতে এলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ অতীতের সমস্ত কিছুকে ভুলে গিয়ে সাদরে তাদেরকে গ্রহণ করে নিলেন। কারণ এই বিরোধ কোনো ব্যক্তিগত রেষারেষি বা ক্ষোভের কারণে ছিল না। বরং এই বিরোধিতা ছিল আদর্শিক বিরোধিতা। তাই যখনই তারা মুসলিম হয়ে গেলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ভেবে খুশি হলেন যে, যারা এতদিন তাগুতের সৈনিক ছিল এখন থেকে সেই দুজনই হবে আল্লাহর সৈনিক।

প্রথমে মুসলিম হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ। এরপরে এলেন আমর ﷺ। তার ভাষায়,

'আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করালেন, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে বললাম, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে আনুগত্যের শপথ করতে চাই। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু আমি বাড়ালাম না। তিনি জানতে চাইলেন, কী হয়েছে আমর? আমি বললাম, আমি এক শর্তে বাইয়াত করতে চাই। তিনি জানতে চাইলেন, কী শর্তে? আমি বললাম, আমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন এই শর্তে যে, আল্লাহ আমার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তখন বললেন, আমর! তুমি কি জানো না, ইসলাম আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়, হিজরত আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয় এবং হজ্জ আগের সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয়?'

এভাবে আমর মুসলিম হয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমর ইবন আল আসকে অনেক কদর করতেন। তার প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন, অন্য অনেকের চাইতে তাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। আবু বকর আর উমারও ﷺ তার ব্যতিক্রম করেননি।

খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদের ﷺ ইসলাম গ্রহণ

'আল্লাহ যখন আমার ভালো চাইলেন, তখন আমার অন্তরে ইসলামের জন্য ভালোবাসা তৈরি করে দিলেন এবং আমাকে বুঝ দান করলেন। তখন আমি নিজেই নিজেকে বলতাম, আমি মুহাম্মাদের ﷺ বিরুদ্ধে কতবার যুদ্ধ করলাম। কিন্তু প্রতিবারই মনে হতো খালি খালিই এত কষ্ট করছি, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদই বিজয়ী হবেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন হুদাইবিয়ায় আসলেন, তখন আমি দুইশো মুশরিকের একটি দল নিয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে বেরিয়ে পড়লাম। আল্লাহর রাসূল আর তাঁর সাহাবিদের দেখা পেলাম উসফানে। আল্লাহর রাসূলকে ﷺ একেবারে মুখোমুখি পেয়ে গেলাম। তখন তিনি সাহাবিদের নিয়ে যুহরের সালাতে ইমামতি করছিলেন। আমরা ঠিক করলাম তাঁকে আক্রমণ করবো। কিন্তু কেন যেন আর আক্রমণ করা হয়ে উঠলো না -- আসলে, এটার মাঝেই কল্যাণ ছিল। ওদিকে তিনি আমাদের পরিকল্পনা টের পেয়েছিলেন,

তাই আসরের সময় সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। বিষয়টা আমাকে খুব নাড়া দিল। আমার মনে হলো কোনো না কোনোভাবে তিনি আমাদের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবেনই, আমরা তাঁর কিছুই করতে পারবো না।'

এরপর হুদাইবিয়ার সন্ধি হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদের মাথায় হাজির হলো এক ঝাঁক প্রশ্ন আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব -- 'আমার জীবনে আর কী আছে? আমি কোথায় যাবো? নাজ্জাশীর কাছে? না, সে তো নিজেই মুহাম্মাদের ﷺ অনুসারী হয়ে পড়েছে। তার রাজ্যে মুসলিমরা নিরাপদ। তবে কি আমি হেরাক্লিয়াসের কাছে যাবো? কিন্তু সেখানে গেলে আমাকে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান বা ইহুদি হয়ে যেতে হবে। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে জীবন কাটাতে হবে। নাকি আমি নিজের দেশেই থেকে যাব?'

এভাবেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর হতাশার মধ্যে এক একটা দিন কাটতে লাগলো। উমরাতুল কাযার সময় এল। মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীরা উমরা পালন করবেন -- এই দৃশ্য সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি খালিদের ছিল না। তিনি মক্কা থেকে অনেক দূরে এক জায়গায় চলে গেলেন। সেবার উমরা করতে এসেছিলেন তারই ভাই আল- ওয়ালিদ ইবন আল- ওয়ালিদ। তিনি যাবার সময়ে ভাইয়ের জন্য একটা চিঠি রেখে গেলেন। চিঠিতে লেখা ছিল,

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইসলামের প্রতি তোমার বিদ্বেষ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তোমার মতো একটা বুদ্ধিমান লোক কী করে ইসলামের বিরোধিতা করে! মানুষ কেমন করে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে -- আমার বুঝে আসে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমার কথা জানতে চেয়েছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন খালিদ কোথায়? আমি বলেছি, আল্লাহ তাঁকে নিয়ে আসবেন। এরপর তিনি বলেছেন, তার মতো মানুষ ইসলামকে উপেক্ষা করে কীভাবে! সে যদি তার শক্তি আর সাহসকে মুসলিমদের পক্ষে ঢেলে দিতো, তাহলে সেটাই তার জন্য উত্তম হতো আর আমরাও তাকে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিতাম। ভাই, নিজেকে তুমি অনেক বঞ্চিত করেছো, আর নিজেকে বঞ্চিত কোরো না।'

এরপর খালিদ বর্ণনা করেন,

'চিঠিটি পড়ে আমি এখান থেকে পালাবার শক্তি ফিরে পেলাম। আর ইসলাম গ্রহণের প্রতি ইচ্ছেও বেড়ে গেল। আমার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের ﷺ মন্তব্য শুনে খুশি খুশি লাগছিল। আরও একটা ব্যাপার ছিল। একটা স্বপ্ন। আমি একদিন স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটা সংকীর্ণ, আবদ্ধ, খরাপীড়িত দেশে ছিলাম। সেখান থেকে সবুজ, উর্বর আর বিস্তীর্ণ এক দেশে চলে এসেছি। আমার মনে হলো, নিশ্চয়ই এই স্বপ্নের কোনো গূঢ় অর্থ আছে।'

মদীনায় যাবার পর খালিদ আবু বকরের ﷺ কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। আবু বকর তাকে বলেন, 'এই স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে তুমি শিরক থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছো।'

খালিদ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি মুসলিম হয়ে যাবেন এবং মদীনায় হিজরত করবেন। তার ইচ্ছে হলো হিজরতের যাত্রাপথে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সমমনা কাউকে সাথে নিতে। প্রথমে গেলেন সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার কাছে। সাফওয়ানের কাছে নিজের মুসলিম হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন, 'আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছো। অল্প কিছু লোকই আমাদের ধর্মের উপরে আছে। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের সম্মানই আরবদের সম্মান।' সাফওয়ান তখন সাফ জানিয়ে দিলো, 'সবাই মুসলিম হয়ে গেলেও আমি কোনোদিন মুসলিম হবো না।'

এরপর গেলেন আবু জাহলের ছেলে ইকরিমার কাছে। তাকেও একই কথা বললেন। ইকরিমাও মুসলিম হতে প্রত্যাখ্যান করলো। এরপর তার সাথে দেখা হলো উসমান ইবন তালহার সাথে। খালিদ প্রথমে ভাবলেন উসমানের সাথে এই বিষয় নিয়ে কোনো আলাপ করবেন না। কারণ এই উসমান পরিবারের সাত সদস্য উহুদে মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু তারপরেই ভাবলেন, 'আচ্ছা, কী-ই আর এমন হবে এ কথা বললে? আমি তো চলেই যাচ্ছি, কথা বলেই যাই।' কত বিস্ময়কর ঘটনাই তো দুনিয়াতে ঘটে। উসমান ইবন তালহা, যার পরিবারের সাত সাত জন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে, সে-ই তালহাকেই দেখা গেল ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী। তারা দুজনে এবার একসাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পথিমধ্যে দেখা হলো আমর ইবন আল-আসের সাথে, যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনজন মিলে একসাথে মদীনায় গেলেন।

মদীনার সীমান্তে এসে খালিদ কাপড় বদলে ভালো পোশাক পরে নিলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের জন্য সুন্দর করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সবাই। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা হলো। খালিদকে সেই দূর থেকে দেখার পর থেকেই রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে এক চিলতে হাসি ঝুলেই আছে। খালিদ কাছে আসলেন, বাইয়াত দিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে পথ দেখিয়েছেন। আমি তোমার মাঝে বুদ্ধির ছাপ দেখেছি, আর আশা করেছি তোমার বুদ্ধিমত্তা তোমাকে ভালো পথে নিয়ে আসবে।' খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি তো জানেন যে, আমি আপনার বিরোধিতা করেছি। গোঁয়ারের মতো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছি। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন।'

নবীজি ﷺ বললেন, 'ইসলাম তো আগের সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয়।' খালিদ বললেন, 'তবুও আপনি আমার জন্য দুআ করে দিন। নবীজি তখন দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে খালিদ যা কিছু করেছে, তার জন্য আপনি খালিদকে ক্ষমা করে দিন।'

খালিদের পর একে একে আমর ইবন আল আস ﷺ এবং উসমান ইবন তালহা ﷺ বাইয়াত করলেন। কুরাইশদের তিন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে চলে এল। তাদের ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলিমদের বিজয় আর মুশরিকদের পরাজয়।

শিক্ষা

১) হিদায়াহ কোনো নিয়মের ধার ধারে না

হিদায়াহ কোনো বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না। এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াহ দেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহ করেন। এ কারণে আমরা দেখি, খোদ নবীজির চাচা আবু তালিব, যিনি আমৃত্যু নবীজিকে সুরক্ষা দিয়ে এসেছেন, তিনি মুসলিম হননি। কিন্তু ডাকাত গোত্র গিফার থেকে আগত আবু যর ﷺ মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। নবীজির আরেক চাচা আবু লাহাব, যার পুত্রদ্বয়ের সাথে নবীজির দুই কন্যার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে ছিল, সে মুসলিম হয়নি, হয়েছেন সুদূর পারস্য থেকে আগত সালমান আল-ফারসি ﷺ। আমরা দেখি তুলাইহা আল-আসাদীর ﷺ মতো মানুষকে যিনি কিনা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিনগ্রস্ত ভেবে তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিলেন, এরপর নবীজির মুখে স্রেফ দু লাইনের খুতবার দুআ শুনে সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম হয়ে যান। অথচ আমর ইবন আল-আস, যিনি কিনা এত বছর ধরে নবীজিকে কাছ থেকে দেখেছেন, কথা বলেছেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি, শেষমেশ আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কথায় তার অন্তর গলেছে। ইসলামের ঘোরশত্রু উসমান ইবন তালহা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আরবের সেরা কবি ওয়ালিদ ইবন মুগীরা, যে ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণায় অগ্রগামী এক বুদ্ধিজীবী, তার ছেলে খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অমুসলিম অবস্থাতেই মারা গেছেন আল্লাহর রাসূলকে বছরের পর বছর আগলে রাখা চাচা আবু তালিব।

হিদায়াহ এমন এক জিনিস যা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আমরা যাকে চাই, তাকে হিদায়াত দিতে পারবো না, বরং আল্লাহ যাকে চান, তাকে হিদায়াত করেন। কিন্তু এই বিষয়টি বুঝতে না পারার কারণে আজকাল অনেক মুসলিম কাফিরদের সামনে ইসলামকে কিছুটা ঘষামাজা করে উপস্থাপন করে। বর্তমান সময়ে 'স্পর্শকাতর' কিছু বিষয় যেমন জিহাদ, বহুবিবাহ, হুদুদ এসবের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান তারা এড়িয়ে যেতে চায় বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অথবা কাটছাঁট করে উপস্থাপন করে। তারা মনে করে এভাবে তুলে ধরলে কাফির ও জাহিল মুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে কাফিরদের সামনে গ্রহণযোগ্যভাবে তুলে ধরা।

কিন্তু উদ্দেশ্য ভালো হলেও এটা অন্যায়। আল্লাহ তাআলা যে দ্বীন আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তাকে কাটছাঁট করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। দাওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর উপস্থাপনা এবং উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা জরুরি তবে তার মানে এই নয় যে, ইসলামকে বদলে ফেলতে হবে বা ইসলামের সত্যকে গোপন করতে হবে। কাফিরদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করাটা হতে হবে আমাদের মূল

উদ্দেশ্য, তাদেরকে খুশি করা নয়। হিদায়াত আল্লাহর হাতে, কারো ইসলাম গ্রহণের জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট, আর কাউকে কুফরি থেকে ফেরানোর জন্য একশোটি নিদর্শনও যথেষ্ট হয় না।

আরও একটি ব্যাপার হলো, মানুষ সম্পর্কে আগেভাগে খুব বেশি বিচার করা উচিত নয়। খালিদ ইবন ওয়ালিদের কাছে মনে হয়েছিল উসমান ইবন তালহা ইসলাম গ্রহণ করবেন না, কিন্তু তিনি সেটা করেছেন। কাজেই কারো ব্যাপারে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে সে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করবে না। আমাদের দায়িত্ব হলো দাওয়াত দেওয়া, কথার ভেলকিবাজি বা চমৎকারিত্ব বা ইসলামের মিষ্টিমধুর পশ্চিমা ভার্সন মানুষের অন্তরকে বদলাতে পারে না। মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়াজালের হাতে।

২) যোগ্যতার কদর করা

ভালো নেতার একটা গুণ হলো তার অধীনস্থদের যোগ্যতাকে কদর করা। খালিদ ইবন ওয়ালিদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ মন্তব্য করেছিলেন, 'সে যদি ইসলাম গ্রহণ করতো তাহলে আমরা তাকে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিতাম।' সাহাবিদের সময়ে কারো মর্যাদা নির্ণীত হয় কে কত আগে মুসলিম হয়েছে তার ওপর। কিন্তু এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, খালিদ দেরিতে মুসলিম হলেও তাকে অন্য অনেকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। এর কারণ হলো খালিদের এমন কিছু যোগ্যতা আর পারদর্শিতা ছিল যা অন্য কারো মধ্যে ছিল না। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে প্রশংসা এবং আশ্বাস পাওয়ার কারণে খালিদের ইসলাম গ্রহণের পথ সহজ হয়ে যায়। মানুষের সক্ষমতা ও দক্ষতাকে চিনতে পারা নেতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সব মানুষ সমান না, একেকজন একেকরকম। কিছু মানুষের এমন গুণ আছে যা অন্যদের নেই। কেউ তেজস্বী, কেউ দুর্বল। কেউ বুদ্ধিমান, কেউ শক্তিশালী -- আল্লাহ তাআলা এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। নেতৃত্ব হলো সঠিক মানুষকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করার সক্ষমতা।

মু'তার যুদ্ধ

প্রেক্ষাপট

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের এই পর্যায় পর্যন্ত যতগুলো জিহাদ হয়েছে সেগুলোর পরিধি মূলত আরবের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক শক্তিগুলো দমন করা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। মু'তার যুদ্ধকে বলা যেতে পারে একটি নতুন পর্যায়ের সূচনাবিন্দু, কেননা এর মাধ্যমে মুসলিমরা বিশ্বের তৎকালীন পরাশক্তি বা 'সুপার-পাওয়ার' রোমানদের সাথে সংঘাতে প্রবেশ করে। মু'তার যুদ্ধের মাধ্যমে রোমানদের সাথে মুসলিমদের যে সংঘাতের সূচনা হয়েছে, তা চলতে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। এটি একাধিক হাদীস থেকে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রোমান বা রুম বলতে হাদীসে মূলত পশ্চিমাদের বোঝানো হয়েছে। আর শাম বলতে বোঝানো হয় বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন এবং জর্ডান এই দেশগুলোকে।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিপক্ষশক্তি ছিল আরবের গাসসান গোত্র এবং বাইজেন্টাইন বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য। গাসসান হলো একদল আরব খ্রিস্টান। সে সময়ে তারা ছিল রোমানদের আশ্রিত বা আজ্ঞাবহ একটি রাজনৈতিক শক্তি। বর্তমানকালের পরিভাষায় বলা যেতে পারে Vassal State।

মু'তার যুদ্ধে মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা সর্বপ্রথম মুখোমুখি হয় একটি যুদ্ধের ময়দানে। যদিও এই যুদ্ধের সূত্রপাত আরও বেশ ক'বছর আগ থেকেই হয়েছে। এর আগে দুমাতুল জান্দালে দুটো সারিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো ছিল আরব খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরবের উত্তরদিকের গোত্রগুলোর সামরিক তৎপরতা বেড়ে যায়। বিষয়টা বেশ গুরুতর পর্যায় ধারণ করে যখন তারা আল-হারিস ইবন উমায়ের আল-আযদীকে ﷺ হত্যা করে। আল-হারিস ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ পক্ষ থেকে রোমান গভর্নরের কাছে প্রেরিত দূত। দামাস্কাসের রাজার কাছে দূত পাঠানো হলে সে কোনো পাত্তা তো দেয়ইনি, উল্টো মদীনা আক্রমণের হুমকি দেয়।

অন্যদিকে যাত-আতলাহ নামক স্থানে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাঠিয়েছিলেন আমর ইবন কা'বের নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি দলকে। তারা সে অঞ্চলের লোকদের ইসলামের দিকে আহবান করেন কিন্তু তারা এর জবাবে তীর ছুঁড়তে থাকে। আমর ইবন কা'ব ছাড়া সবাই মারা যান। এই ঘটনাগুলো ঘটে মূলত শামে। তৎকালীন শাম ছিল রোমান সাম্রাজ্যের মদদপুষ্ট। তারা শামের মুসলিমদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। মাআনের গভর্নর মুসলিম হয়েছে এই খবর শুনে তারা তাকেও হত্যা করে। এভাবেই তৈরি হয় মু'তার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট।

এই যুদ্ধ ছিল মুসলিম এবং রোমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধ। সীরাতে এটাই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ সরাসরি অংশগ্রহণ না থাকা সত্ত্বেও এই যুদ্ধকে গাযওয়া হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব যুদ্ধে থাকতেন সেগুলোকে বলা হয় গাযওয়া, আর তিনি না থাকলে সারিয়াহ। তাৎপর্যের দিক থেকে তাই মু'তার যুদ্ধ বদর, উহুদের কাতারে চলে আসে।

আমীর নির্বাচন

আশ-শামে রোমানদের ভূমি আক্রমণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন হাজার জনের একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। সাধারণত কোনো অভিযান পাঠানোর সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ একজন আমীর নিযুক্ত করে দিতেন। কিন্তু এবারে তার ব্যতিক্রম হলো। তিনি ক্রমানুসারে তিনজন সাহাবিকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। বললেন, 'আমীর হচ্ছে যায়িদ ইবন হারিসা। যদি সে শহীদ হয়, তাহলে জাফর ইবন আবি তালিব। আর যদি সেও শহীদ হয়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা।'

সেদিন ছিল শুক্রবার। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ ভাবলেন, 'আচ্ছা আমি তো একা মানুষ। আমি একটু পরে বেরোলে আর কী এমন হবে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে জুমুআ আদায় করে তারপরই বের হই। এরপর মূল বাহিনীর সাথে যোগ দেবো।'

সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সঙ্গ পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে থাকতেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা আল্লাহর রাসূলের সাথে জুমুআ আদায় করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চাইলেন না। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না এই কাজের চেয়ে আরও দামি কাজ হাতছাড়া হয়ে গেল!

জুমুআর সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বিষয়টা খেয়াল করলেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি! তুমি পেছনে পড়ে আছো যে?' আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন, 'আমি চেয়েছিলাম আপনার সাথে জুমুআর সালাত আদায় করতে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত টাকাও খরচ করে ফেলো, তবুও তাদের ধরতে পারবে না।'[100]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আক্ষরিক অর্থে এটা বোঝাননি যে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তার বাহিনীর সাথে যোগ দিতে পারবেন না। তিনি বুঝিয়েছেন -- যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত টাকাও খরচ করো, পুরস্কারের দিক থেকে কখনো তাদের ধরতে পারবে না। তাদের পেছনেই পড়ে থাকবে। অথচ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা খুব অল্প সময়ের জন্যই পেছনে ছিলেন -- ফজর থেকে জুমুআ। কিন্তু ততক্ষণে তার বাহিনী রওনা হয়ে গেছে।

---

[100] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১।

আর তিনি যে ফযিলত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, সেটা আর কিছুতেই ফিরে পাবার নয়। এমনকি যদি তিনি খোদ আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে জুমুআ আদায় করেন, তাও সেই ফযিলতের সমান হবে না। আল্লাহর রাসূলের সাথে থেকে তিনি হয়তো আরও জ্ঞান লাভ করতে পারতেন, শিখতে পারতেন আরও অনেক কিছু। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর সাথে বের হয়ে পড়া ছিল তার থেকেও বেশি ফযিলতপূর্ণ।

যদিও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কাহিনীটি হাদীসের সনদ বিবেচনায় খুব একটা শক্তিশালী নয়। তবে এই প্রসঙ্গে অন্য সহীহ হাদীস আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কোনো মুজাহিদ বাহিনীর সাথে বের হওয়া অথবা তাদের সাথে ফিরে আসা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চাইতে উত্তম।'[101]

জিহাদ যখন ফরয হয়ে যায় তখন অন্য কোনো অজুহাতে জিহাদ পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পরিত্যাগ করেননি। তিনি একটু দেরিতে সেই বাহিনীর সাথে যোগ দিতে চেয়েছেন। সেটাও আলস্যের কারণে নয়। তিনি চেয়েছেন আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে আরও কিছু সময় থাকতে। কিন্তু এটাও আল্লাহর রাসূল ﷺ পছন্দ করেননি। আর যারা জিহাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে, তাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে আরও শোচনীয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিচ্ছিলেন, পেছনে বসে থাকার কোনো অজুহাত নেই। আমরা জানি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হতে পারে নিজের জান দিয়ে, মাল দিয়ে অথবা মুখের কথা দিয়ে। কিন্তু এই হাদীসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অনেকে ময়দানে যেতে চায় না। এটা সঠিক নয়। শুধুমাত্র সম্পদ বা মুখের কথা দিয়ে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করা যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে সাহাবিদের মাঝে যারা আলিম বা মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন তারা মদীনায় বসে থাকতে পারতেন। কিন্তু সেটা হয়নি। কুরআনে হাফিয উবাই ইবন কা'ব রাসূলুল্লাহর ﷺ সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতেন। মুআয ইবন জাবালের মতো আলিম, উসমান ইবন আফফান কিংবা আবদুর রাহমান ইবন আওফের মতো ধনী সাহাবি, যারা জিহাদের অর্থায়ন করতেন -- রদিয়াল্লাহু আনহুম -- তাদের সবাই জিহাদের জন্য বের হয়েছিলেন। তাদের জ্ঞান, সম্পদ বা অন্য কাজকর্মে দক্ষতা তাদের পেছনে থাকার কোনো অজুহাত হয়নি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলই ﷺ বলেছিলেন, 'ইশ, আমি যদি প্রতিটা সেনাদলের সাথে যোগ দিতে পারতাম!'

যুদ্ধের ময়দানে

সেনাবাহিনী আশ-শামে পৌঁছালো, বর্তমান সময়ের জর্ডানে। মাআনের গভর্নরকে হত্যাস্থলে তারা ঘাঁটি গাড়লেন। সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলেন শত্রুপক্ষের এক

---

[101] সহীহ বুখারি, অধ্যায় অন্তর কোমলকারী বিষয়, হাদীস ১৫৬।

বিশাল বাহিনী, দুই লক্ষ! আরবের লাখাম, জুদাম, বাহরা আর বালী গোত্র থেকে এসেছে পুরো এক লক্ষ সৈন্য আর হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে এসেছে আরও এক লক্ষ রোমান খ্রিস্টান সৈন্য। রোমান সৈনিকরা কিন্তু বেদুইনদের মতো নয়, তারা ছিল পেশাদার, প্রশিক্ষিত এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

মুসলিমরা আশা করেনি শত্রুপক্ষের সৈনিক সংখ্যা এত বেশি হবে! মুসলিমরা ছিলেন মাত্র তিন হাজার। আর শত্রুসংখ্যা দুই লাখ, তুলনারও বাইরে! এক মুসলিম সৈনিকের বিপরীতে ৬৬ জন কাফির সৈনিক! এর আগে মুসলিমরা সর্বোচ্চ দশ হাজার সৈন্যের সেনাদলকে সামাল দিয়েছে। কিন্তু দুই লাখ সৈন্যের দলের মুখোমুখি হতে হবে এমনটা হয়তো তারা চিন্তাও করেননি।

তারা দু'দিন ধরে শূরা করলেন কী করা যায়। যা আছে তা দিয়ে লড়বেন নাকি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করবেন। কেউ কেউ বললো, 'এক কাজ করি। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে একজন দূত পাঠাই। তাঁকে জিজ্ঞেস করি কী করা উচিত এবং অপেক্ষা করি। তিনি যদি চান অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাবেন এবং তিনি চাইলে তখন আমরা যুদ্ধ করবো।' কেউ কেউ বললো, 'আমরা বরং চলে যাই, নিরাপত্তাই সবার আগে।'

দুই লাখ সৈনিকের খবর পেয়ে অনেকেই মুষড়ে পড়েছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। পর্বতসম ঈমান বুকে নিয়ে বলে উঠলেন,

'ভাইয়েরা! তোমরা সেই জিনিসকেই অপছন্দ করছো যেটার সন্ধানে তোমরা বেরিয়ে এসেছো। সেটা কী? শাহাদাহ! আমরা আমাদের সংখ্যা বা শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করছি না। আমাদের শক্তি হলো আমাদের দ্বীন! কাজেই এগিয়ে চলো ভাইয়েরা, এগিয়ে চলো! আমাদের জন্য দুটো ভালো পরিণতিই অপেক্ষা করছে -- হয় শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়, নয়তো শাহাদাহ!'

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা খুব ভালো কবিতা লিখতেন। সেই কবির আবেগমাখা শব্দের ঝঙ্কারে সাহাবিরা যেন প্রাণ ফিরে পেলেন! বহুক্ষণ ধরে শুকনো তীরে পড়ে থাকা ম্রিয়মান মাছেরা হঠাৎ বৃষ্টির তোড়ে নদীর পানিতে গিয়ে পড়লে যেমন প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে ওঠে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কথাগুলো ঠিক সেই বৃষ্টির পানির মতন সাহাবিদের হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার করলো। তারা প্রত্যেকে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন! ক্লান্তি আর শঙ্কা নিমিষে দূর হয়ে গেল, ভর করলো সাহস আর অনুপ্রেরণা। আবার সবার মাঝে জিহাদের হারিয়ে যাওয়া মেজাজ ফিরে এল। মাত্র তিন হাজার সৈন্যের দল নিয়ে দুই লক্ষ বাহিনীর বিশাল শত্রুসেনার সাথে লড়াই করার মতো প্রায় অসাধ্য কাজটি সাধনের ব্যাপারে সাহাবিরা দৃঢ়চিত্ত হলেন।

মুসলিমরা দাঁড়িয়ে আছে মু'তার ময়দানে। আবু হুরায়রা ﵁ তখন সবে মুসলিম হয়েছেন। সেই যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীর একজন সৈনিক। ময়দানে দাঁড়িয়ে আবু

হুরায়রা অবাক হয়ে দেখছিলেন দুই লক্ষ সৈন্যের শত্রুবাহিনীকে। তার চোখেমুখে বিস্ময় -- এমন কিছু তার চোখের সামনে ঘটতে যাচ্ছে যা তিনি আগে কখনো দেখেননি। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে দুই লক্ষ সৈন্যের মুখোমুখি হওয়া মানে নিশ্চিত পরাজয়। মৃত্যু সেখানে অনিবার্য! সম্ভবত কোনো দেশ বা গোত্রের ঐতিহ্যে এমন নজির নেই। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না এত বড় একটা বাহিনীর সাথে তারা লড়তে যাচ্ছেন! অস্ত্রের ঝনঝনানি, শক্তির প্রদর্শনী, সোনা-রূপার ঝলকানি দেখে আবু হুরায়রার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল!

বিষয়টা একজন প্রবীণ সাহাবির নজরে এল। সাবিত ইবন আরকাম ﷺ আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- মনে হচ্ছে, তুমি খুব বিশাল একটা বাহিনী দেখছ!

- হ্যাঁ, অবশ্যই! দেখুন না, আমরা কাদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি!

- শোনো, বদরের যুদ্ধে তুমি আমাদের সাথে ছিলে না। সেদিন আমাদের বিজয় সংখ্যার জোরে আসেনি, কথাটা মনে রেখো।

সাবিত ইবন আরকাম অভিজ্ঞ এক সাহাবি। আর আবু হুরায়রা মাত্র কিছুদিন আগে জাহিলিয়াহ ছেড়ে ইসলামে এসেছেন। সাবিত তার অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে আবু হুরায়রাকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, জাহিলিয়াতের নিয়ম-কানুন ভুলে যাও। তুমি এখন মুসলিম। এটা এক নতুন পৃথিবী। আমরা দুনিয়াকে ভিন্ন চোখে দেখি। এখানে সংখ্যার উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে না। বদরে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। কাজেই সংখ্যা দিয়ে বিচার কোরো না।

বদরের অভিজ্ঞতা থেকে সাবিত জানেন সংখ্যার উপর বিজয় নির্ভরশীল নয়। বদরে তারা জয়ী হয়েছেন তাদের ঈমানের জোরে। আল্লাহ তাদের বিজয়ী করেছেন। জাহিলিয়াতের মানদণ্ডে সংখ্যা আর শক্তিমত্তাই সব। কিন্তু ঈমানের মানদণ্ডে সংখ্যাই শেষ কথা নয়, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাহায্যই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারক।

যুদ্ধ শুরু হলো

যাইদ ইবন হারিসা ﷺ ছিলেন এই যুদ্ধের প্রথম আমীর। তাঁর হাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা পতপত করে উড়ছে। সবাই দেখলো, বীরের মতো যায়িদ ইবন হারিসা সামনের দিকে ছুটে গেলেন। সেই চেহারায় কোনো ভয় নেই, কোনো শঙ্কা নেই। শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে তাদের বাহিনীতে ঢুকে পড়লেন অকুতোভয় এক যুবক। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় শত্রুদের বর্শা আর বল্লমের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাকে আর দেখা গেল না।

চারদিক থেকে তীর আর বর্শা ধেয়ে এল তার দিকে। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না বর্শার আঘাত তাকে থামিয়ে দেয়। শরীরে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, শত্রুদের বর্শা তাঁর রক্তে ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে। যাইদ ইবন হারিসা ﷺ আল্লাহর পথে শহীদ হলেন। বীরের মতো পতাকা তুলে নিলেন দ্বিতীয় আমীর জাফর ইবন আবি তালিব ﷺ।

শত্রুরা এবার ঘিরে ধরলো জাফরকে। সাধারণত সৈনিকরা চেষ্টা করে প্রতিপক্ষের পতাকাবাহীকে আক্রমণ করতে। রোমান সৈনিকরা জাফরকে চারপাশ থেকে নিশ্ছিদ্রভাবে ঘেরাও করে ফেললো। জাফর এতটুকু ভয় পেলেন না। তিনি জানতেন কী হতে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে থাকার কারণে তার যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিল তাই তিনি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে নিজের ঘোড়াকে হত্যা করলেন যেন শত্রুরা সেই ঘোড়াকে কাজে লাগাতে না পারে। মুখে কবিতা পড়ছেন আর একের পর এক হামলা সামলে নিচ্ছেন অনায়াসে।

পতাকা ছিল তার ডান হাতে, শত্রুরা ডান হাত কেটে ফেললো। তিনি এবার বাম হাতে পতাকা নিলেন, শত্রুরা বাম হাতও কেটে ফেললো। দুই কাটা হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। সেই কাটা দুই হাত দিয়েই জাফর ইসলামের পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছিল তার শরীর, শাহাদাত তাকেও হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। জাফর শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর রবের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ হলো।

জাফরের শরীরের এখানে-সেখানে কম করে হলেও নব্বইটি জখমের চিহ্ন। সেই জখমগুলোর কোনোটিই তার শরীরের পেছনে না, সবগুলোই সামনে। তিনি পিছু হটার মানুষ ছিলেন না। একত্রিশ বছর বয়সী জাফর এই তো সেদিনই মাত্র আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে নিজের কাছে আটকে রাখেননি। প্রিয় চাচাতো ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে। জাফর আসলেন, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলেন আর শাহাদাহ বরণ করলেন।

যুদ্ধ তখনও চলছে। এবার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তৃতীয় আমীর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ। পতাকা তুলে নিয়ে তিনি ঘোড়ায় চেপে বসলেন। কবিতার ভাষায় স্বগোতক্তি করলেন,

'হে আমার আত্মা! তুমি আজ আমার শরীর ছেড়ে চলে যাবে!
যেতে তোমাকে হবেই, নয়তো জোর করে তোমাকে আমার শরীর ছাড়াবো!'

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার এক ভাই তাকে এক টুকরো মাংস খেতে দিয়েছিল। খেলে শরীরটা একটু চাঙ্গা হবে। তিনি মাংসে কামড় দিলেন, কিন্তু খাওয়ার মাঝখানে যুদ্ধের কোলাহল শুনে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। নিজেই নিজেকে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি

এখনো বেঁচে আছো!' এই বলে মাংসের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে মেরে ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তার স্বপ্ন পূরণ হলো। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা হন্যে হয়ে শাহাদাতের সন্ধান করছিলেন। শাহাদাতও তাকে পরম মমতায় আলিঙ্গন করে নিলো। শত্রুরা তাকে হত্যা করলো। তিনি লাভ করলেন তার কাঙ্ক্ষিত সম্মান - শাহাদাহ!

খালিদ ইবন ওয়ালিদের ﷺ নেতৃত্বগ্রহণ

তিন আমীর একে একে শহীদ হয়ে গেলেন, কিন্তু মুসলিমরা ময়দানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে দিনের আলো নিভু নিভু। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার হাত থেকে পড়ে যাওয়া পতাকা হাতে তুলে নিলেন সাবিত ইবন আরকাম ﷺ। পতাকা হাতে নিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে আমীর ঘোষণা করেননি, বরং চাচ্ছিলেন একজন যোগ্য লোকের হাতে পতাকাটা তুলে দিতে। সাবিত ইবন আরকাম নিজেও একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি বদরের যুদ্ধ করেছেন, সত্যি বলতে তিনি নিজেই আমীর হবার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন কারো হাতে দায়িত্ব দিতে চাইলেন যে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে আনতে পারবে। পতাকা হাতে তুলে বললেন, 'ভাইয়েরা! আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর নির্বাচন করো।' সাহাবিরা বললেন, 'আপনিই এ দায়িত্ব পালন করুন।' সাবিত বললেন, 'না, আমি সেটা করবো না।'

সাহাবিরা এরপর খালিদ ইবন ওয়ালিদকে সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ, যার রণকৌশল নিয়ে নতুন করে কিছু বলাটাও বাহুল্য, তিনি এর আগে অসংখ্য যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেরাদের সেরা এবার আমীর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। আর এটাই ছিল মুসলিমদের পক্ষে লড়া তাঁর প্রথম যুদ্ধ। একজন নও-মুসলিম হিসেবে জিহাদে অংশ নিলেও তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনার কমতি ছিল না। খাঁটি যোদ্ধার মতো লড়াই করলেন, লড়তে লড়তে নয়টা তলোয়ার ভেঙে গেল। একটা ইয়েমেনি তলোয়ার শুধু শেষমেশ রক্ষা পেল!

মু'তার ময়দানে কী হচ্ছে সেই খবর আল্লাহর রাসূলকে ﷺ পৌঁছে দিচ্ছিলেন স্বয়ং জিবরীল ﷺ। আর তাঁর কাছ থেকে শুনে সাহাবিদের কাছে সেই যুদ্ধের লাইভ বর্ণনা দিচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। যাইদ, জাফর এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদতের খবর শুনে তিনি কাঁদতে থাকেন। কিন্তু যখনই জানতে পারলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদের হাতে যুদ্ধের পতাকা, তখনই তিনি সবাইকে বিজয়ের সংবাদ দেন। বললেন, 'আল্লাহর তলোয়ারদের মধ্য থেকে একটি তলোয়ার সেই পতাকা তুলে নিল এবং আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করলেন।'

প্রথম তিনজন আমীরের শুহাদার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল বলেন, 'তারা এখন যেখানে আছে, সেখানেই বেশি সুখে আছে!' আর খালিদ ইবন ওয়ালিদকে সেইদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ একটা নতুন নাম দেন, *সাইফুম মিন সুয়ূফিল্লাহ -- আল্লাহর তলোয়ারদের*

মধ্যে একটি তলোয়ার! আল্লাহর রাসূল ﷺ উপযুক্ত নামকরণই করেছিলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ আর কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি।

রাত নেমে এল, যুদ্ধে বিরতি হলো। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ভাবছেন কীভাবে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যায়। যদি তারা দ্রুত পিছু হটেন, তাহলে শত্রুরা তাদের ধাওয়া করে ধরে ফেলতে পারে। সামরিকবিদ্যায় খালিদ ছিলেন একজন মেধাবি সেনাপতি। তিনি এমন একটা কৌশল বের করলেন যাতে মুসলিমরা পশ্চাদপসরণ করবে ধীরে ধীরে কিন্তু শত্রুরা মুসলিমদের ধরতে পারবে না। তিনি সবাইকে বললেন সবাই যেন আরও খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে। রাতের অন্ধকারে তিনি ডান পাশের সৈনিকদলকে বাম পাশে, আর বাম পাশের সৈনিকদের ডান পাশে স্থানান্তর করলেন। সামনের সৈনিকদেরকে পাঠিয়ে দিলেন পেছনে, পতাকাগুলোর অবস্থানও বদলে দিলেন।

খালিদের এই কৌশল চমৎকারভাবে কাজ করলো। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রোমানরা মুসলিম বাহিনীর নতুন চেহারা দেখে ভাবলো নিশ্চয়ই মুসলিম বাহিনীতে অতিরিক্ত সৈন্য যোগ হয়েছে। তারা বলাবলি করতে লাগলো, মুসলিমরা যদি মাত্র তিন হাজার সৈন্য আগের দিন ময়দানে টিকে থাকতে পারে, তাহলে নতুন সৈন্য নিয়ে না জানি তারা কী করবে! এই ভয়ে রোমানরা বেশ মুষড়ে পড়লো এবং পিছিয়ে গেল। খালিদ ঠিক এটাই চাচ্ছিলেন। এই সুযোগে তিনি পুরো বাহিনী নিয়ে মদীনায় নিরাপদে ফিরে এলেন। পুরো মুসলিম বাহিনী ধ্বংস হতে পারতো, কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদের অসাধারণ কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলা সেই বাহিনীকে নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়ে আনলেন। দুই লক্ষ সৈনিকের মোকাবেলায় এই যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র দশ জন শহীদ হন।

মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তন

মুসলিম বাহিনী যখন মদীনার কাছাকাছি, তাদের অভ্যর্থনা জানাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, জাফর ইবন আবি তালিবের বাচ্চাকাচ্চাদের যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জাফরের স্ত্রী আসমা বিনত উমাইস বাচ্চাদের গোসল করিয়ে, গায়ে তেল মেখে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠান। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দেখে জড়িয়ে ধরেন, তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতে থাকে। আসমা বুঝতে পারেন কিছু একটা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, জাফর শহীদ হয়েছে। আসমা চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'এই দুনিয়া এবং আখিরাতে আমিই হবো জাফরের সন্তানদের ওয়ালি।' জাফরের সন্তানদের জন্য এটা ছিল একটা বিশেষ মর্যাদা।

যে তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী দুই লাখ সেনার বিপরীতে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে কৌশলগত কারণে মদীনায় ফিরে এল, সেই বাহিনীই যখন মদীনায় প্রবেশ করলো,

মুসলিমরা তাদের দিকে মাটি ছুঁড়ে মারলো! 'ছি! তোমরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছো!' আল্লাহর রাসূল তাদের ভুল শুধরে দিয়ে বললেন, 'না, তারা পালিয়ে আসেনি। তারা ফিরে এসেছে যেন তারা আবার যুদ্ধ করতে পারে, ইনশা আল্লাহ!'

এই যুদ্ধে নিজেদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনাটাই ছিল বিজয়। তাই যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ খবর পেয়েছিলেন খালিদের হাতে বাহিনীর নেতৃত্ব, তখন সবাইকে বলেছিলেন খালিদের হাতে বিজয় আসবে। এখানে লক্ষণীয় মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসাটা ছিল সাহাবিদের চোখে লজ্জাজনক পরাজয়। মু'তার যুদ্ধ পরাজয় ছিল না, কিন্তু তবু তারা প্রথমে মানতে পারছিলেন না কীভাবে মুসলিম বাহিনী ময়দান ছেড়ে আসে। আসলে সে যুগের মুসলিমরা অনেক ইতিবাচকভাবে জীবনটা দেখতেন, আর আমরা আমাদের পরাজিত অবস্থাকে মেনে নিয়ে জিহাদকেই পরিত্যাগ করে বসেছি।

স্বামীর শোকে শোকাহত আসমা ﷺ অবশ্য খুব দ্রুতই নিজেকে সামলে নেন। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তিনি আবু বকর সিদ্দীকের ﷺ কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পান এবং রাজি হন। তাদের বিয়ে হলো, ঘর আলো করে এল মুহাম্মাদ নামের এক পুত্র সন্তান। আবু বকর সিদ্দীকের ﷺ মৃত্যুর পর আসমা বিনতে উমাইসকে ﷺ বিয়ে করে নেন আলী ইবন আবু তালিব। মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর আলী ইবন আবু তালিবের ﷺ ঘরে বেড়ে ওঠেন। আগের ঘরের সন্তান হলেও আলী মুহাম্মাদকে খুবই ভালোবেসে বড় করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের এই ভালো সম্পর্ক বজায় ছিল।

প্রথম যুগের মুসলিম সমাজে কোনো মুসলিম বোনই একা বা অবিবাহিত থাকতেন না। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে সহজেই তার বিয়ে হয়ে যেতো। বিধবা হলেও সমস্যা ছিল না, কেউ না কেউ তাকে বিয়ে করে নিতো। এমনকি বয়স হয়ে গেলেও তাদের বিয়ে হতে কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু আমাদের সমাজে বিষয়টা একেবারে উল্টো। প্রথমত, বহুবিবাহকে বেশিরভাগ মানুষ সহ্য করতে পারে না। এটাকে রীতিমতো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। নিজের চাইতে বয়সে বড় এমন কাউকে বিয়ে করতে অনেক ভাই পছন্দ করেন না। তালাকপ্রাপ্ত হওয়াটা যেন কলঙ্ক, আর বিধবা হওয়াটা যেন দোষ। তাদেরও সাধারণত বিয়ের বাজারে পরিহার করা হয়।

বহুবিবাহকে উৎসাহিত ও গ্রহণযোগ্য করা না হলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। একটি পরিবারের অংশ হওয়াটা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক জীবনের সাজসজ্জার অংশ হলো পারিবারিক জীবন। সাহাবিরা সে যুগে এটা নিশ্চিত করেছেন যেন কোনো বোন সংসারজীবন থেকে বঞ্চিত না হয়। তাই তারা বয়স্কা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা -- কাউকেই অবহেলা করতেন না।

তিন আমীরের মর্যাদা

যাইনাবের সাথে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিয়ের আলোচনায় যাইদ ইবন হারিসাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কীভাবে তিনি তার বাবা-মায়ের ঘর থেকে খাদিজার হাতে আসেন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বড় হন আর জিহাদের ময়দানে তার অবদান কী, ইত্যাদি। তবে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি সেটা হচ্ছে তিনি হলেন একমাত্র সাহাবি যার নাম কুরআনে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন।

> 'এরপর যাইদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব নারীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোনো বিঘ্ন না হয়...' (সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৭)

কুরআনে অন্য সাহাবিদের কথা বলা হয়েছে, সাহাবিদের প্রশ্নের উত্তরে আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু একমাত্র যাইদ ছাড়া নাম ধরে কারো কথা উল্লেখ করা হয়নি। এই সম্মান আবু বকর, উমার, উসমান বা আলীও ﷺ লাভ করেননি।

জাফর ইবন আবি তালিব ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচাতো ভাই। তিনি আলী ইবন আবি তালিবের আপন বড় ভাই। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিম দলের আমীর। দীর্ঘ দশ বছর পর সেখান থেকে তারা মদীনায় ফিরে আসেন। এই পুরো সময়টায় তিনিই ছিলেন মুসলিম মুহাজিরদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তিনি আবিসিনিয়া ও মদীনা দুই দেশে হিজরতের সাওয়াব লাভ করেছেন।

জাফরের মর্যাদা হলো তার দুই ডানা। মু'তার যুদ্ধে জাফর তার দুটো হাত হারিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর বীরত্বের খেতাবস্বরুপ দুটো হাতের পরিবর্তে তাকে দিয়েছিলেন দুটো ডানা। এ ডানা মেলে তিনি জান্নাতের যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াবেন! ইবন উমার ﷺ বলতেন, 'শান্তি বর্ষিত হোক তোমার উপর, হে দুই ডানাওয়ালা!'

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ ছিলেন আকাবার শপথে একজন নাকীব। বারো জনের একজন যারা তাদের গোত্রের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি শুধু মুজাহিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সেই যুগের মিডিয়াকর্মী। ইসলামের সমর্থনে এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রশংসায় তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।

একটি হাদীস থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার চোখে এই তিন আমীরের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আবু উমামা আল বাহিলী বর্ণনা করেন[102],

---

[102] ইবন হিব্বান, হাদীস ৭৪৯১।

'আমি রাসুলুল্লাহকে ﷺ বলতে শুনেছি। তিনি বলেন,

একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখি, দুজন লোক আমার কাছে আসলো আর আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরলো। এরপর আমাকে একটি অসমতল পাহাড়ের কাছে নিয়ে বললো, এটায় চড়ুন! আমি বললাম, আমি এখানে চড়তে পারবো না। তারা বললো, আমরা আপনার জন্যে সহজ করে দেবো। আমি পাহাড়ে চড়লাম। পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছে বিকট চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলাম, বললাম, এগুলো কীসের চিৎকার? দুই ফেরেশতা বললো, এগুলো হচ্ছে জাহান্নামীদের আর্তনাদ। এরপর তারা আমাকে নিয়ে আরও এগিয়ে গেল, দেখলাম, একটি দলকে তাদের গ্রীবা ধমনী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের ক্ষতবিক্ষত চোয়াল দিয়ে রক্ত ঝরছে। বললাম, এরা কারা? উত্তরে তারা বললো, এরা সাওম ভঙ্গ করতো। তারপর তারা আমাকে আরও সামনে নিয়ে গেল। দেখলাম, একদল লোকের মৃত দেহ ফুলে গিয়ে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সে দুর্গন্ধ বিষ্ঠার দুর্গন্ধের মতোই অস্বস্তিকর। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললো, এরা তারা যারা কাফিরদের মধ্যে নিহত হয়েছে। তারপর তারা আমাকে আরও সামনে নিয়ে গেল। সেখানেও কিছু লোককে দেখলাম যাদের দেহ ফুলে গিয়ে বিষ্ঠার মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। জানতে চাইলাম, এরা কারা? ফেরেশতারা উত্তর দিলো, এরা ছিল ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী।

আমাকে আরও সামনে নিয়ে গেল তারা। দেখলাম, কিছু মহিলার স্তনে সাপ দংশন করছে। জিজ্ঞেস করলাম, এদের অবস্থা এমন কেন? ফেরেশতারা উত্তর দিলো, এরা তাদের ছেলেমেয়েদের তাদের দুধ পান করতে দেয়নি। তারপর তারা আমাকে আরও সামনে নিয়ে চললো। দেখলাম, কিছু বালক যারা দুটো সাগরের মধ্যে খেলাধুলা করছে। বললাম, এরা কারা? ফেরেশতারা বললো, এরা মু'মিনদের নাবালক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সন্তান। এরপর তারা আমাকে নিয়ে গেল একটি উঁচু জায়গায়, সেখানে তিনজনের একটি দলকে দেখলাম যারা জান্নাতী সুরা পান করছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা জবাব দিলো, এরা হচ্ছেন জাফর ইবন আবু তালিব, যাইদ ইবন হারিসা এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ। তারপর তারা আমাকে অন্য একটি উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল, সেখানেও দেখলাম তিনজনের একটি দল। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?' তারা বলেন, এরা হচ্ছেন ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা ﷺ; তারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

যাতুস সালাসিলের অভিযান

এটি ছিল আমর ইবন আসের ﷺ নেতৃত্বে প্রথম সারিয়াহ। মাত্র কিছুদিন আগেই তিনি খালিদ ইবন ওয়ালিদের ﷺ সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নেতৃত্বস্থানে বসালেন, কেননা এ দু'জনের মধ্যে

জন্মগতভাবেই নেতৃত্বের গুণ ছিল। এই অভিযানের নাম ছিল যাতুস-সালাসিল, কেননা যাতুস-সালাসিল নামের একটি কূপ না নদীর উৎসের কাছে এই অভিযান সংঘটিত হয়। অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মু'তার যুদ্ধে রোমানদের পক্ষাবলম্বনকারী বনু কুদাআহ গোত্রকে শায়েস্তা করা। আমর ইবন আল আস ﷺ তিনশো মুহাজির ও আনসার সাথে নিয়ে অভিযানে বের হলেন। শত্রুপক্ষের কাছাকাছি গিয়ে জানতে পারলেন তারা বিশাল বাহিনী নিয়ে লড়তে এসেছে। তখন আমর আল্লাহর রাসূলের কাছে অতিরিক্ত সৈন্য চেয়ে খবর পাঠালে আল্লাহর রাসূল আবু উবায়দা ইবন আল-যাররাহর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী পাঠান।

অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কারণ শত্রুপক্ষ প্রতিরোধ গড়ার পরিবর্তে পালিয়ে যায়। আরবের উত্তরে মুসলিমদের কর্তৃত্ব সুসংহত হয়। কিছু গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে আর কিছু গোত্র মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

শিক্ষা

১) এই অভিযানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ঐক্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আবু উবায়দাকে ﷺ আমীর নিযুক্ত করে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠান, তখন সালাতে ইমামতি কে করাবেন সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক হয়। আমর ইবন আল আস ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের সবার আমীর, কারণ তোমরা এসেছো অতিরিক্ত সৈন্য হিসেবে।' মুহাজিররা প্রতিবাদ করলেন, বললেন, 'আপনি আপনার দলের লোকদের আমীর, আর আবু উবায়দা তার দলের আমীর।'

বিষয়টা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে দেখে আবু উবায়দা ﷺ আমরকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সর্বশেষ নির্দেশে বলেছেন, তোমরা মিলেমিশে থাকবে, একে অপরের সাথে বিরোধ করবে না। কাজেই আমর, তুমি যদি আমাকে মানতে না চাও, তাহলে আমি তোমাকে মানবো।' এরপর আবু উবায়দা ﷺ আমর ইবন আল-আসের ﷺ নেতৃত্ব মেনে নিলেন এবং সবাই এক আমীরের অধীনে সালাত আদায় করলো।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় হলো ঐক্য বজায় রাখা। আবু উবায়দা এখানে আমরের অধীনস্থ ছিলেন না, চাইলেই তিনি নিজের মতের ওপরে অটল থাকতে পারতেন। কিন্তু ঐক্যের স্বার্থে, বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে তিনি নিজের নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন। আবু উবায়দা ছিলেন খুবই শান্ত মেজাজের সরল মনের মানুষ, তাই বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চাননি। নিজের ক্ষমতার ওপর ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২) আমর ইবন আল-আস ﷺ ছিলেন নও-মুসলিম, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা রপ্ত করতে এবং নিজের যোগ্যতা ইসলামের কাজে লাগাতে সময় নেননি।

ক) অভিযান প্রেরণের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমর ইবন আল-আসকে ﷺ বলেন, 'তোমাকে আমি একটি বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ যেন

তোমাকে নিরাপদ রাখেন এবং তোমাকে গনিমতের সম্পদ দান করেন।' জবাবে আমর বলেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি তো গনিমতের আশায় ইসলাম গ্রহণ করিনি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, 'শোনো, নেককার লোকের হাতে হালাল সম্পদ হলো বরকতময়।' এ হাদীস থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়, এক, আমর ইবন আল-আস আন্তরিকভাবেই ইসলামের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। গনিমতের উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম হননি এবং দুই, টাকা পয়সা থাকাটা খারাপ কোনো ব্যাপার নয়, সে টাকা কীভাবে কামানো হচ্ছে বা কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে সেটাই আসল কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, যারা ভালো লোক, তারা যদি বিত্তশালী হয় তাতে খারাপ কিছু নেই কারণ তারা তাদের সম্পদ হালাল উপায়ে আয় করে এবং ভালো কাজে খরচ করে।

খ) অভিযানের পুরো সময় জুড়ে আমর সৈনিকদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রেখেছেন। দিনের বেলা ভ্রমণ না করে রাতের অন্ধকারে পথ চলেছেন। নিশ্চিত করেছেন কেউ যেন আলো না জ্বালায়। শত্রুরা পালিয়ে যাবার পর তাদের পিছু নেননি, কারণ শত্রুরা অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে হাজির হলে তিনি তার সীমিত সংখ্যক সৈনিক নিয়ে তাদের সাথে পেরে উঠবেন না, তাই তিনি মদীনায় চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন।

গ) অভিযানের এক রাতে আমর ইবন আসের ؓ স্বপ্নদোষ হয়। সে রাতে ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাই তিনি গোসল না করে শুধুমাত্র তায়াম্মুম করেন এবং সে অবস্থায় অন্যদের ইমামতি করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বিষয়টি জানানো হয়। আমর ইবন আল আস ؓ বললেন, 'আমি নিজেকে নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম। যদি আমি সেদিন গোসল করতাম তাহলে নির্ঘাৎ মারা যেতাম! তখন অসম্ভব ঠাণ্ডা ছিল তাই সতর্কতাবশত শুধু তায়াম্মুম করেছি।' রাসূলুল্লাহ শুনে ﷺ হাসলেন, কিছুই বললেন না। অর্থাৎ আমরের এই কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মতি প্রকাশ করেছেন। অনেক আলিম এই ঘটনার ওপরে মত দিয়েছেন, যদি আবহাওয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয় এবং পানি খুব ঠাণ্ডা হয় তবে ফরজ গোসলের পরিবর্তে ওযু বা তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে। কুরআনের যে আয়াতের ওপর ভিত্তি করে আমর ইবন আল-আস ؓ ইজতিহাদটি করেন সেটি হলো,

> "...এবং তোমরা নিজেদের হত্যা কোরো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।" (সূরা নিসা, ৪: ২৯)

এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় আল্লাহর রাসূলের যুগে ইজতিহাদের অনুমোদন ছিল। আর আমর নও-মুসলিম হয়েও এই ইজতিহাদটি করেছেন। এটা প্রমাণ করে আমর কুরআনের জ্ঞান রাখতেন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের ﷺ চিঠি

দ্বীন ইসলাম কেবল আরবদের জন্য আসেনি, বরং ইসলাম এসেছে একটি বৈশ্বিক মিশন নিয়ে। আর ইসলামের এই মিশন বলবৎ থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর আইনকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলো এই মিশনের উদ্দেশ্য।

সে উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উদ্দেশ্যে কিছু চিঠি পাঠান। চিঠির ভাষাই বলে দেয় এই চিঠিগুলো পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইসলামকে আরবের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করছিলেন। এই শাসকদের কেউ রাসূলুল্লাহর ﷺ আহবান গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছে, কেউ সমীহ দেখিয়েছে, কেউ পাত্তাই দেয়নি। তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের সাথে পরবর্তী বোঝাপড়ার রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন।

রোমান শাসকের কাছে চিঠি

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মিম্বরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে বাইরের রাজাদের কাছে পাঠাতে চাই। কিন্তু আমার ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক কোরো না যেমন করে বনী ইসরাঈলের লোকেরা করেছিল মারইয়ামের পুত্র ঈসার ﷺ ব্যাপারে।' মুহাজিররা প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমরা কখনো কোনো ব্যাপারে আপনার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করবো না। আপনি আমাদের আদেশ করুন, আমরা এগিয়ে যাবো।'

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠানো ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই চিঠি ছিল তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই চিঠির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আহবান করেছেন যেন তারা তাঁকে অনুসরণ করে। তাদের ধর্ম, মানবরচিত বিধান ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়। এটি একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ ও বটে। প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর রাসূল ﷺ কেন ঈসার ﷺ কথা বলে মুসলিমদের সতর্ক করলেন? এর কারণ হলো বনী ইসরাঈলিরা কিছু স্বৈরাচারী রাজার অধীনে বসবাস করতো। এই রাজাদের প্রভাব এবং হস্তক্ষেপের কারণে খ্রিস্টধর্ম বিকৃত হয়ে যায় এবং খ্রিস্টানরা বিভক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ তেমনই কিছু রাজার দেশে সাহাবিদের পাঠাচ্ছিলেন। এটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ একটা ব্যাপার ছিল। এই কারণে তিনি সাহাবিদের সাবধান করে দেন যেন তারা ঈসার অনুসারীদের মতো বিতর্কে লিপ্ত না হয়।

তৎকালীন রোমের সম্রাট হিরাকলের কাছে চিঠি পাঠানোর জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বেছে নিলেন সুদর্শন সাহাবি দাহিয়া আল-কালবীকে ﷺ। হিরাকল বা হিরাক্লিয়াস ছিল সেই সময়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি। এটি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল আর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান ইতালীর রোম। হিরাকল যখন শাসনক্ষমতা লাভ করে, তখন রোমানরা বেশ কঠিন সময় পার করছিল। সে সময়ে তারা পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় হিরাকল নিজেই একটি যুদ্ধের সেনাপতির ভূমিকা পালন করে এবং এরপর থেকে পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায়। রোমানরা পারস্যদের হারিয়ে তাদের হারানো ভূমি ফিরে পেতে শুরু করে। এমনকি সে পারস্য সাম্রাজ্যের অংশবিশেষও দখল করা শুরু করে।

সূরা আর-রুমে এমন একটি যুদ্ধের কথা আগের খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ বলেছেন রোমানরা একটি যুদ্ধে শীঘ্রই পারস্যদের পরাজিত করবে। সেটা এই হিরাকলের সময়ের যুদ্ধ। যা-ই হোক, হিরাকল পারস্যদের পরাজিত করে দামাস্কাস, জেরুসালেম ফিরে পায় এবং 'ট্রু ক্রস' পারস্যদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। ট্রু ক্রস হলো কাঠের তৈরি একটি বিশেষ ক্রস। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে এই ক্রসে ঈসাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি ঈসাকে ﷺ আল্লাহ তুলে নিয়েছেন এবং তিনি আবারও দুনিয়াতে ফিরে আসবেন।

ট্রু ক্রস ফিরে পাওয়া ছিল খ্রিস্টানদের জন্য আনন্দঘন একটি মুহূর্ত। জাঁকজমকপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে হিরাকলকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে -- এমনই এক মুহূর্তে হিরাকলের হাতে এসে পড়লো আল্লাহর রাসূলের ﷺ চিঠি। সে চিঠিতে লেখা:

> *'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।*
>
> *এই চিঠিটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের ﷺ পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাকলের উদ্দেশ্যে।*
>
> *শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা সত্য পথের অনুসরণ করে। আমি আপনাদের ইসলামের প্রতি আহবান করছি। আত্মসমর্পণ করুন এবং ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। আর যদি আপনি অস্বীকৃতি জানান, তবে আরিসিয়ীনদের (তার দেশের নাগরিকদের কথা বলা হচ্ছে) দায়ভারও আপনার উপর পড়বে।*
>
> *বলো, 'হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের দিকে আসো -- যা আমাদের আর তোমাদের মধ্যে সমান -- আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে*

রব হিসাবে গ্রহণ করি না।' তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাকো, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।'

চিঠি পড়ে হিরাকলের ঘাম ঝরতে থাকে। চিঠিটি তার হাতে পৌঁছে দেয় বসরার গভর্নর। চিঠিটি পড়ে সে তার অধীনস্থদের বললো, সে নবীজির ﷺ কোনো অনুসারীর সাথে কথা বলতে চায়। যেভাবেই হোক তারা যেন একজন অনুসারীকে তার কাছে নিয়ে আসে। তারা তন্ন তন্ন করে আশ-শাম খুঁজে বেড়ালো। ঘটনাক্রমে সন্ধান পেল আবু সুফিয়ানের। আবু সুফিয়ানের সাথে তখন একদল কুরাইশ আর একটি কাফেলা। হিরাকলের দরবারে তাদের ডাক পড়লো।

দোভাষী আনা হলো। আবু সুফিয়ান ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ সবচাইতে কাছের আত্মীয়। তাই সে সামনে আর বাকিরা পেছনে দাঁড়িয়ে। হিরাকল আবু সুফিয়ানের কাছে জানতে চাইলো,

- তোমার সাথে তাঁর কেমন আত্মীয়তা?

- তিনি আমার ভাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ানের সরাসরি ভাই ছিলেন না। তাদের দাদারা পরস্পর ভাই ছিলেন, সে হিসেবে তারা দুজন ভাই ছিলেন। হিরাকল বললো, 'আমি চাই তোমরা বাকিরা তার পেছনে দাঁড়াও। যদি সে মিথ্যা বলে তাহলে আমাকে ইঙ্গিতে দেখাবে।'

সেদিনের ঘটনার ব্যাপারে আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে বলেন, 'আমি হিরাকলের মতো বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ কাউকে দেখিনি। আমি যদি মিথ্যা বলতাম, তবু আমার লোকেরা আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতো না। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত লোক হিসেবে মিথ্যা বলাটা আমার কাছে খুবই লজ্জাজনক। আমি যদি মিথ্যা বলতাম সেটা মক্কায় ঠিকই জানাজানি হতো, তাই আমি হিরাকলকে মিথ্যা কিছুই বলিনি।' আবু সুফিয়ান তখন একজন কাফির ছিল সত্যি, কিন্তু সে নীতিবান ছিল। হিরাকল জিজ্ঞেস করলো,

- মুহাম্মাদ লোকটা কে?

- তিনি একজন জাদুকর এবং মিথ্যাবাদী।

- কুৎসা শুনতে আমি আগ্রহী নই। আমাকে তাঁর ব্যাপারে জানাও।

হিরাকল রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে চাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো,

- কোন ধরনের বংশ থেকে তাঁর আবির্ভাব?

- সম্ভ্রান্ত বংশ থেকেই তাঁর আবির্ভাব।

- তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা ছিলেন?

- না।

- আচ্ছা, এর আগে তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নবুওয়াতের দাবি নিয়ে এসেছিল?

- নাহ।

- যারা তাঁর অনুসারী, তাদের বেশিরভাগ অভিজাত পরিবারের নাকি গরীব?

-তারা গরীব।

- তাদের সংখ্যা কি দিনে দিনে বাড়ছে না কমছে?

- তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

- আচ্ছা, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এই ধর্ম গ্রহণ করে আবার আগের ধর্মে ফিরে এসেছে?

- নাহ।

- আচ্ছা, তুমি কি তাঁকে এই নতুন ধর্ম প্রচার করার আগে মিথ্যা বলতে শুনেছো?

- না, শুনিনি।

- কখনো সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

- না, আমরা তাঁর সাথে অস্থায়ী সন্ধি করেছি। তবে ভবিষ্যতে তিনি কী করে বসবেন সেটা নিয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

- তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ?

- হ্যাঁ, করেছি।

- কে জিতেছে সেই যুদ্ধে?

- কখনো তিনি জিতেছেন, কখনো আমরা জিতেছি।

- তিনি তোমাদের কী কী কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন?

- তিনি বলেছেন যেন আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি। তিনি আমাদের বাপ-দাদার ধর্মের অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন, সত্য কথা বলার ও সৎভাবে বাঁচার আদেশ দেন, মানুষের প্রতি দয়াবান হতে বলেন।

আবু সুফিয়ান খুব করে চাইলো রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে খারাপ কিছু বলবে। কিন্তু সে সুযোগই পেল না, শুধু এতটুকুই বলতে পারলো -- তিনি ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে করতেও পারেন!

সব শুনে হিরাকল বললো,

'তুমি বলেছ মুহাম্মাদ একটি সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে এসেছেন আর সকল নবী ও রাসূলের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। তুমি বলেছ তাঁর আগে কেউ নবী হওয়ার দাবি করেনি, সেক্ষেত্রে এ কথা বলতে পারছি না যে তিনি কারো দেখাদেখি এসব করছেন। তোমার কথা অনুযায়ী তাঁর বংশের কেউ রাজা ছিল না, তার মানে তিনি রাজত্বের দাবিদার নয়। তুমি আরও বলেছ নবী হওয়ার দাবি করার আগে তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি, কাজেই আল্লাহর নাম নিয়ে তিনি অবশ্যই মিথ্যা কথা বলা শুরু করবেন না। তুমি স্বীকার করেছ যে তাঁর অনুসারীরা গরীব। আল্লাহর সকল নবীর অনুসারীরা গরীব ছিল। তাদের সংখ্যা বাড়ছে, এর থেকে বোঝা যায় তারা সত্য দ্বীনের উপরে আছে, কেননা সত্য দ্বীন পূর্ণতাপ্রাপ্তির আগে এমনটাই ঘটে। তুমি আরও বলেছ এই ধর্ম গ্রহণের পর কেউ তা থেকে ফিরে আসেনি, আর এটাই ঈমানের বৈশিষ্ট্য যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে। তুমি আরও স্বীকার করেছ তিনি বিশ্বাসঘাতক নন, আল্লাহ তাআলার কোনো নবীই এমন ছিলেন না। তুমি বলেছো তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে আহবান করেন, তাঁর ইবাদত করতে বলেন, সত্যবাদী এবং দয়ালু হতে বলেন। তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাও তিনি জয় করবেন। আমি জানতাম তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি যে তোমাদের মাঝে আসবেন এটা আমি ভাবিনি। যদি আমি পারতাম, শত ঝামেলা সত্ত্বেও তাঁর কাছে যেতাম এবং নিজ হাতে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।'

হিরাকলের এই কথাগুলোই বলে দেয় সে কতটা বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী একজন মানুষ ছিল। ইতিহাস, সত্য ধর্ম, আল্লাহর রাসূলের পরিচয় -- একজন সম্রাট হিসেবে হিরাকলের এসব ব্যাপারে ভালোই জ্ঞান ছিল। যদিও এই জ্ঞান তার কোনো কাজে আসেনি, কারণ শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্য সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। একজন কাফির হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছে।

হিরাকল উপরের কথাগুলো বলার পর তার রাজদরবারে শোরগোল পড়ে যায়। আবু সুফিয়ান আর তার সাথের লোকদের সরিয়ে দেওয়া হয়। হিরাকলের চেহারায় দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের ছাপ দেখে আবু সুফিয়ানের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আল্লাহর রাসূল ﷺ সত্যিই একদিন রোম সাম্রাজ্য জয় করবেন।

সীরাতের বইতে এ সম্পর্কিত আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। হিরাকল তার মন্ত্রীসভা এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদে ডেকে বললো, 'হে রোমানরা! সাফল্য যদি তোমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়, যদি তোমরা সত্য পথের সন্ধান চাও, যদি তোমরা চাও তোমাদের এই সাম্রাজ্য টিকে থাকুক, তাহলে এই নবীর কাছে তোমরা বাইয়াত করো।' এই কথা কারো পছন্দ হলো না, সবাই দৌড়ে চলে যেতে লাগলো। পরে সবাইকে সে আবার ডেকে এনে বললো, 'তোমরা শান্ত হও। আমি আসলে তোমাদের ঈমান কতটা শক্ত সেটা পরখ করেছি মাত্র।'

পারস্য সম্রাটের কাছে চিঠি

আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা আস-সাহমীকে ﷺ পাঠানো হয় পারস্যের সম্রাটের কাছে। চিঠিটি দেওয়া হয় তৎকালীন বাহরাইনের রাজার কাছে। সে পারস্যের সম্রাটের কাছে চিঠিটি পৌঁছে দেয়।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদের ﷺ এর পক্ষ থেকে পারস্যের মহান কিসরার প্রতি।

শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা সত্য পথের অনুসরণ করে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে আর সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের আর কোনো যোগ্য সত্তা নেই এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আমি আপনার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। সকল মানবজাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল হিসেবে জীবিত সকল মানুষকে আমি সতর্ক করছি: যারা আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন এবং ইসলাম গ্রহণ করুন। যদি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। আর যদি এই আহবান প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে অগ্নিপূজারিদের (সমস্ত নাগরিক) দায়ভারও আপনার উপর বর্তাবে।'

কিসরা এই চিঠি পড়ে প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। সে বলে 'এত বড় সাহস! আমার দাস হয়ে আমাকে এমন চিঠি দেয়!' উদ্ধত কিসরা ইয়েমেনের গভর্নরকে আদেশ দেয় যেন সে দুইজন লোক পাঠিয়ে মুহাম্মাদকে ﷺ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

পারস্যরা আরবদের গোলাম মনে করতো। কারণ পারস্যের সামনে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তিই আরবদের ছিল না। ইয়েমেন ছিল তখন পারস্যের আজ্ঞাবহ একটি দেশ। ইয়েমেনের তৎকালীন গভর্নর বাযান ইবন সাসান দুজন লোককে পাঠায় আল্লাহর রাসূলকে 'ধরে আনা'র জন্য।

বাযান কোনো সেনাবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজনবোধ করলো না। পারস্যের সম্রাটের আদেশই ছিল যথেষ্ট, সেনা পাঠানোর দরকার নেই। তাইফে পৌঁছে তারা লোকদের সাথে কথাবার্তা বলে জানতে পারে আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় আছেন। এই ঘটনা দেখে তায়েফবাসী এবং কুরাইশরা যারপরনাই খুশি হয়ে ওঠে। বলাবলি করতে থাকে, 'আহ! মুসলিমদের সময় শেষ হয়ে এল বলে!'

মদীনাতে গিয়ে তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে দেখা করে। তাকে বলে, 'রাজাদের রাজা, শাহেনশাহ কিসরা, ইয়েমেনের রাজা বাযানকে এই মর্মে আদেশ করেছেন যেন আমরা আপনাকে এখান থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাই। যদি আপনি রাজি হন তাহলে

বাযান আপনার পক্ষ হয়ে কিসরার সাথে কথা বলবে। আর আপনিও বড় বিপদ থেকে বাঁচবেন। আর আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কিসরার ক্ষমতা কেমন তা নিশ্চয়ই আপনার ভালোই জানা আছে। তিনি নিশ্চিতভাবে আপনার দেশ এবং জাতিকে ধ্বংস করে দেবেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করালেন। পরের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বললেন,

- গতরাতে আমার রব তোমাদের রবকে হত্যা করেছেন।

তারা হতভম্ভ হয়ে গেল, বললো,

- আপনি জানেন আপনি কী বলছেন! এর চাইতেও তুচ্ছ বিষয়ে আপনার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। এরপরও কি আপনি চান যে রাজা বাযানকে আপনার এই কথাগুলো জানাই?

- হ্যাঁ, জানাও। তাকে আমার পক্ষ থেকে এও জানিয়ে দাও যে আমার দ্বীন এবং রাজ্য কিসরার ধর্ম ও রাজ্যকে উৎখাত করবে এবং সবকিছুকে ধুলোয় মিশিয়ে দিবে। তাকে আরও বলে দাও, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে আমি তাকে তার বর্তমান পদেই বহাল রাখবো এবং সেই অঞ্চলের শাসক বানাবো।

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের কিছু উপহার দিয়ে বিদায় করে দেন।

লোক দুটো বাযানের কাছে ফিরে গেল। সব শুনে বাযানের মনে হলো, যেনতেন লোকের পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের ﷺ মাঝে বিশেষ কিছু আছে। সে কিছুদিন অপেক্ষা করতে চাইলো। কিছু সময় পর তারা খবর পেল কিসরা সে রাতেই মারা গেছে যে রাতের কথা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন। এই ঘটনাই ছিল বাযানের জন্য যথেষ্ট। সে মুসলিম হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে রেখে দেন। এভাবেই ইয়েমেনে ইসলামের দরজা খুলে যায়।

পারস্যের নতুন কিসরা ছিল আগের কিসরারই ছেলে। সে তার বাবাকে খুন করে শাসনক্ষমতা দখল করে। নতুন কিসরা বাযানের কাছে চিঠি লিখে বলে, 'আমি আমার বাবাকে খুন করেছি কারণ সে আমাদের সম্মানিত লোকদের সাথে বিরূপ আচরণ করেছে। আর যে লোককে আমার গ্রেপ্তার করতে আমার বাবা আদেশ করেছিলেন, তার ব্যাপারে আপনার আর কিছু করার প্রয়োজন নেই।'

কিসরা যখন আল্লাহর রাসূলের ﷺ চিঠি পেয়েছিল, তখন সেই চিঠি সে রাগে ঔদ্ধত্যে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা তার রাজত্ব ছিন্ন ভিন্ন করে দেবেন।' শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছিল। অল্প ক'বছর পরেই মুসলিমরা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে নেয়।

আল মুকাওকিসের নিকট চিঠি

পরবর্তী চিঠিটি পাঠানো হয় মিশরের শাসক আল মুকাওকিসের প্রতি, চিঠিটি পৌঁছে দেন হাতিব ইবন আবি বালতা ﷺ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহর ﷺ পক্ষ থেকে আল মুকাওকিসের উদ্দেশ্যে।

আমি আপনার কাছে ইসলামের বাণী নিয়ে এসেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন। আর আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে মিশরের খ্রিস্টানদের দায়ভারও আপনার উপর বর্তাবে।

বলো, 'হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের দিকে আসো -- যা আমাদের আর তোমাদের মধ্যে সমান -- আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করি না।' তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাকো, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।'

চিঠিটি পড়ে মুকাওকিস হাতিবকে ﷺ বললো,

- যিনি আপনাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন, তিনি কি একজন রাসূল নন?

- অবশ্যই তিনি একজন রাসূল।

- যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে যারা তাকে বের করে দিয়েছে, তাদের ধ্বংস চেয়ে তিনি কেন দুআ করলেন না?

- আপনি মারইয়ামের পুত্র ঈসার ﷺ কথা ভাবুন। তিনিও একজন রাসূল ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে সপ্তম আসমানে তুলে নিয়েছিলেন -- তখন কি তিনি তাদের ধ্বংসের জন্য দুআ করতে পারতেন না?

- হুম! নিশ্চয়ই আপনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যাকে আরেকজন জ্ঞানী ব্যক্তি পাঠিয়েছেন। আমি আপনার সাথে মুহাম্মাদের ﷺ জন্য কিছু উপহার পাঠাচ্ছি।

মিশরের শাসকের প্রতিক্রিয়া ছিল ভদ্রোচিত, যদিও সে মুসলিম হয়নি। তিনি হাতিবের সাথে দুই বা তিনজন দাসী পাঠিয়ে দেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন মারিয়া। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করে নেন এবং তাঁর গর্ভে রাসূলুল্লাহর ﷺ পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই সে মারা যায়। অন্য দাসী দেওয়া হয় হাসান ইবন সাবিতকে। দুলদুল নামে একজন ভৃত্যও রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, আর সেই সাথে কিছু উপহার।

এগুলো ছাড়াও আরও কিছু চিঠি পাঠানো হয়েছিল আরবের রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে। আন নাজাশীকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল, পাঠানো হয়েছিল গাসসানের রাজাকে এবং বাহরাইনের শাসককেও। অবশ্য নাজাশীকে যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল সেটি কি মাক্কী জীবনে নাকি হুদাইবিয়ার পরে সেটি নিয়ে দ্বিমত আছে।

চিঠিগুলোর তাৎপর্য

১) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামী শক্তির উত্থান

তৎকালীন পরাশক্তিগুলোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর ﷺ পাঠানো চিঠিগুলোর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এই চিঠিগুলোর কাজ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং সম্প্রসারণশীল নীতির ব্যাপারে সবাইকে জানান দেওয়া। চিঠিগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনি সবাইকে আভাস দিচ্ছিলেন -- নতুন এই রাষ্ট্রকে সমীহ করেই চলতে হবে, একে হালকাভাবে নেওয়া চলবে না। তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি ছিল একটি অভূতপূর্ব বিষয়। সে সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো হয় পারস্য নয়তো রোমানদের অধীনস্থ ছিল। বর্তমান সময়ের সাথে এই অবস্থার কিছুটা মিল পাওয়া যায়, গত একশো বছরের উপরে যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিভক্ত এবং আন্তর্জাতিক পরাশক্তি যেমন আমেরিকা, রাশিয়া বা ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ চিঠিগুলো ছিল সেই সময়ের পরাশক্তিগুলোর প্রতি চ্যালেঞ্জ। তাদেরকে ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার আহবান করা এবং এই আহবানে সাড়া না দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা। বেশিরভাগ রাষ্ট্রীয় শক্তি এই আহবানে সাড়া দেয়নি, যে কারণে পরবর্তীতে সাহাবিরা সেই সাম্রাজ্য এবং দেশগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন। পারস্যের প্রতিক্রিয়া ছিল সবচাইতে রূঢ়, তাদের পতনও হয়েছে সবচাইতে দ্রুত। নতুন কিসরা মাত্র ছয় মাসের জন্য সিংহাসনে বসার সুযোগ পায়। এর পর আভ্যন্তরীণ কোন্দলে পারস্যের রাজনৈতিক কাঠামো একেবারেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। পরবর্তী মাত্র চার বছরে দশবার ক্ষমতার রদবদল হয়। শেষ পর্যন্ত ৬৩৭ সালে মুসলিমদের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ কবুল হয়। পারস্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

অন্যদিকে রোমান সম্রাট হিরাকল সম্মান দেখিয়েছিল আর তার সাম্রাজ্য টিকেছিল প্রায় আটশো বছর। ১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতহের হাতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বাহরাইন, মিশর, ইয়েমেন, শাম, ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় আবু বকর رضي الله عنه এবং উমারের رضي الله عنه খিলাফতকালেই। রোমান এবং পারস্য -- দুই পরাশক্তির পতন ঘটে, উত্থান হয় নতুন এক পরাশক্তি ইসলামের। ইসলাম পরবর্তী প্রায় তেরোশো বছর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল।

২) কাফির নেতৃবৃন্দের প্রতি মনোভাব

রোমান সম্রাটকে লেখা চিঠিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে রাজা বা নেতা হিসেবে সম্বোধন করেননি। এর ব্যাখ্যায় ইবন হাজার আসকালানি বলেছেন, ইসলাম কোনো কাফিরের কর্তৃত্ব বা রাজত্বকে স্বীকৃতি বা বৈধতা দেয় না। তবে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে পুরোপুরি অসম্মানও করা হয়নি। বলা হয়েছে *আযীম আর-রুম* বা *রোমের মহান ব্যক্তি*। চিঠিতে বলা হয়েছে -- শান্তি বর্ষিত হোক যারা সত্য পথের অনুসারী। হিরাকল বা অন্য কোনো সম্রাটকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ সরাসরি সালাম দেননি। বলেছেন, 'সালাম তাদের জন্য যারা সত্য পথের অনুসরণ করে।'

বর্তমানকালে আমরা একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। যেসব কাফির রাষ্ট্রের নেতা সরাসরি ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের হত্যা এবং মুসলিমদেশের দুর্দশার জন্য দায়ী -- তেমন নেতাকেও মুসলিমরা সম্মান জানাচ্ছে, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। নিঃসন্দেহে এটা পরাজিত এবং দুর্বল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এটা রাসূলুল্লাহর শিক্ষা নয়, এটা সাহাবিদের পথও নয়। এটা হলো লাঞ্ছনা এবং অবমাননার পথ। তারা শত্রুদের সাথে মাথা উঁচু রেখে কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহর তাঁর চিঠিতে, লেখায়, কথায় শিষ্টাচার অবলম্বন করেছেন কিন্তু 'রাজনৈতিক শিষ্টাচারের' নামে কাফিরদের অপ্রয়োজনীয় সম্মান দেখাননি।

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার চুক্তিভঙ্গ: প্রেক্ষাপট

জাহেলি যুগে বনু হাদরামির এক লোক বনু বকরের মিত্র ছিল। সে সময়ে দেখা যেতো, এক গোত্রের লোক অন্য একটি গোত্র থেকে নিরাপত্তা লাভ করতো, তাদের মিত্র হিসেবে চলাফেরা করতো, তাদের সাথে থাকতো। বিষয়টিকে অনেকটা অন্য গোত্রের নাগরিকত্ব বা সিটিজেনশিপ লাভ করার মতো। যাই হোক, বনু হাদরামির সেই লোকটি একদিন হিজাজে ভ্রমণ করছিল। ঘটনাক্রমে সে খুযাআ গোত্রের এলাকায় ঢুকে পড়লো এবং খুযাআর লোকেরা তাকে হত্যা করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। যেহেতু বনু হাদরামি আর বনু বকর ছিল মিত্র, তাই প্রতিশোধস্বরূপ বনু বকরের লোকেরা খুযাআর এক লোককে হত্যা করে। পাল্টা জবাবে খুযাআ এবার বনু বকরের অন্তর্ভুক্ত বনু আসওয়াদের তিনজনকে হত্যা করে। বনু বকরের অন্তর্ভুক্ত হলেও বনু আসওয়াদের স্থান ছিল অন্যদের চাইতে ওপরে, তাই অন্যদের তুলনায় তারা দ্বিগুণ 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য আদায় করতো।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল জাহিলিয়াতের সময়। সুলহুল হুদাইবিয়ায় চুক্তির একটি শর্ত ছিল -- যার ইচ্ছা সে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে জোট বাঁধতে পারবে আর যার ইচ্ছা সে কুরাইশের সাথে জোট বাঁধতে পারবে।। বনু বকর জোট বাঁধলো কুরাইশদের সাথে আর বনু খুযাআ জোট বাঁধলো মুসলিমদের সাথে। জাহিলি যুগে বনু খুযাআ ছিল বনু হাশেমের মিত্র, তাই বনু হাশেমের সন্তান ও নেতা হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে তারা সন্ধি করে, যদিও তাদের অনেকেই ছিল মুশরিক। এই সন্ধি তারা করেছিল গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে, দ্বীনের কারণে নয়।

যেহেতু মুসলিম এবং কুরাইশরা শান্তিচুক্তিতে আছে, হুদাইবিয়ার শর্তমতে, বনু খুযাআ এবং বনু বকরের মধ্যেও এখন শান্তিচুক্তি বিরাজ করছে। কেননা তাদের একদল মুসলিমদের পক্ষে আরেকদল কুরাইশদের পক্ষে। কিন্তু ঝামেলা বাঁধালো বনু বকর। তারা বনু আসওয়াদের সেই তিনজনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।

এই কাজে নেতৃত্ব দেয় মুআবিয়া ইবন নওফাল। সে ছিল বনু বকরের এক নেতা। তবে সে-ই একমাত্র নেতা ছিল না। সে ছিল একটি শাখাগোত্রের (বনু দাইলি) প্রধান, বনু বকরের সবাই তাকে নেতা হিসেবে মানতো না। তবু সে সবাইকে বনু খুযাআর লোকদের উপর হামলা চালানোর জন্য আহবান করলো । বনু বকরের অন্যেরা রাজি হলো না। তখন মুআবিয়া এবং তার দলবল খুযাআর লোকদের উপর আক্রমণ চালায়। এই লোকদের মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু ও নারীরাও ছিল। বনু খুযাআর বিশজন লোক বনু বকরের হাতে ওয়াতীর কূপের কাছে মারা গেল।

এদিকে কুরাইশরাও এই হামলায় বনু বকরকে অস্ত্র সরবরাহ করলো। হামলা ঘটেছিল রাতের বেলায়, সেই সুযোগে কুরাইশদের কেউ কেউ এই হামলায় অংশ নেয় এই ভেবে যে রাতের বেলা কিছু বোঝা যাবে না কে হামলায় অংশ নিয়েছে। খুযাআর লোকেরা প্রাণ বাঁচাতে হারামের সীমানার মাঝে ঢুকে পড়লো। তৎকালীন আরবে হারামের সীমার ভেতর বা হারাম মাসে হত্যাকাণ্ডকে খুব খারাপ চোখে দেখা হতো। বনু খুযাআর লোকেরা হারামে ঢুকে মুআবিয়ার কাছে আর্তি জানালো, 'মুআবিয়া! আমরা হারামে ঢুকে পড়েছি! তোমার দেবতাদের দোহাই লাগে!' কিন্তু মুআবিয়া ইবন নাওফালের এতটুকু দয়াও হলো না, সে বললো, 'আজ কোনো ইলাহ নেই। বনু বকরের লোকেরা, তোমরা আজকে আল্লাহর নামে প্রতিশোধ নাও। তোমরা হারাম শরীফে চুরি করতে পারো, তবে কি নিজেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো না?'

এই খুনোখুনির খবর আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌঁছে দিলেন আমর ইবন সালিম আল খুযাই। বনু বকরের হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডে কুরাইশদের হাত এবং নিহত লোকদের ব্যাপারে সে আল্লাহর রাসূলকে জানালো কবিতার ভাষায়। আরবিতে খুবই চমৎকার এবং ছন্দময় একটি কবিতা। দীর্ঘ কবিতাটির অল্প কিছু লাইন উল্লেখ করা হলো,

হে রব! আমি মুহাম্মাদকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সেই পুরোনো সন্ধির কথা!
যে সন্ধি হয়েছিল আমার আর তাঁর পূর্বপুরুষের মাঝে।
(হে মুহাম্মাদ!) আপনারা তো আমাদেরই সন্তান, আর আমাদেরই লোক আপনার পিতৃপুরুষ।
আর তাই তো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।
সেই সন্ধি থেকে আমরা হাত গুটিয়ে নেইনি,
আপনি আমাদের সাহায্য করুন!
আল্লাহ আপনাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করুন!
আপনি আহবান করুন আল্লাহর বান্দাদের,
যেন তারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে!

তাদের উদাত্ত আহবান শুনে রাসূল ﷺ একটা কথাই বললেন, 'তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে আমর ইবন সালিম। তুমি সাহায্য পাবে।'

এই হামলা ছিল মুসলিমপক্ষের একটি গোত্রের ওপর কুরাইশপক্ষীয়দের হামলা। আর যেহেতু কুরাইশপক্ষীয়রাই এই হামলা করে চুক্তিভঙ্গ করেছে, আল্লাহর রাসূল তাই মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কুরাইশপক্ষের লোকেরা যা করেছিল, তা ছিল সুস্পষ্ট চুক্তি লঙ্ঘন এবং বিশ্বাসঘাতকতা। লক্ষণীয়, কুরাইশপক্ষের সবাই এই হত্যাকাণ্ড সমর্থন করেনি, অল্প কিছু লোকই এই কাজ করেছে যা ছিল চুক্তিভঙ্গের জন্য যথেষ্ট। এমন হতে পারে, কাফিরদেশের বিপুল জনগণ যুদ্ধবিরোধী মিছিল করছে, কিন্তু চুক্তিভঙ্গের জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারের একটি অংশের আনুষ্ঠানিক সমর্থনই যথেষ্ট, সমস্ত জনগণের সমর্থন থাকা জরুরি নয়।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধি নবায়নের প্রচেষ্টা

সুলহুল হুদাইবিয়া ছিল দশ বছরের জন্য, কিন্তু এক বছরের কিছু বেশি সময় যেতেই কাফিররা চুক্তিভঙ্গ করে। এই ঘটনার পর আবু সুফিয়ান বুঝতে পারলো কুরাইশরা খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। সে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। সে বুঝতে পারছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এই চুক্তিভঙ্গের বিষয়টা এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন না। তড়িঘড়ি করে সে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করে। মদীনায় গিয়ে প্রথমেই যায় মেয়ে উম্মে হাবিবার ﷺ বাসায়। উম্মে হাবিবা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ স্ত্রী। বাসায় ঢুকে আবু সুফিয়ান মেঝেতে পাতা মাদুরে বসতে যাবে -- ওমনি উম্মে হাবিবা টান মেরে সেটা গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন। জন্মদাতা পিতার প্রতি মেয়ের এমন আচরণে আবু সুফিয়ান অবাক হলো, মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো,

- মাদুরটা কেন সরালে? এই মাদুর কি আমার উপযুক্ত নয়? নাকি আমিই এতে বসার যোগ্য নই?

- এই মাদুরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বসেন আর আপনি একজন নাপাক মুশরিক। আমি চাই না আপনি সেই মাদুরে বসেন যে মাদুরে রাসূলুল্লাহ্ বসেন।

আবু সুফিয়ান এবার তাজ্জব হয়ে গেল, সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না তার আপন মেয়ে তাকে এভাবে উপেক্ষা করতে পারে! উম্মে হাবিবার কথায় স্পষ্ট আল্লাহর রাসূলের প্রতি তাঁদের কেমন ভক্তি ছিল! উম্মে হাবিবা নিজের বাবাকেও রাসূলুল্লাহর মাদুরে বসতে দেননি -- এটাই হলো আল-ওয়াল আল-বারা -- মুসলিমদের আপন ভাবা আর কাফিরদের পর। উম্ম হাবিবা ছিলেন আবিসিনিয়া এবং মদীনায় হিজরতকারী একজন নারী। বহু বছর আগেই তিনি মুশরিক এবং শিরকের সাথে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। ষোলো বছর পরে যখন তার সাথে তার বাবার দেখা হলো, তখনও তিনি বাবার প্রতি এতটুকু সম্মান দেখাননি। কারণ তার বাবা আবু সুফিয়ান হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। উম্মে হাবিবার কাছে পিতা-কন্যার সম্পর্ক বা সামাজিক শিষ্টাচার প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে ঈমান।

'তোর উপর শয়তানি ভর করেছে!' - মেয়েকে এই কথা শুনিয়ে আবু সুফিয়ান গেল আল্লাহর রাসূলের কাছে। আল্লাহর রাসূল তাকে গ্রাহ্য করলেন না। এরপর সে গেল আবু বকরের ﷺ কাছে। আবু বকরও তার সাথে কথা বলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন না। এরপর সে গেল উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ কাছে। উমারের স্বভাব ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি রাখঢাক করে কথা বলার মানুষ নন। মুখের ওপর বলে দিলেন, 'তুমি আশা করছো আমি আল্লাহর রাসূলের হয়ে তোমার সাথে দর কষাকষি করবো! আমার সাথে যদি খালি এক টুকরো কাঠও বাকি থাকে, সেটা দিয়েও আমি তোমাদের সাথে জিহাদ করবো!'

কোনো সুবিধা করতে না পারে আবু সুফিয়ান গেল আলী ইবন আবু তালিবের ﷺ কাছে। আলী বললেন, 'দেখো আবু সুফিয়ান, আমাদের কিছুই করার নেই। আল্লাহর রাসূলের কথার ওপরে তো আর কোনো কথা চলে না।' আবু সুফিয়ান তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে ফাতিমাকে ﷺ অনুরোধ করলো, 'মুহাম্মাদের কন্যা! তোমার এই ছেলেটাকে (হাসান) একটু বলো না লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে দিক, যদি সে করে তাহলে সারাজীবন আরবদের নেতা হয়ে থাকবে।' ফাতিমা সাফ জবাব দিলেন, 'আমার ছেলে এ কাজের জন্য খুব ছোট। আর আল্লাহর রাসূল যদি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন, তাহলে তাঁর মতের বিপরীতে গিয়ে মীমাংসা করার আমরা কেউ নই।' আবু সুফিয়ান হতাশ হয়ে আলীকে বললো,

- আবুল হাসান, পরিস্থিতি তো কঠিন হয়ে পড়েছে। কী করা যায় বলো তো, একটা বুদ্ধি দাও।

- আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি তো বনু কিনানার নেতা। এক কাজ করো, তুমি নিজেই মসজিদে গিয়ে বিষয়টা মীমাংসা করে দেশে চলে যাও!

- এতে কোনো লাভ হবে?

- মনে হয় না। তবে এর থেকে ভালো কিছু মাথায় আসছে না।

আলী ﷺ দায়সারা কথা বলে তাকে বিদায় করলেন। আবু সুফিয়ান তখন মসজিদে গিয়ে বললো, 'লোকসকল! আমি সবার সামনে চুক্তি নবায়ন করলাম।' এই বলে সে চলে গেল। কেউ তাকে পাত্তাও দিলো না। মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো অবস্থান আবু সুফিয়ানের ছিলও না। সে কুরাইশদের নেতা, মদীনায় আবু সুফিয়ান কেউ নয়, সেখানে কেউ তাকে আমলে নেয় না।

আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে এল। সবাই জানতে চাইলো কী হয়েছে। ঘটনা শুনে তারা বললো, 'তুমি যে মসজিদে ঘোষণা দিয়ে এলে, মুহাম্মাদ ﷺ কি তা অনুমোদন করেছে?' আবু সুফিয়ান বললো, 'না।' তখন তারা বললো, 'দুর্ভাগ্য! আলী তোমাকে বোকা বানিয়েছে! কাজের কাজ তো কিছুই হয়নি অপমানিত হওয়া ছাড়া।'

'কী আর করা? আর তো কিছু করার ছিল না আমার।', আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়লো।

যে কুরাইশরা ক'বছর আগে মুসলিমদের নাম শুনলেই অহংকার আর ঔদ্ধত্যের ভারে নাক-মুখ কুঁচকে ফেলতো, সেই কুরাইশদের নেতা আবু সুফিয়ান এসে মুসলিমদের কাছে রীতিমতো ভিক্ষা চাইছে! লাঞ্ছিত আর অপমানিত হয়ে দরজায় দরজায় মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন চুক্তিটি নবায়ন করা হয়। এভাবেই আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্য করেন এবং দুনিয়ার বুকে তাদের সম্মানিত করেন। কিন্তু সেটা পেতে হলে আল্লাহর দ্বীনের ওপর অটল থাকা চাই।

আজ মুসলিমদের মধ্যে একটি ধারণা গেঁথে গেছে যে তারা দুর্বল। তারা মনে করে তারা অক্ষম, শত্রুরা শক্তিশালী, এখন মাক্কী যুগ তাই কিছুই করার নেই। সকল অনাচার-অত্যাচারকে তারা স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেয়। অতি অল্পে হাল ছেড়ে দেয়। কাফিরদের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়ায়। ধৈর্যের সাথে কষ্ট স্বীকার করার মানসিকতা মুসলিমদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হলো মুসলিম। মুসলিম দেশগুলোর অবস্থান ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। তেলের খনি তাদের অধিকারে, পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ পানিপথ ও ভূমিগুলো মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে -- এরপরেও মুসলিমরা কীভাবে দুর্বল হতে পারে? আসলে এই দুর্বলতা মানসিকতায়। আর্থিক সম্পদ বা ভূমির অভাব কোনো সমস্যা না, মুসলিমদের প্রয়োজন আল্লাহর ওপর ঈমান ও তাওয়াক্কুল। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের ধন-দৌলতের প্রাচুর্য ছিল না, ছিল না পেশাদার সেনাবাহিনী। কিন্তু ঈমানকে পুঁজি করে মুসলিমরা এগিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে মক্কার কুরাইশের নেতা আবু সুফিয়ান করজোড়ে তাদের সামনে হাজির হয়েছে। একজন মু'মিন বাহ্যিক ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল হলেও মন থেকে কখনো দুর্বল হতে পারে না। পরাজিত মানসিকতা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য নয়। মুসলিমরা যদি তাদের দুর্বলতার এই ভ্রান্ত ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতো, তাহলে যেসব জাতি আজ মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে, তারাও আবু সুফিয়ানের মতো হাতজোড় করে শান্তি কামনা করতো।

বিজয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হলো ধৈর্য। যে কুরাইশরা এতদিন দাপটের সাথে এতগুলো যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে -- তারাও একসময় হাল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে মুসলিমদের অসীম ধৈর্যের কাছে। কয়েক বছর আগেও কেউ চিন্তা করতে পারেনি কুরাইশরা মুসলিমদের কাছে ধরনা দেবে। কিন্তু মুসলিমরা তাদের দ্বীনের ওপরে অটল থেকেছে, ধৈর্য ধরেছে, আর ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় কুরাইশদের সাথে পাল্লা দিয়েছে -- আর তাই কুরাইশরা হার মানতে বাধ্য হয়েছে।

অভিযানের প্রাক্কালে

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কা অভিযানের বিষয়টি গোপন রাখলেন। যদিও কুরাইশরা জানতো আজ হোক কাল হোক মক্কা আক্রমণ হবেই। কিন্তু ঠিক কখন হবে এবং কীভাবে হবে -- সে ব্যাপারে নবীজি তাদের কোনো ধারণা দিতে চাননি। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদের শ্রবণ আর দৃষ্টি কেড়ে নাও, যেন আমরা তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারি, আমাদের আগমন যেন তারা টের না পায়।'

এই অভিযানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ কাউকে কিছুই জানালেন না, এমনকি আবু বকরকেও ﷺ না। আবু বকর ﷺ রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করতে এসে দেখলেন তাঁর মেয়ে আইশা ﷺ গম পিষছেন। দেখে বুঝতে পারলেন রাসূল ﷺ লড়াইয়ের প্রস্তুতি

নিচ্ছেন। আইশার কাছে জানতে চাইলেন কোথায় অভিযান হবে, আইশার কাছ থেকে কিছুই জানা গেল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে বাতনু ইদামের দিকে আট জনের একটি দলকে পাঠালেন। বাতনু ইদাম ছিল মদীনা থেকে শামের দিকে, মক্কার দিকে নয়। মক্কা অভিযানের আসল উদ্দেশ্যকে গোপন রাখতে তিনি এই কৌশল অবলম্বন করেন। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কারো কাছে আসল গন্তব্য প্রকাশ করেননি। এরপর তিনি মদীনার ভেতরে এবং বাহিরে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিলেন যেন মুসলিম সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতিতে কেউ মদীনা আক্রমণ করতে না পারে।

কিন্তু এত সাবধানতার পরও হাতিব ইবন আবি বালতাহর ﷺ কাজে সমস্যা বাঁধার উপক্রম হলো। তার পরিবার ছিল মক্কায়। তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি মক্কায় একটি চিঠি পাঠিয়ে কুরাইশদের এই অভিযানের কথা জানিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তার এই চিঠি পাঠানোর খবর ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল জেনে যান। জানার সাথে সাথে তিনি চিঠির বাহককে ধরে আনার জন্য আলী, যুবাইর ইবন আল-আওয়্যাম আর মিক্বদাদ ইবন আসওয়াদকে ﷺ পাঠিয়ে দেন। চিঠির বাহক ছিল এক নারী। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তারা সেই মহিলাকে ধরে ফেললেন। তারপর সেই মহিলাকে হুমকি দিয়ে চিঠিটি উদ্ধার করলেন। দেখা গেল, চিঠিটি আল্লাহর রাসূলের সাহাবি হাতিবের লেখা। রাসূল ﷺ চিঠিটি পড়লেন। হাতিবকে ডেকে আনা হলো, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হলো, জানতে চাওয়া হলো কেন তিনি এই কাজ করলেন। হাতিব বললেন,

'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কথাটা আগে শুনুন। কুরাইশদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে সত্যি, তারা আমার মিত্র, কিন্তু সত্যি বলতে আমি আসলে ওদের কেউ নই। আপনার মুহাজির সঙ্গীদের মক্কায় কেউ না কেউ আত্মীয় আছে। তারা তাদের পরিবার ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কিন্তু আমার এমন কেউ নেই। তাই আমি কুরাইশদের একটা উপকার করতে চেয়েছি যাতে এর বিনিময়ে তারা আমার পরিবারের ক্ষতি না করে। দ্বীন ত্যাগ করার নিয়তে আমি এই কাজ করিনি। ইসলাম ছেড়ে ভোগবিলাসে মত্ত হবো -- এটাও আমার ইচ্ছে ছিল না।'

হাতিব বলতে চাচ্ছিলেন কুরাইশদের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার পরিবার পড়ে আছে মক্কায়। মুসলিমরা যদি মক্কায় অভিযান চালায় তাহলে কুরাইশরা তার পরিবারের ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তাদের রক্ষা করার নেই। অন্যদিকে অন্যান্য মুহাজিরদের পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কেউ না কেউ মক্কায় আছে। তাই হাতিব ভেবেছেন কুরাইশদের যদি তিনি মক্কা অভিযানের কথা জানিয়ে দেন, তাহলে বিনিময়ে তারা তার পরিবারকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু হাতিব ঠিকই জানতেন, যে কাজটি তিনি করছেন সেটা ঠিক নয়। সেটা মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করার শামিল। কিন্তু কাফিরদের গুপ্তচরবৃত্তি করা বা বেঈমানি করা তার

উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল নিজের পরিবারকে রক্ষা করা। তাই তিনি নিজের এই কাজের কৈফিয়ত আল্লাহর রাসূলের কাছে পেশ করলেন।

তার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সে সত্য বলছে।' উমার ﷺ পাশেই ছিলেন। হাতিবের কথা শুনে তিনি রেগে গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এই মুনাফিক্বের গর্দান কেটে ফেলার অনুমতি দিন।' রাসূল ﷺ বললেন, 'সে বদরে অংশ নিয়েছে। আর বদরে অংশ নেওয়া লোকদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ বলেছেন, বদরের লোকেরা, তোমরা যা খুশি করো। আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি।'

এই ঘটনার পর আল্লাহ তাআলা সূরা মুমতাহিনার আয়াতটি নাযিল করলেন,

> "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন কোরো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে জিহাদে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও, তাহলে কীভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে পারো! তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর) কাজটি করে, তাহলে বুঝতে হবে সে দ্বীনের সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে।" (সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১)

হাতিব ইবন আবি বালতার কাহিনী থেকে শিক্ষা

১) হাতিব ﷺ দ্বীন ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে এই কাজ করেননি। যে শব্দটি তিনি এখানে ব্যবহার করেছেন তা হলো রিদ্দা। এর অর্থ হলো দ্বীনত্যাগ, মুরতাদ হয়ে যাওয়া। বোঝা যাচ্ছে, হাতিব নিজের কাজকে কুফর হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই তিনি বলেছেন -- ধর্মত্যাগ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও আলিমদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে যে শত্রুর হয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করা কুফর না ফিসক। এই কাজের জন্য উমার ﷺ হাতিবকে মুনাফিক্ব বলেছেন। সেই সাথে কাজটিকে কুফর মনে করে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে হত্যার অনুমতিও চেয়েছেন। কাফিরদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি একটি ভয়াবহ অপরাধ। এই অপরাধটি এতই ভয়াবহ যে এটা কুফরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অনেক আলিমের মতে এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আরও একটি মত হলো, গুপ্তচরের শাস্তি কী হবে সেটা ইমামের হাতে।

২) হাতিবের ﷺ বেঁচে যাওয়াটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র বদরে অংশ নেওয়ার সুবাদে। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় দুটো জিনিস বোঝা যায়। প্রথমত, বদরের যোদ্ধাদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। দ্বিতীয়ত, উমারের ﷺ প্রস্তাবকে আল্লাহর রাসূল নাকচ করেননি। হাতিবকে মুনাফিক্ব ডাকার জন্য উমারকে নিন্দা করেননি, কিংবা এ কথা বলেননি যে, হাতিবের অপরাধ হত্যাযোগ্য নয়। আল্লাহর রাসূলের সামনে কোনো ভুল কথা বা কাজ করা হলে আল্লাহর রাসূল সেটা

শুধরে দিতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি উমারকে কিছুই বলেননি, কাজেই এর অর্থ দাঁড়ায় উমারও এখানে কোনো ভুল করেননি। তিনি বাহ্যিক কাজের বিচারে হাতিবকে বিচার করেছেন এবং এটাই নিয়ম। কিন্তু হাতিবকে শাস্তি না দেওয়ার বিষয়টি ছিল ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন বদরে অংশ নেওয়া সাহাবি। তবে আজকের দিনে কেউ যদি হাতিবের মতো একই কাজ করে বসে তাহলে সে হাতিবের মতো এভাবে ক্ষমা পেয়ে যাবে না। কারণ হাতিব ছিলেন একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত। বদরে অংশ নেওয়া এই মুবারক দলটির ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ওয়াহীর মাধ্যমে জেনেছেন।

৩) আল্লাহর রাসূল যখন কাউকে বিচার করেছেন, তখন শুধুমাত্র একটি কাজের ওপর তাকে বিচার করেননি। বরং তার অতীতের চরিত্র এবং কাজকর্ম বিবেচনায় এনেছেন। হাতিবের অতীত থেকে এমন কিছুই প্রমাণিত হয় না যে তিনি কাফিরদের চর বা তাদের পক্ষের লোক, বরং তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু মক্কা অভিযানের কথা জানিয়ে দিয়ে তিনি একটি মানবীয় ভুল করেছিলেন। তার একটি ভুলের কারণে তার সমস্ত অতীতকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো, একজন আলিম, যিনি সবসময় সত্য কথা বলে এসেছেন, দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তিনিও একটি দুটি বিষয়ে ভুল করে বসতে পারেন, কিন্তু এ কারণে তার সমস্ত কাজ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। একজন মানুষের আন্তরিকতার কথা মাথায় রেখে তাকে বিচার করা উচিত। এটাই ইনসাফের দাবি।

৪) সূরা মুমতাহিনার আয়াত থেকে শিক্ষা হলো আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা। এই শিক্ষা মুসলিমরা আজ ভুলতে বসেছে। ইমাম কুরতুবির رحمه الله মতে, এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের প্রতি মুসলিমদের আনুগত্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করেছেন। যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদেরকে আপন ভাবা বা বিশ্বস্ত মনে করার কোনো সুযোগ নেই। মুহাম্মাদ ইবন বাকর আল-আবিদের মতে, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুহাজিরদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বলে তারা যেন কুরাইশদের আপন মনে না করে। বরং কুরাইশরা হলো কাফির আর কাফিরদের শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। সায়্যিদ কুতুব رحمه الله এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কুরাইশদের হাতে এত অত্যাচারিত হওয়ার পরেও কিছু মুসলিম সরলমনে ভেবেছে মক্কার কুরাইশদের সাথে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সেই ধারণাকে মুছে দিয়েছেন। মুসলিমদের দৃষ্টিকে আত্মীয়তার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে এনে কেবল ঈমান এবং দ্বীনের ওপরের নিবদ্ধ করেছেন।

মক্কার অভিমুখে অগ্রযাত্রা

বরকতময় রমাদান মাসে যাত্রা শুরু করে বরকতময় এই বিজয়ের কাফেলা। মাসের প্রথম দিকে তাঁরা সাওম রাখলেন কিন্তু মক্কার কাছাকাছি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সাওম ভাঙতে নির্দেশ দিলেন। এই সেনাবাহিনীতে দশহাজার সেনা ছিল।

এ পর্যন্ত এটাই ছিল মুসলিমদের সবচাইতে বড় বাহিনী। এই বাহিনীতে সব মুহাজির আর আনসাররা ছিলেন। মদীনার আশপাশের অনেক গোত্র যেমন সুলাইম, আসলাম, গিফার ও যাইনা এতে যোগ দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ হাজার সৈনিক নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। আবু রুহম ইবন হুসাইন আল-গিফারীকে ؓ মদীনায় অস্থায়ী গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো। দশ হাজার সৈনিক নিয়ে আল্লাহর রাসূল পৌঁছলেন যোহফায়। সেখানে পৌঁছে আল-আব্বাস ইবন আল-মুত্তালিবের ؓ সাথে দেখা হয়ে যায়। মক্কায় গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব ছিল তার উপর ছিল, তা শেষ করে তিনি সপরিবারে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করছিলেন। এরপর আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা হলো দুই কুরাইশের, আবু সুফিয়ান ইবন আল-হারিস এবং আবদুল্লাহ ইবন উমাইয়্যা।

এই দুজনই ছিল ইসলামের দুই শত্রু। আবু সুফিয়ান আল-হারিস আল্লাহর রাসূলকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখতো। আর আবদুল্লাহ ইবন উমাইয়্যা হলো সেই লোক যে মাক্কী জীবনে ব্যঙ্গ করে বলেছিল, 'আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না তুমি একটা মই নিয়ে আসো যেটা সরাসরি ঐ আকাশ পর্যন্ত যায়। তারপর সেখান থেকে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে আসবে। আর সেই চিঠিতে চারজন ফেরেশতা তোমার নবুওয়্যাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। তবে সত্যি বলতে কী, এসব করলেও আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো বলে মনে হয় না।'

এই লোক পর্যন্ত ইসলাম কবুল করতে রাজি হয়ে গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আবু সুফিয়ান মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান নয়। আল্লাহর রাসূল প্রথমে তাদের ক্ষমা করতে রাজি হলেন না, কিন্তু তাদের কাকুতি মিনতিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। ফলে তারা মুসলিম হয়ে গেল।

এগোতে এগোতে এরপর মুজাহিদ বাহিনী মার আদ-দাহরানে পৌঁছে গেল। সেখানে তাঁবু গাড়া হলো। জায়গাটি ছিল মক্কা থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু চারপাশের মরুভূমি বেশ খোলামেলা হওয়ার কারণে মক্কা থেকে পরিষ্কার তাদের উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর উপস্থিতি জানান দিতে চাচ্ছিলেন। সেদিন রাতে মুসলিম শিবিরে দশ হাজার আগুন জ্বালানো হলো। দশ হাজার আগুনের দপদপে আলোর রেখারা জানান দিচ্ছিলো বিশাল সেই বাহিনীর সমাগম।

বিষয়টা আবু সুফিয়ানের নজর এড়ালো না। সে বুদাইল ইবন ওয়ারকা এবং হাকিম ইবন হিযামকে সাথে নিয়ে পরিস্থিতি বোঝার জন্য বেরিয়ে পড়লো। পথে যেতে যেতে আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করলো,

- কারা এরা? এত আগুন আর এত বড় শিবির তো আগে কখনো দেখিনি।

- এরা নিশ্চয়ই খুযাআ গোত্রের লোক হবে। হয়তো যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে, বুদাইল

জবাব দিলো।

- নাহ, এরা খুযাআ হতে পারে না। এদের শক্তি এত বেশি নয় যে এরকম বড় শিবির করে আগুন জ্বালাবে।

আবু সুফিয়ানের ভেতরকার উদ্বেগ চাপা থাকলো না। রাস্তায় আল-আব্বাসের সাথে তাদের দেখা হলো। আব্বাসকে আবু সুফিয়ান বললো,

- এই অবস্থায় কী করি বলো তো?

- আল্লাহর শপথ, আগামী সকাল হবে কুরাইশদের জন্য এক কঠিন সকাল। আল্লাহর রাসূল তোমাকে পেলে ছাড়বেন না। তুমি বরং এই গাধার পিঠে চড়ে বসো, আমার সাথে চলো। আল্লাহর রাসূলের কাছে তোমাকে নিয়ে যাই। দেখি তোমাকে কোনোভাবে বাঁচানো যায় কি না।

আবু সুফিয়ান রাজি হলো। অন্য একটি বর্ণনামতে, এই তিনজন মুসলিমদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ঘটনা যা-ই হোক, তারা তিনজনই মুসলিমদের ক্যাম্পে এল। সবাই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু আব্বাসকে সাথে দেখতে পেয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

সবাই ছেড়ে দিলেও একজন কিন্তু এত সহজে ছাড়তে চাইলেন না। তিনি আর কেউ নন, উমার ইবন খাত্তাব ﷺ। উমার চাইলেন আবু সুফিয়ানকে সেখানেই মেরে ফেলবেন। এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করার পাত্র তিনি নন। বিষয়টা নিয়ে উমারের সাথে আব্বাসের তর্কাতর্কি লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তির জন্য তারা আল্লাহর রাসূলের কাছে গেলেন।

আল আব্বাস চাচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূল যেন আবু সুফিয়ানকে প্রাণ ভিক্ষা দেন। অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ চাচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূল তাকে যেন আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতি দেন। এক পর্যায়ে আব্বাস ﷺ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, 'উমার! আজ যদি আবু সুফিয়ান তোমার গোত্র বনু আদীর লোক হতো তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে চাইতে না! সে বনু আব্দুল মানাফের লোক বলেই তুমি তাকে হত্যা করতে চাইছো।'

উমার ﷺ সম্পর্কে আব্বাসের ধারণা ভুল ছিল। তিনি ভাবছিলেন ভিন্ন গোত্রের বলেই উমার আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে চাইছে। কিন্তু ছায়ার মতো আল্লাহর রাসূলের সাথে লেগে থাকতেন যিনি, হক আর বাতিলের মাঝে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যেতেন যেই আল-ফারুক, সেই উমার নিঃসন্দেহে এমন ছিলেন না। উমার গম্ভীর স্বরে বললেন,

'শান্ত হও, আব্বাস, শান্ত হও! তোমার ইসলাম আমার কাছে আমার বাবা আল খাত্তাবের ইসলামের চাইতে বেশি প্রিয়। এটা শুধু এই কারণে যে আমার বাবা ইসলাম

গ্রহণ করলে সে খবরে আল্লাহর রাসূল যত খুশি হতেন, তার চাইতে তোমার ইসলাম গ্রহণে আল্লাহর রাসূল ﷺ বেশি খুশি হয়েছেন।'

আল্লাহর রাসূলকে কত ভালোবাসলে নিজের বাবার ইসলাম গ্রহণের চেয়েও প্রিয় হয়ে যায়, রাসূলের প্রিয় চাচার ইসলাম-গ্রহণ? উমারের কথা থেকে শিক্ষণীয় হলো, কারো জাতীয়তা বা পারিবারিক বংশ পরিচয়ের কারণে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। আন্তরিকতার বিচার হবে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার মাপকাঠিতে। যদি কেউ আল্লাহ আযযা ওয়াজালের নিকটবর্তী হয় তাহলে সে-ই উম্মাহর জন্য বেশি আপন। আর যদি কেউ আল্লাহ আযযা ওয়াজালের সাথে বিদ্রোহ করে হয় তাহলে তার সাথে এই উম্মাহর কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ঝগড়া সেখানেই থামিয়ে দিতে চাইলেন। তাই আব্বাসকে পরের দিন সকালে আসতে বললেন। পরদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানকে বললেন,

- আবু সুফিয়ান! এখনও কি তুমি বুঝতে পারছো না যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই?

- আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি কতই না দয়াময়, উদার আর একজন বড় মাপের মানুষ। আত্মীয়দের প্রতি আপনি কতই না সদয়! যদি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ সত্যিই থেকে থাকতো তাহলে সে নিশ্চয়ই রক্ষা করতো।

- আর আমি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এটা কি বোঝো নি?

- এই বিষয়ে আমার অন্তরে এখনো কিছু দ্বিধা আছে।

আল আব্বাস ﷺ গর্জে উঠলেন, 'ধ্বংস হও তুমি! তোমার গর্দান কাটা যাবার আগেই মুসলিম হয়ে যাও!'

প্রাণের মায়া বড় মায়া। এই কথার পর আবু সুফিয়ান মুসলিম হয়ে গেল; সাক্ষ্য দিলো, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' যদিও সেই সাক্ষ্যদানে তেমন দৃঢ়তা ছিল না।

আবু সুফিয়ানের মানসিক অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আবু সুফিয়ানকে ﷺ পাহাড়ের গিরিপথে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখার জন্য আব্বাসকে ﷺ নির্দেশ দেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ান যেন মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিজ চোখে দেখতে পারে। রাসূলুল্লাহর ﷺ সেনাবাহিনী গোত্র অনুসারে অনেকগুলো ব্যাটালিয়নে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের নিজস্ব পতাকা ছিল। একের পর এক ব্যাটালিয়ন মার্চ করে এগোচ্ছে আর আবু সুফিয়ান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। একেকটি দল সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, আর আবু সুফিয়ান আব্বাসের কাছে জিজ্ঞেস করে, 'এরা কারা?' আব্বাস উত্তর দেন, 'এরা সুলাইম' বা 'এরা গিফার' বা 'এরা হলো মুযাইনা।' এদের কারো সাথেই আবু সুফিয়ানের দ্বন্দ্ব ছিল না। সে বলছিল, 'এদের

সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই।'

একটি ব্যাটালিয়ন আবু সুফিয়ানের মনোযোগ কেড়ে নেয়। তাদের ঈমানী তেজ, তাদের ঋজু ভঙ্গিমা দেখে সে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে। সেই ব্যাটালিয়নে আর কেউ নন, ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ আর তাঁর সাথে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই দল -- মুহাজির এবং আনসার। সবুজ পতাকা নিয়ে এগোতে থাকা এই দলটিকে দেখে আবু সুফিয়ান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে জানতে চায়, 'কারা এরা?' আল-আব্বাস বলেন, 'এরাই তো মুহাজির আর আনসার। এদের সাথে আছেন রাসূলুল্লাহ।' আবু সুফিয়ান যেন সম্মোহিতের মতো বলে ওঠে, 'নাহ! এদের সাথে পেরে ওঠার মতো শক্তি কারো নেই। আব্বাস, তোমার ভাতিজার রাজত্ব সত্যিই আজ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।' আব্বাস তাকে শুধরে দিয়ে বলেন, 'এটা রাজত্ব নয়, এটা হলো নবুওয়াত।' আবু সুফিয়ান বললো, 'হুম, ঠিকই বলেছো।'

পরবর্তী গন্তব্য: মক্কা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে যী-তুওয়ায় পৌঁছলেন। সেখানে তিনি বাহিনীর কোন অংশে কে নেতৃত্ব দেবে সেটা নির্ধারণ করে দিলেন এবং কীভাবে ও কখন মক্কায় প্রবেশ করা হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। বাম পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ ؓ। ডান পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আয-যুবাইর ইবন আল-আওয়্যাম ؓ। আর পদাতিক সৈনিকদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবায়দা ؓ।

কুরাইশরা কিছু ভাড়াটে সৈন্যদের দিয়ে প্রতিরোধ গড়ার পরিকল্পনা করেছিল। এদের বলা হতো 'আউবাশ'। আল্লাহর রাসূল ﷺ আনসারদের এই আউবাশদের একেবারে গুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাদেরকে আস-সাফায় অবস্থান নিতে বলেন। আয-যুবাইর মুহাজির ঘোড়সওয়ারদের নেতৃত্বে ছিলেন। তাকে মক্কার উপরিভাগে 'কিদা' নামক স্থানে পতাকা গেড়ে অবস্থান নিতে বলা হয়। খালিদের ؓ নেতৃত্বে ছিল কুদাআহ, সুলাইমসহ বেশ কিছু গোত্র। তারা অবস্থান নেন মক্কার নিচের দিকে। আনসারদের নেতৃত্বে ছিলেন সাদ ইবন উবাদাহ ؓ।

মক্কার চারদিকে মুসলিমদের চারটি বাহিনী এমনভাবে অবস্থান নিলো যে, প্রতিরোধ গড়ার মতো কোনো অবস্থাই কুরাইশদের ছিল না। তারা একেবারেই হাল ছেড়ে দিল। বিনা বাধায় মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করতে লাগলো। শুধুমাত্র খালিদ ইবন ওয়ালিদ ؓ যেদিকে অবস্থান নিয়েছিলেন সেদিকে বনু বকর এবং হুদাইল বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে। কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদ ؓ তাদের পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দেন। অল্পসময়েই তারা কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচে। এটাই ছিল মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে একমাত্র নামে মাত্র প্রতিরোধ।

কতটা সহজে মুসলিমরা মক্কা জয় করে সেটা একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে বুঝা যায়। হিমাস ইবন কাইস নামের এক যোদ্ধা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তলোয়ারে শান দিচ্ছিল। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো,

- এই, এসব কেন করছো তুমি?

- মুহাম্মাদ আর তার সঙ্গীদের সাথে যুদ্ধ আছে!

- তাই নাকি! কয়েকটাকে ধরে এনো তো, তোমার দাস বানিয়ে রেখো!

হিমাস কিংবা তার স্ত্রী -- কারোই ধারণা ছিল না তারা কীসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। আবু জাহেলের ছেলে ইকরিমার বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে হিমাস দেখলো মুশরিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়িমড়ি করে পালাচ্ছে। হিমাস কোনোমতে নিজেকে অক্ষত রেখে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে বাড়ি চলে আসলো। তার স্ত্রী তাকে দেখেই বলে উঠলো,

- কী ব্যাপার, তুমি না বললে ওদের হারানো তোমার জন্য ডালভাত?

- ইয়ে মানে, সাফওয়ান আর ইকরিমার মতো যোদ্ধাই যদি পালিয়ে যায়, আমার কী করার আছে বলো!

এদিকে আবু সুফিয়ান মক্কায় চলে এসেছে, চিৎকার করে বলছে, 'কুরাইশরা শোনো! মুহাম্মাদ ﷺ যে বাহিনী নিয়ে এসেছে তার সাথে মোকাবেলা করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। কাজেই যে আবু সুফিয়ানের ঘরে থাকবে সে নিরাপদ!'

মক্কার পতন হবে -- এটা মুশরিকরা মানতেই পারছিল না। আবু সুফিয়ানের মুখে এ কথা শুনে খোদ তার স্ত্রী হিন্দ ক্ষেপে গিয়ে তার গোঁফ ধরে বললো, 'এই বুড়োর মৃত্যু হোক! মেরে ফেলো একে!' আবু সুফিয়ান স্বপক্ষ নিয়ে বলতে লাগলো, 'এই মহিলার কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না। যে বাহিনী তোমাদের সাথে লড়তে এসেছে তাদের সাথে তোমরা পেরে উঠবে না। কাজেই আমার কথা শোনো, আজ আবু সুফিয়ানের ঘরে যে থাকবে সে নিরাপদ!'

লোকেরা এ কথায় বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'ধ্বংস হও তুমি! তোমার ঐ ছোট্ট ঘরে আমরা এতগুলো মানুষ আঁটবো কী করে?' আবু সুফিয়ান তখন জানিয়ে দিলো, 'কেউ যদি নিজের ঘরে অবস্থান নেয়, সে নিরাপদ। কেউ যদি মসজিদে অবস্থান নেয়, সে নিরাপদ।' এ কথা শুনে লোকেদের ভিড় দ্রুতই হালকা হয়ে গেল। সবার যার যার বাসায় অথবা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিল।

আল্লাহর রাসূল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন যেন কোনো প্রকার রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় সম্ভব হয়। সেটাই হয়েছিল। তবে আনসার নেতা সাদ ইবন উবাদা ﷺ উত্তেজনার বশে আবু সুফিয়ানকে দেখে বলে ওঠেন, 'আজ হলো মহান যুদ্ধের দিন! আজ কাবার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে!'

কথাগুলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ কানে পৌঁছলে তিনি বলেন, 'সাদ ভুল বলেছে। এটা তো সেই দিন যেদিন আল্লাহ কাবাকে মহিমান্বিত করবেন!' রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ ইবন উবাদার ﷺ কাছ থেকে ব্যানার নিয়ে নেন। পাছে তিনি মক্কায় কোনো রক্তপাত না করে বসেন! কিন্তু এত বড় একজন সাহাবি, যিনি আল্লাহর রাসূলকে নুসরাহ দিয়েছেন, জীবন-মরণ আল্লাহর দ্বীনের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার শপথ করেছেন, তার থেকে ব্যানার ফিরিয়ে নিয়ে তাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছিলেন না আল্লাহর রাসূল। তাই সে ব্যানার তুলে দেন তাঁরই ছেলে কাইস ইবন সাদের হাতে।

নিজের দেশে বিজয়ীর বেশে

অবশেষে এল সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত, স্বপ্ন পূরণের মুহূর্ত। যে মানুষটি আজ থেকে আট বছর আগে এই শহর ছেড়ে রাতের আঁধারে চুপিসারে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি আজ ফিরে এসেছেন। ফিরে এসেছেন সেই আজীবন পরিচিত জন্মভূমির মাটিতে। যে মানুষগুলো তাঁকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারা আজ ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে!

আজ থেকে বিশ বছর আগে তিনি আস-সুবহা ডাক দিয়ে মক্কার লোকগুলোকে জড়ো করেছিলেন। তাদের বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নাও। তারা তাঁকে তাচ্ছিল্য করেছে, অবজ্ঞা করেছে, বয়কট করেছে। কিন্তু আজ তারাই তাঁর কথা শুনার জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছে। এই মক্কার মাটিতে একদিন তাঁর শরীরের ওপর নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্রেফ মজা করার জন্য। আজ তাঁর গায়ে আঁচড় দেওয়ার সাহসটুকুও কারো নেই। হুমকি আর মৃত্যুভয় তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে বছরের পর বছর। কিন্তু আজ সেই হুমকিদাতার দল নিজেদের মৃত্যুভয়ে কম্পমান!

তারা বিলালকে ﷺ তপ্ত মরুভূমির বুকে পাথর চাপা দিয়েছিল, উসমানকে ﷺ কার্পেটে মুড়ে তার গায়ের ওপর লাফিয়ে পাশবিক অত্যাচার করেছিল। তারা খাব্বাবকে ﷺ ছুঁড়ে ফেলেছিল জ্বলন্ত পাথরে, আম্মারকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে নিথর ফেলে রেখেছিল। সেই বিলাল, উসমান, খাব্বাব আর আম্মাররা আজ বিজয়ী বাহিনীর একেকজন বীর সৈনিক!

যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল বদদুআ করেছিলেন, তাদের কেউ আজ বেঁচে নেই। তাঁর কথার একচুল বিরোধিতা করার মতো কেউ নেই। তারা না পেরেছে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে কিনে নিতে আর না পেরেছে যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে হত্যা করতে। বরং মক্কার লোকেরা আজ হার মানতে বাধ্য হয়েছে তাদের চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠা সেই চেনা মুখ 'আল-আমীন' এর কাছে। একদিন তারা বলেছিল এ তো কবি, পাগল, জাদুকর -- আরও কত কী! কিন্তু আজ তারা ঠিকই জানে, ইনিই হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করছেন। তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি। আল্লাহ তাঁকে এক মহাসম্মান দান করেছেন। এই সম্মানের কৃতজ্ঞতায় তিনি মাথা নুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করছেন। একমনে পাঠ করছেন আল্লাহর বাণী, সূরা ফাতহের সেই আয়াতগুলো,

'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়...'

বিজয়ীর বেশে আজ মক্কার রাজপথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। কিন্তু কোথাও কোনো কুচকাওয়াজ নেই, নেই কামানের শব্দের মিথ্যে জৌলুস। জাতীয় সঙ্গীতের বাজনা নেই, উন্মত্ত-উল্লাসধ্বনি নেই, কোনো লাল গালিচাও পাতা নেই। পরাক্রমশালী এই বাহিনীর মাঝে নেই কোনো অহংকারের ছাপ। বুক উঁচু করে, অবনত মস্তকে, আল্লাহর প্রতি বিনম্র চিত্তে বিজয়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করছেন। তিনি উটের পিঠে বসা। শহরে ঢোকার সময় তিনি আল্লাহর কাছে সিজদা দিয়ে আছেন। এতটাই নিচু হয়ে আছেন যে তাঁর দাড়ি উটের সাথে লেগে আছে। তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য নেই, আছে নম্রতা। উত্তেজনা নেই, আছে সাকিনাহ।

আল্লাহর রাসূল ﷺ কাবার চারিদিকে তাওয়াফ করলেন। তাঁর হাতে একটি বর্শা ছিল। সেই বর্শা দিয়ে কাবাকে ঘিরে রাখা ৩৬০টি মূর্তিকে একে একে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে লাগলেন। মুশরিকদের দেবতারা একে একে ভূপাতিত হতে লাগলো। আল্লাহর রাসূল তিলাওয়াত করছেন কুরআনের সেই দুটো আয়াত,

"আর বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭: ৮১)

"বলুন, সত্য এসেছে এবং বাতিল কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, আর কিছু পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না।" (সূরা সাবা, ৩৪: ৪৯)

একে একে সমস্ত মূর্তিকে ধ্বংস করা হলো। উসমান ইবন তালহা ﵁ থেকে কাবার চাবি আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার দরজা খুললেন। ঢুকেই সেখানে দেখতে পেলেন কাঠের তৈরি একটা কবুতরের মূর্তি। সেটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেললেন। আল কাবার ভেতরে আরও অনেক ছবি আর মূর্তি ছিল। সমস্ত মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করা হলো। সবগুলো ছবি মুছে ফেলা হলো। কাবার ভেতরে একটা ছবিকে মুশরিকরা নবী ইবরাহীমের ﵇ ছবি বলে দাবি করতো। সেই ছবিতে ইসমাঈলের ﵇ হাতে ছিল আল-আযলাম। আল-আযলাম হলো এক প্রকার লটারি। পৌত্তলিকরা কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই লটারি ব্যবহার করতো। এই ছবি চোখে পড়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন। এই মুশরিকরা ঠিকই জানতো ইবরাহীম বা তাঁর পুত্র কেউই আল-আযলাম ব্যবহার করতেন না।'

সবগুলো প্রতিকৃতি ও ছবি সরিয়ে ফেলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার ভেতর প্রবেশ করলেন। কাবা এখন শিরকের কলুষতা ও নোংরামি থেকে পবিত্র। আল্লাহর রাসূল ﷺ

কাবার প্রতিটি কোণে গিয়ে পাঠ করলেন 'আল্লাহু আকবর'। তারপর সেখানেই সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ কাবা থেকে বের হয়ে কাবার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। উৎসুক জনতা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে আছে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করছে। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি ছোট্ট একটি ভাষণ দিলেন।

> *'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আজ তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। একাই সমগ্র শত্রুকে পরাজিত করেছেন।*
>
> *তোমরা জেনে রাখো, জাহিলিয়াতের সকল আভিজাত্যের অহমিকা আর সম্পদের প্রতিশোধের দাবি আমার পায়ের নিচে। তবে বাইতুল্লাহর সেবা এবং হাজীদের পানি পান করানোর বিষয়টি আগের মতোই থাকবে।*
>
> *জেনে রাখো, যে কোনো রকমের হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব বা ক্ষতিপূরণ একশত উট, এর মধ্যে চল্লিশটি উট হতে হবে গর্ভবতী।*
>
> *কুরাইশরা! তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে জাহিলিয়াতের অহংকার এবং বংশগৌরবের অবসান ঘটিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।'*

এরপর তিনি পাঠ করলেন সূরা হুজুরাতের একটি আয়াত।

> "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চারিদিকে অসংখ্য মানুষ। মক্কার জনতার চোখেমুখে বিস্ময়, ভয়, কৌতূহল! তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে একটি মানুষের সিদ্ধান্তের উপর -- সেই মুহাম্মাদ ﷺ, যাকে তারা অপমান করেছে, দিনের পর দিন অভুক্ত রেখেছে, দেশছাড়া করে ছেড়েছে -- আজ তিনিই বীরের বেশে নেতা হয়ে ফিরে এসেছেন নিজের ঘরে। কুরাইশের লোকেদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসার কথা। তারা আজ তাঁরই তরবারীর নিচে। রাসূলুল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন,

- তোমাদের কী ধারণা? আজ তোমাদের সাথে আমি কেমন ব্যবহার করবো?

- আপনি আমাদের ভাই, আমাদের ভাতিজা। আপনার কাছে থেকে মহৎ আচরণের আশা করি।

রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সেটাই বলব যা ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন। লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওম -- আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।'

মক্কায় শুরু হলো এক নতুন যুগের সূচনা। জাহিলিয়াতের আদর্শ, আইন-কানুন, রীতি-প্রথা সবকিছু প্রতিস্থাপিত হলো ইসলাম দিয়ে। আরবের সে সমাজে গোত্রীয় গর্ব বা বংশমর্যাদাই ছিল গোটা সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ভিত্তিকে বাতিল করে দিলেন। নতুন এই সমাজের ভিত্তি হবে ইসলামী আদর্শ। আর এটি পরিচালিত হবে ইসলামী আইন ও মূল্যবোধে। মক্কার কুরাইশরা তাদের বাপ-দাদার অর্থহীন ঐতিহ্য আর সামাজিক পদমর্যাদা টিকিয়ে রাখতে সুদীর্ঘ বিশ বছর ইসলামের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। কিন্তু তারপরও এদের মন জয় করার জন্য আল্লাহর রাসূল তাদের কোনো নিয়ম-কানুন বা আচার-প্রথা গ্রহণ করেননি।

বিলালের ؓ আজান

আল্লাহর রাসূল ﷺ বিলালকে আজান দেওয়ার জন্য ডাকলেন। আজ থেকে আট বছর আগে বিলাল কথা বলতেন চুপিচুপি, কিন্তু আজ বিলাল দাঁড়িয়ে আছেন কাবাঘরের ওপরে উন্মুক্ত কণ্ঠে আজান দেবেন বলে। আজ তিনি মক্কার কাউকে ভয় পান না। বিলাল ছিলেন মুশরিকদের চোখে নীচুশ্রেণি। তাকে দেখে অনেকেরই সহ্য হলো না। তারা কানাঘুষা করতে লাগলো, 'এই কালো কাকটা এখানে কী করছে?'

কাউকে পাত্তা না দিয়ে বিলাল তার সুমধুর কন্ঠে আজান দিলেন। সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল। আজানের ধ্বনি যেন সবাইকে তন্ময় করে দিলো। এই একই আজানের ধ্বনিতে কারো অন্তরের দরাজ ভেঙে ইসলাম প্রবেশ করলো, আর কারো অন্তরে দাউদাউ করে বিদ্বেষের আগুন জ্বলতে লাগলো। কাবাঘর হলো আল্লাহর ঘর। শিরকের অত্যাচারে এতদিন এই ঘরটা যেন খা-খা করছিল, দীর্ঘদিন পর বিলালের আযানের মাধ্যমে তাওহীদ ফিরে এল। বিলাল ছিলেন একজন দাস। কাবায় তার আজান ছিল মক্কায় গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের প্রতীকি সমাপ্তি। বিলালকে দিয়ে আজান দেওয়ানোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, ইসলাম দ্বারা যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে তাতে জাহিলিয়াতের শ্রেণীবৈষম্যের আর কোনো স্থান নেই। একজন মানুষের মর্যাদা বা হীনতা নির্ধারিত হবে তাকওয়ার মাধ্যমে।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং বাইয়াত গ্রহণ

মক্কায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হলো। তাদের বাড়িঘর তাদেরই থাকলো, কোনো করও আরোপ করা হলো না। বলা হলো, কেউ যদি তার নিজ বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে সে নিরাপদ। যদি সে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সে নিরাপদ। যদি কেউ মসজিদে অবস্থান করে তাহলে সে নিরাপদ।

বিজিত শত্রুর প্রতি এই অভাবনীয় দয়া, একজন নবী ছাড়া আর কে-ই বা করতে পারেন? মক্কার লোকেরা উপলব্ধি করলো, যে দেবতাদের তারা এতকাল উপাসনা করে এসেছে, তারা আসলে মিথ্যা মাবূদ। ইসলামের সত্য উপলব্ধি করে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

> "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসা করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।" (সূরা নাসর, ১১০)

সাফা পাহাড়ে বসে আল্লাহর রাসূল তাদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন। লোকেরা এসে তাঁর কাছে এই মর্মে বাইয়াতবদ্ধ হলো যে, তারা সাধ্যমতো তাঁর কথা শুনবে ও মানবে। মহিলাদের থেকেও আল্লাহর রাসূল সেদিন বাইয়াত নিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দও বাইয়াত দিতে হাজির হলো। তবে সে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাইলো পাছে আল্লাহর রাসূল তাকে চিনে ফেলেন। বিশেষ করে আল্লাহর রাসূলের চাচা হামযার সাথে হিন্দ যা করেছিল, তাতে তার নিজেকে আড়াল করতে চাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূল ﷺ বাইয়াতের শর্তগুলো এক এক করে উল্লেখ করছিলেন, আর উমার সেসব মহিলাদের সামনে পুনরাবৃত্তি করছিলেন। যেমন- শিরক না করা, সন্তান হত্যা না করা, মিথ্যা শপথ না করা ইত্যাদি। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা চুরি করবে না...' তখন হিন্দ নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে বলে ফেলে, 'আচ্ছা আল্লাহর রাসূল, আবু সুফিয়ান তো খুব কৃপণ স্বভাবের। সে যা খরচাপাতি দেয়, তাতে আমার আর আমার সন্তানদের চলে না। এখন যদি আমি তার থেকে কিছু না বলে নিই, সেটা কি গুনাহ হবে?' আল্লাহর রাসূল হেসে বললেন, 'যতটুকু না নিলেই নয়, ততটুকু তুমি তার থেকে নিতে পারো, সমস্যা নেই।'

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আরেকটি শর্ত উল্লেখ করলেন, 'তোমরা যিনা করবে না।' হিন্দ এ কথা শুনে অবাক হয়ে বললো, 'একজন স্বাধীন নারী কী করে যিনা করতে পারে!' হিন্দের বিস্ময় বলে দেয় তৎকালীন মুশরিক সমাজেও যিনা-ব্যভিচারকে কতটা খারাপভাবে দেখা হতো। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বর্তমান মুসলিম সমাজে শহুরে জীবনে যিনা-ব্যভিচারের প্রতি মুসলিমদের এক ধরনের সহনশীলতা তৈরি হয়েছে।

হিন্দের কণ্ঠ শুনে আল্লাহর রাসূল তাকে চিনে ফেলেন। জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা তুমিই কি হিন্দ?' হিন্দ উত্তর দেয়, 'জ্বী আল্লাহর রাসূল, আমিই হিন্দ। যা কিছু হয়ে গেছে তার জন্য আমাকে মাফ করে দিন।' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিন।' শেষ পর্যন্ত হিন্দ সব শত্রুতা ভুলে একজন আন্তরিক মুসলিমাহ হিসেবে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন।

কাবার চাবি রাখা এবং হাজীদের পানি সরবরাহ করা ছিল কুরাইশদের জন্যে বেশ গৌরবের একটি বিষয়। আলী ইবন আবি তালিব ﷺ এই দায়িত্ব পেতে চাইলেন।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ গোত্র বনু হাশিমের অনেকেই এই সম্মান লাভ করতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ এই চাবি দিলেন উসমান ইবন তালহাকে ؓ। এই উসমান ইবন তালহা যখন মুশরিক ছিলেন তখনো তার গোত্র বনু শাইবার কাছেই কাবার চাবি গচ্ছিত থাকতো। মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেই নিয়মটি পরিবর্তন করলেন না। উসমান ইবন তালহাকে চাবি রাখার দায়িত্ব দিয়ে বললেন, 'এটা চিরদিনের জন্য রেখে দাও। তোমাদের কাছ থেকে যে এই চাবি কেড়ে নেবে সে জালিম।' বংশ পরম্পরায় এখনো সেই চাবি বনু শাইবার অধিকারে আছে।

কালো তালিকা

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও কিছু জঘন্য অপরাধীর জন্য একটি কালো তালিকা তৈরি করা হয়। এদের ক্ষমা করা হয়নি। এই কালো তালিকায় ছিল নয় থেকে তেরো জন মানুষ। এরা হলো আব্দুল উযযাহ ইবন খাতাল এবং তার দুই দাসী, আব্দুল্লাহ ইবন সাদ আবি সারাহ, মাকিস ইবন সাবাবাহ, আল হুয়াইরিস ইবন নাকিস, হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ এবং সারাহ। ভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন নামও এসেছে। এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তাদেরকে হত্যা করো, যদি তারা আল কাবার গিলাফ (পর্দা) ধরে ঝুলে থাকে, তবুও!'

আব্দুল্লাহ ইবন খাতাল ছিল একজন মুহাজির মুসলিম। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কর সংগ্রহ করার কাজে পাঠান, তার দাস তার সাথে ছিল। পথিমধ্যে কোনো কারণে সে তার দাসের ওপর রেগে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে। সে জানতো কাজটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো ছাড় দেবেন না। ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম, চাকর হোক, মালিক হোক -- সবার জন্যই ন্যায় বিচার। আবদুল্লাহ ইবন খাতাল শাস্তির ভয়ে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে। হত্যার আদেশ জারি হওয়ার পর সে কাবাঘরের গিলাফ ধরে ঝুলে থাকে। তাকে সে অবস্থাতেই হত্যা করা হয়।[103]

তার দুজন দাসী ছিল -- ফারতানা এবং আরনাব। আল্লাহর রাসূলের কুৎসামূলক গান গাওয়ার অপরাধে তাদের দুইজনকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয় এবং অপরজন মুসলিম হয়ে ছাড়া পেয়ে যায়।[104]

আব্দুল্লাহ ইবন আবি সারাহ ছিল একজন মুসলিম এবং কুরআন সংরক্ষণকারী। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে সে মক্কায় পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সে গলাবাজি করতে থাকে, 'আমি কুরআন পাল্টে ফেলবো! কুরআন লিখে তার অর্থ বদলে দেবো!' মক্কা বিজয়ের দিন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে সে তার দুধ ভাই উসমান ইবন আফফানের ؓ কাছে নিরাপত্তা চায়। উসমান তাকে নবীজির ﷺ কাছে নিয়ে যান।

---

[103] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৫০।

[104] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৭।

আবদুল্লাহ ইবন আবি সারাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'আমি আপনাকে বাইয়াত দিতে এসেছি।' নবীজি চুপ করে রইলেন, সে আবার বললো, 'আমি আপনাকে বাইয়াত দিতে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ এবারও কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বারে নবীজি ﷺ তার বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

সে চলে যাবার পর নবীজি উপস্থিত সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি বুদ্ধিমান কেউ ছিল না? আমি তো এজন্য চুপ করেছিলাম যেন তোমাদের কেউ উঠে এসে তার গর্দানটা উড়িয়ে দেয়।' একজন সাহাবি বললেন, 'ইশ! আপনি যদি আমাদেরকে একটু ইশারা করতেন!' নবীজি ﷺ উত্তর দিলেন, 'ইশারা দিয়ে হত্যা করা কোনো নবীর জন্য শোভা পায় না।'[105]

আব্দুল্লাহ ইবন আবি সারাহ অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেল। তবে সে জীবনের শেষপর্যন্ত ভালো মুসলিম হয়ে বেঁচে ছিল। তার মৃত্যু ঘটে ফজরের নামাযে সিজদারত অবস্থায়। উমার ইবন খাত্তাব এবং উসমানের ﷺ শাসনামলে তিনি বেশ ভালো পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মাকিস ইবন হুবাবার ভাই ছিলেন একজন মুসলিম। বনু মুসতালিকের যুদ্ধে তার ভাই এক আনসারী মুসলিমের হাতে ভুলক্রমে নিহত হন। মাকিস তখন হিজরত করে মদীনায় আসেন শুধুমাত্র তার ভাইয়ের মৃত্যুর ক্ষতি পূরণের টাকার লোভে। ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে সে পালিয়ে মক্কায় ফিরে আসে এবং মুরতাদ হয়ে যায়।

হুয়াইরিস ইবন নাকিসের অপরাধ ছিল সে মক্কায় আল্লাহর রাসূলকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় সে আল্লাহর রাসূলের দুই কন্যা ফাতিমা ﷺ এবং উম্ম কুলসুমকে ﷺ উত্ত্যক্ত করে। একই রকম অপরাধ করেছিল হাব্বাব ইবন আসওয়াদ। সে হিজরতের সময় আল্লাহর রাসূলের কন্যা যাইনাবকে ﷺ বর্শা উঁচিয়ে ভয় দেখায়। তখন যাইনাব ছিলেন গর্ভবতী। এ ঘটনায় যাইনাবের গর্ভপাত হয়ে যায়। হুয়াইরিসকে হত্যা করা হয় কিন্তু হাব্বাব পরবর্তীতে মুসলিম হয়ে ফিরে আসে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর সারাহ ছিল হাতিব ইবন আবি বালতার পত্রবাহিকা, মাক্কী যুগে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে গান গাইতো। তার জন্য নিরাপত্তা চাওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে যায়।

কালো তালিকায় আরও কিছু ব্যক্তির নাম ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। এখানে উল্লেখ্য, যাদের নাম কালো তালিকাভুক্ত ছিল এদের প্রায় সবার অপরাধ ছিল হয় *রিদ্দা* নয়তো *আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিন্দা করা*। তীব্রতার মাত্রায় এই দুটো অপরাধ ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। যে কারণে মক্কার সাধারণ কাফিরদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলেও এ দুটি অপরাধের সাথে যুক্তদের ক্ষমা করা হয়নি। এ দুটি

---

[105] সুনান আন-নাসাই, অধ্যায় রক্তপাত নিষিদ্ধকরণ, হাদীস ১০২।

অপরাধের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। একজন কাফির যুদ্ধবন্দী হলে তাকে হত্যা করা, মুক্ত করে দেয়া, দাস হিসেবে রাখা বা তার থেকে মুক্তিপণ আদায় করা কিংবা তাকে বন্দী বিনিময়ে ব্যবহার করা – এর যেকোনোটির সিদ্ধান্ত ইমাম নিতে পারেন। কিন্তু মুরতাদের ক্ষেত্রে একটিই বিধান। তা হলো মৃত্যুদণ্ড। শুধুমাত্র সে যদি পুনরায় মুসলিম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেই তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

উম্ম হানি ﷺ ছিলেন আলী ইবন আবি তালিবের ﷺ বোন। মক্কা বিজয়ের দিন তার শ্বশুর বাড়ির দুই আত্মীয় তার কাছে আশ্রয় চাইলে তিনি তাদের আশ্রয় দেন। কিন্তু আলী ﷺ বিষয়টি পছন্দ করলেন না। তিনি তাদের হত্যা করতে চাইলেন। উম্ম হানি তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ শরণাপন্ন হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব খুশি হয়ে তাকে স্বাগত জানালেন, জানতে চাইলেন কী হয়েছে। উম্ম হানি সবকিছু খুলে বলার পর সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সমস্যা নেই, তুমি যাদের নিরাপত্তা দিয়েছো আমিও তাদের নিরাপত্তা দিলাম।'

বিবিধ শিক্ষা

১) উম্ম হানির ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো, একজন মুসলিম চাইলে একজন ব্যক্তি বা ছোট কোনো দলকে নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু বড় কোনো দল বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। এ কারণে আবু সুফিয়ান চুক্তি নবায়ন করতে মদীনায় গেলে কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি।

২) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার সময় বলা হয়েছিল কেউ যদি নিজ ঘরে অবস্থান করে, তাহলে সে নিরাপদ। অথবা কেউ যদি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেয় তাহলে সে নিরাপদ। এখানে লক্ষণীয়, কেউ যদি নিজ ঘরেই অবস্থান করতে পারে, তাহলে আবু সুফিয়ানের ঘরে তার যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। তবু কেন নাম ধরে আবু সুফিয়ানের কথা উল্লেখ করা হলো? আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের মানসিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থানের কথা মাথায় রাখতেন। আবু সুফিয়ান কিছুকাল আগেও ছিল কুরাইশদের নেতা। মাত্র সে মুসলিম হয়েছে। মুসলিম হয়ে তার মর্যাদা এবং সামাজিক অবস্থান হারানোর একটা ভয় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর রাসূল চাইলেন এই ভয় দূর করে দিতে এবং তার জন্য ইসলামে আসার পথ সহজ করে দিতে। আবু সুফিয়ানের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল। আল্লাহর রাসূল তাকে সেটাই দিলেন। তাই তার নাম ধরে বলে দিলেন কেউ যদি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেয় সে নিরাপদ। তাই, একজন মানুষের মানসিক কিংবা সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী সত্যকে গ্রহণ করা তাঁর জন্য সহজ করে দেওয়া উচিত।

৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান দেখুক কত বিশাল মুসলিম বাহিনী মক্কা অভিযানে এসেছে। তিনি আবু সুফিয়ানের মন থেকে লড়াই করা বা প্রতিরোধ গড়ার শেষ ইচ্ছেটুকুও মেরে ফেলতে চাচ্ছিলেন। যদিও আবু সুফিয়ান তখন মুসলিম, কিন্তু তখনো তিনি একজন নও মুসলিম এবং কুরাইশদের নেতা। নিজ

গোত্রের কাছে গিয়ে তার মন বদলেও যেতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন আবু সুফিয়ান ﵁ স্বচক্ষে এই বাহিনী দেখে আত্মসমর্পণ করে ফেলুক। কারণ আল্লাহর রাসূল মক্কায় রক্তপাত হোক তা চাননি। এটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল, সীরাতে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে।

মক্কার পবিত্রতা ঘোষণা

সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিবের ﵀ মতে, মক্কা বিজয়ের দিনটি কোনো উৎসব বা আনন্দ উদযাপনের দিন ছিল না। তাঁর বর্ণনায়, সেদিন মক্কা প্রবেশের সময় মুসলিমরা তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়ছিলেন। তারা সেদিন কাবাঘরও তাওয়াফ করছিলেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করার তৌফিক দিয়েছেন, আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর কাবায় ফিরে এসে তারা সন্তুষ্ট, আনন্দিত।

তারা সকাল পর্যন্ত কাবাঘর তাওয়াফ করেন। সারা রাত ধরে তাদের ইবাদাত চললো। এই চমৎকার দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে আবু সুফিয়ান তার স্ত্রীকে বললো, 'তোমার কি মনে হয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে?' হিন্দ জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, আমার তো তা-ই মনে হচ্ছে!' এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আবু সুফিয়ানের দেখা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি হিন্দকে এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, তোমার কি মনে হয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে? আর হিন্দ জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ আমি মনে করি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে?' এ কথা শোনামাত্র আবু সুফিয়ানের অন্তরের ভেতর কী যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। নবুওয়াত নিয়ে তার সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। আর কেউ আমাদের এই কথোপকথন শুনেনি। আমি আর হিন্দ ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিল না।'

মক্কা বিজয়ের পরদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ সবার উদ্দেশ্যে বললেন,

> *'আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেই একই দিন তিনি মক্কাকে পবিত্র স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত এই পবিত্রতা বলবৎ থাকবে। আল্লাহ এবং শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাসী কারো জন্য মক্কায় রক্তপাত করা কিংবা গাছ কাটা বৈধ নয়। আমার আগেও এমনটা করা বৈধ ছিল না। আমার পরেও তা কারো জন্য বৈধ হবে না। যদি কেউ প্রশ্ন তোলে, তাহলে আল্লাহর রাসূল কেন এখানে রক্তপাত করেছেন? তবে তাকে বলবে, আল্লাহ তাঁকে সেই অনুমতি দিয়েছেন। এই অনুমতি তোমাদের দেওয়া হয়নি। আর আমার ক্ষেত্রে এটা কিছু সময়ের জন্যই বৈধ করা হয়েছে। আগে এখানে খুনখারাবি রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল। ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবে।'*[106]

---

[106] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২২।

অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে পশুপাখি হত্যা, গাছ কাটা, গাছপালা উপড়ে ফেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গাছ না কাটার আদেশ শুনে আব্বাস ইবন মুত্তালিব ইযকির নামের একটি গাছ কাটার অনুমতি চাইলেন। এই গাছটিকে মৃতদের জন্য সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল এই একটি গাছ কাটার অনুমতি দেন।

বিশৃঙ্খলা দমন

বনু হুযায়ল গোত্রের সাথে বনু খুযাআর একটি বিরোধ ছিল। জাহিলিয়াতের যুগে বনু হুযাইলের ইবন আসওয়া বনু খুযাআর এক লোককে হত্যা করে। মক্কা বিজয়ের পর তারা এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়। খুযাআর লোকেরা ইবন আসওয়াকে মেরে ফেলে। বনু খুযাআ ছিল মুসলিম গোত্র। হুদাইবিয়ার চুক্তিতে তারা ছিল মুসলিমদের মিত্র। এই ঘটনার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ খুযাআকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> *'খুযাআর লোকেরা, তোমরা হানাহানি থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। যে লোককে তোমরা হত্যা করেছো, আমি তার রক্তপণ আদায় করে দেবো। কিন্তু জেনে রাখো, এরপর থেকে যদি কেউ এমন কাজ করে, তাহলে নিহত ব্যক্তির পরিবার চাইলে এর প্রতিশোধে হত্যা করতে পারে, অথবা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই নিহত লোকের জন্য রক্তপণ আদায় করলেন। এভাবে বিষয়টি বেশি দূর গড়ানোর আগেই নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

আনসারদের সংশয়: কোথায় থাকবেন আল্লাহর রাসূল

মক্কা বিজয় হলো, চারিদিকে আনন্দ, কিন্তু আনসারদের মনে ভয় কাজ করছিল, প্রিয় মানুষকে হারানোর ভয়। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফা পাহাড়ে উঠে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। এই দৃশ্য দেখে আনসাররা ভাবলেন, মক্কা তো বিজয় হয়েই গেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ শহরে ফিরে এসেছেন। তিনি নিশ্চয়ই এখানেই থেকে যাবেন। এই ভাবনাটাই ছিল ভীষণ কষ্টের। মক্কা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর গত আট বছর ধরে তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আগলে রাখতে চেয়েছেন। একসাথে থেকে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করেছেন। আর এখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের ছেড়ে মক্কায় থেকে যাবেন? তারা তাদের মনকে মানাতেই পারছিল না।

এই কথাবার্তাগুলো আল্লাহর রাসূলের কানে গেল। তিনি আনসারদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি এ কথা বলেছো?' তারা প্রথমে স্বীকার করতে চাইলেন না, পরে

স্বীকার করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বললেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহর দিকে ও তোমাদের দিকে হিজরত করেছি। আমার জীবন তোমাদের সাথে, আর মৃত্যুও তোমাদের সাথে।'

গভীর আবেগে আনসারদের চোখ ভিজে গেল। এই অশ্রু আনন্দের। তারা কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আপনাকে কাছে পাওয়ার আকুলতা আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমরা এ কথা বলেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদের কথায় বিশ্বাস করেন।'

কুরাইশ নেতাদের ইসলাম গ্রহণ

সুহাইল ইবন আমর ﷺ

সুহাইল ইবন আমর ছিলেন ইসলামের একজন গোঁড়া শত্রু। বদর, উহুদ -- প্রতিটি যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে সুহাইলের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি আল্লাহর রাসূলকে অসম্মান করে কিছু আপত্তিকর কথাও বলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে মক্কা বিজয়ের পরে সুহাইল নিজের জান বাঁচাতে পালিয়ে যায়। কারণ, মুসলিমদের বিরোধিতায় সে যা করেছে, তাতে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

পালিয়ে গেলেও তার মনে সূক্ষ্ম আশা ছিল হয়তো আল্লাহর রাসূল তাকে ক্ষমা করে দিতেও পারেন। তাই সুহাইল তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবন সুহাইলকে ক্ষমার আশায় আল্লাহর রাসূলের কাছে পাঠালেন। আল্লাহর রাসূল এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'আল্লাহর শপথ! সে নিরাপদ, তাকে আসতে বলো!'

আল্লাহর রাসূল শুধু সুহাইলকে ক্ষমাই করলেন না, বলা চলে তাকে স্বাগত জানালেন। সাহাবিদের বলে দিলেন, কেউ যেন রাগের দৃষ্টিতেও সুহাইলের দিকে না তাকায়। বললেন, 'সুহাইলের মতো একজন বুদ্ধিমান আর অভিজাত লোক ইসলাম সম্পর্কে জানবে না -- তা কী করে হয়!'

সুহাইল মক্কায় ফিরে এলেন। তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন না। তবে আল্লাহর রাসূলের প্রশংসা না করে তিনি পারলেন না। বললেন, 'তারুণ্যে আর বার্ধক্যে, তিনি ছিলেন সবসময়ই বিশ্বস্ত আর ভালো মানুষ।' আসলে আল্লাহর রাসূলের চরিত্র এমন ছিল যে শত্রুরাও তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্মান না দিয়ে পারতো না। এই ঘটনার পর সুহাইল কিছুদিন মুশরিক অবস্থাতেই থেকে যান। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি আল্লাহর রাসূলের সাথে অভিযানে বের হন এবং মুসলিম হয়ে যান।

ইসলাম পরবর্তী জীবনে সুহাইল ইবন আমর ﷺ কেমন মুসলিম ছিলেন? এ প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক যেহেতু এই সুহাইল বছরের পর বছর ছিলেন ইসলামের বিরুদ্ধে

সক্রিয় শত্রু। আয-যুবাইর ইবন বাকর বলেছেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর সুহাইল নিয়মিতভাবে সালাত, সিয়াম, যাকাত আদায় করতেন। এমনকি তিনি নিজের দল নিয়ে শামে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে বেরিয়ে পড়েন। তিনি এত বেশি সিয়াম আর কিয়াম পালন করতেন যে, তার মুখ শুকিয়ে যেত। কুরআন শুনলে তিনি কাঁদতেন। আর ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিনি ছিলেন কিরদূস ব্যাটালিয়নের কমান্ডার।'

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা ﷺ

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার কথা এর আগেও এসেছে। সে ছিল ইসলামের একজন নামকরা শত্রু। বদরের পর আল্লাহর রাসূলকে গুপ্তহত্যার পরিকল্পনাকারী ছিল এই সাফওয়ান। মক্কা বিজয়ের পর সেও সুহাইলের ﷺ মতো মৃত্যুভয়ে পালিয়ে যায়। জেদ্দার কাছে আশ-শুয়াইবায় আত্মগোপন করে।

তার পিছু নেয় তারই বন্ধু উমায়ের ইবন ওয়াহাব ﷺ। এই উমায়ের ইবন ওয়াহাব-ই সাফওয়ানের পরিকল্পনামতো বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূলকে বিষ মাখানো তরবারি নিয়ে হত্যা করতে এসে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, উমায়ের জেদ্দায় সাফওয়ানের দেখা পায়। উমায়েরকে দেখে সাফওয়ান ভাবলো নিশ্চয়ই উমায়ের তাকে হত্যা করতে এসেছে। সাফওয়ানের বদ্ধমূল ধারণা ছিল আল্লাহর রাসূল নির্ঘাৎ তাকে হত্যা করবেন। কারণ ইসলামের শত্রুতায় সে যা করেছেন তাতে তার ছাড়া পাবার কথা নয়। অবশ্য উমায়েরের সাথে কথা বলে একটু পরেই তার ভুল ভাঙলো। উমায়েরকে সে বললো,

- তুমি কেন এসেছো? তোমার সব ঋণের দায়ভার আমি নিয়েছিলাম। আর এখন সেই তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছ?

- সাফওয়ান! আমি তো এমন একজন মানুষের কাছ থেকে এসেছি যিনি সবচেয়ে মহৎ, দয়ালু আর সজ্জন ব্যক্তি।

- না! আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না! তোমার কথার প্রমাণ কী?

সাফওয়ানের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, আল্লাহর রাসূল তাকে নিরাপত্তা দিতে পারেন! আসলে উমায়ের ইবন ওয়াহাব আগেই আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে সাফওয়ানকে নিরাপত্তা দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। উমায়ের বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল, সাফওয়ান তার গোত্রের নেতা। তাকে আপনি নিরাপত্তা দান করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ঠিক আছে, নিরাপত্তা দিলাম।' উমায়ের তখন নিরাপত্তার চিহ্নস্বরূপ কিছু চাইলে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পাগড়ী খুলে উমায়েরকে দেন।

সাফওয়ান প্রথমে মক্কায় ফিরে যেতে সাহস করছিল না। উমায়ের তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'আমি এমন একজন মানুষের কাছ থেকে এসেছি যিনি সবচেয়ে দয়ালু,

সহানুভূতিশীল এবং ক্ষমাশীল। তিনি তোমার চাচা। তাঁর মর্যাদাই তোমার মর্যাদা। তাঁর রাজত্বই তোমার রাজত্ব।' শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ পাগড়ী দেখে সাফওয়ান আশ্বস্ত হয়ে মদীনায় ফিরে যায়। ফিরে এসে সাফওয়ান রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটি বলছে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আর আমাকে নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটা কি ঠিক?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, সে ঠিকই বলেছে।' সাফওয়ান বললো, 'ঠিক আছে, আমাকে দুই মাস সময় দিন।' মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করতে এই সময়টুকু সে চাইলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চার মাস সময় দিলেন। পরবর্তীতে হাওয়াজিনের যুদ্ধের সময়ে সাফওয়ান ؓ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়। সে সময় আল্লাহর রাসূল তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দান করে তার মন জয় করেন।

ইকরিমা ইবন আবু জাহল ؓ

পিতা আবু জাহলের মৃত্যুর পর তার ছেলে ইকরিমা কুরাইশদের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়। তার ছিল একটাই চাওয়া। যেকোনোভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের হত্যা করে পিতা হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমাও কালো তালিকাভুক্ত ছিল।

আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে ইকরিমা ইয়েমেনে পালিয়ে গেল। তার স্ত্রী উম্ম হাকিম ছুটে গেলেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, ইকরিমা তো ইয়েমেন পালিয়ে গেছে। সে ভয় পাচ্ছে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলবেন। আপনি দয়া করে তাকে নিরাপত্তা দান করুন।'

আল্লাহর রাসূল রাজি হলেন। উম্ম হাকিম এই সুসংবাদ নিয়ে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে ছুটে গেল। ইকরিমা তখন তিহামায় এক নৌকায় বসে আছে। কিছুক্ষণ পরেই যাত্রা শুরু হবে। এ অবস্থায় উম্ম হাকিম ইকরিমাকে পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন,

- আমার সাথে মক্কায় ফিরে চলো। আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলেছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিতে রাজি হয়েছেন।

- সত্যি বলছো?

- হ্যাঁ, আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

ইকরিমা তার স্ত্রীর সাথে মক্কায় ফেরত আসলো। ইকরিমা তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইল কিন্তু তার স্ত্রী রাজি হলো না। বললো, 'তুমি একজন কাফির আর আমি একজন মুসলিম!'

ইকরিমা একটা ধাক্কা খেলো। শুধুমাত্র অমুসলিম হওয়ার কারণে তার স্ত্রী তাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করবে -- এটা সে ভাবতেই পারেনি। ইসলামের প্রতি কতটা ভক্তি থাকলে

তার স্ত্রী এমনটা করতে পারে? বিষয়টা ইকরিমাকে ইসলাম নিয়ে ভাবতে বাধ্য করল। কিছুক্ষণ পর সে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা করতে আসলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইকরিমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। কিন্তু ইকরিমা তখনো সন্দিহান। জানতে চাইলেন,

- আপনি কি সত্যিই আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন?

- হ্যাঁ, দিয়েছি। তুমি নিরাপদ।

- আপনি আমাকে কীসের প্রতি আহ্বান করেন?

- আমি তোমাকে এই সাক্ষ্য দিতে আহবান করি যে, এক আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো সত্তা নেই। আমি আহবান করি তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল। আর তুমি সালাত ও যাকাত আদায় করবে।

- আল্লাহর শপথ! আপনি তো কেবল সত্য আর যা কিছু সুন্দর, তার প্রতি আহবান করছেন। সত্যি বলতে, এই আহবান করার আগেও আপনি ছিলেন আমাদের মাঝে সবচাইতে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত আর মহৎ একজন মানুষ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো সত্তা নেই আর আপনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহর রাসূল খুবই খুশি হলেন। এবার ইকরিমার ﷺ ক্ষমা চাওয়ার পালা। সে বললো,

- আল্লাহর রাসূল! আমি যতবার আপনার সাথে শত্রুতা করেছি, যতবার যুদ্ধে আপনার মোকাবেলা করেছি, আপনার সামনে-পেছনে যতবার আপনার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছি, আমি চাই আপনি প্রতিবারের জন্যই আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

আল্লাহর রাসূল তার অনুরোধ রাখলেন। বললেন,

- হে আল্লাহ! তুমি ইকরিমাকে ক্ষমা করে দাও -- সে যতবার শত্রুতা করেছে, যতবার তোমার দ্বীনের আলো নিভিয়ে দিতে চেয়েছে -- প্রতিবারের জন্যই তাকে ক্ষমা করে দাও। আমার সামনে-পেছনে সে যতবার নিন্দা করেছে, তাকে সেসবের জন্য ক্ষমা করে দাও!

- হে আল্লাহর রাসূল! আমি খুব খুশি! আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে আমি যত টাকা খরচ করেছি, কথা দিচ্ছি, আল্লাহর পথে আমি এবার দ্বিগুণ খরচ করবো! আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি যত কষ্ট করেছি, কথা দিচ্ছি, আমি এখন থেকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য তার দ্বিগুণ কষ্ট করবো!

ইকরিমা তার কথা রেখেছিলেন। তিনি একজন ভালো মুসলিম এবং মুজাহিদ হিসেবে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। রিদ্দার যুদ্ধ, শামের যুদ্ধ -- এরকম অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে অংশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইয়ারমূকের যুদ্ধে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

সুহাইল ইবন আমর, ইকরিমা কিংবা সাফওয়ান -- যারা কি না ইসলামের বিরুদ্ধে এতটা সোচ্চার ছিলেন যে মক্কা-বিজয়ের পর ভয়ে-আতঙ্কে আল্লাহর রাসূলের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। তারা যখন শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ তাদের নিরাপত্তা দিতে রাজি হয়েছেন, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন নি! এত বিরুদ্ধাচার করার পরেও কি ক্ষমা পাওয়া সম্ভব? কিন্তু তারা প্রত্যেকে জানতেন, মুহাম্মাদ ﷺ হলেন 'আল-আমীন' -- বিশ্বস্ত -- তাঁকে সব ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়। তাঁর মুখের প্রতিটা কথা সত্য, তাঁর কাছে সকল আমানত নিরাপদ, তাঁর নিরাপত্তাও তাই বিশ্বাসযোগ্য। ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর রাসূলের কথার ওপর যে পরিমাণ ভরসা করতে পেরেছে, সম্ভবত মানুষ তার বন্ধুর ওপরও এত ভরসা করতে পারে না।

বনু জাদীমার অভিযানে খালিদ ইবন ওয়ালিদের ﷺ ভুল ও প্রাপ্ত শিক্ষা

অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবন ওয়ালিদকে বনু জাদীমাহ গোত্রের কাছে পাঠালেন। তারা প্রথমে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু খালিদকে দেখে দমে গেল। খালিদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হলো। কিন্তু সরাসরি 'আমরা মুসলিম হয়েছি' না বলে তারা বললো, 'সাবা'আনা।'

যখন কেউ মুসলিম হতো, তখন কুরাইশরা তাচ্ছিল্য করে বলতো, 'সে সাবেঈ হয়ে গেছে।' যেহেতু অন্যেরা এই শব্দটি ব্যবহার করে, তাই তারাও তা ই বললো। কিন্তু আসলে তারা মুসলিমই হতে চাচ্ছিল কিন্তু 'আসলামনা' বলার মতো জ্ঞান তাদের ছিল না।

খালিদ ইবন ওয়ালিদের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য হলো না। তিনি তাদের কথা বুঝতে ভুল করে কাফির ভেবে তাদের হত্যা করা শুরু করলেন। কিন্তু কিছু মুসলিম সৈনিকের প্রবল প্রতিবাদের মুখে খালিদ থেমে গেলেন এবং ঐ গোত্রের বাকিদের বন্দী করে প্রত্যেক বন্দীকে একজন করে সৈনিকের হাতে অর্পণ করলেন।

পরদিন সবাইকে নিজেদের বন্দীকে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ এবং আরও কয়েকজন এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন। বিষয়টি পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে উত্থাপন করা হলো। রাসূলুল্লাহ খুবই রেগে গেলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি মুক্ত।'[107]

---

[107] সহীহ বুখারি, অধ্যায় বিচার, হাদীস ৫১।

আবদুল্লাহ ইবন উমার ঠিকই বুঝতে পারছিলেন খালিদ ভুল করছেন। এই লোকগুলো ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ও বন্দী করা হয়েছে। বিষয়টা এমন নয় যে, আমীরের আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন উমার জানতেন না। তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে, আমীরের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্তই করতে হবে যতক্ষণ তিনি যা নির্দেশ দিচ্ছেন তা হালাল। হারাম কাজের আদেশ দিলে আমীরের আনুগত্য করা যাবে না। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ একটি বিপজ্জনক ব্যাপার। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উমার এবং তার বন্ধুরা জেনেশুনেই আমীরের নির্দেশ অমান্য করেছেন। আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।

এই সারিয়াহর সময় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তারকৃত লোকদের মধ্যে একজন লোক ছিল বহিরাগত। সে জাদীমাহ গোত্রের ছিল না। সে এসেছিল এক মহিলাকে ভালোবেসে। হাত বাঁধা অবস্থায় সে তার পাহারায় থাকা মুসলিম সৈন্যকে অনুরোধ করলো, 'আমাকে একবার ঐ মহিলার কাছে যেতে দাও। এরপর তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, তা ই করো।'

তাকে যেতে দেওয়া হলো। সে ঐ মহিলার কাছে গিয়ে বললো, 'হুবাইশ, জীবনের ইতি হওয়ার আগেই ইসলাম গ্রহণ করো!' মহিলাটি বললো, 'আমি তো তোমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছি।' এতটুকুই তাদের মধ্যে কথা হলো। এরপর লোকটিকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হলো। মহিলাটি সেই দৃশ্য দেখে লোকটির কাছে এল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ নিজেও তার পাশে পড়ে গিয়ে মারা গেল।

এই ঘটনাটি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব খারাপ লাগলো। তিনি বললেন, 'তোমাদের কারো মনে কি একটুও দয়া হলো না?'

সেখানে হত্যা করা তো ভুল ছিলই, তার ওপর লোকটিকে এভাবে হত্যা করা ছিল খুবই দুঃখজনক। পুরো ঘটনাটা রাসূলুল্লাহকে ﷺ কষ্ট দেয়। তিনি দিয়্যাহ বা রক্তপণ পরিশোধ করার জন্য আলী ইবন আবি তালিবকে ؓ পাঠালেন। কেননা লোকগুলো ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে সমস্ত কিছুর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো। রক্তপণ ছাড়াও যা কিছু হারানো গিয়েছিল, যা কিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল তার সবকিছুর জন্য আলী ؓ ক্ষতিপূরণ দিলেন। এরপরেও কিছু অর্থ বেঁচে গিয়েছিল। যদি তাদের কোনো কাজে লাগে এই ভেবে আলী ؓ সেটাও তাদেরকে দিয়ে দিলেন।

ইবনে কাসীর এই ঘটনা নিয়ে একটি মন্তব্য করেছেন, তিনি বলছেন,

'খালিদ ইবন ওয়ালিদ ঐ গোত্রের অনেকজনকে হত্যা করেছিলেন। আর প্রায় সব বন্দীকে মেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু এরপরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদকে বরখাস্ত করেননি। সেনাবাহিনীর আমীর পদে তাকে বহাল রাখেন। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ

ঘোষণা করেছেন যে, খালিদ যা করেছে তার দায় থেকে তিনি মুক্ত। কিন্তু খালিদ হত্যা ও সম্পদ কেড়ে নিয়ে যে ভুল করেছিলেন সেই ভুলের মাশুলস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষতিপূরণও দিয়েছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আলিমরা মত দিয়েছেন যে, ইমাম যদি কোনো ভুল করেন তখন সেটার ক্ষতিপূরণ ইমামের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে নয়, বরং মুসলিমদের কোষাগার থেকে দেওয়া হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।'

আর এই কারণে আবু বকর আস সিদ্দীকও ﷺ তাকে তার পদে বহাল রেখেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক ﷺ বলেছিলেন, 'আমি সেই তলোয়ারকে কোষবদ্ধ করতে চাই না, যে তলোয়ারকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল মুশরিকদের উপরে কোষমুক্ত করেছেন।' তবে উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ সময়ে খালিদকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

জিহাদের সময়ে মুসলিমদের দ্বারা ভুলত্রুটিগুলোকে কীভাবে সুন্নাহ অনুসারে সামলানো যায়, সে ব্যাপারে এই ঘটনার মাঝে শিক্ষা রয়েছে। খালিদ ইবন ওয়ালিদ কিছু মুসলিমকে হত্যা করেছিলেন কিন্তু সেজন্যে তাকে কারাবন্দী করা হয়নি বা তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই কাজের সাথে তিনি একমত নন। তিনি খালিদকে শাস্তি দিলেন না। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিকে দ্রুত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই ক্ষেত্রবিশেষে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে আমীর হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিলেন।

একজন মুসলিমকে কখনোই কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। একজন মুসলিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মুসলিমরা একে অপরের ভাই। সে তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং তার উপর অত্যাচার করে না।' বর্তমান সময়ে বিষয়টিকে ঘিরে বেশ কিছু বিভ্রান্তি আছে। দুর্ভাগ্যবশত কিছু মুসলিম কাফিরদের রক্তকে মুসলিম রক্তের চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। তারা তাদের মুসলিম ভাইদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে চায় এবং কাফিরদের সাথে এক হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও জায়েয মনে করে। এর কারণ মানুষের মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারার জ্ঞানের অভাব। এই বিষয়ের ওপর মুসলিমদের আরও মনোযোগ দেওয়া জরুরি। তাদের জানা দরকার যে, মুসলিমরা কাদের প্রতি অনুগত এবং কাদের ব্যাপারে দায়মুক্ত।

মূর্তি ভাঙার অভিযান

উযযা ধ্বংস

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল উযযা ধ্বংস করার জন্য খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ﷺ পাঠালেন। আল লাত, আল উযযা, হুবাল -- এগুলো ছিল সে সময়ে মুশরিকদের কিছু জনপ্রিয়

দেবতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার চারপাশের মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন। এখন তিনি মক্কার বাইরের মূর্তিগুলোকেও ধ্বংস করতে চাইলেন।

আল উযযার মূর্তি ছিল নাখলায়। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ؓ নাখলায় গেলেন। উযযার তত্ত্বাবধায়করা তাঁকে দেখেই পালিয়ে গেল। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ؓ উযযার মূর্তি ভেঙে ফেললেন। এর ভিত্তিপ্রস্তরসহ গুঁড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আর কিছু দেখনি?' খালিদ উত্তর দিলেন 'না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাহলে তুমি আসল কাজটাই করোনি।'

খালিদ ইবন ওয়ালিদ আবার ফিরে গেলেন। দেখতে পেলেন, এলোমেলো চুলের এক নগ্ন নারীকে। সে চিৎকার করছে আর নিজের গায়ে ময়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ভীত হওয়ার পাত্র নন, তলোয়ারের কোপে তাকে হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহকে শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই ছিল আল উযযা। তুমি তাকে হত্যা করেছো।' বাহ্যিকভাবে একটা মূর্তি থাকলেও মূলত উযযা ছিল এক ধরনের জ্বীন বা শয়তান। । এর ভিতরে জ্বীন বা শয়তান বাস করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আজকের পর উযযা বলে আর কিছু নেই।'

মানাত ধ্বংস

মানাত মূর্তিটি ছিল লোহিত সাগরের পাড়ে। মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি জায়গায়। জাহিলিয়াতের যুগে আওস, খাযরাজ, গাসসান এবং অন্যান্য অনেক গোত্র মূর্তিপূজা করতো। হজ্জের সময়ে তারা এই মূর্তির পূজো দিয়েই হজ্জের সূচনা করতো। সাদ ইবন যাইদ আল-আশহালীকে ؓ আল্লাহর রাসূল এই মূর্তি ধ্বংস করার জন্য পাঠালেন। বিশজন সৈনিক নিয়ে তিনি মানাত ধ্বংস করতে গেলেন। মানাতের রক্ষক তাদের বললো,

- কেন এসেছো?

- মানাত ধ্বংস করতে!

- করো দেখি কী করতে পারো!

সাদ মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। বেরিয়ে এল একটি কালো নারী। সে মুখ দিয়ে আজেবাজে বকছিল। সাদ প্রথমে সেই মহিলাকে হত্যা করলেন, এরপর মূর্তি ধ্বংস করে ফিরে এলেন।

সুওয়া ধ্বংস

এই মূর্তির পূজা করতো বনু হুযাইল গোত্র। মক্কা বিজয়ের পর বনু হুযাইল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমর ইবন আল আসকে ؓ সুওয়া ধ্বংস

করতে পাঠান। আমর মূর্তি ভাঙতে উদ্যত হলে সুওয়ার রক্ষক তাকে বাধা দিল না। কিন্তু বললো, 'তুমি এর কিছুই করতে পারবে না।'

আমর বললেন, 'তুই এখনো মিথ্যার ওপরে বেঁচে আছিস? শোনে এই মূর্তি? দেখে এই মূর্তি?' এই বলে মূর্তিটি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিলেন। এরপর জানতে চাইলেন, 'এখন কী মনে হয় তোর?'

'আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম' – এই বলে সুওয়ার রক্ষক মুসলিম হয়ে গেল। চোখের সামনে মূর্তির অসারতার প্রমাণ পেয়ে হয়তো তার বোধোদয় ঘটেছিল। এভাবেই বিভিন্ন মূর্তি ভাঙার মাধ্যমে আরবের বুক থেকে শিরকের প্রতীকগুলোকে একে একে উচ্ছেদ করা হলো।

মক্কা বিজয় থেকে শিক্ষা

হুদুদ, ইসলামের সাম্য এবং শারীয়াহ

মক্কায় প্রবেশকালে আল্লাহর রাসূলের ﷺ উটের পেছনে বসা ছিলেন উসামাহ ইবন যাইদ ؓ। তার বাবা যাইদ একসময় ছিলেন দাস। আল্লাহর রাসূল ﷺ কাবাঘরে আজান দিয়েছিলেন বিলালকে দিয়ে। বিলালও ছিলেন সমাজের অপাংক্তেয় শ্রেণির একজন মানুষ। এগুলো ছিল মক্কার গোত্রীয় ভেদাভেদ ও শ্রেণিবৈষম্যকে ইসলামের সাম্য ও ন্যায় দিয়ে প্রতিস্থাপনের প্রতীকি পদক্ষেপ। তবে সত্যি বলতে, গোত্রীয় বৈষম্য কুরাইশদের মাঝে এত গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে, হাতে-কলমে এই শিক্ষা দেওয়াটা প্রয়োজন ছিল। এই শিক্ষাটি প্রোথিত করার আরেকটি সুযোগ মেলে একটি চুরির ঘটনার মাধ্যমে।

বনু মাখযুমের এক মহিলার কাহিনী। চুরির অপরাধে তাকে ধরে আনা হয়। বনু মাখযুম ছিল কুরাইশের এক প্রভাবশালী গোত্র। তাদেরই এক সম্মানিত মহিলা চুরি করার মতো অপরাধ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই মহিলার ওপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ, অর্থাৎ হাত কাটার নির্দেশ দিলেন।

এই আদেশের পর সেই গোত্রের লোকেরা সেই মহিলাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে উঠেপড়ে লাগে। সম্ভ্রান্ত একজন মহিলার চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে, বিষয়টা তাদের জন্য যেমন অভিনব, তেমনই কষ্টকর। তারা মানতেই পারছিল না প্রভাবশালী কেউ এ ধরনের শাস্তি পাবে। যে সমাজব্যবস্থায় বরাবর দুর্বল আর দাসশ্রেণির লোকেরাই শাস্তি ভোগ করে এসেছে, যে সমাজে উঁচু শ্রেণির লোকেরা বরাবর কোনো না কোনোভাবে পার পেয়ে এসেছে, সে সমাজের লোকেদের কাছে ব্যাপারটা হজম করতে কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারা উসামাহ ইবন যাইদকে ؓ দিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে শাস্তি লাঘব বা মাফ করার জন্য অনুরোধ করাতে চাইলো। কারণ, উসামাকে ؓ

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভালোবাসতেন।

পীড়াপীড়িতে উসামা অনিচ্ছার সাথে রাজি হলেন। বিষয়টা নিয়ে কথা তোলার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ চেহারাই বদলে গেল। তিনি খুবই রেগে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে একটি খুতবা দিলেন। খুতবায় বললেন, 'তোমাদের আগের জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছিল এই কারণে যে, তাদের সম্ভ্রান্ত বংশের কোনো লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আমার জানের মালিক আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে নিতাম!'

এরপর হাদ্দ কায়েম করা হলো অর্থাৎ শাস্তিস্বরূপ মহিলার হাত কেটে নেওয়া হলো। পরে অবশ্য সেই মহিলা তাওবা করেছিলেন। তার বিয়েও হয়েছিল। আইশা ﷺ বলেন, 'এ ঘটনার পরে তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। তার কিছু প্রয়োজন থাকলে আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ সেসব জানাতাম।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন এক আদর্শের শিক্ষা দিয়েছিলেন যেখানে আইন মানুষের জীবনকে পরিচালনা করে, ক্ষমতা নয়। যদি কোনো সমাজে কেবল দুর্বলদের শাস্তি দেওয়া হয় আর ক্ষমতাশালীরা পার পেয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল সেই সমাজকে ধ্বংস করে দেন। বর্তমান সমাজে এ ধরনের বৈষম্য তো আছেই, উপরন্তু আল্লাহর আইন বলেও কিছু নেই।

হাদীসে এসেছে যে, 'আল্লাহর হুদুদের একটি হাদ্দ প্রয়োগ করা চল্লিশ দিন টানা বৃষ্টি হওয়া থেকে কল্যাণকর।'[108] শুধু এই হুদুদ প্রয়োগ না করার কারণে সমাজ আজ হাজারো বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জীবনে এত বিশৃঙ্খলা। আজ এই উম্মাহর সম্পদ আছে, বিস্তৃত ভূমি আছে, কিন্তু সেসবে বারাকাহ নেই। কারণ কোথাও হুদুদের প্রয়োগ নেই। মুসলিমদের প্রত্যেকের ওপর দায়িত্ব পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করা। ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে বা শরীয়াহকে বর্তমানে বর্বর এবং মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি কল্যাণ, শান্তি ও বারাকাহ আছে। মুসলিমদের স্বর্ণযুগ বলে যে যুগটির কথা বলা হয়, সেটি প্রকৃতপক্ষে এই শরীয়াহর যুগ। আর যে যুগে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত, পদদলিত আর পিছিয়ে আছে, সেটি হলো গত দুশো বছর ধরে চলে আসা সাম্রাজ্যবাদের যুগ। এখন মুসলিমরা শরীয়াহকে বাদ দিয়ে কাফিরদের আইন মেনে নিয়েছে আর তাদের জীবনযাত্রার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।

---

108 ইবনু মাজাহ, অধ্যায় হুদুদ, হাদীস নং ২৫৩৭।

হিজরত এবং জিহাদ

বুখারীতে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর বলেন, 'আজ থেকে আর কোনো হিজরত নেই। শুধু জিহাদ ও নিয়্যত আছে। আর যদি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য আহবান করা হয়, তাহলে তোমরা তাতে সাড়া দেবে।'[109]

মক্কা বিজয়ের আগে হিজরত করা ছিল বাধ্যতামূলক। সেসময়ে যে-ই মুসলিম হতো, তাকেই মক্কা থেকে মদীনা, বা আরবের অন্য যে অংশেই সে থাকুক না কেন, তাকে মদীনায় হিজরত করতে হতো। মক্কা বিজয়ের পরে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, হিজরতের সময় শেষ। যারা যারা হিজরত করেছে, তারা এর আজর (সাওয়াব) পেয়ে গেছে। এখন আর হিজরতের সুযোগ নেই। হিজরতের বদলে এখন আছে জিহাদ। যে ইবাদাতের মাধ্যমে হিজরতের সাওয়াব লাভ করা যাবে, তা হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। তাবেঈ আতা ইবন রাবাহ رحمه الله বলেন,

'আমি আইশার ﵂ কাছে গিয়ে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আইশা বললেন, 'এখন আর কোনো হিজরত নেই। সে যুগে ফিতনা থেকে বাঁচতে মু'মিনরা তাদের দ্বীন নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে পালিয়ে আসতে চাইত। কিন্তু এখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল ইসলামকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম যেখানে ইচ্ছা আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে। তবে তোমাদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ করা উচিত এবং জিহাদের নিয়্যত রাখা উচিত।'

আজ থেকে আর কোনো হিজরত নেই -- এই কথার অর্থ এই নয় যে হিজরতের আদেশ রহিত হয়ে গেছে। বরং এ কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মক্কা থেকে মদীনায় আর হিজরত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করা অথবা ভালো নিয়ত, যেমন ভালোভাবে দ্বীন পালনের উদ্দেশ্যে হিজরত করা -- এ দুটো আদেশ ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ইবন কাসীর এই ব্যাপারে মন্তব্য করেন, '(সাধারণভাবে) এখন আর হিজরত নেই, তবে এমন কিছু পরিস্থিতি আছে যখন হিজরত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন হারবিদের (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কুফফার দেশ বা গোষ্ঠী) কাছাকাছি থাকলে আর তাদের মাঝে প্রকাশ্যে দ্বীন পালনের সুযোগ না থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে আলিমরা একমত।'

অর্থাৎ, হিজরতের হুকুম এখনো আছে। পরিস্থিতিভেদে সেটা আবশ্যক অথবা ঐচ্ছিক হতে পারে। যদি কাফিরদেশে নিজের দ্বীন প্রকাশ করা বা পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেই ভূমি থেকে ইসলামের ভূমিতে অথবা এমন কোনো দেশে হিজরত করা

---

[109] বুখারী, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস নং ২৬৩১।

উচিত যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে কোনো বাধা নেই। প্রকাশ্যে দ্বীন পালন বলতে ব্যক্তিগত আহকামগুলো নয়, বরং ইসলামের সবগুলো আহকাম পালন করার সুযোগ থাকতে হবে।

বর্তমানে কোনটা কুফরের ভূমি ও কোনটা হারবি ভূমি সেটা স্পষ্ট। কিন্তু আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট ইসলামের ভূমি নেই। তাই বর্তমান সময়ের জন্য হুকুম হলো একজন মুসলিমের সেখানেই হিজরত করা উচিত, যেখানে সবচেয়ে ভালোভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যাবে। বিষয়টা কিছুটা আপেক্ষিক। একজন মুসলিম যদি তার দেশে সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে, তাহলে সে সেখানে থাকতে পারে। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে তার এমন কোনো জায়গা খুঁজে বের করা উচিত, যেখানে সে তার দ্বীন নিয়ে সবচেয়ে কম ভীত থাকবে। এখানে যেটা দেখতে হবে সেটা হলো দ্বীন, দুনিয়া নয়। হতে পারে, কোনো একটি দেশে তার দুনিয়া নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু সেখানে দ্বীন পালনে বাধা আসছে। আবার আরেকটি দেশে দ্বীন পালনে বাধা তুলনামূলক কম, কিন্তু দুনিয়াবি আরাম-আয়েশের বিবেচনায় সে জায়গাটি আরামদায়ক নয়। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় দেশে হিজরত করাটাই দ্বীনের দাবি।

বিজয়ের আগের ও পরের মুসলিমরা সমান নয়

আমর ইবন সালামা ﷺ ছিলেন মক্কার বাইরে থেকে আসা একজন সাহাবি। তিনি তার ছোটবেলার কথা বর্ণনা করেন,

'আমাদের সামনে দিয়ে কোনো মুসাফির গেলেই আমরা তাকে মুহাম্মাদের ﷺ কথা জিজ্ঞেস করতাম। তারা বলতো, তিনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন আর তাঁর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াহী আসে। আর তিনি মাত্রই অমুক-তমুক ব্যাপারে ওয়াহী লাভ করেছেন। আমি এমনভাবে এই শব্দগুলো (কুরআনের আয়াত) মুখস্থ করতাম যে তা আমার অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল।'

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে গোটা আরব অনেক আগে থেকেই খোঁজ খবর রাখত। যদিও তখনো তাদের বেশিরভাগ মুসলিম হয়নি। ইসলাম ছিল সেই সময়ের পত্রিকার হেডলাইন। আমর ইবন সালামা তখন একজন শিশু। কিন্তু মানুষের কথাবার্তা তার কানে আসতো আর এভাবে তিনি কুরআনের অনেক আয়াত মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অথচ তার গোত্রের লোকেরা তখন কাফির ছিল।

আরবরা দলে দলে মুসলিম হয়েছে মক্কা বিজয়ের পরে। আসলে তারা দেখতে চাইছিল কুরাইশ বনাম মুহাম্মাদের ﷺ এই দ্বন্দ্বে কে জয়ী হয়। গণমানুষ এভাবেই চিন্তা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তারা সত্যের সন্ধান করে না, বরং তারা জয়ী দলের সন্ধান করে। তারা দেখে কারা বিজয়ী হচ্ছে আর তারপর বিজয়ী দলের অনুসরণ করে। তাই সে যুগের আরবরা বলতো, 'মুহাম্মাদ যদি তাঁর নিজ গোত্রের বিপক্ষে হেরে যান তাহলে

তাঁকে আর তাঁর গোত্রকে ছেড়ে দাও। আর যদি তিনি বিজয়ী হন, তাহলে তিনি একজন নবী ও তিনি সত্যবাদী।'

এই মানসিকতা ত্রুটিপূর্ণ। বিজয় সত্যের মানদণ্ড নয়। আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস থেকে জানি এমন কিছু নবী এই দুনিয়ায় ছিলেন, যাদের অনুসারী ছিল খুবই কম। দশ, পাঁচ, দুই বা একজন। এমন নবীও ছিলেন, যাদের কোনো অনুসারীই ছিল না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা ভুলের ওপরে ছিলেন বা তারা ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা, হিদায়াত আল্লাহর হাতে, নবীর দায়িত্ব কেবল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। একজন নবী যদি সঠিকভাবে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, তাহলে তিনি সফল। ইসলাম এভাবেই সফলতাকে সংজ্ঞায়িত করে, জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে নয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবজনতার বিপরীতে স্বল্পসংখ্যক মানুষই ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা জানতো, আল্লাহর রাসূল হচ্ছেন সত্য নবী। তাই তারা বিজয়ের অপেক্ষা করেনি। ইসলামকে সত্য জেনে মুসলিম হয়ে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

> "তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় বেশি যারা (মক্কা) বিজয়ের পর (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। (অবশ্য) আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।" (সূরা হাদীদ, ৫৭: ১০)

সুতরাং বিজয়ের আগে মুসলিম হওয়া আর পরে মুসলিম হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা মক্কা বিজয়ের আগে মুসলিম হয়েছে, হিজরত ও জিহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা মক্কা বিজয়ের পরের মুসলিমদের চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি মুসলিমদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে। কারণ, বর্তমানে ইসলাম শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় নেই। কাজেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে এই প্রতিকূল পরিবেশে যারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে, তাদের মর্যাদা ও পুরস্কার নিঃসন্দেহে সেসব লোকের চাইতে বেশি যারা ইসলামের বিজয় দেখার পর ইসলামের বাহিনীতে যোগ দেবে।

হুনাইনের যুদ্ধ

প্রেক্ষাপট

মক্কা বিজয় হলো। ইসলামের বিরুদ্ধে সবচাইতে শক্তিশালী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি ছিল কুরাইশরা। মক্কা বিজয়ের সাথে তাদের পতন ঘটে। কিন্তু আরও একটি শক্তি তখনও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করছিল। তাদের কথা কুরআনেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

> "আর তারা বলে, এ কুরআন কেন দুই জনপদের মধ্যকার কোনো মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না?" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩১)

এই দুই জনপদ হলো মক্কা আর তাইফ। আর অবশিষ্ট এই বিরোধী শক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল হাওয়াযিন, সাকিফ এবং আরও কিছু গোত্র। এরা হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সাকিফ গোত্র তাইফে বসবাস করতো। এটি ছিল হাওয়াযিনের একটি শাখা। হাওয়াযিন ছিল কুরাইশের মতোই অন্য অনেকগুলো উপগোত্রের মূল গোত্র। হাওয়াযিনরা কুরাইশদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সেই জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই। এই দ্বন্দ্ব ছিল পুরোপুরি গোত্রীয় চেতনা থেকে উদ্ভুত। আল্লাহর রাসূলের ﷺ মক্কা বিজয়ে হাওয়াযিনরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, কেননা তাদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। কুরাইশ বংশের কেউ এসে তাদের ওপর ক্ষমতাবান হয়ে যাবে, এটা তারা মানতে পারছিল না। তারা স্পষ্টতই বুঝতে পারছিল যে, মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূলের পরবর্তী লক্ষ্য তাইফ। ভূ-রাজনৈতিক বিচারে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ তাইফ ছিল মক্কার নিকটবর্তী সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাইফে এর আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তারা খুব বাজেভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের আচরণ তৎকালীন জাহিলিয়াতের মানদণ্ডেও প্রচণ্ড আপত্তিকর ছিল। আরবদের মধ্যে সহজাত যে ঔদার্য আর মেহমানদারিতার প্রচলন ছিল, তার ছিটেফোঁটাও তারা দেখায়নি। যখন মানুষকে মিথ্যা মাবূদদের পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর দিকে আহবান করা হয়, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, স্বজাত্যবোধ গৌণ হয়ে যায়। তাওহীদ আর শিরকের দ্বন্দ্ব সবকিছুকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই চিরন্তন বাস্তবতা।

তারা সিদ্ধান্ত নিল মুসলিমরা আক্রমণ করার আগে তারাই মুসলিমদের ওপর হামলা চালাবে। মালিক ইবন আউফ আল-নাসরির নেতৃত্বে হাওয়াযিন, সাক্বিফ, বনু হিলাল, বনু সাদ ইবন আবি বকরসহ বেশ কিছু গোত্র এক হলো। তবে কা'ব এবং কিলাব গোত্র তার ডাকে সাড়া দেয়নি। মালিক ইবন আউফ প্রায় বিশ হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই সৈন্যসমাবেশের

খবর শুনতে পেয়ে বারো হাজার সৈনিকের এক বাহিনী নিয়ে মক্কার বাইরে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই বারো হাজারের মধ্যে দশ হাজার সৈনিক মক্কা বিজয়ে অংশ নিয়েছিল। আর এরপর আত-তুলাকা থেকে আরও দুই হাজার সৈন্য যোগদান করে। মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমা ও মুক্তিপ্রাপ্তদের আত-তুলাকা বলা হতো। অর্থাৎ, যেসব মক্কাবাসী মক্কা বিজয়ের পর মুসলিম হয়ে যায় তারা হলো আত-তুলাকা। এই অভিযান চলাকালীন সময়ে মদীনায় গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন আত্তাব ইবন উসাইদ ﷺ।

দুই শিবিরে যুদ্ধের প্রস্তুতি

এই যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল আগের চাইতে বেশি। তাই কিছু সাহাবি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলতে লাগলেন,

'সৈন্য সংখ্যার কমতির জন্য আজ আমরা পরাজিত হবো না, আমাদের সেনাসংখ্যা আজ অনেক!'

শত্রুপক্ষে একজন বিচক্ষণ বৃদ্ধ লোক ছিল। তার নাম দুরাইদ ইবন আস-সিমাহ। হাওয়াযিনদের মাঝে সে অনেক বিখ্যাত ছিল। বলা চলে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। তার খ্যাতির কারণ বহুবিধ। সে ছিল সাহসী, নির্ভীক যোদ্ধা, দক্ষ রণকুশলী এবং বিচক্ষণ একজন ব্যক্তি। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই এ যুদ্ধে সে ছিল একজন উপদেষ্টা। মালিক ইবন আউফ ছিল এই যুদ্ধের কমান্ডার।

উট থেকে নেমে দুরাইদ জিজ্ঞেস করলো,

- আমরা কোথায় আছি এখন?

- এটা হলো আওতাস, কেউ একজন জবাব দিল।

- বাহ! অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য বেশ ভালো জায়গা। পাথুরেও নয়, আবার নরম মাটিও নয়। আচ্ছা, এতসব হট্টগোল কীসের? মনে হচ্ছে যেন উটের চলার আওয়াজ! গাধার বিকট চিৎকার! শিশুদের কান্না! ছাগলের ভ্যাঁ-ভ্যাঁ! ঘটনা কী বলো তো?

- মালিক ইবন আউফ তার বাহিনীর সাথে তাদের ধন-সম্পদ আর পরিবার-পরিজনকেও সাথে এনেছে। এগুলো পেছনের সেই কাফেলারই আওয়াজ।

- কোথায় সে?

মালিক ইবন আউফকে ডেকে আনা হলো। দুরাইদ তাকে প্রশ্ন করলো,

- মালিক ইবন আউফ! তুমি আজ তোমার গোত্রের নেতা। আজকের দিনে তুমি যা

সিদ্ধান্ত নেবে, অনাগত ভবিষ্যতের ওপরে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। এই যে আমি উটের শব্দ, গাধার বিকট চিৎকার, শিশুদের কান্না আর ছাগলের ভ্যাঁ-ভ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, কাহিনীটা কী বলতো?

- আমি আমার লোকজনের ধন-সম্পদ আর স্ত্রী-পুত্রকে সাথে করে নিয়ে এসেছি।

- এই কাজটা তুমি কেন করলে?

- তাহলে প্রত্যেক সৈনিকের পেছনে তাদের পরিবার আর ধনসম্পদ থাকবে। তাদের মায়ায়, তাদের বাঁচাবার জন্য তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করবে।

- ভেড়ার রাখাল কোথাকার! যদি যোদ্ধারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে আটকাবার সাধ্য কার আছে! যুদ্ধ যদি তোমার অনুকূলে যায় তাহলে তো ঐ তলোয়ার আর বল্লমধারী লোকগুলোই তোমার কাজে আসবে। আর যদি প্রতিকূলে যায়, তাহলে তোমার স্ত্রী-পুত্র আর ধন-সম্পদ তোমার বাড়তি ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দুরাইদ এরপর জিজ্ঞেস করলো,

- আচ্ছা, ভালো কথা, কা'ব আর কিলাব -- এ গোত্র দুটো কোথায়? ওদের দেখছি না যে?

- তারা যুদ্ধে আসেনি, লোকেরা উত্তর দিল।

- তাহলে ক্ষীপ্রতা আর বীরত্ব দেখাবে কারা! এই যুদ্ধ যদি মর্যাদার কিছু হতো, তাহলে ওরা এই যুদ্ধে অবশ্যই আসতো। তোমরাও যদি ওদের মতো আজ বিরত থাকতে, কতই না ভালো হতো! ওরা যদি না এসে থাকে, তাহলে এই যুদ্ধে এসেছে কারা?

- এসেছে আমর ইবন আমীর আর আওফ ইবন আমীর।

- এরা আসলেও কী আর না-আসলেও কী! না পারবে উপকার করতে, না পারবে ক্ষতি করতে!

মালিক ইবন আউফের যুদ্ধের প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা দেখে দুরাইদ যারপরনাই হতাশ। তার কাছে মনে হচ্ছিল এই যুদ্ধে যাওয়াটা একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তবু সে মালিককে উপদেশ দিল,

- শোনো মালিক, হাওয়াযিনের দলকে অশ্বারোহীদের সামনে রেখো না। এদের পেছনে পাঠিয়ে দাও। শুধু অশ্বারোহীদের সাথে নিয়ে সাবিঈদের (মুসলিমদের) মোকাবেলা করো। যদি যুদ্ধ তোমার অনুকূলে যায়, তাহলে পেছনের লোকেরা তোমাদের সাথে মিলিত হবে। আর যদি প্রতিকূলে যায়, তাহলে অন্তত তোমার পরিবার আর ধন-সম্পদ বেঁচে যাবে।

মালিক ইবন আউফ এই উপদেশ কানেই তুললো না, উল্টো বললো, 'আল্লাহর কসম, আমি কখনো এমন করবো না। তুমি বুড়িয়ে গেছো, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনাও বুড়িয়ে গেছে। হাওয়াযিনদের উদ্দেশ্যে বলছি, হয় তোমরা আমার আনুগত্য করবে অথবা আমি এই তরবারির ওপর ভরসা করবো। যোদ্ধারা, যখন তোমরা শত্রুদের দেখবে, তরবারি কোষমুক্ত করে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

মালিক ইবন আউফ আসলে চাচ্ছিল না এই যুদ্ধে দুরাইদের কোনো সম্পৃক্ততা থাকুক। কারণ সে এই যুদ্ধের কৃতিত্ব পুরোটাই নিজের ঘাড়ে নিতে চাচ্ছিল। দুরাইদ মন খারাপ করে বললো, 'না পারলাম এই যুদ্ধে শামিল হতে, না পারলাম এই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে।' এই আলোচনা থেকে নবীন আর প্রবীণের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। দুরাইদের মতো অভিজ্ঞতা আর বিচক্ষণতা মালিক ইবন আউফের ছিল না। সে ছিল কিছুটা হুজুগে প্রকৃতির। নিজের নাম কামানোর জন্য বিশাল এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে সে দ্বিধা করছে না। যুদ্ধের ময়দানে অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শুধু উৎসাহ-উদ্দীপনা আর আবেগ যথেষ্ট নয়।

তথ্য ও অস্ত্র সংগ্রহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রু পক্ষের উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আবদুল্লাহ ইবন আবি হাদরাদকে ؓ পাঠালেন। আবদুল্লাহ ইবন আবি হাদরাদ ؓ সফলভাবে শত্রুসেনার সংখ্যা এবং তাদের পরিবার ও সম্পদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন। কিন্তু উমার ইবন খাত্তাব তার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তার দেওয়া তথ্যকে নাকচ করে দিলেন। আবদুল্লাহ পাল্টা জবাব দিলেন, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ আপনি নিজেই একসময় সত্য দ্বীনকে অস্বীকার করেছেন। আমার চাইতেও শতগুণ পবিত্র সত্তা আল্লাহর রাসূলকে আপনি অস্বীকার করেছিলেন!' উমার ؓ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শুনেছেন সে কী বলছে!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হেসে উমারকে ؓ বললেন, 'তুমি যে পথহারা ছিলে তা নিয়ে তো সন্দেহ নেই উমার। এরপর আল্লাহ তোমাকে সত্য পথে পরিচালিত করেছেন।'

এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অতিরিক্ত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন মেটাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার সাথে কথা বলেন। সাফওয়ান তখনো মুশরিক। কুরাইশ নেতা হিসেবে তার ভালোই সম্পদ ছিল। অনেক অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে বর্শা আর ঢাল ধার হিসেবে চাইলেন। সাফওয়ান রাজি হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেই জোর করে অস্ত্রগুলো নিতে পারতেন কিন্তু সেটা তিনি করেননি। অস্ত্রগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার সময় হলে দেখা গেল কিছু অস্ত্র হারিয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সে সবের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সাফওয়ান রাজি হলো না। ততদিনে তার মন পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং সে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সামনে আসবে।

ময়দানে মুখোমুখি দুই দল

সেদিনের আবহাওয়া ছিল খুবই উত্তপ্ত আর শুষ্ক। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হলো। তারা হুনাইনের উপত্যকা ধরে এগোতে লাগলেন। পাহাড় দিয়ে সোজা সামনে এগোনোর সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ করে চারদিক থেকে শুরু হলো তীরবৃষ্টি। এরপর হাওয়াযিনের অশ্বারোহীরা মুসলিমদের ওপর হামলা চালায়। উপর্যুপরি অতর্কিত হামলায় মুসলিম সেনারা পুরোপুরি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। দিশেহারা মুসলিম সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারপাশে পালাতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় মালিক ইবন আউফের পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

তার পরিকল্পনা ছিল প্রতিটি গিরিপথ, গোপন আর সংকীর্ণ স্থানে ওঁৎ পেতে থাকা আর মুসলিম বাহিনী সেই গিরিপথে এলেই তাদের ওপর আচমকা আক্রমণ করা। আক্রমণ পরিচালিত হবে দুটি ফ্রন্টে -- পাহাড়ের দুই পাশ থেকে তীর ছোঁড়া হবে আর এরপর মূল সেনাবাহিনী মুসলিমদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানবে। মুসলিমদের ধারণাই ছিল না হাওয়াযিনের সৈনিকরা এভাবে লুকিয়ে আছে। হাওয়াযিনের বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল। প্রথমে ছিল সওয়ারীদের সারি, তারপর পদাতিক সৈনিকদের সারি, তারপর মহিলাদের সারি, তার পেছনে ছিল পশুপাল। তাদের দক্ষ তীরন্দাজ ছিল। তার ওপর অশ্বারোহী হাওয়াযিন সেনারা মুসলিমদের ওপর কঠিন হামলা চালায়। মুসলিম সেনাবাহিনীর সামনের দিকে ছিল বনু সুলাইম গোত্রের সেনাদল। আকস্মিক হামলার তীব্রতা ও ভয়াবহতা সামাল দিতে না পেরে তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো শুরু করল। তাদের পেছনে ছিল আত-তুলাকা। তারা মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারাও যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিছু হটতে লাগলো। উটগুলো পালাতে গিয়ে একটার পর আরেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই হামলা এতটাই আচমকা আর তীব্র ছিল যে মুসলিমদের সেরা পদাতিক সৈন্য সালামা ইবন আল-আকওয়াও ﷺ ময়দান ছেড়ে পালাতে থাকেন। মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় সবাই উধাও হয়ে গেল। ময়দানে টিকে থাকলেন অল্প কিছু মানুষ। আল্লাহর রাসূল ﷺ, কিছু মুহাজির, আনসার এবং আহলে বাইতের লোকেরা।

> **"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৫)**

মুসলিম বাহিনীর এই বিপর্যয়ে দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা যেন প্রায় ঈমানহারা হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান ﷺ এই অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, 'এরা তো পালাতে পালাতে সমুদ্রের পাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে!' সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার ভাই বলে ওঠে, 'জাদুর কেরামতি আজ শেষ! মুহাম্মাদের জাদু আর কাজ করছে না!' এ কথা শুনে সাফওয়ান

ইবন উমাইয়্যা ক্ষেপে গেল, 'থাম তুই! আল্লাহ তোর মুখ ভেঙে দিক! আল্লাহর কসম, আমি একজন কুরাইশের কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজি আছি, কিন্তু কোনো হাওয়াযিনের কর্তৃত্ব মানতে রাজি নই!'

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবিচলভাবে ময়দানে দাঁড়িয়ে। তিনি সবাইকে ডাকছেন আর বলছেন, 'লোকেরা তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমার দিকে এসো, আমি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ, আল্লাহর রাসূল!'

কিন্তু কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। সবাই শত্রুদের আক্রমণের ধাক্কায় পড়িমড়ি করে ছুটছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তবু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে 'আমি আল্লাহর নবী! আমি মিথ্যাবাদী নই! আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান!' এ সময়টাতে তাঁর সাথে ছিলেন চাচা আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবন আল-হারিস ﷺ এবং অল্প কিছু মুহাজির ও কুরাইশ। আল্লাহর রাসূল আব্বাসকে বললেন, 'আব্বাস, সামুরার লোকদের ডাক দাও!' সামুরাহ হচ্ছে বাইয়াতুর রিদওয়ানে উপস্থিত সাহাবিদের দল । আব্বাস চিৎকার করে বাইয়াতুর রিদওয়ানের সাহাবিদের ডাকলেন - সেরা সব সাহাবি। তার আহবানের সাথে সাথে তারা যেন তীরের বেগে ময়দানে ফিরে এল। আর বলতে লাগলেন, 'আমরা এসেছি! আমরা এসেছি!'

এরপর বিশেষভাবে আনসারদের আহবান করা হলো। এরপর বিশেষভাবে ডাকা হলো খাযরাজদের। ডাকা হলো হলো একে একে সবগুলো গোত্রকে। মুসলিমদের অনেকেই প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ময়দানে ফিরে এল। রাসূলুল্লাহর চারপাশে জড়ো হলেন প্রায় একশো সাহাবি। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবার ময়দানের দিকে দৃষ্টি মেলে বললেন, 'এবার ঠিকই জ্বলেছে যুদ্ধের অগ্নিশিখা!'

আল্লাহর রাসূল এক মুঠো ধুলো তুলে মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, বললেন, 'মুহাম্মাদের রবের শপথ! তোরা ধ্বংস হ!' এই ধুলো শত্রুবাহিনীর প্রত্যেকের চোখে গিয়ে পড়ে। এর পর তীরন্দাজরা আর মুসলিমদের ওপর তীর ছুঁড়তেই পারেনি। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা। এরপরই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেতে লাগলো।

> "তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের ওপর ও মু'মিনদের ওপর এবং নাযিল করলেন এমন সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে আযাব দিলেন। আর এটা কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৬)

আল্লাহর এই সৈন্য ছিল ফেরেশতা। জুবাইর ইবন মুতইম বলেন, 'আমরা আকাশে কালো মেঘ দেখতে পেলাম। এরপর যখন তা মাটিতে নেমে এল, আমরা দেখলাম অগণিত পিপড়া! এ যেন পিপড়ার গালিচা! আর আমরা মনে করলাম এটাই হলো আল্লাহর সৈন্য।' আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মুশরিকদের ওপর ধুলো নিক্ষেপ

করেছিলেন, তা তাদের অন্তরে প্রবল ত্রাস আর আতঙ্কের জন্ম দেয়। আর মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ঢেলে দিলেন প্রশান্তি বা সাকিনাহ। বদরের যুদ্ধেও এমনটা হয়েছিল। আল্লাহ যদি চান, যুদ্ধক্ষেত্রের অস্থির পরিস্থিতিতেও তাঁর বান্দাদের মনে প্রশান্তি ঢেলে দিতে পারেন। এই প্রশান্তি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদের জন্য সাহায্য।

এই সাহায্য আসার পরেই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে যায়। মুসলিমরা ময়দানে ফিরে আসলে হাওয়াযিনরা আর কোনো পাল্টা আক্রমণ করা দূরে থাক, কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। বরং তারা ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করে। সম্ভবত এর কারণ হলো অনভিজ্ঞ মালিক ইবন আউফের আর কোনো বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না। একটিমাত্র কৌশলকে পুঁজি করে তার বাহিনী এই যুদ্ধে অংশ নেয়। প্রাথমিকভাবে তাদের এই কৌশল কাজে লাগলেও যখন মুসলিমরা ঘুরে দাঁড়ালো, তখন তাদের কৌশলগত দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে তারা হেরে যেতে থাকে।

যে অল্প কয়েকজন সাহাবি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থেকে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, উমার ইবন খাত্তাব, আলী ইবন আবি তালিব, আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ, তাঁর ছেলে ফাযল ইবন আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবন হারিস ﷺ, রাবিয়া ইবন হারিস, উম্ম আয়মানের ছেলে আয়মান ইবন আবদুল্লাহ ﷺ প্রমুখ।

হুনাইনের যুদ্ধে কিছু ঘটনা

১) আবু কাতাদার ﷺ ঘটনা

ঘটনাটি আবু কাতাদা ﷺ নিজেই বর্ণনা করেছেন, 'হুনাইনের দিনে আমি দেখলাম দুই সৈনিক লড়াই করছে। একজন মুসলিম, একজন মুশরিক। সেই লড়াইয়ে আরেক মুশরিক তার মুশরিক বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য যোগ দিল। এই দৃশ্য দেখে আমি ছুটে গিয়ে তার হাত কেটে ফেললাম। তখন সে তার আরেক হাত দিয়ে আমার গলা চেপে ধরে। আল্লাহর কসম! সে এত জোরে আমার গলা চেপে ধরে যে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবার মতো অবস্থা! কিন্তু সে একসময় (রক্তক্ষরণের কারণে) সে ধপ করে পড়ে গেল। তখন আমি তাকে আরেকবার আঘাত করে হত্যা করলাম। আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমার জন্য সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় মক্কার কেউ এসে তার জিনিসপত্র তুলে নিল। যুদ্ধ যখন পুরোপুরি শেষ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে যে যাকে হত্যা করবে, সে-ই হবে তার জিনিসপত্রের মালিক।

তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এক লোককে হত্যা করেছি। তার অনেক জিনিসপত্র ছিল। কিন্তু আমি তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই কে তার জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়েছে তা বলতে পারবো না। তখন মক্কার সেই লোক এসে বললো, সে সত্য বলেছে রাসূলুল্লাহ। আমি-ই সেই জিনিসগুলো নিয়ে এসেছি। আপনি জিনিসগুলো

আমাকে দিয়ে দিন। এ কথা শুনে আবু বকর ﷺ গর্জে উঠে বললেন, 'আল্লাহর কসম! এটা কখনো হতে পারে না! আল্লাহর পথে লড়াই করা সিংহের সম্পদে তুমি ভাগ বসাতে চাও! কক্ষণো না! তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও।' তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আবু বকর ঠিকই বলেছে। ওর প্রাপ্য জিনিস ওকে ফিরিয়ে দাও।

এরপর আমি সাথে সাথে তার কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে নিলাম। এরপর সেটা বিক্রি করে খেজুর বাগান কিনলাম। সেটাই ছিল আমার মালিকানাধীন প্রথম সম্পত্তি।'

এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কোনো মুসলিম যদি কোনো কাফিরকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করে, তবে ঐ কাফিরের সাথে যা কিছু (ময়দানে) ছিল, সেগুলো সেই মুসলিম লাভ করবে।

২) উম্মু সুলাইমের সাহসিকতা ﷺ

উম্মু সুলাইম ﷺ ছিলেন আনসারী সাহাবি আবু তালহার ﷺ স্ত্রী। যুদ্ধের ময়দানে উম্মু সুলাইমকে দেখা গেল একটা ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামী আবু তালহা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' উম্মু সুলাইম উত্তর দিলেন, 'কোনো কাফির আমার কাছ দিয়ে গেলে আমি তার পেট চিরে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে ফেলব!' এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন। উম্মু সুলাইম এরপর বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া তুলাকাদের আমি হত্যা করবো!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে শান্ত করে বললেন, 'মহান আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' অর্থাৎ, তুমি চিন্তা কোরো না, আল্লাহ আমাদের বিজয় দিয়েছেন, তাদের হত্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

হুনাইনের এই যুদ্ধের সময় উম্মু সুলাইম ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। তালহা তখন তার গর্ভে। দুঃখজনক বিষয় হলো, উম্মাহর স্বর্ণযুগে মুসলিম নারীরা যে সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, বর্তমান সময়ের মুসলিমরা পুরুষরাও সে ধরনের সাহস রাখে না।

৩) এক নারী হত্যার ঘটনা

যুদ্ধের পর দেখা গেল এক দল লোক জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হচ্ছে এখানে?' জবাব এল, 'এই মহিলাকে খালিদ ইবন ওয়ালিদ হত্যা করেছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'এই মহিলা যোদ্ধাদের কেউ নয়। সে তো যুদ্ধ করেনি।' এরপর তিনি খালিদ ইবন ওয়ালিদকে নির্দেশনা দিয়ে পাঠালেন, যেন নারী এবং শিশুদের হত্যা করা না হয়। এই নির্দেশনা ইচ্ছাকৃত হামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪) দুরাইদ ইবন আস-সিমার মৃত্যু

রাবিয়া ইবন রুফাই নামে একজন মুসলিম দুরাইদকে পালাবার সময় ধরে ফেললেন।

একটা উটের ওপর পালকির ভেতরে তাকে পাওয়া যায়। এসব পালকিতে সাধারণত মহিলারা থাকতো। তিনি দুরাইদকে টেনে বের করে আনেন। দুরাইদ জিজ্ঞেস করলো,

- কী চাস তুই?

- আমি তোকে হত্যা করবো, রাবিয়া উত্তর দিলেন।

- কে তুই?

- আমি রাবিয়া ।

এই বলে তিনি তরবারি দিয়ে দুরাইদকে আঘাত করলেন। আঘাতটা তেমন মারাত্মক ছিল না। তাই দেখে দুরাইদ বললো,

- তোর মা মনে হয় তোকে শেখায়নি কীভাবে তলোয়ার চালাতে হয়! তুই যা, ঐ জিন থেকে আমার তরবারি নিয়ে এসে আমাকে আঘাত কর। ঠিক এখানে, এই আমার শিরদাঁড়ার ওপর খুলির নিচে মারবি। আমি এভাবেই মানুষ মারতাম। এরপর যখন তুই তোর মায়ের কাছে ফিরে যাবি, বলবি, আমি দুরাইদ ইবন আস-সিমাহকে হত্যা করেছি। আল্লাহর কসম করে বলছি, তোদের মায়েদেরকে আমি বহুবার যুদ্ধে বাঁচিয়েছি।

দুরাইদ রাবিয়াকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলার কারণ হলো, রাবিয়া নিজেও হাওয়াযিন গোত্রের সন্তান ছিল। কিন্তু পার্থক্য হলো তিনি ছিলেন মুসলিম আর দুরাইদ কাফির। যা-ই হোক, রাবিয়া এরপর তাকে দুরাইদের কথামতোই আঘাত করলেন। দুরাইদ মারা গেল।

দুরাইদ কেন এমন আচরণ করলো? এ ধরনের আচরণ আমাদের কিছুটা অবাক করতে পারে। তবে এটা ছিল সেই গোত্রীয় যুগের বাস্তবতা। দুরাইদের এ আচরণ এক প্রকারের ঔদ্ধত্য, গোত্রীয় ঔদ্ধত্য। দুরাইদের মতো লোকদের কাছে গোত্রের সম্মান আর গৌরবই ছিল সব। গোত্রের জন্য জীবন, গোত্রের জন্য মরণ। তাই মৃত্যুর আগেও সে বলছিল, আমার মতো লোককে মারতে পারাটা তোমার জন্য এক বিশাল ব্যাপার।

কার তাক্বদীরে কী আছে তা একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জাল ছাড়া কেউই জানে না। কাজেই মুসলিমদের উচিত নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে তুষ্ট না হয়ে পড়া, আল্লাহর কাছে সবসময় দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য সাহায্য চাওয়া। যে আবু তালিব সারা জীবন আল্লাহর রাসূলকে ﷺ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আগলে রেখেছেন, সে-ই আবু তালিব কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবু সুফিয়ান শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে। হুনাইনের যুদ্ধে, হাওয়াযিন গোত্রের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিল মালিক ইবন আউফ একাই। সে অভিজ্ঞ দুরাইদের মতকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নিজের অপরিণত সিদ্ধান্তের উপর অটল ছিল। কিন্তু এই মালিক ইবন আউফ শেষ পর্যন্ত মুসলিম হয়ে যায় আর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা দুরাইদ ইবন আস-সিমাহ কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

৫) আনাস ইবন আবি মারসাদের ﷺ কাহিনী

হুনাইনের যুদ্ধের আগের রাতের কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা পাহারা দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজছিলেন। আনাস ইবন আবি মারসাদ ﷺ উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পাহারা দেওয়ার জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'তোমার অংশ থেকে যেন কোনো আক্রমণ না আসে, সেটা দেখার দায়িত্ব তোমার।' আনাস ইবন আবি মারসাদ ﷺ তার বাহনে করে পাহাড়ের পাশ ধরে পাহারার স্থানে চলে গেলেন। পরদিন ভোরবেলা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি তোমাদের সওয়ারীকে দেখেছো?' সাহাবিরা বললেন আনাস ইবন আবি মারসাদ এখনো ফিরে আসেননি। ফজরের সালাত শেষ হওয়ার পর দেখা গেল আনাস পাহাড় থেকে নেমে আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি সালাত আদায় আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া ছাড়া আমার জায়গা থেকে নড়িনি।' আল্লাহর রাসূল ﷺ খুব খুশি হলেন। তাকে বললেন, 'তুমি তো জান্নাতকে নিজের জন্য অবধারিত করে ফেলেছো! আজকের পর আর কোনো (অতিরিক্ত) ভালো কাজ না করলেও তোমরা চলবে।'[110]

এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে "মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধক্ষেত্রে পাহারা দেওয়ার ফযিলত" শিরোনামে। আনাস ইবন আবি মারসাদ ﷺ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এজন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এটা বলে দেয় যে, আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়া কত বড় একটি ইবাদাত। এই ঘটনা থেকে আরেকটি শিক্ষা হলো, প্রত্যেক সাহাবিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ আলাদা আলাদাভাবে কদর করতেন। ফজরের সালাতের সময়ে তিনি আনাসের ﷺ খোঁজ নিয়েছেন। ফিরে এসেছেন কি না জানতে চেয়েছেন এবং সবশেষে তার গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য তাকে আখিরাতে পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন।

৬) রাসূলুল্লাহর ﷺ দুধ বোন শায়মার ﷺ কাহিনী

আশ-শায়মা বিনত আল-হারিস ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দুধ মা হালিমা আস-সাদিয়্যার কন্যা। সে হিসেবে শায়মা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের দুধ বোন। বনু সাদ ইবন বকর হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। শায়মা ছিলেন সেই গোত্রের। যুদ্ধের পর তিনি বন্দী হলেন। তাকে বাজারে নেওয়ার পথে তিনি বললেন, 'তোমরা কি জানো না আমি তোমাদের সাথীর (আল্লাহর রাসূলের) দুধবোন?' সাহাবিরা ঠিক নিশ্চিত ছিলেন না শায়মা সত্য বলছেন কি না। তাই তারা শায়মাকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে নিয়ে গেলেন ।

স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর রাসূল নিজেও শায়মাকে ﷺ চিনতে পারছিলেন না। কারণ শায়মার সাথে তিনি একসাথে বড় হয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তিনি শায়মাকে তার দাবি প্রমাণ করতে বললেন। শায়মা বললেন, 'তুমি যখন ছোট ছিলে, একবার

---

[110] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৫।

আমি তোমাকে কোলে নিয়েছিলাম আর তুমি আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলে। সেই দাগ এখনো আছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন নিশ্চিত হলেন এটা আসলেই তার বোন। তিনি দুধবোনের সম্মানে নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে দিলেন, শায়মাকে সেখানে বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'তুমি চাইলে ইসলাম গ্রহণ করে এখানে থেকে যেতে পারো। তাহলে অনেক আদর আর ভালোবাসা পাবে। অথবা তুমি চাইলে তোমরা গোত্রের কাছেও ফিরে যেতে পারো।' শায়মা নিজ গোত্রের কাছেই ফিরে যেতে চাইলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার দুধবোনকে একজন দাসী, তিনজন দাস এবং বেশকিছু উট আর ভেড়া উপহার দিলেন। শায়মা ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি তার গোত্রের সাথেই থেকে যান।

তাইফের অবরোধ

যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে হাওয়াযিনের সৈন্যরা তাইফে পালিয়ে যায়। তাদের কেউ চলে যায় নাখলায়, কেউ চলে যায় আওতাসে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এদের ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে কয়েকভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিকে পাঠান। মূল অংশ রওনা হয় তাইফের উদ্দেশ্যে। মালিক ইবন আউফ আন নাসরি তার সৈনিকদেরসহ সেখানে আশ্রয় নিয়ে তাইফের দুর্গগুলোর প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়। আরেকটি দল অগ্রসর হয় আওতাসের দিকে। সে দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবু মূসা আল আশআরীর চাচা আবু আমীর আল আশআরী ﷺ। এগুলো ছিল একেকটি সারিয়াহ।

আওতাসে অভিযানের এক পর্যায়ে আবু আমীর হাঁটুতে আঘাত পান। ভাতিজা আবু মূসা আল আশআরী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'চাচাজান! কে আপনার ওপর তীর ছুঁড়েছে?' আবু আমীর ইশারার মাধ্যমে এক লোককে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ লোকটা আমার দিকে তীর মেরেছে।' আবু মূসা তার পিছু নিলেন। আবু মূসাকে দেখে সে লোকটা পালাতে লাগলো। আবু মূসা তাকে বলছিলেন, 'লজ্জা হয় না তোর? তুই কি লড়বি না? পালাবি নাকি? তোর মধ্যে কি পুরুষত্ব নেই?' কথাগুলো তার খুব গায়ে লাগলো। সে লড়াই করার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। আবু মূসা লড়াইয়ে তাকে হারিয়ে দিলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এরপর আবু মূসা ﷺ তার চাচার দিকে ফিরে বললেন, 'চাচাজান! আমি আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছি।' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এবার তুমি আমার হাঁটু থেকে তীরটা বের করে দাও।'

তীরটি বের করা হলো কিন্তু রক্তক্ষরণ বেড়ে গেল। আবু আমীরের মনে হলো তিনি হয়তো আর বাঁচবেন না। আবু মূসাকে বললেন, 'ভাতিজা, তুমি নবীজিকে আমার সালাম জানাবে আর আমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে বলবে।' আবু মূসা আল আশআরী ﷺ রাসূলুল্লাহর কাছে পুরো ঘটনাটি বললেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অযু করলেন। তারপর দু'হাত উঁচু করে দুআ করলেন,

'হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমীরকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমীরের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। ক্বিয়ামত দিবসে তোমার মাখলুকের মধ্যে অনেক মানুষের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করো।'

এটা ছিল একজন শহীদ মুজাহিদের জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ। এই দুআ শুনে আবু মূসা আল-আশআরী ﷺ অভিভূত হয়ে যান। তিনি আল্লাহর রাসূলকে তার নিজের জন্যও দুআ করার অনুরোধ করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন আবু মূসার জন্য দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনু কায়সের (আবু মূসা) গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং ক্বিয়ামাত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও।'

আবু আমীরের জন্য আল্লাহর রাসূল যে দুআটি করেছিলেন সেই দুআ একজন মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া। তা হলো ক্বিয়ামত দিবসে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা। বেশিরভাগ মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিচার দিবসের কথা ভুলে যায় আর দুনিয়ায় নিজের অবস্থান পাবার জন্য মরিয়া হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সেই বেদুইনের দুআটি উল্লেখ না করলেই না নয়। এই দুআটি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ খুব পছন্দ করেছিলেন। দুআটি হলো,

'ইয়া আল্লাহ! আমার জীবনের উত্তম অংশটি যেন জীবনের শেষ অংশ হয়। আমার শেষ আমলটি যেন আমার জীবনের সর্বোত্তম আমল হয়। আর আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন যেন আপনার সাথে আমার দেখা হওয়ার দিনটি হয়।'

মূল বাহিনী অগ্রসর হয় তাইফের দিকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাইফ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই অবরোধে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'মিনযানিক' নিক্ষেপ করা হয়। এই মিনযানিক ছিল এক প্রকারের গুলতি। এটি দিয়ে তাইফের দেওয়ালে সজোরে পাথর নিক্ষেপ করা হতো। এই গুলতি যখন আঘাত হানতো, তখন সেটা দুর্গের ভেতর ঠিক কোথায় আঘাত হানছে সেটা বোঝার উপায় ছিল না। তখনকার দুর্গগুলো ছিল বিশাল। দুর্গের দেওয়ালের ভেতরে পুরো একটা শহর। কাজেই এই গুলতিগুলো শহরের ভেতরে বাজার, রাস্তা কিংবা ঘর-বাড়ি যে কোনো স্থানে পতিত হবার সম্ভাবনা ছিল।

এই ধরনের হামলার কারণে 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' বা অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন, এই ধরনের হামলায় নিক্ষিপ্ত গোলা নারী ও শিশুদের ওপর আঘাত হানতে পারে। যদিও তাদের হত্যা করা নিক্ষেপকারীর লক্ষ্য ছিল না। কারণ এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ঠিক কোথায় গিয়ে আঘাত হানবে এটা জানা সম্ভব হয় না। এটা ঠিক তীরের মতো নয় যেখানে তীর কোন লক্ষ্যে আঘাত হানবে সেটা তীরন্দাজ জানে। নির্বিচারে গোলা নিক্ষেপের এই পদ্ধতি বায়াত নামে পরিচিত। তাইফে যখন রাতের অন্ধকারে বায়াত হামলা করা হচ্ছিল, তখন মুশরিকদের নারী ও

শিশুরা মারা পড়ছিল।[111] তখন আল্লাহর রাসূলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, 'তারা তাদের মধ্য থেকেই।'[112] অর্থাৎ, এই ব্যাপারে মুশরিক নারী ও শিশুদের ব্যাপারে হুকুম পুরুষদের মতোই প্রযোজ্য হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা করে জিহাদে কাফির নারী ও শিশু হত্যা করা যাবে না, এটাই সাধারণ হুকুম।

অবরোধ প্রত্যাহার

এই ধরনের হামলা চালানো সত্ত্বেও তাইফবাসী হাল ছেড়ে দেয়নি। তাদের তীরন্দাজরা দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিল আর তাদের তীরের আঘাতে অনেক মুসলিম আহত হচ্ছিলেন। তাই মুসলিম বাহিনীকে তীরের সীমা থেকে বের হয়ে পেছনে চলে আসতে হয়। সাহাবিরা ﷺ এই অবরোধে 'দাব্বাবাহ' ব্যবহার করলেন। এটা ছিল একটা কাঠের তৈরি কাঠামো। এর ভিতরে কয়েকজন সাহাবি ﷺ প্রবেশ করতেন। এটা তীরের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিত। এটাকে ব্যবহার করে তারা দেওয়ালের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাইফবাসী দাব্বাবার বিরুদ্ধে অপর একটি অস্ত্র ব্যবহার করল। তারা আগুনে উত্তপ্ত করা কাঁটাযুক্ত লোহার টুকরা দাব্বাবার দিকে ছুঁড়ে দেয় ফলে দাব্বাবার ভেতর থেকে সাহাবিরা বের হয়ে আসতে বাধ্য হন। দাব্বাবাহ অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাইফবাসীর ওপর আরও চাপ প্রয়োগ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুরের গাছগুলো কেটে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। এই কৌশলে কাজ হয়। তাইফের লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই গাছগুলো ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। তখন তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করে যেন তিনি তাদের গাছ পোড়ানো বন্ধ করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের অনুরোধ রাখেন।

শত্রুদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য নবীজি ﷺ আরও একটি কাজ করেন। তিনি তাইফের দাসদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন, যদি তারা দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে, তাহলে তাদের স্বাধীন করে দেওয়া হবে। এই ঘোষণা শুনে তেইশ জন দাস বের হয়ে আসে। তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়।

অবরোধ পনেরো দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো। কিন্তু তাইফের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মসমর্পণ করার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন নাওফাল ইবন মুওয়াবিয়াহ আদ-দাইলির সাথে পরামর্শ করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অবরোধ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তোমার মতামত কী?' নাওফাল বললেন, 'এদের অবস্থা এখন গর্তে লুকিয়ে থাকা শিয়ালের মতো। আপনি যদি অবরোধ চালিয়ে যান, আজ হোক, কাল হোক, আপনি জয়ী হবেন। তবে তাদের ছেড়ে দিলেও তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' কারণ, তাইফের চারপাশে প্রায় সবগোত্র ততদিনে ইসলাম

---

[111] ইবন মাজাহ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৯৪৭ (আরবি রেফারেন্স)।

[112] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস, ৩০,৩১।

গ্রহণ করে ফেলেছে। তাই তাইফ মুসলিমদের জন্য আর কোনো হুমকি নয়। নবীজি তার উপদেশ গ্রহণ করলেন। উমারকে ﷺ বললেন যেন সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা ফিরে যাবেন।

এই ঘোষণা সাহাবিদের অনেকের মনঃপূত হলো না। তারা তাইফ জয় না করে ফিরে যাবেন এটা মানতে পারছিলেন না। তারা বললো, 'রাসূলুল্লাহ! আমরা বিজয় ছাড়াই ফিরে যাবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' পরদিন তারা লড়াইয়ের জন্য বের হলেন। বেশ কিছু সাহাবি আহত হলেন। তারা বুঝতে পারলেন এই দুর্গ ভেদ করা সহজ হবে না, যেমনটা তারা ভেবেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন আবার বললেন, 'ইনশা আল্লাহ, আগামীকাল আমরা এখান থেকে ফিরে যাবো।' এবার আর সাহাবিরা প্রতিবাদ করলেন না, বরং তারা সেটাই চাচ্ছিলেন। তাদের নীরবতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই বললেন না, হাসলেন শুধু। তাইফ থেকে বের হয়ে এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা বলো: আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং রবের প্রশংসাকারী।' সাহাবিদের কেউ বললেন, 'আপনি সাকিফদের বিরুদ্ধে দুআ করুন।' আল্লাহর রাসূল সাকিফদের বিরুদ্ধে বদদুআ না করে তাদের হিদায়াতের জন্য দুআ করলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ! সাকিফকে পথ দেখাও, তাদের সত্যের পথে চালিত করো।' আল্লাহর রাসূলের ﷺ এই দুআ কবুল হয়েছিল। হিজরী ৯ম বর্ষে তারা নিজ থেকে এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

তাইফ ছিল আরবদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ গাযওয়া। এই যুদ্ধের পর মুসলিমদের সামনে নতুন এক প্রতিপক্ষ দাঁড়ায়। রোমান সাম্রাজ্য। রোমানদের বিরুদ্ধে এর পর তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

হুনাইনের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা

১) যাত-আনওয়াতের ঘটনা

অভিযানে যাওয়ার পথে মুসলিমরা একটা বিশাল গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। জাহিলিয়াতের যুগে মুশরিকরা এই গাছের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করতো এবং বরকত ও মঙ্গল লাভের আশায় তাদের তরবারি এই গাছে ঝুলিয়ে রাখত। এই অভিযানে মুসলিম সেনাবাহিনীতে অনেক নতুন মুসলিম ছিল। সবার তাওহীদের সঠিক বুঝ ছিল না। তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুরোধ করলো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদেরকেও এরকম একটি গাছ নির্ধারণ করে দিন যেমনটা মুশরিকদের আছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'আল্লাহু আকবার! তোমরা এমন এক কথা বলেছো যা মূসার জাতি মূসাকে বলেছিল! তারা বলেছিল, হে মূসা, তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও। সে বলেছিল, তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই তোমরাও আগের জাতিগুলোকে একে একে অনুসরণ করবে।'*

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মতো এই উম্মাতের মধ্যেও কিছু লোক কাফিরদের অনুসরণ করবে। তবে পার্থক্য হলো বনী ইসরাঈল জাতির পথভ্রষ্টতা ছিল ব্যাপক। তাদের ভালোর চাইতে খারাপটাই ছিল প্রকট। একারণে তাদের পুরো দ্বীনই একসময় বিকৃত হয়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু নবী মুহাম্মাদের ﷺ উম্মাতে সবসময় কিছু হকপন্থী বান্দা থাকবে। তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং দ্বীনের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত অটল ও অবিচল থাকবে।

এই ঘটনা থেকে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ আক্বীদাহ জিহাদে অংশ নেওয়ার পূর্বশর্ত নয়। এখানে নও মুসলিমরা খুবই অদ্ভুত এবং অগ্রহণযোগ্য একটা আবদার করেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সেজন্য বের করে দেননি, বরং তিনি তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। তারা ছিল নওমুসলিম, তাদের ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার অভাব ছিল। কিন্তু একারণে তাদের জিহাদে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখা হয়নি। কারণ জিহাদ একটা ইবাদাত, এর জন্য পুরস্কার আছে। আর জিহাদ শুধু যুদ্ধ করাই নয়, বরং তারবিয়াহ চর্চার জন্য একটি উপযুক্ত স্থানও হলো জিহাদ। এর মাধ্যমেও ইলম অর্জন, আত্মশুদ্ধির চর্চা হয়।

২) সংখ্যা বা শক্তি নয়, ভরসা কেবল আল্লাহর ওপর

> “অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।” (সূরা তাওবা, ৯: ২৫)

যদি মুসলিমরা মনে করে যে, সংখ্যাধিক্য তাদের বিজয় এনে দেবে, সামরিক শক্তি আর প্রযুক্তি তাদের বিজয় এনে দেবে, যদি তারা ভাবে যে, শুধু অস্ত্রের জোরে উম্মাহ বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে, তাহলে মুসলিমরা ভুলের রাজ্যে আছে। এটাই হুনাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। বিজয় আসে আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পক্ষ থেকে। আর বাকি সবকিছুই উপকরণমাত্র। উপকরণ কখনো আমাদের বিজয় এনে দেয় না। এটাই হলো আল্লাহ আযযা ওয়াজালের ওপর আমাদের ঈমান, আমাদের ভরসা, আমাদের নির্ভরশীলতা।

৩) আল্লাহর রাস্তায় তীর ছোঁড়ার পুরস্কার

আল্লাহর রাস্তায় তীর ছোঁড়ার ফযিলতের ব্যাপারে একটি হাদীস আছে। এটি বর্ণনা করেছেন আবু নাজিহ আস-সুলামি ﷺ। তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় তীর ছোঁড়ে আর সেই তীর লক্ষ্যভেদ করে, তাহলে জান্নাতে তার মর্যাদা এক স্তরে উঁচুতে উন্নীত হবে। সেদিন আমি ষোলোটা তীর ছুঁড়েছি। এর প্রত্যেকটা লক্ষ্যভেদ করেছিল। আল্লাহর রাসূলকে আমি এও বলতে

শুনেছি, যে আল্লাহর রাস্তায় একটা তীর ছোঁড়ে, সে একটি দাস আযাদ করার পুরস্কার লাভ করবে।'[113] তীরের হাদীসটি তাইফের অবরোধের সাথে সম্পর্কিত হলেও আধুনিক যুগের জিহাদে তীরের সমতুল্য অস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হুনাইনের গনিমত: সম্পদ নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ দিয়েছিলেন কুরাইশ আর আরব গোত্রগুলোকে। হুনাইনের গনিমতের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। কেননা এই যুদ্ধে হাওয়াযিনের নেতা মালিক ইবন আউফ ও তার সৈনিকরা স্ত্রী-সন্তান, পশুপাল সবকিছু নিয়েই যুদ্ধে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ, গাতফান এবং তামিম গোত্রের নেতাদের বিপুল পরিমাণ গনিমতের সম্পদ দেন। প্রত্যেক নেতা একশোটি করে উট পায়। কুরাইশদের মধ্য থেকে আবু সুফিয়ান, সুহাইল ইবন আমর, হাকিম ইবন হিযাম, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা এবং আল-আকরা ইবন হাবিস, উয়াইনা ইবন হিসন আল-ফিজারী, মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান, ইয়াযিদ ইবন আবু সুফিয়ান, ক্বাস ইবন আদী প্রমুখ অনেক গনিমত পান। কেউ কেউ একশো, দুইশো এমনকি তিনশো উটও পান! বনু সুলাইম গোত্রের প্রধান আব্বাস ইবন মিরদাসকেও অনেক সম্পদ দেওয়া হয়। শুধু বাকি রইলেন আনসার সাহাবিগণ। তাঁদের রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই দিলেন না।

বিপদের সময় যে লোকগুলো পালিয়ে গিয়েছিল, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দুহাত ভরে দিলেন, অথচ যারা সামনে থেকে যুদ্ধ করেছে, তাদের হাত খালি পড়ে রইলো। স্বাভাবিকভাবেই আনসারদের কেউ কেউ এতে মনঃক্ষুণ্ণ হন, বিশেষ করে তরুণ আনসাররা বিষয়টা সহজভাবে নিতে পারলো না। কেউ কেউ বললো,

'আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ ক্ষমা করুন! আমাদের তলোয়ার এখনো রক্তে ভেজা, অথচ তিনি কুরাইশদের এত কিছু দিলেন, আর আমাদের কিছুই দিলেন না!'

আনসারদের নেতা সাদ ইবন উবাদা ؓ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বিষয়টা খুলে বললেন। বললেন,

- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনসাররা আপনার গনিমত বণ্টনে দুঃখ পেয়েছে। আপনি নিজের কওম আর আরব গোত্রপ্রধানদের অনেক বেশি পরিমাণে গনিমত দিয়েছেন। কিন্তু আনসাররা তো কিছুই পেল না।

- সাদ, এই বণ্টনের ব্যাপারে তোমার কী মত?

- রাসূলুল্লাহ! আমিও তো আনসারদেরই একজন।

সাদ ইবন উবাদা ؓ এভাবে খুব আদবের সাথে নিজের অনুভূতির কথাও ব্যক্ত

---

[113] সুনান আন-নাসাঈ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৫।

করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সব আনসারদের ডাকলেন। সেই বৈঠকে অল্প কিছু মুহাজির সাহাবিও ছিলেন। বাকিদের সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আনসারদের একান্ত কথোপকথন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন।

বক্তব্যের শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহর রাসূল তাঁর কথা শুরু করলেন,

- আনসার ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদের কাছে এমন এক অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট, আর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের পথ দেখান? তোমরা ছিলে দরিদ্র, আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের সম্পদ দিয়েছেন। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের অন্তরকে জুড়ে দিয়েছেন। বলো, এসব কি সত্য নয়?

- হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল, এসবই সত্য। আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনেক মেহেরবানি।

- হ্যাঁ, তোমরা আমাকে এ কথা বলতেই পারো যে, যখন সবাই আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তখন আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। যখন সবাই আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল, আমরা আপনার পাশে দাঁড়িয়েছি। যখন আপনি ছিলেন আশ্রয়হারা, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি ছিলেন নিঃস্ব, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর বললেন,

> *'আনসাররা শোনো! তোমরা দুনিয়ায় তুচ্ছ কিছু সম্পদের জন্য মনে মনে নাখোশ হয়েছো। অথচ এই সম্পদগুলোর মাধ্যমে আমি কিছু লোকের মন জয় করতে চেয়েছি যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর তোমাদের ইসলামের ওপর আমার তো আস্থা আছেই। বলো, তোমরা কি এতে খুশি নও যে অন্যরা যখন উট, ভেড়া নিয়ে বাড়ি ফিরবে, তখন তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে? সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ওরা যা কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে, তার চাইতে উত্তম কিছু নিয়ে তোমরা আজ বাড়ি ফিরবে। যদি হিজরত বলে কিছু না হতো, তাহলে আমিও হতাম আনসারদেরই একজন। যদি সব লোক এক পথে চলে আর আনসাররা অন্য পথে চলে, আমি তো আনসারদের পথেই চলবো। হে আল্লাহ, তুমি আনসারদের ওপর রহম করো, তাদের সন্তানদের ওপর রহম করো এবং তাদের সন্তানদের ওপরও রহম করো।'*

এ কথাগুলো শুনে আনসাররা কাঁদতেই থাকলেন, কাঁদতেই থাকলেন। আর বললেন, 'আমরা আমাদের অংশে আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে সন্তুষ্ট।'

আনসাররা ছিলেন বাকিদের চাইতে আলাদা। অন্যদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে আল্লাহর রাসূল এই অর্থসম্পদ তাদের দিয়েছিলেন। কিন্তু আনসারদের বেলায় এমনটা করা প্রয়োজন ছিল না। কারণ তারা এতদিন ধরে সুখে-দুঃখে আল্লাহর রাসূলের পাশে ছিলেন, তারা টাকা-পয়সার জন্য জিহাদ করেননি। প্রথম দিন থেকেই আখিরাত ছিল তাদের লক্ষ্য।

তারা ছিলেন পথহারা, তারা ছিলেন কাফির। একজন মানুষের জন্য কাফির হওয়ার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে? কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদকে ﷺ তাদের কাছে পাঠানোর মাধ্যমে তাদের পথ দেখালেন। এটা ছিল আনসারদের সবচাইতে বড় অর্জন, সবচাইতে বড় পাওয়া। হিদায়াতের সাথে পৃথিবীর কোনো সম্পদের তুলনা চলে না। এজন্যই আমরা যে দুআটি সবচেয়ে বেশি করি তা হলো হিদায়াতের দুআ -- ইহদিনাস সিরাত্বল মুস্তাক্বীম -- সূরা ফাতিহার সেই আয়াত -- আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

আল্লাহ শুধু আনসারদের হিদায়াত দিয়েছেন তা নয়, বরং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে তাদের সম্পদশালী বানিয়েছেন। মদীনার অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের পর একের পর এক যুদ্ধে এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, কিন্তু জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাধ্যমে আনসাররা ধনী হয়েছিলেন।

আনসারদের প্রতি আল্লাহ তাআলার আরেকটি বড় অনুগ্রহ হচ্ছে তাদের ঐক্য। আনসারদের আওস ও খাযরাজ গোত্র চিরশত্রু ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ মাধ্যমে আল্লাহ এই দুটি গোত্রের অন্তরকে এক করেন। আনসাররা তাদের দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চটা ঢেলে দিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাসূলের কঠিন সময়ে তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু সেসব নিয়ে তারা কখনোই গর্ব করেননি, বরং এসবকিছুকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবেই মেনেছিলেন আর আল্লাহর প্রশংসাই করেছেন। তবু কেন তারা আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্তে প্রথমে কিছুটা দুঃখ পেয়েছিলেন? সত্যি বলতে আনসারদের সবাই নয়, বরং কিছু সাহাবি দুঃখ পেয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল চেয়েছেন কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের নেতাদের মন থেকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করে দিতে, যেন তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার ﵁ একটি কথায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছিলেন, 'রাসূলুল্লাহ আমাকে গনিমত থেকে দিতেই থাকলেন, দিতেই থাকলেন, যতক্ষণ না তিনি আমার চোখে পৃথিবীর সবচাইতে নিকৃষ্ট মানুষ থেকে সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হলেন।' এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আল-গাযযালি একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেছেন,

'কিছু লোক সত্যের দিক ধাবিত হয় পেটের চাহিদায়, সত্যান্বেষী মন দিয়ে নয়। গবাদিপশুদের যেমন করে একগুচ্ছ পাতা দেখিয়ে গোলাঘরের দিকে টেনে আনা হয়, তেমনি কিছু লোককে সত্যের দিকে ধাবিত করতে চাইলে কিছু প্রলোভন দেখানোর প্রয়োজন পড়ে।'

আল্লাহর রাসূল জানতেন কাকে কতটুকু দিতে হয়, অথবা কাকে না দিলেও চলে। যেমন তিনি আল-আকরা ও উয়াইনাকে প্রথমে ১০০টা করে উট দিলেন কিন্তু আব্বাস ইবন মিরদাসকে দেন ৫০টি উট। আব্বাসও ছিল অন্যদের মতো গোত্রপ্রধান। স্বভাবতই তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে সে একটি কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতার ভাষায় সে বলছিল যে, সে কম পেয়েছে অথচ তাঁর পূর্বপুরুষেরাও অন্য গোত্রগুলোর মতোই লড়াই করে এসেছে।

কবিতার কথাগুলো আল্লাহর রাসূলের কানে আসে। কবিতা শুনে তিনি বললেন, 'ওর জিহবা কেটে ফেলো।' নবীজির কথা শুনে কিছু লোক ভাবলো তিনি আক্ষরিক অর্থেই আব্বাসের জিহবা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন! আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাসকে আরও ৫০টা উট দেওয়ার কথা বলেছিলেন যাতে তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে তিন দফায় একশো করে দেওয়া হয়েছিল তিনশো উট। হাকিম ইবন হিজামকে দেওয়া হয়েছিল দুইশো উট। আবু সুফিয়ান, তার দুই ছেলে মুআবিয়া এবং ইয়াযিদ ﷺ -- তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল একশো উট আর ছয় কেজি রুপা।

কিন্তু কিছু মানুষকে আল্লাহর রাসূল কিছুই দিলেন না। এমন একজন হলেন আমর ইবন তাঘলিব ﷺ । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসায় বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি যাদেরকে দিচ্ছি না -- তারা আমার কাছে বেশি প্রিয়। কিছু লোককে আমি দিচ্ছি কারণ তাদের অন্তরে আমি সম্পদের লোভ দেখতে পাচ্ছি, আর যাদেরকে দিচ্ছি না তাদের ওপর আমার পুরো আস্থা আছে যে আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। আমর ইবন তাঘলিব তাদেরই একজন।'

এই কথা আমর ইবন তাঘলিবের মন ভরিয়ে দিল। তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাগুলোকে আমি লাল উটের চেয়ে বেশি পছন্দ করলাম।'

সে যুগে আরবে লাল উট মানে হলো বর্তমানের মার্সিডিজ বেঞ্জ! আমর বোঝালেন, যদি সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ করে লাল উট তাঁকে দেওয়া হয়, তবু তার চাইতে মহানবী ﷺ তাঁকে যেভাবে সম্মানিত করলেন, সেটাই তাঁর কাছে অনেক বেশি দামি!

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ানকে গনিমত দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসা আদায় করলেন আর অন্যদিকে আমরা ইবন তাঘলিবকে না দেওয়ার মাধ্যমে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসা পেলেন। সাফওয়ানের কাছে গনিমতটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু আমরের জন্য রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে ঈমানের স্বীকৃতিটাই বড়।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাতের দিকে তাকালে দেখা যায় কাকে কী বলতে হবে, কার সাথে কেমন আচরণ করলে লাভ হবে -- এসবের ব্যবস্থাপনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে মানুষের মন জয় করার এই বিশেষ

ক্ষমতাটি দান করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলিমদের একটা অভিন্ন উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছেন।

> “যদি আপনি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদও ব্যয় করতে, তবু এ মানুষদের অন্তরগুলোর মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করতে পারতেন না। বরং আল্লাহ তাআলাই এদের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করেছেন।” (সূরা আনফাল, ৮: ৬৩)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন, এর মানে এই নয় যে মুসলিমরা কাফিরদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজেদের দ্বীন আর পরিচয় বিকিয়ে দেবে, যেটা এখন হচ্ছে। আজকে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ও মুসলিমদের ওপর সর্বাত্মক যুদ্ধ চালানো কাফির নেতৃবৃন্দদের নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করছে একদল মুসলিম। এটা হচ্ছে মূলত পশ্চিমা দেশগুলোতে। সেখানে কিছু মুসলিম ক্রমাগত তাদের ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে চলেছে। সমাজে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য তারা পশ্চিমা কুফরি আদর্শ ও অনৈতিক মূল্যবোধগুলোকেও স্বীকৃতি দিচ্ছে। কাফিরদের খুশি করার জন্যই তাদের এত পরিশ্রম, তবে এর সবই পণ্ডশ্রম। কারণ, আল্লাহ্ বলছেন,

> “আর ইহুদি ও নাসারারা কখনো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের পথ অনুসরণ করেন।” (সূরা বাক্বারাহ, ২: ১২০)

আল্লাহর রাসূল যে লোকগুলোর মন জয় করার চেষ্টা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আগে তিনি প্রায় বিশ বছর মতাদর্শিক ও সামরিক যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করেছেন, কোণঠাসা করেছেন, সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছেন। তিনি যতদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, ততদিন তাদেরকে টাকা দিয়ে বা ছাড় দিয়ে খুশি করার কোনো চেষ্টাই করেননি। কিন্তু যখন তিনি তাদের ওপর ক্ষমতা অর্জন করেছেন আর তারা ক্ষমা চেয়েছে বা পালিয়ে গেছে, তখন তিনি তাদের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন তারা যেন ইসলামের ছায়াতলে আন্তরিকভাবে চলে আসে। ক্ষমতাসীন কাফিরদের হাতে টাকা-পয়সা তুলে দিয়ে বা তাদের পক্ষে ক্যাম্পেইন করে তাদের মন জয় করা যায় না। কারণ যতদিন তাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাদের ইসলামের কোনো প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় বরং তাদের সাথে দৃঢ়তা দেখানো ও অনমনীয় হওয়াটাই নবীজির পথ।

খারিজীদের শেকড়

কিছু লোকের সম্পদের লোভ তাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ বণ্টনের প্রতি অন্যায্যতার অভিযোগ তোলার দিকে ঠেলে দেয়। বনু তামীম গোত্রের যুলখুয়াইসিরাহ নামের এক লোক এসে বললো, ‘এই মুহাম্মাদ, তুমি আল্লাহকে ভয় করো।’ রাসূলুল্লাহ কাউকে

কম, কাউকে বেশি দিচ্ছিলেন এটা তার পছন্দ হয়নি, সে তাই আল্লাহর রাসূলকে ন্যায়বিচার শিক্ষা দিতে চলে এসেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'জমিনের সমস্ত মানুষের ওপরে আল্লাহ আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তবে আর কে করবে?' উমার ইবন খাত্তাব ﵁ স্বভাবতই খুব ক্ষেপে গেলেন, বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন, আমি এর গর্দানটা উড়িয়ে দিই'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'ওকে ছেড়ে দাও। এমন আরও অনেক লোক তুমি দেখবে। তাদের সালাতের তুলনায় তোমার সালাত কিছুই না। তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমার সিয়াম কিছুই না। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচ দিয়ে নামবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর লক্ষ্যভেদ করে বেরিয়ে যায়।'*

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই জাতীয় চরমপন্থী লোকদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তুলনাটা এমন যে, একজন শক্তিশালী তীরন্দাজ যখন খুব জোরে তীর নিক্ষেপ করে তখন তা লক্ষ্যে আঘাত করে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তীরন্দাজ বুঝতেই পারে না আদৌ লক্ষ্যভেদ হয়েছে কি না। এই লোকগুলোর অবস্থা সেই তীরের মতো, তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবে যেভাবে করে তীরন্দাজের তীর লক্ষ্যভেদ করে বেরিয়ে যায়।

এই লোকগুলো সালাত আদায় করবে, সিয়াম পালন করবে, এবং এদের এসব ইবাদাত ও আমল বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব নজরকাড়া হবে। এমনকি সাহাবিদের আমল তাদের ধারেকাছে যাবে না। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের গলা দিয়ে নামবে না অর্থাৎ কুরআন তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না। কুরআনের আয়াতগুলো তারা কেবল উচ্চারণ করবে মাত্র, জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করবে না।

ইসলামী পরিভাষায় এদের বলা হয় খারিজী। এরা চরমপন্থা অবলম্বন করে এবং বাড়াবাড়ি করে। আল্লাহর রাসূল অন্য একটি হাদীসে বলেছেন, খারিজীরা হবে মু'মিনদের প্রতি কঠোর আর কাফিরদের প্রতি নমনীয়। এটি খারিজী চিহ্নিত করার মূল সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি যুগের খারিজীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ঘুরেফিরে থাকবে। মুসলিমদের জান-মালের কোনো মূল্য তাদের নেই। বরং মুসলিমদের ওপর তারা কুফরির অপবাদ দিয়ে তাদের দেদারসে হত্যা করে। তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা আর বর্তমান সেকুলার দৃষ্টিতে চরমপন্থা -- দুটোর সংজ্ঞা এক নয়। চরমপন্থার সংজ্ঞা আসলে কী -- সেটা মুসলিম আলিমদের থেকে শিখতে হবে, পশ্চিমা বা সেকুলার মিডিয়া থেকে নয়। কারণ ইসলামের যা কিছুতে সেকুলারদের আপত্তি, তার সবকিছুকেই তারা চরমপন্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে।

আলীর ﷺ খিলাফতের যুগে খারিজীদের উত্থানের সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে। খাব্বাব ইবন আরাতের ﷺ ছেলে ইবন খাব্বাব তার স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বের হয়েছেন। পথিমধ্যে খারিজীরা তার পথরোধ করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। তার উত্তর তাদের পছন্দ না হওয়ায় তারা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তার গর্ভবতী স্ত্রীকে মেরে পেট কেটে বাচ্চা বের করে ফেলে। তার কিছু পরেই তারা কিছু খ্রিস্টানদের সম্পদ লুট করলো। কিন্তু যখনই শুনলো সেগুলো খ্রিস্টানদের, সেগুলো তারা সাথে সাথে ফেরত দিয়ে দিলো। ইবন খাব্বাবকে হত্যার পরই আলী ইবন আবি তালিব ﷺ খারিজীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। যেহেতু মুসলিমদের জান-মাল খারিজীদের হাতে নিরাপদ থাকে না, তাই খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কাফিরদের সাথে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ থেকেও প্রাধান্য পায়। খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে মূলধন রক্ষা করার মতো। আর কাফিরদের ভূমিতে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। নিশ্চিতভাবেই মুনাফা অর্জনের চেয়ে মূলধন রক্ষা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই একই নীতি মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদেও প্রযোজ্য, কেননা তারা উম্মাহর অভ্যন্তরীণ শত্রু। কাফিরদের আগ্রাসন প্রতিরোধ করা, মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও খারিজীদের দমন করা -- এদের প্রতিটিই জরুরি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

খারিজীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য তারা ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে অত্যাচারী মুসলিম শাসকের যুলুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ইসলামী শরীয়াতে খুরুজ হিসেবে গণ্য করা হয় না। জিহাদ ও খুরুজ -- এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বোঝা জরুরি। বর্তমানে যেকোনো প্রকার জিহাদকে খুরুজ তকমা দেওয়ার একটি রেওয়াজ চালু হয়েছে যা নিঃসন্দেহে উম্মাহর জন্য বিভ্রান্তিকর।

হাওয়াযিন গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

হুনাইনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র নারী, শিশু, সম্পদ--সবকিছু হারায়। এসব নিয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল তাই এগুলোকে গনিমত হিসেবে মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তারা যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়, ততক্ষণে যাবতীয় গনিমত ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ফলে তাদের গোত্রে শুধু কিছু পুরুষ ছাড়া কিছুই রইলো না। বিষয়টা কষ্টকর, তারা মুসলিম হয়ে এসেছে কিন্তু তাদের পরিবার তাদের সাথে নেই। তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ খুব সম্মান করলো, তাঁর প্রশংসা করলো এবং অনুরোধ করলো যেন তাদের সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বিষয়টা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ইতিমধ্যেই সবকিছু বণ্টন করে দিয়েছেন, তাই সেগুলো মুসলিমদের থেকে ফেরত নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আল্লাহর রাসূল চাচ্ছিলেন তাদেরকে যতটুকু সম্ভব ফিরিয়ে দিতে। তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোনটা চাও আমাকে বলো, তোমাদের পরিবার নাকি সম্পদ? কোনটা ফিরে পেতে তোমরা আগ্রহী?'

তারা বললো, 'আমরা অবশ্যই আমাদের পরিবারকে ফিরে পেতে চাই। ওরাই তো আমাদের সম্মান।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'ঠিক আছে, আমার আর বনু মুত্তালিবের হাতে যা আছে, আমি তোমাদের সেগুলো ফিরিয়ে দেবো। তোমরা একটা কাজ করবে, আমি যখন সালাতে ইমামতি করবো, তোমরা উঠে দাঁড়াবে এবং বলবে, আমরা আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করি যেন তিনি আমাদের হয়ে মুসলিমদের এবং মুসলিমদের অনুরোধ করি তারা যেন আমাদের হয়ে আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করে আমাদের পরিবার-পরিজনকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন এ অনুরোধ করবে, তখন আমি আমার ও বনু মুত্তালিবের হাতে যা আছে তা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবো আর বাকিদেরকেও তা-ই করতে বলবো।'

যুহরের ওয়াক্তে আল্লাহ রাসূল মসজিদে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর হাওয়াযিনের নও মুসলিমরা উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূলের কথামতো ওপরের কথাগুলো বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমাদের ভাইয়েরা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এখন আমি তাদের পরিবার-পরিজনকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই।' এরপর আল্লাহর রাসূল তাঁর ও তাঁর পরিবার বনু মুত্তালিবের হাতে গনিমত হিসাবে যেসকল নারী শিশু ছিল, তাদের হাওয়াযিন গোত্রের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর উদারতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুহাজিররা বললেন, 'আমাদের যা আছে, আমরাও সেসব সবই ফিরিয়ে দেবো।' আনসাররাও একই কথা বললেন।

কিন্তু এই উৎসাহে ভাটা পড়ে যখন আকরা ইবন হাবিস বললো, 'আমাদের গনিমত ফেরত দেবো না।' উয়াইনাও একই কথা বললো, একই কথা বললো বনু সুলাইমের নেতা আব্বাস ইবন মিরদাস। কিন্তু তার গোত্রের লোকেরা দাঁড়িয়ে বললো, 'কিন্তু আমরা আল্লাহর রাসূলকে আমাদের সব গনিমত ফিরিয়ে দিতে চাই!' আব্বাস রেগে গিয়ে বললো, 'তোমরা আমাকে অপমান করলে!'

আল্লাহর রাসূল খুব করে চাচ্ছিলেন হাওয়াযিনের নারী-শিশুরা যেন পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু যখন দেখলেন কিছু লোক স্বেচ্ছায় তাদের গনিমত ফিরিয়ে দিতে চাইছে না, তখন তিনি তাদের প্রস্তাব দিলেন, 'ঠিক আছে, তোমরা যারা গনিমত ছেড়ে দিতে চাইছো না, তোমাদের বলছি, তোমরা যদি এবার এই গনিমত ছেড়ে দাও, তাহলে পরবর্তী জিহাদে তোমাদের ছয়গুণ করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে, আল্লাহর রাসূল তাদেরকে এর বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা দেন। এই কথা শুনে সবাই তাদের গনিমত ছেড়ে দিল। এভাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ চমৎকার ব্যবস্থাপনায় হাওয়াযিন গোত্রের নারী-শিশুরা তাদের গোত্রে ফিরে গেল, আর অর্থসম্পদ মুসলিমদের কাছে থেকে গেল। মুসলিমদের প্রত্যেকে পেয়েছিল ৪০টি করে ভেড়া।

মালিক ইবন আউফকে বলা হলো, 'তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমার সম্পত্তি আর পরিবার তো ফিরিয়ে দেওয়া হবেই, তার সাথে আরও ১০০ উট তোমাকে দেওয়া হবে।' এ খবর শুনে মালিক ইবন আউফ তাইফ থেকে চলে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। আল্লাহর রাসূল তাঁর কথামতো সবকিছু ফিরিয়ে দিলেন এবং মালিককে সেই এলাকার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিলেন। মালিক ইবন আউফ মহাখুশি হয়ে আল্লাহর রাসূলের প্রশংসায় কবিতাও লিখে ফেললো! শুধু তা-ই নয়, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেই একটি বাহিনী গঠন করে তাইফ অবরোধ করলো। যে লোকটি কিছুদিন আগেও রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সে এখন রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষ হয়ে জিহাদ শুরু করল। যাদের সে কিছুদিন আগে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল, এখন সে তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ শুরু করলো । এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের ঘোরশত্রুদেরও মন জয় করেন।

কাব ইবন যুহাইরের ؓ ইসলাম গ্রহণ

কাব ইবন যুহাইর নবীজির ﷺ বিরুদ্ধে কবিতা লিখতো। তার ভাই তাকে জানালো রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যারা কবিতা লিখেছে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এ কথা শুনে কা'ব খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে সিদ্ধান্ত নিল রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতেন না। সে রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে বললো, 'কাব ইবন যুহাইর আপনার কাছে এসেছে। সে মুসলিম হতে চায়। আপনি কি তার ইসলাম গ্রহণ করবেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তাকে আসতে দাও।' তখন কা'ব বললেন, 'আমিই কা'ব ইবন যুহাইর।' এরপর সে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বায়াত দিলো এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রশংসা করে চমৎকার একটি কবিতা আবৃত্তি করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবিতা শুনে খুব খুশি হলেন এবং তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে কাবকে দিয়ে দিলেন।

উরওয়া ইবন মাসউদের ؓ ইসলাম গ্রহণ

উরওয়া ইবন মাসউদ আস-সাকাফীর কথা হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাপ্রবাহে এসেছিল। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কূটনীতিক। উরওয়া ছিলেন তাইফের অধিবাসী। মালিক ইবন আউফ যখন তাইফ অবরোধ করলেন, তখন উরওয়া ইসলাম গ্রহণের নিয়তে তাইফ ছেড়ে চলে এলেন । আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা করে মুসলিম হয়ে উরওয়া তাইফে ফিরে যান। সাকিফ গোত্রের কাছে উরওয়া ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি তাইফবাসীর কাছে তার সম্মানের স্থান হারান। উরওয়া তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান করেন। নিজ বাড়ি থেকে আজান দেন। এসব সহ্য করতে না পেরে তার গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। মারা যাওয়ার আগে তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাইফের সাথে যুদ্ধে শহীদ মুসলিমদের কবরে যেন তাকে কবরস্থ করা হয়। উরওয়া মুসলিম হিসেবে বেঁচে ছিলেন অল্প কিছুদিন, কিন্তু সে কয়টা

দিনই ছিল তার জীবনের অর্থপূর্ণ দিন। মৃত্যুমুখে উপনীত হয়ে তিনি বলেছিলেন,

'নিশ্চয়ই এই শাহাদাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এক বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহর পথে মরতে পারার মর্যাদা! আমার অবস্থা তো সেই শহীদদের মতো, যারা এই শহরের দরজায় শহীদ হয়েছিলেন, যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ এই শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন।'

তাবুকের যুদ্ধ

পটভূমি

> "হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের কাছে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা করো, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (আত-তাওবাহ, ৯: ২৮)

শত বছর ধরে হজ্জ ও উমরাকে ঘিরে ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। এটিই ছিল কুরাইশদের জীবিকার মাধ্যম। সারাবছরই হজ্জ আর উমরা উপলক্ষে অসংখ্য মানুষ মক্কায় প্রবেশ করতো। এর ওপরেই কুরাইশদের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। কুরাইশদের কাছে তাই হজ্জ বা উমরা কেবল ধর্মীয় আচার ছিল না, বরং তারা ভালো করেই জানতো তাদের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে হজ্জ বা উমরাকে ঘিরে। কিন্তু ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন যে, এই বছরের পর কোনো মুশরিক মাসজিদ আল হারাম অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। সেসময় হিজাযের বাইরে আরবের তেমন কোনো গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরকম অবস্থায় তাদের মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া মানে কুরাইশদের ব্যবসায় বিশাল ধ্বস। স্বাভাবিকভাবেই কুরাইশরা এই সিদ্ধান্ত সহজভাবে নিতে পারছিল না।

এই প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। মুশরিকদের মাসজিদ আল হারামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল তাদের অপবিত্রতার কারণে। আর্থিক ক্ষতির ব্যাপারে কুরাইশদের মনে চাপা যে আশঙ্কার জন্ম নিয়েছিল সে ব্যাপারে তাদের আশ্বস্ত করতে আল্লাহ বলছেন,

> 'আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা করো, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

এটাই তাওয়াক্কুল। আয়ের কোনো উপায় যদি হারাম হয়, তাহলে মানুষের তা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর যদি হালাল হয়, তবেই কেবল তা গ্রহণ করা উচিত। কোনটায় লাভ বেশি আর কোনটায় কম -- সেটা দেখার আগে দেখতে হবে উপায়টি আদৌ হালাল কি না, কেননা লাভ-ক্ষতির ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে। এভাবেই ইসলাম আমাদের চিন্তাধারা বদলে দিতে এসেছিল। সাধারণত মানুষ প্রথমেই লাভ-ক্ষতিকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইসলাম কুরাইশদেরকে অন্যভাবে চিন্তা করতে শেখালো। কুরাইশদের জন্য বিষয়টা মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। কারণ ব্যবসা ছাড়া আর কোনো কিছুতে তারা অভ্যস্ত ছিল না, না ছিল তাদের অন্যকিছুতে দক্ষতা বা

জ্ঞান। আর মক্কাও এমন কোনো উর্বর ভূমি ছিল না যে, সেখানে কৃষিকাজ করে খাওয়া যাবে। পাথুরে ভূমি আর খুবই অল্প বৃষ্টিপাতের এই অঞ্চলের লোকগুলোকে যখন বলা হলো যে তাদের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। আল্লাহ তখন তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহই তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।

আল্লাহর আদেশ পালন করলে আল্লাহ আমাদের বঞ্চিত করবেন না। এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই আছে যারা সুদ বা অন্যান্য হারাম পন্থায় জীবিকা অর্জন করে এবং ঐ হারাম পথ থেকে সরে আসতে চায় না। কারণ সেটা ছাড়া তাদের আর কোনো উপার্জনের উৎস নেই। হয়তো কেউ একজন হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন করছে। তাকে গিয়ে যদি বলা হয় এটা হারাম, আপনি এই কাজ ছেড়ে দিন। সে জবাব দেবে, 'তাহলে আমি কী খেয়ে বাঁচবো?' বাড়ি গাড়ি করতে ব্যাঙ্ক থেকে সুদে লোন নেওয়া কিংবা বেশি লাভের আশায় ফিক্সড ডিপোজিট রেখে উচ্চহারে সুদ নেওয়া এখন সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে সতর্ক করতে গেলে সবাই সমস্বরে বলে উঠে, "লোন না নিলে কীভাবে বাড়ি করবো? ফিক্সড ডিপোজিট না রাখলে খরচ চালাব কী দিয়ে?" তাদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ বলেন,

> **"যার তাকওয়া আছে তার জন্য আল্লাহ উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন সব উৎস থেকে তাদের (রিযক) দিবেন যা তারা কখনো কল্পনা করেনি।" (সূরা তালাক, ৬৫: ২-৩)**

এটা আল্লাহর ওয়াদা। কারো যদি তাকওয়া থাকে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা থাকে, তাহলে রিযক নিয়ে তার ভাবতে হবে না, রিযক আল্লাহই যোগাবেন। সূরা তাওবার পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

> **"আহলে কিতাবের মধ্যে যারা যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯: ২৯)**

ইবন কাসীর (রহ) এই দুই আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীরের মাধ্যমে ৯ম হিজরি ও এতে তাবুক যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে বর্ণনা শুরু করেন।

> **"হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়; আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (আত-তাওবাহ ৯: ১২৩)**

আশেপাশের কাফির বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে রোমানদের। কারণ পুরো হিজায তখন ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর সংলগ্ন অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। ইবন কাসিরের মতে, তাবুকের জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের

সম্প্রসারণ। ইসলামকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হলো জিহাদ। তাবুকের যুদ্ধ এই কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ আরবের পরেই ছিল রোমান সাম্রাজ্য আর রোমান সাম্রাজ্য ছিল ইসলামের প্রসারের পথে বড় বাধা।

এছাড়া তখন মুহাম্মাদ ﷺ ইসলামের তখনকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সৈন্যবাহিনী গঠন করা শুরু করেছেন। সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে সেটি গোপন রাখতেন যেন শত্রুবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে চমকে দেওয়া যায়। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের ক্ষেত্রে নবীজি ﷺ বিষয়টি গোপন না রেখে প্রথম দিন থেকেই পুরো বিষয়টি প্রকাশ করে দেন। এর কিছু কারণ ছিল:

প্রথমত, মুসলিমরা নতুন এক ধরনের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপক্ষ কোনো আরব গোত্র বা চেনাজানা কেউ নয়। প্রবল পরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আরবের মুসলিমদের তেমন ধারণাই ছিল না। তারা এমন এক সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল, যারা তাদের ক্ষমতা ও সামরিক শক্তিমত্তার জন্য কয়েক শতাব্দী জুড়ে বিখ্যাত ছিল।

দ্বিতীয়ত, রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থ হলো অনেক বড় একটা দূরত্ব অতিক্রম করে ময়দানে যেতে হবে। এজন্য তিনি চেয়েছিলেন সবাই যেন এটা মাথায় রেখে আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয়ত, সময়টা ছিল ভ্রমণের জন্য খুবই প্রতিকূল -- গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, প্রচণ্ড গরম আর শুষ্ক। অন্যদিকে এটা হলো খেজুর পাকার সময়। আরববাসীর জন্য এটা খুব লোভনীয় সময়, কেননা মদীনার অর্থনীতি কৃষিপ্রধান আর তাদের ফসল হচ্ছে মূলত খেজুর। এই সময়ের জন্য তারা সারা বছর অপেক্ষা করে। কিন্তু এই লোভনীয় সময়ে এল জিহাদের ডাক!

চতুর্থত, এই যুদ্ধের লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখার তেমন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, এর আগে মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা ছেড়ে চলে গেলে আশেপাশের শত্রুদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু আশেপাশের বেশিরভাগ গোত্রই মুসলিমদের রাজনৈতিক শক্তির সামনে বশ্যতা স্বীকার করায় তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে সেই ভয় আর ছিল না।

পঞ্চমত, এই যুদ্ধ ছিল সে পর্যন্ত সবচাইতে বড় অভিযান। এর জন্য অর্থায়ন প্রয়োজন ছিল প্রচুর। তাই এই জিহাদ অর্থায়ন করার জন্য প্রকাশ্যে আহবান করা হয়। এটি আরেকটি কারণ।

এসব কারণে রাসূল ﷺ আগে থেকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখলেন যে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে যাওয়া হবে।

কুরআনের চোখে তাবুকের যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর আগে তাবুকের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা। তাবুকের জিহাদ ছিল ইসলামের স্বর্ণশিখর, রাসূলের ﷺ জীবনের জিহাদের অধ্যায়টি এর দ্বারা সমাপ্ত হয়। জিহাদ সম্পর্কিত চূড়ান্ত বিধানগুলো তাবুকের সময় নাযিল হয়। এই জিহাদ মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। বদর যুদ্ধের পরপরই মদীনায় নিফাকের উৎপাত দেখা যায়। তাবুকের সময় যে আয়াতগুলো নাযিল হয় তা মুনাফিকদের পুরোপুরি উন্মোচিত করে দেয়। নিফাক সম্পর্কিত বেশিরভাগ আয়াত এসেছে সূরা আত-তাওবায়। এই সূরাটি নাযিল হয়েছিল ৯ম হিজরিতে। এর অধিকাংশ আয়াতই তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কিত।

জিহাদের প্রতি অনীহা অন্তরের একটি রোগ

তাবুকে যদিও কোনো লড়াই হয়নি, তবুও শরীয়াহ, ঈমান ও সিয়াসাহ -- সবক্ষেত্রেই তাবুক থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। তাই তাবুক যুদ্ধের ব্যবচ্ছেদের আগে এই যুদ্ধসংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর উপর আলোকপাত করা জরুরি।

> “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।” (আত-তাওবাহ ৯: ১২৩)

তাবুকের জিহাদ ছিল একটি পরীক্ষা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন পর্যন্ত আসা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। তাই এই যুদ্ধের বাহিনীকে বলা হয় যাইশ আল ‘উসরাহ বা ‘প্রতিকূলতার বাহিনী’। উসরাহ অর্থ কঠিন, প্রতিকূল। এই বাহিনীর জন্য অর্থ যোগানো ছিল কষ্টকর, সৈন্যদের একত্র করা ছিল কষ্টসাধ্য, আবহাওয়া ছিল রূঢ়, পানি ছিল দুষ্প্রাপ্য। যে পথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধে যেতে হতো, তা ছিল প্রতিকূল। প্রতিপক্ষ হিসেবে রোমানরাও ছিল সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কুরআনে এই সময়কে বলেছেন সা'আতুল উসরাহ বা ‘প্রতিকূল সময়’।

নবীজি ﷺ এই যুদ্ধের জন্য মক্কা, মদীনা ও এর আশেপাশের গোত্রগুলো থেকে যে যেখানে আছে তাদের সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন। এর আগে কখনো এমনটা হয়নি। নবীজি ﷺ চেয়েছেন প্রত্যেক সবল মুসলিম এই যুদ্ধে অংশ নিক।

কুরআন আমাদের অন্তরের রোগগুলোর কথা বলে। কুরআন নাযিল হয়েছে সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের ভেতরের ও বাইরের সব খবর জানেন। কুরআন আমাদের এমন কিছু দুর্বলতার কথা বলে দিতে পারে, যেগুলো অনেক সময় আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না বা বুঝলেও স্বীকার করি না। এজন্যই কুরআন অনন্য। তাবুকের বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল

না। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন কেন যুদ্ধে যেতে কিছু মানুষের এত অনীহা আর অনাগ্রহ ছিল।

এখনকার সময়েও জিহাদে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথাই বলে। কেউ বলে যে ফিকহ অনুসারে এটা ঠিক নয়, কেউ বলে যে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কেউ বলে যে এটা করা হিকমাহর পরিচয় নয়, কেউ বলে এসবের কোনো মানেই হয় না! কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন এমন কথা যা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না।

> "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো? যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি আঁকড়ে ধরো, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগবিলাস তো অতি অল্প।" (আত-তাওবাহ ৯: ৩৮)

এই আয়াত আমাদের অন্তরের রোগ ও রোগের চিকিৎসাও বলে দিয়েছে। এই রোগ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি মায়া, ভালোবাসা। আমরা আমাদের জীবনকে অনেক বেশি ভালোবাসি, তাই সবকিছু ছেড়েছুড়ে জিহাদে যেতে চাই না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন -- দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় কিছুই না। সুতরাং রোগের চিকিৎসা হচ্ছে বাস্তবতা উপলব্ধি করে আখিরাতের জন্য বাঁচা।

জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি

> "তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।" (আল-বাকারাহ ২: ২১৬)

জিহাদ আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, কিন্তু তবুও আমরা তা অপছন্দ করি। আমরা কেবল অপছন্দ করি তা-ই না, এটা নিয়ে কথা বলাও আমরা অপছন্দ করি! জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত, কুরআনে এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত আছে, অগণিত হাদীস রয়েছে, তবুও মানুষের মধ্যে জিহাদের আলোচনাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কাজ করে। এই রোগ এবং রোগের চিকিৎসা দুটোই আল্লাহ বলে দিয়েছেন। আরও বলে দিয়েছেন যদি আমরা এই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাই তবে আমাদের পরিণাম কী হবে।

> "যদি (জিহাদের জন্য) বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (আত-তাওবাহ ৯: ৩৯)

আল্লাহ বলছেন জিহাদ পরিত্যাগ করার পরিণাম হলো কঠিন শাস্তি, আযাব। আমাদের বর্তমান অবস্থাই এর সবচাইতে বড় প্রমাণ। আজকে আমরা বঞ্চিত, অপমানিত ও

নির্যাতিত হচ্ছি! আমাদের অঢেল সম্পদ থাকার পরেও সবচেয়ে দরিদ্র। যমীনের উপরে ও নিচে আমাদের যা কিছু আছে তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও দামি হওয়ার পরও সেগুলো আজ অন্যদের হাতে। আমাদের একতাবদ্ধ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরাই আজ সবচেয়ে বেশি বিভক্ত। আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী উম্মাহ হওয়ার কথা, কিন্তু আমরাই আজ সবচেয়ে দুর্বল। এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, কারণ আমরা তাঁর দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়েছি।

> "যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, যখন তাঁকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, গুহার মধ্যে তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখোনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফিরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আত-তাওবাহ ৯: ৪০)

পরের আয়াতে আল্লাহ সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﵁ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করছিলেন আর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সবসময় সাহায্য করেছেন, যখন কেউ সাহায্যের জন্য ছিল না, তখনও করেছেন। অর্থাৎ, আমরা যদি দ্বীনের স্বার্থে এগিয়ে না আসি তবে তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহর আদেশগুলো আমাদের নিজেদের স্বার্থেই মানতে হবে, কেননা এর মাঝে আমাদেরই কল্যাণ।

সাহাবিদের উপলব্ধি

> "তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯: ৪১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিররা বলেন, কমবয়সী বা বেশি বয়সী, ব্যস্ত কিংবা বেকার, ধনী বা দরিদ্র সবাইকে জিহাদে যেতে হবে। এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবিরা এটাকে একটা অনেক বড় দায়িত্ব হিসেবে দেখেছিলেন। কারণ এতে করে কারো জন্য কোনো অজুহাত বাকি থাকেনি, সবাইকেই যেতে হবে। এরপরই আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন,

> "দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, যদি এই সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য স্বীকার করে) তাহলে এ সব সৎ লোকের প্রতি

কোনো প্রকার অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।” (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৯১)

আল্লাহ তাআলা দুর্বল, অসুস্থ কিংবা ব্যয়ভার বহনে অক্ষম লোকদের জন্য যুদ্ধে না যাওয়ার সুযোগ রাখলেন। তারা ছাড়া বাকি সবাইকেই যেতে হবে। এ আয়াত শুনেও ইসলামের বীর যোদ্ধা আবু কাতাদাহ ﷺ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর ঘোড়ার ওপর বসেছিলেন, অথচ তিনি তখন এতটাই বৃদ্ধ ছিলেন যে, তাঁর ভুরু দিয়ে চোখ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, শরীরও ভারী হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে বলা হলো, আপনার জন্য তো যুদ্ধে না যাওয়ার অজুহাত আছে, তবু আপনি কেন এই বয়সে যুদ্ধে যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'সূরা তাওবাহ তো আমাদের জন্য কোনো অজুহাত রাখলো না!' এমনটাই ছিল জিহাদের প্রতি সাহাবিদের ﷺ উপলব্ধি।

মুনাফিক্বদের নির্লিপ্ততা বনাম মু'মিনদের উদ্দীপনা

মদীনাজুড়ে যখন জিহাদে যাওয়ার জন্য মু'মিনদের মাঝে উদ্দীপনা, তখন কিছু লোকের উপর ভর করেছিল নিষ্ক্রিয়তা। এই লোকগুলো জিহাদে যেতে চায় না, ঘরে বসে থাকতে চায়। তারা নিষ্ক্রিয় হলেও জিহাদের প্রতি মুসলিমদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা দিতে তারা ছিল সক্রিয়। নানাভাবে তারা মুসলিমদের জিহাদে যেতে অনুৎসাহিত করছিল।

“আর যখন কোনো সূরা এ মর্মে নাযিল করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদ করো, তখন তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা তোমার কাছে অনুমতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা বসে-থাকা-লোকদের সাথে থাকবো।” (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৮৬)

এই লোকগুলোর সামর্থ্য ছিল না এমন নয়, তবু তারা জিহাদে না যাওয়ার অজুহাত খুঁজছিল। ধনসম্পদের ফিতনা অনেক কঠিন ফিতনা। ধনসম্পদ থাকা খারাপ কিছু না। কিন্তু সম্পদের প্রতি ভালোবাসা যদি আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে এই সম্পদই কাল হয়ে দাঁড়ায়।

“তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না।” (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৮৭)

এই আয়াতে যে লোকদের কথা বলা হচ্ছে তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখেছে, তাঁর সামনে বসে খুতবা শুনেছে। কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে তাদের সময়ে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চাইতে এই লোকগুলোর জ্ঞানও বেশি। কিন্তু তবু তাদের সম্পর্কে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলছেন -- তারা বোঝে না। কারণ তারা বোঝে না

দুনিয়া ও আখিরাতের বাস্তবতা, তারা বোঝে না আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের গুরুত্ব, তারা বোঝে না আত্মত্যাগের মর্যাদা। বর্তমান যুগেও এরকম অনেক মানুষ আছে যারা যথার্থভাবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জগতটাকে দেখে না, যারা দ্বীনের পথে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজনীয়তা বোঝে না।

আসলে আয়াত মুখস্থ করা আর বুঝতে পারা এক নয়, বরং বুঝতে পারা বা অনুধাবন করতে পারাটা অন্তরের বিষয়। কুরআন-হাদীস অনেকেই পড়তে পারে, একজন অমুসলিমও পারে। পাশ্চাত্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজে অনেক অমুসলিম শিক্ষার্থী আছে, তারা ভালো ফলাফলও করে। কিন্তু এগুলো ইসলাম বোঝার মাপকাঠি হতে পারে না। কতগুলো কিতাব পড়া হয়েছে সেটা প্রকৃত জ্ঞান নয়, প্রকৃত জ্ঞান হলো কতটুকু অনুধাবন করা হয়েছে ও সে অনুসারে আমল করা হচ্ছে। কেউ যদি কুরআনের অসংখ্য আয়াত আর হাদীস মুখস্থ করে, কিন্তু সেগুলো মেনে না চলে তাহলে কিয়ামতের দিন এই জ্ঞান তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। তাই ইলমের সাথে আমল সমভাবে জরুরি। কেউ যদি অনেক আয়াত ও হাদীস জানে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল না করে, তবে তার জ্ঞানের বাহার বা মিষ্টি কথায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

এরপর আল্লাহ বলছেন তাদের কথা, যারা সঠিক পথে আছে। এরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ ডাকে জিহাদে অংশ নিয়েছে।

> **"...রাসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তারা সবাই নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। (কাজেই) এদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটিই মহাসফলতা।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৮৮-৮৯)**

তাবুকের যুদ্ধে এমন কিছু লোক ছিল যাদের জিহাদে অংশ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। এদের কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন কেবল তাদের আন্তরিকতার কারণে। কিছু লোক এসে জিহাদে যাওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে আর্থিক সাহায্য চান। তাদের কোনো সহায়-সম্পত্তি ছিল না, ঘোড়া বা উট না থাকায় তাদের যাতায়াতের খরচ নবীজিকে ﷺ বহন করার অনুরোধ করেন। এই সাহাবিরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু জিহাদে অংশ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল অদম্য। কিন্তু তাদের অর্থায়ন করার মতো যথেষ্ট অর্থ রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল না। জিহাদে যোগদান করতে না পারার কষ্ট নিয়ে সেই সাহাবিরা رضي الله عنهم অশ্রুসিক্ত হয়ে কষ্ট পেয়ে ফিরে গেলেন।

> **"আর তাদের উপরও কোনো দোষ নেই, যারা আপনার কাছে আসে, যাতে আপনি তাদের বাহন জোগাতে পারেন। আপনি বললেন, আমি তোমাদেরকে**

> বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল। তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিল এ দুঃখে যে, তারা ব্যয় করার মতো কিছু পাচ্ছে না।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৯২)

অদ্ভুত এক দৃশ্য কুরআন আমাদের সামনে তুলে ধরে। কিছু লোকের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকলো। এমন নয় যে তারা জিহাদে যেতে ভয় করছিল, বরং জিহাদে মহিলা আর শিশুদের মতো ঘরে বসে থেকেই আনন্দ পাচ্ছিল! অন্যদিকে কিছু গরিব সাহাবি ﷺ মনেপ্রাণে চাচ্ছিলেন জিহাদে যেতে, কিন্তু অপারগতার দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।

ওয়াসিলা ইবন কাইস ﷺ ছিলেন জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর! তার নিজের কোনো বাহন ছিল না। মুসলিম বাহিনী যখন অভিযানে যেতে প্রস্তুত, তিনি তখন রাস্তায় গিয়ে বললেন, 'কেউ কি আছে যে আমাকে তার বাহনে চড়তে দেবে? বিনিময়ে আমি তাকে আমার ভাগের গনিমাহ দিয়ে দেবো!' আনসারদের মধ্যে এক বৃদ্ধ মুজাহিদ রাজি হলো, বললো, 'আমি তোমার ভাগ নিব, তবে তোমাকে পালা করে বাহন চড়তে হবে। আমি তোমাকে খাবারও দিব।' ওয়াসিলা রাজি হলেন। এই ঘটনার পরে ওয়াসিলা একটি অভিযানে গনিমাহ হিসেবে কিছু উট পান। চুক্তিমতে, সেগুলো তিনি বৃদ্ধ আনসারকে দিয়ে আসতে গেলেন, কিন্তু বৃদ্ধ আনসার সেগুলো নিতে রাজি হলেন না, বললেন, 'ভাতিজা, ওগুলো তোমার। আমি ওগুলো চাই না।'

এটা হলো ভ্রাতৃত্ব। এমন ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন আর কোনো যুগে কোনো কালে পাওয়া যাবে না। ওয়াসিলা তার নিজের গনিমতের ভাগ ছেড়ে দিয়ে হলেও জিহাদে যেতে উন্মুখ হয়ে ছিলেন! আর সেই বৃদ্ধ নিজের আরাম-আয়েশ ছেড়ে দিয়ে ওয়াসিলাকে সাথে নিতে রাজি হয়েছেন সাওয়াবের আশায়, গনিমতের আশায় নয়। এমনই ছিল সাহাবিদের মানসিকতা, আখিরাতের পুরস্কারকেই তারা জীবনের সাফল্য হিসেবে দেখতেন।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিক্বদের সম্পর্কে বলছেন,

> "যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৪২)

যদি যাত্রাপথ ছোট হতো এবং যুদ্ধে গনিমত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে মুনাফিক্বরা ঠিকই দুনিয়াবী লাভের আশায় জিহাদে যোগ দিত। কিন্তু তাবুকের পথ ছিল অনেক দুর্গম, তাই তারা নানা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে যোগ দিলো না। কিন্তু

তাদের অজুহাতগুলো ছিল মিথ্যা অজুহাত।

> "আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের।" (আত-তাওবাহ ৯: ৪৩)

তাবুকের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটা ছিল একটা পরীক্ষা এবং আল্লাহ তাআলা রাসূলকে ﷺ উদ্দেশ্য করে বলছেন যে মুনাফিক্বদের কোনোরকম ছাড় দেওয়াটা তাঁর উচিত হয়নি।

> "আল্লাহ ও রোজ ক্বিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ্ সাবধানীদের ভাল জানেন। নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৪৪, ৪৫)

অর্থাৎ, যারা সত্যিকারের মু'মিন তারা কোনো অজুহাত না খুঁজে স্বেচ্ছায় জিহাদে যোগ দিতে আসবে। অন্যদিকে ঈমানের দুর্বলতার কারণে যারা জিহাদের প্রকৃত ধারণাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে চায় তারা সবসময়ই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অস্বচ্ছতা এবং স্ব-বিরোধিতার মাঝে ঘুরপাক খায়। একদিকে তারা দাবি করে যে তারা দ্বীনের খেদমত করতে চায়, অন্যদিকে তারা তাদের দায়িত্বগুলো অস্বীকার করে তা থেকে দূরে থাকতে চায়, নানা অজুহাতে গা বাঁচানোর চেষ্টা করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলছেন, আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের ওপর আসলে এদের ঈমান নেই। যার আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে, সে আল্লাহকে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি ভয় করে তার দায়িত্বগুলো পালনে সচেষ্ট হবে। অন্যদিকে কিয়ামতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে দুনিয়ার প্রতি তার বিশেষ আসক্তি থাকবে না।

> "আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিতো, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হলো বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাকো।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৪৬)

কোনো কাজের সংকল্প থাকলে এর জন্য প্রস্তুতিও থাকা চাই। কেউ ডাক্তার হতে চাইলে তাকে সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে, বছরের পর বছর এজন্য পরিশ্রম করতে হবে। দুনিয়ার যেকোনো কাজ বা পেশার জন্য যেমন প্রস্তুতি নিতে হয় ইসলামেও ঠিক তেমন। কেউ যদি বলে যে সে হিজরত করবে কিংবা যদি বলে সে জিহাদে যোগ দেবে,

তবে তার সেইভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। প্রস্তুতি শব্দটা এখানে মুখ্য। যেকোনো ইবাদাতের জন্য যা যা দরকার, তার সবই এতে অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আল্লাহ মন্তব্য করছেন, এই লোকগুলো জিহাদে না যাওয়ায় বরং ভালোই হয়েছে! এর কারণ হলো,

> "যদি তোমাদের সাথে তারা বের হতো, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর ঘোড়া ছোটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে (উন্মুখ হয়ে) তাদের কথা শুনবার লোক রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ জালিমদের ভালোভাবেই জানেন।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৪৭)

অর্থাৎ তারা যুদ্ধে গেলে কোনো উপকার তো হতোই না, বরং অন্যদের মনে সন্দেহ আর অনৈক্যের বীজ বপন করার মাধ্যমে আরও ক্ষতি করতো। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতো। এরপর আল্লাহ বলছেন -- তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তাদের কথা উন্মুখ হয়ে শোনে! এখানে বলা হচ্ছে সাহাবিদের কথা, কিছু সাহাবি মুনাফিক্বদের প্রোপাগান্ডায় কান দিতেন। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের সতর্ক করে দিচ্ছেন, কারণ কে মুনাফিক্ব আর কে নয় -- এটা বোঝা সহজ নয়। হতে পারে তারা অনেক মিষ্টভাষী, জ্ঞানী, বাকপটু কিংবা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যে কেউ তাদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহর রাসূলের যুগেই এই সমস্যা ছিল। সে তুলনায় এখনকার পরিস্থিতি আরও জটিল। এ কারণে জিহাদের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে বিভ্রান্তি ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনেক বেশি। সে কারণে সূরা তাওবাহ পাঠ করা আমাদের সময়ে গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ হলো, প্রথমত, আমরা নিজেরা যেন মুনাফিক্ব না হয়ে পড়ি আর দ্বিতীয়ত, মুনাফিক্বদের প্রোপাগান্ডায় যেন বিভ্রান্তিতে না পড়ি। নিফাক এমনই একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যা যে কাউকে স্পর্শ করতে পারে। একজন আলিম বা একজন মুজাহিদের মাঝেও নিফাকী থাকতে পারে। উমারের ﷺ মতো সাহাবি নিজের ঈমানে নিফাকের আশঙ্কা করতেন। হুযায়ফার ﷺ কাছে রাসূল ﷺ মুনাফিক্বদের পরিচয় প্রকাশ করতেন এবং তিনি সেই তথ্যগুলো গোপন রাখতেন। উমার হুযায়ফার ﷺ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রাসূল ﷺ মুনাফিক্ব হিসেবে উমারের ﷺ নাম উল্লেখ করেছেন কিনা। হুযায়ফা ﷺ তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন, 'না। আপনি ছাড়া আর কাউকে আমি এই প্রশ্নের উত্তরও দিতাম না।'

আল্লাহ তাআলা চান মুনাফিক্বরা জিহাদের ময়দান থেকে দূরে থাকুক। কারণ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য যুদ্ধে যেত না, তারা যেত নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য, মু'মিনদের মাঝে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ফিতনা তৈরি করার জন্য।

> "তারা এর আগেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তোমার পরিকল্পনা নস্যাৎ করার চক্রান্ত করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফ তাদের কাছে হাজির হলো এবং আল্লাহর ফায়সালাই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হলো, যদিও তারা হচ্ছে (এ বিজয়ের) অপছন্দকারী। আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখো, তারা তো আগে থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯: ৪৮, ৪৯)

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল মুনাফিক্বদের নেতা। তাকে বলা হতো সায়্যিদুল খাযরাজ -- খাযরাজদের নেতা। জুমুআর দিনে সে উঠে দাঁড়াতো, সবার উদ্দেশ্যে বলতো, 'ইনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। তোমরা তাঁর কথা শোনো, তাঁকে মানো।' অথচ এই লোকটাই ছিল মুনাফিক্বদের নেতা, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। উমার ﷺ একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ইবন উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দেননি। কারণ হিসেবে একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ইবন উবাইকে হত্যা করা হলে তার অনুসারীরা তার পক্ষে লড়াই করার জন্য দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই লোকটির আসল চেহারা আল্লাহ তাআলা এমনভাবে উন্মোচন করে দিলেন যে, তার অনুসারীরাই তাকে পরিত্যাগ করতে লাগলো।

মুনাফিকদের এক নেতা, নাম তার যাদ ইবন কাইস। তাবুকের সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?' যাদ ইবন কাইস জবাব দিলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার ভয় হয় জিহাদে গেলে রোমান নারীদের ফিতনায় পড়ে যাবো।'

এটা ছিল মুনাফিক্বদের জিহাদে না যাওয়ার অজুহাতের নমুনা! তারা হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার দোহাই দিয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করতো। এই যুগেও যারা জিহাদকে পরিত্যাগ করে, তারা শরীয়াহর কোনো যুক্তি দেখিয়েই তা পরিত্যাগ করে। ফিতনার দোহাই দিয়ে অনেকে জিহাদে যেতে চাইছিলো না, কিন্তু আল্লাহ বলছেন, জিহাদে না যাওয়াটাই তাদের জন্য আসল ফিতনাহ। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহতে অংশ নিলেই বরং ফিতনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই যারা বলে যে, আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত না, আত্মিকভাবে প্রস্তুত না -- দেখা যায় কখনোই তাদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে ওঠে না। তারা সর্বদা দুনিয়ার ফিতনায় পড়ে থাকে। কিন্তু সাহস করে যুদ্ধে যোগ দিলেই তারা সঠিক পথ পেত। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলছেন, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, আল্লাহ তাদের পথের দিকনির্দেশনা দিবেন।'

> "আপনার কোনো কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে এবং কোনো বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা আগে থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯: ৫০)

এটা মুনাফিক্বদের আরেকটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মুসলিমদের ভালো কিছু দেখলে তাদের গা জ্বলে, মুসলিমদের বিপদে তারা আনন্দিত হয়। মুসলিমদের বিপদে তারা বলে, 'বলেছিলাম না তোমাদেরকে? কেন তোমরা বের হয়েছিলে?' তারা মনে করে 'ঝামেলা' থেকে দূরে থেকে তারা খুব বিচক্ষণের মতো কাজ করেছে, কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা উল্টো, তারা নিজেদের আরও ফিতনার মাঝে ফেলে দেয়।

> "আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা করো; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।" (আত-তাওবাহ ৯: ৫২)

দুটি কল্যাণ বলতে বোঝানো হচ্ছে হয় শাহাদাত কিংবা বিজয়লাভ। মুসলিমরা মুনাফিক্বদের যেন এরকম বলে দেয় যে -- যদি আমরা হেরে যাই, আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় আর জিহাদের ময়দান থেকে দূরে থেকেছো বলে আপাতদৃষ্টিতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি বলে ভেবো না তোমরা বিচক্ষণের মতো কাজ করেছো। আমাদের কপালে আছে দুটো জিনিস, হয়তো বিজয়লাভ কিংবা শাহাদাত -- কোনোটাতেই আমাদের ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমাদের কপালে কী আছে? তোমাদের কপালেও আছে দুটো জিনিস -- হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি কিংবা আমাদের হাতেই তোমাদের কঠিন শাস্তি। কাজেই তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও করছি।

তাবুক যুদ্ধে অংশ না নিয়ে পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে এসব আয়াত নাযিল হয়েছিল।

তাবুকের যুদ্ধের অর্থায়ন

কুরআনে একটি আয়াত বাদে বাকি সবখানেই আগে সম্পদ এবং তারপর জানের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ জিহাদে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দরকার হয়। অতীত কিংবা বর্তমান, জিহাদ সবসময়ই অর্থ-সম্পদ গ্রাস করে ফেলে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসের মাধ্যমে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সব সাদাকার সাওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আল্লাহর পথে সাওয়াব বৃদ্ধি পায় সাতশোগুণ, কারণ সূরা বাকারায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশো করে দানা থাকে।' ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, 'ফী সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তা কথাটি সাধারণত জিহাদের ক্ষেত্রেই বলা হয়।' এজন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের মাহাত্ম্য অনেক বেশি।

তাবুক যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্থ যোগাড় শুরু করলেন। কাজটা ছিল অনেক কঠিন, কেননা ফসল তোলার আগ মুহূর্তের ঐ সময়টায় মুসলিমদের হাতে তেমন কিছু ছিল না। তারপরও সাহাবিরা যার যা সামর্থ্য আছে সে অনুযায়ী সম্পদ ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবু বকর ও উমার ﷺ তাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল তা দিয়ে দিলেন। সেটা যথেষ্ট হলো না, তাই উসমান ﷺ লাগাম ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত একশোটি উট এনে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও অর্থায়ন চাইলেন। উসমান ﷺ আরও একশোটি উট এনে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও চাইলেন। উসমান এবারও একশো উট দান করলেন! এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আবারও জিহাদের জন্য অর্থায়ন করার আহবান করলেন। এবারও এগিয়ে এলেন উসমান। কিছু স্বর্ণমুদ্রা এনে রাসূলুল্লাহর ﷺ কোলে ফেলে দিলেন। নবীজির ﷺ আঙুলগুলো তখন স্বর্ণমুদ্রার মাঝে ডুবে ছিল। তিনি বললেন, 'উসমান ভবিষ্যতে যা-ই করুক না কেন, তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না!' তাবুকের সেই দিনে উসমান এত বেশি দান করেছিলেন যে পরবর্তী জীবনে তিনি যা-ই কিছু করুন না কেন, আল্লাহ তাআলার ক্ষমা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়! এতেই বোঝা যায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মাহাত্ম্য কত বেশি। আর উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ ঘটনা তাঁর মুখেই শোনা যাক। তিনি বলেন,

'তাবুক অভিযানের একদিন আগের কথা। আল্লাহর রাসূল আমাদের আদেশ করলেন আমরা যেন জিহাদে সাদাকা করি। ভাগ্যক্রমে সে সময়ে আমার কাছে ভালোই টাকা-পয়সা ছিল। আমি ভাবলাম, আবু বকরকে যদি কোনোদিন হারাতে পারি, তবে সেটা আজই! এরপর আমার যত অর্থ-সম্পদ তার অর্ধেক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আল্লাহর রাসূল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো? আমি বললাম, যা এনেছি, তার সমপরিমাণ তাদের জন্য রেখে এসেছি। এরপর দেখলাম আবু বকর তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হয়েছে! আল্লাহর রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী রেখে এসেছো তোমার পরিবারের জন্য? আবু বকর উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ﷺ রেখে এসেছি। আবু বকরকে আমি বললাম, নাহ, তোমার সাথে আমি কখনোই পেরে উঠবো না!'

ভালো কাজে সাহাবিরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তাবুকের অর্থায়নে ভূমিকা রেখেছেন আবদুর রাহমান ইবন আউফ ﷺ। তিনি এই জিহাদে দুই হাজার দিরহাম দান করেন। এটা ছিল তার সম্পদের অর্ধেক। এছাড়াও নিজেদের সম্পদ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আব্বাস ইবন আবু মুত্তালিব, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ এবং আসীম ইবন আদী।

কিছু মানুষের কিছুই ছিল না, তবু তাদের যা আছে তা দিতে চেষ্টা করেছেন। এমন একজন ছিলেন আবু উকাইল ﷺ, তিনি হাজির হয়েছিলেন কেবল চারমুঠো খেজুর নিয়ে। মুনাফিকরা তাকে নিয়ে বললো, 'আরে! এই ক'টা খেজুর দিয়ে হবেটা কী! এই লোকের দান আল্লাহর কোনো দরকার নেই!' আর অন্যদিকে আবদুর রাহমান ইবন আউফকে নিয়ে তারা বললো, 'আরে সে তো লোক দেখানোর জন্য এত দান করে

বেড়াচ্ছে!' অন্যদিকে কিছু মানুষ ছিল যারা জিহাদে না যাওয়ার অজুহাত খুঁজছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হলো, আর তারা অপছন্দ করলো তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বললো, তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না। বলুন, জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝতো! অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনেক বেশি কাঁদবে।" (সূরা তাওবা, ৯: ৮১, ৮২)

দ্বীন নিয়ে হাসি ঠাট্টা: মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাকি কুফরি করার স্বাধীনতা?

জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনার দায়িত্বভার কারো কাছে অর্পণ করে যেতেন। তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার আমীর হিসেবে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহকে رضي الله عنه নিয়োগ করে যান । আর আলী ইবন আবু তালিবকে رضي الله عنه তাঁর নিজ পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান। মুনাফিকরা সবসময়ই সবকিছুর মাঝে দোষ খুঁজে বেড়াত। এবার তারা বলাবলি করতে লাগলো, 'মুহাম্মাদ আলীকে রেখে গেছে কারণ জিহাদের ময়দানে সে একটা বোঝা।' অথচ আলী رضي الله عنه ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা। স্বাভাবিকভাবেই এই কথাগুলো তাঁর খুব গায়ে লাগলো। আলী رضي الله عنه তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য নবীজির কাছে চলে গেলেন। আল্লাহর রাসূল ইতিমধ্যে তাঁর বাহিনী নিয়ে আল-জুরফ ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন।

আলী رضي الله عنه নবীজিকে ﷺ মুনাফিকদের মিথ্যাচারের কথা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীর رضي الله عنه মানসিক অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন,

> *'তারা তো মিথ্যে বলছে, আলী! আমিই তো তোমাকে আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রেখে এসেছি। কাজেই তুমি ফিরে যাও, আমার এবং তোমার পরিবারের দেখাশোনা করো। তুমি কি এটা ভেবে খুশি হও না যে, মূসার عليه السلام কাছে হারূন عليه السلام যেমন, আমার কাছে তুমি তেমন? পার্থক্য তো শুধু এতটুকুই যে আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না।'*

যখন মূসা عليه السلام আল্লাহ আযযা ওয়া জালের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন তখন বনী ইসরায়েলের তত্ত্বাবধান করার জন্য হারূনকে عليه السلام রেখে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহও ﷺ ঠিক সেভাবেই আলীকে رضي الله عنه দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই কথা ছিল সাহাবি হিসেবে আলীর رضي الله عنه জন্য এক বিশাল সম্মাননা। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ও আলীর সম্পর্ককে মূসা ও হারূনের عليهما السلام সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনাকে

শিয়ারা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে টেনে নেয়। তারা বলতে চায়, এই হাদীস দিয়ে প্রমাণিত হয় আল্লাহর রাসূল তাঁর মৃত্যুর পর আলীকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন। স্পষ্টতই এমন কিছুর ইঙ্গিত এই হাদীসে নেই। আলীকে ﷺ নবীজি ﷺ একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তা হলো তাঁর পরিবারকে দেখাশোনা করা। মদীনার অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা। শিয়াদের যুক্তি অনুসারে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাই নবীজির পরে খলিফা হওয়ার কথা! কিন্তু সে কথা কখনোই ওঠে না। শিয়ারা এই হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয় তাদের ভুল বিশ্বাসকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য। আহলুস সুন্নাহ এই ঘটনা থেকে সাহাবি হিসেবে আলী ইবন আবূ তালিবের ﷺ বিশেষ মর্যাদার ব্যাপারে শিক্ষা নেয়।

পুরো সীরাত জুড়েই জিহাদের ব্যাপারে মনোবল ভেঙে দেওয়া কথাবার্তা বলার অভ্যাস মুনাফিক্বদের মধ্যে দেখা যায়। তাবুকের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। কিছু মুনাফিক্ব বলাবলি করতে লাগলো, 'তোমাদের কি মনে হয় রোমানদের সাথে যুদ্ধ করা আর আরবদের সাথে যুদ্ধ করা একই কথা? ওদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তোমরা দড়িতে বাঁধা অবস্থায় ফিরে আসবে।'

জিহাদে রওনা হওয়া সেনাবাহিনী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা কখনোই ভালো অভ্যাস নয়। এ ধরনের কথা সৈনিকদের হৃদয়ে শত্রুদের ব্যাপারে আতঙ্ক জন্ম দেয়। তাদের এই গোপন কথাবার্তাগুলো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল নবীজিকে ﷺ জানিয়ে দেন। নবীজি তখন সেই লোকগুলোর ব্যাপারে আম্মার ইবন ইয়াসিরকে, বললেন, 'থামাও ওদের। ওরা যে কথা বলেছে, সেটা নিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করো। তারা তো নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে বলবে, তোমরা এই-এই কথা বলেছো।' আমর তাদের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমরা অমুক-তমুক কথা বলেছো, যাও আল্লাহর রাসূলের কাছে মাফ চেয়ে আসো।' তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললো, 'আমরা তো ঠাট্টা মশকরা করছিলাম মাত্র।' আল্লাহ তখন কুরআনের একটি আয়াত নাযিল করলেন,

> **"আর যদি আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা তো কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার।" (সূরা তাওবা, ৯: ৬৫-৬৬)**

এই আয়াতের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে, দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফর পর্যন্ত গড়াতে পারে। কেননা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেছেন, "ছলনা কোরো না, ঈমান আনার পর তোমরা কাফির হয়ে গেছো।" এই মুনাফিক্বরা বলাবলি করছিল

যে, মুসলিমরা রোমানদের সাথে লজ্জাজনকভাবে হেরে যাবে। তারা মুসলিমদের সামর্থ্য নিয়ে তামাশা করছিল। কুরআনের আয়াত বা হাদীস, আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা সাহাবি অথবা ইসলামের কোনো নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা খুবই বিপজ্জনক এবং তা কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটা নিফাকের চিহ্ন।

কাজেই কথার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া জরুরি। কিছু কৌতুক আছে যেগুলো কুরআনের আয়াত বা সূরা নিয়ে মজা করে, এগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ কৌতুক মনে হলেও এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা এগুলো অনেকসময় ধর্মদ্রোহিতার দিকে ধাবিত করতে পারে। দ্বীন ইসলাম একটি পবিত্র বিষয়। এই দ্বীনকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখা এবং এর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া মুসলিমদের দায়িত্ব। নিজেরা যেমন নিজেদের দ্বীনকে হেয় করা যাবে না, তেমনি অন্য কাউকেও সেই সুযোগ দেওয়া যাবে না।

এই আয়াতের শিক্ষা বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য। মুসলিমদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় এমন কিছু বলা বা প্রচার করা উচিত নয়। হতে পারে মুসলিমরা আসলেই দুর্বল, তাদের মাঝে অনৈক্য আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমনভাবে কোনো কথা বলা বা রটানো উচিত নয় যা মুসলিমদের মনোবল ভেঙে দেয়। মুসলিমদের অন্তরে এই ধারণা প্রবেশ করানো উচিত নয় যে, তোমাদের শত্রুরা অজেয়, ওদের সাথে তোমরা কখনো পেরে উঠবে না, তোমাদের কোনো শক্তি নেই, তোমরা দুর্বল, তোমাদের কোনো আশা নেই, কোনো ভবিষ্যত নেই, ইত্যাদি। দায়িত্ব হচ্ছে আশার বাণী সঞ্চার করা, উম্মাহকে উৎসাহ দেওয়া। উম্মাহকে মনে করিয়ে দিতে হবে তারা হলো মানবজাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতি। উম্মাহকে তাদের গৌরবময় অতীত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কুফফারের সামর্থ্য, শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে এবং মুসলিমদের মধ্যকার অনৈক্য নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা উচিত নয় যা মুসলিমদের মনোবলকে নষ্ট করে দেয়, তাদের হতোদ্যম করে দেয় এবং তাদের দুরবস্থাকে তাদের নিয়তি হিসেবে স্বীকার করিয়ে অলস বসিয়ে রাখে। কৌশলগত কারণে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে, তবে তা কখনোই যেন মুসলিমদের উদ্যমকে নষ্ট না করে।

যুদ্ধের ময়দানে

তাবুকের যুদ্ধ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো রোমান ব্যাটালিয়ন বা স্থানীয় আরব খ্রিস্টান কোনো বাহিনীর চিহ্নই দেখা গেল না। কোনো যুদ্ধই হলো না। কারণ রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের খবর রোমানদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। তাই তাদের আধুনিক সমরাস্ত্র আর বিরাট সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধের জন্য বের হয়নি। সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হতে তারা ভয় পেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবস্থান করে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু কেউই এল না। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শাম ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি শহর দখল করে তাদের সাথে চুক্তি করেন ও জিযিয়া গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাউমাতুল জান্দালের রাজা উকাইদকে বন্দী করে আনার জন্য খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ﷺ পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদকে বলেই দিয়েছিলেন, 'তুমি দেখবে উকাইদ গাভী শিকারে ব্যস্ত।' হলোও তাই। সেদিন ছিল এক পূর্ণিমার রাত। উকাইদ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল গাভী শিকারের জন্য। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ তাকে আক্রমণ করে বন্দী করলেন। উকাইদ জিযিয়া দিতে রাজি হলো। জারবা, আযরা, মাক্বনা -- এই অঞ্চলের খ্রিস্টানরা জিযিয়া দিতে রাজি হয় এবং ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে। এই ছোট ছোট রাজ্যগুলো ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়ায় ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা সুরক্ষিত হয় এবং এই অঞ্চলটি রোমান ও মুসলিমদের মাঝে 'বাফার জোন' হিসেবে কাজ করে। এই রাজ্যগুলো যদিও ইতিপূর্বে রোমানদের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু রোমানদের প্রতি তারা খুশি ছিল না। যে কারণে তারা বেশ সহজেই ইসলামের অধীনে চলে আসে। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদার সময়ে এই অঞ্চলগুলো থেকে রোমান সাম্রাজ্যের ওপর সামরিক হামলাগুলো পরিচালনা করা হয়।

তাবুকের যুদ্ধ ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনের সর্বশেষ বড় অভিযান। এই যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি পরীক্ষা।

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন নবীর ওপর, অনুগ্রহ করেছেন মুহাজির ও আনসারদের ওপর, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল। (এমনকি) যখন তাদের একটি দলের অন্তর বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল, অতঃপর আল্লাহ এদের সবার ওপর দয়া করলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।" (সূরা তাওবা, ৯: ১১৭)

এই আয়াত আল্লাহর রাসূলের জীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। কেননা ক্ষমা হলো এমন একটি ব্যাপার, যা সমাপ্তির দিকেই আসে। ইবাদাতের শেষ দিকেই আমরা সাধারণত ইস্তিগফার করি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমদেরকে জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আরও ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই সব আনসার ও মুহাজিরদের যারা কঠিন সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন।

ধ্বংসপ্রাপ্ত কাফির জাতিগুলোর প্রতি মুগ্ধতা নয়, করুণা

তাবুকের অভিযানে যাওয়ার পথে মুসলিমরা সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। সামূদ জাতি ছিল স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী এক জাতি। পাথর কেটে তারা বাসা বানাতো। নবী সালিহকে ﷺ প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন। তাদের রেখে যাওয়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে মুসলিমরা সে দিকে ছুটে যায়। সেখানের কূপগুলো থেকে পানি পান করতে থাকে। বিষয়টা জানতে পেরে আল্লাহর রাসূল ﷺ মোটেই পছন্দ করলেন না, বললেন,

'তোমরা এ সকল আযাবপ্রাপ্ত জাতির বাসস্থান থেকে পানি পান করো না এবং এখানকার রুটি নিজেরা খেয়ো না, বরং তা উটদের খাওয়াও কারণ এগুলো অভিশপ্ত। তোমরা এ সকল স্থানে যদি প্রবেশ করতেই চাও তবে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করো। যদি না কাঁদতে পার, তাহলে তাদের স্থানে প্রবেশ করো না। যেন তাদের মতো তোমাদের উপরেও শাস্তি না পৌঁছে যায়।'[114]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই এলাকার পানি ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। ঐ পানি দিয়ে প্রস্তুত করা রুটির মণ্ড উটদের খাইয়ে দিতে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাননি যে সামূদ বা তাদের ভূমি বা তাদের পানির সাথে সাহাবিদের কোনো সম্পৃক্ততা হোক।

প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদার কথা বলছেন। এর কারণ, এককালের প্রবল পরাক্রমশালী জাতিগুলোর নির্মম পরিণতি দেখে একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয় জেগে ওঠা উচিত। আল্লাহর গযবের ভয় এবং নিজের অসহায়ত্বের উপলব্ধি তাকে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করবে। তাদের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখে যদি কেউ বিমোহিত হয়, তাহলে সেসব স্থানে যাওয়াই উচিত নয়। কাফির সভ্যতাগুলোর এত প্রাচুর্য আর শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের কী পরিণতি হয়েছে -- শুধু সেই শিক্ষা আর উপলব্ধি নেওয়ার জন্যই এসব স্থানে যাওয়া যেতে পারে, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকবার জন্য নয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির সভ্যতার ব্যাপারে আমাদের সে রীতিই অবলম্বন করা উচিত যা রাসূল ﷺ শিখিয়ে দিয়েছেন, সেটি হলো তাদেরকে মুগ্ধতা নয়, করুণার চোখে দেখা।

আদিকালের মুশরিকদের ও আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত লোকদের এসব তথাকথিত সভ্যতার ব্যাপারে আমাদের গর্বিত হবার কোনো সুযোগ নেই। ব্যাবিলন, ফিরআউন কিংবা অন্যান্য কাফির সভ্যতাগুলো ছিল আল্লাহর শত্রু। মুসলিমরা এসব নিয়ে গর্ব করতে পারে না। ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াতের ইতিহাস ও সভ্যতা নিয়ে মুসলিমদের গর্ব করাটা খুবই দুঃখজনক একটি ব্যাপার। ইসলাম তাদের পরিচয়কে বদলে দিয়েছে এবং সম্মানিত করেছে। কাফিররা এটা অনেকক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবেই উল্লেখ করেছে যে, তারা চায় মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস পুনর্জীবিত হোক। এর ফলে ইসলামী ইতিহাসের সাথে তাদের দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে আর সেটাই হচ্ছে। এখন মুসলিমরা মমি বা ফিরআউনের পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ছবি তুলছে, পিকনিক করছে এবং পুরো বিষয়টা উপভোগ করছে। কিন্তু বিষয়টা মোটেও হালকাভাবে দেখার মতো নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ধ্বংসাবশেষগুলোকে রেখে দিয়েছেন, যেন মুসলিমরা সতর্ক হতে পারে। এই বাস্তবিক উপস্থাপনা এজন্যই যেন পবিত্র কুরআনে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার সচিত্র রূপ চাক্ষুষ সচেতন চোখ খুঁজে পায়।

---

[114] সহীহ বুখারি, অধ্যায় নবীদের কাহিনী, হাদীস ২৩। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় যুহদ এবং অন্তর কোমলকারী বিষয়, হাদীস ৪৭।

তাবুকের যুদ্ধে কিছু টুকরো ঘটনা

১) আবদুর রাহমান ইবন আউফের ﷺ ইমামতি

এই অভিযানে কোনো একটি ওয়াক্তে সালাত আদায় করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ দেরি করে ফেলেন। মুসলিমরা তাই সালাতের জন্য ইক্বামাত দেন। আবদুর রহমান ইবন আউফের ইমামতিতে সালাত আদায় শুরু হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে যোগ দিলেন, আবদুর রহমান চাইলেন সালাত থামিয়ে দিতে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আবদুর রহমান ইবন আওফের ﷺ পেছনেই সালাত আদায় শেষ করলেন। এর ফলে আব্দুর রহমান ইবন আউফ হলেন একমাত্র সাহাবি যার পিছে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এটি আব্দুর রহমান ইবন আউফের ﷺ একটি বিরাট মর্যাদা।

২) আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইনের ﷺ মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সম্মাননা

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তাবুকের যুদ্ধের সময় মাঝরাতে আমি একটি মশাল দেখতে পেলাম। তাই আমি সেটার পিছু নিলাম। কাছে গিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ﷺ ও উমারকে ﷺ দেখতে পেলাম। দেখলাম আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন আল মুজানী ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর এবং উমারকে বলছিলেন, তোমাদের ভাইকে কাছে নিয়ে আসো। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে কবরে শায়িত করে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, এই রাতে আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আপনিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।'

আবদুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, সহজ সরল ও অপরিচিত একজন সাহাবি। কিন্তু তার জানাযায় ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ, আবু বকর এবং উমার। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ এই দৃশ্য দেখে বলেন, 'ইশ! এটা যদি আমার কবর হতো!' আল্লাহর রাসূল ﷺ একজন শহীদকে এতটাই সম্মান দিয়েছিলেন যে অন্য সাহাবিরাও ঈর্ষান্বিত হতেন।

৩) 'সে একা এসেছে, একাই চলে যাবে, আর একাই উত্থিত হবে।'

মুসলিম সেনাবাহিনী সুনায়াতুল-ওয়াদা নামক স্থানে পৌঁছানোর পর আল্লাহর রাসূল ﷺ পুরো বাহিনীর বিভিন্ন ভাগের জন্য কমান্ডার নিযুক্ত করে তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন। এই অভিযানে গাইড ছিলেন ইলক্বিমাহ ইবন আল-ফাঘওয়াহ। আব্বাস ইবন বিশর ছিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে।

তাবুকের যুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদের দিকে গণ-আহবান করা হয়েছিল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'তে বিশ্বাস করে এমন প্রত্যেক মুসলিম এই আহবানে সাড়া দেয়। তবে অল্প কিছু লোক বাদে। সবার জন্য অপেক্ষা করাও যৌক্তিক ছিল না। যখনই রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলা হতো, 'অমুক যুদ্ধে আসেনি', তখন রাসূলুল্লাহ বলতেন, 'তার কথা বাদ দাও।

তার মধ্যে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে তোমাদের পথ অনুসরণ করাবেন। আর যদি ভালো কিছু না থাকে, তাহলে আল্লাহ তার হাত থেকে তোমাদের রেহাই দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ যখন বলা হলো, 'আবু যার আমাদের সাথে আসেননি,' তখনও তিনি একই কথা বললেন।

আবু যার ﷺ হচ্ছেন আবু যার আল-গিফারী। তাঁর কথা এর আগেও আলোচনা হয়েছে। তিনি বেশ প্রথমদিকের একজন মুসলিম। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি গিফার গোত্রে ফিরে যান এবং তাঁর দাওয়াহর বদৌলতে গিফার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। হিজরতের পর তিনি আর তাঁর গোত্র মদীনায় চলে আসেন।

অগ্রগামী মুসলিম হিসেবে আবু যার তাবুকে অংশ নেবেন, এটাই ছিল কাম্য। কিন্তু তাকে দেখা গেল না। আসলে আবু যার মূল বাহিনীর পেছনেই ছিলেন, কিন্ত তাঁর উটটি ছিল ধীরগতির। তাই তিনি পিছিয়ে পড়েন। অনেকটা পিছিয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে উট থেকে নেমে গিয়ে তপ্ত মরুভূমির বুকে হেঁটেই রওনা দেন। মুসলিমরা দেখতে পেল, দূর দিগন্তে একজন মানুষ, একা হেঁটে আসছে! তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটা যেন আবু যার হয়!' আসলেই তা-ই! সে মানুষটি কাছে এলে দেখা গেল তিনি আর কেউ নন, আবু যার ﷺ। আবু যারের ﷺ আগমনের কথা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালো হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ আবু যারের ﷺ উপর রহমত বর্ষণ করুন। সে একা এসেছে, একাই চলে যাবে, আর ক্বিয়ামতের দিনে তাঁকে একাই উত্থিত করা হবে।'

আল্লাহর রাসূলের ﷺ এই ভবিষ্যতবাণী আক্ষরিক অর্থেই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল বেশ কিছু বছর পর। তখন উসমান ইবন আফফানের ﷺ খিলাফতকাল। মুসলিম সাম্রাজ্য অঢেল বিত্ত-বৈভব অর্জন করেছে। আবু যার ছিলেন খুব সাদাসিধে একজন মানুষ। বড় হয়েছিলেন কঠিন মরু এলাকায়। স্বভাবে তিনি ছিলেন কিছুটা রাগী এবং কঠোর প্রকৃতির। তিনি ছিলেন একজন যাহিদ-দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি, কঠোরভাবে যুহদ করতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, মুসলিমদের প্রয়োজনের বেশি সম্পদ জমা করা হালাল নয়। তিনি মনে করতেন যা কিছু প্রয়োজনের চাইতে বেশি তা দরিদ্রদের দান করা ও অন্যান্য ভালো কাজ ব্যয় করতে হবে। যদিও শক্তিশালী অভিমত হলো, একজন ব্যক্তি তার সম্পদের উপর যাকাত দেওয়ার পর বাকি সম্পদ তার জন্য হালাল হবে এবং সে চাইলে এটা জমা করতে ও রেখে যেতে পারে -- এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। সম্পদ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার অনুমোদন যদি ইসলামে না-ই থাকতো, তাহলে মীরাস বা উত্তরাধিকারের বিধানগুলো থাকার কোনো অর্থই নেই।

যা-ই হোক, আবু যারের ﷺ যুহদ ছিল এতটাই কঠোর যে জনগণ ও শাসন কর্তৃপক্ষের সাথে তার ঠিকমতো বনিবনা হচ্ছিলো না। উসমানের ﷺ খিলাফতকালে আবু যার শামে ছিলেন। তখন মুআবিয়া ﷺ ছিলেন শামের গভর্নর। রোমানদের সাথে তখন জিহাদ চলছিল, তাই শাম হয়ে উঠে গনিমতের আধার। আর শাম এমনিও বেশ

বরকতময় একটি জায়গা। প্রবল বিত্ত-বৈভবের প্রবাহে আবু যার ﷺ খুশি ছিলেন না। তিনি জনগণকে বকাঝকা করতেন। তারা সম্পদ জমা করতো, সে কারণে তাদের তিরস্কার করতেন। বিষয়টা জনমনে অসন্তোষের জন্ম দেয়। তাই গভর্নর মুআবিয়া ﷺ খলিফা উসমানকে চিঠি দিয়ে আবু যারের ﷺ ব্যাপারে অভিযোগ করে জানালেন তার জন্য শামের স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটছে।

উসমান তখন আবু যারকে ﷺ মদীনায় ফিরে আসতে বলেন। কেননা শাম আসলে আবু যারের জন্য উপযুক্ত জায়গা ছিল না। আবু যার শাম ত্যাগ করে মদীনায় ফিরে এলেন। উসমান ইবন আফফান বললেন তিনি চাইলে মদীনায় থাকতে পারেন। কিন্তু আবু যার বললেন, 'আপনাদের দুনিয়ার সাথে আমি কোনো সম্পর্কই রাখতে চাই না। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন। আমাকে আর-রাবদাতে যেতে দিন।'

আর-রাবদাহ মদীনার কাছেই মরুভূমিতে ছোট্ট একটি গ্রামের মতো। উসমান আবু যারকে ছেড়ে দিলেন, জোরাজুরি করলেন না। তিনি এতটাই দুনিয়াবিমুখ ছিলেন যে মুসলিমদের দুনিয়াবী সমৃদ্ধি হবে -- এই দৃশ্য তার একেবারেই ভালো লাগছিল না। উসমান তাকে বললেন, 'আমি আপনাকে কিছু উট দিতে চাই।' আবু যার বললেন, 'না আমি এসব চাই না। আমি নিজে নিজের মতো চলতে পারবো।' আবু যার ﷺ আর-রাবদায় চলে গেলেন এবং সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

আবু যার একা একা জীবন কাটাতে লাগলেন, আল্লাহর ইবাদাতে ডুবে থাকলেন। একসময় তার মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। মৃত্যুশয্যায় তখন মরুভূমির মাঝখানে তাঁর সাথে ছিলেন শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী এবং সেবক। কোনো প্রতিবেশি বা বন্ধুবান্ধব ছিল না। যে মহান সাহাবি একসময়ে ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ সঙ্গী, আবু বাকর, উমার ও উসমানের ﷺ সময়ে তিনি ছিলেন একজন আলিম, একজন মুফতি -- অথচ দুনিয়া ত্যাগ করার সময় তিনি আজ সম্পূর্ণ একা। কোনো ছাত্র বা বন্ধু -- কেউই নেই। তাঁর স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। আবু যার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছো কেন?' স্ত্রী উত্তর দিলেন, 'তুমি কীভাবে আশা করো আমি কাঁদবো না? তুমি মারা যাচ্ছো আর তোমাকে দাফন করার মতো কিছুই আমার নেই। তোমাকে একা দাফন করার মতো শক্তিও আমার নেই।'

আবু যার তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কেঁদো না, আমি এক জমায়েতে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে একজন এক শূন্য ভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং তাঁর দাফন প্রত্যক্ষ করবে মু'মিনদের একটি দল। সেই জমায়েতের আমি ছাড়া সবাই মারা গেছে। তারা সকলেই দলবদ্ধ ছিলেন। কাজেই আমিই সেই ব্যক্তি যে একা একা মৃত্যুবরণ করে হাদীসটিকে সত্য প্রমাণ করবো। তুমি বরং বাইরে যাও আর গিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রাখো। যখন আমি মারা যাবো, আমাকে গোসল দিও, কাফনে ঢেকে দিও। আর আমাকে রাস্তার ওপাশে রেখে এসো। যে মুসাফির দলের সাক্ষাৎ তুমি পাবে, তাদেরকে বলবে, এ হচ্ছে আবু যার...'

আবু যার ﷺ একদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। তার স্ত্রী এবং সেবক তার কথামতো সবকিছু করলেন। তার স্ত্রী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন একটি কাফেলা আসবে এবং তার স্বামীকে দাফন করবে। অবশেষে একটি কাফেলা এল। সেই কাফেলাটি আসছিল কুফা থেকে, সেখানে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ যখন জানলেন, এটা আবু যারের ﷺ লাশ, তখনি তার মনে পড়ে গেল আল্লাহর রাসূলের ﷺ সেই হাদীস। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল সত্যই বলেছিলেন: আবু যার ﷺ একা এসেছে, একাই যাবে আর একাই পুনরুত্থিত হবে।' এরপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আবু যারের ﷺ জানাযায় ইমামতি করলেন। আবু যারের ﷺ দাফন সম্পন্ন হলো।

আবু যার ﷺ ক্ষমতা আর নেতৃত্বকে তীব্রভাবে অপছন্দ করতেন। একবার আবু মূসা আল-আশআরী ﷺ তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। আবু যার ﷺ তখন ঘরের কাজ করছিলেন। ভাই হিসেবে তাকে সাহায্য করতে গেলে আবু যার ﷺ তাকে বলেন, 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।' আবু মূসা ﷺ বললেন, 'আমি তো তোমার ভাই!' আবু যার ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন, 'না! নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত তুমি আমার ভাই ছিলে!' আমীর হিসেবে নিযুক্ত বা সরকারি কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তি থেকে আবু যার ﷺ দূরত্ব বজায় রাখতেন।

আবু যারের ﷺ মতো জীবনযাপন করা হয়তো এখন সম্ভব নয়। কিন্তু নিজেদের অবস্থাকে আবু যারের জীবনের সাথে অন্তত তুলনা করে দেখা সম্ভব। এখন মুসলিমদের জীবনে প্রাচুর্য আছে, জীবনের নিরাপত্তা আছে, আছে সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্য। আবু যারের সেসব কিছুই ছিল না। কাফনের জন্য একটুকরো ভালো কাপড়ও ছিল না। কিন্তু ছিল তাকওয়া, যা এখন দুর্লভ। তাই মুসলিমদের আজ সব থেকেও নেই।

৪) আবু খাইসামার ﷺ কাহিনী

পিছিয়ে থাকা সাহাবিদের মধ্যে আরও একজন ছিলেন আবু খাইসামা আল-আনসারী ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্য মুসলিমরা যখন অভিযানে, আবু খাইসামা তখন বসে আছেন *'আরিশে।'* আরিশ গাছের ডাল দিয়ে বানানো একধরনের বিশেষ কুঁড়েঘর। গরমকালে সেই ঘরের উপরে পানি ঢালা হলে তা শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যেত। বলা যেতে পারে আরিশ ছিল প্রাকৃতিক এয়ারকন্ডিশনার। তাঁর দুই ঘরে ছিল দুইজন স্ত্রী। আবু খাইসামা ﷺ ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর স্ত্রীরা তাঁর জন্য খাবার পানীয় প্রস্তুত করে রেখেছেন।

হঠাৎ তার মনে হলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল তপ্ত সূর্য আর গরম বাতাসে বসে আছেন আর আবু খাইসামা বসে আছে সুশীতল ছায়ায়, সুস্বাদু খাবার আর সুন্দরী স্ত্রীদের সাথে! এ হতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমি এই দুই ঘরের একটিতেও প্রবেশ করবো না যতক্ষণ না আমি আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করি। কাজেই তোমার আমার জন্য আমার রসদ প্রস্তুত করো।'

তার স্ত্রীরা তার জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে দিলেন। আবু খাইসামা ﷺ উটের পিঠে চড়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান । যাত্রাপথে উমায়ের ইবন ওয়াহাবকে ﷺ সঙ্গী হিসাবে পেয়ে যান । উমায়ের ﷺ সম্ভবত মক্কা থেকে আসছিলেন বা অন্য কোনো কারণে তার দেরি হয়। তাবুক গিয়েই তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাফেলার দেখা পান। আবু খাইসামা উমায়েরকে ﷺ অনুরোধ করলেন যেন তিনি একা গিয়ে প্রথমে আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলতে পারেন। উমায়ের ﷺ তার অনুরোধ রাখলেন।

দূর থেকে সাহাবিরা দেখলেন, কেউ একজন আসছে! আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'এটা যেন আবু খাইসামাই হয়!' আবু খাইসামা ﷺ কাছে এলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি তো নিজেকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলে, আবু খাইসামা!' আবু খাইসামা ﷺ এরপর রাসূলুল্লাহকে ﷺ পুরো ঘটনা খুলে বলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। একজন আদর্শ নেতা হিসেবে তাঁকে সাবধান করলেন এবং তাঁর প্রতি দয়াও করলেন।

আবু খাইসামার ﷺ কাহিনী থেকে শিক্ষা হলো, একজন মুসলিম হোঁচট খায়, কিন্তু হোঁচট খেয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। একজন মুসলিম ভুল করে, কিন্তু তার বিবেক তাকে শোধরাতে বাধ্য করে। একজন মুসলিম দ্বীনের মধ্যে পিছিয়ে পড়ে, কিন্তু সে অনুশোচনা করে আর সেই অনুশোচনা তাকে দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়।

> **"আল্লাহ তাআলাকে যারা ভয় করে, যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা কখনো তাদের স্পর্শ করে, তবে সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের চোখ খুলে যায়।" (সূরা আরাফ, ৭: ২০১)**

মাসজিদ আদ-দ্বিরার

মুনাফিকদের মাসজিদ

মদীনা থেকে রওনা হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহকে ﷺ একটি নবনির্মিত মসজিদে সালাত পড়ার জন্য আহবান করা হয়েছিল। মদীনার পাশের কিছু লোক মসজিদটি নির্মাণ করেছিল। তারা নবীজিকে ﷺ বললো, 'আমরা চাই এই মসজিদে সালাত আদায় করে আপনি একে বরকতময় করে তুলুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'এখন তো আমরা সফরে আছি। যখন আমি ফিরে আসবো, ইনশাআল্লাহ তখন সালাত আদায় করবো।'

এই মসজিদের কাহিনী সম্পর্কে জানার আগে আবু আমীর সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সে ছিল খাযরাজ গোত্রের এক বিশিষ্ট নেতা। জাহিলিয়াতের সময়ে তার নাম ছিল আবু আমীর আর-রাহীব। রাহীব মানে পাদ্রী, কারণ সে ছিল আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক। সে

খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। খাযরাজের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও সে তার ধর্মেই অটল থাকে। শুরু থেকেই তার ছিল প্রবল ইসলামবিদ্বেষ। উহুদের যুদ্ধে সে ছিল কুরাইশ পক্ষের শক্তি। তার খনন করা গর্তে পড়েই আল্লাহর রাসূলের ﷺ দাঁত ভেঙে গিয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ থেকে কিছু লোহার টুকরা উনার গালের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিল না। এই অবস্থায় সে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হিরাক্লিয়াসের সাথে দেখা করতে যায় এবং মদীনা দখল করার জন্য তাকে সেনাবাহিনী পাঠাতে আহবান করে। হিরাক্লিয়াস তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে কথা দেয়।

আবু আমীর প্রায়ই মদীনায় তার বন্ধু মুনাফিক্বদের চিঠি লিখে আশ্বাস দিতো যে ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সে সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হবে। সে তাদেরকে অনুরোধ করলো তারা যেন নিজস্ব একটি ঘাঁটি তৈরি করে যেখানে বসে তারা নিজেদের এজেন্ডা ছড়িয়ে দিতে পারবে, ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরি করবে, নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ও যোগাযোগ রক্ষা করবে। তার চিঠির সূত্র ধরে মুনাফিক্বরা মসজিদে কুবার পাশে নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এই মসজিদে সালাত আদায় করতেই নবীজিকে ﷺ আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের যুক্তি ছিল শীতের দিনে দুর্বল ও অসুস্থ লোকেরা যেন ঘরের কাছে সালাত আদায় করতে পারে সেজন্য তারা মসজিদটি নির্মাণ করেছে। এ মসজিদ নিয়ে যেন কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয় এজন্য তারা আল্লাহর রাসূলকে সেখানে সালাত আদায় করতে অনুরোধ করে। কারণ আল্লাহর রাসূলের সালাত আদায় করার অর্থ সেই মসজিদকে বৈধতা দেওয়া। নতুন নির্মাণকৃত মসজিদটি ছিল মুনাফিক্বদের একটি ঘাঁটি।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল সেখানে কখনোই সালাত আদায় করেননি। তাবুক থেকে মদীনায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ওয়াহীর মাধ্যমে মুনাফিক্বদের এই পরিকল্পনা প্রকাশ করে দেওয়া হয়।

> "(মুনাফিক্বদের মধ্যে) যারা (তোমাদের ক্ষতি সাধন করার জন্য) মাসজিদ দ্বিরার নির্মাণ করেছে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করা, মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং আগে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, তাদের জন্য ঘাঁটি প্রস্তত করা। তারা তোমাদের কাছে কসম খেয়ে বলবে যে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (এটা) করিনি। আল্লাহ তাআলা নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।
>
> তুমি (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) কখনো সেখানে দাঁড়াবে না। তোমার তো দাঁড়ানো উচিত সেখানে, যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে রয়েছে এমন কিছু লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।" (সূরা তাওবা, ৯: ১০৭-১০৮)

আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ এই মসজিদে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। বরং এমন মসজিদে সালাত আদায় করতে বলেছেন যেটা প্রথম থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে মু'মিনরা থাকে, যারা পবিত্র হতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর এই মসজিদকে আগুনে পুড়িয়ে মাটির সাথে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন।

> "যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির ওপর -- সে ব্যক্তি উত্তম, নাকি সেই ব্যক্তি, যে তার ঘরের ভিত্তি দাঁড়া করিয়েছে কোনো গহবরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম এবং যা তাকে সহ অচিরেই জাহান্নামের গিয়ে পড়বে? আর আল্লাহ জালিমদের পথ দেখান না। তাদের নির্মিত ঘরটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা, ৯: ১০৯-১১০)

মসজিদ আল-দ্বিরারের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) মসজিদ আদ-দ্বিরার প্রতিষ্ঠা করেছিল মুনাফিক্বরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই মসজিদের মাধ্যমে তাদের ইসলামবিদ্বেষী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ দিয়ে সেখানে সালাত আদায় করিয়ে তাদের এই কার্যক্রমের বৈধতা আদায় করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এই মসজিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন -- দুররান ওয়া কুফরান ওয়া তাফরিক্বান। অর্থাৎ এটা এমন এক মসজিদ যা ক্ষতিসাধন করে, কুফরি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

খোদ আল্লাহর রাসূলের ﷺ যুগেই যদি মুনাফিক্বরা এমন কাজ করার সাহস করে, তাহলে বর্তমান যুগে এই ফিতনার স্বরূপ কী হতে পারে তা অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে সরকার ও রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রভাব খাটানোর জন্য মসজিদগুলোকে ব্যবহার করছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য আলিমদের ব্যবহার করে ফতোয়া প্রদান করাচ্ছে। কাজেই, বর্তমান সময়ের কোনো মসজিদ যদি কাফিরদের এজেন্ডা প্রচার করে, তাহলে সেটিও মসজিদ আল-দ্বিরারের সমতুল্য। দ্বীনের শত্রুদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক হতে হবে।

২) *আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা* -- অর্থাৎ, কাফিররা এক মিল্লাত বা এক জাতি। আবু আমীর ছিল একজন খ্রিস্টান। আক্বীদার বিচারে খ্রিস্টধর্ম ইসলামের কাছাকাছি, কারণ খ্রিস্টধর্ম মূলত তাওহীদবাদী একটি ধর্ম। যদিও খ্রিস্টানরা তাওহীদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখেনি। সে তুলনায় মুশরিকদের আক্বীদা মৌলিকভাবে শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একজন খ্রিস্টান হয়েও আবু আমীর মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করেছে এবং মুশরিকদের আপন করে নিয়েছে। আল্লাহর রাসূল তার নাম বদলে রেখেছিলেন আবু আমীর আল-ফাসিক্ব, কারণ সে ছিল নীতিহীন, পথভ্রষ্ট একটি লোক।

তাবুকের অভিযান থেকে শিক্ষা

যাদ আল মাআদ কিতাবে ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তাবুকের অভিযান থেকে কিছু কল্যাণকর শিক্ষার কথা তুলে ধরেন।

১) যদি ইমাম (খলিফা) যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন তাহলে তাতে সাড়া দেওয়া প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। ইমাম অনুমতি দিলেই পেছনে বসে থাকার অনুমতি আছে। যে তিনটি ক্ষেত্রে জিহাদ করা ফরয হয়, এর মধ্যে এটি একটি। বাকি দুটো ক্ষেত্র হলো যখন শত্রুরা মুসলিম ভূমি দখল করে আর যখন দুটি সৈন্যদল ময়দানে মুখোমুখি হয়।

২) জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রে জান ও মাল দুটো দিয়েই সমর্থন করা বাধ্যতামূলক। কারণ, কুরআনে যখনই জিহাদের কথা এসেছে, জান ও মাল দুটোর কথাই এসেছে এবং শুধুমাত্র একটি আয়াত ছাড়া প্রতিবারই মালের কথা জানের আগে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি একজন যোদ্ধাকে অর্থায়ন করে, সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো।' যাদেরই আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে তাদেরই জিহাদের পেছনে অর্থায়ন করা বাধ্যতামূলক, যেভাবে জান দিয়ে জিহাদ করা বাধ্যতামূলক। কারণ জিহাদ তখনই সফল হয়, যখন যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্যবাহিনী ও অর্থায়ন মজুদ থাকে। কেউ যদি যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়, তার জন্য সম্পদ দিয়ে জিহাদে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক। তার কোনো অজুহাতই প্রযোজ্য হবে না যতক্ষণ না সে প্রমাণ করেছে সে সম্পদ দিয়ে জিহাদ করতে অসমর্থ।

৩) সামূদের কূপের পানি পান করা, সে পানি ব্যবহার করে রান্না করা, রুটির মণ্ড তৈরি করা বা তাতে অযু করা জায়েজ নয়। কারণ হলো এদের ওপর আল্লাহ তাআলার গজব আপতিত হয়েছে। কেউ যখন আল্লাহর শাস্তিপ্রাপ্ত জনপদের স্থান বা বাসস্থানের পাশ দিয়ে যায় তখন তাতে প্রবেশ করা উচিৎ নয় বা সেখানে অবস্থান করা উচিৎ নয়। যত দ্রুত সম্ভব সেটা পার হয়ে যেতে হবে এবং যতক্ষণ না সেই স্থান পার হচ্ছে ততক্ষণ মুখ ঢেকে রাখা উচিৎ। মূল কথা হলো, এরকম স্থান যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিৎ, অথবা কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করা উচিত। শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া এ ধরনের স্থানে প্রবেশ করা উচিৎ নয়।

পেছনে থেকে একজন যাওয়া মু'মিন: কা'ব ইবন মালিকের ﷺ ঘটনা

একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলে তাবুকের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ঘটনাটি ইতিহাসে কা'ব ইবন মালিকের হাদীস ﷺ নামে পরিচিত। কাহিনীটি সহীহ বুখারী এবং সীরাহর অন্যান্য কিতাবে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এই কাহিনী বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। কেননা এখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন

সম্মানিত সাহাবির জীবনের এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও রয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে একজন নিবেদিত সাহাবির ঘটনা। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় সদা প্রস্তুত এক অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু মানবিক ভুলের কারণে, নফসের ধোঁকায় পড়ে কেবল একবারই তিনি আল্লাহর রাস্তায় পিছিয়ে পড়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর সৎকর্ম, তারবিয়্যাহ আর ঈমানের জোরে এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পান। কা'ব ইবন মালিকের ﷺ এই কাহিনী সবচেয়ে চমৎকারভাবে বর্ণিত আছে তাঁর নিজের ভাষ্যেই। তাঁর উদ্ধৃতিতেই ঘটনাটি জেনে নেওয়া যাক।

'আল্লাহর রাসূল ﷺ যতগুলো অভিযান পরিচালনা করেছেন, তার মধ্যে তাবুক ছাড়া আর কোনো অভিযানে আমি পেছনে পড়ে থাকিনি। তবে হ্যাঁ, বদরে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি সত্যি, তবে বদরে যারা অংশ নেয়নি, তাদের কাউকে আল্লাহর রাসূল ﷺ সমালোচনা বা নিন্দা করেননি। কারণ বদরের অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক যুদ্ধের নিয়তে বের হননি, উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের কাফেলা আক্রমণ করা। কিন্তু আল্লাহ দুই বাহিনীকে মুখোমুখি করেন। যদিও তাদের কারোরই যুদ্ধের কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। তবে আমি আকাবার রাতে উপস্থিত ছিলাম। সে রাতে আমরা আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইয়াত দিয়েছিলাম। সত্যি বলতে, আমাকে যদি আকাবার বিনিময়ে বদরে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, আমি রাজি হতাম না, যদিও আকাবার রাত থেকে বদর যুদ্ধ মানুষের কাছে অনেক বেশি বিখ্যাত।

তাবুকের অভিযানে আমার সামর্থ্যের কোনো কমতি ছিল না। অতীতের যেকোনো সময়ের চাইতে সেবারের অবস্থা ছিল ভালো। সেবার আমার মালিকানায় দু-দুটো সাওয়ারী উট ছিল। এর আগে কখনো এমন ছিল না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন কোনো অভিযানে যেতেন, সাধারণত তিনি তাঁর আসল গন্তব্য প্রকাশ করতেন না। ভান করতেন অন্য কোথাও যাচ্ছেন। কিন্তু তাবুকের অভিযানে ঘটনা ছিল ভিন্ন। সেটা ছিল প্রচণ্ড গরমের মৌসুম। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে আর মুখোমুখি হতে হবে এক বিশাল সেনাবাহিনীর। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ সে অভিযানের গন্তব্য সম্পর্কে আগেভাগেই মুসলিমদের জানিয়ে দেন যেন তারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারে। তিনি অভিযানের গন্তব্য পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন।

আল্লাহর রাসূলের সাথে সেইবার ছিল অনেক, অনেক মুসলিম। তখন কোনো দিওয়ান (রেজিস্ট্রি ব্যবস্থা) ছিল না। তাই কেউ যদি অভিযানে না গিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইত, সেটা জানাজানি হওয়ার মতো কোনো ভয় ছিল না। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী এসে বিষয়টা প্রকাশ করে দিলে সেটি ভিন্ন কথা।

তখন ফল পেকে এসেছে। গাছের মনোরম ছায়ার নিচে বসে উপভোগ করার উপযুক্ত সময়। এমন সময়েই মুসলিমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। আমিও তাদের সাথে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্যত হলাম। কিন্তু কেন যেন কাজ এগোচ্ছিল

না। আজ না কাল করতে করতে প্রতিদিনই নিজেকে বলতাম, আরে, আমি তো পারবো, এটা কোনো ব্যাপার না।

এভাবে দিন যেতে থাকে আর আমি দেরি করতে থাকি। ওদিকে বাকিরা নিজেদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর মুসলিম বাহিনী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু আমি তখনো প্রস্তুতির কিছুই করিনি। নিজেকে প্রবোধ দিলাম, দুই-একদিনের মধ্যেই সবকিছু গোছগাছ করে রওনা হয়ে যাবো আর মাঝপথে তাদের সাথে যোগ দেবো। তারা বেরিয়ে পড়লো। আমি প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বের হলাম, কিন্তু আগের মতোই কাজের কাজ কিছু না করে বাড়ি ফিরে এলাম। আমি পরদিন সকালে আবার বের হলাম। আবারও তেমন কোনো কাজ না এগিয়েই বাড়ি ফিরে আসলাম, কিছুই করা হলো না। এভাবে গড়িমসি করে দিন যেতে থাকলো। ততদিনে তারা বেশ কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। আমি তখনও ভাবছিলাম আমি বের হয়ে পড়ব আর তাদের ধরে ফেলব। ইশ! আমি যদি তা-ই করতাম!

কিন্তু সেটা আমার তাক্বদীরে ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে যাওয়ার পর তখন মদীনায় ছিল শুধু দুর্বল আর অক্ষম পুরুষেরা। এদেরকে আল্লাহ আগেই অব্যাহতি দিয়েছিলেন। আর ছিল মুনাফিকের দল। রাস্তায় বের হলে এদের দেখে আমি দুঃখে শেষ হয়ে যেতাম।

তাবুকে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার কথা স্মরণ করেননি। তাবুকে পৌঁছার পর হঠাৎ এক মজলিসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাবের কী হয়েছে? বনু সালামার (কাবের ﷺ গোত্র) এক লোক উত্তর দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুনিয়ার মায়া তাকে আটকে দিয়েছে। সে বসে থেকে ডানে-বাঁয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। (অর্থাৎ, সে মুগ্ধ নয়নে তার সম্পদের দিকে চেয়ে বসে আছে, ধনসম্পদ আর আত্মগরিমা তাকে আসতে দেয়নি)

মুআয ইবন জাবাল ﷺ বললেন, কী বাজে কথা বলছো! ইয়া আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তো কা'ব সম্পর্কে ভালো কথাই জানি। আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছুই বললেন না, চুপ করে রইলেন।

পরে যখন জানতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার দিকে ফিরে আসছেন, তখন আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, কোনো একটা মিথ্যা অজুহাত দিয়ে পার পেয়ে যাবো। নিজেকে বললাম, কীভাবে আল্লাহর রাসূলের রাগ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। পরিবারের জ্ঞানীগুণী সদস্যদের সাথে পরামর্শ করলাম। কিন্তু যখনই শুনলাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রায় চলে এসেছেন, আমার মাথা থেকে মিথ্যা বলার চিন্তা দূর হয়ে গেল। ভাবলাম, মিথ্যা বলে এই অবস্থা থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সত্য কথাই বলব।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ এসে পৌঁছলেন। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি সবসময় আগে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাআত সালাত আদায় করতেন। তারপর সেখানে মানুষজনের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। যারা পেছনে পড়ে ছিল, তারা সবাই আসলো। আল্লাহর রাসূলের কাছে জিহাদে না যাওয়ার অজুহাত পেশ করলো আর আল্লাহর নামে কসম করা শুরু করলো। সব মিলিয়ে এমন অজুহাতকারীর সংখ্যা ছিল ৮৩ থেকে ৮৯ জন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বাহ্যিক অজুহাত গ্রহণ করে নিয়ে তাদের জন্য মাফ চেয়ে আল্লাহর দুআ করলেন। আর তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন।

আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ দিকে এগিয়ে গেলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে শুষ্ক হাসি হাসলেন। কিন্তু সে হাসির মধ্যে রাগ ছিল। বললেন, এদিকে আসো। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি থেকে গিয়েছিলে কেন? তুমি কি সাওয়ারী কেনোনি?

বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ যদি আপনার বদলে দুনিয়ার অন্য কারো সামনে বসতাম, আমি জানি তাকে যেকোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে পার পেয়ে যেতাম। সত্যি বলতে, আমি কথাবার্তায় বেশ পারদর্শী আর ভালো তর্ক করতে জানি। আমি যদি আজ আপনাকে মিথ্যা বলি, হয়তো সাময়িকভাবে আপনি আমার ওপর খুশি হবেন, কিন্তু সেইদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আল্লাহ আপনাকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আপনাকে সত্যটা বলি, তাহলে আপনি হয়তো আমার ওপর নাখোশ হবেন। কিন্তু আমি আশা করি আল্লাহ আমার সত্যবাদিতার জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। নাহ, এই জিহাদে না যাওয়ার পেছনে আমার গ্রহণযোগ্য কোনো অজুহাত ছিল না। শক্তি আর সামর্থ্যের কথা যদি বলি, এই অভিযানের সময়টায় আমি যতটা শক্তিশালী আর সামর্থ্যবান ছিলাম, তা আর কখনোই ছিলাম না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তুমি সত্য কথাই বলেছো। কাজেই তুমি উঠে দাঁড়াও এবং আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। বনু সালামার কিছু লোক বেশ উত্তেজিত হয়ে গেল। তারা আমাকে বললো, তোমাকে তো এর আগে কখনো আমরা গুনাহ করতে দেখিনি। তুমি তো চাইলেই অন্যদের মতো একটা অজুহাত পেশ করতে পারতে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমার জন্য জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে দুআ করলে তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যেত। তারা আমার সমালোচনা করতেই থাকলো। এক পর্যায়ে আমি ভাবলাম -- আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে ফিরে গিয়ে কোনো একটা অজুহাত পেশ করি আর আগের স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিই।

কিন্তু আমি তার আগে তাদের জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আমার মতো আর কেউ আছে যারা একই কাজ করেছে? তারা বললো, হ্যাঁ, আরও দু'জন আছে তোমার মতো। তাঁরাও রাসূলুল্লাহকে একই কথা বলেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ সেই দু'জনকেও একই

উত্তর দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই দু'জন কারা? তারা বললো, মুরারাহ ইবন আর-রাবী ও হিলাল ইবন উমাইয়্যা।

এই দুইজন ছিল আল্লাহর নেককার বান্দা। তারা বদরে অংশ নিয়েছিল। আমি তাদেরকে নিজের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করলাম। আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে ফিরে গিয়ে মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা বাদ দিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলার ব্যাপারে সব মুসলিমদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল আমাদের তিনজনের ওপরই আরোপ করা হয়। বাকি যারা জিহাদে না গিয়ে পেছনে পড়ে ছিল, তাদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

আমরা মানুষজন থেকে দূরে দূরে থাকলাম আর আমাদের প্রতি তাদের আচরণ কেমন যেন হয়ে গেল। নিজ ভূমে হয়ে গেলাম পরবাসী। সবকিছুকে কেমন যেন অপরিচিত ঠেকত, এই দেশ যেন আর আমার নয়!

আমার অন্য দুই সাথী হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে কান্নাকাটি করতো। আমি ছিলাম তিন জনের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট আর শক্তমনের। আমি ঠিকই বের হতাম, মসজিদে জামাআতে সালাত আদায় করতাম, বাজারে ঘুরাঘুরি করতাম। কিন্তু কেউই আমার সাথে কথা বলতো না। এমনকি আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছেও যেতাম। সালাতের পর যখন তিনি অন্যদের সাথে বসতেন, আমি তাঁকে সালাম দিতাম। তাঁর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতাম তিনি আমার সালামের জবাব দিচ্ছেন কি না। সালাতের সময় তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতাম আর তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাতাম। আমি সালাতে দাঁড়ালে তিনি আমার দিকে তাকাতেন। কিন্তু চোখে চোখ পড়ামাত্র তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

মানুষের কঠোরতা আর এড়িয়ে চলা -- এই অবস্থা চললো দীর্ঘদিন ধরে। এভাবে আর থাকতে না পেরে আমি একদিন মরিয়া হয়ে আবু কাতাদাহর বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকে পড়লাম। সে ছিল আমার ভাই আর খুব কাছের একজন মানুষ। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু সে জবাব দিল না। বললাম, আবু কাতাদাহ, আল্লাহর কসম করে বলো তো -- আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি না? সে কোনো উত্তরই দিল না। আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে তবু চুপ করে রইল। আমি আবার মিনতি করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে শুধু এতটুকুই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমি মুখ ফিরিয়ে দেওয়াল টপকে ফিরে এলাম।

আরেকদিনের ঘটনা, আমি মদীনার বাজারে হাঁটছি। শামের এক কৃষক মদীনার বাজারে খাবার বিক্রি করতে আসত। সে বললো, কে আমাকে কা'ব ইবন মালিকের কাছে নিয়ে যাবে? মানুষজন আমাকে দেখিয়ে দিল। সে আমার জন্যএকটা চিঠি নিয়ে এসেছিল। চিঠিটি পাঠিয়েছিল গাসসানের রাজা। আমি পড়তে ও লিখতে জানতাম। তখনই চিঠিটা খুলে পড়লাম। সেখানে লেখা ছিল:

আমি জেনেছি যে আপনার সঙ্গী আপনাকে পরিত্যাগ করেছে। এভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেননি। আপনি বরং আমাদের কাছে চলে আসুন। আমরা মুহাম্মাদের চেয়েও ভালোভাবে আপনার দেখভাল করবো।

চিঠিটি পড়ে নিজেকে বললাম, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। আমি চিঠিটি পুড়িয়ে ফেললাম।

চল্লিশ রাত পার হয়ে গেল। এরপর আল্লাহর রাসূলের ﷺ পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক এল। সে এসে আমাকে বললো, আল্লাহর রাসূল তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা হতে আদেশ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে তালাক দেবো? সে উত্তর দিলো, না, শুধু তার থেকে দূরে থাকবে, তার কাছে যাবে না। আমার অন্য দুই সাথীকেও একই আদেশ করা হলো।

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে একটি ফায়সালা করা পর্যন্ত তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকো। হিলাল ইবন উমাইয়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুরোধ করলো, আল্লাহর রাসূল, হিলাল একজন গরীব, বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর সেবা করার মতো কেউ নেই। আমি যদি তার সেবা-শুশ্রুষা করি, তাতে কি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, ঠিক আছে, সেটা করতে পারো। কিন্তু তার কাছে যেও না (অর্থাৎ তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক থেকে দূরে থেকো)। হিলালের স্ত্রী তখন বললো, আল্লাহর কসম, এই ঘটনার পর থেকে সে সব কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে কেবল কেঁদেই যাচ্ছে।

আমার পরিবারের কেউ কেউ আমাকে বললো, তুমিও কেন আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করছো না? হয়তো তিনি তোমাকেও স্ত্রীকে কাছে রাখার অনুমতি দিবেন। আমি বললাম, না আমি এমনটা করবো না। আমি জানি না তিনি আমাকে অনুমতি দেবেন কি না, আমি তো একজন যুবক ।

এরপর কেটে গেল আরও দশটি রাত। আমাদের সাথে লোকেদের কথাবার্তা বলার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের ﷺ আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মোট পঞ্চাশটি রাত পার হলো। পঞ্চাশ দিন পর আমি সকালে বাড়ির ছাদে ফজরের সালাত আদায় করছিলাম। নিজেকে মনে হচ্ছিল বিধ্বস্ত। বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে মনে হচ্ছিল সংকীর্ণ -- যেমনটা কুরআনে আল্লাহ বলেছেন। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনলাম। সালা পাহাড়ের উপরে উঠে কেউ আমাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বললো, কা'ব ইবন মালিক, খুশি হও! আমি সাথে সাথেই সিজদায় পড়ে গেলাম। অনুভব করলাম মুক্তি এসে গেছে! আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে ঘোষণা করলেন আমাদের তাওবা কবুল হয়েছে। মানুষজন আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ছুটে আসলো। কেউ কেউ আমার বাকী দুই সাথীর কাছে সুসংবাদ নিয়ে ছুটে গেল।

যে আমাকে চিৎকার করে সুসংবাদ দিয়েছিল, আমি পুরস্কারস্বরূপ আমার শরীর থেকে দুটো জামা খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আমার কাছে ছিলই এই দুটো জামা। তাই আমি আরেকজনের কাছ থেকে দুটো জামা ধার করে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ছুটে গেলাম। মানুষজন আমার সাথে দলে দলে সাক্ষাত করতে এগিয়ে আসলো। সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো এই বলে, আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন। তাই তোমায় অভিনন্দন! মসজিদে ঢুকে দেখি ভেতরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বসে আছেন আর বাকিরা তাঁকে ঘিরে বসে আছে। তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসলো। আমার সাথে হাত মিলিয়ে অভিনন্দন জানালো। মুহাজিরদের মধ্যে কেবল তালহাই এগিয়ে এসেছিল। তালহার এই স্মৃতি আমি জীবনেও ভুলবো না। আল্লাহর রাসূলকে ﷺ সালাম দিতে গিয়ে দেখতে পেলাম তাঁর চেহারা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। তিনি আমাকে বললেন, আনন্দিত হও, কাব। তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে আজকের দিনই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন! কা'ব ইবন মালিক ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসূল, এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে! রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুব খুশি হতেন তখন তাঁর মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল করতো, দেখে মনে হতো এক টুকরো চাঁদ!

আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললাম, তাওবার অংশ হিসেবে আমি চাই আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাস্তায় সাদাকাহ করে দিতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার নিজের জন্যেও কিছু রাখো, সেটাই বরং তোমার জন্য বেশি ভালো। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাহলে খাইবারের অংশ আমি আমার নিজের জন্য রাখলাম। হে আল্লাহর রাসূল, আমার সততা আর সত্যবাদিতার জন্য আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। কাজেই তাওবা কবুলের নিদর্শনস্বরূপ আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, কেবল সত্য কথাই বলবো। আল্লাহর কসম, সেদিনের পর আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোনো মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এমন নিয়ামত আল্লাহ দান করেছেন বলে জানি না, যেমনটা তিনি আমাকে দান করেছেন। যেদিন রাসূলুল্লাহর সামনে বসে সত্য কথা বলেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা রাখি, বাকী জীবনও আল্লাহ তাআলা আমাকে মিথ্যা থেকে হেফাযত করবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেন।

> "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর উপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন মুহাজিরদের উপর, আনসারদের উপর, যারা একান্ত কঠিন সময়ে তাঁর অনুসরণ করেছিল তাঁদের সবার উপর, এমনকি তাঁদের একটি (ছোট) দলের চিন্তা (একটু) বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ এঁদের সবার উপর দয়া করলেন; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন তাঁদের সবার প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। সেই তিন ব্যক্তির উপরও (আল্লাহ তাআলা দয়া করলেন), যাদের (ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত স্থগিত করে রাখা হয়েছিল, (তাঁদের অবস্থা) এমন এক পর্যায়ে (এসে পৌঁছুল) যে, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও,

তাঁদের উপর সংকুচিত হয়ে গেল, (এমনকি) তাঁদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছেই দুর্বিষহ হয়ে গেল, তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া তাঁদের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে, অতঃপর আল্লাহ তাঁদের উপর অনুগ্রহ করলেন যাতে তাঁরা পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ১১৭-১১৯)

আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সৎ হতে পারাটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নিআমত। সত্যি বলতে, হিদায়াত লাভের পর এটাই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিআমত। আমি যদি তাঁর সাথে মিথ্যা বলতাম, তাহলে মিথ্যাবাদীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে যখন ওয়াহী এল, তখন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে যতটা রূঢ়ভাবে কথা বলেছেন, সেভাবে আর কারো ব্যাপারে বলেননি।

"যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন অচিরেই তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই তারা অপবিত্র এবং জাহান্নাম হলো তাদের আশ্রয়স্থল। তারা যা অর্জন করতো, তার প্রতিফলস্বরূপ। তারা শপথ করবে তোমাদের নিকট, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। অতএব তোমরা যদিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসিক কওমের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।" (সূরা তাওবা, ৯: ৯৫-৯৬)'

কা'ব ইবন মালিকের ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) আল্লাহর সাথে সততা

কাব ইবন মালিকের বর্ণনাই বলে দেয় যে, তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল অসাধারণ। এক কথায় তার বর্ণনাটা চমৎকার, কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেও জানতেন আল্লাহ তাকে সুন্দর করে কথা বলার গুণ দিয়েছেন। তিনি চাইলে এই গুণকে কাজে লাগিয়ে তার জিহাদে না যাওয়ার পেছনে সুন্দর একটা অজুহাত তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর এই নিআমতকে তিনি অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি।

কাব ইবন মালিক ﷺ ছিলেন একজন কবি। ইসলাম ও আল্লাহর রাসূলের ﷺ খেদমতে যারা নিজেদের কাব্যপ্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, কা'ব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। মদীনার তিন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন হাসসান ইবন সাবিত, কা'ব ইবন মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেছিলেন, আমাকে তর্ক-বিতর্ক করার গুণ দেওয়া হয়েছে। মানে তিনি চাইলেই মানুষকে কিছু একটা বুঝ দিতে পারতেন। অন্য কথায়, তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খুব সহজেই এমন অজুহাত উপস্থাপন করতে পারতাম, যা শুনতে যৌক্তিক আর সঠিক

মনে হবে। কিন্তু আমি অনুধাবন করতে পারলাম যে এমন করে আমি বেশি দূর যেতে পারবো না। আপনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ওয়াহীর মাধ্যমে আমার কুকর্ম ফাঁস করে দিবেন। এজন্য আমি সত্যটাই বলবো।

বর্তমানে ইসলাম ও মুসলিমরা কুফরি শক্তির ভয়াবহ আগ্রাসনের শিকার। এই আগ্রাসন সর্বাত্মক -- সামরিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো মোটেও সহজ নয়। যারাই এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাদের বিরুদ্ধেই কুফরি শক্তি উঠে পড়ে লাগে। সত্য কথা বলার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, মূল্য দিতে হয়। এই কঠিন দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা সবার থাকে না। সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন অনেক আলিম ও দাঈ এই অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে চায় না। উল্টো তারা নিজেদের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য অজুহাত পেশ করে। তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই দলিল পেশ করে নিজেদের কাপুরুষতা, নিষ্ক্রিয়তা ও বসে-থাকাকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তাদের যুক্তি আকর্ষণীয়, তাদের উপস্থাপনা চমৎকার, তাদের অজুহাতগুলোও আপাতদৃষ্টিতে বেশ যৌক্তিক শোনায়।

মুসলিমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, উত্তরণের কোনো চেষ্টাই তারা করতে চায় না। নিজেদের এই দুর্বল ও লাঞ্ছিত অবস্থাকে তারা তাদের নিয়তি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। একটি অজুহাত তাই মুসলিমদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় -- আমরা এখন মাক্কী যুগে আছি, তাই কিছুই করার নেই। মুসলিমরা লাখে লাখে মরুক, মুসলিম নারীদের ইজ্জত ভুলুণ্ঠিত হোক, আমাদের দ্বীনকে নিয়ে ইসলামের শত্রুরা হাসি-ঠাট্টা করুক, আমাদের কিছুই করার নেই।

তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা ত্যাগ-স্বীকার করতে চায় না। আর এই অনিচ্ছা ও অযোগ্যতাকে সরাসরি স্বীকার না করে তারা ইসলামের মোড়ক দিয়ে ঢেকে দেয়। হ্যাঁ, এটা সত্য যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মক্কার মুসলিমরা ইসলামের প্রথম দিকে দুর্বল অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে বের হওয়ার জন্য সমর্থনের আশায় সব গোত্রের দুয়ারে কড়া নেড়েছেন । প্রত্যেক হজ্বের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের সাথে বারবার সাক্ষাৎ করেছেন। সাধ্যে যতটুকু কুলায় তার সবটুকু দিয়েই মুসলিমরা চেষ্টা করেছিল। তাই যারা মনে করে যে, তারা মাক্কী জীবনের মতো দুর্বল অবস্থায় আছে, তাদের উচিত এ অপমানজনক জীবন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা। এটাই আল্লাহর রাসূলের ﷺ শিক্ষা।

কাজেই কা'ব ইবন মালিকের ঘটনা থেকে প্রথম শিক্ষা হলো, কথার পারদর্শিতা বা উপস্থাপনার ভেলকিবাজিতে প্রলুব্ধ না হওয়া, কথার চাকচিক্যে নিজেদের অন্তরের রোগ আড়াল করার চেষ্টা না করা বরং আল্লাহর প্রতি সৎ থাকা এবং নিজেদের অবস্থার উত্তরণে চেষ্টা করে যাওয়া।

২) সত্তার শত্রু: নফস

এমন নয় যে, কা'ব ইবন মালিক ﷺ জিহাদে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রস্তুতি নেওয়ার নিয়ত তাঁর মনে ছিল। কিন্তু আলসেমির কারণে কিছুই করা হয়ে ওঠেনি। দৃঢ়তার অভাবেই মানুষকে ঢিলেমি পেয়ে বসে। এটা চিরাচরিত মানব বৈশিষ্ট্য। করছি, করবো -- এই করতে করতে সেই কাজটি আর করা হয়ে উঠে না। কা'ব ইবন মালিকের ﷺ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল।

মানুষের নফস ধোঁকা দেয়। লাগাম পরিয়ে না রাখলে নফস মানুষকে অনেক নিচে নামিয়ে আনতে পারে। নিজের খেয়াল-খুশিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা খুবই জরুরি। নিজের 'মুড' এর উপর সব কাজকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। কা'ব ইবন মালিক ﷺ নফসের সাথে পেরে উঠেননি। যাচ্ছি-যাবো বলে তাঁর আর যাওয়া হয়নি। নফস হলো অলস, ভীতু, দুর্বল। সে দুনিয়াকেই ভালোবাসে। তাই নফসকে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে রাখাটা জরুরি।

কাব ইবন মালিক তাবুকের আগের বড় বড় প্রায় সব জিহাদে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু সামান্য ঢিলেমি দেওয়ার কারণে তিনি তাবুকের অভিযানে যোগ দিতে পারেননি। কাজেই নিজের ঈমানের ব্যাপারে কখনোই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের আমল-ইবাদাতে ঢিলেমি দেওয়া উচিত নয়। অতীতের আমল যতই ভালো আর ঈর্ষণীয় হোক না কেন। রাসূল ﷺ বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ার পরও কা'ব ইবন মালিক ﷺ ভাবছিলেন, আমি ঠিকই কাফেলা ধরে ফেলতে পারবো। অথচ, তখনো তার প্রস্তুতির কিছুই হয়নি।

কালকের জন্য কাজ ফেলে রাখলে জমতে জমতে তা এত বিশাল আকার ধারণ করে যে শেষ পর্যন্ত কাজ করার উৎসাহই হারিয়ে যায়। এটা আসলে নফসের একটা ধোঁকা। প্রথমে সে বোঝায় -- কাজটা তো একেবারেই সহজ, তুড়ি মেরে করে ফেলা যাবে! আর পরে যখন সব কাজ একসাথে জমে বিশাল আকার ধারণ করে, তখন সে বোঝায়, এত্তো কাজ করা কী করে সম্ভব! আর এভাবেই সে ভালো কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। যদি কা'ব ইবন মালিকের ﷺ মতো একজন সাহাবি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে এত বড় ভুল করতে পারেন, তাহলে এখনকার মুসলিমরা কীভাবে নিরাপদ থাকতে পারে? জিহাদ এমন একটি ইবাদাত যেটা সবসময় চলতে থাকে। যতই দেরি করা হয়, জিহাদে অংশ নেওয়া ততই কঠিন হয়ে পড়ে।

৩) ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা: জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ

তাবুকে পৌঁছার পর কা'ব ইবন মালিকের ﷺ খোঁজ করা হলে সাহাবিরা অনেকে বলে বসেন, কা'ব ﷺ দুনিয়ার মোহে জিহাদ পরিত্যাগ করেছে। নিঃসন্দেহে এটা খুবই অপমানজনক কথা। আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনেই এমন কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। একজন মুসলিমের মর্যাদা ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক দামি। কিন্তু সম্মানিত সাহাবি কা'ব ইবন মালিকের ﷺ ব্যাপারে এমন অসম্মানজনক এবং

তীর্যক মন্তব্য করার পরেও আল্লাহর রাসূল চুপ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, জিহাদে অংশ না নেওয়া কত বড় অপরাধ হতে পারে। শুধুমাত্র জিহাদে অংশ না নেওয়ার কারণে তিনজন সাহাবিকে পঞ্চাশ দিনের জন্য পুরো সমাজ বয়কট করেছিল। তাহলে তাদের অপরাধ কতটা ভয়াবহ যারা আজকে জিহাদে অংশ নেওয়া দূরে থাক, উল্টো জিহাদের বিরোধিতা করে?

৪) কুনু মা'আস সাদিক্বীন: সত্যবাদীদের সাথে থাকো

সৎসঙ্গে থাকা খুবই জরুরি। ভালো কাজে সাথী পেলে মানুষের মাঝে সাহস সঞ্চার হয়, উৎসাহ সৃষ্টি হয়। মানুষের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কা'ব ﷺ একটা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করাবার জন্য প্রায় উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু যখনই জানলেন তার মতো আরও দু'জন আছে, তখন তিনি এ থেকে সরে আসেন। সৎ ও জ্ঞানী মুসলিমদের সাথে উঠাবসা করা দ্বীনের পথে উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এতে করে ভালো কাজে অংশ নেওয়া সহজ হয়, বন্ধুর পথে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভর করেছে ফিতনা আর অবিশ্বাস। তাই এই পঁচে যাওয়া এই সমাজ ব্যবস্থায় সৎসঙ্গের গুরুত্ব অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। সুতরাং নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া যাবে না। স্বভাবগতভাবেই মানুষ দুর্বল। আল্লাহ বলেছেন, "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল অবস্থায়।"

ফিতনার মোকাবেলায় মানুষ বরাবরই দুর্বল। তাই মুসলিমদের উচিত জামাতবদ্ধ থাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দ্বীন হলো নাসীহা।' অর্থাৎ চারপাশে এমন মানুষ থাকা জরুরি, যারা সবসময় ভালো কাজের উপদেশ দিবে। খারাপ পরিবেশ ত্যাগ করে দ্রুত ভালো পরিবেশে চলে যাওয়া ঈমানের হেফাজতের জন্য খুবই জরুরি। আজকে ঈমান তেজোদ্দীপ্ত হলেও আগামীকাল অন্তরের অবস্থা একরকম না-ও থাকতে পারে। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবকে কখনোই ছোট করে দেখা উচিত নয়।

৫) আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না

কেউ যদি সত্যবাদিতা অবলম্বন করে, তাহলে সে একদিন না একদিন এর উপযুক্ত পুরস্কার পাবেই -- এটাই কা'ব ইবন মালিকের ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, কা'ব ইবন মালিক আর বাকি দুইজন যদি মুনাফিক্বদের মতো মিথ্যা অজুহাত দিতেন তাহলে তাদের বয়কট করা হতো না, কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষের মনের খবর জানেন, তিনি ভালোকে মন্দের কাতার থেকে পৃথক করে দেন।

যারা কোনো অজুহাত না দিয়ে অকপটে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছিল, তাদেরকে বর্জন করা হয়েছিল। আর যারা মিথ্যা কথা বলেছিল, তারা অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু এই অব্যাহতি ছিল সাময়িক। মিথ্যা বলে ক্ষণিকের জন্য পার পাওয়া বা কিছু অর্জন করা গেলেও সেটা চিরস্থায়ী হয় না। অপরদিকে আপাতদৃষ্টিতে সত্যকে অপ্রিয় বা কঠিন মনে হলেও, দিনশেষে সত্যের অর্জনটাই চিরস্থায়ী। আল্লাহ কা'ব ও

তার দুই সাথীকে ﷺ সরল পথে কায়েম রেখেছেন তাদের সততা ও সত্যবাদিতার কারণে।

৬) আল্লাহর রাসূলের প্রতি আনুগত্য

কাব ﷺ ছিলেন মদীনার অধিবাসী। এই মদীনায় তার জন্ম, তার বেড়ে ওঠা। কিন্তু মুসলিমদের বয়কটে এই চিরচেনা মদীনা তার কাছে হয়ে গেছিল অচেনা, পর। একান্ত আপন লোকেরাই তাঁকে বয়কট করেছিল। যে আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশে সাহাবিরা কা'বকে ﷺ বয়কট করেছিল, সেই আল্লাহর রাসূলের ﷺ জন্মভূমি কিন্তু মদীনা ছিল না। এটা দেখিয়ে দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিই ছিল সাহাবিদের একনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ আনুগত্য। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ সবাই এক বাক্যে মেনে নিয়েছিল। কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব করেনি। এটাই বলে দেয় যে, সে সময়ের সমাজব্যবস্থা কতটা মজবুত ছিল। বয়কটকারী সাহাবিরাই কেবল আনুগত্য করেননি, বরং যে তিনজনকে বয়কট করা হয়েছিল, তারাও আল্লাহর রাসূলের ﷺ আনুগত্য ত্যাগ করেনি! এই পঞ্চাশটি দিন তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশ মেনে চলেছেন।

৭) ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ততা

গাসসানের রাজা ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমদের ঘৃণা করতো। সীরাহর বইগুলোতে এমন ঘটনা উল্লেখ আছে যে, সে সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলিমদের আক্রমণ করতে চেয়েছিল আর এ কাজে সে হিরাক্লিয়াসের সহায়তা চেয়েছিল। কিন্তু হিরাক্লিয়াস তাকে থামিয়ে দেয়। রাজা হলেও সে ছিল মূলত হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি। গাসসানের রাজার মতো শাসকদের নামের সাথে অনেক লম্বা লম্বা উপাধি থাকলেও বাস্তবে তারা অন্যের হুকুমের দাস, বলা যেতে পারে দালাল শাসক। সে বোকা হলেও হিরাক্লিয়াস ছিল দূরদর্শী। সে জানতো রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সত্য নবী। এজন্য সে তখন মুসলিমদের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলতে চেয়েছিল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, গাসসানের রাজা ছিল একজন আরব। সে হিসেবে আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি অপেক্ষাকৃত বেশি সহমর্মী হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অনারব হিরাক্লিয়াসের থেকেও সে নিজেই ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি বেশি আক্রমণাত্মক। মনিবের চেয়ে ভৃত্যের রাগ সাধারণত বেশি হয়। কথায় আছে, সূর্যের চেয়ে বালি গরম।

কুফফাররা সবসময় মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করতে চায়। এটি কুফফারদের অতি প্রাচীন কৌশল। তারা মুসলিমদের মধ্যে থেকে এমন কাউকে টার্গেট করে যারা কিছুটা বিপদে আছে, পরিস্থিতির চাপে হয়তো তারা শত্রুদের সাথে হাত মেলাবে। তারা এ ধরনের নড়বড়ে মুসলিমদের 'কিনে' নিতে চায়। গাসসানের রাজা কা'ব ইবন মালিককে ﷺ ভালোবাসত -- বিষয়টা মোটেও এমন নয়। বরং কা'বকে ﷺ ব্যবহার করে তারা তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল।

আজকের দিনেও এই স্ট্র্যাটেজি কার্যকর। অনেক মুসলিম সংস্থা বা মুসলিম দাঈদের

সাথে কাফিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বেশ দহরম-মহরম। এই মুসলিমরা কাফির সরকারের মন জুগিয়ে চলে, ইসলামের যে বিষয়গুলো কাফিররা পছন্দ করে না, সে-সব কথা বলা থেকে বিরত থাকে অথবা সেসব বিষয়ে চিনি মিশিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। মূলত, তারা দাওয়াহর নামে কাফিরদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। তারা ততটুকুই বলে, যতটুকু কাফিররা অনুমোদন দেয়।

কাফিররা আজকে সরাসরি ইসলামকে পরিবর্তন, সংস্করণ ও কাটছাঁট করার কথা বলছে। এজন্য তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। তারা এমন সব আলিম ও দাঈদের জন্ম দিতে কাজ করছে, যারা এই নতুন ভার্সনের ইসলাম মানুষের কাছে প্রচার করবে। এই বিষয়গুলো তারা খোলাখুলিভাবেই উল্লেখ করেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যান্ড কর্পোরেশন এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। র‍্যান্ড সমর্থিত এই আলিম ও দাঈদের শয়তান এই বলে ধোঁকা দেয় -- আমরা তো দাওয়াহ করছি, মসজিদ আর স্কুল নির্মাণ করছি, ইসলামকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আসলে কাফিরদের অর্থায়ন আর প্রযোজনায় কখনো ইসলামের দাওয়াহ হয় না। এটা দাওয়াহর নামে অন্য কিছু। কাফিররা যদি ইসলামী দাওয়াতের পেছনে অর্থ খরচ করে, সেটা নিজেদের স্বার্থে। মূলত তারা এভাবে ইসলামকে বদলে দিতে চায়।

কাব ইবন মালিক ﷺ গাসসানের রাজার চিঠি ছিঁড়ে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। গাসসানের রাজা বেশ সহানুভূতি আর দরদ নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। কিন্তু কা'ব ﷺ জানতেন, এই সহানুভূতির ভাষা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। কা'ব ইবন মালিকের ﷺ মতো একজন মুসলিমকে নিজেদের পক্ষে টেনে বিভেদ তৈরি করাই ছিল তার লক্ষ্য। দরদ দেখানো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কা'ব ﷺ চাইলে সেই চিঠিকে স্মারক হিসেবে রাখতে পারতেন, রাজার চিঠি বলে কথা! কিন্তু তিনি সেটা করেননি। বরং একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন, যেন এই প্রলোভন দ্বিতীয়বার তার মাথায় উঁকি দিতে না পারে। মুসলিমদের বয়কট সত্ত্বেও কা'ব ﷺ ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। অন্যদিকে কাফিরদের থেকে পাওয়া নাগরিকত্বের অফার তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার নাম হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা। বিষয়টি পৃথকভাবে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে শেখা ও অনুশীলন করা।

৮) অপরাধবোধ ও অনুশোচনা

তিনজন মুসলিম তাবুকের অভিযানে অংশ নেননি। কিন্তু এটা নিয়ে তাদের তীব্র অপরাধবোধ কাজ করেছে। কিন্তু মুনাফিক্বদের মনে এ নিয়ে কোনো উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার উদ্রেক হয়নি, কোনো ভাবান্তরও হয়নি। তারা একদম গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু মু'মিনদের মনে তীব্র মনস্তাপের জন্ম হয়, জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। একজন ঈমানদার যদি কোনো গুনাহ বা অপরাধ করে ফেলে, তার অন্তর আফসোসে ভরে ওঠে, অনুশোচনা হয়। এটা এমন একটা গুণ যা মুনাফিক্বদের থেকে মু'মিনদের আলাদা করে দেয়।

৯) ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহর কিছু মন্তব্য

পরিশেষে ইমাম ইবনুল কায়্যিমের রাহিমাহুল্লাহ *যাদুল মা'আদ* গ্রন্থ থেকে তাবুকের অভিযান বিষয়ক কিছু শিক্ষা জেনে নেওয়া যাক।

১) নিজের দুর্বলতা বা অক্ষমতার কথা সাধারণত প্রকাশ করা জায়েয, যদি তাতে কোনো উপকার থাকে। সাধারণভাবে, নিজের গুনাহের কথা প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি এর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু থেকে থাকে, তবে সেটা প্রকাশ করায় বাধা নেই। যেমন এই ঘটনায় কা'ব ইবন মালিক ﷺ নিজেই নিজের অপরাধের কথা বর্ণনা করছেন যেটা মুসলিমদের জন্য একটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা।

২) নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করা ও নিজের কিছু ভালো কাজের কথা প্রকাশ করা ক্ষেত্রবিশেষে ঠিক আছে। তবে নিঃশর্তভাবে নিজের প্রশংসায় মেতে ওঠা ঠিক নয়। এই ঘটনায় কা'ব ইবন মালিক ﷺ বলেছেন তিনি বদর ছাড়া বাকি সব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ছিলেন আর আকাবার ঘটনার সময়ও উপস্থিত ছিলেন। অহংকারের বশে কিংবা মানুষের চোখে নিজের মর্যাদা বাড়ানো যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে নিজের ব্যাপারে ভালো কথা বলা বৈধ।

৩) আল্লাহ কোনো ভালো কাজের সুযোগ করে দিলে সেই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। জীবনের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ আমাদের জন্য ভালো কাজের দরজা খুলে দেন। এই সুযোগগুলো হয়তো জীবনে একবারই আসে। একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে তা চিরতরে হাতছাড়া হয়। তাই ভালো কাজের সুযোগ 'পরে করবো' ভেবে হাতছাড়া করা উচিত নয়। কা'ব ইবন মালিক ﷺ তাবুকের অভিযানে অংশ নিতে না পেরে আফসোস করে বলেছেন, 'হায়! আমি যদি যেতে পারতাম!' সুযোগ অবহেলা করার পরিণাম কখনো খুব ভয়াবহ হতে পারে।

> **"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সেই ডাকে সাড়া দাও যা তোমাদের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে। জেনে রেখো আল্লাহ তাআলা মানুষ ও তার অন্তরের মাঝখানে অবস্থান করেন, তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।" (সূরা আনফাল, ৮: ২৪)**

মহান আল্লাহই অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। ক্ষণিকের অবহেলা আর নিফাক্বের কারণে তিনি মানুষের অন্তরকে অভিশপ্ত করে দিতে পারেন, পরবর্তীতে ভালো কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সুযোগের কোনো দরজা খোলা হলে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। প্রথমবারেই মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ অন্তর ও দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ফলে দ্বিতীয় কোনো সুযোগ আর না-ও পাওয়া যেতে পারে।

> **"আমি (শীঘ্রই) তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে (অন্যদিকে) ঘুরিয়ে দিবো, যেমন তারা প্রথমবারেই এর (কোরআনের) ওপর ঈমান আনেনি এবং আমি**

তাদেরকে অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেবো।" (সূরা আনআম, ৬: ১১০)

৪) আল্লাহর রাস্তায় না গিয়ে ঘরে বসে থাকা নিফাকের লক্ষণ। কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় আবশ্যিক জিহাদে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সমালোচনা করা বৈধ, এটা গীবত হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন হাদীসের আলিমরা হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করেন, যেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা ও শিক্ষাকে বিশুদ্ধ রাখা যায়। এ কারণে বনু সালামার সেই ব্যক্তি যখন কা'ব ইবন মালিকের সমালোচনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চুপ ছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি কাউকে ভালো হিসেবে জানি, তাহলে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য, যেমনটা করেছিলেন মুআয ইবন ইবন জাবাল ﷺ।

যদি কেউ অনেক বড় অপরাধ করে, তাহলে তার সালামের উত্তর না দেওয়া বৈধ, যাতে সে তার ভুল বুঝতে পারে। তবে তার মানে এই নয় যে, কারো সাথে মতপার্থক্য হলেই খুঁজে খুঁজে তার ভুল বের করে তার সাথে সালাম বিনিময় ও কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে হবে। এটা ইসলামের আদবের মধ্যে পড়ে না। কোনো ব্যক্তিকে বয়কট করা জায়েয হতে পারে, যদি এই বয়কটের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে কোনো গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে নাসীহা দেওয়া সম্ভব হয়। বয়কটের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির সংশোধন।

৫) বন্ধুর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা উচিত নয়। তবে যদি সে কিছু মনে না করে, তাহলে সমস্যা নেই। যেমন কা'ব ﷺ তাঁর ভাই ও বন্ধু আবু কাতাদাহর বাড়িতে দেয়াল টপকে প্রবেশ করেছিলেন। তবে যদি হারাম কিছু চোখে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, বা মহিলাদের পর্দা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেটা কোনোভাবেই জায়েয নয়।

৬) সাহাবিরা ﷺ কোনো সুসংবাদ শুনলে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন। এটা ভালো একটি অভ্যাস।

৭) কোনো কিছুর ব্যাপারে যদি এমন আশঙ্কা হয় যে, নিজের দ্বীনের ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাহলে সেটা ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত। যেমন কা'ব ﷺ গাসসানের রাজার চিঠি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৮) তাওবাহ করার সাথে সাথে আমাদের উচিত আল্লাহর রাস্তায় কিছু সাদাকাহ করা। কোনো ভুল করে ফেললে, তাওবাহ করার সাথে কিছু সাদাকাহও করা উত্তম। কা'ব ইবন মালিকও ﷺ এমনটা করেছিলেন।

হিজরী ৯ম বর্ষের ঘটনাপ্রবাহ

মুনাফিক্ব নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মৃত্যু

হিজরী ৯ম বর্ষ। সারাজীবন নিফাক্ব, মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, গোপন বিরোধিতা ও শত্রুতা পোষণের পর আবদুল্লাহ ইবন উবাই তখন মৃত্যুমুখে। উসামাহ ইবন যাইদকে ﷺ সাথে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার সাথে দেখা করতে গেলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে সবসময় সতর্ক করতাম, ইহুদিদের ভালোবেসো না।' ইবন উবাই বললো, 'সাদ ইবন যুরায়রা তো তাদের ঘৃণা করতো। কিন্তু কী লাভ হয়েছে? সে তো মারা গেছে।'

ইবন উবাইয়ের চোখে মৃত্যুই ছিল পরাজয়। মৃত্যুর পরের জীবনই যে আসল জীবন- এই সত্য সে তার কুফরি আর একগুয়েঁমির কারণে বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়নি। মুসলিমদের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য দেখালেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিশ্বস্ততা ছিল কাফিরদের প্রতি। এটা মুনাফিক্বদের চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তারা কুফফারদের প্রতি অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে, অর্থাৎ, তারা তাদের সুখে সুখী হয়, তাদের দুঃখে দুখী হয়।

> "বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে।" (৫: ৫২)

মুনাফিক্বরা কাফিরদের নিজেদের আপন ভাবে, তাদের পক্ষ নেয়। তারা কখনোই মন থেকে মুসলিমদের মেনে নিতে পারে না, তাদের সাথে থেকে স্বস্তি পায় না।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাজার সালাত আদায় করতে যাচ্ছিলেন। সামনে এসে দাঁড়ালেন উমার ইবন খাত্তাব ﷺ। আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে যাদেরকে সত্য-মিথ্যার ফারাক বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই মুষ্টিমেয়দের একজন ছিলেন তিনি। মুনাফিক্ব আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের জানাজা পড়বেন আল্লাহর রাসূল -- এটা তিনি কোনোভাবেই মানতে পারলেন না। আবদুল্লাহ ইবন উবাই অতীতে যত কুকর্ম করেছে, তার সমস্ত ইতিহাস এক এক করে বলতে বলতে উমার ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'এমন এমন কাজ করার পরও আপনি কীভাবে তার জানাজার সালাত পড়াতে পারেন?' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার পথ ছেড়ে দাও, উমার। আমি যদি জানতে পারি, আল্লাহর কাছে তার নাজাতের জন্য সত্তর বারের বেশি দুআ করলে আমার দুআ কবুল হবে, তবে আমি তা-ই করবো।'

> "(হে নবী) এমন লোকদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না-করেন (দুটোই সমান), যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তারপরেও তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। কেননা এরা

আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ নাফরমানদেরকে হিদায়াত করেননা।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ৮০)

কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ৭০ বারের কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য বলছেন যে, ৭০ বারের বেশি ইস্তিগফারে যদি কাজ হতো তবে তিনি তা-ই করতেন। এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহর ﷺ চরিত্রের একটা অসাধারণ দিক তুলে ধরে। আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের শত্রুতা দেখতে দেখতে উমার ؓ পর্যন্ত প্রশ্ন করছিলেন, 'আপনি কীভাবে তার জন্য ক্ষমা চাইতে পারেন?' কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মনটা ছিল বিশাল। যে আবদুল্লাহ ইবন উবাই জীবনভর তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, শত্রুতা, মিথ্যাচার, ছলচাতুরী কিছুই বাদ রাখেনি, তাকেও তিনি শেষ সুযোগ দিতে চেয়েছেন। তার জানাযা পড়িয়ে তার নাজাতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। জাহান্নামের আগুনের যে সীমাহীন কষ্ট, সে কষ্ট তিনি তাঁর শত্রুর জন্যেও চাননি। এই জানাযা পড়ার আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে ইবন উবাইয়ের অনুসারীদের মন জয় করার চেষ্টা করা। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ হয়তো আশা করেছিলেন তাদের প্রতি নমনীয়তা দেখানো হলে তারা তাদের নিফাক্ব ছেড়ে তওবা করে ফিরে আসবে। এই সিদ্ধান্তটি তখনো শরীয়াহগতভাবে বৈধ এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুকূল। কিন্তু এই জানাজা পড়ার পরেই মুনাফিক্বদের ওপর জানাজার সালাত আদায়ের বৈধতা তুলে নেওয়া হয়।

> "আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনো নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।" (সূরা তাওবাহ ৯: ৮৪)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ফায়সালা করে দিলেন যে, মুনাফিক্বদের ওপর আর কোনো জানাজার সালাত পড়া হবে না। এটিই ছিল চূড়ান্ত হুকুম। কুরআনে বেশ কিছু আয়াত আছে যেগুলো উমারের ؓ মতের সমর্থনে নাযিল হয়েছিল, এটি তেমনই একটি আয়াত।

আল্লাহর রাসূলের আগে আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মৃত্যু ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি হিকমাহ। ইবন উবাইয়ের মনে আশা ছিল, আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর পরে সে পুনরায় মদীনার নেতৃত্ব ফিরে পাবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, যখন ইবন উবাইয়ের হাতে মদীনার শাসনভার আসার কথা, ঠিক সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসেন এবং আওস ও খাযরাজদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। রাসূলুল্লাহর অধীনে পুরো সময়টাতে সে এবং তার দলবল জিহাদে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে, নিফাকের পথ অবলম্বন করেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে ষড়যন্ত্র করে উৎখাতের চেষ্টা করেছে। তারা ভেবেছিল, ইসলামের রাজত্ব সাময়িক, হঠাৎ করে এসেছে, আবার হঠাৎ করে চলেও

যাবে, মদীনা আগে যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা হয়নি, বরং মুনাফিক্বদের প্রভাব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। ইবন উবাইয়ের মৃত্যুর মাধ্যমে মদীনার মুনাফিক্বদের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে না গেলেও জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে তাদের সাথে লড়াই করে। চিহ্নিত মুনাফিক্বদের ওপর জানাজা পড়তে মুসলিমরা অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহর রাসূল হুযাইফাকে জানিয়ে যান কারা কারা মুনাফিক্ব। এভাবে মুনাফিক্বরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর মদীনায় ইসলাম আরও সুসংহত হয়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একটি ঘটনা

আর দশজন সহজ স্বাভাবিক দম্পতির মতই আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনেও ছিল আনন্দ-বেদনার গল্প, ছিল বাদানুবাদ আর মান-অভিমানের উত্থান-পতন। একবার এমন হয়েছিল, স্ত্রীদের সাথে অভিমান করে আল্লাহর রাসূল ﷺ দীর্ঘ এক মাস বাড়ির বাইরে কাটান। পুরো সময়ে তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর কাছেই যান-নি। ঘটনাটা নবম হিজরির।

একদিন আবু বকর ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন আরও অনেকেই রাসূলের ঘরের দরজায় অপেক্ষমান। কাউকেই ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। আবু বকর ﷺ ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। এরপর উমার ﷺ এলেন, তাকেও অনুমতি দেওয়া হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ নিচে বসে আছেন আর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে উনার স্ত্রীরা। সবার মধ্যে বিষাদের ছাপ। পুরো পরিবেশ থমথমে হয়ে আছে। গুমোট ভাবটাকে হালকা করার জন্য উমার ﷺ মজা করে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার টাকা-পয়সা নেই জেনেও যদি আমার বউ তার পেছনে খরচ করার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতো, তাহলে আমি তার ঘাড় ভেঙে দিতাম!' উমারের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন, বললেন, 'এখানেও তা-ই হয়েছে! আমার চারপাশে যাদের দেখতে পাচ্ছো তারাও আমার কাছে ধন-সম্পদ চাইতে শুরু করেছে!'

এ কথা শুনেই আবু বকর ﷺ নিজ কন্যা আইশার ﷺ দিকে এগিয়ে গেলেন আর উমার ﷺ এগিয়ে গেলেন নিজ কন্যা হাফসার ﷺ দিকে। দুজনেই আল্লাহর রাসূলের দুই স্ত্রীর বাবা! উমার ﷺ বললেন, 'তোমরা নবীজির কাছে এমন কিছু দাবি করছো, যা তাঁর কাছে নেই!' তারা উত্তর দিলেন, 'আমরা কখনো এমন কিছু দাবি করবো না যা আল্লাহর রাসূলের কাছে নেই।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসূল ﷺ স্ত্রীদের থেকে এক মাস আলাদা ছিলেন। আর সেই সময়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন।

> "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা করো, তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-

বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।” (সূরা আহযাব, ৩৩: ২৮-২৯)

আল্লাহর রাসূলের লাইফস্টাইল ﷺ আর দশজনের মতো সহজ আর স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না, আরাম কী জিনিস তিনি জানতেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা -- নেতৃত্ব, খ্যাতি, ধন-সম্পদ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু সেই ডাককে তিনি কোনো পাত্তাই দেননি, এমনভাবে জীবন কাটিয়েছেন যেন দুনিয়ার চেয়ে সস্তা আর অর্থহীন বস্তু আর দ্বিতীয়টি নেই। মদীনায় আসার পর মসজিদে নববীর পাশে আল্লাহর রাসূল ﷺ আর উম্মুল মুমিনীনদের জন্য ঘর তৈরি করা হয়। সে ঘর ছিল নিতান্তই সাধারণ। রাজা-বাদশাদের প্রাসাদের মতো প্রকাণ্ড কিছু তো ছিলই না, বরং কাদামাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি ছোট কয়েকটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। সেগুলোকে বড়জোর কুঁড়েঘর বলা চলে। আরবের মরুভূমিতে সবচেয়ে সহজলভ্য খেজুরের ডাল ছিল সেই ঘরের চালা। ঘরের ছাদগুলো এত নিচু ছিল যে ছোটখাট লোকও নিমিষে হাত দিয়ে ছুঁতে পারতো। ইমাম হাসান আল বসরী বলেন, ‘আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ ঘর দেখেছি। হাত বাড়ালেই এর ছাদ ধরা যায়।’

আল্লাহর রাসূলের সেই ঘরে আলো জ্বালানোর মতো কুপিও ছিল না। মা আইশা ﵂ বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাতের স্থানের সামনে ঘুমাতাম। রাতে যখন তিনি তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন, ঘরে আলো না থাকায় সিজদার সময় তাঁর কপাল আমার মাথায় এসে লাগতো। সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল আমার পায়ে খোঁচা দিতেন। তখন আমি পা ভাঁজ করে নিতাম, যখন তিনি সিজদা থেকে উঠতেন আমি আবারো পা বিছিয়ে দিতাম।’

ঘরে কার্পেট বলে কিছু ছিল না। মেঝে বলতে ছিল বালি আর খেজুরের ছোবলা। আল্লাহর রাসূল সেখানেই ঘুমোতেন। তাঁর গায়ে এবড়ো-খেবড়ো ছোবলার দাগ পড়ে যেত। রকমারি আসবাবও ছিল না। মাথার নিচে দেওয়ার মতো একটা চামড়ার গদি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়তো না ঘরে। তাঁর জীবন দেখলে মনে হতো প্রাচুর্য বলে এই পৃথিবীতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। এই দৃশ্য দেখে একদিন উমার ﵁ নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, কেঁদেই ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি এই উম্মতকে প্রাচুর্য দান করেন। পারস্য আর রোমের সম্রাটদের দেখুন, তারা তো আল্লাহর ইবাদত করে না অথচ তারাই আজ ভোগবিলাসে আছে।’ তিনি বললেন, ‘উমার! এটাই কি উত্তম নয় যে তারা দুনিয়ার ভোগবিলাস পেলো আর আমরা আখিরাতের অনন্ত জীবন পেলাম!’

আমরা জীবনের প্রাচুর্য দেখে দেখে আক্ষেপ করি কেন অন্য অনেকের সমান কিংবা তার চেয়েও বেশি পরিমাণ নিআমত আমার হলো না, কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে ﷺ যেন

এসব কিছু স্পর্শই করত না। দুনিয়ার ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ আর প্রাচুর্য ছিল তার কাছে একটা মশা কিংবা মাছির চেয়েও তুচ্ছ, কাছে আসলেই হাত দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার মতোই তিনি বরাবর একে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

দারিদ্র্য ছিল আল্লাহর রাসূলের নিত্যসঙ্গী। মা আইশা ﷺ বলেন, 'এমনও হয়েছে পরপর তিন চন্দ্রমাস অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ঘরে চুলায় আগুন জ্বলেনি।' এ কথা শুনে তার ভাগ্নে উরওয়া ইবনে আয যুবাইর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে সে সময় আপনারা কী খেতেন?' আইশা ﷺ জবাব দিলেন, 'আমরা শুধু পানি আর খেজুর খেয়ে থাকতাম!' আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, 'মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলকে কোনোদিন ভুনা গোশত দিয়ে পেট ভরে এক টুকরো রুটি খেতে দেখি-নি।'

এমন নয় যে, উম্মুল মুমিনীনরা আল্লাহর রাসূলের এই কঠোর আর অনাড়ম্বর জীবনের সাথে অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু হিজরি ৯ম বর্ষে এসে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল উম্মাহকে খায়বার, মক্কা বিজয়ের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিজয় দান করেন। কুরআনের কিছু আয়াতও নাযিল হয়, যা সীমার মধ্যে থেকে দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি প্রদান করে। আল্লাহ বলেন,

> "আপনি বলুন, আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, এসব নিআমত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা বোঝে।" (সূরা আরাফ, ৭: ৩২)

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর উম্মুল মুমিনীনরা মনে করলেন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে আল্লাহ দুনিয়ায় মু'মিনদের জন্য যা হালাল করেছেন, সেই নিয়ামত ভোগ করায় দোষের কিছু নেই। আদতে এই আয়াতগুলো ছিল মূলত সাধারণ মানুষদের জন্য। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন তাঁর রাসূল ﷺ দুনিয়ার উপকরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন, বাকিদের মতো তিনি দুনিয়া উপভোগ করবেন না।

> "আপনি (কাফিরদের) মাঝে কিছু লোককে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি আপনি চোখ তুলে তাকাবেন না। তাদের ব্যাপারে চিন্তিত হবেন না, বরং মু'মিনদের প্রতিই ঝুঁকে থাকবেন।" (সূরা আল হিজর, ১৫: ৮৮)

অনন্ত আখিরাত জীবনের উল্টো পিঠে অতি তুচ্ছ এই নশ্বর পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে যাওয়া আল্লাহর রাসূলের জন্য কোনোভাবেই শোভনীয় নয়। সূরা আহযাবের উপরোল্লিখিত আয়াত নাযিল হবার পর আল্লাহর রাসূল স্ত্রীদের দুটো রাস্তা খুলে দিলেন

-- হয় তারা দুনিয়ার ভোগবিলাস উপভোগ করবেন, অথবা তারা আল্লাহর রাসূলের জীবনসঙ্গী হিসেবে থাকবেন। তারা যদি আল্লাহর রাসূলের সাথে সংসার করেন, তবে বিনিময়ে কষ্ট হলেও লাভ করবেন সবচেয়ে মহান প্রাপ্তি -- আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অসামান্য পুরস্কার। যে নারীরা এতদিন ভরণ-পোষণ বাড়ানোর জন্য চাপাচাপি করতে করতে নবীজিকে প্রায় বিরক্ত করে তুলেছিলেন, এই আয়াত শোনার পর, সেই তারাই প্রত্যেকে একবাক্যে বললেন, 'আমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং আখিরাতের আবাসকেই বেছে নিলাম।' আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের ওপর সন্তুষ্ট হোন।

খুলাফায়ে রাশেদীনরাও এই ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন সমগ্র মুসলিম জাহানের ভার যার কাঁধে, তার জন্য দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহাবিষ্ট হওয়া কী করে শোভনীয় হয়? তাদের ভোগবিলাসের জায়গা হলো আখিরাহ। নিজের অধীনস্থ মানুষের দেখভালের জন্য তারা রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে যাবে, দুনিয়াকে পিষে ফেলবে পায়ের তলায়। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। আমরা দেখেছি, উম্মাহর সোনালী যুগের খলিফারা আল্লাহর রাসূলের রেখে যাওয়া সেই সুন্নাহর অনুসরণ করেছেন। দুনিয়ার ভোগবিলাসের সমস্ত উপকরণকে পায়ে ঠেলে এই উম্মাহকে আগলে রেখেছেন নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে। আল্লাহ তাদের ওপরও সন্তুষ্ট হোন।

মুশরিকদের সাথে বারাহ ঘোষণা এবং জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরী ৯ম সনে আবু বকর সিদ্দীককে ؓ হাজ্জের আমীর হিসেবে মনোনীত করলেন। সে সময় মক্কার কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে ছিল। কিন্তু তখনও মূর্তিপূজারীরা তাওয়াফ করার জন্য কাবাঘরে আসতো। নগ্ন হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করার ঐতিহ্য তারা তখনো বজায় রেখেছে। তারা বিশ্বাস করতো যে তাদের অপবিত্রতা ও পাপের কারণে তাদের পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করাটা অনুচিত। তাই তারা কুরাইশদের পোশাক ধার করে তাওয়াফ করতো। কুরাইশদের ব্যবহার্য পোশাককে পবিত্র মনে করা হতো। কিন্তু কাপড় ধার করার মতো সচ্ছলতাও সবার ছিল না, তারা তাই নগ্ন হয়েই তাওয়াফ করতো। শিরক ও নগ্নতার এই পরিবেশে আল্লাহর রাসূল ﷺ হাজ্জ করতে চাইলেন না।

আবু বকর আস-সিদ্দীক ؓ কয়েকশো সাহাবিকে নিয়ে হজ্জ করতে গেলেন। তখন নাযিল হলো সূরা বারাহ অর্থাৎ তাওবার প্রথম দিকের কিছু আয়াত। কিন্তু ততক্ষণে আবু বকরের নেতৃত্বে সাহাবিরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এই আয়াতগুলোকে আবু বকরের ؓ কাছে পৌঁছে দিতে আলী ইবন আবি তালিবকে ؓ পাঠান। তিনি আলীকে ؓ বললেন, 'সূরা তাওবার এই আয়াতগুলি

নিয়ে যাও। সবাই মীনায় জড়ো হওয়ার পর এই আয়াতগুলো পড়ে শুনাবে। তাদের বলে দাও, কোনো কাফির ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কোনো মুশরিক এই বছরের পর হজ্জ পালন করতে পারবে না। আর কোনো নগ্ন ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের চারপাশে তাওয়াফ করতে পারবে না। তবে যারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ চুক্তিবদ্ধ আছে, তাদের চুক্তি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্তই বহাল থাকবে।

"সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ করো এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা করো, তবে তা, তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না।

আর কাফিরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি-বদ্ধ, তারা চুক্তিরক্ষায় কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেওয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবাহ ৯: ১-৫)

এটা একমাত্র সূরা যেটা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু হয় না। কারণ এই সূরাটি শুরু হয় সরাসরি কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার মাধ্যমে। অবশ্য এর অন্যান্য ব্যাখ্যাও রয়েছে। এই সূরার প্রথম শব্দ বারাআ, এর অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। এই আয়াতগুলি সহ আরও কিছু আয়াত আলী ইবন আবি তালিব ﷺ হিজরি ৯ম শতকের হাজ্জে বর্ণনা করেন। মক্কায় মুশরিকদের বিভিন্ন আচার-প্রথা ও উপাসনা দেখা যাওয়ার এটাই ছিল শেষ বছর। এরপর মক্কায় সবরকম শিরক নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এই ঘোষণার মাধ্যমে আরব উপদ্বীপের ইতিহাসে তাওহীদের অধ্যায় সূচিত হয়। এই ঘোষণা ছিল কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের ঘোষণা। এর ফলে, আরবের মুশরিকদের জন্য দুটো পথ খোলা থাকলো -- হয় তারা মুসলিম হবে, ইসলামের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেবে, অথবা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যারা ইতিমধ্যেই আল্লাহর রাসূলের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল, তারা নিরাপদ থাকবে চুক্তির

সময়সীমা পর্যন্ত, এরপরে আর চুক্তি নবায়ন করা হবে না। আর যাদের সাথে কোনো চুক্তি ছিল না, তাদের চারমাসের সময় দেওয়া হলো। এরপর হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না হয় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। এভাবে আরবে শিরকের সমাপ্তি হলো এবং মুশরিকদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো।

আরব গোত্রগুলোর প্রতিনিধি প্রেরণ

> "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।" (সূরা নাসর ১১০: ১-৩)

এই আয়াতটি বলছে, যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে। ইসলাম বনাম শিরকের এই দ্বন্দ্বে অনেকগুলো আরবগোত্র ছিল দর্শকের ভূমিকায়। তারা অপেক্ষা করছিল কখন তারা কুরাইশ ও মুহাম্মাদ ﷺ এর মধ্যে চলমান এই সংঘাতের শেষ দেখতে পাবে ও একটি দলকে বিজয়ী হিসেবে দেখবে। যখন সংঘাত শেষ হলো এবং ইসলামের বিজয় হলো, তখন তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ভিড় জমালো।

আরবরা কুরাইশদের বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখতো কারণ ধর্মীয় বিষয়ে তারাই ছিল কর্তৃত্বের অধিকারী। এতদিন পর্যন্ত তারাই ছিল আল্লাহর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী, হজ্জ ও উমরার নির্দেশনা ও দেখাশোনার দায়িত্ব তাদের ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ যখন নিজেকে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন তখন আরবদের অনেকেই এই সংঘর্ষের শেষ না দেখে কোনো দলে যোগ না দেওয়াকেই শ্রেয় মনে করলো। মক্কা বিজয়ের একদম পরপরই বেশ কিছু আরবগোত্র ইসলাম গ্রহণ করলো; যেমন: সাক্বীফ গোত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলেন, পরে তাদের ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে তারাই আবার এসে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে আরবের সবচেয়ে বড় দুটি গোত্র – কুরাইশ ও সাক্বীফ ইসলাম গ্রহণ করার পর অন্য সব গোত্রও দলে দলে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে লাগলো ইসলাম গ্রহণের জন্য। এজন্য ৯ম হিজরি সালকে বলা হয় 'আম-আল উফুদ' অর্থাৎ প্রতিনিধিদলদের বছর।

সূরা তাওবার এই আয়াতগুলো নাযিল হবার পর এই গোত্রগুলো তাদের প্রতিনিধিদল পাঠানো শুরু করলো। তারা ইসলাম সম্পর্কে জানলো ও ইসলাম গ্রহণ করলো, রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাইয়াত দিত। এই বাইয়াত শুধু ইসলাম গ্রহণের বাইয়াত ছিল না, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার ছিল। তারা কেবল দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করতো তা নয়, বরং তারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সদস্য হয়ে যেতো, বা এখনকার পরিভাষায় বলা যেতে পারে নাগরিক হিসেবে শপথ করতো। তাদের বাইয়াত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি। এই

বাইয়াতের মাধ্যমে তারা তাঁর শাসন ও হুকুম-আহকাম মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকার করতো। এই গোত্রগুলো মদীনা থেকে ইসলামের বেশ ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নিজ নিজ গোত্রে ফিরে যায়।

সীরাতের কিতাবগুলোতে ইবন কাসীর, ইবন ইসহাক, আল ওয়াকিদী প্রায় ষাটটি প্রতিনিধিদলের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু দল নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে। কিন্তু মনে রাখা জরুরি, মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামে গ্রহণ করা এই মুসলিমদেরকে সাহাবির মর্যাদা দেওয়া হলেও, মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করা সাহাবিদের মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশি। কারণ মক্কা বিজয়ের পর এই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুসলিমরা দুনিয়াতেও সফল হতে যাচ্ছে। এই গোত্রগুলো রাজনৈতিক অনুকূল পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বলা যেতে পারে, ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তের পেছনে তাদের দুনিয়াবি কিছু স্বার্থ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর আগে যারা প্রতিকূল অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা জানতো যে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনেক বড় ত্যাগ করতে হতে পারে। তাই যে যত আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মর্যাদা তত বেশি।

> **"...তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে।..." (সূরা হাদীদ ৫৭: ১০)**

সাক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল

সাক্বীফ গোত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে তারা চেয়েছিল সমঝোতায় পৌঁছতে। তারা চাচ্ছিলো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে ঠিকই কিন্তু তাদের প্রধান দেবতার মূর্তিকে যেন এক বছরের জন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের ধারণা ছিল হঠাৎ করে এত বছরের পুরোনো দেবতাকে মাটির সাথে মিশে যেতে দেখলে গোত্রের সাধারণ জনগণ একটা বড় রকমের ধাক্কা খাবে, বিষয়টা মেনে নিতে পারবে না। তারা এও চাচ্ছিলো তাদের ওপর যেন ব্যভিচার, মদপান, সুদ খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া না হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের একটি দাবিও মানলেন না। এরপর তারা চাইলো অন্তত এক মাসের জন্য হলেও যেন ছাড় দেওয়া হয়। তবু রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হলেন না। যখন তারা বুঝলো আল্লাহর রাসূল এরকম কিছুর অনুমতি দেবেনই না, তখন তারা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, তবে আমরা আমাদের মূর্তি ভাঙবো না। আপনাদের মধ্যে কাউকে পাঠিয়ে এ কাজটি করতে হবে।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ান ও মুগীরাহ ইবন শু'বাহকে رضي الله عنه পাঠালেন। মুগীরাহ নিজেই ছিলেন সাক্বীফ গোত্রের। তারা যখন মূর্তি ভাঙতে গেলেন, তখন সাক্বীফরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো এই বলে যে তাদের ওপর কুষ্ঠরোগসহ অন্যান্য

রোগব্যাধি, বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশা আপতিত হবে। তারা আসলেই বিশ্বাস করতো মূর্তি ভেঙে ফেললে তাদের ওপর গজব নেমে আসবে। তাদের এই কুসংস্কার ভুল প্রমাণ করার জন্য মুগীরাহ একটি ফন্দি আঁটলেন। তিনি মূর্তিতে আঘাত করার পর ভান করলেন তিনি জোরে একটা ধাক্কা খেয়েছেন আর সেই ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেলেন। সবাই এটা দেখে খুশি হয়ে গেল, ভাবলো, নিশ্চয়ই মুগীরাহর কর্মকাণ্ডে দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করে ফেলে দিয়েছে। তারপর মুগীরাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আরে বোকার দল! এটা এক টুকরো পাথর ছাড়া কিছুই না।' এরপর তিনি সেটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললেন।

বনু তামীম থেকে আগত প্রতিনিধিদল

বনু তামীম থেকেও প্রতিনিধিদল আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো, বনু তামীম!' তারা বললো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুসংবাদ তো দিয়েছেন, এখন আমাদের কিছু দিন।' বনু তামীম আসলে রাসূলুল্লাহর সুসংবাদের চেয়েও হাতেনাতে দুনিয়াবী ফল পেতে বেশি আগ্রহী ছিল। তাদের এই মনোভাব রাসূলুল্লাহর ﷺ পছন্দ হলো না। এরপর ইয়েমেন থেকে একটা প্রতিনিধিদল এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো, কেননা বনু তামীম তা গ্রহণ করেনি।' তারা জবাব দিলো, 'আমরা গ্রহণ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ।'

যখন কোনো প্রতিনিধিদল আসতো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের একজনের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করতেন। বনু তামীমের ছিল দুইজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি -- আকরা ইবন হাবিস ও কাকা ইবন মাবদ ইবন যুরারা। আবু বকর ﷺ আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বললেন যেন কাকা ইবন মাবদকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। আর উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বললেন যেন আকরা ইবন হাবিসকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। আবু বকর শুনে রেগে গেলেন, বললেন, 'আমার বিপরীতে তোমাকে কিছু একটা বলতেই হবে, তাই তুমি এমনটা করেছো!' উমার এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং তারা দু'জন তর্কে লিপ্ত হলেন। তাদের কণ্ঠস্বর জোরালো হতে লাগলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন আয়াত নাযিল করলেন,

> "মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" (সূরা হুজুরাত ৪৯: ১)

আব্দ-কাইসের প্রতিনিধিদল

আরবের একদম পূর্ব দিকের গোত্র বনু আব্দিল কাইস থেকে প্রতিনিধিদল আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের চারটি জিনিসের আদেশ দিচ্ছি ও চারটি জিনিস হতে সতর্ক করছি। আমি তোমাদের আদেশ করছি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

স্থাপন করতে। তোমরা কি জানো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বলতে কি বোঝায়? আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন বলতে বোঝায় এটা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদানে সাওম পালন করা এবং গনিমতের এক পঞ্চমাংশ দান করা।' জিহাদের ময়দানে যে গনিমত পাওয়া যায়, তার এক পঞ্চমাংশ আমীর অর্থাৎ নেতাকে দান করে দেওয়াটা ছিল নিয়ম। এরপর তিনি চারটি জিনিস থেকে দূরে থাকতে বললেন। সেগুলি ছিল চার রকমের পাত্র, যেগুলি দ্বারা মদ পান করা হতো। অর্থাৎ তিনি তাদের মদপান থেকেই শুধু নয়, বরং মদপানের জন্য ব্যবহৃত পাত্রগুলি ব্যবহার করা থেকেও দূরে থাকতে বললেন।

বনু হানীফার প্রতিনিধিদল

বনু হানীফা গোত্র থেকে একটা প্রতিনিধিদল এসেছিল। বনু হানীফা গোত্রের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে, যারা ছিল আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে সবচাইতে শত্রুভাবাপন্ন এবং রূঢ়। সেই গোত্রে ছিল মুসাইলামা। মুসাইলামা ইসলামের ইতিহাসে পরিচিত মুসাইলামা আল-কাযযাব বা মিথ্যাবাদী মুসাইলামা নামে। কারণ আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশাতেই সে নবুওয়াতের মিথ্যে দাবি করেছিল।

মুসাইলামা আল কাযযাব এসে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে দাবি করলো যদি তাঁর মৃত্যুর পর মুসাইলামাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তবে সে রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসারী হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এক টুকরো খেজুরের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'তুই যদি আমার কাছে এই খেজুরের ডালটাও চাস, সেটাও পাবি না। আল্লাহ তোর জন্য যা রেখেছেন তার চাইতে এক বিন্দু বেশিও তুই পাবি না। তুই যদি ফিরে যাস, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করবেন। আর আমার বিশ্বাস তুই-ই সে-ই, যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমার পক্ষ হয়ে সাবিত ইবন কাইস তোর সাথে কথা বলবে।' এই বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ চলে গেলেন।

যে স্বপ্নের কথা তিনি বলছিলেন সেটা অন্য বর্ণনায় এসেছে। স্বপ্নটা ছিল এমন: রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে তাঁর দুই হাতে দুটো বালা দেখেছেন। তাঁকে বলা হলো যেন তিনি সেগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ফুঁ দিলেন আর সেগুলো উড়ে গেল। এই দুটো বালা হলো দুই মিথ্যা নবী আসওয়াদ আল আনসি এবং মুসাইলামা আল-কাযযাব।

এই মুসাইলামা পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। লিখেছিল হিজরি দশ বা এগারো সালে। সে লিখেছিল, 'আল্লাহর রাসূল মুসাইলামা থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিলাম। যাই হোক, গোটা রাজ্যের অর্ধেক ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে, আর বাকিটা কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।'

সে আল্লাহর রাসূলের সাথে সমান-সমান ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ চিঠির জবাবে লিখলেন,

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে মিথ্যাবাদী মুসাইলামার প্রতি, শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি, যারা পথনির্দেশ অনুসরণ করে। এই জমিন আল্লাহর এবং তিনি এটা যাকে ইচ্ছা দান করেন। চূড়ান্ত সফলতা তাদের জন্য যারা ন্যায়নিষ্ঠ।'

যে দু'জন মুসাইলামার এই চিঠি বহন করেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে আমিই আল্লাহর রাসূল?' তারা বললো, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস করি। যদি আমি কখনো কোনো বার্তাবাহককে হত্যা করতাম, তবে আমি তোমাদের হত্যা করতাম।' অর্থাৎ, পত্রবাহককে হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ, যদিও তারা কাফির বা মুরতাদ বাহিনীর হয়। আল্লাহর রাসূল যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মুসাইলামা অনেক বাগাড়ম্বর করলেও সরাসরি বিদ্রোহ করার সাহস দেখায়নি। তাকে দমন করা হয় আবু বকরের ﷺ খিলাফতকালে।

নাজরান থেকে প্রতিনিধিদল

এরপর আসে নাজরানের প্রতিনিধিদল। এই দলটি ছিল খ্রিস্টান। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর একটি চিঠির জবাবে তারা দেখা করতে আসে। সে চিঠিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন। সেখানে বলা ছিল, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের হাতে দুটো রাস্তা খোলা থাকবে -- হয় তারা জিযিয়া দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, অথবা মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। এই চিঠি পেয়ে নাজরানের রাজা ১৪ জন সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান নেতাকে মদীনায় পাঠালো।

তারা মদীনায় এল খুব জমকালো পোশাকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের এই সাজপোশাক দেখে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। পরদিন তারা সাধারণ বেশে এল। এরপর আল্লাহর রাসূল তাদের সাথে দেখা করলেন, তাদের ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। তারা প্রত্যাখ্যান করলো এবং দাবি করলো তারাই হকের ওপরে আছে। বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। ঈসাকে ﷺ তারা আল্লাহর পুত্র বলে সাব্যস্ত করতো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল বললেন ঈসা ﷺ আল্লাহর পুত্র নন, বরং তিনি আল্লাহর একজন রাসূল। তারা ঈসাকে ﷺ আল্লাহর পুত্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বললো, 'ঠিক আছে তাহলে এমন একজনের উদাহরণ দিন যাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে।' তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ভুল প্রমাণ করে আয়াত নাযিল করলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত, তিনি তাকে মাটি দ্বারা

> সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, হও, ফলে সে হয়ে গেল। সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৫৯-৬০)

এই আয়াতটিই তাদের থেমে যাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এরপরেও তারা তর্ক চালিয়ে গেল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের মুবাহালার আমন্ত্রণ জানালেন। মুবাহালা হলো দুই বিবাদমান পক্ষ কামনা করবে তাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার ওপর যেন আল্লাহ তাআলার গজব নেমে আসে। কুরআনে এই মুবাহালার কথা এসেছে।

> "অতঃপর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে তোমার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে, তবে তুমি তাকে বলো, এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আর আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে, তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত করি।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৬১)

সূরা আলে ইমরানের প্রায় আশিটি আয়াত নাযিল হয়েছিল এই প্রেক্ষাপটে। মুবাহালার শর্ত অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল পরের দিন আলী ইবন আবি তালিব ﷺ, হাসান ﷺ, হুসাইন ﷺ এবং ফাতিমাকে ﷺ নিয়ে হাজির হলেন মুবাহালায় মোকাবেলা করার জন্য। কিন্তু খ্রিস্টানরা মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি হলো না। যদিও তারা অনেক তর্ক করছিল, কিন্তু তারা মুবাহালায় গেল না এই ভেবে যে যদি সত্যিই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল হন তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই তারা তর্কে না গিয়ে রাসূলুল্লাহর বিচার ﷺ মেনে নিতে রাজি হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থেকে কিছু সম্পদের বিনিময়ে শান্তিচুক্তি করলেন। চলে যাওয়ার সময় তারা বললো, 'আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি তোমাদের সাথে এমন একজনকে প্রেরণ করবো যে, পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত।' তারপর তিনি পাঠালেন আবু উবাইদা ইবন আল-যাররাহকে ﷺ। এই কারণেই আবু উবাইদা আমর ইবন আল-যাররাহকে বলা হয় এই উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

বনু সাদ ইবন বাকর গোত্র থেকে প্রতিনিধি

বনু সা'দ ইবন বাকর গোত্র থেকে একজনই প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন, তার নাম দিমাম ইবন সালাবা ﷺ। মুসনাদ আহমাদের বর্ণনায়, দিমাম আসলেন, উটকে বাইরে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সাহাবিদের সাথে বসা। সে এসেই জিজ্ঞেস করলো,

- তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে?

- আমিই আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র, রাসূলুল্লাহ উত্তর দিলেন।

যদিও রাসূলুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের নাতি। কিন্তু আবদুল্লাহ মুত্তালিব ছিলেন অনেক বিখ্যাত, তাই তার নামেই তার পরিবারকে সবাই চিনতো। আর পূর্বপুরুষদেরকে আরবরা পিতৃতুল্য মনে করতো।

- আচ্ছা, আপনিই কি মুহাম্মাদ?

- হ্যাঁ।

- আমি আপনাকে সোজাসাপ্টা কিছু প্রশ্ন করবো, আশা করি আপনি রেগে যাবেন না।

- না, আমি রাগবো না। তোমার যা বলার আছে বলতে পারো।

- আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, তিনি কি আপনাকে একজন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

- হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, তিনি আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

- আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে আপনার কাছে জানতে চাই, তিনি কি আপনাকে আদেশ করেছেন আমরা যেন শুধু তারই ইবাদাত করি এবং এই দেবতাদের উপাসনা করা ছেড়ে দেই?

- হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, তিনি বলেছেন।

- আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে প্রশ্ন করছি, তিনি কি আপনাকে আদেশ করেছেন যেন আমরা এই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি?

- হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, তিনি তাই আদেশ করেছেন।

এভাবে দিমাম তাঁকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ নিয়েই একই প্রশ্ন করলেন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই উত্তর দিলেন। তারপর সে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউই নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আমি সেসবের অনুসরণ করবো যা আপনি আদেশ করেছেন এবং সেসব থেকে বিরত থাকবো যেসব থেকে আপনি বিরত থাকতে বলেছেন। এর সাথে কিছুই যোগ করবো না বাদ দেবো না।'

দিমাম তার গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার বরকতময় দাওয়াতে সেই দিনেই তার গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন আব্বাস ﷺ তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা আর কোনো প্রতিনিধিদলের কথা জানি না যেটা কিনা দিমাম ইবন সালাবার চাইতে চেয়ে বেশি বরকতময় ছিল।'

আদী ইবন হাতিমের ﷺ কাহিনী

আদী ইবন হাতিম ছিলেন বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈয়ের সন্তান। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। আরবের ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়ার বদৌলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তার

তেমন মোটেও উচ্চ ধারণা ছিল না। আদী ইবন হাতিমের মূল বর্ণনাকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও অনুলিখিত আকারে জানা যাক,

'আমি রাসূলুল্লাহকে যতটা ঘৃণা করতাম, আরবের কেউ তাকে এতটা ঘৃণা করতো না। আমি নিজে ছিলাম অভিজাত বংশের লোক, খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী। গনিমতের এক-চতুর্থাংশ আমি লাভ করতাম। নিজ গোত্রে রাজার হালে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে যখন শুনলাম, প্রচণ্ড ঘৃণা হলো। এক আরবি গোলামকে বললাম, কিছু বেগবান আর হৃষ্টপুষ্ট উটকে কাছাকাছি বেঁধে রাখিস তো। মুহাম্মাদের বাহিনী যদি আক্রমণ করে, আমাকে খবর দিস। একদিন সকালে সে এসে আমাকে জানালো, মুহাম্মাদের বাহিনী এসে পড়েছে, কী করতে চান করে ফেলুন। বললাম, উটগুলো নিয়ে আয়।

আমি আমার পরিবার আর সন্তানদের নিয়ে শামে খ্রিস্টানদের কাছে চলে এলাম, ফেলে আসলাম আমার বোনকে। রাসূলুল্লাহর বাহিনীর হাতে অনেকের সাথে আমার বোনও বন্দী হলো। তাকে রাখা হলো মসজিদের সামনে খোঁয়াড়ের মতো একটি স্থানে। বন্দীদের সেখানেই রাখা হতো। আমার বোন বেশ বুদ্ধিমতী, স্পষ্টভাষী ছিল। সে আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবা মারা গেছেন। আর আমাকে যিনি দেখাশোনা করতেন, তিনি আমাকে ফেলে গেছেন। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।

এভাবে তিন দিন সে অনুরোধ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার প্রতি সদয় হয়েছি। তুমি তাড়াহুড়া কোরো না। যদি তোমার গোত্রের নির্ভরযোগ্য এমন কাউকে পাও যে তোমাকে দেশে পৌঁছে দেবে, আমাকে জানিও।

এরপরে আমার বোন একটি কাফেলার সন্ধান পেল। রাসূলুল্লাহ তখন তাকে কাপড়চোপড়, বাহন আর পথখরচ দিলেন। আমার বোন সেই কাফেলার সাথে করে শামে চলে এল। আমি আমার পরিবারের সাথে বসে আছি, এমন মুহূর্তে আমার বোন কাফেলা থেকে নামলো। আমাকে দেখেই তিরস্কার করতে লাগলো, জালিম! সম্পর্কচ্ছেদকারী! কীভাবে পারলে তুমি নিজের বৌ-বাচ্চাকে নিয়ে যেতে আর নিজের বাবার মেয়েকে ফেলে আসতে?

আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করে মাফ চাইলাম। আমার বোনের কাছে জানতে চাইলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে। সে বললো, তোমার উচিত তার সাথে দেখা করা। তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তার সাথে যারা আগে দেখা করবে, তাদের প্রতি তিনি সদয় হবেন। আর যদি রাজা হয়ে থাকেন, তবে তার মহত্ত্বের সামনে তোমার ছোট হবার কিছু নেই, তুমি তুমিই থাকবে।

আমি মদীনায় চলে গেলাম, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট পৌঁছলাম। তিনি তখন মসজিদে বসা। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমি কে। আমি বললাম, আমি আদী ইবন হাতিম। তিনি তখন আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এক

জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধার সাথে তাঁর দেখা। বৃদ্ধা তাঁকে দাঁড়াতে বললো, দীর্ঘক্ষণ ধরে তার প্রয়োজনের কথা খুলে বললো। এই দৃশ্য দেখে মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, এই মানুষটা কিছুতেই রাজা হতে পারে না।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে সামনের দিকে এগোলেন। ঘরে ঢুকে আমাকে একটা বালিশ দিয়ে বললেন, এর উপরে বসো। সেই বালিশের বাহিরে চামড়া, ভেতরে খেজুরের বাকল। তিনি নিজে বসলেন মাটিতে। আমি মনে মনে ভাবলাম, নাহ, আল্লাহর কসম, কোনো রাজা এমন আচরণ করে না।

এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তুমি কি রাকূসি উপদলের? আমি বললাম, জ্বী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার গোত্রের গনিমতের চার ভাগের এক ভাগ ভোগ করো, তাই না? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, কিন্তু তোমার ধর্ম অনুযায়ী এটা তো তোমার জন্য বৈধ না, তাই না? আমি স্বীকার করলাম, হ্যাঁ।

এতক্ষণে আমার আর বুঝতে বাকি থাকলো না, তিনি আল্লাহর নবী। যা বলা হয় না, তাও তিনি জানেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, শোনো আদী, চারপাশের অভাব-পীড়িত মানুষদের দেখে হয়তো তুমি এই দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছো, কিন্তু আল্লাহর কসম, সেই দিন খুব দূরে নয়, যেদিন ধন দৌলত এসে উপচে পড়বে আর সেগুলো নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো শত্রুর সংখ্যাধিক্য আর এই মানুষগুলোর দুর্বলতা তোমাকে এই দ্বীন গ্রহণ থেকে পিছপা করে রেখেছে। কিন্তু আল্লাহর কসম, সেই দিন খুব দূরে নয় যেদিন দেখবে একজন নারী সুদূর কাদিসিয়া থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করবে। আদী, হয়তো এই জিনিস দেখে তোমাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে যে তুমি দেখছো রাজত্ব আর বাদশাহী অন্যদের মাঝে। কিন্তু আল্লাহর কসম, সেই দিন খুব দূরে নয়, যখন শুনতে পাবে বাবেলের শ্বেত পাথরগুলো মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়েছে।

আল্লাহর রাসূলের এ কথাগুলো শোনার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।'

আদী ইবন হাতিমের ﵁ ঘটনা থেকে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

প্রথমত, জনপ্রিয় মিডিয়া বা লোকের কথায় কান না দিয়ে নিজে যাচাই করা। আরবের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে অনেক মিথ্যা গুজব শুনে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো। কিন্তু তাদেরই পরিচিত ও বিশ্বস্ত কারো থেকে যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে জানতো, তখন তাঁর সাথে দেখা করার সাহস ও আগ্রহ পেত। আদী ইবন হাতিমের ক্ষেত্রেও আমরা তা দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রাসূল ﷺ আর দশটা রাজা-বাদশার মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন মদীনার শাসক, এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি। কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী মানুষটি

দীর্ঘক্ষণ ধরে জীর্ণ-শীর্ণ, দরিদ্র বৃদ্ধ মানুষদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন, মন দিয়ে তাদের কষ্ট আর অভিযোগের কথা শুনতেন। অতিথিকে ভালো বালিশ দিয়ে নিজে মাটিতে বসে কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। এ দুটো দৃশ্য আদী ইবন হাতিমের মনে দাগ কাটে। তিনি বুঝতে পারেন, একজন রাজা কখনো এতটা মাটির মানুষ হতে পারেন না।

তৃতীয়ত, আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের মনের কথা পড়তে পারতেন। তিনি আদী সম্পর্কে জানতেন। মদীনার সাদামাটা পরিস্থিতি দেখে রাজার হালে বড় হওয়া আদী ইবন হাতিম যে কিছুটা অস্বস্তি আর সংকোচবোধ করছিলেন সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাকে অভয় দিয়েই বললেন, এই অবস্থা সাময়িক, শীঘ্রই পরিস্থিতি বদলে যাবে। একজন দাঈর মধ্যে এই গুণ থাকা খুব জরুরি। মানুষের মন-মানসিকতা ভেদে দাওয়াহর ভাষা ও ধরন উপযোগী হওয়া জরুরি।

চতুর্থত, আদী ইবন হাতিমের গলায় ক্রুশ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন, 'তারা তাদের যাজকদের আল্লাহর পাশে শরীক করেছে।' আদী তখন বললেন, 'আমরা আমাদের যাজকদের আল্লাহর পাশে উপাস্য হিসেবে শরীক করি না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? তারা কি হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করেনি?' আদী জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'এটাই তাদের উপাসনা করার শামিল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে শিরকের একটি প্রকার নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। যখন কোনো সরকার বা কর্তৃপক্ষ হালালকে হারাম ঘোষণা করে বা হারামকে হালাল করে, তখন সেই কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করাটা শিরক হয়ে যায়, কারণ এর এখতিয়ার শুধুমাত্র আল্লাহর। আইন প্রণয়ন বা বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহর। আর কারো এই অধিকার নেই।

পঞ্চমত, বাহ্যিক চাকচিক্য আর বস্তুগত সাফল্যের ভিত্তিতে কোনো আদর্শ বা ধর্মকে বিচার করা উচিত নয়। আদী দেখতে পাচ্ছিলেন মুসলিমরা দরিদ্র। তাদের তেমন সহায়-সম্বল নেই, ভালো ঘরবাড়ি, উন্নত রাস্তাঘাট বা যাতায়াতব্যবস্থা নেই, জীবনযাত্রার উন্নত মান নেই, যেটা রোমানদের ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে ইসলাম ভুল আর রোমানরাই সঠিক! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, মুসলিমদের অবস্থাও একসময় বদলে যাবে, উন্নত হয়ে যাবে। আর সেটাই হয়েছিল। আদী ইবন হাতিম নিজের চোখে মুসলিমদের অবস্থা বদলে যেতে দেখেছিলেন।

ইয়েমেনের আজদ থেকে আগত প্রতিনিধিদল

আরবের দক্ষিণে ইয়েমেনের আজদ থেকে সাতজনের একটি প্রতিনিধিদল আসে। তাদের সাথে মদীনার আনসারদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চরিত্র, আচার-ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কারা?' তারা বললো, 'আমরা বিশ্বাসী।' রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে

বললেন, 'সব কথার পেছনে একটা বাস্তবতা থাকে। তোমাদের এই কথার পেছনে বাস্তবতা কী?' তারা বললো, 'আমাদের পনেরটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের পাঁচটি আপনার দূতদের মাধ্যমে আমরা আদিষ্ট হয়েছি, পাঁচটি আপনি আমাদের পালন করার আদেশ দিয়েছেন এবং পাঁচটি আমরা জাহেলিয়াত থেকে আমরা পালন করে আসছি, যদি না সেগুলিকে আপনি ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমার দূতরা যে আদেশ দিয়েছেন সেগুলি কী কী?' তারা জবাব দিলো, 'আমরা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাসমূহ, তাঁর নবী-রাসূলগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করতে আদিষ্ট হয়েছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যে আদেশগুলো দিয়েছি সেগুলো কী কী?' তারা বললো, 'আপনি আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এই সাক্ষ্য দিতে, সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, রামাদানে সাওম পালন করতে ও যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের হজ্জ সম্পাদন করতে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আর জাহিলিয়াতের যে পাঁচটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তোমরা ধরে রেখেছ সেগুলো কী?' তারা বললো, 'স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞ থাকা, কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকা, ভাগ্যে যা আছে তা মেনে নেয়া, যখন পরস্পর প্রতিপক্ষরা একত্র হয় তখন সত্যবাদী থাকা এবং প্রতিপক্ষের বিপদে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ উদযাপন না করা।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ এবং তোমাদের জ্ঞানের বদৌলতে তোমরা প্রায় নবীদের সমকক্ষতা অর্জন করেছো!' তাদের কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা যা কিছু বললে তা যদি পছন্দ করে থাকো, তবে আমি তোমাদের আরও পাঁচটি দেবো যার কারণে তোমরা বিশটি বৈশিষ্ট্য লাভ করবে। সেগুলো হলো -- যা তোমরা খাবে না তা জমা কোরো না, যেখানে তোমরা বাস করবে না সেখানে কিছু নির্মাণ করবে না, এমন কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে না যা তোমরা আগামীকাল পরিত্যাগ করবে, আল্লাহকে ভয় করবে যার প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে ও যার সামনে তোমাদের প্রকাশিত হতে হবে এবং তোমাদের সামনে যা আছে যেখানে তোমাদের চিরকাল বাস করতে হবে (অর্থাৎ আখিরাত) তার জন্য সংগ্রাম করো।' এ শুনে তারা ফিরে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপদেশ মেনে চলল।

এগুলো ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আসা প্রতিনিধিদলগুলির মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা। এটা তাঁর জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত একটা বছর ছিল। তাঁর জীবনসায়াহ্নের এই দিনগুলোতে আরবের সব প্রান্ত থেকে দলে দলে লোকেরা এসে ইসলাম গ্রহণ করছিল। মূলত তাঁর দাওয়াতী জীবনে যা কিছু তিনি করেছিলেন, তার ফসল এই সময়ে পাচ্ছিলেন ।

ইয়েমেনের অধিবাসীদের প্রতি দাওয়াহ

আরবের গোত্রগুলো এক এক করে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করতে লাগলো। নতুন এই গোত্রগুলোকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ অভিজ্ঞ এবং

আলিম সাহাবিদেরকে তাদের কাছে পাঠালেন। মুআয ইবন জাবাল ﷺ এবং আবু মূসা আল আশআরী ﷺছিলেন সাহাবিদের মধ্যে বিশেষভাবে তাদের ইলম এবং দাওয়ার জন্য পরিচিত। তাদেরকে পাঠানো হলো ইয়েমেনের দুটো ভিন্ন প্রদেশে।

মুআয ইবন জাবালকে ﷺ পাঠানো হয়েছিল ইয়েমেনের উত্তরভাগে। তিনি ছিলেন একাধারে তাদের শাসক, বিচারক, শিক্ষক এবং যাকাত সংগ্রাহক। মুআযকে ﷺ যখন ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। মুআয ﷺ বসে আছেন সওয়ারীর পিঠে, আর আর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাথে হেঁটে হেঁটে কথা বলছেন। মুআযকে তিনি বললেন,

> *'তুমি আহলে কিতাবদের একটি ক্বওমের কাছে যাচ্ছো। তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহবান হবে, তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেয়। তারা তা মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচ বার সালাত ফরজ করে দিয়েছেন। তারা সালাত আদায় করা শুরু করলে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তাদের প্রতি যাকাত ফরজ করেছেন। এই যাকাত গ্রহণ করা হবে তাদের ধনী লোকদের থেকে, আর এই যাকাত বণ্টন করা হবে তাদেরই গরীবদের মধ্যে। তারা যদি সেটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করো। তবে লোকজনের ধন-সম্পদের উত্তম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। সাবধান! মযলুমের দুআকে ভয় করবে। কারণ তার দুআ আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।'*[115]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআযকে আরও বললেন, 'মুআয, এর পর হয়তো তোমার সাথে আর দেখা হবে না। তুমি হয়তো কেবল আমার মসজিদ এবং কবরটাই দেখবে।' এ কথা শুনে মুআয কেঁদে ওঠেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন এটা ছিল আল্লাহর রাসূলের সাথে তার শেষ সাক্ষাৎ।

আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু মূসা আল-আশআরীকে ﷺ পাঠালেন ইয়েমেনের দক্ষিণে। তার ভূমিকা ছিল মুআয ইবন জাবালের ﷺ মতোই -- শাসক, বিচারক, শিক্ষক এবং যাকাত সংগ্রাহক। তাদের দু'জনকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ উপদেশ দিলেন,

> *'(লোকেদের কাছে দ্বীনকে) সহজ করে দাও, কঠিন কোরো না। সুসংবাদ দাও, মানুষকে তাড়িয়ে দিও না।'*

আবু মূসা আল-আশআরী ﷺ এবং মুয়ায ইবন জাবালের ﷺ প্রতি আল্লাহর রাসূলের দেওয়া উপদেশ থেকে বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

---

[115] সহীহ বুখারি, অধ্যায় তাওহীদ, হাদীস ২। সুনান ইবন মাজাহ, অধ্যায় যাকাত, হাদীস ১।

১) সাধারণভাবে যে অঞ্চল থেকে যাকাত আদায় করা হয়, সেটা সেই অঞ্চলেই খরচ করা হবে। তবে যদি অন্য কোনো অঞ্চলে প্রয়োজন থাকে, সেক্ষেত্রে সেই অঞ্চলে যাকাত খরচ করা যাবে।

২) যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করার সময় ভালো বা খারাপ মানের সম্পদ না নিয়ে মাঝারি বা গড়পড়তা মানের সম্পদ যাকাত হিসেবে নেওয়া উচিত।

৩) আল্লাহর রাসূল ﷺ মুআযকে সাবধান করছেন যেন তার দ্বারা মানুষের ওপর জুলুম না হয়। শাসকের হাতে ক্ষমতা থাকে, আর তার দ্বারা জুলুম সংঘটিত হওয়া সবচেয়ে সহজ। কিন্তু মানুষের প্রতি জুলুম করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। কারণ মজলুমের দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

৪) জিহাদে প্রয়োজন কঠোরতা, আর দাওয়াতে প্রয়োজন বিনয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুআয এবং আবু মূসাকে ﷺ উপদেশ দিচ্ছেন, তারা যেন মানুষের সাথে বিনয়ী হন, দ্বীনকে সহজভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেন। অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন থেকে দূরে থাকেন এবং মানুষের সাথে রূঢ় আচরণ না করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুত্তাক্বী ব্যক্তিরাই আমার আপনজন, তারা যে-ই হোক, তারা যেখানেই থাকুক।' এর মানে হলো, রাসূলুল্লাহর ﷺ আপন মানুষ হলো তাকওয়ায় অগ্রগামী মানুষেরা। তারা কোথা থেকে এসেছে, তাদের পরিচয় কী সেটা মুখ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবন জাবালকে ﷺ আরও বলেন, 'বিলাসিতা সম্পর্কে সাবধান হও, কারণ আল্লাহর বান্দারা বিলাসিতায় লিপ্ত হয় না।'

হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ﷺ ইয়েমেনের হামদান গোত্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছয় মাসের মতো সেখানে অবস্থান করার পরও সেখানকার মানুষজন তার দাওয়াতে তেমন সাড়া দিলো না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তার বদলে আলীকে ﷺ পাঠালেন। আলীকে বলে দিলেন, সৈনিকদের মধ্যে কেউ চাইলে খালিদের সাথে ফেরত আসতে পারে অথবা আলীর সাথেও থেকে যেতে পারে। সেখানে পৌছে আলী ﷺ তার অধীনস্থ সব মুসলিমদের কাতারবন্দী করে জামাতে সলাত আদায় করলেন।

এরপর তিনি হামদান গোত্রকে একত্র করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ চিঠি পড়ে শুনালেন। সেই চিঠি পড়ে পুরো হামদান গোত্র মুসলিম হয়ে গেল। আলী ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ এই সুসংবাদ চিঠি লিখে জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব খুশি হলেন, সিজদায় পড়ে গেলেন আর বললেন, 'হামদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!'

আলী ﷺ এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না সেটা নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে এমন লোকদের উপর আসীন করে পাঠাচ্ছেন যারা আমার চেয়ে বড়। আমার বয়স কম এবং বিচারক হিসেবে আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আলীর বুকে হাতে রেখে বললেন,

'হে আল্লাহ, তার জবানকে সুদৃঢ় করে দিন, তার অন্তরকে হিদায়েতের উপর রাখুন। আলী, যখন দুই ব্যক্তি বিবাদ করবে এবং তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে তখন তাদের উভয়ের সাক্ষ্য আগে শুনবে। তারপর রায় দেবে। যদি তুমি এভাবে চল, তাহলে বিচার ফায়সালা করা তোমার জন্য সহজ হবে।'

আলী ﷺ বলেন, 'এরপর থেকে আমি আর কখনোই বিচার করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।'

বিচারক হিসেবে আলী ﷺ কতটা বিচক্ষণ ছিলেন ইতিহাসই সেটার সাক্ষী। তিনি উমার ﷺ এবং উসমানের ﷺ সময় বিচারক ছিলেন। তারা দু'জনেই আলীর ﷺ বিচারের ওপর খুব আস্থাশীল ছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম ও নাজুক বিষয়ের ফায়সালার ভার তার উপর অর্পণ করতেন।

আরবে স্থিতিশীলতা অর্জন

যে মিশন নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ পাঠানো হয়েছিল, সেই মিশন এখন সফলতা প্রাপ্তির পথে। সমগ্র আরবে ইসলামকে তাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। গোত্রভিত্তিক ঐক্য ছেড়ে আরবরা গ্রহণ করলো আদর্শভিত্তিক একটি জীবনব্যবস্থা। ইসলাম আরবদের ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে সক্ষম হলো। যে লোকগুলো বিশ বছর আগেও মূর্তিপূজা করতো, তারাই এখন মূর্তি ভেঙে ফেলছে, এক আল্লাহর ইবাদাত করছে এবং মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবান করছে। আরবের বুক থেকে নৈরাজ্য, গোত্রীয় বৈষম্য, অত্যাচার আর অরাজকতার অবসান ঘটলো। সূচনা হলো এমন এক সভ্যতার যারা নিজেরা ক্ষমা, মহত্ত্ব, ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, আইনের শাসন, সমতা আর ঐক্যের চর্চা করেছে এবং গোটা বিশ্বকে সেই শিক্ষা দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোনো বিচারে সপ্তম শতাব্দীর এই প্রজন্ম ছিল শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।

এটা সত্য যে সবগুলো গোত্র তাওহীদের আক্বীদাকে আলিঙ্গন করে ইসলাম গ্রহণ করেনি। অনেকেই রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে তাদের অন্তরের দরজা ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রশস্ত হয়। প্রতিটি মানুষ ইসলামকে ভালোবেসে ইসলাম গ্রহণ করে না। কেউ দুনিয়াবী কারণে, কেউ রাজনৈতিক স্বার্থেও ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। তবে এই কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তারা ইসলামকে

কাছ থেকে দেখতে পায়। জাহিলিয়াতের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা হলে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, ইসলাম গ্রহণে কোনো বাধা বা চাপ থাকে না। আর এ কারণেই ইসলাম মানুষকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে।

আরবের এই স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ সাহাবিদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিলেন। মক্কার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো আত্তাব ইবন উসাইদকে ﷺ, আর তাইফের গভর্নর ছিলেন উসমান ইবন আল-আস ﷺ। বাযানকে ﷺ ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে বহাল রাখা হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর ইয়েমেনকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়। সানার গভর্নর হয় বাযানের ছেলে শামার, মা'রিব শহরের গভর্নর ছিলেন আবু মূসা আল-আশআরী ﷺ, আল-জুনদে ইয়ালা ইবন উমাইয়্যা, হামদানে আমীর ইবন শামর আল-হামদানী। নাজরান, যামাআ এবং যাবীদ অঞ্চলে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় খালিদ ইবন সাইদ, আমীর ইবন হিযাম (নাজরান), যিয়াদ ইবন লাবীদ (হাদরামাউত), উকাশ ইবন সাউর ﷺ (আস-সাকাসিক এবং আস-সুকুন)।

বিদায় হজ্জ

> “নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল তা মক্কায়, বরকতময় ও বিশ্ববাসীর হিদায়াতের দিশারী বানানো হয়েছিল (এ ঘরকে) । এখানে রয়েছে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, (আরও রয়েছে) মাকামে ইবরাহীম। আর এ ঘরে যে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে। মানবজাতির ওপর আল্লাহর জন্য এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তির এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছানোর সামর্থ্য থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে...” (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৯৬-৯৭)

রাসূলুল্লাহর ﷺ হজ্জ

রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের দশম বছরে হজ্জ করেছিলেন। এই হজ্জকেই বলা হয় বিদায় হজ্জ। এই হাজ্জেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম উম্মাতের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ভাষণ প্রদান করেন। সকল মুসলিম সম্মিলিতভাবে শেষবারের মতো রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখার ও শোনার সুযোগ পায়। মদীনা থেকে তিনি এই একবারই হজ্জ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে চড়ে হজ্জ করেছিলেন। তাঁর এই হাজ্জে কোনো বিলাসিতা ছিল না, নিতান্তই সাদাসিধেভাবে তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই হজ্জ এখনকার মতো ভিআইপি হজ্জ ছিল না। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের হজ্জের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করলেন, এরপর যখন তিনি আরাফাতের ময়দানে তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

> “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।” (সূরা মায়িদা, ৫: ৩)

এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবিরা কাঁদতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ আর বেশিদিন তাদের মাঝে থাকবেন না। উমারকে رضي الله عنه জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কেন কাঁদছেন। তিনি উত্তর দেন, ‘যখন কোনো কিছুর উত্থান ঘটে আর সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে, এরপর তার কেবল পতনই সম্ভব।’ উমার বলতে চাচ্ছিলেন, ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলিমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব কিছুকাল ধরে রাখবে, এরপর আস্তে আস্তে তাদের পতন হবে। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি, সাহাবিদের যুগ ছিল শ্রেষ্ঠ সময়, সেই স্বর্ণযুগ আর কখনো ফিরে আসবে না।

মাসজিদ আল-হারামে এসেই আল্লাহর রাসূল ﷺ কালো পাথর স্পর্শ করে চুমু খেলেন। এরপর তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম তিনবারের তাওয়াফ ছিল দ্রুতগতির তাওয়াফ,

আর পরের চারবার ছিল সাধারণ গতিতে। এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

> “আর স্মরণ করো, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।” (সূরা বাক্বারাহ, ২: ১২৫)

এরপর তিনি মাক্বামে ইবরাহীমকে তাঁর আর কাবার মাঝে রেখে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি আবার কালো পাথর স্পর্শ করলেন, চুমু খেলেন। এরপর পাঠ করলেন সূরা বাক্বারাহ অন্য একটি আয়াত।

> “নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শোকরকারী, সর্বজ্ঞ।” (সূরা বাক্বারাহ, ২, ১৫৮)

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফা ও মারওয়ার মাঝে ‘সাঈ’ করলেন সাতবার। আল্লাহর রাসূল ﷺ উরানাহ উপত্যকায় এসে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, যেটা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। তিনি বললেন,

> *‘লোকেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো! হয়তো আজকের পর আমি আর কখনো এখানে তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারবো না।*
>
> *আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র। কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।*
>
> *জেনে রেখো, জাহিলী যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পায়ের নিচে। শুধু কাবাঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া। জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণের দাবি বাতিল করা হলো। প্রথম যে রক্তপণের দাবি বাতিল করছি, তা হলো রবিয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদের দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।*
>
> *জাহেলী যুগের সুদের প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। তোমাদের কেবল মূলধনের ওপর অধিকার থাকলো। সর্বপ্রথম যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের*

বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো।

নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্ধারিত কালিমা বাক্যের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ভার বহন করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।

আমার পর তোমরা পরস্পর খুনোখুনিতে জড়িয়ে কুফরে পতিত হয়ো না। যারা সালাত আদায় করবে, তারা (পুনরায়) শয়তানের ইবাদাত করবে, এটা শয়তান আশা করে না। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকবে।

তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যদি বিকলাঙ্গ কোনো দাসও তোমাদের উপর নেতা নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তাঁকে শুনবে ও মানবে।

সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তায় না, না বর্তায় সন্তানের অপরাধ পিতার ওপরে। জেনে রেখো, এ নগরে আর কখনো শয়তানের ইবাদাত হবে না, এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তুচ্ছ ভেবে এমন অনেক কাজ তোমরা করবে, যা করলে সে খুশি হবে।

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

তোমাদের গোলাম ও অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে।

জেনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। তোমাদের একের সম্পদ আরেকজনের জন্য বৈধ নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায়, খুশি মনে তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না।

আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ।

নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাপকাঠিতে।

মনে রেখো, সকলকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। সে দিন তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠবে না। আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি । যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের ﷺ সুন্নাহ।

প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'

খুতবা শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে?'

সাহাবিরা উত্তর দিলেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো!'

বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে শিক্ষা

১) রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল জাহিলিয়াতের শেকড় আনুষ্ঠানিকভাবে উপড়ে ফেলছেন। এটা ছিল নতুন যুগের শুরু এবং আগের যুগের সমাপ্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম নিজের ও নিজের পরিবারের হাতে জাহিলিয়াতের নিয়মগুলো বাতিল করছেন। এ কারণে জাহিলিয়াতের যুগে ঘটা রবিয়া ইবন হারিসের হত্যাকাণ্ডের জন্য রক্তপণের দাবি ছেড়ে দিচ্ছেন। তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন, তখন সর্বপ্রথমে আব্বাস ইবন মুত্তালিবের ﷺ সুদ বাতিল করছেন। আব্বাস ﷺ জাহিলিয়াতের যুগে লোকজনকে ধার দিতেন এবং এর ওপর সুদ ধার্য করছিলেন। নিজ চাচার সুদের দাবি বাতিল করে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুধু মূলধন ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। যে কোনো ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো নিজের বা নিজের পরিবারের মাধ্যমে বিষয়টি শুরু করা।

২) আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের সতর্ক করছেন নিজেদের মধ্যকার অনৈক্যের ব্যাপারে। শয়তান কুফফারদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ বাঁধানোর ব্যাপারে তেমন পরোয়া করে না। কারণ তারা ইতিমধ্যেই কাফির হয়ে গেছে এবং তারা জাহান্নামের আগুনে যাবেই। কিন্তু সে মুসলিমদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, কারণ মুসলিমদের সে কাফির বানাতে পারে না, তাই সে তাদের মধ্যে বিভেদ আর অনৈক্য তৈরি করে, মুসলিমদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিয়ে তাদের প্ররোচিত করে এবং ফিতনা বাঁধায়।

৩) আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছেন, কোনো বিকলাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দাসকে যদি আমাদের ওপর নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করে তাহলে তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। এ কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি, শাসক যে-ই হোক, যেমনই হোক, তাদের চরিত্র যা-ই হোক, তাদের বংশপরিচয় যা-ই হোক, সে যদি আল্লাহর কিতাব দিয়ে শাসন করে, তাহলে তাকে মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ দিয়ে শাসন করা একজন শাসকের বৈধ শাসক হবার মূল শর্ত।

৪) আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের বুক থেকে বর্ণ বা গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের বোধকে মুছে ফেলতে চেয়েছেন। ইসলাম একটি সর্বজনীন দ্বীন, কোনো জাতি বা গোত্র বিশেষের দ্বীন নয়। এই দ্বীন যারা পালন করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে তাকওয়ার মাধ্যমে, জাতি, বর্ণ অথবা গোত্রের মাধ্যমে নয়।

৫) আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন, শয়তান হয়তো মুসলিমদের দ্বারা কুফরি করাতে পারবে না, কিন্তু মুসলিমদের গুনাহে লিপ্ত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালাবে। আজকে আমরা মুসলিমদের মধ্যে এটাই দেখছি, তারা ইসলাম হয়তো ত্যাগ করছে না, কিন্তু গুনাহ এবং পাপ কাজের কারণে তারা নিজেদের ধ্বংস এবং অবমাননা ডেকে এনেছে।

৬) এই খুতবায় আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলে গেছেন, তা হলো, মুসলিমরা যদি দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে, তা হলে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটো হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। এই আদেশ শুধু সেই যুগের মানুষদের ওপর প্রযোজ্য নয়, বরং সকল যুগের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। সভ্যতার গতিবিধি যেদিকেই গড়াক, প্রযুক্তি যতই উৎকর্ষ লাভ করুক, বিশ্বব্যবস্থা যা-ই হোক, মুসলিমদের জন্য চিরন্তন জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম, যার উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। আর কিয়ামত পর্যন্ত এর কোনো পরিবর্তন হবে না। পৃথিবীর সকল যুগের, সকল স্থানের যেকোনো সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ এর নির্দেশিত পথেই হবে, এর কোনো নড়চড় হবে না।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ

বিদায় হজ্জের আলোচনার উপসংহার হিসাবে যোগ্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ এই দু'আটি। শাইখ আবুল হাসান আন-নাদভী তাঁর *আস-সীরাহ আন-নববী* গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন,

> *'হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনেছো, দেখেছো আমি কোথায় আছি। তুমি আমার অন্তরের খবর জানো, তুমি আমার বাহ্যিক অবস্থাও জানো, আমার কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমি অসহায়, দুর্বল। আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার শাস্তির আশঙ্কা করি, ভয় করি। আমি নিজের সমস্ত দোষ তোমার কাছে স্বীকার করে নিচ্ছি। এক অসহায় বান্দা হিসেবে আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, গুনাহগার হিসেবে আমি তোমার কাছে তাওবা করি। একজন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ হয়ে আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি, অঝোরে কেঁদে তোমার কাছে মিনতি করছি, বিনম্র হয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি। ও আল্লাহ! ও আমার রব! তুমি আমার এই মিনতি কবুল করে আমাকে সন্তুষ্ট করো। আমার প্রতি দয়া করো, করুণা করো! তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দুআ শ্রবণকারী, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দাতা!'*

'আমি যার মাওলা, আলী ﷺ তার মাওলা'

আলী ইবন আবি তালিব ﷺ তখন ইয়েমেনের আমীর। সে সময় তার কর্তৃত্ব নিয়ে কিছু গুঞ্জন ওঠে। আলীর ﷺ সাথে সাদাকার কিছু উট ছিল, তার সৈন্যরা উটগুলোকে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আলী ﷺ রাজি হলেন না। তার অবর্তমানে সৈনিকরা সেই উটগুলো ব্যবহার করা শুরু করে। বিষয়টা জানতে পেরে আলী ﷺ খুব রেগে গেলেন।

কিছু লোকের কাছে আলীর ﷺ এই আচরণ পছন্দ হলো না। ফলে তার বিরুদ্ধে গুজব রটে গেল। অভিযোগগুলো একসময় আল্লাহর রাসূলের ﷺ কান পর্যন্ত পৌঁছলো। একজন সাহাবি এই অভিযোগগুলোকে সমর্থন দিচ্ছিলেন। তার হাঁটুতে হাত রেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বলো তো, তুমি কি আলীকে অপছন্দ করো?' সাহাবির সোজাসাপ্টা উত্তর, 'হ্যাঁ, করি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার উচিত তাকে ভালোবাসা।' সেই সাহাবি বলেন, 'এরপর থেকে আলী ইবন আবি তালিব হয়ে গেলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন।'

বিদায় হজ থেকে ফিরে আসার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ গাদিরখুম নামক এক জায়গায় এসে মানুষদের জড়ো করেন। আলীর ﷺ ব্যাপারে সেই বিখ্যাত উক্তিটি তিনি সেখানেই করেন। কথাটা ছিল, 'মান কুনতু মাওলা, ফা 'আলীউ মাওলা -- আমি যদি কারো মাওলা হই, তবে আলীও তার মাওলা। মাওলা মানে বন্ধু। রক্ষাকারী। ঘনিষ্ঠ সহচর।

এই সবগুলো অর্থই আলীর ﷺ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু শিয়ারা এই ঘটনা আর এই উক্তিকে তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করে। তারা এই উক্তিটি দেখিয়ে দাবি করে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এ কথার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর পর আলীকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আসলে আল্লাহর রাসূল ﷺ কেন গাদিরখুমে এই কথাটি বলেছিলেন? আলীর ﷺ বিরুদ্ধে মানুষের ভুল ধারণা আর বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য। আলীর ﷺ নামে গুজব সৃষ্টি হয়েছিল, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার সামনে আলীকে ﷺ সম্মানিত করলেন যেন সবাই বুঝতে পারে আলীর ﷺ মর্যাদা কত ওপরে। আলী ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচাতো ভাই, তাঁর মেয়ে ফাতিমার ﷺ স্বামী, তাঁর রেখে যাওয়া একমাত্র বংশধরদের বাবা। আমরা জানি, নাতি হাসান ﷺ এবং হুসাইন ﷺ ছাড়া রাসূলুল্লাহর ﷺ আর কোনো বংশধর ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে বলছিলেন, আমি যদি তোমাদের বন্ধু হই তবে আলীও তোমাদের বন্ধু। তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে আলীকেও ভালোবাসতে হবে। এ কথা থেকে সাহাবি হিসেবে আলীর ﷺ উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে প্রথম খলিফা হওয়ার কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত এখানে নেই।

উসামা ইবন যায়িদের ﷺ নেতৃত্বে অভিযান

হিজরতের একাদশ বছর। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ শেষে মদীনায় ফিরে এসেছেন। মুহাররম মাস সেখানেই থাকলেন। সফর মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবন যায়িদ ইবন হারিসাকে একটি বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এই সেনাবাহিনী যাবে আশ শামে, রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এর আগে রোমানদের বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধ হয়েছিল, তখন আমীর ছিলেন উসামার ﷺ বাবা--আল্লাহর রাসূলের ইসলাম পূর্বযুগের

পালকপুত্র-- যাইদ ইবন হারিসা ﷺ। সে যুদ্ধেই তিনি শহীদ হয়ে যান। এরপর তাবুকের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে অংশ নেন কিন্তু রোমানরা সেবার যুদ্ধ করতে আসেনি।

সেই একই রোমানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বারের মতো বাহিনী পাঠানো হচ্ছে, মুসলিমদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তারই আমীর নির্ধারিত হলেন তরুণ সাহাবি উসামা ﷺ। এই অভিযানে উসামাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার বাবার শহীদ হওয়ার স্থানে যেতে নির্দেশ দেন।

উসামার ﷺ বয়স তখন মোটে আঠারো কি বিশ। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে তখন প্রবীণ অনেক সাহাবিই ছিলেন, যারা কেবল বয়সেই বড় নন, বরং, জিহাদ, নেতৃত্ব আর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিষয় ব্যবস্থাপনায়ও অভিজ্ঞ। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি না এমন একজন তরুণ সাহাবিকে আমীর হিসেবে নিয়োগ দিলেন, যার অধীনে আবু বকর ﷺ ও উমারের ﷺ মতো সাহাবিরা যুদ্ধ করবেন!

ফলে এটা নিয়ে কিছুটা কানাঘুষা শুরু হয়। মুসলিম সমাজের আকার তখন আগের চাইতে অনেক বড়, তাই অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা আর কানাঘুষার মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। আর মুনাফিকরা তো ছিলই, যারা ছিদ্রান্বেষণ আর সমালোচনার সুযোগ হাতছাড়া করতো না।

কানাঘুষা হলো দুটো বিষয়কে ঘিরে। প্রথম অভিযোগ ছিল, উসামার ﷺ বয়স কম, আর দ্বিতীয় অভিযোগ তিনি দাস শ্রেণির। উসামার বাবা যাইদ ﷺ এক সময় দাস ছিলেন, তার মা উম্ম আয়মানও দাসী ছিলেন, দাসের সন্তান হয়ে উসামা কীভাবে স্বাধীন মানুষের ওপর নেতৃত্ব পেতে পারে -- কেউ কেউ এটা মানতেই পারছিল না। রাসূলুল্লাহর ﷺ কানে সে সব কথা এলে তিনি বললেন, 'তোমরা উসামার নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক করছো? এর আগে তোমরা তার বাবার নিয়োগ পাওয়া নিয়েও বিতর্ক করেছিলে! আল্লাহর কসম করে বলছি, তার বাবা নেতা হিসেবে যোগ্য ব্যক্তি ছিল, সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। আর তার ছেলে তার পরে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।'

জীবনসায়াহ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ

আল্লাহর রাসূলের ﷺ সীরাতের সফলতম সময় চলছিল। আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নবুওয়াতের যে মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, সে মিশনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছে। আজ থেকে তেইশ বছর আগে যে তাওহীদের বার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সেই বার্তাকে লোকেরা এখন সাদরে গ্রহণ করেছে। আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক বিতাড়িত হয়েছে, আল্লাহর ঘর কাবায় তাওহীদ প্রত্যাবর্তন করেছে। সমগ্র আরব ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে, আরবের চারপাশে ইসলাম কড়া নাড়তে শুরু করেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল ﷺ এমন এক প্রজন্মকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যারা ইসলামের এই বিজয় মশাল পুরো বিশ্বে বহন করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। দুনিয়ার বুকে মুসলিমদের জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে তার বাস্তব উদাহরণ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ওপর আরোপিত গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, তাঁর বিদায় নেওয়ার সময়ও তাই ঘনিয়ে এসেছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আগে থেকেই বেশ কিছু আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> “আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার রব শীঘ্রই আপনাকে এমন কিছু দেবেন যে আপনি খুশি হবেন।” (সূরা আদ দ্বুহা, ৯৩: ৪-৫)

> “নিশ্চয়ই আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের রবের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।” (সূরা যুমার, ৩৯: ৩০-৩১)

> “আপনার আগেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৩৪-৩৫)

> “আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৪)

> “ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমণ্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব।” (সূরা আর-রাহমান ৫৫: ২৬, ২৭)

> "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদা, ৫: ৩)

এখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর সরাসরি কোনো ইঙ্গিত না থাকলেও রাসূলুল্লাহর ﷺ মিশনের পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আরও বলেন,

> "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।" (সূরা আন-নাসর, ১১০)

সূরা নাসরে আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনাবসানের ইঙ্গিত থাকার প্রসঙ্গে একটি কাহিনী আছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ ছিলেন একজন তরুণ সাহাবি, কিন্তু তিনি বয়স্ক মুহাজির ও আনসারদের সাথে উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ দরবারে বসতেন। এত কমবয়স্ক একজন সাহাবির উপস্থিতিতে প্রবীণ মুহাজির এবং আনসাররা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতেন, তারা একদিন বললেন, 'এই যুবক আমাদের সাথে কেন বসছে?'

উমার ﷺ তাদের প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আচ্ছা, সূরা নাসর থেকে আপনারা কে কী বোঝেন?' সবাই নিজ নিজ ব্যাখ্যা দিল। উমার ﷺ এরপর ইবন আব্বাসকে ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই সূরা থেকে কী বোঝো?' ইবন আব্বাস ﷺ বললেন, 'আমি এই সূরা থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর ব্যাপারে ইঙ্গিত পাই।' উমার ﷺ বললেন, 'আর আমিও তা-ই বুঝি।' এর মাধ্যমে উমার ﷺ উপস্থিত সাহাবিদের বুঝিয়ে দিলেন যে, ইবন আব্বাসের ﷺ বয়স কম হতে পারে, কিন্তু কুরআনের বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি উমারের দরবারে অন্য প্রবীণ সাহাবিদের সাথে স্থান পেয়েছেন। সাধারণত কোনো কাজ শেষ করার পর আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে ইসতিগফার করা হয়। এই সূরায় আল্লাহ বলছেন, যখন আল্লাহর দ্বীনের বিজয় আসবে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহর রাসূল যেন ইসতিগফার করেন। এই ইসতিগফার তাঁর দাওয়াহ মিশনের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে এমন বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবন জাবালকে ﷺ ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেন, 'তোমার সাথে হয়তো আমার আর দেখা হবে না।' এ কথা শুনে মুআয কাঁদতে থাকেন। অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম শিখে নিও, কেননা এই বারের পর হয়ত আমি আর কখনো হজ্জ করতে পারবো না।' আরও একটি হাদীস আছে সহীহ বুখারিতে, সেটি বর্ণনা করেছেন আইশা ﷺ। তিনি বলেন,

'একবার আমরা নবীজির ﷺ সব স্ত্রী একসাথে বসে আছি, এমন সময় ফাতিমা পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম! তাঁর হাঁটা যেন অবিকল রাসূলুল্লাহর ﷺ হাঁটার মতো ছিল! মেয়েকে দেখে নবীজি স্বাগত জানালেন, বললেন, 'আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক!' তারপর তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। এরপর ফাতিমাকে কানে-কানে কিছু একটা বললেন, আর ফাতিমা খুব করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর কানে-কানে কিছু একটা বললেন। তখন ফাতিমা হাসতে লাগলেন!

নবীজির ﷺ স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বলে উঠলাম, আমাদের উপস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ সবার মাঝে আলাদা করে তোমাকে গোপনে একটা কথা বলেছেন, আর তুমি কাঁদছো! এরপর যখন নবীজি ﷺ উঠে চলে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আচ্ছা, উনি তোমাকে কানে-কানে কী বলেছিলেন? ফাতিমা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ গোপন কথা ফাঁস করবো না। এরপর যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু হলো, আমি তাঁকে বললাম, তোমার ওপর আমার দাবি থেকে জানতে চাই, তুমি কি আমাকে তাঁর গোপন কথাটি বলবে না? ফাতিমা বললেন, হ্যাঁ, এখন তোমাকে জানাবো। প্রথমবার তিনি আমাকে গোপনে বলেছিলেন, জিবরীল ﷺ প্রতি বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি ধারণা করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় চলে এসেছে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে আর বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কাঁদতে থাকি, যা তুমি নিজেই দেখেছো। আর এরপর অস্থিরতা দেখে আমাকে দ্বিতীয়বার কানে-কানে বললেন, ফাতিমা, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে তুমি মু'মিন নারীদের সর্দার হবে অথবা এই উম্মাতের নারীদের সর্দার হবে? তখন আমি হেসে দিলাম, সেটাও তুমি দেখেছো।'[116]

সে বছর সফর মাসের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মাঝরাতে আবু মুওয়াইহিবাকে ﷺ ডেকে বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা, আমাকে বাক্বী'র অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। চলো আমার সাথে।' আবু মুওয়াইহিবা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ আযাদকৃত দাস। আল বাক্বী' হলো মদীনার কবরস্থান। সেখানে সমাহিত করা হয়েছে সেইসব সাহাবিদের যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে কষ্ট করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, ইসলামের জন্য জান দিয়েছেন। গভীর রাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাক্বীতে গেলেন,

> *'হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যে অবস্থায় আছো, সেটা জীবিতদের চাইতে ভালো। তোমরা সুখী হও। আঁধার রাতের মতো ধেয়ে আসছে ফিতনা-ফাসাদ -- একটার পেছনে আরেকটা, আর প্রথমটার চাইতে পরেরটা ভয়াবহ।'*

---

116 সহীহ বুখারি, অধ্যায় অনুমতি প্রার্থনা, হাদীস ৫৮।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মুওয়াইহিবার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাকে এই দুই এর মাঝে একটি বাছাই করতে বলা হয়েছিল, হয় আমি দুনিয়ার সমস্ত রত্নভাণ্ডার আর সম্পদের চাবি নিয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবো। এরপর জান্নাতে যাবো। অথবা আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ এবং জান্নাত।'

আবু মুওয়াইহিবা ﷺ বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি দুনিয়ার রত্নভাণ্ডার, শেষপর্যন্ত দুনিয়াতে থেকে তারপর জান্নাত -- এই সুযোগটাই বেছে নিন!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'না, আল্লাহর কসম, আমি আমার রবের সাথে মিলিত হওয়া এবং জান্নাতকেই বেছে নিয়েছি।'*

বিশাল এক নেতা অথচ কত নির্মোহ। দুনিয়া, সম্পদ, বাড়িগাড়ি এসবের প্রতি রাসূলুল্লাহর কখনোই ﷺ কোনো আকর্ষণ ছিল না, লোভ তো দূরেরই কথা। তাঁর উদ্বেগ ছিল উম্মাহকে ঘিরে। ইবন কাসিরের رحمه الله ভাষায়, 'দুনিয়া ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ চোখে তুচ্ছ, আর আল্লাহর কাছেও অতি তুচ্ছ, এতটাই তুচ্ছ যে দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই রেখে যাননি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উম্মাহর জন্য জীবনভর কষ্ট করেছেন। আজকে সমগ্র আরব তাঁর পদানত, কিন্তু এই বিশাল অর্জন কোনো নিরাপদ, ঝুঁকিহীন, নির্ঝঞ্ঝাট পথে হয়নি। আরাম-আয়েশ বলে কোনো বস্তু আল্লাহর রাসূলের জীবনে ছিল না। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকতো। নবুওয়াতের সেই প্রথম দিন থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। দারিদ্র্য, কষ্ট আর দুর্দশা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। আর তাঁর এই ত্যাগ-তিতিক্ষার সুফল ভোগ করে আজ আমরা মুসলিম। তাঁর এই কষ্ট, তাঁর এই ত্যাগ ছিল আমাদের জন্য, আমার-আপনার কাছে দ্বীন ইসলামকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নিঃসন্দেহে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে ঋণী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকী'বাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সেখান থেকে চলে এলেন। এর পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বিদায়বেলা

আল্লাহর রাসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আইশা ﷺ পাশেই ছিলেন। প্রচণ্ড মাথাব্যথায় কাতর হয়ে আইশা বলছিলেন, 'উহ! ব্যথায় মারা যাচ্ছি!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন রসিকতা করে বললেন, 'যদি তা-ই হয়, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো, তোমার জন্য দুআ করতে পারবো।' আইশা ﷺ তখন স্বভাবসুলভ অভিমানী ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো সেটাই চান। আমি মরে গেলে তো আপনি অন্য স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'আমারই বরং বলা উচিত -- ব্যথায় মারা যাচ্ছি!'[117]

---

[117] সহীহ বুখারি, অধ্যায় রোগী, হাদীস ২৭।

রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল প্রচণ্ড জ্বর। এক সাহাবি ؓ রাসূলুল্লাহর ﷺ মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নবীরা অন্য যে কারো চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট ভোগ করে থাকি।' আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁদের বেশি ভালোবাসেন, তাই তাঁদের পরীক্ষাগুলো বেশি কঠিন, কষ্টগুলো বেশি তীব্র, আর পুরস্কারও অন্যদের চাইতে বেশি।

শেষ দিনগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ কাটিয়েছেন স্ত্রী আইশার ঘরে। অন্য স্ত্রীরা তাতে সায় দিয়েছিলেন, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে প্রত্যেকের ঘরে যাওয়া তাঁর জন্য খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে আইশার ঘরে আসতে হয়। শেষ দিনগুলোতে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে যেতে চাইলেন। তিনি চাইলেন মানুষদের কিছু নাসীহা দেবেন। বললেন, 'আমার গায়ে সাত বালতি পানি ঢেলে দাও, আমি মানুষের কাছে গিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।' রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো যেন শরীরের তাপমাত্রা কমে আসে আর তিনি মসজিদে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো, তাঁর মাথা কালো কাপড়ে জড়ানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একা হাঁটতে পারছিলেন না, তাঁর পা মাটিতে ঘষা খাচ্ছিল, তাই অন্যের ওপর ভর করে তাঁকে মসজিদে যেতে হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমেই আল্লাহ আযযা ওয়াজালের প্রশংসা করলেন। এরপর উহুদের শহীদদের কথা স্মরণ করলেন, তাদের জন্য সালাত পাঠ করলেন এবং মাগফিরাতের দুআ করলেন। এরপর মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

> *'মুহাজিররা শোনো, তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমে আসছে। শুরুর দিকে তারাই আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা তাদের প্রতি সদয় হবে। কাজেই, তাদের মধ্যে যারা উত্তম, তাদের সাথে ভালো আচরণ কোরো, আর যারা ভুল-ত্রুটি করে, তাদের ক্ষমা করে দিও।'*

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন একজন বান্দা আছে যাকে দুনিয়ার শান-শওকত অথবা আল্লাহর কাছে যা আছে -- এই দুইয়ের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'*

আল্লাহর রাসূল ﷺ আসলে নিজের কথাই বলছিলেন, কিন্তু কে এই বান্দা সেটা আবু বকর ؓ ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারলো না। আবু বকর ؓ কাঁদতে শুরু করলেন। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা হঠাৎ করে আসে। কিন্তু নবীদের কাছে জান কবজের আগে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করা হয়। আবু বকর ؓ কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আমরা আর আমাদের সন্তানরা আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে ؓ থামিয়ে দিয়ে বললেন,

> *'বন্ধুত্ব আর অর্থ-সম্পদের ত্যাগ স্বীকারে যে মানুষটি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে, সে হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই নিজের খলিল বানাতাম। কিন্তু আমার সাথে আবু বকরের সম্পর্ক হলো ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার। তোমরা মসজিদের খোলা দরজাগুলোর দিকে তাকাও। ওগুলো তোমরা বন্ধ করে দেবে, শুধু আবু বকরের দরজা ছাড়া।'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সবার সামনে আবু বকরের ؓ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানিত অবস্থান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। খলিল হলো বন্ধুত্বেরও ওপরে একটি স্থান, যা অন্তরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়। যদি দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে খলিল হিসেবে বেছে নিতেন, তাহলে সে স্থানটি আবু বকরের হতো। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর খলিল, তাই আবু বকর ؓ হলেন তাঁর দ্বীনের ভাই, বন্ধু, সবচেয়ে আপনজন।

মসজিদে নববীর সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘর ছাড়াও আরও কিছু সাহাবিদের ঘর লাগোয়া ছিল আর সেই ঘর দিয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করা যেত। সেগুলো ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত দরজার মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, কেবলমাত্র আবু বকরের দরজাই খোলা থাকবে আর বাকিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক আলিম মনে করেন এই আদেশের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পরে আবু বকরের খলিফা হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছেন, তবে এটা তাঁর আদেশ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করতেন, তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিমরা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের অনুসরণ করা শুরু করতে পারে। মৃত্যুর চার দিন আগে তাই তিনি এই ব্যাপারে ওসিয়ত করে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন,

> *'জাযিরাতুল আরব থেকে তোমরা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের বের করে দেবে। আর প্রতিনিধিদলের সাথে আমি যেমন ব্যবহার করতাম, তেমন ব্যবহার করবে।'*

আল্লাহর রাসূল ﷺ দ্বীন ইসলামের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সেখানে স্থান দিতে চাননি। তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আরও বললেন,

> *'আল্লাহর লানত ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রতি! তারা তাদের নবীদের কবরের উপর মসজিদ বানাচ্ছে। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে।'*

অর্থাৎ, তিনি মুসলিমদের নিষেধ করে দেন যেন তারা তাঁর কবরস্থানকে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে না নেয়, যে ভুলটা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা করেছে।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও একটি বিষয়ের ওপর জোর দেন, সেটি হলো সালাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হও। তিনি মুসলিমদের দাসদের প্রতি যত্নশীল হওয়ারও উপদেশ দেন। উপদেশ দেন নারীদের ব্যাপারে, যেন তাদের ওপর অবিচার করা না হয়। আর জিহাদের ব্যাপারে বলেন,

'মানুষ যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখনই অপদস্থ হবে।'

মৃত্যুর চার দিন আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতের ইমামতি করেছিলেন। কিন্তু ইশার ওয়াক্তে তাঁর শরীর এত খারাপ হয়ে গেল যে তিনি কোনোভাবেই উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার বেঁহুশ হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, আবু বকর ﷺ যেন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আইশা ﷺ চাচ্ছিলেন না তার বাবা আবু বকর ﷺ সালাতে নেতৃত্ব দিক। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবা তো খুব নরম মনের মানুষ। আমি ভয় পাচ্ছি উনি যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে হয়তো উনার পক্ষে ইমামতি করাই অসম্ভব হয়ে যাবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, 'আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।' আইশা ﷺ আবারও একই কথা বললেন। এভাবে তিনবার। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা নারীরা হলে ইউসুফের নারীদের মতো। আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।'

ইউসুফের নারীর সাথে তুলনা দেওয়ার কারণ হলো, আযীযের স্ত্রী যখন অন্য নারীদের দাওয়াত দিয়েছিল, বাহ্যত মনে হবে, সেটা স্রেফ নারীদের জন্য একটা আসর বা আড্ডার আয়োজন। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল সবাই যেন ইউসুফকে দেখতে পায়। অর্থাৎ, তার মুখের কথা ছিল এক, আর মনের কথা ছিল আরেক। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকরকে দিয়ে ইমামতি করানোর আদেশ করেছেন, তখন আইশা কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তার বাবা খুব নরম মনের মানুষ, তাই তিনি ইমামতি করতে গিয়ে হয়তো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন, কাজেই তিনি ইমামতি না করলেই ভালো। তবে আসল কারণ সেটা ছিল না। আসল কারণ কী ছিল সেটা আইশা পরবর্তীতে নিজেই বলেছেন, 'আমি চাইনি আমার বাবা সালাত পড়ান তার কারণ হলো, মানুষ হয়তো আল্লাহর রাসূলের স্থানে দাঁড়ানোর জন্য তাকে অপছন্দ করতে পারে।' আল্লাহর রাসূলের ﷺ স্থানে অন্য কাউকে দেখতে উম্মাহ অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকরকেই ইমামতির জন্য নির্ধারিত করে দিয়ে গেছেন।

আইশা ﷺ বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ বোধ করতেন, তখন মুআউয়িযাত (সূরা নাস, সূরা ফালাক) পরে নিজের হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরে মুছে নিতেন। কিন্তু এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে নিজ হাতে সেটা করতে পারছিলেন না, তাই আইশা ﷺ সূরাগুলো পড়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে ফুঁ দিতেন এবং তাঁর হাত

দিয়েই তাঁর শরীর মুছে দিতেন, কেননা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাত আইশার ﷺ হাতের চেয়ে বেশি বরকতময়।[118]

উসামা ইবন যাইদের ﷺ সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল মদীনার বাইরে জুরফে। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে উসামা ইবন যাইদ ﷺ তাঁকে ﷺ দেখতে মদীনায় আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এতটাই অসুস্থ যে কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। উসামা ইবন যাইদ ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত উঠিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য দুআ করছেন।' কী যন্ত্রণা আর কষ্টের মাঝেও রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবন যাইদের ﷺ জন্য দুআ করছিলেন। এতে বোঝা যায় উসামার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ভালোবাসা কত প্রবল ছিল।

মৃত্যুর দু'দিন আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি মসজিদে যেতে চাইলেন। দুইজনের কাঁধে ভর করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সে সময় সালাতে ইমামতি করাচ্ছিলেন আবু বকর ﷺ। রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইঙ্গিতে বোঝালেন যেন তিনি সেখানেই থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের ﷺ পাশে গিয়ে বসলেন। আবু বকর ﷺ তখন সালাতে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করলেন আর বাকিরা আবু বকরের অনুসরণ করে সালাত আদায় করলো।[119]

উম্মাহর জীবনে বিষাদতম দিন

দিনটা ছিল সোমবার। আল্লাহর রাসূল ﷺ সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান। কেমন ছিল সেই দিন? ফজরের ওয়াক্তে আবু বকর ﷺ মুসলিমদের সালাত পড়াচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতর তাকালেন। তিনি চোখ ভরে তাঁর উম্মাহকে দেখছিলেন। তাঁর উম্মাহ সারিবদ্ধভাবে সালাহ আদায় করছে। তাওহীদের যে বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন, সেই চারাগাছ আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাওয়াহ সফল, তাঁর মিশন সম্পূর্ণ। মুসলিমরা আজ নিজেরাই জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহর ﷺ মন এক অপার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

তিনি ﷺ মুচকি হাসলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ হাসিমুখ দেখে সাহাবিরাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাদের সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম! আনাস ইবন মালিকের ﷺ বর্ণনায়,

'আল্লাহর রাসূলের ﷺ মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।'

---

[118] সহীহ বুখারি, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস ৫০।

[119] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আজান, হাদীস ৭৭।

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

'তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ফালি চাঁদ!'

আবু বকর ﵁ রাসূলুল্লাহকে ﷺ ইমামতিতে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে পেছনে ফিরে আসছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশারায় জানিয়ে দিলেন তারা যেন নিজেরাই সালাত আদায় করে নেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দা ফেলে আবার ভেতরে চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ যে দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি হলো সালাতের জামাত। এই দৃশ্য দেখেই রাসূলুল্লাহর ﷺ মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। নিশ্চয়ই তাওহীদের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাহ।

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দাঁড়াতে দেখে সাহাবিরা ভাবলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ শারীরিক অবস্থার হয়তো উন্নতি হয়েছে। তাই আবু বকর ﵁ অনুমতি নিয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে দেখা করতে আস-সুনহে চলে গেলেন, সেটা ছিল মদীনার কিছু দূরে।

সোমবারের ফজর সালাহ ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ শেষ সালাহ। আইশার ﵂ ভাই আবদুর রহমান ﵁ তাদের ঘরে এলেন, তার হাতে একটা মিসওয়াক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে কিছু বলাও তখন কষ্টকর। আইশা ﵂ তাঁর চাহনি দেখেই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে চাইছেন। তিনি ﵂ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এটা চান?' রাসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ চাই। আইশা ﵂ তখন মিসওয়াকটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এর অন্য পাশ নরম করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ এগিয়ে দিলেন। আইশা ﵂ বলেন, তিনি ﷺ এমনভাবে মিসওয়াক করছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একদম সুস্থ। জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাহ ত্যাগ করেননি।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কষ্ট, যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। তাঁর কষ্ট দেখে ফাতিমা বলে উঠলেন, 'বাবার কতই না কষ্ট হচ্ছে!' সেই কষ্টের মুহূর্তেও তিনি মেয়ের কথার উত্তর দিলেন, বললেন, 'আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই মা!'

মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুয়ে ছিলেন আইশার ﵂ কোলে মাথা রেখে। পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছে বলছিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সমগ্র মানবজাতির সেরা সৃষ্টি, তাঁকেও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল।

শেষ সময় ঘনিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সূরা নিসার একটি আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, বলছিলেন,

'হে আল্লাহ! আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের

সাথে, যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন!

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও! আমার ওপর রহম করো! আমাকে সর্বোচ্চ সাথীর কাছে মিলিত করো!'

মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর তর্জনী উপরে তুলে বলছিলেন,

ফীর-রফিকুল আ'লা!
ফীর-রফিকুল আ'লা!
ফীর-রফিকুল আ'লা!

রাসূলুল্লাহর ﷺ চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা -- ওয়ালহিক্বনী বির- রফিক্বিল আ'লা – আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

মুসলিম উম্মাহর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু। মুসলিম উম্মাহ হারালো তাদের সবচেয়ে আপনজনকে। মাথার ওপর ছায়া হয়ে থাকা নেতাকে, বাবার মতো বুকের মাঝে আগলে রাখা মানুষটাকে। ভয়ে-কষ্টে-বিপদে-দ্বন্দ্বে সবাই যার কাছে ছুটে যেতো, যার কাছে সবাই নির্বিঘ্নে সব সমস্যার কথা বলতে পারত, যিনি ছিলেন সবার আশ্রয়, সেই মানুষটা আজ চলে গেলেন। উম্মাহর জীবনে সবচেয়ে বড় ফিতনা সেই দিন। সবচেয়ে অন্ধকার আর বিষাদমাখা একটা দিন।

সাহাবিরা এই খবর মেনে নিতে পারলেন না। সবাই খুব বড়সড় একটা ধাক্কা খেলেন। কারো মাথা আর কাজ করছে না। কেউ স্তব্ধ হয়ে গেছে, কেউ নির্বাক হয়ে বসে পড়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো শক্তিটুকুও যেন আর নেই। কেউ কেউ তো রীতিমতো অবিশ্বাস করলেন। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ কোনোভাবেই মানতে পারলেন না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মসজিদের দিকে ছুটে গেলেন, উমারের পিছু পিছু সবাই মসজিদের দিকে ছুটলো। চারদিকে হাহাকার, হৃদয়গুলো ক্ষত-বিক্ষত, আজ মদীনার বাতাস ভারী হয়ে আছে কান্নায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর সংবাদ মেনে নেওয়া সাহাবিদের জন্য কতটা কঠিন ছিল সেটা আমরা কখনো অনুভব করতে পারবো না, কারণ রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি আমাদের সেই পরিমাণ ভালোবাসাই নেই। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বছরের পর বছর থেকেছেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন ﷺ তাদের সব, সবকিছু। তাদের নেতা, তাদের পরামর্শদাতা, তাদের শিক্ষক, তাদের সুখ-দুঃখের বন্ধু, তাদের রাসূল!

উমার বলে উঠলেন,

'না! না! আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা যাননি! তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ

করতে গেছেন, মূসা ﷺ যেমন তাঁর রবের সাথে দেখা করতে চল্লিশ দিনের জন্য তাঁর সম্প্রদায়কে রেখে চলে গিয়েছিলেন আর এরপর আবার ফিরে এসেছেন। আল্লাহর রাসূলও তেমনি ফিরে আসবেন, অবশ্যই আসবেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! আর ফিরে এসে তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলবেন যারা বলছে তিনি মারা গেছেন।'

উমার ﷺ ভাবতেই পারছেন না রাসূলুল্লাহ আর নেই। তিনি ভাবছেন, সব মুনাফিককে হত্যা করার আগে রাসূলুল্লাহ মারা যেতেই পারেন না। তরবারি কোষমুক্ত করে অবুঝের মতো উমার ﷺ হুমকি দিয়ে বললেন, 'যে এ কথা বলবে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেছে, আমি তার মাথা এই তরবারি দিয়ে আলাদা করে দেবো।'

যে উমার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অসম্ভব দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, শক্তি-সাহস আর বীরত্বের পরিচয় দিয়ে যাকে সবাই চেনে, যাকে দেখে শয়তানও ভয়ে অন্য পথ ধরতো, সেই উমার আজ মুষড়ে পড়লেন। এমন কি হওয়ার কথা ছিল? হ্যাঁ, সাহাবিরাও মানুষ। রক্ত-মাংসের জলজ্যান্ত মানুষ। যাদের শরীরে লাল রক্ত আছে আছে, যাদের আবেগ আছে, অনুভূতি আছে, দুর্বলতাও আছে। তাই উমারের মতো শক্ত-সমর্থ মানুষটাও ﷺ সেদিন অবুঝ শিশুর মতো ভেঙে পড়েছিলেন।

কিন্তু একজন ভেঙে পড়েননি। সেই সংকটময় মুহূর্তে যখন কেউ নির্বাক, কেউ হতবিহ্বল, তখন একটা মানুষ বটবৃক্ষের মতো সব ঝড় সামলে নিলেন। কে সেই মানুষটি? আল্লাহর রাসূলের ﷺ সবচেয়ে কাছের মানুষ, আল্লাহর রাসূলের বন্ধু, ভাই, সাহাবি আবু বকর ﷺ। নবুওয়াতের প্রথম থেকে যেই মানুষটা পায়ে পায়ে রাসূলের ﷺ সাথে লেগে ছিলেন, সেই আবু বকর। আল্লাহর রাসূলের ﷺ সমস্ত সুন্নাহ, সমস্ত শিক্ষা যিনি বুক পেতে গ্রহণ করেছেন, সেই আবু বকর। আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতের সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত, আবু বকর ﷺ।

সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে হারিয়েও তিনি ঈমানী শক্তিতে নিজেকে সামলে নিলেন। সমুদ্রে ঝড় উঠলে যেভাবে শক্ত হাতে জাহাজের হাল ধরতে হয়, তেমনি করেই পুরো উম্মাহর হাল ধরলেন তিনি। রাসূলুল্লাহর ﷺ ইন্তেকালের সময়ে আবু বকর ﷺ মদীনায় ছিলেন না, ছিলেন মদীনার কাছাকাছি আস-সুনহে। খবর পেয়ে তিনি সোজা আইশার ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখ অনাবৃত করে আবু বকর ﷺ কেঁদে উঠলেন, রাসূলুল্লাহকে ﷺ চুমু দিলেন আর বললেন, 'আপনি জীবিত অবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন, মৃত্যুর পরও আপনি পবিত্র। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করাবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তা সম্পন্ন হয়ে গেছে।' এরপর আবু বকর ﷺ আইশার ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে গেলেন। সেখানে তখন উমার ﷺ চিৎকার করছিলেন। উমারকে থামিয়ে আবু বকর ﷺ বললেন, 'বসো, উমার, বসো!'

উমার ﷺ আবু বকরের ﷺ কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আবু বকর ﷺ আবার

বললেন, 'উমার, বসো বলছি, বসো।' তবুও উমার ﷺ থামলেন না। আসলে উমার ﷺ মানসিকভাবে এতটাই বিধ্বস্ত ছিলেন যে, কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আবু বকর ﷺ উমারকে উপেক্ষা করেই সামনে এগিয়ে গেলেন। লোকেরা উমারকে ﷺ ছেড়ে তখন আবু বকরের ﷺ কাছে ভিড় জমালো। তখন আবু বকরের ﷺ সেই দিনের কথাগুলো উম্মাহ এত বছর পরেও স্মরণ করে। তিনি বলেছিলেন,

'যে মুহাম্মাদের ﷺ ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক -- মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছে। আর যে আল্লাহর ইবাদত করতো সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।'

এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

> **'মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। তাঁর আগেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তাই যদি তাঁরও মৃত্যু হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যায়, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে সক্ষম নয়। শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।' (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৪)**

কথাগুলো শুনে উমার বসে পড়লেন, তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। তার ভাষায়, 'আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ আসলেই আর নেই।' এমন নয় উমার কুরআনের এই আয়াত জানতেন না, কিন্তু অদ্ভুত শূন্যতার সেই মুহূর্তে আবু বকরের ﷺ মুখে আল্লাহ তাআলার এই আয়াত যেন ঝাঁকুনি দিয়ে সবার মাঝে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ মৃত্যু সংবাদে উমার ছিলেন দিশেহারা। উসমান হয়ে যান নির্বাক। আলী ﷺ সবার থেকে লুকিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর ﷺ সূরা আলে-ইমরানের এই আয়াতটির অর্থ জানতেন যে, মুসলিমরা আল্লাহর জন্য বাঁচে, ব্যক্তি মুহাম্মাদের ﷺ জন্য নয়। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসূল, তাঁর মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তাঁর আনীত দ্বীন চলবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। সেদিন মদীনায় কত হাফেজ ছিল, কত আলেম ছিল, কিন্তু কেউ এই আয়াতকে কাজে লাগাতে পারলো না। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করেছিলেন মাত্র একজন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ ছায়া যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি, সেই আবু বকর ﷺ। ইমাম কুরতুবি মন্তব্য করেন,

'সাহসিকতার মানে যদি হয় বিপদ আর কষ্টকর পরিস্থিতিতে দৃঢ় আর অবিচল থাকা, তবে আবু বকরের সাহসিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো কুরআনের এই আয়াত ও এই ঘটনা। কেননা রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর চাইতে বড় ফিতনা উম্মাহর জীবনে আর ছিল না ... চারদিকে যখন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম, তখন যিনি হাল ধরেছিলেন তিনি হলেন আবু বকর।'

আবু বকর ﵁ আল্লাহর রাসূলের ﷺ শিক্ষার সবটা আমল করেছিলেন, এজন্যই তিনি হলেন নবী-রাসূলদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

রাসূলুল্লাহর ﷺ দাফন

রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবারের সদস্যরা রাসূলুল্লাহর ﷺ গোসল ও দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন আল আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব, আলী ইবন আবি তালিব, আল ফাযাল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়েদ এবং রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত দাস শুকরান ﵁। আনসারী সাহাবি আওস ইবন খাওলি ﵁ আলীকে বললেন, 'আল্লাহর কসম এবং রাসূলুল্লাহর ওপর আমাদের হকের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে ভেতরে আসতে দিন।' তাকে ভেতরে আসতে দেওয়া হলো এবং তিনি গোসলের সময় উপস্থিত ছিলেন।

আইশা বলেন, 'গোসলের সময় তারা বললো, আমরা তো বুঝতে পারছি না, রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় খুলে গোসল দেবো, যেভাবে করে আমরা অন্যদের গায়ের কাপড় খুলে গোসল দিই, নাকি কাপড় রেখেই যেভাবে আছে সেভাবে গোসল দেবো। যখন তারা এটা নিয়ে বিতর্ক করছিল, তখন আল্লাহ তাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন, সেই তন্দ্রায় তাদের প্রত্যেকের মাথা ঢলে পড়লো। এরপর ঘরের পাশ থেকে একটা আওয়াজ এল -- রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় থাকা অবস্থাতেই তাকে গোসল দাও। কেউ জানে না এই কথা কে বলেছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহর জামার ওপর দিয়েই পানি ঢালে এবং তারা তাদের হাত না দিয়ে জামার ওপর দিয়ে তাঁর শরীর ঘষে দেয়।'

গোসল শেষে রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীরে তিন টুকরো কাপড় জড়ানো হলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ জানাযার সালাত এক জামাতে আদায় করা হয়নি। আইশার ﵂ ঘরে যতটুকু জায়গা হতো তত মানুষ আসতো, জানাযার সালাত আদায় করে চলে যেতো। এক দলের সালাত আদায় শেষ হলে আরেক দল -- এভাবে সালাত আদায় করা হলো। প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা, তারপর শিশুরা আর সবশেষে দাসরা। রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাতে কোনো ইমাম ছিল না, প্রত্যেকে আলাদাভাবে সালাত আদায় করে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীর ছিল আইশার ﵂ ঘরে। উম্মু সালামা ﵂ বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীরা খুব কাঁদছিলাম, কিন্তু তখন অতটুকু সান্ত্বনা ছিল যে আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃতদেহটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বুধবার গভীর রাতে যখন কবরের মাটি খোঁড়ার শব্দ পেলাম, তখন আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, চিৎকার করে উঠি। মসজিদ থেকে আমাদের চিৎকার শুনতে পেয়ে তারাও চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, পুরো মদীনাই যেন একটা বিরাট আর্তনাদে পরিণত হয়।'

ফজরের সময় হলে প্রতিদিনের মতোই বিলাল ﵁ আজান দিতে গেলেন। 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ।' এরপর আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলতে গিয়ে আর বলতে পারলেন না, গলার কাছে আওয়াজগুলো যেন সব দলা পাকিয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিলাল, আজান শেষ করতে পারলেন না। বিলাল ছিলেন আল্লাহর রাসূলের মুয়াজ্জিন, রাসূলের মৃত্যুর পর তিনি আর কারো জন্য আজান দেননি।

আইশার ﷺ ঘরে খনন করা হলো রাসূলুল্লাহর কবর। নবীরা যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়, এটাই নবীদের সুন্নাহ। আইশা ﷺ একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনটি চাঁদ তার কোলে পতিত হয়েছে। আবু বকর ﷺ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়, তাহলে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ তিন ব্যক্তির কবর তোমার ঘরে হবে।' যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ দাফনের সময় এল তখন আবু বকর ﷺ বলেন, 'তোমার চাঁদগুলোর মধ্যে এটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ চাঁদ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় এল। এই কাজটিও রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবারের লোকেরা সম্পন্ন করলেন। কবরে নেমেছিলেন আলী, ফাদল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস আর শুকরান ﷺ। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহকে ﷺ কবরস্থ করার সময় মুগীরা ইবন শু'বা ﷺ ইচ্ছে করে তার একটি আংটি কবরের মধ্যে ফেলে দেন এবং এরপর সবাইকে বলেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমার আংটিটা নিয়ে নিতে দিন।' এই বাহানায় তিনি ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কবরে নামেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পর্শ করা শেষ ব্যক্তিটি হতে পারেন। এরপর তিনি উঠে আসেন।

দাফনকাজ শেষ করে সবাই একে একে ফিরে এল। তখন ফাতিমা ﷺ আনাসকে ﷺ বললেন, 'আনাস, তোমরা কীভাবে পারলে আল্লাহর রাসূলের ﷺ শরীরের ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে!' আসলে রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু, তাঁর গোসল, তাঁর দাফন -- সবই তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যখনই তোমাদের কারো উপর কোনো বিপদ আসবে, তখন আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।' কারণ, একজন মুসলিমের ওপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ আসতে পারে, সেটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর তা হলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনাবসান। আর কোনো মুসিবতই এর সাথে তুলনা করার মতো নয়। আনাস ইবন মালিক ﷺ ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ঘরে বড় হওয়া সাহাবি। তিনি বলেন,

'আমার জীবনের সবচেয়ে বিশেষ দিন দুইটা -- একটা সবচেয়ে আনন্দের, আরেকটা সবচেয়ে কষ্টের। আনন্দের দিনটি হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনায় আসার দিন। সেদিন সবকিছু ছিল আলোকিত! আর সবচেয়ে কষ্টের দিন হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর দিন। সেদিন সবকিছু যেন আঁধারে ছেয়ে গেল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ কবর দেওয়ার পর যখন আমরা হাত থেকে ধুলো ঝাড়ছিলাম, তখন থেকেই মনে হতে লাগলো, আমাদের অন্তরগুলো আর আগের মতো নেই।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থাকা সাহাবিদের জন্য একটা অন্যরকম অনুভূতি। যখন তিনি

চলে গেলেন, তখন তাদের মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু বদলে গেছে। একদিন আবু বকর আর উমার ﷺ উম্ম আইমানের ﷺ সাথে দেখা করতে যান। উম্ম আইমান ﷺ তাদের দেখে কাঁদতে শুরু করেন। তারা জানতে চাইলেন, 'আপনি কেন কাঁদছেন?' উম্ম আইমান ﷺ বললেন,

'আমি জানতাম আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন না একদিন চলেই যাবেন। আমি কাঁদছি এ কারণে যে আর কখনো ওয়াহী নাযিল হবে না।'

তারা শুধু রাসূলুল্লাহর ﷺ অভাব বোধ করছিলেন তা নয়, তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ মাধ্যমে যে ওয়াহী পেতেন সেটার অভাবও অনুভব করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা যান হিজরী একাদশ বছরের বারো রবিউল আউয়াল। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সমগ্র আরবের অবিসংবাদিত শাসক। তিনি এমন একটা সময়ে চলে যান যখন অনারবের রাজা-বাদশাহরা তাঁকে সমীহ করতে শুরু করেছে। কিন্তু এই প্রতাপ আর প্রতিপত্তি থাকা মানুষটি কোনো সম্পদ রেখে যাননি। মৃত্যুর একদিন আগে তিনি সব দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন। সাত দিনার ছিল, সেগুলোও সাদাকা করে দেন। তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল। সেটার বিনিময়ে তিনি কিছু যব নিয়েছিলেন পরিবারের জন্য। তিনি রেখে গেছেন কেবল একটি সাদা খচ্চর, কিছু অস্ত্র আর এক টুকরো জমি। এই জমিটিও তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদাকাহ করে দিয়ে গেছেন। না ছিল সম্পদের বাহার, না ছিল সোনা-রুপার বহর, কিছুই না।

তবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানুষটি রেখে গেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। সেই প্রজন্ম গড়েছে এক নতুন ইতিহাস। মুসলিম জাতির আগে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর মনোনিত জাতি ছিল বনী ইসরাঈল। তাদেরকে সৎপথে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একের পর এক নবী পাঠাতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ যে উম্মাহকে রেখে গেছেন, সে উম্মাহর জন্য আর কোনো নবী পাঠানোর প্রয়োজন নেই, শেষ নবীই তাদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত যথেষ্ট। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অভাবনীয় সম্মাননা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যেখানে শেষ করেছেন, সাহাবিরা সেখান থেকে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। সে যুগ গৌরবের, সে যুগ সমীহ জাগানিয়া। রাসূলুল্লাহর ﷺ চলে যাওয়ার অল্প ক'বছরের মাথায় পৃথিবীর তৎকালীন দুই পরাশক্তি রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসারী সাহাবিদের ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। সে আরেক ইতিহাস। আপাতত, এতটুকুই।

শেষ কথা

প্রিয় পাঠক, আমরা আযযা ওয়া জালের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির সম্পূর্ণ জীবনী শুরু থেকে শেষ করার জন্য আমাদের তাওফীক্ব দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করি যেন তিনি আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা সত্যিই রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথ আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ক্বিয়ামতের দিন মিলিত হবেন এবং তাঁর হাতে হাউযে কাউসারের পানি পান করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক্ব প্রাপ্ত হবে।

প্রিয় পাঠক, রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ নিছক সাহিত্যিক রস আস্বাদনের জন্য নয়। মজা পাওয়া বা উপভোগের জন্য উম্মাহর আলিমরা সীরাহ লেখেননি। এই সীরাহ নিজেকে বদলে দেওয়ার জন্য, নিজেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ আদলে গড়ে তোলার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে এই উম্মাহকে ভালোবাসতেন, উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত থাকতেন, আমরাও সেভাবে এই উম্মাহকে ভালোবাসবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। পৃথিবীর সুখ-শান্তি আর সম্পদ তিনি ত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র এই দ্বীন ইসলামকে আমার-আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সেজন্য আমাদের উচিত অন্তর থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকা।

যে মানুষ আল্লাহর বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না, আর পৃথিবীতে আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যা-কিছু-জানি তার সবটাই তো তাঁর ﷺ কাছ থেকে জানি! এই ঋণ আমরা কখনো পরিশোধ করতে পারবো না, তবে নূন্যতম আমরা যেটা করতে পারি তা হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ অবদান স্বীকার করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা, তাঁর আনীত দ্বীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর তাঁর মর্যাদাকে রক্ষার জন্য নিজের জান দিয়ে দেওয়া।

সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার এবং সাহাবিদের প্রতি।

অন্ধকার অরণ্যে এক ছটা আলোর কিরণ কিংবা ঘোর অমানিশায়
উজ্জ্বল তারকার মত জন্ম যার। সততার অটল আদর্শে সদা হাস্যোজ্জ্বল তরুণ
আল আমীন একদিন ওহীর পরশে সমগ্র মানবজাতির কাছে হলেন
রহমাতুল্লিল আলামিন। কখনও স্বজাতির প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শির, কখনও
বদর-উহুদের রক্তে ভেজা জমিন মাড়িয়ে দ্বীনের ঝাণ্ডা বয়ে নিয়ে চলা।
সন্তানের মৃত্যুতে ক্রন্দনরত পিতার হৃদয়, কখনও বা কিশোরী স্ত্রীর খেলার
সাথী। যুগের পর যুগ ধরে লেখা হয়েছে হাজারো পৃষ্ঠা, কত শত ঘণ্টা পেরিয়ে
গেছে তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে। হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছুঁয়ে গেছে তাঁর ভালোবাসা।

হাজার বছর পরও লেখকদের কলমের কালি আজও ফুরিয়ে যায়নি,
মিটে যায়নি নবীপ্রেমিকের হৃদয়ের তৃষ্ণা, অশ্রুজল হৃদয়ের আবেগে এতটুকুও
ভাটা পড়েনি। তাঁর সম্পর্কে আরো একটু জানার আকাঙ্ক্ষায়, আরো
একটু হৃদয়ের কাছাকাছি যাওয়ার আশায় আজও আমরা খুঁজে ফিরি
নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি।

তিনি আমাদের নবীজী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।